সমাজসেবক পুস্তকাবলী—১

বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি-নিরাস।

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের

“বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার” প্রবন্ধে

সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের উপর আক্রমণের

প্রত্যুত্তর।

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

গৌহাটি সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে

সহকারিসম্পাদক শ্রীরামদেব শর্ম্মা কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

শক ১৮৩৬।

প্রাপ্তিস্থান—

সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দির

গৌহাটি—কামরূপ।

কলিকাতা, ৬০ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট

বণিক প্রেস হইতে

শ্রীশিব... রায়বর্ম্মণ দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

যথাশক্তি সমাজের সেবা করা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই উচিত। দুঃখের বিষয় এই সম্বন্ধে শিক্ষিত সাধারণ প্রায়শঃ উদাসীন।

এদিকে, সমাজশরীরকে নির্জ্জীব বা স্পন্দহীন মনে করিয়া কোনও কোনও ব্যক্তি ইহাতে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিন্তু তাঁহারা এইটা প্রণিধান করেন নাই যে আমাদের এই সনাতন সমাজ এখনও জড়ে পরিণত হয় নাই। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধটীতে সমাজদেহে তদ্রূপ আঘাত করিয়াছেন। ইহাতে ব্যথিত হইয়া নানা জনেই নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন; ভূতপূর্ব্ব "জাহ্নবী" পত্রে (পৌষ ১৩১৬ সালে) আমিও একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাই সম্প্রতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ক্রমে "সমাজ-সেবক পুস্তকাবলীর" প্রথম সংখ্যারূপে গৌহাটি সনাতন ধর্ম্ম সভা কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে।

দুই প্রকারে সমাজের সেবা হইতে পারে; এক উপদেশক পুস্তক প্রচার দ্বারা; অপর, আক্রমণকারীর প্রত্যুত্তর দ্বারা। যাহারা অশেষ শাস্ত্রদর্শী এবং বহু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, তাঁহারাই প্রথমবিধ উপায়ে সমাজসেবার অধিকারী। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি (ধর্ম্মব্যাখ্যা ইত্যাদিতে) ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় (আচার প্রবন্ধাদিতে) ৺চন্দ্রনাথ বসু (হিন্দুত্ব প্রভৃতিতে) শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্ঞান ও কর্ম্মে) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার (সনাতনীতে) শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী

(ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্ম বিদ্যায়), এবং আরও কতিপয় মহাত্মা প্রথমবিধ উপায়ে সমাজের সেবা করিয়া ইহার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। নিম্ন অধিকারী এই অকিঞ্চন লেখক অপর পথ অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রচার দ্বারা সমাজ সেবার সংকল্প করিয়া ফলাফলের নিমিত্ত ভগবৎ কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে।

অত্রত্য সনাতন ধর্ম্ম সভার নিষ্ঠাবান্ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহোদয় এতদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়া মদীয় কৃতজ্ঞতার এবং সমাজের ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। ইতি -

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—কামরূপ,
শকাব্দাঃ ১৮৩৬।

শ্রীপদ্মনাথ দে[illegible]র্ণঃ।

বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি-নিরাস।

কিছুদিন হইল ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নানা পত্রিকায় ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রবন্ধটিতে হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্মের এবং কতিপয় গৌরবভাজনের উপর ডাক্তার রায় যেভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে কেহ কেহ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন; সেইজন্য অতীব দুঃখিত চিত্তে তাঁহার ন্যায় সম্মানার্হ ব্যক্তির কতিপয় উক্তির প্রতিকূলে সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রবন্ধটীর প্রারম্ভেই রাজশাহী-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে, ডাঃ রায় তদীয় অভিভাষণের যে অংশে রঘুনন্দনাদির উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বলেন:

"সত্য বটে আমরা নব্য-স্মৃতি ও নব্য-ন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী-মস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে সময়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবমবর্ষীয়া বিধবা নির্জ্জলা উপবাস না করিলে, তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবেন, ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকাটিপ্পনী রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্বিদ্‌বৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে নৈঋত কোণে বায়স 'কা-কা' রব করিলে, সেদিন

কিপ্রকার যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়পূর্ব্বক কাক-চরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এদেশের অধ্যাপকমণ্ডলী 'তাল পড়িয়া ঢিপ্ করে কি ঢিপ্ করিয়া পড়ে' ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তিভঙ্গের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপে গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিবর্গ উদীয়মান হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদঘাটনপূর্ব্বক জ্ঞান-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন ও মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিলেন।"

ভাবের আবেগে মেকলের অনুকরণে ডাঃ রায় বেশ জমকাল একটা মহাবাক্য লিখিয়া ফেলিয়াছেন বটে; কিন্তু একটু ভুল এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬৪২) কেপ্লার (১৫৭১—১৬৩০) বা নিউটন (১৬৪২—১৭২৭) কেহই শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৫ ১৫৩২) মহাধ্যায়ী রঘুনাথ বা রঘুনন্দনের সমসাময়িক ছিলেন না। অবশ্য নৈয়ায়িক জগদীশ ও গদাধর গ্যালিলিও প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন বটে, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র-প্রবর্ত্তনার নিমিত্ত রঘুনাথই দায়ী; বরং তদীয় অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌম, যিনি আরও প্রাচীন ছিলেন, এই দায়িত্বের অংশী। যাহা হউক, ইহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। "যে সময়ের" অর্থ 'যে যুগ"ই ধরিয়া লওয়া যাউক। "নব্য-ন্যায় ও নব্য-স্মৃতিকে আমাদের শ্লাঘা করা অনুচিত, কেন না ইহা প্রাকৃতবিজ্ঞান-বিষয়ক নহে", এই ত ডাক্তার রায়ের মত? আপেক্ষিক তুলনায় ধরিয়া লইলাম, নব্য-ন্যায় ও নব্য-স্মৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞান হইতে নিকৃষ্ট; তথাপি তত্তৎ শাস্ত্রবিষয়ে অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের হিসাবে যদি নব্য-ন্যায় ও নব্য-স্মৃতির গ্রন্থ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে আমরা তজ্জন্য রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের শ্লাঘা করিব না কেন?

তারপর বিবেচনা করিতে হইবে সেই সময়ের শিক্ষার অবস্থা। তখন বঙ্গদেশের বিদ্যার্থীদের ন্যায় পড়িবার জন্য মিথিলা যাইতে হইত। স্মৃতিবিষয়েও বঙ্গদেশের নিজস্ব কিছু ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তখন রঘুনাথ মিথিলার দর্পচূর্ণ করিয়া ন্যায়কে নবদ্বীপে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন; নৈয়ায়িকের চিন্তাস্রোতঃ এক নূতন খাতে প্রবাহিত হয়। তাঁহার 'দীধিতি'র মত গ্রন্থ জগতে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে জানি না। পশ্চাদ্বর্ত্তী জগদীশাদি নৈয়ায়িকগণও বড় কম ছিলেন না। প্রমাণচ্ছলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগদীশকৃত "শব্দশক্তি-প্রকাশিকা" ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধভাবে সংস্কৃত এম্-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অবশ্য, বর্ত্তমানে টোলের শিক্ষায় ফাঁকি পাতড়ার বাড়াবাড়ি দেখা যায় বটে, (যদিও এই বাড়াবাড়ি কদাপি আকাঙ্ক্ষণীয় নহে)—তথাপি ন্যায়শাস্ত্র বলিতে যাঁহারা কেবল "তাল পড়িয়া ঢিপ্ করে না ঢিপ্ করিয়া পড়ে" বুঝেন, তাঁহাদের রহস্যপটুতা প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা যে ন্যায়শাস্ত্র-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একথা সাহস করিয়াই বলা যায়। স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় নব্য-ন্যায় সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন :—

A hair-splitting subtlety in the discussion of meanings of terms is, thus, the distinguishing characteristic of modern Nyaya. Poverty of matter is its great draw-back. Notwithstanding this draw back, however, it is an excellent training for the intellect, which under its discipline acquires a power of precise thinking that is beyond all price. Without a study of modern Nyaya,

it is impossible again to thoroughly understand certain Sanskrit works on Philosophy, Law, Rhetoric and even Grammar, ; for example, the Chitsukhi a commentary by Chitsukhacharyya on Nyayamakaranda (a work on the Vedanta Philosophy by Anandabodha) the Dayabhaga-prabodhini a commentary by Srikrishna Tarkalankar on Dayabhaga (a treatise on the Hindu law of Inheritance.) the Kavyaprakasadarsa, a commentary by Maheswara Nyayalankar on Kavyaprakasa (a work on Rhetoric) and Paribhashenduseckhara and Manjusha (works on Grammar) by Nagesa Bhatta. (P. P. 3-4 : Brief notes on the modern Nyaya system of Philosophy and its technical terms by M. M. Mahes Chandra Nyayaratna C. I. E.).

সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ন্যায়দ্বারা আমাদিগের দেশে বাঙ্গালী মস্তিষ্কের যতটুকু স্ফুরণ হইয়াছে, তাহারই গৌণফলে আজ বাঙ্গালীর প্রতিভা নানা সূক্ষ্ম ও অভিনব বিষয়ে লব্ধপ্রবেশ হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

তারপর রঘুনন্দনের স্মৃতি। ডাঃ রায় রঘুনন্দনকে নিতান্ত নির্ম্মম প্রতিপাদন করিবার জন্য যে কৌশলময়ী বাক্যরাজির প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া বোধ হয় রঘুনন্দন যে বঙ্গদেশের কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানেন না বা জানিবার চেষ্টা করেন নাই। নবমবর্ষীয়া বিধবাকে একাদশীর দিন জলবিন্দু স্পর্শ না করাইতে মাথার দিব্য দেওয়া দূরে থাকুক, রঘুনন্দন একাদশীর উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তির জন্য অনুকল্পবিধি প্রদর্শন করিয়া আমাদের ন্যায় দুর্ব্বলাধিকারীর ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

তদীয় তিথিতত্ত্বের একাদশী প্রকরণে পদ্মপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত বিধান উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা
ফলং তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বু বাজ্যং।
যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাথ বায়ুঃ
প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ ॥"

ইহাতে তিনি ফল, দুগ্ধ, জল প্রভৃতি এমন কি অধমকল্পে রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন ভোজন পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া একাদশীপালনের পন্থা সুগমই করিয়াছেন; তবে দুরদৃষ্টবশতঃ যে বালিকা নবমবর্ষে বিধবা হইবে, তাহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিধির ব্যত্যয় করিতে অবশ্যই রঘুনন্দন উপদেশ দেন নাই।

রঘুনন্দন বঙ্গসমাজের কি উপকার করিয়াছেন, ৺ভূদেব বাবুর "আচার প্রবন্ধ" হইতে তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশের অপেক্ষা স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের প্রসাদে বাঙ্গালাতে স্মার্ত্তাচার অধিকতর প্রবল হইয়া আছে। এই প্রদেশের ব্রাহ্মণেতর জাতীয়েরা বোম্বাই এবং মাদ্রাজের তুলনায় সমধিক পরিমাণেই ব্রাহ্মণাচারের অনুকরণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য সমধিক পরিমাণে শুচি, পবিত্র এবং শ্রী ও বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া যেমন আশ্রম চতুষ্টয়ের এবং পৌরাণিক মন্ত্রাদির, তেমনই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সমস্ত সংস্কারেরও অধিকারী হইয়াছেন।" (আচার-প্রবন্ধ, ১১০ পৃঃ)

ডাক্তার রায় অতঃপর "জ্যোতির্ব্বিদ্‌বৃন্দের" প্রতি কাকচরিত্র রচনার জন্য * ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। কাকচরিত্র শাকুনাবস্থা—

* এ স্থলেও ডাঃ রায় এক অবান্তর ভুল করিয়াছেন; নিউটন কেপ্লারের বহুপূর্ব্বে এতদ্দেশে কাকচরিত্র "রচিত" হইয়াছিল।

জ্যোতির্ব্বিদের ইহাতে সংশ্রব নাই। যাহা হউক, শাকুনবিদ্যা "বিজ্ঞান" বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা, এতদ্বিষয়ে ডাক্তার রায় তদীয় গবেষণা প্রয়োগ করিয়াছেন কিনা তাহা কুত্রাপি বলেন নাই। "Sufficient for the day is the evil ,thereof" বাইবেলের এই উক্তি ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া খৃষ্টিয়ান ইউরোপীয়গণ শাকুনবিদ্যা এবং ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি - ভবিষ্যৎ জানিবার উপায়াবলী পরিহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মন্ত্রশিষ্য অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণও, মুখে যতই "স্বাধীন-চিন্তা" "স্বাধীন চিন্তা" উচ্চারণ করুন না কেন, গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় ইউরোপীয়দের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। থিওসফি দলের সাহেবেরা ভাগ্যে যোগশাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিষাদি কোন কোন অতীন্দ্রিয় বিষয়ক বিদ্যার পক্ষে সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন, তাই শিক্ষিত দলের কেহ কেহ বর্ত্তমানে ঐ গুলি বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

যাহা হউক, শাকুনবিদ্যাও একটা প্রাচীন বিজ্ঞানের অন্তর্গত ছিল। রোমের অভ্যুদয় সময়েও ইহা যে তদ্দেশে প্রচলিত ছিল, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা এক বহু প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ মাত্র পাইয়াছি। আমাদিগের অনেক শাস্ত্র লোপ পাইয়াছে;—যে সকল শাস্ত্র আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি বা উপায় আমাদের নাই। এরূপ স্থলে বিদ্রূপের হাস্যসহকারে তুড়ি দিয়া শাস্ত্রোদ্ধৃত বচনগুলিকে উড়াইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ডাঃ রায়ের আক্রমণের আর এক্ পাত্র কুল্লূকভট্ট। তাঁহার অপরাধ তিনি মনুসংহিতার টীকা করিয়াছেন। স্মৃতি-সংগ্রহকার রঘুনন্দনকেও ডাঃ রায় টীকাকারের শ্রেণীতে আনিয়া তাঁহাকে এবং কুল্লূকভট্টকে

এক দড়ীতে বাঁধিয়া লেকী কথিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ৪০০০ টীকাকারের পালের মধ্যে ঢুকাইয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, যে মনুসংহিতা হিন্দুসাধারণের অবশ্য পাঠ্য ছিল, তাহার অর্থগ্রহণে সহায়তা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস করা কি নিতান্ত কুকাজ? এই মনুসংহিতা সমস্ত স্মৃতির প্রধান :—

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্॥

ইহার অর্থবোধ করাইবার জন্য টীকা প্রচার করিয়া কুল্লুকভট্ট যে কেবল তৎসময়ের ছাত্রদের উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, ইদানীং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বি, এ, পাস কোর্সে সাহিত্যরূপে এবং এম্ এ, 'সি' গ্রুপে ধর্ম্মশাস্ত্রে মনুসংহিতা পাঠ্য হইয়াছে; তৎ সঙ্গে-সঙ্গে কুল্লূকভট্টের টীকাও অবশ্য পঠনীয় বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

ডাক্তার রায় বলেন "আমার বোধ হয়, ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালীর এমন কি হিন্দুজাতির অতীত গৌরবের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে ভ্রান্ত মত পোষণ করেন মাত্র।" ডাঃ রায়ের এই উক্তির কারণ বোধ হয় এই যে, গৌরব করিলেই গৌরবান্বিত ব্যক্তির মত সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিতে হয়। তিনি স্বয়ং এই প্রবন্ধে চার্ব্বাকের, "অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতেজা" ষড়দর্শন প্রণেতা ঋষিগণের, এবং আর্য্যভট্ট-বরাহমিহির প্রভৃতির অনেকের "গৌরব" প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে কি আমাদিগকে বলিতে হইবে তিনি উহাদের সমস্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন? মেকলের শিষ্য নব্যশিক্ষিতের দল এ দেশে কোনও দিন যে কিছু ভাল ছিল, এ দেশে যে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, এ দেশে যে গণিত, বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির চর্চ্চা হইয়া ভূয়সী উন্নতি হইয়াছিল,

এ কথা মানিতেন না। বঙ্কিম বাবু ও ভূদেব বাবু এই সকল কথার প্রতি নব্যশিক্ষিতদলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের মনে স্বদেশ-প্রীতি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ হিন্দুরসায়নের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া যে ডাক্তার রায় সভ্যজগতের নিকট আমাদের অতীতের গৌরব খ্যাপন করিয়াছেন, তাঁহার লেখনীমুখে কি এই কথা শোভা পায়?

অতীতের গৌরব করিয়া আমরা স্ফীত হইয়া থাকি, আর কোনও কাজ করি না, ডাঃ রায়ের বোধ হয় ইহাই ধারণা। ডাঃ রায় এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করুন। পূর্ব্বপুরুষের গৌরব-স্মৃতির দ্বারা আমরা যে কেবল স্ফীত হই তাহা নহে—পূর্ব্বপুরুষেরা কি ছিলেন, আর আমরা কি হইয়াছি, এই ভাবিয়া অশ্রুবর্ষণও করিয়া থাকি—তাঁহাদের ন্যায় মহৎ হইতে স্বতঃই আমাদের আকাঙ্ক্ষাও হয়। আমাদের হৃদয়ের আনন্দের স্ফূর্ত্তিই পূর্ব্বপুরুষগণের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন দ্বারা প্রকটিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়রচিত জাতীয়সঙ্গীতের প্রথম গানই যে "গাও ভারতের জয়।" সে কি নব্যভারতের? তা নয়; সেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের; সেই বাল্মীকি, বেদব্যাসের; সেই সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তীর। ফলতঃ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই যখন মন নিস্তেজ হয়, তখনই পূর্ব্বপুরুষের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উদ্দীপনার একটা প্রধান উপায়।

অপিচ ডাঃ রায় অন্যত্র বলেন, "পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমি কাহাকে সম্ভ্রমহীন হইতে বলি না।" বেশ কথা। কিন্তু তৎপরেই একটী 'কিন্তু' আছে, "কিন্তু যাঁহারা সেই স্মৃতির প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত হইতে গিয়া তাঁহাদের ভুলগুলিকেও অলঙ্কার বিভূষিত করিতে চাহেন, সেগুলির অনুকরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্যই আমার এই প্রস্তাবের অবতারণা।" ভাল কথা, ডাঃ রায় যেগুলি ভুল মনে

করেন, সেগুলি যদি আমরা ভুল মনে না করি, আমরা যদি তৎসম্বন্ধে টেনিসনের সঙ্গে সঙ্গে বলি,—

By faith and faith alone embrace
Believing what we cannot prove;
(In Memoriam.)

তাহা হইলে ডাঃ রায়ের আমাদিগকে মন্দ বলিবার কি অধিকার আছে? ডাঃ রায় স্বাধীন চিন্তা ভারতে কতদূর উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা দেখাইতে গিয়া চার্ব্বাকের উক্তি * প্রদর্শনচ্ছলে বেদ-নিন্দা রটনা করিয়াছেন। আবার স্বয়ং স্মৃতি ও পুরাণ-রচয়িতাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—"একদল অযোগ্য স্বার্থপর লোক সমাজে আবির্ভূত হইয়া, * * সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিল এবং স্বকীয় জাতির মহিমা হারাইয়া কেবল এক গুচ্ছ শ্বেতসূত্র বা যজ্ঞোপবীতের দোহাই দিয়া সমাজের শাসনবিষয়ক স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল। সেই সকল গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য কেবল ব্রাহ্মণ জাতির মহিমা কার্ত্তন অর্থাৎ স্বার্থপর ব্রাহ্মণ নামধারী প্রভুগণের আধিপত্য বিস্তার ও জীবিকা নির্ব্বাহ।" আজকালকার হিন্দুদিগের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "আজ আমরা 'হিন্দু' বলিলে কেবল মুষ্টিমেয় লোকের প্রাধান্য বুঝি মাত্র। এই গণ্ডীর ভিতরে ফোঁটা তিলক কাটিয়া শাস্ত্রের ভোক

---

* চার্ব্বাকের মতগুলি অতি প্রাচীন। তাঁহার দর্শনের অপর নাম লোকায়ত দর্শন। কেন না অজ্ঞ লোক-সাধারণ আপাতদৃষ্টিতে পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে চার্ব্বাকের ন্যায় মতই পোষণ করে। এইজন্য, এইগুলি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য হইলেও, ভারতীয় দর্শনকারেরা যত্নপূর্ব্বক এই সকলের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ডাক্তার রায় তদীয় প্রবন্ধে চার্ব্বাকের যে মতগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনের প্রয়াস এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ ডাক্তার রায়ও চার্ব্বাকের মতের সঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ মতৈক্য-স্পষ্টতঃ প্রকাশ করেন নাই।

যিনি যত খাটাইবেন, তিনি তত হিন্দু।" এই সকল উক্তি পাঠ করিলে বড় দুঃখ হয়। ডাঃ রায় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তাঁহার লেখনীমুখে ঈদৃশ ভাব ও ভাষা প্রকটিত হওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়।

"স্বাধীন চিন্তার" অর্থ বোধ হয় উচ্ছৃঙ্খলতা নতুবা চার্ব্বাক আদর্শ হইতেন না। যাঁহার নৈতিক মত "যাবজ্জীবেৎ, সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ছিল, * তিনি হইলেন স্বাধীন চিন্তার "আদর্শ।" এইরূপ স্বাধীনচিন্তাশীল লোক এখনও জগতে—তথা ভারতে—অহরহঃ ভূরি ভূরি জন্মিতেছে; তবে অনেক সময় উহাদের "চিন্তা" কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া জারিতে না পারায় ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী প্রহরি-রক্ষিত স্থানবিশেষে গিয়া তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিতে হইতেছে!

মানুষের প্রকৃতিতে ছয়টী প্রবল রিপু বিরাজমান। ইহাদের দমনের নিমিত্ত তিনটী বন্ধন আছে—শাস্ত্রের বন্ধন, সমাজবন্ধন এবং আইনের বন্ধন। শাস্ত্রের বন্ধন যদি নাও থাকে, অপর দুইটী ত থাকিবে? তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অবকাশ কোথায়? আপত্তি হইতে পারে শাস্ত্রের বন্ধনে প্রতিভার বিকাশ হয় না। ডাঃ রায় স্বয়ং তদীয় হিন্দু রসায়নের ইতিবৃত্তের উপক্রমণিকায় কি বলিয়াছেন দেখুন:—

"The capacity of a nation must be judged by what it has independently achieved in the several fields of knowledge and branches of Literature Mathematics, including Arithmetic, Algebra, Geometry and Astronomy; Phonetics, Philology, Grammar, Law, Philosophy and Theology." Intr. to H.C.

* ডাঃ রায় চার্ব্বাক দর্শনের এই অংশটুকু উদ্ধৃত করেন নাই।

অনাদিকাল হইতে হিন্দুগণের নিকট বেদ অভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত—তথাপি উল্লেখিত বিষয়সমূহে হিন্দুগণ উন্নতি করিতে পারিল কিরূপে? এই যে রসায়ন শাস্ত্র তাহাও ত খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতির অবস্থায় চলিয়াছিল।

তবে স্বাধীনচিন্তার আজকাল আর একটী অর্থ আছে। অনেকে আশৈশব ইংরেজী মাত্র পড়িয়া, ইউরোপীয়দের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অলক্ষ্যে ইউরোপীয় আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী—তথা স্বদেশীয় রীতিনীতির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ—হন। কেহ কেহ (যথা, ডাঃ রায়) মুখে বলেন বটে যে, তাঁহারা "মনের উপর ইংরেজী ভাবের দাসত্ব আনিতে" চাহেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিন্তায় ও কার্য্যে যিনি যতদূর স্বজাতিবিদ্বেষ ও বিজাতীয় প্রীতি দেখাইতে পারেন, তিনিই নিজকে তত স্বাধীন চিন্তাশীল এবং নৈতিক সাহস (moral courage) পরায়ণ মনে করেন। এই স্বাধীনতার অর্থ অধীনতার পাত্র-পরিবর্ত্তন মাত্র। অর্থাৎ স্বদেশের শাস্ত্র ও সমাজের অধীনতা ছাড়িয়া ইউরোপীয় রুসো মিল প্রভৃতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করা।

ডাঃ রায় স্মৃতি ও পুরাণ কি চক্ষে পড়িয়াছেন জানি না। আমরা কিন্তু স্মৃতি-পুরাণে পদে পদেই ব্রাহ্মণের অসুবিধা দেখিতে পাই। প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যত আচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—এক চুল তফাৎ হইলে শূদ্রত্ব চণ্ডালত্ব প্রভৃতির ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। লাভ-জনক যত ব্যবসায় অন্য জাতির আয়ত্ত। অন্যের দানের উপর ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ভর করিতেছে—তাহাতেও পদে পদে বাধা; অসৎ প্রতিগ্রহ নিষেধ; শ্রাদ্ধান্ন-ভোজী বিপ্রের পাতিত্য; সোনা প্রভৃতি মূল্যবান দান নিয়া অগ্রদানী ব্রাহ্মণের সৃষ্টি; ইত্যাদি। কেবল সংযম, ত্যাগ, অন্যের ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহায়তা, আবশ্যক হইলে পরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত

পরিত্যাগ এই সকল কার্য্যেই আমরা ব্রাহ্মণকে প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাই। কাব্য, নাটক, প্রভৃতিতেও ব্রাহ্মণকে সংযমশীলই দেখি। এত বড় যে চাণক্য তাঁহার গৃহের বর্ণনায় * দারিদ্র্যের ছবিই দেখি অথচ এই চাণক্য ব্রাহ্মণ্যের অধঃপতন-যুগের ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ মূর্খ হইলে তাহার যে দুর্দ্দশা হইত, তাহা শকুন্তলা নাটকের বিদূষকের ছবিতে দেখা যায়, অথচ সেই নাটকেই আছে, তপঃকাননের অধিবাসী তেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণের নিকট রাজগণও সন্ত্রস্ত ভাবে যাইতেন। ফলতঃ মনু প্রভৃতি ব্রাহ্মণের আদর্শ এত উচ্চ করিয়া রাখিয়াছেন যে, এই যুগের ব্রাহ্মণেরা চেষ্টা করিয়াও ততদূর পৌঁছিতে পারিবেন না। তাই বোধ হয় শ্রাদ্ধে দর্ভময় ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা হইতে ডাঃ রায় দেখুন যে, ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থ সাধনার্থ শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন নাই; বরং যত কঠোরতা ব্রাহ্মণের জন্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোথায় ইহাতে শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি দেখাইবেন না উল্টা গালাগালি!

যাঁহারা সমাজের প্রকৃত হিতৈষী, তাঁহারা ব্রাহ্মণ যাহাতে প্রকৃত "ব্রাহ্মণ" হইতে পারেন, তজ্জন্য উপদেশ দেন, কার্য্যও করেন। পুণ্যশ্লোক ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সমস্ত লোকেরই ব্রাহ্মণদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন এই ব্রাহ্মণেরা যত্ন করিয়া বেদ, উপনিষদ, দর্শন, সংহিতা, গণিত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, তন্ত্র, তাবৎ রক্ষা

---

* "কঞ্চুকী। অহো রাজাধিরাজমন্ত্রিণো গৃহভূতিঃ। কুতঃ
উপলশকলমেতদ্ভেদকং গোময়ানাং
বটুভিরুপহৃতানাং বর্হিষাং স্তোমমেতৎ।
শরণমপি সমিদ্ভিঃ শুষ্যমাণাভিরাভি—
র্বিনমিতপটলান্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড্যম্॥" মুদ্রারাক্ষস—তৃতীয়াঙ্ক।

করিয়া আসিয়াছেন। নানাকারণে এবং মোসলমানদের আক্রমণে অনেক গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে। * ব্রাহ্মণের উপর কত ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহারা যত্ন করিয়া জ্ঞানভাণ্ডার যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মেক্সমুলার প্রভৃতি ইউরোপীয় সুধীগণ তাঁহাদিগকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়াছেন, আর আমাদের দেশের লোকেরা তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত।

ডাঃ রায় হিন্দুশাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ, কেন না ইহাতে জাতিভেদ আছে এবং শবব্যবচ্ছেদ, সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। জাতিভেদ সম্বন্ধে আবার ডাক্তার রায় একস্থলে প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, "জাতিভেদ ও স্মৃতি ও সামাজিক বহু ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে যে এক শান্ত, উদ্বেগবিহীন জীবনযাত্রা-প্রণালী

---

* ডাক্তার রায়ের যেন ইহাতেও আপত্তি দেখা যায়। তিনি বলেন, "কেহ কেহ বলেন, মোসলমানের আধিপত্যে রাজন্যগণ শ্রীভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হওয়াই ইহার (অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদাদি বিদ্যালোপের) প্রধান কারণ। * * * তাহাই যদি হইত তবে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিদ্যার আলোচনা দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কারণ তথায় মোসলমান আধিপত্য কখনও স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।" ইত্যাদি। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, আর্য্যাবর্ত্তই শাস্ত্রচর্চ্চার আদি ও কেন্দ্রভূমি ছিল। অতএব আর্য্যাবর্ত্তের উপর অত্যাচারে বিদ্যালোপ হওয়া কোনরূপ অসম্ভাবিত বিষয় নহে। এক আলেকজেন্দ্রিয়ার লাইব্রেরী ধ্বংসহওয়াতে. সমস্ত প্রতীচ্য দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, অথচ কখনও সমগ্র ভূমণ্ডল মোসলমানদের অধীন হয় নাই। নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরে শাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষমাত্র চর্চ্চা হইত। দক্ষিণাত্যেও সমগ্র বিদ্যা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজমান ছিল না। ডাঃ রায়ের হিন্দু কেমিষ্ট্রীর ইতিবৃত্ত হইতেও ইহার আভাস পাওয়া যাইতেছে :—"Indeed in many parts of the Deccan the very names of Charaka and Susruta were forgotten and Vagbhata was looked upto as a revealed author."

Vol. I, Inroduction, P XXVII.

আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বৈদেশিক ঐতিহাসিক গণের প্রশংসিত যে সুন্দর পল্লীমণ্ডলসমূহ সংগঠিত হইয়াছিল—যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত্য দেশের কাউণ্ট টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষিগণের ও সোশিয়ালিষ্টগণের জীবনের চরম স্বপ্ন; ভারতবর্ষীয় যে সমাজ-শৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দুজাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অন্য জাতীয়গণের তুলনায় অনেক কম; ভারতবর্ষের যে পুণ্যসমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের দারুণ জীবন সংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়; আমরা যেন সে সকল কথা না ভুলি”

অতি উত্তম কথা। কেবল কাউণ্ট টলষ্টয় কেন, প্লেটোর “রিপাব্লিক” এবং কোমতের দর্শনেও ঠিক হিন্দুর জাতিবিভাগের ন্যায় সমাজ-গঠনের ব্যবস্থা আছে। তবে কেন ডাক্তার রায় ইহার এত প্রতিবাদী? তিনি বলেন, “কিন্তু যতদিন মানুষের স্বাভাবিক দুরাকাঙ্ক্ষা না বিদূরিত হইবে, যতদিন মানুষের মনে তাহাদের সহচরগণের উপর প্রাধান্যলাভ করিবার ইচ্ছা থাকিবে, যতদিন এক জাতি অন্য জাতিকে স্বার্থের জন্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে, ততদিনের মধ্যে যে জাতি নিজেদের সমাজকে সোশিয়ালিজমের আদর্শে গঠিত করিবে, সে জাতিকে শীঘ্রই অন্যের দাসত্বে জীবন কাটাইতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।”

ডাক্তার রায়ের এই উক্তিতে “আলালের ঘরের দুলালের” ঠগ চাচার কথা মনে পড়িল—“দুনিয়া সাচ্চা নয়, মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?”—এও যে সেইরূপ কথা! ফলতঃ শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত জাতিভেদ-সংবলিত সমাজ যদি বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য হয়, তবে এরূপ কার্য্য করা সকলের কর্ত্তব্য যাহাতে সমগ্র জগতে এই জাতি-বিচার-প্রথা প্রচলিত হইতে পারে। মহর্ষি মনু এই উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥২।২০

পৃথিবীর সকল লোক এই ব্রহ্মর্ষি-দেশজাত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে আপন আপন আচারব্যবহার শিক্ষা করিবে। ভারতবর্ষ এই শোভন বর্ণাশ্রম-বিভাগের জন্য অধঃপতিত হয় নাই—বরং কলিমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতে এই অধোগতি ঘটিয়াছে। এই জাতিভেদ যে আমাদিগকে মোসলমান প্রভৃতি বিজেতাদের হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়া হিন্দুনাম চিরবিলুপ্ত হইতে দেয় নাই, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ইহা ব্রাহ্মণকে শূদ্রের প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করিতে—"তুই হীন" "তুই ছোট" বলিতে-শিক্ষা দেয়। জাতিভেদের বিচার করিতে হইলে জন্মান্তরবাদ আনিতে হয়। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ একজন ব্রাহ্মণ হইল, দুষ্কৃতিবশতঃ একজন শূদ্র হইল; আবার ইহজন্মে সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারিলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে—দুষ্কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণও অধঃপতিত হইতে পারে। এই যখন ব্যবস্থা, একে অন্যকে ঘৃণা বা ঈর্ষা করিবার অবসর কোথায়? এই যে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ" ইহা ইহজন্মে লোকের শ্রদ্ধাদি আকর্ষণরূপ ফল সম্বন্ধে যতটা না হউক, পারলৌকিক উন্নতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে। একে অন্যের হাতে না খাইলেই যে ঘৃণা প্রকাশ করা হইল, ইহা আধুনিকদের এক উদ্ভট মত। অপরিচিত বা অসম্পর্কিত ব্রাহ্মণের অন্ন ব্রাহ্মণেরও গ্রহণ করিবার রীতি নাই। অনেকস্থলে পিতা অনুপনীত পুত্রের হাতে, কিংবা তাহাকে স্পর্শ করিয়া খান না। তাহাকে ঠাকুর ঘরে যাইতে দেন না। অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ স্ত্রীর হাতে পর্য্যন্ত খান না, স্বপাক ভোজন করিয়া থাকেন।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা মোসলমানের পাক করা মাংসে ও আচারবান্ ব্রাহ্মণের দ্বারা পক্কমাংসে কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত না হইতে পারে; তবে হে জড়বিজ্ঞানবিৎ, এটা ঠিক্ যে—

"There are many things in Heaven and Earth
Than are dreamt of in your Philosophy."

ফলতঃ বর্ণভেদদ্বারা যে ব্রাহ্মণ অন্যজাতির প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইয়া কেবল দাম্ভিক আত্মম্ভরি মাত্র হইয়া যান, একথা বলা অনুচিত। বরং আচারবান্ ব্রাহ্মণের আদর্শ আজকালও সমাজে যাহা দেখা যায়, তাহাতে তদ্বৈপরীত্যই লক্ষিত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় প্রণীত "যুগান্তরে" একটী নাকি প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পরিবারের আদর্শে বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ডাক্তার রায় কৃপা করিয়া সেই গল্পটি একবার পড়িবেন।

ডাক্তার রায় বলেন "জাতিভেদেরফলে স্বদেশ প্রেম ও স্বজাতি প্রেম বলিয়া স্বর্গীয় জিনিস দুইটি ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং স্বদেশ প্রেম বলিয়া কিছু ভারতবর্ষে কখনও ছিল এইরূপ মনে হয় না।" ডাক্তার রায়ের বোধ হয় রাজস্থানের কথা মনে পড়ে নাই এবং শিবাজীবিষয়ক ইতিবৃত্তও স্মরণ নাই। যাহা হউক, নানা কারণে এই সম্বন্ধে সমধিক বলা অনাবশ্যক মনে করি।

তিনি আরো বলেন, "এই জাতিবৈষম্য বহুদিন যাবৎ সমাজের হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত চুষিয়া নিঃশেষ করিতেছে। আপনার স্ত্রীপুত্রের জীবিকা-সংস্থানই এই জাতির মুখ্য উদ্দেশ্য, এই জাতি প্রাতিবেশীর দুঃখ বোঝে না, আপন গণ্ডীর বাহির্ভাগে স্বীয় ভালবাসার আনন্দময় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।" ডাক্তার রায় এতদুপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি বিশেষও উদ্ধৃত করিয়াছেন:

"যে ধর্ম্ম গরিবের দুঃখ দেখে না, মানুষকে দেবতা করে না, তাকি আবার ধর্ম্ম? আমাদের কি আর ধর্ম্ম? আমাদের 'ছুৎমার্গ'—খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দুহাজার বৎসর খালি বিচার কচ্ছে, ডান হাতে খাব কি বাম হাতে খাব, ডান থেকে জল নেব, কি বাম দি ক্ থেকে, কট্ ক্রট্ ক্রাং ক্রুং হিহি ইত্যাদি যে দেশের মূলমন্ত্র, তাহাদের অধোগতি হবে না ত আর কাদের হবে!" অবশ্য ইহাতে যুক্তি-তর্কের লেশ নাই—গায়ের জোরের কথা। ভাবও ভাষার অনুযায়ী লঘু (Vulgar); কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যে সে লোক নহেন, তাঁহার ভক্ত অনেক। সুতরাং তাঁহার উক্তির মর্য্যাদার্থ ইহারও একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

মানুষকে দেবতা যদি কোনও ধর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মই উহা করিয়াছে—তা যে অর্থেই হউক। বেশী দূর যাইতে হইবে না—বিবেকানন্দের গুরু ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতিই দৃষ্টিপাত করুন। তারপর, হিন্দুধর্ম্ম গরিবের দুঃখ দেখে কিনা, মাত্র স্ত্রীপুত্রের জীবিকা-সংস্থানই এই জাতির উদ্দেশ্য কিনা, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "চারিত্র-পূজা" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"আমাদের দেশে প্রত্যেকের প্রত্যহের কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে আবালবৃদ্ধ বনিতাকে যথাসম্ভব নিজের স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পশুপ্রকৃতিকে সংযত করিয়া পরের জন্য নিজকে উৎসর্গ করিতে হয়, ইহাই আমাদের আদর্শ। * * * * *
এইজন্য সাধারণতঃ সমস্ত হিন্দুসমাজে একটী সাত্ত্বিক ভাব বিরাজমান—এখানে ছোটবড় সকলেই মঙ্গলচর্চ্চায় রত, কারণ গৃহই মঙ্গল-চর্চ্চার স্থান।

"আমাদের সমাজে যেরূপ বিধান ছিল, তাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন চাঁদা দিতে হইত। তাহার তহবিল আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, দীনদুঃখী সকলের জন্যই ছিল।"

ইহার উপর আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তারপর স্পর্শদোষ (বিবেকানন্দের "ছুৎমার্গ") সম্বন্ধে ১৩১৬ সালের ২২শে আশ্বিন তারিখের "হিতবাদী" পত্রিকায় প্রকাশিত "হিন্দুর জাতিতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কতক এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"ভারতের হিন্দুসমাজে যেরূপ জাতিবিচার আছে, সেরূপ জাতিবিচার বুঝি পৃথিবীর কোনদেশে কোন সমাজে নাই। একব্যক্তি অস্পৃশ্য কোনজনকে স্পর্শ করিলে, সেই ব্যক্তিকে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়; মানব হইয়া মানবের প্রতি এত ঘৃণা! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, সাম্যবাদী খৃষ্টানগণ, একেশ্বরপূজক মোসলমানগণ হিন্দুদিগের এই বিসদৃশ অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে স্তব্ধ হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ "যত্র জীবস্তত্র শিবঃ" বলিয়া জীবমাত্রকেই দেবতা জ্ঞান করেন, যে ব্রাহ্মণ পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে জল-গণ্ডূষপ্রদানকালে "আব্রহ্মতৃণস্তম্ব" পর্য্যন্ত তৃপ্তিকামনা করেন, সেই ব্রাহ্মণ কেন যে ব্যাধ, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতিকে অস্পৃশ্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা বৈদেশিকগণ বুঝিতে পারেন না এবং আমাদের স্বদেশীয় ইংরাজী-শিক্ষিত লোকেরও ধারণার অতীত। তাই এখন অনেকেই জাতিভেদ-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন।

"একজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ হিন্দুর জাতিভেদ-প্রণালীর মূলে নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। ইনি প্রফেসার ই, এচ, হ্যান্‌কিন্। পশ্চিমোত্তর দেশে গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় প্রফেসর হ্যান্‌কিন্ রাসায়নিক ও আনুবীক্ষণিক পরীক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি হিন্দুসমাজের জাতিভেদ-প্রথার সমর্থন করিয়া

সম্প্রতি একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রফেসার হ্যান্‌কিন্‌ বলেন যে, ব্যবসায়ভেদে হিন্দুসমাজের জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, দৃষ্টিতে ইহাই মনে হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই জাতিভেদ-প্রথার বিষয় আলোচনা করিলে ইহার সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ প্রাচীন ব্রাহ্মণগণও এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন না; * তাঁহারা ঝাড়ুদার, ডোম, চামার, মেথর প্রভৃতির প্রতি ঘৃণাবশতই তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া গিয়া থাকিবেন; কিন্তু যাহারা ঝাড়ুদার, মেথর, ডোম, মুর্দ্দাফরাশ প্রভৃতির কার্য্য করে, তাহাদের শরীরে, বস্ত্রে, এমন কি তাহাদের শরীরের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী বায়ুতেও নানাপ্রকার অনিষ্টকর কীটাণু সঞ্চরণ করে। তাহারা আশৈশব ঐ সকল কীটাণুর সাহচর্য্যে অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের কোনওরূপ পীড়া হয় না; কিন্তু যাহারা চিরকাল ঐ সকল কীটাণু হইতে দূরে থাকে, তাহারা যদি একমুহূর্ত্তের জন্যও ঐ সকল নীচ জাতির সংস্পর্শে থাকে, তাহা হইলে তাহারা কীটাণুদ্বারা আক্রান্ত হয়। ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; সেইজন্য তাঁহারা চণ্ডাল, ডোম, মেথর প্রভৃতিকে স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হন। প্রফেসার হ্যান্‌কিন্‌ মনে করেন:—At any rate, the caste system makes for cleanliness, and that the high caste Brahmin is undoubtedly clean. He may be saturated with superstitiot and ignorance—according to European ideas, but that was a different matter; and he thought that the levelling up—or down—of castes would not benefit the people of the country. ইহার ভাবার্থ এই যে, জাতিভেদের জন্য হিন্দুসমাজে পরিচ্ছন্নতা আছে

* সাহেবের এইটুকু ধারণা ভুল; "ন খলু ধীমতাম্‌ (ঋষীণাং) কশ্চিদবিষয়ো নাম।"

এবং ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণগণকে আমরা আজও কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে করিতে পারি, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, জাতিভেদ-প্রথার বিলোপ সাধন করিলে এদেশের উপকার হইবে না।

"প্রফেসার হ্যান্‌কিন্‌ যখন হিন্দুসমাজের জাতিভেদ-প্রথা সমর্থন করিয়াছেন, তখন, হয়ত শীঘ্র দেখিব, যে সকল হিন্দুসন্তান এতদিন জাতিভেদ-প্রথার দোষকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারই আবার ঐ প্রথার গুণ-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবেন'। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন আর কি হইতে পারে?"

এই স্পর্শদোষ-সম্বন্ধে জড়বৈজ্ঞানিকের যুক্তি যাহাই হউক না কেন এতদতিরিক্ত আরও কিছু আছে, তাহা বিশ্বাসের বিষয়ীভূত, তর্কের নহে; ফলতঃ অধ্যাত্মবিদ্যার এখনও এমন উন্নতি হয় নাই * যে সেই অতীন্দ্রিয়দর্শী মহর্ষিগণের সমগ্র উপদেশাবলীর মর্ম্মোদ্ঘাটন হইতে পারে।

ডাঃ রায় "প্রায় এক হাজার বৎসর" যাবৎ হিন্দুগণের নিস্পন্দতা ঘটিয়াছে—লিখিয়াছেন; তাঁহার মাতব্বর সাক্ষী বিবেকানন্দ বলেন, "দুই হাজার বৎসর যাবৎ" এই জাতির আর কোনও কর্ম্ম নাই— "কেবল ডান হাতে খাব কি বাম হাতে খাব" এইরূপ বিচার করিতেছে! ইহার মধ্যে যে ডাঃ রায়ের গৌরবাস্পদ আর্য্যভট্টাদিও পড়িয়া গেলেন! যাহা হউক, বিবেকানন্দ "ডান থেকে জল নেব,

---

* ইউরোপীয়েরাও এইরূপ কথা স্বীকার করিতেছেন:—"Those unknown Psychical forces which we are now but beginning to catch a glimpse of and which were so largely employed by Indians our forerunners in the matter of Psychological experience whose level we have not yet been able to reach." Dr. Leo Sera "On the tracks of life" (Quoted in the Modern Review, November 1909, P. 507).

কি বাম থেকে”,—ইত্যাদি উক্তির দ্বারা আচারানুষ্ঠানের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার হিন্দুশাস্ত্রের মূল-মন্ত্রকে কট্ ক্রট্ ক্রাং ক্রুং হিহি বলিয়া তিনি অর্থহীন প্রলাপ বাক্যের ন্যায় মনে করিয়াছেন!

বিবেকানন্দ স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। জিজ্ঞাসা করি, এই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ গদাধর কিরূপে পরমহংস-পদবী লাভ করিয়াছিলেন? যে তান্ত্রিক দীক্ষার বীজকে বিবেকানন্দ “কট্ ক্রাং হিহি” বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহারই অবলম্বনে রামকৃষ্ণদেব অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার “শ্রীম—কথিত” “কথামৃতে” তো আচারানুষ্ঠানের প্রতি কোনও বিদ্রূপের ভাব দেখিলাম না! ফলতঃ, বিবেকানন্দ অসাধারণ মনস্বী ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার উপদেশাবলী ও বক্তৃতাদিতে ধর্ম্মভাবের অপেক্ষা রাজনীতিক ভাবের প্রাধান্য দেখিতে পাই। তিনি পরমহংসদেব হইতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন—শাস্ত্র বিগর্হিত দেশে গিয়া শাস্ত্রাচার-বিমুখতা বশতঃ সমস্ত খোয়াইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের ধারণা—নচেৎ ঈদৃশ উক্তি তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত না। মনে হয়, যেন একখণ্ড ইস্পাত চুম্বক-সংস্পর্শে চৌম্বকশক্তিলাভ করিয়াছিল—কিন্তু আর্ম্মেচার (armature) দ্বারা সংরক্ষিত না হওয়ায় লুপ্তশক্তি (demagnetized) হইয়া পড়িয়াছিল!

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নামসংকীর্ত্তনাদি প্রচার দ্বারা যে মোসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন একথা আমিও স্বীকার করি।* তবে তিনি যে “চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।” এই কথাদ্বারা একটা উদ্ভট মত প্রচার করিয়া

* সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩১৫ দ্রষ্টব্য—তাহাতে প্রকাশিত “পূর্ব্ববঙ্গে মোসলমানের সংখ্যাধিক্য” শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা বলিয়াছি।

গিয়াছেন, অথবা জাতিভেদের শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে চাহিয়াছিলেন—একথা স্বীকার করিতে পারি না। তাঁহার "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ" শ্রীমদ্ভাগবতের নানা শ্লোকের প্রতিধ্বনি মাত্র। যথা, তৃতীয় স্কন্ধ ৩৩।৬, ৩৩।৭; সপ্তম স্কন্ধ ৯।১০; শেষোক্ত শ্লোকটী এখানে উদ্ধৃত করিলাম:—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং নতু ভূরিমানঃ॥"

দ্বাদশগুণভূষিত ব্রাহ্মণও যদি নারায়ণ পাদপদ্মপরাঙ্মুখ হন, তবে যে চণ্ডালের মন, বাক্য, ধন ও প্রাণ তাঁহাতে অর্পিত, তাহাকেও সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি—যেহেতু সে, ঐ চণ্ডালবংশ পবিত্র করিতেছে কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে অসমর্থ।

যাঁহারা বলেন, মহাপ্রভু জাতিভেদ তুলিয়া দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিমিত্তে চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"যদ্যপি তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥"

ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু সনাতনকে বলিতেছেন—"মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ।" তিনি যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের মর্য্যাদা হানির জন্য চণ্ডালোঽপি ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

অপিচ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী ছিলেন—সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তিনি সর্ব্ববর্ণের প্রতি সমদৃষ্টি হইলেও প্রায়শঃ ব্রাহ্মণের বাড়ী ভিন্ন কখনও ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। অথচ তিনি থাকিতেন পুরীতে, যেখানে মহাপ্রসাদ ভক্ষণে স্পর্শদোষ নাই।

জাতিভেদের বন্ধন কলিযুগের পূর্ব্বে অনেকটা শিথিল ছিল—কলিযুগে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণও হীনতেজা হইয়া পড়িয়াছেন। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে যেমন সূর্য্যকে আপন তাপ রক্ষা করিবার জন্য অবয়ব সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে, তেমনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকেও আহার কি বিবাহ বিষয়ে কতকটা সঙ্কোচ ভাবাপন্ন হইতে হইয়াছে।

ডাঃ রায় শাস্ত্রের উপর অপর যে যে হেতুবশতঃ বিদ্বেষপরায়ণ তৎসম্বন্ধেও আলোচনা করা যাউক। ডাঃ রায় এমারসন্ উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়; সেইরূপ স্মৃতি প্রভৃতি অসংখ্য আইন নিগড়ের দ্বারা প্রতিভা প্রতিহত হইবার কথা।" এমারসনের কথায় কি তবে বিশ্ববিদ্যালয় উঠাইয়া দিতে হইবে? কোথায় কবে কোন্ প্রতিভা জন্মিবে তাহার জন্য কি নিয়মবদ্ধ বিশ্ববিদ্যাগার কিম্বা শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ সংগঠিত করিতে হইবে না? এতদ্ বিষয়ে হিন্দু-সমাজ-তত্ত্ববিৎ প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিনের "বঙ্গবাসী"তে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল:—

"যেন তেন প্রকারেণ ধর্ম্মজীবন আচার-জড়িত হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট আচার নষ্ট করিতে পারিলেই মহামনীষিত্ব, মহাপুরুষত্ব—এইরূপ একটা ধারণা এখন অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। এই ধারণাই ধর্ম্মস্থিতির প্রধান অন্তরায়। তাঁহাদের কথা—আচার ধর্ম্মের অঙ্গ হয় হউক, কিন্তু আচার বন্ধন স্বাধীন চিন্তার বিরোধী।

"স্বাধীনচিন্তা অবারিত না হইলে প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হয় না। তাঁহাদের কথা তাঁহারাই বলুন—আমরা শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি 'সুপ্রভাত' পত্রে লিখিতেছেন:—'এই শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষের মধ্যবিধ শক্তিসম্পন্ন লোক উৎপাদনের যেরূপ সুবিধা হইয়াছিল, মহাশক্তিমান্ পুরুষজননের পক্ষে সেরূপ কার্য্যকর হয় নাই, কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য মহাশক্তিশালী পুরুষের—প্রতিভাবান্ পুরুষের একান্ত প্রয়োজন।' এ সকল ভাল কথা। তবে জিজ্ঞাস্য এই, সকল দেশেই ত সাধারণের জন্য বিধিব্যবস্থা হইয়া থাকে, অসাধারণের জন্য নহে। তবে ভারতবর্ষ দোষ করিল কি প্রকারে? যাঁহারা শক্তিশালী পুরুষ তাঁহারা বাঁধনছাদন কাটাইয়া উঠেন। বাঁধনছাদন থাকে বলিয়াই ত শক্তিপ্রদর্শনের সুযোগ হয়। একা ভারতবর্ষে যত শক্তিশালী মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবীতে তত হয় নাই। সুতরাং এ বাঁধনছাদনের জন্য ভারতবর্ষ দোষী, এ কিরূপ সিদ্ধান্ত বুঝিলাম না।"

আপ্তবাক্যের বিধি-নিষেধ মাথায় লইয়াও যে এই ভারতবর্ষে নানা বিদ্যার চর্চ্চা ও উন্নতি হইয়াছিল, একথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—এমন কি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রসায়নবিদ্যার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহাও বলা হইয়াছে। সেই যুগে জ্যোতির্ব্বিদ্ জয়সিংহকেও ডি-লা-হায়ারের নক্ষত্রতালিকা সংশোধন করিতে দেখিতে পাই। হিন্দুশিল্পী কর্ত্তৃক তাজমহলের ন্যায় আশ্চর্য্য কীর্ত্তির উদ্ভাবনার কথাও হেভেল সাহেব বলিয়াছেন; এমন কি সপ্তগ্রামের দ্রাঘিমান্তর (longitude) নিরূপণ-ক্রমে পঞ্জিকাসংস্কারও হইয়াছিল; কিন্তু হায়! দিনের দিন সবই দীন হইতে লাগিল, আর কি বলিব? শাস্ত্রের শাসনে প্রতিভা সংযত হয় বটে, কিন্তু নিষ্পিষ্ট হয় না।

আপ্তবাক্যমূলক শাস্ত্র যে ভারতেই আছে, এমন নহে। মোসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতিরও ঐরূপ শাস্ত্র আছে। এখন সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের হানি ঘটিয়াছে। কিন্তু যখন কোরাণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আরবজাতীয়েরা খালিফাদের দ্বারা চালিত হইতেছিল, তখন যে কেবল তাহারা নিজে সভ্যতালোকে দীপ্তিশীল হইয়াছিল এমন নহে, তৎকালীন তিমিরাচ্ছন্ন ইউরোপকেও সেই আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল।* ইউরোপেরও নানা জাতি বাইবেলকে ঈশ্বরের বাক্য মানিয়াও উন্নত হইতে পারিয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি আর এক আক্রোশ, ইহা দ্বারা শবব্যবচ্ছেদাদি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ডাঃ রায় বলেন, "মৃতদেহ স্পর্শ করিলে অশৌচ হয়, মনু এই ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন, সুতরাং শবব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান তিরোহিত হইল।" "অশৌচ" কথাটা শুনিয়াই কেহ শিহরিয়া উঠিবেন না; ডাক্তার রায়ের ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় গ্রহণ করুন। হিন্দু রসায়নের ইতিহাস গ্রন্থেও (১৯৩ পৃঃ) ডাঃ রায় লিখেন :—"According to Susruta, the dissection of dead bodies is a *sine qua non* to the students of surgery and this high authority lays particular stress on knowledgeg ained from experiments and observation. But Manu would have none of it. The very touch of a corpse, according to Manu, is enough to bring contamination to the sacred person of a Brahmin." ইহার ফুটনোটে তিনি মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ৬৪, ৮৫ ও ৮৭ সংখ্যক

* "When in the dark and middle ages, the lamp of knowledge had begun to burn very low in Europe * * * it was the Arabs who carried there the accumulated, intellectual treasures of the East and thus laid the foundation, so to speak, of modern Europe." Dr. Ray's History of Hindu Chemistry. Vol 1. Introduction. P. Cvii.

শ্লোকের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুসংহিতার শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা যাউক ; ৫ম অধ্যায়ের ৬৪ সংখ্যক শ্লোক এই :—

"অহ্না চৈকেন রাত্র্যাচ ত্রিরাত্রৈরেবচ ত্রিভিঃ।
শবস্পৃশো বিশুধ্যন্তি ত্র্যহাদুদকদায়িনঃ॥"

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত কুল্লূক ভট্টের টীকানুযায়ী অনুবাদ এইরূপ :—"ব্রাহ্মণ গুণবান্ হইলেও যদি সপিণ্ডের শবস্পর্শ হয়, তাহা হইলে তিন গুণিত তিন দিন অর্থাৎ নয় দিন এবং এক দিন, এই দশাহোরাত্রে অশৌচান্ত হয়, কিন্তু সমানোদকদিগের শবস্পর্শে তিনরাত্রি অশৌচ জানিবে।"

এই বচন দাহকালে শবনির্গমন বিষয়ক। ডাক্তার রায় কুল্লূক ভট্টের প্রতি বিরূপ ; তা মনুর অন্য টীকাও তো আছে ? গোবিন্দরাজ অপর এক জন টীকাকার ; তাঁহার মতে "ধনগ্রহণপূর্ব্বকশবনির্হারক (= বহনকারি) অসম্বন্ধিব্রাহ্মণবিষয়মিদং দশাহাশৌচম্।" এই বচন শবব্যবচ্ছেদকালীন স্পর্শের বিষয়ে যে খাটে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

৫ম অধ্যায়ের ৮৫ ও ৮৭ সংখ্যক বচনদ্বয় এই :—

"দিবাকীর্ত্তি মুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকাং তথা।
শবং তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্টা স্নানেন শুধ্যতি॥" ৮৫

চণ্ডাল, ঋতুমতী স্ত্রী, পতিত, নবপ্রসূতা স্ত্রী, শব ও শবস্পর্শী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

"নারং স্পৃষ্টাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্যবা॥" ৮৬

মৃত মনুষ্যের সরস অস্থি স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হন ; কিন্তু শুষ্ক অস্থি স্পর্শন স্থলে আচমন করিয়া গাভী স্পর্শ করিয়া অথবা সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হন।

এখন দেখুন ডাঃ রায় যে বলেন "But Manu would have none of it" তাহা কতদূর সঙ্গত। বিশেষতঃ "শবব্যবচ্ছেদ করিবে না" এই আদেশও তিনি দেন নাই, যে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া কেহ ঋষিবাক্যলঙ্ঘনরূপ পাতক অর্জ্জন করিবে। শব কি শবাস্থি ছুঁইলে কি করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা মাত্র করিয়াছেন। ইহা কি বড়ই কঠোর ব্যবস্থা? স্নান বা আচমন করণার্থ এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জল ঘাটানটা কি বড়ই অসুবিধাকর কাজ? ভাল, মড়া কাটিলে সাহেবেরা কি করিয়া থাকেন? তাঁহারা কি সাবান কি অন্য কোনও জিনিস দ্বারা যত্নসহকারে হস্তপ্রক্ষালন করেন না?

অপিচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মনুর ৫ম অধ্যায়ে ৬৪ ও ৮৫ সংখ্যক শ্লোকে শবস্পর্শের বিভিন্ন প্রকারের অশৌচ ও শুদ্ধির ব্যবস্থা দেখিয়াও এই প্রভেদের কারণানুসন্ধান করার কর্ত্তব্যতা ডাক্তার রায়ের মনে উপজাত হইল না। তাঁহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের নিকট এই বিষয়ের একটা কারণ নির্দ্ধারণের চেষ্টা দেখিলেও আমরা সুখী হইতাম। ফলতঃ ডাঃ রায় মনুর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অথচ স্বয়ং স্থানান্তরে মহর্ষি মনুর বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া ইহার "অমূল্য উপদেশ" আমাদের চক্ষুঃ সমীপে ধরিয়াছেন :—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥*

---

* এই বচনটী মনুসংহিতায় বা অন্য কোন সংহিতায় খুঁজিয়া পাইলাম না। ইহা রঘুনন্দন বৃহস্পতির বচন বলিয়া প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু যুক্তি শব্দের কোনও অর্থ দেন নাই। তবে একথা ঠিক যে ডাঃ রায় ইহার যে অর্থ বুঝিয়াছেন, অর্থাৎ শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের বুদ্ধি অনুসারে চলিতে হইবে, সেই অর্থে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রকার এইরূপ বচন প্রয়োগ করিতে পারেন না। ঈদৃশ স্থলেই কুল্লূকাদির

তৎপরে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করা হেতু ডাক্তার রায় মনুপ্রভৃতির উপর বিরক্ত। মহর্ষি মনু সমুদ্রযায়ী ব্রাহ্মণকে বিগর্হিতাচার অপাংক্তেয় বলিয়াছেন (৩।২৩৮)। সমুদ্রে গেলে তখনও যে ব্রাহ্মণকে ভূরিপরিমাণে আচারভ্রষ্ট হইতে হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই—এখন তো হিন্দুর গমনোপযোগী জাহাজই নাই। এই বিষয়ে কলিযুগের প্রারম্ভে একটা প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল বোধ হয়। হুইটবির ধর্ম্মসভার (Synod of Whitby) ন্যায় তৎকালীন বড় বড় মহাত্মারা মিলিয়া একটা সভা করিয়া পরামর্শক্রমে কতকগুলি বিষয় নিষেধ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনকৃত উদ্বাহতত্ত্বে ধৃত বৃহন্নারদীয় ও হেমাদ্রিপরাশর ভাষ্যের বচন দেখিলে ইহাই সূচিত হয়:—

"সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহু র্মনীষিণঃ॥"
"এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥

সাধুমহাত্মারা লোক রক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াগিয়াছেন। তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিলাত এমেরিকা প্রভৃতি স্থানে অনেকে যাইতেছেন। ইহাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে তাহার কথা এখন কেহই বলিতে পারে না। আপাততঃ

প্রয়োজন। যুক্তির অর্থ এইরূপ স্থলে "লোক-ব্যবহার"ও হইতে পারে। শব্দকল্পদ্রুমে স্পষ্টই আছে, "যুক্তিঃ—লোকব্যবহারঃ। ইতি ব্যবহার-মাতৃকা। ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরোধেতু যুক্তিযুক্তো বিধিঃস্মৃতঃ। ইতি স্মৃতিশ্চ।" এখন বোধ হয় ডাঃ রায় ইহাকে আর "অমূল্য উপদেশ" মনে করিবেন না।

তো অমঙ্গলই যেন দেখা যাইতেছে—কেননা এমন যে আদর্শ সমাজ-বন্ধন—আমাদের এই সাজান বাগান—যাহার প্রশংসা ডাঃ রায় পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন—তাহাকে এই বিলাত প্রভৃতির ফেরত মহাত্মারাই উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; এখানেও যাহাতে সমুদ্রে ভাসমান বরফপর্ব্বতের (Ice berg) ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল প্রতীচ্য সমাজের আদর্শে সমাজ গঠিত হয় তাহার ফিকির দেখিতেছেন। বলাতে গিয়া কল, মিল প্রভৃতির আমদানী করিলেই যে নিছাক উপকার হইবে, ইহারই বা সম্ভাবনা কি? বোম্বে আহ্‌মদাবাদ প্রভৃতি স্থানে কলের মজুরগণের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া এবং এদিকে যে শতসহস্র তাঁতি, জোলা প্রভৃতি বৃত্তিহীন হইতেছে তাহা দেখিয়া যে অনেকেই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইতেছেন? সেই কলিপ্রারম্ভে সমবেত মহাত্মাদের মনে যে ভারতের ভবিষৎ দুর্ভাগ্যের ছায়া পতিত না হইয়াছিল তাহাই বা কে বলিতে পারে? হয়তো সমুদ্র যাত্রা দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ না হইলে মোসলমানদিগের অত্যাচারে হিন্দুর সংখ্যা, উপনিবেশ স্থাপন হেতু, আরও কমিয়া যাইতে পারিত—হয়তো বা এই বহুতীর্থ-সমন্বিত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হিন্দুশূন্য হইয়া যাইত। ফলতঃ ভগবদ্বিধানের যেমন উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, তদ্রূপ আর্য্যমনীষীদিগের বিধিব্যবস্থার কারণ নির্ণয়ও সুদূর পরাহত।

ডাক্তার রায় দেবতার নিকট পীড়াদি উপলক্ষে মানত করা কিংবা স্বপ্নে ঔষধাদি পাওয়া, অথবা দেবস্থানের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসস্থাপন দ্বারা রোগমুক্তি, ইত্যাদির প্রতিও অবজ্ঞার কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইহাতে নাকি স্বাধীন-চিন্তা লোপ পায়। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এগুলি ব্যাধির উপশমকল্পে কার্য্যকর হয় এবং ইহা এখন জড়বিজ্ঞান-প্লাবিত পাশ্চাত্যদেশেও স্বীকৃত হইতেছে। বৈদ্যনাথ বা তারকেশ্বরে

গিয়া যদি কেহ ঈশ্বর কৃপায় ঔষধলাভ করিয়া রোগমুক্ত হইয়া থাকে, তবে ইহার প্রতি অবিশ্বাস জন্মান কি উচিত? যে 'সুপ্রভাত' পত্রে ডাঃ রায়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—যাহা জনৈক ব্রাহ্মমহিলা দ্বারা পরিচালিত—তাহারই বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে সন্ন্যাসিদত্ত অর্শের অব্যর্থ "মাদুলীর" বিজ্ঞাপনে উক্ত হইয়াছে, "সঞ্জীবনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া বহুলোক ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন।" বিজ্ঞাপনটিও প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাড়ীর জনৈক মহিলা দ্বারা বৈদ্যনাথ হইতে প্রচারিত। আবার একের বিশ্বাসে যে অন্যেরও রোগের উপশম হইয়া থাকে, তাহার অপর উদাহরণ "ভারতমহিলা" (কার্ত্তিক ১৩১৫) পত্রিকায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত তদীয় মাতৃদেবীর জীবনী হইতে উদ্ধৃতকরা যাইতেছে:—"আমার জননীর ধর্ম্মপরায়ণতার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমার বয়স যখন ৬।৭ বৎসর এবং আমার মাতার বয়স যখন ২৫।২৬ বৎসর, তখন আমি একবার কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমার জীবনের আশা ছিল না। তখন মা তাঁহার ইষ্টদেবের চরণে এই মানত করিলেন যে, সন্তান রোগমুক্ত হইলে তিনি হাতে ও মাথাতে ধুনা পুড়াইবেন এবং বুক চিরিয়া সেই রক্ত দিয়া ইষ্টদেবতার স্তব লিখিয়া দিবেন। যখন আমি রোগমুক্ত হইলাম এবং এই ব্রত উদ্যাপন করিবার সময় আসিল, তখন যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না।"—ইত্যাদি। এইরূপে আরও দুইবার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় তাঁহার মাতা ইষ্ট-দেবতার্চ্চনাদি দ্বারা তাঁহার রোগমুক্ত হইবার সহায় হইয়াছিলেন। ফলতঃ বিশ্বাস দ্বারা এইরূপ রোগমুক্তি তো অল্প কথা, আরও গুরুতর আশ্চর্য্য ঘটনা হইতে পারে। কিন্তু হায়, সেই বিশ্বাস—সেই ধর্ম্মে অটল ভক্তি—ক্রমশঃ কালধর্ম্মে কমিয়াই

যাইতেছে; তাহাতে আবার বিজ্ঞান আসিয়া বিশ্বাসলোপের সহায় হইয়াছে।

তবে হিন্দুসমাজের সকলেই যে মানত করিয়া পীড়ার উপশম করিতে চায়, তাহাও নহে; এতদ্বিষয়ে স্বর্গীয় ভূদেব বাবু তাঁহার "আচার প্রবন্ধে" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—"কাম্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি নরনারীগণের বাসনার ন্যায় অতি বিচিত্র ও বহু পল্লবিত; উহারা নিকৃষ্ট অধিকারীকে সংযমাদি শিখাইয়া ও তাহাদের চিত্তশুদ্ধি-বিধান করিয়া তাহাদের উপকারসাধন করে। কিন্তু উচ্চাধিকারীদিগের বিষয় হয় না এবং শাস্ত্রে উহাদিগের তাদৃশ গৌরব প্রখ্যাপিত নাই; সমধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন তেজস্বী ব্রাহ্মণেরাও ঐ সকল কাম্য কর্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি জানিতাম, তাদৃশ কোনও মহাপুরুষের একমাত্র পুত্রের কঠিন পীড়ায়, তাহার আরোগ্য বিধানার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি তদনুষ্ঠানে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "দেবতাকে ডাক্তার বৈদ্যের কার্য্য করিবার নিমিত্ত আবাহন করিতে পারি না'।" আচার-প্রবন্ধ ১৩০—১৩১ পৃষ্ঠা।

ডাক্তার রায় ইহাও মনে রাখিবেন, হিন্দুসমাজে রোগের চিকিৎসা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী একটী জাতি আছে এবং তাহাদের সংখ্যাও বড় কম নহে।

ডাক্তার রায়ের বোধ হয় এইরূপ ধারণা যে, ভূদেব প্রভৃতি যে সকল সমাজ হিতৈষী মহাত্মগণ সামাজিক প্রাচীন আচারব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তাঁহারা নূতনকে একেবারে তাড়াইয়া দিতে চান, ইহা ঠিক নয়। মনু যে বলিয়াছেন;—

"শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি"

হিন্দুসমাজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, একথা বলিতে পারি না। ধর্ম্মের

অবিরোধিভাবে মোসলমান আমলে আরবী পারসীর অধ্যয়ন চলিত— এখনও ইংরেজী পড়াশুনা চলিতেছে।

"হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই শ্রেষ্ঠ, হিন্দু ভিন্ন জাতিসকল ম্লেচ্ছ ও বর্ব্বর, তাহাদের নিকট আমাদের কিছুই শিখিবার নাই," এই সকল কথা অতি প্রাচীনকালে তো অক্ষরে অক্ষরে সত্যই ছিল, এখনও সমাজশৃঙ্খলা এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে খুবই যে বলিতে পারা যায়, তাহা ডাক্তার রায়ের জাতিভেদের প্রশংসাবাক্য হইতেই সমর্থিত হয়। তবে অন্যান্য বিষয়ে ঈদৃশ ভাব পোষণের কথা, বোধ হয়, বিজ্ঞ হিন্দু বলেন না—শাস্ত্রও তৎপ্রতিকূল। বরং বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরই মনে প্রায়শঃ আমাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব বদ্ধমূল। ডাক্তার রায়ই বলিতেছেন ;—

"These scholars seem to smart under sense of injury if they have to confess that Europe owes an intellectual debt to India, hence many a futile attempt to explain away positive historical facts." History of the Hindu Chemistry Introduction pp. Xlii-Xliii. ইহারই ফুটনোটে আছে, In the mind of the average European this belief has taken too firm a hold to be easily eradicated.

আমরা নূতন তথ্য গ্রহণ করি না এবং ইউরোপীয়েরা "কোথায় কোন্ জাতির কি ভাল আছে, যেই সেই বিষয় শ্রুতিগোচর হইল, অমনি উহার আয়ত্তীকরণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন।" ডাক্তার রায়ের একথাও অত্যুক্তি দোষযুক্ত। আমরা হোমিওপ্যাথি কত আগ্রহে গ্রহণ করিয়াছি—যদিও রাজা ইহার পৃষ্ঠপোষক নহেন। অথচ আমাদের আয়ুর্ব্বেদের নাড়ীবিজ্ঞান ইউরোপীয়েরা শিখিয়াছেন কি? অধ্যাত্ম বিদ্যার কথা নাই বলিলাম ; তবে অর্থাগমের কোনও উপায় কিংবা

যুদ্ধে লোকসংহারের কোনও কৌশল সম্বন্ধে ডাক্তার রায়ের উক্তি খুবই খাটে।

এস্থলে একটী বিষয় কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও বলিতে হইল। ডাক্তার রায় প্রভৃতি সমাজসংস্কারে-বদ্ধপরিকর মহোদয়েরা যে সংস্কারের নামে সমাজের সংহার-সাধন করিতে চান, তাহা তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রতিষেধিতব্য বিষয়াবলীর নিম্নপ্রদত্ত তালিকা দেখিলেই উপলব্ধ হইবে। (১) বেদ অভ্রান্ত বলিয়া কীর্ত্তন; (২) ঋষিবাক্যে বিশ্বাস; (৩) বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষা (উপনয়ন, মন্ত্রগ্রহণ ইত্যাদি); (৪) শ্রাদ্ধতর্পণাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান; (৫) অশৌচগ্রহণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি শাস্ত্রাচার; (৬) মন্ত্রের শক্তি ও সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ; (৭) গুরু-পুরোহিত স্বীকার; (৮) একাদশী, জন্মাষ্টমী, সাবিত্রী প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান; (৯) মূর্ত্তিপূজা; (১০) তীর্থদর্শন; (১১) স্থান-মাহাত্ম্য স্বীকার; (১২) যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে সাধনা; (১৩) মালা-তিলক-শিখাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের বহিশ্চিহ্নধারণ; (১৪) বর্ণভেদবিচার; (১৫) বিবাহাদিতে সম্বন্ধ বিচার; (১৬) ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার; (১৭) বালিকাদের রজোদর্শনের পূর্ব্বে বিবাহ; (১৮) বিধবার অবশ্য কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য*; (১৯) নারীগণের পুরুষাধীনতা; (২০) যাত্রাদি সাধারণ কার্য্যে কালাকাল বিচার; ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহা কিছু হিন্দুর বিশেষত্ব তাহাই উঠাইয়া দিতে হইবে। এই হিন্দুত্বশূন্য হিন্দু সূত্রশূন্য বস্ত্রের ন্যায় নাম-শেষমাত্র নহে কি? সংস্কারক মহাত্মারা কৃত্তিবাস-কথিত মহীরাবণের ন্যায় নানারূপে সমাজরূপ রামচন্দ্রের নিকট

---

* যাঁহারা ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ পড়িয়া বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত (১২৯৩ সালে প্রকাশিত) "বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ" নামক পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিবেন।

আসিয়া ইহাকে রসাতলে নিতে চাহিতেছেন—কেহ রাজনীতিক-রূপে, কেহ কবিরূপে, কেহ ধর্ম্মপ্রচারকরূপে, কেহ বৈজ্ঞানিকরূপে, কেহবা চিকিৎসকরূপে * কেহবা নিম্নজাতির বান্ধবরূপে, আরও যে কতরূপে, কে ইয়ত্তা করিবে? মহামায়া আমাদের এই সনাতন সমাজকে এই সকল মায়াবীর হাত হইতে রক্ষা করুন।

অনেককে দেখিয়াছি উদ্দাম যৌবনে নূতন ভাবের মদিরায় মত্ত হইয়া সমাজ সংস্কারকরূপে শাস্ত্র ও মহাত্মগণের নিন্দাবাদ করিয়াছেন - পরে ভগবৎ কৃপায় সাধুসঙ্গে মোহবিমুক্ত হইয়া শাস্ত্রে বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া পুনশ্চ অনুতপ্ত চিত্তে সমাজের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কারকগণ যেন এই বিষয়টী স্মরণ রাখেন।

ডাক্তার রায় তদীয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বাঙ্গালায় কৃত্রিম সমাজ বিভাগ, বর-পণ, চাকরির জন্য উৎকট উদ্যম, ব্যবসায় বিমুখতা প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। যে সকল প্রথা কৃত্রিম অর্থাৎ শাস্ত্রদ্বারা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট নহে এবং যাহা এক্ষণে ক্রমশঃ অপ্রচলিত প্রায় হইয়া যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক। বর-পণ প্রভৃতি কতকগুলি রীতি বড়ই নূতন আমদানী; অর্থকরী ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রবল আবেগ, এই শিক্ষায় ব্যয়বাহুল্য, ধর্ম্ম ভাবের সঙ্কোচ, অর্থকে পরমার্থ জ্ঞান

* ডাক্তার ইউ, এন্, মুখার্জ্জি হিন্দুজাতির বিনাশ আশঙ্কা করিয়া বেঙ্গলিতে এক বিরাট্ প্রবন্ধ লিখিয়া বিধবা-বিবাহাদি অগদ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "সাহিত্যে" (ফাল্গুন ১৩১৫) মল্লিখিত "পূর্ব্ববঙ্গে মোসলমানের সংখ্যাধিক্য" প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ এতদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় অমৃতবাজার পত্রিকায় ডাঃ মুখার্জ্জির প্রবন্ধের যথোচিত উত্তর দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও বঙ্গদর্শন (আশ্বিন ১৩১৬) পত্রিকায় এই প্রবন্ধের সমাক্ষরে প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ইত্যাদি কারণে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে; শাস্ত্র ইহার অনুকূল নহে। ইহা উঠিয়া যাউক, এই আকাঙ্ক্ষা সমাজহিতৈষী মাত্রেই করেন--কিন্তু কারণগুলি বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত ইহা যে উঠিবে, সে সম্ভাবনা কম।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ডাক্তার রায় একজন স্বদেশবৎসল মহাত্ম ব্যক্তি; দেশের হিতাকাঙ্ক্ষাই তদীয় লেখনীকে পরিচালিত করিয়াছে। তবে তিনিই বলিয়াছেন "প্রবন্ধের মধ্যে হয়ত: আবেগের বশে দুই একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি।" কিন্তু তাঁহার এই আবেগ তাঁহার ন্যায় ধীর ব্যক্তির পক্ষে অশোভন। অপিচ তাঁহার গৌরবস্তম্ভ হিন্দু রসায়নের ইতিবৃত্তেও এইরূপ মধ্যে মধ্যে আর্য্যশাস্ত্রের ও হিন্দুগৌরব শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ব্যক্তির প্রতি প্রায়শঃ অনাবশ্যকভাবে বিদ্রূপ ও আক্রমণ আছে।* সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিরূপেও বক্তৃতার মধ্যে বৃথা রঘুনাথ রঘুনন্দনকে টানিয়া আনিয়া তিনি অবজ্ঞাত করিয়াছেন। নব্যবঙ্গ তাঁহাকে নানা কারণে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে; তাই তাঁহার লেখনী-মুখে অবান্তরভাবে শাস্ত্র ও গৌরবভাজন ব্যক্তির অমর্য্যাদার ভাব দেখিলে নব্য শিক্ষিতেরাও সেই ভাব, তদীয় উক্তি-গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া অবিচারিত ভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারের পথে প্রধাবিত হইবে; বিশেষতঃ তাঁহার এই প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, ইংরাজীতেও অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে; অধিকন্তু, এই প্রবন্ধ

---

* E. g. Foot note, Pxlix Introduction Vol. I. "It should be commended to those who are lost in admiration over the "keen intellect' of Sankara who does not find a better weapon to fight with his opponents than an appeal to the Vedas and other Scriptures." See also foot note to p 196. (মনুর প্রতি অযথা আক্রমণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে)।

স্বতন্ত্রভাবে বহুসংখ্যক মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। এই সক কারণেই ইহার ঈদৃশ সমালোচনা আবশ্যক মনে করিলাম। ডাক্তা রায়ের ন্যায় গৌরবান্বিত ব্যক্তি যদি আবেগ বশে শক্ত কথা বলিতে পারেন, তবে আমাদের প্রবন্ধে তাদৃশ কথা দুই একটা থাকিলে ক্ষমা যোগ্য হইবে বলিয়াই আশা করি।

সমাজহিতকর গ্রন্থমালা— ১

আলোচনা-চতুষ্টয়।

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

৺কাশীধাম ব্রাহ্মণসভা হইতে
শ্রীগোপীচন্দ্র শর্ম্মা সাংখ্যতীর্থ কর্ত্তৃক,
প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৮৪৬।

কাশীধাম,

ভারতধর্ম্ম প্রেস্ হইতে

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বাকচী দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—

৺কাশীধাম ব্রাহ্মণসভা সোনারপুরা,

চৌরাস্তা বারাণসী।

নিগমাগম পুস্তকাগার জগৎগঞ্জ,

বারাণসী।

ভূমিকা

—:০:—

[প্রকাশয়িতা ৺কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভার পক্ষে সহকারি-সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য কবিসম্রাট্ মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত।]

শ্রীমান্ মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী ভট্টাচার্য্য এম্ এ তাঁহার লিখিত চারিটি প্রবন্ধ "আলোচনা-চতুষ্টয়" নামে সঙ্কলনপূর্ব্বক ৺কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভার হস্তে প্রকাশভার অর্পণ করেন। ব্রাহ্মণ সভা একটি সাধারণ অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যের মতে স্থির করেন যে ইহা সভা হইতে প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই "আলোচনা-চতুষ্টয়" "সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা"র প্রথম সংখ্যা। তাই ইহার একটি "ভূমিকা" ৺কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভার পক্ষ হইতে লিখিত হওয়া আবশ্যক; বিশেষতঃ এই পুস্তকখানিতে কতিপয় গ্রন্থ সমালোচিত হইয়াছে—ইহাতে এমন কি বিষয় আছে যে জন্য "ব্রাহ্মণ সভা" ইহার প্রকাশক হইতে পারেন, তৎপ্রদর্শনার্থেও ভূমিকার প্রয়োজন। উহা লেখার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সভার অনুমত কার্য্য আমার পক্ষে অপ্রত্যাখ্যেয়—তাই এই 'ভূমিকা' লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।

পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মপরিগ্রহ বশতঃ স্বধর্ম্ম ও সমাজের পরম ভক্ত শ্রীমান্ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও কথা সহ্য করিতে পারেন না; প্রায়শঃ যথাশক্তি প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। উদাহরণচ্ছলে তৎপ্রণীত "বৈজ্ঞানিকের

ভ্রান্তিনিরাস" ও "হিন্দু বিবাহসংস্কার" এই পুস্তিকাদ্বয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে ; ঐ দুইখানিও গৌহাটি সনাতন ধর্ম্মসভা কর্তৃক প্রকাশিত "সমাজসেবক পুস্তকাবলী"র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই চারিটি প্রবন্ধেও তিনি গ্রন্থ সমালোচনা ব্যপদেশে হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধভাবের ও কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সুশিক্ষিত যুবকযুবতীর বিবাহের ফল মন্দ ; ইহাই দেখাইতে যাইয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ "চোখেরবালি" ও "ঘরে বাইরে" লিখিয়াছেন ; একথা আমি প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছিলাম। পরন্তু শ্রীমান্ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী মনে করেন, আধুনিক কতিপয় পাশ্চাত্যলেখকের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঐ দুই উপন্যাসে পরকীয়া নারীর সহিত অপর পুরুষের আবিল প্রণয় প্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করিয়া সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছেন। তাই শ্রীমান্ স্বল্পাক্ষরে অথচ তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ করিয়া সমাজের হিতসাধন করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'সীতা' নাটকে পৌরাণিক চিত্রের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই—বরং শ্রীরামচন্দ্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতির চরিত্র মলিন ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। ভারতের নরনারীর পক্ষে ইহা একান্ত অসহনীয়। শ্রীমান্ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী প্রতিবাদ-পূর্ব্বক দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনার অসারতা প্রদর্শন করিয়া সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

৺পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত" সমালোচনায়ও শ্রীমান্ দেখাইয়াছেন, কিরূপে সংস্কৃত কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র সদাচার মাতাপিতার সন্তান শিবনাথ শাস্ত্রী পথিভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে ভিড়িয়াছিলেন—পূতসলিলা স্রোতস্বতী পরিত্যাগপূর্ব্বক এক মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি প্রসার ইত্যাদিরও ইতিহাস বর্ণনপূর্ব্বক ইহা যে কোনও মহাজন

প্রবর্ত্তিত পন্থা নহে তাহা বিশদ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে অনেকেরই চক্ষুরুন্মীলন হইবে; তাহাতে সমাজের উপকার সাধিত হইবার কথা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু "পৃথ্বীরাজ" ও শিবাজী" এই দুইখানি মহাকাব্য লিখিয়া প্রশংসা-লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ কাব্যদ্বয়ে—বিশেষতঃ "পৃথ্বীরাজে"—হিন্দুর পতনের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ বর্ণভেদ ব্যবস্থার—তথা আরো দুই একটি বিষয়ের—প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া তাঁহার মনোহর কাব্যখানি হিন্দুর নিকট বিষ মিশ্রিত অমৃতের ন্যায় অনুপাদেয় করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীমান্ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী কবির প্রতি যথেষ্ট সম্মাননা প্রদর্শন করিয়াও ঐরূপ দোষের উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক সমাজবিরুদ্ধ কথার প্রতিবাদ করিয়া হিন্দু সাধারণের সভাজনভাজন হইয়াছেন।

এ সকল "আলোচনা"য় একটু বিশেষত্বও রহিয়াছে। ইংরেজীতে 'এম্ এ' এবং সংস্কৃতে 'বিদ্যাবিনোদ' শ্রীমান্ তত্ত্বসরস্বতীর ন্যায় সব্যসাচীর প্রবন্ধমালা একদিকে যেমন অধুনাতন পাশ্চাত্য মোহাবিষ্টের চৈতন্য সম্পাদন করিবে—অপর দিকে তেমনই ইংরাজীসাহিত্যানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণেরও নিকটে নূতন তথ্য প্রকটন হেতু উপাদেয় বলিয়া সমাদৃত হইবে।

৺কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণ সভা ঈদৃশ গ্রন্থের প্রকাশপূর্ব্বক "সমাজ হিতকর-গ্রন্থমালা"র প্রবর্ত্তন করিয়া অভিনন্দনীয় হইলেন। ইতি

শ্রীযাদবেশ্বর শর্ম্মণঃ।

মুখবন্ধ

—:•:—

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" ও "ঘরে বাইরে" এই দুইটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রথমতঃ "উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (আষাঢ় ১৩২৪), তাহা "হিতবাদী" পত্রে (৪ঠা শ্রাবণ ১৩২৪) উদ্ধৃত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" নাটকের সমালোচনা প্রথমতঃ গৌহাটি শাখা সাহিত্যপরিষদে তৎপর কলিকাতা সাহিত্য সভায় পঠিত হয়; তাহা "সাহিত্য-সংহিতা" পত্রিকায় (১৩২৬ শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন) প্রকাশিত হয় এবং তৎপরে এডুকেশন গেজেটের কয়েক সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত'' সমালোচনা প্রথমতঃ "এডুকেশন গেজেটে" ধারাবাহিক ভাবে (১৩২৬ সালে) প্রকাশিত হয়—তাহা হইতে উদ্ধৃত হইয়া "ব্রাহ্মণসমাজ'' পত্রে (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৬ ও বৈশাখ ১৩২৭ সালে) পুনঃ প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "পৃথ্বীরাজ" ও "শিবাজী"—এই দুই মহাকাব্যের আলোচনা প্রথমতঃ গৌহাটি শাখা সাহিত্য পরিষদে, তৎপর কলিকাতা সাহিত্য সভায় পঠিত হয় এবং "সাহিত্য" পত্রে (১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়।

এই আলোচনাগুলি প্রত্যেকটি এভাবে একাধিক সভায় অথবা একাধিক পত্রিকায় সমাদৃত হইয়াছে দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সনাতন হিন্দুসমাজের যৎকিঞ্চিৎ হিত হইতে পারে এই আশয়ে ঈষৎ সংশোধন পুরঃসর পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত করা হইল। সমাজ-হিতৈষী সুধীগণ ইহা পাঠ করিয়া যৎসামান্য পরিতোষ লাভ করিলেও কৃতার্থ বোধ করিব।

৺কাশীধাম ব্রাহ্মণসভার কর্তৃপক্ষীয়গণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাঁহাদের প্রকাশয়িতব্য "সমাজসেবক গ্রন্থমালা"র অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই লেখককে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন; আমি তাঁহাদের—বিশেষতঃ ভূমিকালেখক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য কবিসম্রাট্ মহোদয়ের—নিকট সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করিতেছি। ইতি—

৪৫ নং হাউস্কটরা, ৺কাশীধাম—
অক্ষয়তৃতীয়া, শকাব্দাঃ ১৮৪৬।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

রবীন্দ্রনাথের দুইটি উপন্যাস।

(চোখের বালি ও ঘরে বাইরে)

ইতঃপূর্ব্বে দুই এক স্থলে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছি—এবং এই বর্ত্তমান প্রবন্ধেও করিব ; তথাপি প্রথমেই বলিয়া রাখি যে তিনি জগন্ময় যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীরই তিনি ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ—লিখিবার ক্ষমতা অতুলনীয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহার এই প্রতিভা ও ক্ষমতা হিন্দুসমাজের কোনও উপকারে লাগে নাই—বরং ঘোরতর অনিষ্টই তদ্দ্বারা সাধিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই জন্য স্বতএব সম্পূর্ণ অপরাধী একথা বলিতে পারি না ; তিনি ব্রাহ্ম—স্বকৃতভঙ্গ নহেন—আজন্ম। ব্রাহ্মেরা সনাতন সমাজের বিদ্রোহী ; হিন্দুর উপাসনারীতি, সামাজিক প্রথা ইত্যাদি সমস্তই তাঁহাদের প্রতিবাদের বিষয়। মূর্ত্তিপূজা, জাতিভেদ, গুরুবাদ, ব্রাহ্ম-দৈব-আর্যবিবাহ, খাদ্যা-খাদ্যবিচার, মৃতের পিণ্ডদান, প্রভৃতি যাহা কিছু হিন্দুর বিশেষত্ব—এমন কি সংস্কৃতভাষায় ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন—সমস্তই তুলিয়া দিতে হইবে—এই তাঁহাদের প্রোগ্রাম। সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে রবীন্দ্রনাথের পিতা স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকটা প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী ছিলেন—রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রথম ঐদিকে কিছুটা পক্ষপাত আমরা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু এখন তাঁহার সেই সকল সংস্কার ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে বলিয়াই বোধ হয়। বিশেষতঃ নারীজাতিসম্বন্ধে তিনি নব্য ইউরোপীয় ভাব আমদানি করিয়া সমাজকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আজকাল স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিতেছেন; তাহা ভাল কি মন্দ বলিব না—এস্থলে তাহা আলোচনার বিষয়ও নহে। বাঙ্গালাভাষায় লিখিত উপন্যাসাদি তাঁহারাই পাঠ করেন। বঙ্কিমবাবু 'বিষবৃক্ষে' যে গরল আনিয়াছিলেন, তাহাতে নিজের কোন স্নেহভাজনেরও নাকি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল! বোধ হয় ইহা ভাবিয়াই—'দেবী-চৌধুরাণী' তে বঙ্কিমবাবু সপত্নীর ঘরেও নিষ্কাম ভাবে কিরূপে থাকা যায় সেই চিত্র দেখাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। অতএব সমাজ-হিতৈষীকে সাবধান হইয়া গল্পে নারীচরিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পে, বিশেষতঃ 'চোখের বালি' ও 'ঘরে-বাইরে' তে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল রমণীচিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। তাঁহার চিত্রের নমুনা দেখুন। 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র এম্, এ, পাস্, আবার মেডিকেল কলেজের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ভদ্রঘরের ছেলে, বিষয় সম্পত্তিতেও সম্ভ্রান্ত। বাড়ীতে রূপসী নবযৌবনা পতিপ্রাণা পত্নীও রহিয়াছে। বিনোদিনীও ভদ্রপরিবারের কন্যা—বাল্যে মিশনারী মেম রাখিয়া পড়াশুনা ও কারুকার্য্যে সুশিক্ষিতা। বিবাহও অধিক বয়সেই হইয়াছিল—তবে দরিদ্রের মেয়ে বলিয়া রোগগ্রস্ত স্বামীর হস্তে পড়িয়া অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছে; দুর্ভাগ্যের প্রেরণায় মহেন্দ্রের ঘরে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে। এমন অবস্থায় বিনোদিনীরই বা মন বিচলিত হইবে কেন?—তাহা হইলে শিক্ষাদীক্ষায় ফল কি? তথাপি আমরা হতভাগিনী বিনোদিনীর ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য না হয় উপেক্ষাই করিলাম। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত, বিবাহিত মহেন্দ্র এভাবে কেন মজিবে? আর ইন্দ্রিয়ের বেগই বা কেমন! ঘরে যে বৃদ্ধা মাতা আছেন সেদিকেও হুঁশ নাই—উন্মত্তের ন্যায় বিনোদিনীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত। ধিক্ শিক্ষার—ধিক মনুষ্যত্বের! ততোধিক গ্রন্থ রচনার।

আবার 'ঘরে-বাইরে'তে কি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে দেখা যাউক। বিমলা বড় ঘরের বধূ। স্বামী কলেজে এম্, এ, পর্য্যন্ত পড়া, ধনী ও জমিদার। বিমলা রূপসীও নহে তথাপি এতাদৃশ পতিসৌভাগ্য ঘটিয়াছে। অত্যনুরক্ত পতি বিমলাকে (বিনোদিনীর মতই) যেম রাখিয়া লেখাপড়ায় সুশিক্ষিতা করিয়াছেন। অথচ, সন্দীপচন্দ্রের দু একটা বোল-চাল শুনিয়াই এই বিমলা উহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিল। হরি হরি, ঘরের বৌকে বাইরে টানিয়া আনিতে না আনিতেই এই পর্য্যন্ত! পরিশেষে সেই স্বামী নিখিলেশ নির্ব্বিকার-চিত্তে শুনিল, সন্দীপ সচ্ছন্দে নিজের পত্নীকে 'বন্দে প্রিয়াং বন্দে মোহিনীং' বলিতে লাগিল! আর পত্নী নিজের অলঙ্কারের বাক্স সন্দীপের হাতে তুলিয়া দিল!!

লেখার ভিতরে আমরা লেখককে দেখিব; লেখকের চেহারা দেখিয়া বা তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সু-কু ধারণা না করিয়া লেখা হইতেই তদীয় জীবনেরও আভাস পাইয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথ এখন বৃদ্ধ—এই বয়সে পরকীয়ার প্রতি এত আবেগবিশিষ্ট চিত্র এইরূপ প্রায় নগ্নভাবে আঁকিয়া দেখানটা কেমন দেখায়? তিনি তো তাঁহার কোনও কোনও স্তাবকের নিকট "ঋষি" বলিয়া আখ্যা পাইয়াছেন, ইহাই কি 'ঋষি' উচিত কর্ম্ম! বঙ্কিমবাবু তো ঋষি-টিষি কিছুই ছিলেন না—পঞ্চাশোর্দ্ধে তিনি এতাদৃশ অশিষ্ট প্রণয়ের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বরাগপ্রদর্শক আদি রসের চিত্রও অঙ্কন করা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার যৌবনে অঙ্কিত 'কুন্দ' বা 'শৈবলিনী'তেও এতদূর উদ্দামতা ছিল না—তারপর উহাদের কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! আর বিমলা ও বিনোদিনী কি সহজে পার পাইল—যেন কিছুই হয় নাই!! ইহাই কি ঋষিত্ব? পুরা-কালে কেহ একটা নূতন মতের [illegible]

কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মন্ত্র তো 'নূতন' নহে—এসকল হাল আমলের ইবসেন্ * প্রভৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সেই দেশ-প্রীতি কোথায় গেল? তৎপরিবর্ত্তে আজকালকার বিদেশ ভক্তি কি অরুন্তুদ!

তবে ভরসার একটা কথাও আছে। 'ঘরে-বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথ কোথায়, এ বিষয় নিয়া বিতর্ক আছে—সন্দীপে ও নিখিলেশে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা যায় বটে—কিন্তু আমার ধারণা তিনি 'বিমলা'তে আছেন। নিখিলেশ বর্ত্তমান ধরণে সুশিক্ষিত কিন্তু সনাতন রীতিনীতিতে আস্থাহীন সমাজ—'বঙ্গবাসী' যাহাদিগকে 'বাবু' আখ্যা দিয়াছেন, তাহাদের সমাজ। সন্দীপ সেই ইব্‌সেন্' শ', নিট্‌শে এণ্ড্ কোং প্রচারিত ইউরোপীয় বর্ত্তমান চটকদার সভ্যতা। সন্দীপ ও নিখিলেশে বন্ধুতা; —আমাদের বাবু সমাজ (যাহাতে ব্রাহ্ম আছেন, বিলাতফেরত আছেন এবং হিন্দু সমাজের তথাকথিত বড় লোকেরাও আছেন) এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যেও বেশ সৌহার্দ্দ। রবীন্দ্রনাথ এই সমাজেরই মধ্যে লালিত পালিত, বিমলা যেমন নিখিলেশের গৃহে সংবর্দ্ধিতা। বিমলা পূর্ব্বেও সন্দীপের নাম শুনিয়াছিল কিন্তু যেই তাহার সাক্ষাতে সন্দীপের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা হইল, সেই একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিল। রবীন্দ্রনাথও আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ; এখন রবীন্দ্ররূপী বিমলা কিছুদিন 'বাইরে' বেড়াইয়া আসুন, তারপর ভগবদিচ্ছা থাকিলে পুনরায় ঘরে আসিয়া তাঁহার প্রতি চিরক্ষমাশীল নিখিলেশরূপ বাবু সমাজের অঙ্কে আশ্রয় লইবেন।

রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ হিন্দু-আদর্শের নিকটে কিরূপ অধোগত বোধ হইতেছেন তাহার একটু নমুনা এই সমালোচ্য দুইখানি পুস্তক হইতেই দেখা যাইবে। 'চোখের-বালি'র পরে 'ঘরে-বাইরে' লিখিত

---

* একটা কথা আছে "জাতি মারুয়ে তিন 'সেন'—কেশব সেন ইষ্টেসেন ও উইলসেন।" এ যে চতুর্থ 'সেন' এই—ইব্‌'সেন্'।

হইয়াছে। 'চোখের-বালি'তে বরং অন্নপূর্ণার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী বিধবা পাই—আশালতার ন্যায় পতি-প্রাণা পত্নী পাই। সুশিক্ষিতাও অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিধবা, বিনোদিনী ব্রহ্মচর্য্য খোয়াইয়াছে বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় অশিক্ষিতা অন্নপূর্ণা ১১ বৎসর বয়সে পতিহীনা হইয়াও বৃদ্ধবয়সেও বলিতেছেন "আমার স্বামী এখন যাঁহার মধ্যে আছেন সেই ভগবানের কথা ভাবি"। হায়, তখনও যে রবীন্দ্রনাথ আপন প্রপিতামহের * সমাজের 'সু' অনেকটা দেখিতেন! তারপর 'ঘরে-বাইরে'তে দুইটি বিধবার ছবি আঁকিয়াছেন, বিমলার জবানবন্দীতে প্রথম পরিচ্ছেদেই তাহা দেখিতে পাইতেছি। "আমার বড় জা যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ঙ্কর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য তাঁর মুখে এত বেশি খরচ হ'ত যে মনের জন্যে সিকি পয়সা বাকী থাকত না।" "আমার মেজ জা অন্য ধরণের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প—তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করিতেন না—বরঞ্চ তাঁর কথাবার্ত্তায় হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন, তাদের রকম সকম একেবারেই ভালো নয়"

রবীন্দ্রনাথ যে বলেন কোনওরূপ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত না হইয়া কেবল 'আর্ট'-এর খাতিরে তিনি 'ঘরে-বাইরে' লিখিয়াছেন, একথাটা বুঝিতে পারিলাম না। উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্য কেবল দুইজনে করিতে পারে—এক স্বয়ং ভগবান্ অপর, তাঁহাকেই দর্শনশাস্ত্রে সৃষ্টিব্যাপারে যাহার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে, উন্মত্ত ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন, এখনও অবতার হন নাই—তবে বাঙ্গালার মাটিতে যেরূপ অবতারের আমদানি দেখা যায় তিনি যে কালে না হইবেন,

* সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে পিতামহ 'প্রিন্স্' সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায়ের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে বিলাতেও গিয়াছিলেন।

কে জানে? এবং তিনি অপরটাও নহেন, নিশ্চয়। তাই কেবল আর্টের ব্যাপার, উদ্দেশ্য ইহাতে কিছুই নাই, একথা বলিলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। সন্দীপ চিত্রে তিনি কোন সুপ্রসিদ্ধ বক্তাকে 'প্যারোডি' করিয়াছেন এবং নিজের কর্ম্মবিমুখতার অনেকটা উহার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার প্রকৃতি যে মনুষ্য-সুলভ দুর্ব্বলতা এখনও এড়াইতে পারে নাই, এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। আবিল প্রণয়কাহিনী কিরূপ 'টেণ্টেলাইজ' করিয়া দেখাইয়াছেন! 'বন্দেমাতরং'এর বিকৃত-বিড়ম্বনা করিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির অবমাননা করিয়া দেশের লোকের মনে আঘাত দিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান্‌পুরুষ; তাঁহার দোষাবলীও ভক্তস্তাবকদের নিকট গুণে পরিণত হইতেছে—তাঁহার নিষ্ঠ্যুতোদ্গীর্ণবান্তাদিও ঐসকল স্তাবক পীযুষময় প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে; ঋষি-প্রচারিত সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের উপর ক্রমাগত মুদ্গরাঘাত করিয়া থাকিলেও, তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে ঋষির পদে অভিষিক্ত করিতেছে।

কিন্তু প্রারম্ভেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান্—তাঁহার লিপি-কুশলতা অসামান্য—বিশ্বময় তাঁহার নাম ডাক হইয়াছে, ইহাতে আমাদের শ্লাঘার কথা। সে জন্য তাঁহার দোষ থাকিবে না এবং থাকিলে তাহা দেখাইতে হইবে না, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। 'বড়'লোকের দোষগুলিও বড় ধরণের হয়— ঐসকলের অনুকরণ করিয়া যাহাতে অপেক্ষাকৃত অক্ষমতাবান্ সাধারণ-শ্রেণীর লোক অধঃপাতে না যায়, প্রত্যেক সমাজহিতৈষীর তাহা দেখা উচিত। তাই নিতান্ত অপ্রীতিকর হইলেও আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এহেন রবীন্দ্রনাথের দোষোদ্ঘাটন কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা'

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যে আধুনিক হিসাবে একজন স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এ বিষয়ে কেহই বোধ হয় সন্দেহ প্রকাশ করিবেন না। তাঁহার "আমার দেশ" ইত্যাদি গান প্রকৃতই স্বদেশানুরাগের উদ্দীপক—আমরা তাঁহার নিকট এ নিমিত্তে কৃতজ্ঞ। তাঁহার "হাসির গান" ইত্যাদি দ্বারা তিনি সমাজকে আনন্দ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—এ জন্যও তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। নাট্যকারভাবেও তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যে এক প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন। তাই ইদানীং তাঁহার জীবন-চরিত দুই খানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি।

দ্বিজেন্দ্র লালের জীবন সম্বন্ধে বা তাঁহার অন্যান্য লেখার বিষয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার লেখনীতে পুরাণের চিত্র কিরূপ ফুটিয়াছে, তদ্বিষয়েই দুইচারি কথা তদীয় নাটক 'সীতার' সমালোচনা উপলক্ষে প্রদর্শন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

"সীতা" সম্বন্ধে তদীয় জীবন-চরিত লেখক ও পরম সুহৃৎ কবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, "সীতা নাট্যকাব্য খানি বস্তুতঃই বঙ্গ-সাহিত্যের একখানা অমূল্য রত্নস্বরূপ"।* পূর্ব্বে একবার 'সীতা' পড়িয়াছিলাম। এই সার্টিফিকেট্‌খানি পড়িয়া পুনশ্চ ইহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি—তাহাতে দ্বিজেন্দ্র লালের এই নাটক খানির সমালোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করিলাম।

---

* দ্বিজেন্দ্রলাল ৭৫০ পৃষ্ঠা।

দ্বিজেন্দ্র লাল এই নাটক খানির একটা ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে দেখা গেল—ইহা পত্রিকাবিশেষে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল—তখনই এই নাট্যকাব্যের প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। তাই এই ভূমিকায় তিনি তাদৃশ সমালোচনার উত্তরে একটা কৈফিয়ৎও দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থন সত্ত্বেও অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে, তিনি যেরূপ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার পক্ষে পৌরাণিক বিষয়ে হাত না দিয়া আধুনিক ঐতিহাসিক অথবা কোনও অভিনব কল্পিত বিষয়ে প্রতিভা প্রয়োগ করাই সমীচীন ছিল। আর্য্য শাস্ত্রে তাঁহার তেমন বিশ্বাস ছিল না—রামায়ণ-মহাভারতের গ্রন্থকার সমাজের শিক্ষার্থে যে আদর্শ চিত্রাবলী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—তৎপ্রতি তাঁহার যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না। অথচ পৌরাণিক বিষয়ে কাব্যনাটক লিখিবার নিমিত্ত যতটা সাধনা আবশ্যক—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, সংস্কৃত কাব্যনাটক ইত্যাদির সম্যক্ অধ্যয়ন—ততটা তাঁহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ পুরাণমূলক কাব্যের ও নাটকের নায়ক নায়িকা ইত্যাদি বর্ণনীয় পাত্রপাত্রীর যথাযথ ভাব-ব্যক্তির নিমিত্ত যতটা সহৃদয় অভিনিবেশের প্রয়োজন তাহারও অভাবই যেন আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাই। ফলতঃ বিদেশে বাস, বিজাতীয় শিক্ষা, সমাজের প্রতি বিদ্বেষ, সতত বিজাতীয় সাহিত্যের চর্চ্চা, মদ্যমাংসভূয়িষ্ঠ আহার, সমানধর্ম্মা ব্যক্তিগণের বেষ্টনী-মধ্যে অবস্থান ইত্যাদি নানা কারণে তাঁহাকে পৌরাণিক বিষয়ে যথোচিত ভারতীপ্রয়োগে উক্তরূপ অযোগ্য করিয়াই তুলিয়া ছিল। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অমায়িক প্রকৃতি, দেলখোলা সরলতা, নির্ভীক তেজস্বিতা, ও সর্ব্বোপরি দেশের জন্য একটা প্রবল 'টান', এই সকলদ্বারা তিনি আমাদের খুবই শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র হইলেও তাঁহার ঐ অনধিকার চর্চ্চার জন্য আমরা তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারি না। এবং

তাঁহার মধ্যে মহত্বের ভাব সমধিক থাকায় এইরূপ ত্রুটি অধিকতর অমার্জ্জনীয় ; কেন না তৎপ্রতি অনুরাগযুক্ত হইয়া অপরে তাঁহার এই দোষেরও সমর্থন বা অনুকরণ করিতে পারে।

আমরা সমালোচনাচ্ছলে তাঁহার ভূমিকায় প্রদত্ত কৈফিয়ৎগুলির বিচারই সর্ব্বপ্রথম করিব। 'রামের চরিত্র-মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন,'— এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্র লাল বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস আমি তাহা করি নাই। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে ভগবান্ রামচন্দ্রের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, রামচন্দ্র শুদ্ধ বংশমর্য্যাদার জন্য সীতার বনবাস দিয়াছিলেন। তাহার উপরে তপোবন দর্শনচ্ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া আসিবার একটা নিষ্ঠুর ছলনাও লক্ষিত হয়। মহাকবি ভবভূতিও এ দুইটীর একটি স্থলেও মহর্ষি বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। আমি বনবাস আখ্যান সম্বন্ধে ভবভূতির পদানুসরণ করিয়াছি। এরূপ করায় আমার বিবেচনায় রামের চরিত্র বাল্মীকির চরিত্র হইতে হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে।"

ইহার প্রথম উত্তর এই যে ভবভূতি সীতার বনবাসে ঠিক্ বাল্মীকির পদানুসরণই করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র লাল ভবভূতির উত্তর চরিত প্রণিধান সহকারে পাঠ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এই দেখুন ভবভূতি লিখিয়াছেন :—

> যৎ সাবিত্রৈর্দীপিতং ভূমিপালৈ
> লোকশ্রেষ্ঠৈঃ সাধু শুদ্ধং চরিত্রম্।
> মৎসম্বন্ধাৎ কশ্মলা কিংবদন্তী—
> স্যাদেতস্মিন্ হন্ত ধিঙ্ মামধন্যম্॥ (উত্তর চরিত প্রথম অঙ্ক)

৺বিদ্যাসাগর মহাশয় টীকায় 'চরিত্রম্' অর্থ করিয়াছেন 'কুলম্' ; তবে 'লোকারাধন' নিমিত্তে যে সীতাবর্জ্জন করিতে হইবে ইহার পৃথক্ উল্লেখ

ভবভূতির উত্তর চরিতে ভূয়োভূয়ঃ আছে ; বাল্মীকি রামায়ণে এই শব্দটীর স্পষ্ট উল্লেখ না দেখিয়া যদি দ্বিজেন্দ্র লালের ভ্রম হইয়া থাকে তবে বলিব তিনি বাল্মীকির লেখা তলাইয়া দেখিতে পারেন নাই, অর্থাৎ বাল্মীকির কি 'স্পিরিট্' তাহা বুঝেন নাই। সীতা নিষ্পাপা রাম তাহা জানেন—ভ্রাতৃবর্গকেও বলিয়াছেন ; তবে কলঙ্ক আসিল কোথা হইতে? প্রজাবর্গ সীতার অপবাদ ঘোষণা করিতেছে, * তাহাদের কথা ফেলিতে পারা যায় না, উহাদের ছন্দানুবর্ত্তন করিতেই হইবে—নচেৎ কলঙ্ক স্পর্শিবে—বংশের সুনামের হানি হইবে, তাই সীতাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। জনমতের প্রতি এই যে রামের মর্য্যাদাভাব ইহাতেই রামকে আদর্শ ভূপতিরূপে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে ; আজিও 'রামরাজত্ব' প্রবচন রূপে সমাদৃত রহিয়াছে।

তারপর তপোবনদর্শনচ্ছলে নির্ব্বাসনার্থ প্রেরণ ভবভূতিও লিখিয়াছেন। উত্তর চরিতের প্রথম অঙ্কের শেষাংশে আছে।

"প্রবিশ্য দুর্ম্মুখঃ। দেবি কুমার-লক্ষ্মণো নিবেদয়তি সজ্জোরথঃ আরোহতু দেবী। সীতা। ইয়ম্ আরোহামি।" তারপর তপোবন, রঘুকুল-দেবতা প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া সীতা রথারোহণার্থ গমন করিলেন।

---

* সেই অপবাদ কি প্রকার তাহার প্রতিও এ স্থলে দৃষ্টিপাত আবশ্যক—

কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতসম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্॥
লঙ্কামপি পুরীং নীতামশোকবনিকাং গতাম্।
রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎস্যতি॥
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ত্ততে॥ উত্তর কাণ্ড,৫৩ সর্গ।

ইহা হইতেও সীতাপরিত্যাগের কারণ বুঝা যায়। এতদবস্থায় সীতাবর্জ্জন ভিন্ন আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্রের উপায়ান্তর ছিল না।

ইহাতে কি বুঝায়? সীতা যে নির্ব্বাসিতা হইয়া চলিলেন স্পষ্ট এ কথা আছে কি? ফলতঃ একথাটা গোপন করাই আছে। বাল্মীকির রামায়ণেও তাই আছে। লক্ষ্মণ এ কথাটা গোপন রাখিয়াছিলেন।

মনে রাখা উচিত যে উত্তর চরিতে, তথা রামায়ণে, ইতঃপূর্ব্বে রামের সঙ্গে কথা ছিল, সীতা গঙ্গাতীরে তপোবনদর্শনে যাইবেন। বাল্মীকির আশ্রমও গঙ্গাতীরে, গঙ্গাতমসার সঙ্গমস্থলে। তাই সেখানে প্রেরণের বন্দোবস্ত হইতেইছিল, তবে নির্ব্বাসনের কথাটা অযোধ্যায় না বলিয়া তপোবনে বলাই রামের ঈপ্সিত ছিল। ইহাতে এমন কি 'নিষ্ঠুর ছলনা' হইল, বুঝিতে পারিলাম না।

অযোধ্যায় নির্ব্বাসন আজ্ঞা সীতার কাছ হইতে গোপন রাখাটা অতীব সঙ্গত কাজই হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সেটা না করায় কৌশল্যা আসিয়া রামকে একপ্রকার 'মাথার কীরা' দিতে লাগিলেন যাহাতে রামের সঙ্কল্প ভঙ্গ হয়; পরিশেষে রামচন্দ্র মাতৃনির্দ্দেশে সীতানির্ব্বাসন ব্যাপার ক্ষান্ত রাখিতে বাধ্য হন। ইহা হইলে রাম রাজত্বে কলঙ্কই আসিত। ফলকথা কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রগুপ্তি রাখাতে রামের কোন পাপ হয় নাই—বরং এতদ্দ্বারা তিনি নানারূপ বিঘ্ন বাধার হাত এড়াইতে পারিয়াছিলেন।

রামের চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের পুস্তকে অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছে। বাল্মীকি নানাস্থানে দেখাইয়াছেন সীতার প্রতি রামের কি প্রগাঢ় প্রেম। ভবভূতি উত্তরচরিতে রামকে একটু দুর্ব্বল-চিত্ত করিয়া থাকিলেও সেই প্রেম যে কত গভীর তাহা দেখাইয়াছেন। বাল্মীকি সীতাহরণের পরে রামকে সীতার জন্য সুবহু বিলাপ করাইয়া তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাই উত্তরকাণ্ডে সীতাবর্জ্জনের পর আর তাহা নূতন করিয়া দেখান নাই—তথাপি এমন যে কর্ত্তব্যপরায়ণ ভূপতি তিনিও চারিদিন শোকে প্রজার কার্য্য করিতে পারেন নাই, এইমাত্র

জানাইয়াই রামচন্দ্রের হৃদয় বেদনার পরিমাণ বুঝাইয়াছেন। স্বর্ণময়ী সীতামূর্ত্তি নির্ম্মাণদ্বারাও রামচন্দ্রের অত্যদ্ভুত পত্নীপ্রেম সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ প্রেমাস্পদকে আপনা হইতে বিসর্জ্জন করা যে রামের কতটা স্বার্থত্যাগ তাহা দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিতে পারেন নাই, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। গুরু বশিষ্ঠের সনির্ব্বন্ধ আদেশে সীতাকে রাম বনে দিয়াছিলেন—বরং সীতার হইয়া বশিষ্ঠের সঙ্গে তর্ক পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন এইটুকু দেখাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রামের মাহাত্ম্য যথেষ্ট খর্ব্ব করিয়াছেন। "আজ্ঞা গুরূণা হ্যবিচারণীয়া" এইরূপ গুরুভক্তির বশীভূত হইয়াও যে রাম চলিয়াছেন তাহাও বলিতে পারি না। কৌশল্যার অনুরোধে সীতার নির্ব্বাসন আজ্ঞা তিনি রদ করিয়া গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার গুরু যখন দারপরিগ্রহ করিতে বলিলেন তখন কঠোর ভাবে তিনি গুরুর আজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়া আপন জেদ বজায় রাখিয়াছেন। গুরুভক্ত রামের বিড়ম্বনা এইখানে শেষ হয় নাই। গুরু যখন সীতাকে গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন, তখন প্রজারঞ্জন রাম প্রজাদের অস্তিত্বই ভুলিয়া গেলেন—প্রজাদের মন হইতে সীতাবিষয়ক অপবাদ দূর করিবার জন্য বশিষ্ঠ বা বাল্মীকিকে একটুকুও অনুরোধ করার প্রয়োজনীয়তা রামের অন্তঃকরণে উদিত হইল না। তখনই বাল্মীকির আশ্রমের দিকে ধাবমান হইলেন, অশ্বমেধের কথা আর শুনাও গেল না। তারপর সেখানে গিয়া লবকুশেরসন্ধান করিলেন—কুশ আসিয়া যথারীতি প্রণাম করিল; লব কিছুতেই ঘাড় নুয়াইবে না, গুরু বাল্মীকির কথাতেও না—প্রত্যুত এক লেক্‌চার্ ঝাড়িয়া বলিল—

'পিতা রামচন্দ্র পৃথিবীর পতি তুমি নরোত্তম
তুমি বীর তুমি? ধর্ম্মপরায়ণ? নিষ্ঠুর নির্ম্মম।
ধিক্ কাপুরুষ। ধিক্ তোমার পাপের নাই সীমা। ইত্যাদি

২০ পৃষ্ঠা।

এমন সুমিষ্ট উক্তির উত্তরে রাম কি কহিলেন, শুনুন—

'পুত্রযুগ্ম মধ্যে তুই শ্রেষ্ঠতর লব' ১২০ পৃঃ।

অহো, বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে? রাম! রাম!! ইহাই দ্বিজেন্দ্রলাল অঙ্কিত রামচিত্র। যে মহাপুরুষের মূর্ত্তিদর্শন ও শব্দশ্রবণ মাত্রে যুধ্যমান লব—ভবভূতির লব—উৎকট বীররসাভিনয় হইতে শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া নম্র হইয়া গেল—সেই লব, দ্বিজেন্দ্রলালের লব—রামচন্দ্রকে অপমান করিতে আর কসুর করিল না। দু এক ঘা যে বসায় নাই সে বোধ হয় পিতা দশরথের পুণ্যফলে! হরি হরি!! রামের আকৃতিটাও কি দ্বিজেন্দ্রলাল 'ইম্প্রোভিং' করিতে পারিলেন না?

শূদ্রতপস্বীর প্রাণদণ্ড একটি গর্হিত কার্য্য বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের ধারণা—গর্হিতত্ব সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় সীতার করুণ অন্ত্যজীবন,—শূদ্রবধ কার্য্যটার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কিছুই নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল অনায়াসে ইহা ছাড়িয়া দিয়া রামচন্দ্রের হীনতার মাত্রাটা একটু কমাইতে পারিতেন। তাতো করেনই নাই, অধিকন্তু বিষয়টাকে অধিকতর বীভৎস করিবার জন্য রামায়ণবিরোধী দু একটা ব্যাপার ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শূদ্রকে 'শূদ্রকরাজ' করিয়া তাহাকে সৌম্যাকৃতি পককেশ শাস্ত্রজ্ঞ সস্ত্রীক বানপ্রস্থাবলম্বী সাজাইয়াছেন। রামায়ণে আছে, শূদ্রকে কৃচ্ছ্র-তপোনিরত দেখিয়া তাহার পরিচয় প্রাপ্তিমাত্র বধ করিয়া রামচন্দ্র ব্রাহ্মণশিশুকে জীবিত ও দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ সৌম্যাকৃতি শুভ্রকেশ শূদ্রকরাজের প্রাণনাশের পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে রামের এক বিষম তর্ক বাঁধাইয়া দিয়াছেন—আবার শূদ্রকরাজের স্ত্রীদ্বারা পতির প্রাণরক্ষণে বহু 'কাকুতি মিনতি' করাইয়াছেন ইহাতে রামচরিত্রের কলঙ্ককালিমা অতি প্রগাঢ় করিয়া দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তো এই করিলেন। কিন্তু সংস্কৃতভাষার দুই মহাকবি—

কালিদাস ও ভবভূতি—ঐ বিষয়টাই কি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন! রঘুবংশের ১৫শ সর্গে ও উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে কলিদাস ও ভবভূতি দেখাইয়াছেন যে অবিধিপূর্ব্বক কৃচ্ছ্র তপস্যাদ্বারা যাহা না হইত রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হওয়ায় শূদ্রের সেই সদ্গতিলাভ হইল।

রামকে বাল্মীকি গম্ভীর-সত্ত্ব সর্ব্বগুণাধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চর আসিয়া যখন সীতাসম্বন্ধীয় অপবাদকাহিনী বর্ণনা করিল রাম স্থির হইয়া বর্ণনা শুনিলেন—অতঃপর দুঃখিত চিত্তে সভাস্থ বয়স্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথমেতদ্ ব্রুবন্তু মাম্।" উঁহারাও যখন'এবমেতন্নসংশয়ঃ' বলিলেন, তখন সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্র লাল রামকে দিয়া বলাইতেছেন—

'কি কহিলি দুর্ম্মুখ, আস্পর্দ্ধা তোর অতি
জানিস্ না কে সে আর কে তুই দুর্ম্মতি
পথের কুকুর হেয়'। ২২ পৃষ্ঠা।

এইকি রামের ভাষা? এই যে একবার তা'নহে। এই বলিয়া অনুতপ্ত হইয়াও পুনশ্চ কহিলেন—

'দুর্ম্মুখ এখনও পাপ দাঁড়াইয়া—হ দূর
দূর হ প্রভুর অন্নে বর্দ্ধিত কুক্কুর
কৃতঘ্ন।' ২৩ পৃষ্ঠা।

রাম রাম! এই কি প্রশান্ত গম্ভীর রামের যোগ্য উক্তি? কেবল রামের চরিত্রই যে এমন মসীলিপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে; আরো অনেক চরিত্রই যে এইরূপ অল্পবিস্তর হীনতর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। ভূমিকায় তারপরে আছে—

'মহর্ষি বাল্মীকির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আছে। কিন্তু তাঁহার পরে পৃথিবীর সমাজ আরও অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বে সব দেশেই স্ত্রীজাতির অবস্থা ও পদবী হীন ছিল। ভারতবর্ষে তাহার মর্য্যাদা সমধিক সংরক্ষিত

হইলেও সে দেশ তখনও স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান উচ্চ অবস্থায় উপনীত হয় নাই। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইলেও সম্পত্তিমাত্ররূপে গণ্য ছিল। তাই যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশাখেলায় বাজী রাখেন। শ্রীরামচন্দ্র শুদ্ধ সীতার নির্ব্বাসনে নয় সীতার উদ্ধারসাধন করিয়াই সীতাকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা প্রসঙ্গচ্ছলেও উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়।'

স্ত্রীলোকসম্বন্ধে বর্ত্তমান ধারণা উচ্চতর কিনা—বাল্মীকির আদর্শ বর্ত্তমান কালের অপেক্ষা লঘুতর কিনা—সেই তর্কে প্রবেশ করিবনা—কেননা সে অতি বিশাল ব্যাপার। এইমাত্র বলিতে পারি যে আমাদের ধারণা অন্যরকম—সমাজোদ্যানের বেল যূই মল্লিকা মালতী উপড়াইয়া ফেলিয়া আমরা পাতাবাহার গাছ লাগাইবার চেষ্টা করিতেছি—যাহা দেবপূজায় লাগিত তৎপরিবর্ত্তে টেবিল সাজাইবার জিনিস তৈয়ার করিতেছি। যাউক সেসব কথা।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল মহাভারতও যে অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন নাই—তাহার পরিচয় এস্থলে প্রদান করিয়াছেন। সভাপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায় আছে অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির আগে রাজ্যধনাদি সমস্তই হারাইয়াছিলেন, পরে একে একে বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভাইদিগকে বাজি রাখিয়া হারাইলেন। তৎপর নিজকেও পণ রাখিয়া যখন পরাস্ত হইয়া ক্রীড়ার উপসংহার করিতে উদ্যত হইলেন তখন শকুনি টিট্‌কারী দিয়া বলিল,—'ওহে আর একটা জিনিস তো তোমার রহিয়া গেল—তাহাকে বাজি না রাখিয়া নিজকে পণ করাতো দ্যূতশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইয়াছে!' এই বলিয়া দ্রৌপদীর কথা পাড়িল। তখন বাধ্য হইয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পণ করিলেন। এখন দেখুন ভ্রাতা ও স্বীয় দেহ পণ রাখিবার পর দ্রৌপদী আসিলেন—ইহাদ্বারা কি দ্রৌপদী 'সম্পত্তিমাত্র' হইলেন? ফলকথা দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু পত্নীর অবস্থা ও পদবী কিরূপ ছিল বা এখনও কোন্ আদর্শ সমাজে চলিতেছে, তাহা ধরিতে পারেন

নাই। বিবাহে স্ত্রীটি স্বামীর আপন দেহের—আত্মার সামিল হইয়া গেল—তার আর স্বতন্ত্র 'পদবী'ই কি 'অবস্থা'ই বা কি? স্বামীর গোত্রে তাহার গোত্র, স্বামীর সম্পত্তি তাহার সম্পত্তি স্বামীর পুণ্যের সে অর্দ্ধেক দাবীদার এসম্বন্ধ জীবনে মরণে, তালাক ডাইভোর্স নাই, বিধবা-বিবাহের অবকাশও ইহাতে নাই। পূর্ব্বে যে নিয়োগবিধিতে সন্তান হইতে, তাহা স্বামীর সন্তানই হইত।

রামচন্দ্র সীতার পরীক্ষা নিলেন, অথবা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন,—এটা যে নিজেরই পরীক্ষা নিজেরই নির্ব্বাসন। আশ্চর্য্য যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই ব্যাপারে রামচন্দ্রের নিষ্ঠুরতাই দেখিতে পাইলেন—কিন্তু তাঁহার যে কি বিষম আত্মসংযম, অবিচলিত ধৈর্য্য ও অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ইহাতে সূচিত হইয়াছে তাহা দেখিলেন না।

অগ্নি পরীক্ষার সময় রামের উক্তি—যাহা উচ্চারণ করিতেও দ্বিজেন্দ্রলালের কষ্ট বোধ হয়—তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। রাম প্রাণে প্রাণে জানিতেন যে সীতা নিষ্পাপা। তথাপি যে সকল লোক সীতার উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করিয়াছে, যে সুগ্রীব রাজ্যভোগ ছাড়িয়া আসিয়াছেন—যে বিভীষণ ভাইকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের সাহায্য করিয়াছেন—ইঁহাদের সমক্ষে দেখাইতে হইবে যে সীতা কি পদার্থ, যাঁর জন্য তিনি ও লক্ষ্মণ এত কষ্ট একটী বৎসর সহ্য করিয়াছেন। যে লঙ্কায় কত শত সহস্র রমণীর সতীত্বনাশ দুষ্ট দশাননকর্তৃক হইয়াছিল—সেইস্থলেই দেখাইতে হইবে সতীর কত তেজ, কিরূপ মাহাত্ম্য। তাই রাম কটু কঠোর বাক্যে সীতার অভিমান উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন, যাহাতে সীতার অগ্নিপ্রবেশার্থ সংকল্প দৃঢ় হয়। ফলে তাই হইল, লক্ষ্মণকে সীতা আদেশ করিলেন, 'চিতা প্রস্তুত কর।' তারপর যাহা হইল—এক অতি বিশিষ্ট লেখকের

গ্রন্থ বিশেষের * বিজ্ঞাপনাংশ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—"জানকীর অগ্নিপরীক্ষা সংক্রান্ত আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ভারতীয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম পরিচ্ছেদ। এই পুরাতন ও পবিত্র কাহিনী বাল্মীকির পৃথ্বীবিখ্যাত রামায়ণ ও পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক কবিদিগের পুরাণে ও কাব্যোপাখ্যানে যে ভাবে আলিখিত হইয়াছে উহা ভক্তির বিলাসক্ষেত্র ভারতবর্ষেই সম্ভবে" ইত্যাদি।

তারপর ভূমিকায় শূদ্রতপস্বিবধের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন :—'আমি স্বীকার করি যে রামকর্ত্তৃক শূদ্রকরাজার শিরশ্ছেদ আমার কাছে একটি গর্হিত কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয় * * * আমার মতে শূদ্রেরপ্রতি ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবহার অতি অন্যায় ছিল। গ্রীসে হেলটগণ যেরূপ প্রপীড়িত হইত আমাদের দেশে শূদ্রগণ প্রায় সেইরূপ প্রপীড়িত হইত। মন্বাদির বিধানে ইহার ভূরিভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় শূদ্রকরাজার প্রতি রামের ব্যবহার ইহার অন্যতম নিদর্শন'।

ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'সীতা'নাট্যকাব্যে শূদ্র কাহিনীর কোনও প্রয়োজনই ছিল না। এবং ইহা রামায়ণে যেরূপ আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল বীভৎসভাবের বৃদ্ধিকল্পে তাহা হইতে অন্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। গ্রীসে হেলটগণ দাসের ন্যায় স্পার্টানদের কাজ করিত অথচ রাজ্যের উপর সমস্ত অধিকার স্পার্টানগণই উপভোগ করিত। ব্রাহ্মণগণের রাজ্যাধিকারও ছিল না—শূদ্রগণের সেবা গ্রহণও তাঁহারা করিতেন না। কোনও মহর্ষির আশ্রমের বর্ণনায় শূদ্র স্ত্রী বা পুরুষের তথায় অবস্থানের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় কি? ব্রাহ্মণেরা 'স্বাধীনতা' উপভোগ করিতেন বটে, কিন্তু ক্ষমতা প্রয়াসী হইয়া অপরের উপর

* স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখিত "জানকীর অগ্নিপরীক্ষা।" এই অমূল্যগ্রন্থখানি সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

হুকুম চালাইয়া সম্পদের ভোক্তা হইতে চান নাই। সেইটা ক্ষত্রিয়ের ছিল; বরং ব্রাহ্মণগণ দেখিতেন ক্ষত্রিয়েরা নিজক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছে কিনা। বর্ণাশ্রমব্যবস্থা এক অদ্ভুত জিনিস, যাহা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল—কিন্তু অন্যদেশের দার্শনিকগণের তাহা সাধনার স্বপ্ন, প্লেটো, কোম্‌ত, টল্‌ষ্টয় প্রভৃতি এবং সোশিয়ালিষ্টগণের ইহাই যেন লক্ষ্যস্বরূপ। শ্রীভগবানের খাস তালুক এই ভারতভূমিতে তাঁহার স্বহস্তরোপিত * বড় সাধের বর্ণাশ্রমধর্ম্মক্রম সংরক্ষণ করা মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের প্রধান কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত; তাই রাজার অত্যুচ্চ প্রশংসা ছিল, বর্ণাশ্রম সংরক্ষক। ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত সনাতন সমাজ সত্যত্রেতাদ্বাপর ও কলির এইপর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে ছিল—আজ রক্ষকের অভাবে সেই সমাজ ওলট্‌পালট্ হইয়া ধ্বংসের পথে যাইতেছে। যাউক সে সব কথা। এখন রামচন্দ্রের নিকট অভিযোগ আসিল—একটা 'অকালমৃত্যু' তাঁহার রাজ্যে হইয়া গেল—ইহার প্রতিবিধান করিতেই হইবে। সমাগত ঋষিগণের মধ্যে নারদ বর্ণাশ্রমধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া উপসংহারে বলিলেন, "তোমার অধিকারের মধ্যে কোনও শূদ্র তপশ্চরণ করিতেছে, তাই এই বালকের মৃত্যু—কেননা প্রজার অকার্য্যের অংশ রাজাতে সংক্রমিত হয়—রাজার পাপেই ইহা ঘটিয়াছে"। রামচন্দ্র পুষ্পরথ আরোহণ করিয়া দক্ষিণে দণ্ডকারণ্যে গিয়া শূদ্রতপস্বীর দেখা পাইয়া পরিচয়গ্রহণান্তে তাহার শিরচ্ছেদন দণ্ড প্রদান করিলেন। এদিকে মৃতশিশু বাঁচিয়া উঠিল—দেবতারা আসিয়া রামকে অভিনন্দিত করিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মণবালকের অকালমৃত্যু দেখাইয়াছেন, কারণ অনুসন্ধানের সূত্রে শূদ্রতপস্বীর বধকার্য্যও বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু ইহার ফলে শিশুর পুনর্জ্জীবন লাভ দেখান নাই—কেননা তাহা হইলে

* চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ। গীতা ৪।১৩।

কাজটার গর্হিতত্ব যে লোপ হইয়া যায়। একটা কাজের 'ভালমন্দ' ফলদ্বারাই প্রমাণিত হয়। অলৌকিক বলিয়া যদি শেষাংশ পরিত্যাগ করিতে হয় তবে সমস্তটাই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ছিল, বিশেষতঃ ইহাতে যখন 'সীতার' প্লটের কোনও হানি হইত না।

মন্বাদি-শাস্ত্রে তিনি শূদ্রের পীড়ন দেখিতে পাইয়াছেন, তা' কতকগুলি কাজে অনধিকার কেবল শূদ্রের কেন ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যেরও ছিল। আবার মনুর বিধিবিধানে ব্রাহ্মণের জন্য যতটা কঠোরতা ছিল—অপরের জন্য ততটা ছিল না—কথায় কথায় শূদ্রত্ব চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি ইত্যাদি ছিল। আবার অসুবিধাই বা কত! দীন দরিদ্রের ন্যায় জীবন-যাপন করিতে হইবে—ভোগলিপ্সা পার্থিবক্ষমতা বর্জ্জন করিতে হইবে। লাভজনক ব্যবসায় অন্যের হাতে, তাহাদের দানের উপর জীবিকা—সে দানও সকলের কাছ হইতে এবং সবজিনিস নেওয়া যায় না। শূদ্রের ঐসকল বালাই ছিল না—অথচ যদি উহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিত, তবে 'মন্ত্র' উচ্চারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করিতে পারিত। *

বর্ণভেদের সঙ্গে আর একটিবিষয় জড়িত রহিয়াছে, যে জন্য ব্রাহ্মণ হইলেই কেহ নিশ্চিন্ত হইত না—শূদ্র হইলেও কেহ 'হা হতোঽস্মি' করিত না। সেটা 'জন্মান্তর বাদ'। ব্রাহ্মণ নিজ বর্ণোচিত কর্ত্তব্যপালন না করিলে পরজন্মে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে—শূদ্রের স্বকর্ত্তব্য সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হইলে উন্নতি অনিবার্য্য। অতএব কেহই ইহকালসর্ব্বস্ব হইয়া অপরকে হিংসা বা উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইত না। এই হিসাবে

* ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্নচ সংস্কারমর্হতি
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্।
ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ॥

মনু ১০।১২৬-১২৭

বিচার করিলেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আপাতদৃষ্ট কঠোরতা অনেকটা কমিয়া যায়।

এখন দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য কৈফিয়ৎ দেখা যাউক। কোনও সমালোচক তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "বিলেত ফের্ত্তার পৌরাণিক আখ্যান লইয়া কাব্য বা নাটক লেখার চেষ্টা বিড়ম্বনা।" প্রত্যুত্তরে তিনি মাত্র এই বলিয়াছেন যে "বঙ্গভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পৌরাণিক মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন (একজন বিলেত ফের্ত্তা) মাইকেল মধুসূদন দত্ত।" ইহা সম্যক্ উত্তর হইল না। মাইকেল মধুসূদন যদি 'মেঘনাদবধ কাব্য' না লিখিয়া কোন ঐতিহাসিক বীরবধকাব্য লিখিতেন অর্থাৎ অপৌরাণিক বিষয়ে ভারতী-প্রয়োগ করিতেন, তবে তাঁহার কাব্য আরো উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইত। মেঘনাদবধ কাব্যে যে যে 'দোষ' পরিদৃষ্ট হয়—তন্মধ্যে পৌরাণিক চিত্রবিকৃতিও একটি প্রকৃষ্ট রকমের দোষ। কাব্যে 'উপদেশ' কিরূপ পাওয়া যায়, কাব্যপ্রকাশে উদাহরণ-স্থলে "রামাদিবৎ বর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ" বলা হইয়াছে। আর মধুসূদন শিক্ষার দোষে রামকে যতটা পারেন হেয় ও রাবণকে মহান্ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহান্ দোষ উপলক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় উক্ত সমালোচক ঐরূপ বলিয়াছিলেন। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাট্যকাব্যেও দেখাইয়াছি—রামের চরিত্র তাঁহার হাতে পড়িয়া কিরূপ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা ভুলিয়া যান যে রাম আমাদের আরাধ্য দেবতা—বিষ্ণুর অবতার; অন্তিমকালে তাঁহার নাম 'তারকব্রহ্ম' বলিয়া সমাদৃত। এই রামচন্দ্রকে এইরূপ ভাবে চিত্রিত করা অত্যন্ত গর্হিত। রবীন্দ্রনাথকে উপহাস করিয়া "আনন্দবিদায়' লিখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার এক প্রিয়তম বন্ধু হইতে ভৎর্সনা লাভ করিয়াছিলেন—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই বন্ধুটি রামচরিত্রের এই বিকৃতি দেখিয়াও এই নাটকখানিকে "বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম অমূল্য রত্নস্বরূপ" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবল রামচরিত্র নহে অপর অনেক চরিত্রও দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে অল্পাধিক বিকৃত হইয়াছে। রঘুবংশের চির-শুভানুধ্যায়ী গুরু বশিষ্ঠদেব—ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে যিনি অগ্রণীস্বরূপ এবং জিতেন্দ্রিয়তায় যিনি অদ্বিতীয় ছিলেন—বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শতপুত্র বধ সত্ত্বেও যিনি বিচলিত হন নাই—এমন বরেণ্য ঋষিকে দ্বিজেন্দ্রলাল কি মলিনভাবে দেখাইয়াছেন! রামচন্দ্রের চরিত্রে যাহা কিছু কলঙ্ক বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন—তাহার সবটাই বশিষ্ঠের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। অথচ রামায়ণে 'বশিষ্ঠ' এসকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। যাঁহারা যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন রামকে বশিষ্ঠ কিরূপ তৈয়ার করিয়াছিলেন—গুরুদেব ইহাও জানিতেন তাঁহার শিষ্যটি কে এবং কেন ধরাধামে অবতীর্ণ। রামচন্দ্রের উপর তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছু চাপাইবার তাঁহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। রামচন্দ্রকে যজ্ঞ করিবার উপদেশও তিনি (রামায়ণ মতে) দেন নাই—আর তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির রামের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য জেদ করাও অসম্ভব। বাল্মীকির নিমন্ত্রণ বন্ধ করা অথবা তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়া অবশেষে হারমানা একেবারেই উন্মত্ত প্রলাপবৎ। ব্রহ্মারপুত্র বশিষ্ঠ বাল্মীকির বংশের আদিপুরুষ প্রচেতার ভ্রাতা—এই হিসাবেও বশিষ্ঠের সঙ্গে বাল্মীকির কোন তর্কই চলে না—ঋষিরা এত 'জ্যাঠা' ছিলেন না।

তারপর বাল্মীকি—তিনিও দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে পড়িয়া হীনপ্রভ হইয়াছেন। যাঁহারা "স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ" তাঁহাদেরই একজনকে—মহর্ষি বাল্মীকিকে—অস্বাভাবিকতরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে—যেন একজন কঞ্চুকী; বার্দ্ধক্য হেতু বহুভাষী ও শিথিলস্মৃতি। আবার কি বেশেই তিনি রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত! বগলে লাঠি, হাতে লোটা (কমণ্ডলু) পিঠে বোচকা (অজিন); আবার পাগড়ী, গায়ে নামাবলী ও পরিধেয়

মালকোচামারা কিনা, বলা হয় নাই! ব্রহ্মা যাঁহার আর্ষপ্রাতিভ চক্ষুঃ অব্যাহতজ্যোতিঃ বলিয়া গিয়াছেন—তিনি যজ্ঞের সংবাদটা কথমপি পাইয়াছেন, কিন্তু রামের সহধর্ম্মিণী কে, তাহা জানিবার জন্য এই অতিবৃদ্ধবয়সে রবাহূত ভাবে সুদূর অযোধ্যায় পাড়ি দিতেছেন! বাসন্তীর ঐবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া স্বগত বলিতেছেন, "মূর্খ আমি! একথাও পূর্ব্বে ভাবি নাই।" (৭৯ পৃষ্ঠ) এই কি মহর্ষি বাল্মীকির চিত্র? তারপর রামচন্দ্রের সভায় গিয়া, যে বশিষ্ঠসম্বন্ধে সুপ্রাচীন বলিয়া রাজর্ষি জনক (উত্তর চরিতে) বলিয়াছিলেন—

'পূর্ব্বেষামপি খলু গুরূণাং গুরুতমঃ।' (৪র্থ অঙ্ক) তাঁহাকে বলিতেছেন 'তুমি ঋষি বশিষ্ঠ কি নও?' ১০১ পৃষ্ঠা।

রামচন্দ্র বিনীতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আজি এতদূর পদব্রজে মহর্ষির গতি।" ১০১ পৃঃ

তাহার উত্তরে বাল্মীকি (বিদূষকের ন্যায়) জবাব দিলেন—"তপোবনে দূরত্ব ত অতিক্রম হয় না ভূপতি, কাজেই পদব্রজে।" ১০১ পৃঃ।

নিতান্ত ফলারে বামুনের ন্যায় নিমন্ত্রণ না হওয়ায় বাল্মীকি চটিয়াও গিয়াছিলেন—তাই বলিতেছেন—

"বিপ্রজাতি ভিক্ষা করে খাই
নিমন্ত্রণ হলে ভাল. তা বিনা নিমন্ত্রণেও যাই।" ইত্যাদি ১০১ পৃঃ।

নাটকে অষ্টাবক্রও উপস্থাপিত হইয়াছেন। বড়লোকের প্রসাদার্থী খোসামোদে ব্রাহ্মণের মত দু'চারটা কথা তাঁহার দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলাল বলাইয়াছেন। অষ্টাবক্রকে বৃথা এই বিড়ম্বনা দেওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? নামটি এবং তার অক্ষরগত অর্থ বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের মনে তাঁহার প্রতি এই লঘুভাবের উদ্রেক করিয়াছে। তাঁহার জীবনের ইতিহাস * জানিলে তিনি বোধ হয় এরূপ উপহাস করিতেন না।

* মহাভারত বনপর্ব্ব ১৩২—১৩৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই গেল মহর্ষিদের দুরবস্থা। অতঃপর অন্যান্য পাত্রপাত্রী।

কৌশল্যা রামকে গুরুবাক্য লঙ্ঘনের জন্য উত্তেজিত করিতেছেন; এটা আজকালকার দিনে অবশ্যই সম্ভাবিত—তখনকার যুগে অসম্ভব।

শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির সহধর্ম্মিণী হইয়াও অরণ্যে বাস করার অপেক্ষা রাজপ্রাসাদে অবস্থান করাটাই যে বাঞ্ছনীয়, তাহাই বলিতেছেন—

' এ প্রাসাদ এ উচ্চ প্রাচীর
উত্তুঙ্গ মন্দির চূড়া উচ্চ সৌধশির।
দাসদাসী সশস্ত্র প্রহরী সদা জাগে
বলিস্ কি সীতা,—তোর ভাল নাহি লাগে?" ১১ পৃষ্ঠা।

শান্তা যেন আজকালকার ধনীর কন্যা--হীনাবস্থ কুলীনে বিবাহিতা; আজন্ম সুখে পালিত হওয়ায় পতিগৃহে অবস্থান না করিয়া পিত্রালয়ের প্রাসাদেই জীবন যাপন করিতেছেন।

মাণ্ডবী, উর্ম্মিলা ও শ্রুতকীর্ত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে কোনও স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই, স্বামীর অস্তিত্বে ইহারা অস্তিত্ব মিশাইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাদের এক একটি চিত্র দিয়াছেন, তা বেশ। তবে মাণ্ডবীর চিত্রটি সরস হইলেও রামায়ণ-বিরোধী। রসিকা মাণ্ডবী আজকালকার অন্তঃপুর গুলজারকারিণী গল্পপ্রিয়া যুবতীরূপে চিত্রিতা। তা বরং সহনীয়। কিন্তু সৌভ্রাত্রের আদর্শ ভরত রামচন্দ্রের বিদ্রোহী হইলেও যখন রামের একান্ত অনুরোধে অযোধ্যায় ফিরিতে চাহিলেন তখন তাঁহাকে আসিতে না দেওয়াটা একান্তই অমার্জ্জনীয়। মাণ্ডবী ভাসুর রামচন্দ্রকে পত্নীঘাতী বিশেষণে ভূষিত করিয়া যেরূপ তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছেন, তাহা এই যুগেই সম্ভবে। অথচ সীতা যে নিজেই ইচ্ছা করিয়া বনে গেলেন, তাহা পশ্চাৎ দেখা যাইবে। সীতার জন্য এত দরদ—কিন্তু সীতা কোথায় কি অবস্থায় আছেন সে খবরও তিনি রাখেন নাই—রাখিলে পত্নীঘাতী বলিতেন কি? আর জনক? ইনি

দশরথের স্ত্রৈণভাবের * একমাত্র উত্তরাধিকারী—সেটাও আবার 'ডাইলুশন' হইয়া এমন ষ্ট্রং হইয়াছে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সেই ভক্তি অনুরক্তি সমস্তই চাপা পড়িয়া গেল!

সীতার চিত্রটি সমুজ্জ্বল করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্যই যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও অচ্ছিদ্র হয় নাই। রামচন্দ্র ভরতের ভর্ৎসনায়, শান্তার বক্তৃতায় এবং কৌশল্যার অনুরোধে সীতার নির্ব্বাসন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সত্যভঙ্গের জন্য অনুতপ্ত হইয়া যখন দেবতার নিকটে মার্জ্জনা ভিক্ষাকরিতেছিলেন, এমন সময়ে সীতা আসিয়া বলিলেন—

পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে
আমিও রাখিব পতিসত্য
* * *
এই বক্ষ পাতি দিব হাসি মুখে
তুমি তাহে চলে যাও সুখে
যশের মন্দিরে। * *
* * সীতা বিম্ন
তোমার সুখের চিন্তা কর দূর। ইত্যাদি ৪৮ পৃষ্ঠা।

রাম সীতার বক্তৃতার স্পষ্ট সায় দিলেন না, বরং হা হতোস্মি করিলেন। তার পর ভরতের কথায়ও জানাযায়, বনবাসে যাইবার সময়ে—

"মুখে দিব্যকান্তি জানকীর সমুন্নত শির
শান্ত সৌম্যগর্ব্বে স্ফীত বক্ষঃস্থল
আত্মোৎসর্গ সুখে।" ৫৭ পৃষ্ঠা

---

* দশরথ কৈকেয়ীর বশীভূত ছিলেন বটে, কিন্তু (দ্বিজেন্দ্রলালের) কৈকেয়ীনন্দনের ন্যায় 'তুমি যা বল' গোচের ছিলেন না।

সীতার এই চিত্রটি দেখাইবার প্রলোভনেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল বনবাসের কথা অযোধ্যায়ই সীতার গোচরীভূত করিয়াছেন। এইরূপই যদি সীতাচরিত্রের দৃঢ়তা প্রদর্শিত হইল তবে শেষটায় লবকুশকে পঞ্চদশ (?) বর্ষপরে কেন সীতা বলিলেন—

"আর আমি অভাগিনী পতিনির্ব্বাসিতা।" ১৬ পৃঃ।

মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে সীতার চরিত্র এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে ইহাতে ছিদ্র বাহির করা অসম্ভব।* দ্বিজেন্দ্রলাল বনবাসটা সীতা দ্বারা গছাইয়া লইয়া বোধ হয় মনে করিয়াছেন সীতার মহিমময় চরিত্রটিকে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাহা দেখায় বেশ। কিন্তু 'তুমি পিতৃসত্য পালিতে বনে গিয়াছিলে, আমিও পতিসত্য পালিতে বনে যাইব।' এই যে টক্কর দিয়া কথা বলা, এটা আদর্শ সতী সীতার যোগ্য হয় নাই। "সমুন্নত শির" "গর্ব্বে স্ফীত বক্ষঃস্থল' এটাও সীতার উচিত চিত্র হয় নাই। পরমারাধ্য স্বামী শ্বশ্রূ স্নেহশীল দেবর ননান্দ্ৃ প্রভৃতিকে ছাড়িয়া যাইতে কোমলহৃদয়া ও স্বভাবশালীনা সীতার কি এইরূপ গর্ব্বিত ভাব শোভা পায়?

যাউক, কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকির কৃত সীতার চিত্র দেখুন। লক্ষ্মণ বনবাসাজ্ঞা জানাইলে মন্যুপীড়িত হইয়া সীতা মূর্চ্ছিতা হইলেন, তৎপর

* মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিতলেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মায়ামৃগের ব্যাপারে সীতাকর্ত্তৃক লক্ষ্মণের ভৎসনার দোষ দেখাইয়াছেন এবং মাইকেল মেঘনাদবধে তাহার উন্নতিসাধন করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। মধুসূদন যে ভৎসনাটুকু সীতার মুখে দিয়াছেন তাহা অতি কোমল; ধীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ইহাতে টলিবার পাত্র ছিলেন না। বাল্মীকি সীতার মুখে এমন কটু কর্কশ ভাষা দিয়াছেন যে তাহাতে লক্ষ্মণ বিচলিত না হইয়াই পারেন না। সীতার অতটুকু কুবুদ্ধি না হইলে পাপীর সংস্পর্শ ঘটিত কি?

বিলাপ করিয়া লক্ষ্মণকে যাহা বলিলেন তাহা কি করুণ অথচ সংযত, কি পতিভক্তির দ্যোতক, অথচ কীদৃশ আত্মত্যাগসূচক! ইচ্ছা হয় সমস্তটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাই, কিন্তু স্থানাভাব; তথাপি রামকে কি কথা জানাইতে হইবে তাহা কি ভাবে বলিতেছেন, দেখুন—

বক্তব্যশ্চাপি নৃপতির্ধর্ম্মেষু সুসমাহিতঃ।
জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তা যা হিতা তব নিত্যশঃ॥
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরুণা জনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ॥
ময়াহি পরিহর্ত্তব্যং ত্বংহি মে পরমাগতিঃ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতি ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ॥
যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথা স্তথা পৌরেষু নিত্যদা।
পরমো হ্যেব ধর্ম্মস্তে তস্মাৎ কীর্ত্তিরনুত্তমা॥
যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্ম্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ।
অহন্তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ॥
যথাপবাদঃ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন।
পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ॥
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ।
ইতি মদ্বচনাদ্ রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ॥*

* * * রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৫৮ সর্গ।

---

* বাল্মীকিও যে প্রজারঞ্জনার্থই রামকর্ত্তৃক সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন—ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। ফলতঃ ভবভূতিও বাল্মীকিরই অনুসরণ করিয়া (বশিষ্ঠদ্বারা) বলাইয়াছেন—

"যুক্তঃ প্রজানামনুরঞ্জনেস্যা স্তস্মাদ্‌যশো যৎ পরমং ধনং বঃ।"

উত্তর চরিত ১ অঙ্ক।

মহাকবি কালিদাস পর্য্যন্ত ইহার একটু এদিক্ সেদিক্ করিতে গিয়া সীতার চরিত্র কিঞ্চিৎ ম্লান করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন।

"বাচাস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য॥

রঘু ১৪। ৬১

ইহাতে রামের উপর আক্রোশ প্রকাশ পায়; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া নিলেন, *

"কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং বিপাকবিস্ফূর্জ্জথুরপ্রসহ্যঃ।

রঘু ১৪।৬২

তৎপর সীতার ক্রন্দনের সংবাদ পাইয়া বাল্মীকি আসিয়া তাঁহাকে নিয়া আশ্রমে গেলেন। তারপর সীতার সংযমগুণেই হউক অথবা বাল্মীকির তপোবন প্রভাবেই হউক রঘুবংশে—তথা রামায়ণে—সীতার কোনও একটা বিলাপের কথাই পাওয়া যায় না।

মহর্ষি বাল্মীকি যুগ্মজাত লবকুশকে এক আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং উভয়কেই রামের সদৃশাকার করিয়াছেন। মহাকবি ভবভূতি এবং কালিদাসও তাহাই দেখাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র লবকে রামের ন্যায় বীরত্ব-ব্যঞ্জকভাবযুক্ত দেখাইয়াছেন †। কিন্তু আকৃতি যে উভয়ের পরস্পর

* প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্—এই নীতি অবলম্বন করিয়া কালিদাস উপরের শ্লোকটি না লিখিলেই যেন ভাল হইত। পুণ্যশ্লোক বৈদেহীর পবিত্র অন্তঃকরণে রামনিন্দার এই ক্ষণিক ছায়াপাতও যে অন্যায়!

† "সীতা। (স্বগত) সেই রাঘবের তেজ। সেই দৃঢ় কথা। সেই দর্প। সে ভঙ্গিমা, গর্ব্ববিস্ফারিত সেই নাসা। সেই দৃঢ় শৌর্য্য-প্রসারিত রামবক্ষ চক্ষে জ্যোতিঃ অটল ও স্থির, সে আত্মনির্ভর মুখে।"

৮৮ পৃষ্ঠা।

সমান এবং রামেরই সদৃশ একথা বলেন নাই। আর্যপ্রতিভা সম্পন্ন বাল্মীকি এই সাদৃশ্যদ্বারা প্রকারান্তরে সীতার কায়মনোবাক্যে সতীত্বের সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃতিগতসাদৃশ্যও না দেখাইয়া কুশকে ভীরু ও মাতার প্রতি বিরক্ত এবং লবকে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা কুশের অবাধ্য *—তথা রামের প্রতি ঘৃণাশীল—দেখাইয়া তাহাদের যুগ্মজাতত্বের ও জনকজননী প্রভৃতি গুরুজনসেবী বীরশ্রেষ্ঠ রামের এবং সতীশিরোমণি সীতার অপত্যত্বের সার্থকতা প্রদর্শন করেন নাই। ফলতঃ এস্থলে দ্বিজেন্দ্রলালের সূক্ষ্মদৃষ্টির নিতান্ত অভাবই সূচিত হইতেছে, এবং লবকুশ চরিত্র উভয়টিই একপ্রকার মাটি হইয়া গিয়াছে।

নাটকের শেষ দৃশ্যটিও নিতান্ত অশোভন হইয়াছে। বাল্মীকির বহু চেষ্টার পরে সীতা সপুত্রা রামকর্তৃক পরিগৃহীতা হইতে চলিয়াছেন। এরূপ শুভসংযোগস্থলে 'ভূমিকম্প' এই অশুভ সংঘটন কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্নিমিত্ত যে মানেন না এমন তো নয়; কেন না যখন বশিষ্ঠের সঙ্গে রামের সীতা নির্ব্বাসনসম্বন্ধে কথা স্থির হইতেছিল, অযোধ্যায় তখন বিনামেঘে বজ্রধ্বনি হইয়াছিল।

সীতা। একি?

কৌশল্যা। বজ্রধ্বনি।

সীতা। নির্ম্মল আকাশে?

কৌশল্যা। (স্বগত) সত্য, কই মেঘ নাই। ২৮ পৃষ্ঠা।

অতএব এই দুর্নিমিত্ত 'ভূমিকম্প' হইল কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল অলৌকিক ঘটনা পরিহার করিয়াছেন, তাই, বোধ হয়, সীতার অদর্শন হওয়ার সময়েও তিনি যে শপথবাক্যদ্বারা আপনার সতীত্বের পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার অবতারণা করেন নাই। বাল্মীকির লেকচার এবং

* "কুশ। তুমি কথা শুনিবে না বহুদিন জানি।" ৮২ পৃষ্ঠা।

বশিষ্ঠের ত্রুটিস্বীকারেই সেইপন্থা অনাবশ্যক বলিয়া রুদ্ধ করিয়াছেন। তবে এটা কি কম অলৌকিক হইল যে ভূকম্পে পৃথ্বীবক্ষঃ বিদীর্ণ হইল কেবল একটিমাত্রস্থলে, এবং তাহাতে একটিমাত্র প্রাণীরই হানি হইল; সেইস্থল সীতার পদতল এবং সেইপ্রাণী সীতা। এখন, তৎকালে বাল্মীকির আশ্রমে অযোধ্যার কোনও মাতব্বর প্রজা যদি উপস্থিত থাকিত, এবং টিট্‌কারীদিয়া বলিয়া উঠিত, "হে রঘুবর, আমরাতো সীতার অপবাদ বিশ্বাসই করিতাম, তুমি আমাদের অপবাদ আশঙ্কা দূর না করিয়া যে ঐ বুড়া বামুনের কথায় এবং আমাদের গুরুঠাকুর বশিষ্ঠদেব—যিনি পূর্ব্বে ঠিক বিচারই করিয়াছিলেন—তাঁহারও অবশেষে মতিভ্রমে, সীতাকে নিতে আসিয়াছিলে—দেখ, দেবতা সুবিচার করিয়াছেন—সীতার ভূগর্ভে জীবন্ত সমাধি হইল। দেখ, আমাদের আশঙ্কা অমূলক কি সমূলক!" তাহা হইলে রামচন্দ্রের অথবা বাল্মীকির উত্তর দিবার কি ছিল?

আমার বোধ হয় সমগ্র রামায়ণের মধ্যে এই সীতার শপথ-পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ দৃশ্যটির ন্যায় এরূপ অদ্ভুত অথচ করুণদৃশ্য আর একটি আছে কি না সন্দেহ। পুনঃ পরীক্ষার্থ আনীতা মা জানকীর ক্ষোভে ও অভিমানে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল—অথচ গুরুজন সকলেই চরিত্র শুদ্ধির প্রমাণ দিতে বলিতেছেন—পতিব্রতা একই কথায় সমস্ত প্রকাশ করিলেন—

> "যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি নচিন্তয়ে
> তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
> মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে
> তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
> যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ
> তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
> রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১১০।১৪-১৬

তথন ভূমধ্য হইতে নাগগণ বাহিত একদিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল—

"তস্মিংস্তু ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।

স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥ উঃ কাঃ ১১০।১৯

এইরূপে সীতা রসাতলে অন্তর্হিতা হইলে—সমগ্র দর্শকমণ্ডলী সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে এই দৃশ্যটির সংক্ষিপ্ত এবং মনোহারী বর্ণনা দিয়াছেন।

ভবভূতি, নাটক বিয়োগান্ত হইতে পারে না, তাই সীতার সম্মেলন দেখাইয়াছেন—তথাপি পৌরজানপদগণের সাক্ষাৎ সীতার পবিত্র চারিত্র্য স্বয়ং ভাগীরথী এবং গুরুপত্নী অরুন্ধতী দ্বারা প্রশংসিত করাইয়াছেন; প্রজারা নতশিরে সীতার উদ্দেশে অভিবাদন করিল—দেবতারাও পুষ্পবর্ষণ করিয়া অভিনন্দিত করিলেন। ফলতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুইপথের কোনটি গ্রহণ না করিয়া অতি অশোভনভাবে নাটকখানির উপসংহার করিয়াছেন।

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তথাপি ভূমিকার আর একটি বাক্যের আলোচনাচ্ছলে দুচারিটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেন, "পরিশেষে আমি সুধীবৃন্দকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা যেন এই নাটকখানিকে কাব্যকলা হিসাবে মাত্র দেখেন, ইতিহাস বা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিচার করিতে না বসেন।" নাটককে 'সুধী' কেন, কোন 'অল্পধী'ও ধর্ম্মগ্রন্থ ভাবিবে না, ইতিহাসও মনে করিবে না। তবে কাব্যকলা হিসাবে দেখিবার অনুরোধ কেন বুঝিলাম না। কোন্ কাব্যকলা বলিয়া দিবে যে পৌরাণিক চিত্রগুলিকে মলিন করিতে হইবে? পৌরাণিক ঔপন্যাসিক বা ঐতিহাসিক কোনও সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা নিয়াই নাটক লিখিতে হইবে, ইহা ভারতীয় অলঙ্কারিকগণের অভিপ্রায়—"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ"—কেননা ইহাতে

স্পষ্ট বুঝিতে তেমন বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু নাটককারের ঈদৃশী কল্পনাশক্তি থাকা চাই যে তিনি পুরাণের ইতিহাসের অথবা উপাখ্যানের নায়ক নায়িকাদের চরিত্রের গূঢ়ভাব যথাযথভাবে প্রদর্শিত করিতে পারেন—যেন মূলের সঙ্গে তুলনায় তাঁহার নাটকবস্তু হীনতর না হয়। যদি হয়, নাটককারকে অপ্রশংসাভাজন হইতে হইবে। পৌরাণিক বিষয়ে আবার আর একটি বিপদ্—ঋষি বা দেবতা অথবা মহাপুরুষাদি সম্বন্ধে দেখিতে হইবে যেন তাঁহাদের প্রতি ভক্তিবিশ্বাস-পরায়ণ জনসাধারণের হৃদয়ে আঘাত না লাগে। তাদৃশ বিষয়ে নাটক লেখকের যে যে গুণ থাকা চাই দ্বিজেন্দ্রলালের যে তাহা নাই, প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখান হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ না করাই ভালছিল।

এই নাটকে এছাড়াও যে সকল ত্রুটি আছে তাহা প্রদর্শন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও কয়েকটি মাত্র না দেখাইলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বাল্মীকির আশ্রমটি দ্বিজেন্দ্রলাল দণ্ডকারণ্যে সংস্থাপন করিয়াছেন। বাল্মীকির আশ্রম সম্বন্ধে এমন কোনও মতভেদ নাই যে তিনি এবিষয়ে স্বাধীন মত পোষণ করিবেন। গঙ্গা পার হইয়াই তাঁহার আশ্রম—তমসা নদীর তীরে; অতএব যেখানে তমসা আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থলেই বাল্মীকির তপোবন—ইহা দণ্ডকারণ্যে নহে।

রামের অশ্বমেধ সীতা নির্ব্বাসনের কত পরে হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ভবভূতির উত্তর চরিতের ২য় ও ৩য় অঙ্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—'দ্বাদশ বৎসর'। রামায়ণেও তাহাই যেন বোধ হয়, কেননা শত্রুঘ্ন সীতা নির্ব্বাসনের সময়েই প্রায় লবণ বধের জন্য মথুরা যান। সেখানে দ্বাদশবর্ষ কাটাইয়া (উত্তরকাণ্ড ৮৪ ও ৮৫ সর্গ) অযোধ্যায় রামকে একবার দেখিতে আসিয়া পুনরায় যান, তাহারই অব্যবহিত পরে এই

এই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকখানি পড়িয়া ঐ ব্যাপার সীতা নির্ব্বাসনের ১০ বৎসর কি ১৭ বৎসর কি ১৮ বৎসর— কত বৎসর পরে হইয়াছিল—কিছুই বুঝা যায় না। পরন্তু একবার ১২ বৎসরও আছে। নিম্নে সমস্তই প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) রাম। * * * জাননা তো তুমি কিসে অহর্নিশ নিত্য এই দশবর্ষ। ৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য ৭৪ পৃ।

(২) আবার সেই পৃষ্ঠায়ই সেই বক্তৃতারই পরে আছে—

চলিয়া গিয়াছে দ্বাদশবর্ষ, শান্তিহীন।

(৩) বাসন্তী * * শুন নাই রঘুবীর অনন্যপত্নীক পঞ্চদশ বর্ষ ধরি। ৪র্থ অঙ্ক ৩য় দৃশ্য ৭৭ পৃঃ।

(৪) রাম। * * * এই ঘোরতর অন্তর্দাহে এই অষ্টাদশ বর্ষ ধরি দগ্ধ হইয়াছি। ৪র্থ অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য ৯৪ পৃঃ।

(৫) বাল্মীকি। * * শিশু সপ্তদশ বর্ষীয়? ৫ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য ১০৩ পৃঃ।

বাল্মীকি। কেঁদেছিলি সপ্তদশ বর্ষ ধরি নিত্য যাঁর জন্য ১১৯ পৃঃ, রাম। * * দীর্ঘ সপ্তদশবর্ষ পরে দেখা হবে। ৫ম অঙ্ক ৫ম দৃশ্য ১২৩ পৃঃ।

রাম। সপ্তদশবর্ষ পরে পাইয়াছি ফিরে পত্নীপুত্রে। ১২৫ পৃঃ।

জানিনা দ্বিজেন্দ্রলালের ১৭ বৎসরই অভিপ্রেত ছিল কিনা। বলা আবশ্যক যে অশ্বমেধের সঙ্কল্পের (৪র্থ অঙ্ক ২য় দৃশ্যের) সময় হইতে অশ্বমেধের শেষ (পঞ্চম অঙ্কের ২য় দৃশ্য) পর্য্যন্ত ৫।৭ বৎসর লাগিবার কোন কথা নাই। অথচ একই অঙ্কে একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ষ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এর অর্থ কি? এত ছাপার ভুল হইতেই পারে না। বিশেষতঃ ইহা যখন পত্রিকাবিশেষ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শব্দপ্রয়োগেও দু এক স্থানে অসাবধানতা দেখা যায়; একটি বড়ই চমৎকার! সেনাগণ অর্থে সেনানী লেখা হইয়াছে:—

কুশ। * * শুনিয়াছি কোলাহল সেনানীর (৮১ পৃঃ)। অরণ্যানী পাণিনি বার্ত্তিক ৪।১ ৪৯) শব্দের দেখাদেখি বনানী বঙ্গভাষায় খুব চলিয়াছে; ক্ষতি নাই, কেননা বনানী শব্দটা নূতন। কিন্তু 'সেনানী' শব্দের অর্থ রূঢ় হইয়া আছে, তাহা এভাবে পরিবর্ত্তিত তো হইতে পারে না!

দ্বিজেন্দ্রলাল মিত্রাক্ষর ছন্দে এই নাট্যকাব্যখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। শেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি ইংলণ্ডের মহাকবিগণ অমিত্রাক্ষরে নাটক লিখিয়াছিলেন—তৎপর কবি ড্রাইডেন প্রভৃতি মিত্রাক্ষরেও নাটক লিখেন। কিন্তু নাটকের বক্তৃতার চরণে চরণে মিল তেমন ভাল শুনায় না, ছড়াকাটার মত শুনায়। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিও অমিত্রাক্ষরই চালাইয়াছিলেন; পরন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল মিত্রাক্ষরের নিগড় পরাইয়াও কবিতাকে চালাইয়াছেন মন্দ নয়। হ্রস্বতর চরণগুলিতে মিল বেশ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু আঠার অক্ষরের চরণের মিল তেমন লক্ষ্য হয় না। আবার মধ্যে মধ্যে এই মিলও সুষ্ঠু হয় নাই। যথা—

মরণের চিন্তা; যেন পুষ্পিত কাননে
ভুজঙ্গম; উৎসব মন্দিরে আর্ত্তধ্বনি; ১৩ পৃষ্ঠা

অপিচ মিলের জন্য কখন কখন নিরর্থক শব্দেরও প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। যথা—

সেদিন বৈদেহী সঙ্গে ম্লান মৌন
সৌমিত্রি অযোধ্যা ছাড়ি অতি গৌণ
নিঃশব্দ সশঙ্কগতি পুষ্পরথে
চড়ি চলিলেন বনে (৫৬ পৃঃ)

গৌণ শব্দটির সার্থকতা কি ?

ক্বচিৎ এই পদ্যময় কাব্যের পংক্তি গদ্যের মতনও শুনায়, যথা—

"দুর্ভিক্ষও অনাবৃষ্টি দেশ হ'তে চির নির্ব্বাসিত হোক।" ১৩ পৃষ্ঠা

আর না—যথেষ্ট হইয়াছে। আমরা একপ্রকার ইচ্ছা করিয়াই মাত্র দোষগুলি প্রদর্শন করিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল এখন পরলোকগত—সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য। তাই তিনি স্তুতি নিন্দার অতীত। প্রশংসা পাইলেও উৎসাহ হইবে না, অপ্রশংসায়ও তাঁহার কোন ক্ষতি নাই। তবে দোষ প্রদর্শনের সার্থকতা এই যে তাঁহার অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন—তাঁহারা যেন সাবধান হন। বিশেষতঃ শ্রদ্ধা বিশ্বাস না থাকিলে পৌরাণিক চিত্রে হস্তক্ষেপ কেহ যেন না করেন। ধরুন এই 'সীতা', ইহার পাত্রপাত্রী যদি অযোধ্যার রামসীতা ও মহর্ষি বশিষ্ঠ বাল্মীকি ইত্যাদি না হইয়া কুসুম-নগরের বীরেন্দ্র ও কমলা নামক কল্পিত রাজরাণী এবং আধুনিক পণ্ডিত হরিশাস্ত্রী রামনিধি ইত্যাদি হইতেন—তবে আমাদের সমালোচনা নিশ্চয়ই কঠোর হইত না। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের নানাপ্রকার চরিত্র সৃষ্টির, রসভাবসমুজ্জ্বল তর্কযুক্তিপ্রয়োগবহুল রচনার শতমুখে প্রশংসা করিতাম। এই নাটকেও লক্ষ্মণ ও ঊর্ম্মিলার চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে—রামায়ণের ভাব (স্পিরিট) ব্যাহত হয় নাই। ফলতঃ নাটককারের প্রধান কর্ত্তব্যই কল্পনাবলে নিজকে বর্ণয়িতব্য দেশ কাল ও পাত্রের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রবিষ্ট করা। উত্তরচরিতে সূত্রধার যেমন বলিয়াছিল—

'এষোঽস্মি কার্য্যবশাদ্ আযোধিক স্তদানীন্তন শ্চ,'

সমস্ত নাটককারেরই রামায়ণ ঘটিত বিষয় বর্ণনায় তাই সাজিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা পারেন নাই; খুঁটিনাটিতেও তাঁহার অত্যাধুনিকত্ব ধরা পড়িয়াছে—তাই ভরত রামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'প্রিয়বর' (২ পৃঃ), লক্ষ্মণও বলিয়াছেন 'ভাই' (১১৭ পৃঃ)।

এখন মধুরেণ সমাপয়েৎ। দ্বিজেন্দ্রলাল মহাপ্রাণ ছিলেন; তাহা না হইলে তাঁহার স্বদেশপ্রেমের গীতগুলি এমন প্রাণস্পর্শী হইত না। তাঁহার প্রাণের প্রার্থনা, "এই দেশেতে জন্ম আমার যেন এই দেশেতে মরি।" কেবল তাই নয়, মহাত্মা গোখলে যেমন মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—'যেন আবার ভারতবর্ষে জন্মি,' দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত পুস্তক হইতেও জানিলাম, তিনিও 'আবার আসিব' বলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার 'মণ্টু' ডাকটিরও অর্থ ইহাই বটে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" ৮।৬

তাই তাঁহাকে এই মণ্টুর মধ্যেই আবার পাইব। হে দ্বিজেন্দ্রলাল, তুমি আসিবে—আইস, আবার বঙ্গদেশকে দেশপ্রীতির করুণ মধুর হৃদয়োন্মাদক স্বদেশ সঙ্গীত শুনাইও। পরন্তু, তোমার অচির ভূতজন্মার্জ্জিত অনার্য বিদেশী ভাব যেন পরজন্মে তোমার নির্ম্মল প্রতিভাকে আর ম্লান না করে, তদর্থে আমরা ভগবৎসমীপে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত।

বিগত বর্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার জীবন-চরিত গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে একবার ইহা পাঠ করিয়াছিলাম; মৃত্যুসংবাদ পাইবার পরে পুনশ্চ পড়িয়াছি। এইখানি উপলক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ এবং ইহার নেতৃবর্গের, তথা পণ্ডিত শিবনাথের, সম্বন্ধে কতকগুলি কথার অবতারণা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্ম-সমাজের কথা বলিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথম ইহার সংস্থাপক রামমোহন রায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। রামমোহন অসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন—এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও এমন অধ্যবসায়ী কর্ম্মী সচরাচর দেখা যায় না। অসামান্য মেধাশক্তি থাকাতে তিনি নানা ভাষায় বুৎপন্ন হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই অশেষ ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক নানা স্থলে ভ্রমণ করিয়া এবং নানা ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া রামমোহন জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মের মর্ম্মাবগত হইয়াছিলেন। তিনি যদি কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশপূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন করিতেন—এমন পরিষ্কার বুদ্ধি এমন অভিনিবেশ-প্রবণ-চিত্ত বিশেষতঃ এমন সুদৃঢ়-কাষ্ঠ-দেহ পাইয়া যদি ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভের জন্য তপস্যা করিতেন, তবে তিনি একজন অতি উচ্চ অঙ্গের সিদ্ধপুরুষ হইয়া ভারতবর্ষকে ধন্য করিতেন। কিন্তু যেরূপ প্রকৃতি হইলে বিদ্যা তর্কযুদ্ধে প্রেরণা আনিয়া দেয়, রামমোহনের সেইরূপ প্রকৃতি ছিল। তাই অপক্ক বয়সেই আরবী শিখিয়া মোসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থাদির আলোচনার ফলে তাঁহার মনে হইল হিন্দুদের প্রতিমা পূজা একটা কুসংস্কার এবং তাঁহার সেই মত প্রচারার্থ একখানি পুস্তকও তিনি লিখিয়াছিলেন।

তারপর, তাদৃশ দৃঢ়বদ্ধ চিত্তবিশিষ্ট লোকের মনে যখন একটা বিষয়ে প্রবণতা জন্মে, তখন নবভাস্কর লগ্ন সংস্কারের ন্যায় তাহা সহজে বিদূরিত হয় না। বরং শাস্ত্রাদির অধ্যয়নকালেও তাদৃশ ব্যক্তি আপনার প্রবৃত্তির অনুকূল বাক্যাদি খুঁজিয়া লয়। ফলকথা রামমোহন "তাত্ত্বিক" ছিলেন না—ছিলেন "তার্কিক"; বিদ্যা তাঁহার "বিবাদায়" হইয়াছিল। তাঁহারাই প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, যাঁহারা নিজের জীবনে সেই 'তত্ত্ব' উপলব্ধি করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রচার করেন; রামমোহনের জীবন-চরিত পড়িয়া আমরা তাহার কোনও প্রমাণ পাই নাই—ষোড়শবর্ষ হইতেই তাঁহাকে "যুদ্ধং দেহি" নিনাদ করিতে দেখি—তত্ত্বোপলব্ধির অবসর কোথায়?

সত্বগুণ অপেক্ষা রজোগুণই তাঁহাতে প্রভূত মাত্রায় দেখা যাইত। ভোগলিপ্সা অর্থলিপ্সা যশোলিপ্সা ইত্যাদি উৎকটভাবে তাঁহার স্বভাবে পরিলক্ষিত হইত। "লক্ষ টাকা" সঞ্চয় করিতে হইবে—তাই রঙ্গপুরের দেওয়ান হইয়া "উপরি" আয়ে সেই বাসনা চরিতার্থ করিলেন। একাধিক বিবাহে তাঁহাকে আপত্তি করিতে দেখা যায় নাই, অধিকন্তু শৈব-বিবাহেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। মদ্য মাংসে রুচি ছিল, সে সময়েও তিনি 'শিবে'র আজ্ঞাবহ—অথচ তাঁহার প্রচারের বিষয় ছিল, নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা!

ফলতঃ রামমোহন রায়ের চরিত্রে পরস্পর বিরোধী ব্যাপার লক্ষিত হইয়া থাকে। যে সঙ্গীত "বিষয় নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিতে পারে" বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে, তিনি তাদৃশ গীত রচনা করিয়াও বিষয়ে নিমগ্ন ছিলেন। "কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে" বলিয়া যিনি গান বাঁধিলেন, তিনিই প্রত্যহ দর্পণে মুখ দেখিয়া বেশ-পারিপাট্য করিতেন!—একজন ঐ কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি "বেশ বলেছ" "বেশ বলেছ" বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বেদান্ত প্রচার বিষয়ে যিনি উৎসাহী ছিলেন, তিনিই গবর্ণর জেনারেলের নিকট

লিখিলেন, ঐ বেদান্তটা কিছু নয়—উহা পড়িয়া ছেলেরা বিগড়াইয়া যাইবে মাত্র! যিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিয়া বিশ্বজনীন উদারতার প্রশংসা লাভ করিলেন, তিনি "পৈত্রিক বিষয়ে আপনার স্বত্বরক্ষার জন্য আদালতে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।" * এইরূপ আরও উদাহরণ দেওয়া যাইত—বাহুল্য বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। তথাপি তদীয় জীবন-চরিত হইতে একটী গল্প এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

রামমোহনের কর্ম্মচারী তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র যাদবচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমার আপিল সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করেন। রামমোহন এই সময়ে মোকদ্দমা শুনিতে যাইতেন এবং প্রত্যেক বারে যাদব-চন্দ্রকে ষোলটি টাকা দিতেন ও আপন রুমালে মুখ মুছাইয়া দিতেন। যাদবচন্দ্র মোকদ্দমায় জয়ী হন। রামমোহন শেষে বলেন "চাকর আর ছেলের মধ্যে বিবাদ চল্‌ছিল চাকর পরাস্ত হ'ল। ছেলের জেদ বহাল হইয়া ভালই হইল।" †

ফলকথা, রামমোহন রায়ের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইবার প্রকৃতি ছিল না। "মহাজনাঃ স্মেরমুখাভবন্তি"—রামমোহন রায়কে নাকি সর্ব্বদা বিষণ্ণ-মুখ দেখা যাইত। তাঁহার মাথার যে মৃন্ময় প্রতিকৃতি সাহিত্য-পরিষদ্-গৃহে দেখিয়াছি, তাহাতে তিনি "দ্বিমস্তক" ছিলেন, স্পষ্টই প্রতীত হয়। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত চরিত্রানুমান বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় আছে,—"দ্বিমস্তকঃ পাপকৃদ্দৈন্যভাক্‌।" পণ্ডিত কালীবর

---

* রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত) ৪৮০ পৃঃ [৩য় সংস্করণ]।

† নগেন্দ্রবাবু কৃত রামমোহনের জীবন-চরিত তৃতীয় সংস্করণ ৩৮৬ পৃষ্ঠা। জীবন-চরিত-কার গল্পটি লিখিয়া মন্তব্য করিতেছেন "কি [illegible] করিতে পারিলা কি?

ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"কপাল ও মূর্দ্ধা যেন যোড়া, যেন দুই থাক আলাদিদা। অর্থাৎ কপালের উপরে ও শিখাস্থানের নিম্নে একটি 'থাক্' থাকিলে তাহাকে দ্বিমস্তক বলা যায়। এতদ্বিধ পুরুষ অর্থাৎ দ্বিমস্তকযুক্ত পুরুষ পাপকৃৎ অর্থাৎ পাপমতি ও অন্তস্কুটিল হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিরা কোন কালেই বা কোনও ক্রমেই ধনশালী হইতে পারে না, ইহা যথার্থ অনুমান।" *

যদি রামমোহন "রাজনীতিক নেতা" হইতেন, অথবা কেবল "সমাজ-সংস্কারক" হইতেন, তবে তাঁহার চরিত্রের দোষগুলির কথা এস্থলে তুলিতাম না। রাজপুরুষ বা সমাজপতিদের সঙ্গে খেলিতে "ডিপ্লোমেসি" বা ডুপ্লিসিটি (কূটনীতি) আবশ্যক। কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারক হইতে হইলে পূতচরিত হইতে হইবে—"স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়তি?" অতএব রামমোহন সম্বন্ধে এই সকল অপ্রিয় সত্য বলা প্রয়োজনীয় মনে করিলাম।

যদিও রামমোহন স্বীয় যাদৃচ্ছিক আচার-ব্যবহার দ্বারা তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের নিকটে এক উদ্ভট আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তথাপি ব্রহ্মোপাসনাকারীর দল হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক একটা সমাজরূপে বিবেচিত হউক, এইরূপ অভিপ্রায় তাঁহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সেজন্য দায়ী তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম-সমাজের অভিভাবক স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* পণ্ডিত মহাশয় "ধনৈস্ত্যক্তঃ" এর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ধনাদি সম্পদ্ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে এইরূপ অর্থ-ই সঙ্গত। ফলতঃ রামমোহন রায় ধনাদি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন যথেষ্ট, কিন্তু শেষকালে পুত্র, দারা বিত্ত সমস্তই ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেশান্তরে এক প্রকার অসহায় অবস্থায় দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

ইঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের বন্ধু ছিলেন—রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভারও একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দ্বারকানাথ রামমোহনের সদৃশ বুদ্ধিমান্ ও রাজনীতিক ছিলেন—তবে "বাবুগিরিতে" অদ্বিতীয়ই ছিলেন। ভারতে ও বিলাতে মেমসাহেবদের বল্ পার্টি ইত্যাদিতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া প্রকাণ্ড সম্পত্তিটা ঋণজালে জড়িত করিয়া গিয়াছিলেন। পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পিতার দোষের উত্তরাধিকারী হন নাই বরং সাধুতা দ্বারা সাধারণের শ্রদ্ধাভাজনই ছিলেন। রামমোহনের ন্যায় পাণ্ডিত্য ইঁহার ছিল না—কিন্তু ইনি চতুর ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন।

পিরালী শ্রেণীভুক্ত বলিয়া ইঁহার সঙ্গে সাধারণ হিন্দুসমাজের বন্ধন তত দৃঢ় ছিল না—তাই এই ব্রহ্মোপাসনাকারী দলটিকে সম্প্রদায়-বদ্ধ করিয়া একটি ভিন্ন 'সমাজ'রূপে পরিণত করিতে ইঁহার নিজের তেমন ক্ষতির কোনও কারণ ঘটে নাই, বরং এই নূতন সমাজে "আচার্য্য"রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া "মহর্ষি" * উপাধি ভূষিত হইতে পারিয়াছিলেন। ইঁহার পরিচালনায় ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে "বেদান্তের" প্রভাব ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া "থিওডোরপার্কার" (ইউনিটারিয়ান্ খৃষ্টান) প্রভৃতি পাশ্চাত্যদিগের প্রভাব ঐ সমাজে আসিতে আরম্ভ হইল। ইঁহার প্রণীত অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে 'সমাজ'ভুক্তগণের পারিবারিক নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য হইতে লাগিল। তবে ইনি হুঁশিয়ার লোক ছিলেন— জাতিভেদের সম্পূর্ণ বিলোপ, অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদির পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলতঃ ব্রাহ্ম-সমাজকে সংস্কারক সমিতিতে পরিণত করিবার কাজ ইঁহার দ্বারা হয় নাই—সেই কাজ করিয়াছিলেন— কেশবচন্দ্র সেন।

---

* এই মহর্ষি উপাধি গ্রহণে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুসাধারণের নিকটে কতকটা অশ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ব্যক্তিও ঋষি [illegible]।

কেশবচন্দ্র অতিশয় প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিতে ও বলিতে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি এদেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন; তবে ইংরাজীতে তাঁহার যেরূপ অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল সংস্কৃতে সেরূপ কিছুই ছিল না। লোকের চিত্তাকর্ষণেও তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল—বহু শিক্ষিত যুবক তাঁহার আকর্ষণে তৎসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন—অনেকে আজীবন তাঁহার প্রতি ভক্তিভাব পোষণ করিয়া গিয়াছেন। এত বড় ব্যক্তির ভিতরেও কিছু খাদ ছিল তাহা অন্তর্দর্শী ভিন্ন সহজে কেহ ধরিতে পারিত না। * পরিশেষে তাহা তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ব্যাপারে ধরা পড়িয়া গেল।

---

* এস্থলে একটি গল্প বলিতে হইল। কলিকাতার উপকণ্ঠে উল্টা ডিঙ্গীতে নবকিশোর গুপ্ত নামে এক সাধু থাকিতেন, কেহ তাঁহার নিকটে গেলে উহার ভিতরের ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি গান বাঁধিয়া গাইতেন। কেশববাবু ঐ সাধুর সংবাদ শুনিয়া একদা তাঁহাকে দেখিতে যান। সাধু তাঁহাকে দেখিয়াই গাইলেন—

রাগিণী ললিত—আড়া।

"আয় সখি যদি দেখ্‌বি তোরা কুকীর্ত্তন কীর্ত্তনের ধারা।
দৃষ্টি মাত্র নাই কেশবে—কেশবে সুখ্যাতি ভরা।
প্রভুর মর্ম্ম প্রভু জানে, গোঁসাই বিনে কে বাখানে,
পশেছে যাদের পরাণে, আছে তারা জীয়ন্তে মরা॥
জীবে কি তেমন আছে, মণির কি তুলনা কাচে,
একথা বলব কার কাছে, ব্যর্থই মিছে অবোধ মারা।
সংকীর্ত্তন করিয়ে ভবে, যেমন নিস্তারিবে জীবে,
বিনে সে চরণে ডুবে, ইচ্ছা কেবল ন'য়ের গোরা॥"

কেশববাবুর সময়েই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান আকারে দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ইহার উন্নততম অবস্থাও ইহারই সময়ে—অধঃপাতও ইহারই সময়ে ঘটিয়াছে।

কেশববাবুর মোহকরী বক্তৃতা শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া উচ্চশিক্ষিত নব্য দল (তন্মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একজন) ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন—ভারতবর্ষময় এই ধর্ম্ম তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ প্রচার করিয়া বহু লোককে নবধর্ম্মে টানিয়া আনিলেন। সুদূর পল্লীগ্রামে

শিশু বই না মানুষ মিলে, দলে দলে প্রচুর চলে,
মদ অহঙ্কারে ফুলে, আত্মতত্ত্ব হ'য়ে হারা।
নিশানে অদ্বৈত গোঁসাই, গৌর-নিতাইর খোঁজ খবর নাই,
কোথা রৈল তারা দুভাই, ভেবে ভেবে হলেম সারা ॥ ২ ॥
কাল যৌবনের স্রোতে মিলে, ভাস্‌তেছে অগাধ সলিলে,
দুদিন বই অন্তিম কালে, এজাল জালে পড়বে ধরা।
মহাজনের যে প্রণালী, তুরীভেরী সে সকলি,
নাম গানে সাক্ষাৎ কলি, কেবলি বক্তৃতায় সারা ॥ ৩ ॥
শূন্যে শুনে বায়স শিবে, পশ্চাতে ধায় মহোৎসবে,
না জানি কার ভাগ্য হবে, নীরে রবে কি লাগ্‌বে কিনারা।
বিনে প্রভুর পদাশ্রিত, যেতে মানা অনাহূত,
ইয়ং বেঙ্গল যত, রবি-সুতের ভয়ে সারা ॥ ৪ ॥

কেশববাবু এই সাধুর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন "আমি বৈষ্ণব—আপনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে গিয়া শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করুন, দুর্য্যোগ কাটিয়া যাইবে—কেননা শক্তিমন্ত্র সমধিক তেজঃসম্পন্ন"। ইহাঁরই কথায় নাকি কেশববাবু পরমহংসদেবের নিকটে গিয়াছিলেন। (এটি কোনও সাধক ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত; সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।)

পর্য্যন্ত রব উঠিল—জাত মারলে তিন সেন—ইষ্টিসেন, উইলসেন আর কেশব সেন। (ইষ্টিসেন অর্থাৎ রেল-জাহাজ, উইলসেন—বিখ্যাত হোটেল)। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিরোধ ঘটাতে দেবেন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র দল "আদি ব্রাহ্ম-সমাজ" এই নামে অভিহিত হইয়া কোণ ঠেসা হইয়া পড়িল।

১৮৭২ ইংরাজীতে যখন ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন পাস হইল—তখন ব্রাহ্মরা যে হিন্দু নহেন একথাটা ঐ আইনের সিধ্যেই প্রতিপাদিত হইয়া পড়িল। সেই হইতেই বোধ হয় ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। আদি সমাজের রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস আবিষ্কৃত হইলেন—লোকে দেখিল "ভবতারিণী" মূর্ত্তির নিরক্ষর পূজক কিরূপে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতে সমর্থ হইলেন। এদিকে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে অল্‌কট্ ব্লেভেট্‌স্কি প্রভৃতির দল আসিয়া আর্য্য শাস্ত্রোক্ত যোগ যাগের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কেশববাবুর কন্যার বিবাহ ব্যাপারে ব্রাহ্ম-সমাজে দলাদলির হলাহল উত্থিত হইল। কেশব-বিরোধী দল 'সাধারণ' ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিলেন; কেশব নিজের দলকে 'নববিধান' সংজ্ঞিত করিয়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজের নেতার ন্যায় 'কোণ ঠেসা' হইয়া পড়িলেন।

এই সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় হইলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ ও বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিয়া গেলেন—আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি কতিপয় শক্তিশালী ব্যক্তি অর্থ সামর্থ্য দ্বারা ইহার পরিপোষক হইলেন। খুব উৎসাহের

সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতে লাগিল; এবং অনেক অপক্ব-বয়স্ক যুবক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন রোগ প্রবল হয় ভগবদ্বিধানে ঔষধও ভূরি পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার কতকগুলি কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (যথা পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের ও "থিয়সফির" আবির্ভাব, ইত্যাদি)। আবার হিন্দু ধর্ম্মের সংরক্ষণার্থও ধর্ম্ম বক্তৃগণ আবির্ভূত হইলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের* নাম এস্থলে সাদরে উল্লেখ যোগ্য। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের সম্পাদকতায় বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী শাস্ত্র প্রকাশক গ্রন্থাবলী প্রচারিত করাতে রামমোহন রায়ের সময় হইতে শাস্ত্র বাক্যের যে অপ-ব্যাখ্যা হইতেছিল, তত্ত্বান্বেষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজে গ্রন্থ পড়িয়া তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি অত্যুচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত মনস্বিবর্গ সমাজের অনুকূল প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া হিন্দু সাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। আবার 'পঞ্চানন্দ'

* শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। কত লোক যে তাঁহার বক্তৃতায় স্বধর্ম্মানুরাগী হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাঁহার গুরু দয়াল দাস বাবাজীর তিরোধানের পরে সম্ভবতঃ তাঁহার ভাবের ঘরে কিছু চুরি হইয়া গেল—তাই তাঁহাকে পরিণামে জেলখানার লাঞ্ছনা ভোগও করিতে হইয়াছিল। তিনি শ্রীজগদম্বার প্রিয় সন্তান ছিলেন; আদরের ছেলেও দুষ্টামি করিলে মা দু একটা কীল চাপড় দিয়া একটু শাসন করিয়া কিছু কাল কাঁদাইয়া পশ্চাৎ কোলে তুলিয়া লয়েন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের সম্বন্ধেও জগজ্জননী এই ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

চন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, থিয়েটারের প্রহসনাদিও ব্রাহ্ম সংস্কারকদিগের বৈদেশিক ভাবের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদনে কম সহায়তা করে নাই।

ব্রাহ্মগণের মধ্যে কতিপয় প্রধান ব্যক্তির আচরণে ও মত পরিবর্ত্তনেও ঐ সমাজের অতিশয় ক্ষতি হইল। কেশব বাবুর আচরণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এই নূতন দলেরও দু একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অপরাধ লোক সমক্ষে ধরা পড়িল। সুপ্রসিদ্ধ ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাহার সমালোচনার কথা অনেকের মনে পড়িবে। কেহ কেহ মানহানির মোকদ্দমা আনিয়া সম্মান রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু পাঁক পুঁছিলেও দাগ সহজে যায় না—বিশেষতঃ—

মৃষা বা সত্যং বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।

ব্রাহ্ম প্রচারকগণ অনবরত হিন্দু সমাজের মধ্যে জনগণের গলদ খুঁজিয়া পত্রিকাদিতে কোথায় কোন্ কুলরমণীর কলঙ্ক ঘটিল, তাহা রটাইয়া, বিশেষতঃ আপন সমাজটী "উচ্চতর আদর্শ প্রদর্শন নিমিত্ত" আবির্ভূত হইয়াছে, উচ্চকণ্ঠে এইরূপ ঘোষণা করিয়া, হিন্দু সাধারণের অশ্রদ্ধাভাজন হইতে লাগিলেন; সে জন্য তাঁহাদের সমাজের অতি সামান্য কুৎসাও সাধারণ্যে প্রচার লাভ করিতে লাগিল।

এদিকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও রামকুমার বিদ্যারত্ন দুই ব্রাহ্ম মহারথ যথাক্রমে বৈষ্ণব ও শাক্ত মহাত্মা রূপে হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশ করাতে ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়ের বহু অনুরাগী ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের অনেকে এমনই "হিন্দু" হইলেন যে সমাজস্থিত "গোঁড়া" হিন্দুরাও ইঁহাদের আচার অনুষ্ঠান দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ইহাই ভগবানের লীলা।*

* সেদিন গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য বারাণসী হইতে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন যে ৺গোস্বামী মহাশয় চিঠি লিখিয়া শিষ্য

আবার অমৃতবাজারের প্রতিভাশালী শিশিরকুমার ঘোষেরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর গণভুক্ত হইয়া পড়িলেন; প্রবীণ ব্রাহ্ম কালীনাথ দত্ত "গুরু ও সাধন-তত্ত্ব" লিখিয়া গুরুবাদ সমর্থন করিলেন। এমন কি ব্রাহ্মসমাজের স্তম্ভস্বরূপ আনন্দমোহন বসু মহাশয়ও. শেষকালে শরণ গ্রহণার্থ মহাপুরুষ খুঁজিয়াছিলেন।* যাঁহারা তত্ত্বপিপাসু হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই ব্রাহ্ম-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে মাত্র কাজ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ফলতঃ কেবল চরিত্র নির্ম্মল রাখিলেই চলে না—ক্ষেত্রটি পরিষ্কার থাকিলেই হয় না—ইহাতে

নাম দস্তখত করিবার সময়ে লিখিতেন "শাস্ত্রও সদাচার পালনকারী সজ্জনগণের দাসানুদাস শ্রী—"। তিনি আরো লিখিয়াছেন, দীক্ষা দিবার সময়ে তিনি (গোস্বামী মহাশয়) প্রত্যেক সাধনপ্রার্থীকে প্রথম উপদেশ দিতেন "শাস্ত্র বাক্যে অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করিবে।" এক সময়ে তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। 'দেখুন, শাস্ত্র ও সদাচারের কথা উঠিলেই দেখিতে পাই আপনি উন্মত্তের মত হইয়া যান, সহস্র মুখে উহার প্রশংসা করেন। এত বেশী জোর দিয়া বলেন কেন?' তিনি বড়ই দুঃখের সহিত হাসিয়া বলিলেন—'জানিবে, যার যেখানে ঘা, তার সেখানে ব্যথা। এক সময়ে আমি এই শাস্ত্র ও সদাচারের বিরুদ্ধে কত কথা বলিয়াছিলাম। সে ব্যথা আজও আমার বুকে শেল সম রহিয়াছে। তাই শাস্ত্রের কথা উঠিলে আমি আর নিজকে সামলাইতে পারি না। অন্ধের মত যদি শাস্ত্র মানিয়া যাইতে পার, তবেই বাঁচিয়া যাইবে। সাধনে একটু অগ্রসর হইলে কারণ বুঝিবে ঋষিরা কিরূপ প্রকৃতদর্শী ছিলেন।'

* সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এ বিষয় সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ময়মনসিংহ হইতে প্রচারিত "সৌরভ" পত্রিকায় ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যায় (২০০-০১ পৃষ্ঠা) "আনন্দমোহন বসুর মহাপুরুষবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিবেন।

ঈপ্সিত বীজ বপন করা চাই—নচেৎ ইহা উষর ভূমিতে পরিণত হইবারই সম্ভাবনা—অথবা অনীপ্সিত আগাছায় ভরিয়া যাইবে।

ব্রাহ্মসম্প্রদায় আর একটি কারণে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। সেটি হিন্দুসমাজের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। নিয়তি বশতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা অতি প্রবলভাবে ভারতবর্ষে আসিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনের মূল কারণও তাহাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাদির যতই প্রচার হইতেছে ততই 'ঘরে বাহিরে' সনাতনধর্ম্মের রীতি নীতি শিথিলমূল হইতেছে। আবার "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরে জনঃ"—এই নীতিতেও, শক্তিমান্ রাজপুরুষ ইউরোপীয়গণের আচার-ব্যবহার অধীন জাতি অবিচারে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে জন্য সমাজে এক ঘরে হইতে হইত—সেই নিমিত্ত এখন কেহ শাসিত হয় না—শাসন করিবার লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে; রাজা জমিদারগণ অনেকেই ইউরোপীয় চালচলনের পক্ষপাতী। 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছেন—যাঁহারা আছেন তাঁহারাও প্রায়শঃ আশ্রয় শূন্য হইয়া হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছেন—"বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ"। অতএব ব্রাহ্ম-সমাজে ঢুকিলে যে সকল যাদৃচ্ছিক আচরণে নির্ব্বাধ অধিকার জন্মিত তাহা সমাজে থাকিয়াই পাওয়া যাইতেছে—সকলেই ত কেবল 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা' দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে ভুক্ত হইত না! এখন অবস্থা প্রায় এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, আচারবান্ হিন্দুর শহরবাস নিতান্তই অসুবিধা-জনক হইয়াছে—শহরে 'এক ঘরে'র ন্যায় থাকিতে হইতেছে।

কোন ব্রাহ্ম মহোদয়কে বলিতে শুনিয়াছি, যে, ব্রাহ্ম-সমাজের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে—হিন্দু-সমাজের ভিতরে ব্রাহ্ম ভাব ঢুকিয়াছে—ইত্যাদি। আমার বোধ হয় ইহাতে ব্রাহ্মদের শ্লাঘার কোন কারণ, নাই; রামমোহন রায় বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা বেদান্ত মত

উড়াইয়া দেওয়ার পরেও যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হইয়াছেন— সকলেই ব্রহ্ম উপাসনাকেই ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান কার্য্য মনে করিয়াছেন; এটাই ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষত্ব। নচেৎ সমাজ-সংস্কারের যে প্রোগ্রাম তাঁহারা ধরিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্য রীতি নীতির প্রচার মাত্র—খৃষ্টান পাদরী এবং ব্রাহ্ম সংস্কারক এ বিষয়ে সম্পূর্ণ এক। এমন কি, কয়েকটি বিষয় ছাড়া, মোসলমানগণও ৭।৮ শত বৎসর কাল তাদৃশ আদর্শই প্রদর্শন করিতেছিলেন। সেই "ব্রহ্ম উপাসনা" হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে নাই। লোকে এখন হয় উচ্চপদস্থ সুবহু ইউরোপীয়দের ন্যায় "ফি থিঙ্কার" হইতেছে, নয় মেসোপটেমিয়ায় গিয়াও দুর্গোৎসব করিতেছে। বরং ব্রাহ্ম-সমাজেরও "বেদী-ভঙ্গ" হইতেছে—এবং নব্যগণের উদ্দাম আচার-ব্যবহার এবং প্রার্থনাপরায়ণতায় বিমুখতা দর্শনে অনেক প্রবীণ ব্রাহ্ম মহাশয়দিগকে আক্ষেপ করিতে দেখিতেছি।

ব্রাহ্ম-সমাজের এই চরমযুগে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সমাজ-তরির কর্ণধাররূপে বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রাণপণে ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, উত্তম লেখক এবং বিশিষ্ট বক্তা পণ্ডিত শিবনাথের ন্যায় ব্রাহ্ম-সমাজে খুব কম লোকই ছিলেন। তদীয় চরিত্রে দৃঢ় অধ্যবসায় অথচ ত্যাগ ও সংযমই পরিলক্ষিত হইত। এজন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারার্থ তিনি বক্তৃতা প্রদান এবং পুস্তিকা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সাধারণ সাহিত্যসেবা ব্যপদেশেও নানা গ্রন্থে এমন কি গল্পেও ব্রাহ্ম-সমাজের ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজীতে ব্রাহ্ম-সমাজের একখানি ইতিহাসও লিখিয়া-ছিলেন। পরিশেষে আত্মজীবন-চরিত প্রকাশ করিয়া স্বীয় সমাজের সেবা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন।*

* তদীয় 'যুগান্তর' নামক উপন্যাসখানি দ্বারা তিনি অর্জ্জিত

পরন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে হিন্দু সমাজের 'অহি-নকুল' সম্বন্ধ। হিন্দুর প্রতিমা পূজা, হিন্দুর জাতি বিচার, হিন্দুর বিবাহ বিধি প্রভৃতি প্রায় সমস্তই ব্রাহ্ম-সমাজের আক্রমণের বিষয়। তাই পণ্ডিত শিবনাথ সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা করাতেই তাঁহার দ্বারা হিন্দু সমাজের অপকারও তেমনই অধিক হইয়াছে, একথা অকপটে বলিতেই হইবে।

তিনি অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জাত হইয়াও কেন যে এইরূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবিরোধী ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন তাহার কারণ অনুসন্ধান চেষ্টা আমাদের সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। *

হিন্দু সমাজেরও একটু উপকার করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু পরিবার ব্রাহ্ম পরিবার পাশাপাশি চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু পরিবারের চিত্রখানিই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে,—অথচ এই চিত্রখানি নেহাত কল্পিতও নহে। তুলনায় সনাতন সমাজ ব্যবস্থারই সুতরাং জয় হইয়াছে।

* এস্থলে একটি বিষয় উল্লেখের আবশ্যক মনে করি। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত (ইংরেজী গ্রন্থ) পড়িয়া এই সমাজ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিবার সংকল্প হয়। তৎপর তাঁহার আত্ম-চরিত প্রকাশিত হইলে ইহা পাঠ করিয়া সংকল্প দৃঢ় হয়। দুএকটা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া লিখিবার উপক্রম করিবার পূর্ব্বেই শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমন শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার জীবদ্দশায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলেই নানা কারণে শোভন হইত—কিন্তু ভগবদিচ্ছা অন্যরূপ, কি করা যায়! শাস্ত্রী মহাশয় পরলোক প্রস্থিত হইলেও তাঁহার কার্য্যের ফলাফল বর্ত্তমান রহিয়াছে—বিশেষতঃ তাঁহার আত্মচরিত দ্বারা তিনি আমাদের সমক্ষেই বিদ্যমান আছেন মনে করিতেছি। তাই অচির-মৃতের সম্বন্ধে ঈদৃশ সমালোচনা তেমন

পণ্ডিত শিবনাথ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গের বৈদিক শ্রেণীর স্বল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় শ্রেণীর বিশাল সমাজের তুলনায় অধিকতর শাস্ত্রানুগত আচারব্যবহারপরায়ণ বলিয়া প্রখ্যাত। পণ্ডিত শিবনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ পণ্ডিত ও সাধু চরিত্র ছিলেন। প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার একজন মহাত্মা লোক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—

"আমি জ্বরে পড়িলে বা অন্য কোনও প্রকার পীড়াতে আক্রান্ত হইলে আমার মা সন্ধ্যাকালে আমাকে লইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া দিতেন এবং পীড়ার কথা জানাইতেন। তৎপরে প্রপিতামহদেব আমার দেহে হাত বুলাইতে ও ঝাড়িতে আরম্ভ করিতেন, সমগ্র দেহে ফুৎকার দিতেন এবং মুখে মুখে ইষ্ট দেবতার স্তব আবৃত্তি করিতেন। আমার বোধ হয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঝাড়িয়া দেওয়াতে অনেক সময়ে আমার জ্বর সারিয়া যাইত। × × × × আমি আর কি বলিব, তাহার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে; অনেক মানুষ দেখিয়াছি, নিজে অনেক ভ্রমপ্রমাদ করিয়াছি; কিন্তু যখনই সেই সাধুপুরুষের সেই ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করি তখনই নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া লজ্জাতে অভিভূত হইয়া যাই। বহু বর্ষ পরে যখন আমার মা কাঁদিয়া বলিতেন "হায়রে এমন সাধু পুরুষের এত আশীর্ব্বাদ কি বৃথা গেল?" তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিতাম না। মনে মনে বলিতাম, "হায়রে তিনি তাঁর ইষ্ট দেবতাকে যেমন অকপটে মা বলিতেন, আমি কেন তেমন করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে পারি না?" (৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা)। তাঁহার জননীর ধর্ম্মভাবসম্বন্ধে লিখিয়াছেন "ধর্ম্মসাধন তাঁহার প্রতিদিনের প্রধান কার্য্য ছিল। মাটি দিয়া শিব গড়িয়া

শোভন না হইলেও, তাঁহার সমাজ সংসৃষ্ট কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা যথাযথ আলোচনা হইতে বিরত হওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম।

নিত্য পূজা করিতেন, সে পূজাতে অনেকক্ষণ থাকিতেন ; খাবার অন্ন ঠাকুরদিগকে নিবেদন না করিয়া কাহাকেও খাইতে দিতেন না। তারপর বিশেষ বিশেষ দিনে ব্রত নিয়ম উপবাসাদি চলিত।" (৪৬ পৃষ্ঠা)।

একবার বালক শিবনাথের পীড়ার সময়ে ইষ্ট দেবতার চরণে প্রণত হইয়া হাতে মাথাতে ধূনা পোড়াইবার এবং বুকের রক্ত দিয়া দেবতার স্তব লিখিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি যে ভাবে ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা দিয়া পণ্ডিত শিবনাথ লিখিয়াছেন—"মায়ের বয়স তখন ২৩ কি ২৪ বৎসরের অধিক নয়। ২৪ বৎসরের বালিকার * ঐ মানসের কথা যখন স্মরণ করি তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে ভাবি, এই ধর্ম্মনিষ্ঠা আমার কৈ ?" † (২৫ পৃষ্ঠা)।

এইরূপ আর একবার যৌবনে যখন ক্ষয়কাশের পীড়া হয় তখনও তাঁহার জননী প্রপিতামহের লাঠি, জপমালা, যোগপট্ট প্রভৃতি শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং রোগ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এগুলি সরান নাই। তখনও জননী ইষ্ট দেবতার পূজা ইত্যাদি দ্বারা রোগমুক্তির সহায়তা করিয়াছিলেন। (২২৮-২৯ পৃষ্ঠা)।

আবার তাঁহার মাতামহী সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ লিখিয়াছেন "বলিতে কি তাঁহাকে আমি যখন স্মরণ করি তখন আমার হৃদয় পবিত্র

* পণ্ডিত শিবনাথের এই উক্তিতে হাস্য সংবরণ করা যায় না—'২৪ বৎসরের বালিকা !' তাও আবার নিজের মায়ের সম্বন্ধে। জেঠামি আর কাকে বলে ? তিনি স্বয়ং সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিবার সময় কত বয়সের ছিলেন ?

† লক্ষ্যের বিষয় এই যে প্রপিতামহ ও জননীর এই ধর্ম্ম জীবনের নিকটে পরাভব স্বীকার করিয়াও পণ্ডিত শিবনাথ স্বাবলম্বিত "অভিনব পন্থা" আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন—অপরকেও তাহাতে টানিতে কসুর করেন নাই !

ও উন্নত হয়, এবং একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমাতে যে কিছু ভাল আছে তাহার অনেক অংশ তাঁহাকে দেখিয়া পাইয়াছি।" (১৬ পৃষ্ঠা)

তাঁহার মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বঙ্গ-বিশ্রুত ব্যক্তি ছিলেন—'সোমপ্রকাশ' ও 'কল্পদ্রুম' সম্পাদন করিয়া তিনি যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, গাম্ভীর্য্য, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ইত্যাদি বহু সদ্‌গুণ ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার পিতা—শিবনাথের মাতামহও—কলিকাতার ডেভিড হেয়ারের বঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন।

তাঁহার পিতৃদেব—হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়—কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, পরে পণ্ডিতী চাকরি করিতেন। তিনিও তেজস্বী চরিত্রবান্ অধ্যবসায় সম্পন্ন লোক ছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই যে এইরূপ পিতৃকুল মাতৃকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শিবনাথ সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের বিদ্রোহী কিরূপে হইলেন? শৈশব হইতে তিনি সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত স্ত্রীপুরুষ আপন পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দেখিয়াছেন; তিনি "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ" সেই 'সতাং মার্গং' ছাড়িয়া কেন এই উদ্ভট ধর্ম্ম ও অভিনব সমাজের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করিলেন? যথাসাধ্য এই প্রশ্নের সমাধানার্থে চেষ্টা করা যাইতেছে।

অবশ্য অদৃষ্ট বাদী হিন্দু সর্ব্বাদৌ "প্রাক্তনের" উপরই এইরূপ ব্যাপারের দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। কিন্তু প্রাক্তনের ফল-বিধাতা যিনি, তিনিতো তদনুসারেই জীবের জন্মপরিগ্রহের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—যেমন, "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।" প্রশ্ন হইবে, হিরণ্যকশিপুর গৃহে 'প্রহ্লাদ' আসিলেন কোথা হইতে? উত্তর—হিরণ্যকশিপু যে-সে ব্যক্তি ছিলেন না—কশ্যপের

পুত্র বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল—শাপে মাত্র 'অসুর' হইয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যার শক্তি কত ?

সে যাহা হউক, পণ্ডিত শিবনাথের পিতৃমাতৃকুল সদাচার বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশ হইলেও, তাহাতে সুব্রহ্মণ্যের হানিকর ব্যাপার কলি-প্রভাবে সম্প্রবেশ হইয়াছিল। দুই বৎসরের ছেলের সঙ্গে এক বৎসরের মেয়ের বিবাহ প্রস্তাব এবং দ্বাদশবর্ষীয় বালকের সঙ্গে একাদশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ সম্পাদন আর্য্য শাস্ত্রের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। বৈদিক-সমাজে ঐরূপ শৈশব বিবাহ ঢুকিয়াছিল। পাঠ সমাপ্ত করিয়া ৩০ বৎসরের পুরুষের দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহের বিধি অক্ষুণ্ণ রাখার ফল এবং ১১।১২ বৎসরের সমবয়স্ক বালক বালিকার বিবাহের ফল ঠিক একই হইতে পারে না। পাত্র বিশেষে এরূপ সমবয়স্ক স্বামী স্ত্রীতে হয়ত গুরু শিষ্যার ভাব পূর্ণ ভাবে প্রকট হইতে পারিত না। তন্নিমিত্তে তাঁহাদের উৎপাদিত সন্তানে একটু ভক্তির ত্রুটি জনিত "জেঠামি" আসিয়া পড়িত। বস্তুতঃও এই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের ছেলেদের মাকে "পাঠী" বলিয়া ডাকিতেও শুনা গিয়াছে (আত্মচরিত ২৫ পৃষ্ঠা)। কাল প্রভাবে, কলিকাতার সংশ্রবে, সংস্কৃত "কলেজের" শিক্ষার ধরণে অনেক ছেলের মধ্যেই জেঠামি (অনভিজ্ঞের অভিজ্ঞতার গর্ব্ব) ঢুকিতেছিল। ইংরাজী "ওল্ড ফুল" শব্দ ভারতে মহানিষ্ট করিয়াছে—শিক্ষার এবং বহুদর্শনের উপর শ্রদ্ধা কমাইয়া দিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথও "শিবেজেঠা" নামে খ্যাপিত হইয়াছিলেন (আত্মচরিত ৫৫ পৃষ্ঠা)।

শিবনাথের পিতাঠাকুর ও মাতামহ মহাশয় উভয়েই চাকরি গ্রহণ করিয়া কৌলিক ব্যবসায় হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন,—চাকরিতে যে পরাধীনতা আসে তাহাতে ব্রাহ্মণত্বের হানি জন্মে।

যার বংশ যত পবিত্র, সামান্য ব্যত্যয়েও তাঁর ততই বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। খাঁটি দুধে সামান্য গোমূত্রের ছিটা পড়িলেই নষ্ট হইয়া যায়—

বিকৃত দুগ্ধে সমধিক গোমূত্রেও আর নূতন কিছু হয় না। চিরাচরিত রীতির ব্যতিক্রম করিয়া চর্ম্মপাদুকাদি গ্রহণ করিয়া পিতা হরানন্দ গ্রামে "সাহেব" সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন (৩য় পৃষ্ঠা)। পণ্ডিত শিবনাথ পিতৃচরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে পিতাকে একজন 'গোঁয়ার' গোচের লোক বলিয়াই বোধ হয়—কথায় কথায় নির্দ্দয় প্রহার হইত;—এমন কি একবার শিবনাথের প্রাণান্ত ঘটিবারও সম্ভাবনা হইয়াছিল!

অপিচ আমরা দেখিতে পাই যে যখন গ্রামে ব্রাহ্মেরা বালিকা বিদ্যালয় খুলিলেন, তখন শিবনাথের পিতামাতা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের মেয়েদিগকে অসঙ্কোচে ঐ ব্রাহ্মদের স্কুলে পাঠাইলেন। মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুহৃৎ ছিলেন; অনুমান করা যায় যে সম্ভবতঃ তাঁহার মতের তীব্র বিরোধী ছিলেন না। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে যে যখন শিবনাথের ঘটকতায় এক বিধবা বিবাহ হইল এবং বিধবার স্বামীর উপরে সামাজিক নির্য্যাতন আরম্ভ হইল, তখন শিবনাথ উহার সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতে চাহিলেন, এবং পিতা নিষেধ করিলেও মাতুলের * অভিমতি অনুসারে ঐ পরিবারে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন; ইহাতে শিবনাথের ভবিষ্যৎ পরিষ্কার হইল। আবার ইহাও দেখিতে পাই যে পিতা ছেলের নিকটে সংস্কৃত নাস্তিক দর্শনের রীতি অবলম্বনে নাস্তিকতা প্রচার করিয়া বলিতেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় আস্তিক নহেন,' ইত্যাদি (আত্মচরিত ১০৪ পৃষ্ঠা)। দার্শনিক নাস্তিক মতের চর্চ্চার সহিত কোন কোন অধ্যাপক পণ্ডিত গতানুগতিকতা এবং সামাজিকপ্রীতি নিবন্ধন আচারনিষ্ঠ থাকেন বটে কিন্তু অনাচারী ইংরাজদিগের মধ্যে

* শিবনাথের উপবীত ত্যাগের পরে এই মাতুলই বলিয়াছিলেন—"ইহার ধর্ম্মাত্মতা হইয়াছে!" (আত্মচরিত ১৩৫ পৃষ্ঠা)

ঐহিক উন্নতি দর্শনে মুগ্ধ নগরবাসীর আস্তিকতা ও শাস্ত্রে বিশ্বাস ভিন্ন সদাচার রক্ষার অন্য সহায় নাই। সুতরাং পিতার এরূপ আচরণে তরুণ পুত্রের পৈতৃক ধর্ম্মে অনাস্থা হওয়া বিচিত্র নহে! ফলতঃ ইহারই অব্যবহিত পরে মানসিক অবসাদ দূরীকরণের ঔষধ স্বরূপ মার্কিন পণ্ডিত থিওডোর পার্কারের শরণাপন্ন হইতে পুত্রকে দেখা গেল—তারপর যাহা হইবার হইল! ক্রমশঃ পুত্র ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিতে লাগিলেন।

তখন শিবনাথ "আর ঠাকুর পূজা করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী গেলে পর, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুর ঘরে পাঠাইবার জন্য 'লাঠি' লইলেন। কিন্তু পুত্র অটল রহিলেন—শেষে পিতাই হার মানিলেন, পুত্র চিরদিনের নিমিত্ত মূর্ত্তি-পূজা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

এস্থলে আর একটি পিতাপুত্র সংবাদ আমাদের মনে পড়িতেছে—তাহা উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করিলাম। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল রাত্রিতে ঠাকুরের আরতি হয় নাই কেন?" পুত্র উত্তর করিলেন, "উহা পৌত্তলিকতা!"

এরূপ বিসদৃশ উত্তরেও পিতা পুত্রের প্রতি কোনরূপ তিরস্কার বাক্যের প্রয়োগ না করিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, "বিশ্বাস না হয় করিও না, ভক্তি ব্যতীত অশুচি মনে ঠাকুর ঘরে যাইতে নাই; তুমি আরতি না করিয়া ভালই করিয়াছিলে; ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কপটতা চলে না। কিন্তু এমন মন তোমার বেশী দিন থাকিবে না।" তারপর পিতা ব্যবস্থা করিলেন ভোরে উঠিয়া প্রত্যহ পিতাপুত্রে গঙ্গাস্নান করিতে যাইবেন—পথে কথোপকথন চলিবে।

পুত্র ভাবিয়াছিলেন নূতন মতের জন্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়; তাই তজ্জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। কিন্তু দেখিলেন লাঞ্ছনা ভর্ৎসনা কিছুই হইল না।

সেদিন বৈকালে পুত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বিশ্বাস না হইলে করিও না" এই উদার কথা মিশনারীরাও বলে না। আচারবান্ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পিতা এমন উদারমতি হইয়াও সর্ব্বদা দেবদেবীর পূজার্চ্চনা ভক্তিভরেই করিয়া থাকেন। খৃষ্টান হইলে এরূপ পিতার মনে ভয়ানক বেদনা দেওয়া হইবে।" পুত্রের চক্ষে জল আসিল—তখন সেণ্টপলের উক্তি স্মরণ হইল, "পিতামাতার উদ্ধার সাধনের জন্য আমি নরকে যাইতেও প্রস্তুত আছি।"

যাহা হউক, পরদিন হইতে নিয়মিত গঙ্গাস্নান আরম্ভ হইল—পিতাপুত্রে পথিমধ্যে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ধর্ম্ম বিষয়ে কোনও কথা হইত না। এভাবে কিছুদিন গেলে পরে, পিতা একদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কৃষ্ণ বন্দ্যোর সহিত একত্র বসিয়া অখাদ্য খাইয়াছ, লোকে বলিতেছে, একথা কি সত্য"? পুত্র বলিলেন, "না আমি খাই নাই—যে খাদ্য আমি আপনার সম্মুখে খাইতে পারিব না আমি তাহা কখনই খাইব না।"

গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্যে ও সৎপিতার সাহায্যে পুত্রের বিকার কাটিয়া গেল। সেই পুত্র আর কেহ নহে—বঙ্গের গৌরব ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় *

---

* ভূদেব চরিত্র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে এই আদর্শচরিত্র মহাত্মার (হিন্দুসমাজের মঙ্গলের জন্য) ধর্ম্ম রক্ষা কিরূপে হইয়াছিল তাহা বর্ণিত আছে। তাঁহার পিতা মহাপণ্ডিত এবং পরম সাধক ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ই দেশের এই মহোপকার করিয়াছিলেন। সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি সকলেরই মূল ৺তর্কভূষণ মহাশয়ের শিক্ষা।

ভূদেববাবু পুষ্পাঞ্জলির উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছেন:—হে স্বর্গীয় পিতৃদেব। তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগুরু। আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষা লাভ করিয়াছি, অপর কাহার নিকট শুনিয়া বা [illegible]

পণ্ডিত শিবনাথের প্রাক্তন অন্যরূপ ছিল—তাই তিনি "ভূদেব" হইতে পারিলেন না।

অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই।......যখন শাস্ত্রার্থ সকল শ্রবণ করিতাম তখন সংশয়াকুলিত হৃদয়াকাশ যেন বিদ্যুৎ প্রভায় আলোকিত হইত......আপাত বিরুদ্ধ মতবাদ সকল মীমাংসিত হইয়া সুপ্রশস্ত ব্যবহার প্রণালী জন্মিত......আমার অন্তর্বাহ্য তোমারই সংগঠিত বস্তু।" ঐ গ্রন্থের আভাসে লিখিয়াছেন "যোগাভ্যাসরত হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ অপরিসীম সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী, অন্তর্দর্শী এবং প্রকৃতদর্শী ছিলেন।"

উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ তাঁহার লিখিত একখানি ইংরাজী পত্রে আছে; তাহা কোমৎ মতবাদী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লিখিত হয়। এডুকেশন গেজেটে ঐ পত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল:—"যে ছয় মাসের মধ্যে হিন্দুকলেজে আমার দুইজন সহাধ্যায়ী খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন সেই সময় ভিন্ন এ সামঞ্জস্য-করণে কিছুমাত্র বাধা পাই নাই। আমি যেন দেখিলাম হিন্দুধর্ম্ম তাহার বাহুদ্বয় আমার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিতেছে; আমি যেন দেখিলাম আমার ত্রি অগ্নি মাতাপিতা ও গুরু। আমি দেখিলাম হিন্দুধর্ম্ম অনন্ত আকাশের ন্যায় বিশাল, অসীম কালের সহিত একাত্ম, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে সক্ষম! অধিকারী ভেদরূপ মহৎ বিধান আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং আমার রক্ষা হইয়াছিল।" তিনি নিজের কথা স্মরণ করিয়াই আচার প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন:—"গায়ত্রী জপে.........শুদ্ধ এই কথা আছে যে, যে ব্রহ্মতেজ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক আমরা সেই তেজের ধ্যান করি......সন্ধ্যার সম্বন্ধে বিশেষ বিধি "মন্ত্রার্থজ্ঞানে যতিতব্যং"—মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য যত্ন করিবে। যদি সন্ধ্যা-বন্দনার প্রকৃত অর্থবোধ বিলুপ্তপ্রায় না হইত তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ-সন্তানের কখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মতি হইতে পারিত না।"

শিবনাথ আত্মচরিতে তাঁহার উপবীত ত্যাগের পর তাঁহাকে প্রহার করার জন্য পিতার লেঠেল রাখা প্রভৃতি যাহাই লিখিয়া থাকুন, তাঁহার পিতার সম্বন্ধে তদীয় জ্ঞাতি জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই লেখককে একদা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

যখন শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বাড়ী আসিলেন, তখন পিতা বলিয়াছিলেন "তুমি আমার পুত্র, আমি তোমার পিতা, উভয়েই সমধর্ম্মা হওয়া উচিত। এস, আমার সঙ্গে বিচার কর, হয় আমাকে পরাস্ত করিয়া ব্রাহ্ম করিয়া লও, নয় তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ কর।" শিবনাথ এইরূপ ভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। তখন তাঁহার পিতা, ঐ একমাত্র পুত্রের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া তাঁহাকে বাড়ী আসিতে নিষেধ করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। *

---

* শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতখানি প্রথমবারে পাঠ করিয়াই আমি তদীয় প্রাগুক্ত জ্ঞাতি মহোদয়ের নিকটে চিঠি লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার কথিত বৃত্তান্তটি সত্য কি না—কেননা আত্ম-চরিতে এটার উল্লেখ নাই। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন :—"ঘটনাটি সত্য কিন্তু শিবনাথ যখন তাঁহার আত্মচরিতে তাহার উল্লেখ করেন নাই, তখন সে সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা না করাই ভাল।"

বলা আবশ্যক যে ইনি সরকারী কাজে উচ্চপদে ছিলেন এখন ৺কাশীবাসী হইয়াছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ জানিবার পূর্ব্বে (আশ্বিনের মধ্যভাগে) আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম। "পিতা এবং পুত্রে সমধর্ম্মা হওয়া উচিত"—এই কথাটা এতই সুন্দর যে উহা প্রচার না করিলে দেশের ক্ষতি। 'পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্'—শাস্ত্রীয় বিধি। শিবনাথ পিতার মত খণ্ডন করিতে পারিলে তিনি প্রকৃতই সানন্দে পুত্রের মত গ্রহণ করিতেন। প্রাচীনকালে সরলমনা ভারতের পণ্ডিতেরা এইরূপ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক শিবনাথের প্রাক্তন কর্ম্মফলেই তিনি পিতৃধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা প্রাক্তনেরই যে ফল তাহার বিশেষ প্রমাণ এই আত্মচরিতেই আছে। শিবনাথের যখন ৪।৫ বৎসর মাত্র বয়স, তখনই তিনি ঠাকুরদের নিবেদিত অন্ন খাইতে কোনও মতেই চাহিতেন না। এজন্য পিতামাতার প্রহার সহ্য করিলেও নিজের জেদ কদাপি পরিত্যাগ করেন নাই। পাড়ার মেয়েরা তাঁহার জননীকে বলিতেন—"তোমার পেটে একি কালাপাহাড় এসেছে!" শিবনাথের মাতা ছেলের আঁতুড় ঘরের গল্প বলিতেন। ছয় দিনের রাত্রে শিশুকে কোলে করিয়া রাখিতে হয়—নচেৎ জাত হরণীতে লইয়া যায়। মাতৃবক্ষে শায়িত হইলেও জননীর নিদ্রাসময়ে শিশু বুক হইতে সরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। জননী স্বপ্নও দেখিলেন, অপর এক স্ত্রী আসিয়া ছেলেটিকে তাহার বলিয়া দাবী করিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, শিবনাথকে জাতহরণীতে ঐ রাত্রে লইয়াছিল বলিয়াই তিনি কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। (আত্মচরিত ৪২।৪৩ পৃষ্ঠা)

লোকের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়াপাত প্রাথমিক জীবনেই প্রায়শঃ দেখাযায়—ইহাও প্রাক্তনেরই সূচক। উপরিউক্ত ব্যাপার ছাড়াও, দেখাগিয়াছে যে তিনি "পাখী পুষিতে ও তাহা শিকার করিবার জন্য গাছে ঢিল মারিতে" খুব ভাল বাসিতেন। কর্ম্মজীবনে তিনি অনেককে স্বীয় আবাসে আশ্রয় দিয়া পুষিয়াছিলেন—এবং হিন্দুসমাজরূপ বৃক্ষে ঢিল ছুড়িয়া ও অনেক যুবকরূপ পক্ষী আহত করিয়া ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের খাঁচায় পুরিয়াছিলেন।

কোন কারণে যখন একবার কোন বিষয়ের প্রতি বিরাগ জন্মিয়া যায়, তাহার অঙ্কুরে বিনাশ না হইলে ক্রমশঃ ঐ বিদ্বেষ শিকড় মেলিতে থাকে। শিবনাথেরও পিতা কর্ত্তৃক কুলধর্ম্মের প্রতি বিরাগের কারণ দূরীভূত হইতে না পারায় এবং স্বীয় পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

তিনি কলিকাতায় আসিয়া নিজের মনোমত ধর্ম্মসঙ্গীদের সহিত মিলিত হওয়াতে আর হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ফিরিয়া আসিবার পথ রহিল না। তিনি আজীবন হিন্দুশাস্ত্র, দেবদেবী, সামাজিক আচার ব্যবহার ইত্যাদি আর ভাল চক্ষে দেখিতে পাইলেন না।

তাঁহার চরিত্রে বাল্যাবধি 'জ্যেঠামি' ব্যতীত আরও দুইটি বিষয় লক্ষিত হইয়া থাকে; এক প্রশংসাপ্রিয়তা—দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের বিশেষতঃ সুন্দরীদের দিকে আকৃষ্ট হওয়া। প্রশংসাপ্রিয়তা বিষয়ে আত্মচরিতে আছে, "আমি বোধ হয় ভিতরে ভিতরে চিরদিন প্রশংসাপ্রিয় মানুষ—এ দুর্ব্বলতাটা শৈশব হইতেই আছে" (২৯ পৃঃ)। "আমিও নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি—"Duped by praise even from childhood" (৩০ পৃঃ)। কথাটা ঠিক—আত্মচরিতই তাহার প্রমাণ। তদ্ভিন্ন আমার স্মরণ হয় বালকপাঠ্য কোনও পত্রিকাতে তিনি নিজের সম্বন্ধে প্রশংসার ঢাক্কা নিনাদ করিয়াছিলেন।* বাহিরের এই প্রশংসাপ্রিয়তাই বোধ হয় তাঁহাকে স্বীয় জনকজননী ও আত্মীয়স্বজন ত্যাগে অনেকটা বল দিয়াছিল; এবং শেষ পর্য্যন্ত তদধিষ্ঠিত অভিনব সমাজে টিকিয়া থাকিতে উৎসাহ দিয়াছিল;—নচেৎ ইহার যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল তাহাতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতির ন্যায় ইহারও প্রকৃত দর্শন এবং বিরাট হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিবার কথা ছিল।

দ্বিতীয়,—রমণীজাতির প্রতি আকর্ষণও † তাঁহাকে নূতন সমাজে টিকিয়া থাকিবার সহায়তা করিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যফলে তাঁহার

* প্রবন্ধটি—"ব্রাহ্মণ-যুবকের বিশ্বাসের বল।" (এইরূপ একটা কিছু); তাহাতে তদীয় উপবীতত্যাগের সময়কার "দৃঢ়তা" সম্বন্ধে লেখা ছিল।

† "একটি সুন্দর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়ে আমাদের পাশের বাড়ীতে তার মাসীর কাছে থাকিত। সে আমার সমবয়স্ক। ঐ মেয়ে আসিলেই

চরিত্রগত কোন দোষের কথা শুনা যায় নাই—কিন্তু নারীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা হিন্দুসমাজে দূষণীয় বিষয়। এই রমণীপ্রীতির আধিক্য হইতেই বাল্যবিবাহে বিদ্বেষ, বিধবা-বিবাহে ঔৎসুক্য, মেয়েদের বাড়ীতে রাখিয়া লালনপালন ইত্যাদিতে প্রবণতা তাঁহার জীবনে দেখিতে পাইতেছি। এ সকল বিষয়ে জড়িত হইয়া তিনি সমাজ-সংস্কারের দিকে এত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলের যে, বিজয়কৃষ্ণ বা বিদ্যারত্নের মত আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁহাতে দেখা যায় নাই।

ফলে এই হইল যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশজাত এবং স্বয়ং সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতী ছাত্র হইলেও তত্ত্বদর্শীয় ন্যায় শাস্ত্রাধ্যয়নে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেশবচন্দ্র সেন আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ইংরাজী নবিশগণের সঙ্গে মিশিয়া, আর্য্যশাস্ত্রের আলোচনা অপেক্ষা, প্রতীচ্য শাস্ত্রের প্রতিই তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল বোধ হয়। একটি প্রমাণ দিতেছি।

আমরা যখন ঢাকায় ছাত্র ছিলাম, তখন পণ্ডিত শিবনাথ ঐ শহরে বক্তৃতা দিতে গিয়া গীতার শ্রীভগবদ্বাক্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌" কি ভয়ানক কথা; আমি হইলে বলিতাম "পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাম্‌" ইত্যাদি *। শাস্ত্রে শ্রদ্ধার অভাব হইলেই এইরূপ ভাব জন্মে—"শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানম্‌"।

আমার খেলাধূলা লেখাপড়া ঘুরিয়া যাইত। আমি তার পায়ে পায়ে বেড়াইতাম।......খেলায় ঘটনা চক্রে যদি আমি তাহার দলে না পড়িতাম, আমার অসুখের সীমা থাকিত না।" (আত্মচরিত ৩১ পৃষ্ঠা)। অপিচ ২০ বৎসর বয়সেও দেখা যায় ১৫।১৬ বৎসরের একটি বিবাহিতা বালিকা "চুম্বকে যেমন লৌহ লাগে তেমনি" যেন তাঁহাতে লাগিয়া গেল (১১১ পৃষ্ঠা)।

* ইহার সঙ্গে একটু রহস্যও আছে। বক্তা এই বলিয়া এমন লম্ফঝম্প পদাঘাত করিলেন যে বক্তৃতার কাষ্ঠমঞ্চ ভাঙ্গিয়া গেল; বক্তা অমনি

থিওসফিদলের অধিনেত্রী মাডাম্ ব্লাভাট্স্কির প্রতিও যেন বিদ্বেষ বশতঃ অনর্থক তাঁহার কথা টানিয়া আনিয়া তিনি মহাত্মাদের কোন চিঠি জাল করিবার অপরাধে অপরাধী হইয়া এদেশ ত্যাগে বাধ্য হন,—এই সংবাদটা প্রকাশ করিয়াছেন (১৩০ পৃষ্ঠা)। এই অহৈতুক বিদ্বেষটা—থিয়সফিওয়ালাদের হিন্দুশাস্ত্রের অনেক বিষয়ের সমর্থন নিমিত্তই নয় কি?

যে উপলক্ষে ব্লাভাট্স্কির কথা আনিয়াছেন, তাহা "হোয়াইট্লাই" সম্পর্কে; উপেন্দ্রনাথ দাস বলিতেন, মিথ্যা দুই প্রকার—হোয়াইট্ লাই ও ব্ল্যাকলাই, অল্প দোষের মিথ্যা এবং গভীর দোষের মিথ্যা। ইহাতে পণ্ডিত শিবনাথ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। ব্লাভট্স্কি তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট ঐ দুইপ্রকার মিথ্যার উল্লেখ করাতেই পণ্ডিত শিবনাথ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। *

কিন্তু তিনিও যে খুবই 'সত্যের সাধক' ছিলেন, এ কথাই বা কিরূপে বলি? রামকৃষ্ণ কথামৃত ম—কথিত প্রথম ভাগ (তৃতীয় সংস্করণ ১০০ পৃষ্ঠা) হইতে নিম্নলিখিত কথাটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

'কুপোকাৎ' হইলেন। স্থানীয় পত্রিকা "ঢাকা প্রকাশ" ইহা নিয়া বেশ রঙ্গরস করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দুষ্কৃতগণের "বিনাশ" মনে করিয়া বক্তার মনে আতঙ্ক সঞ্চার হওয়াতেই কি এই পতন ঘটিল?'

* কিন্তু হোয়াইট্ ব্ল্যাক সমস্ত কার্য্যেই আছে। 'লাই' (মিথ্যা) সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ ঐরূপ ভাব যে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ভাল কথা। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কা কোন মেয়েকে তাহার অভিভাবকের নিকট হইতে অপহরণ করিয়া আনাটাও একটা আইনতঃ অপরাধ, অথচ তিনি ঐরূপ কোন বালিকাকে আনিতে গিয়া যে বিড়ম্বনাগ্রস্ত হইয়াছিলেন —একথা আত্মচরিতেই আছে—এবং ঠিক্ এই (ব্লাভাট্স্কি সম্বন্ধীয়) কথার পরেই বর্ণিত আছে (১৭০-৭১ পৃঃ)।

পরমহংসদেব বলিলেন—'হাঁ গা শিবনাথ আজ আসবে না?' একজন ব্রাহ্ম ভক্ত বলিলেন, 'না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আসতে পারবেন না।' পরমহংসদেব বলিলেন 'শিবনাথকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যাকে অনেকে 'গণেমানে' তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারী দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল, যে ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে) যাবে কিন্তু যায় নাই; ওটা ভাল নয়। এই রকম কথা আছে যে, 'সত্যকথাই কলির তপস্যা সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান্ লাভ হয়।"

অমৃতবাজারের শিশিরবাবুদেরও কিঞ্চিৎ নিন্দাবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন; ভারত-সভা স্থাপনের কথায় ঐ সকল উত্থাপিত না করিলেও কোন দোষের হইত না। তবে শিশিরবাবুরা দল ছাড়িয়াছিলেন—তাই কি এই অধ্যবসায়? * সে যাহা হউক, পণ্ডিত শিবনাথ ধর্ম্মপ্রচারক—ধর্ম্ম সাধনের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী; এতাদৃশ রাজনীতির আসরে তাঁহার যোগ দেওয়াটা অসমীচীন এবং এই অভিনব আদর্শ রামমোহন রায়ই দেখাইয়া গিয়াছেন।

এখন পণ্ডিত শিবনাথের উপবীতত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের যে বিবরণ এই পুস্তকে আছে তদুপলক্ষে কয়েকটি কথা বলিব।

তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পরেই পিতার উপর বিরক্ত হন এবং মনে মনে সমগ্র সমাজের উপরেই যেন চটিয়া যান। এইরূপ বিবাহ করিলে পিতৃভক্ত পুত্রের যাহা করা উচিত বঙ্কিমবাবু "দেবীচৌধুরাণীতে"

* এইরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, শিশিরবাবুরা যখন 'দলে' ছিলেন, সেই সময়ে একবার পণ্ডিত শিবনাথ তাঁহাদের বাড়ী গিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসার সহিত লিখিত হইয়াছে। ১৩৬—১৩৭ পৃঃ।

তাহা দেখাইয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ সেরূপ পথে যান নাই—বরং ভবিষ্যৎ জীবনে যখন "স্বাধীন" হইলেন—পিতার বিরাগভাজন স্ত্রীটিকেই আনিয়া সাদরে গৃহে স্থান দিলেন। অপরটিকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যায় কিনা তাহারও চেষ্টা পাইয়াছিলেন!! কিন্তু দ্বিতীয় পত্নীর এক কথাতেই সে সঙ্কল্প উড়িয়া গেল—"মাগো, মেয়েমানুষের আবার ক'বার বিয়ে হয়।" তারপর দুইটিকে দুইস্থানে রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে দাম্পত্যসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন।

যে কথা বলিতেছিলাম—দ্বিতীয়বার বিবাহের পর তিনি মানসিক অবসাদ গ্রস্ত হইয়াছিলেন,—সে সময়ে পিতা কি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। তখন শিবনাথ, ব্রাহ্ম উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত থিয়োডোর পার্কারের উপদেশ ও প্রার্থনা পড়িতে লাগিলেন। ইহাতে প্রার্থনা করিবার অভ্যাস হইল এবং তাহাতে দুইটি ফল হইল। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রথম—আমি ধর্ম্মের আদেশ ও হৃদয়বাসী ঈশ্বরের আদেশানুসারে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দ্বিতীয়—ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করিলাম।" (১০৫ পৃষ্ঠা)। এই ঘটনা ১৮৬৫ অব্দে—অর্থাৎ তাঁহার ১৮ বৎসর বয়সের সময় ঘটে। কয়েকদিন মাত্র থিয়োডোর পার্কারের উপদেশানুযায়ী প্রার্থনা করিবার ফলেই এই নব যুবকের হৃদয়ে "ধর্ম্মের আদেশ ও ঈশ্বরের আদেশ" স্ফুরিত হইতে লাগিল! এই 'আদেশের' ফলে ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন, এবং পরিশেষে ১৮৬৯ সালে (অর্থাৎ ২২ বৎসর বয়সে, যখন এফ্-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়েন) উপবীত ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে 'ব্রাহ্ম' হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাপারের পূর্ব্বেকার একটী ঘটনা উল্লেখ যোগ্য। ১৮৬৮ সালের মাঘোৎসবে কেশবচন্দ্র সেনের দলের নগর কীর্ত্তনের মধ্যে এই সকল কথা ছিল;—

তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশা
হলো অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি
নাহি তাহে জাত বিচার॥ ইত্যাদি

তিনি লিখিতেছেন "এই আহ্বানধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল। আমার যেন মনে হইল আমাকে ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আদর্শ আমার নিকট ধরিল, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।" (১৪৭ পৃষ্ঠা)

অপিচ এই কয়েক বৎসরে পণ্ডিত শিবনাথ কি কি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাও দেখা উচিত। "এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি অনেক জীবনচরিত পড়িয়া ফেলি। অবশেষে স্মরণ আছে যে প্রতিদিন বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া বীটন্‌স্ বাইওগ্রাফিক্যাল্ ডিক্‌শনারী হইতে বড় বড় লোকের জীবনচরিত পড়িতাম। * * * জীবনচরিত ভিন্ন আরও কয়েকখানি গ্রন্থে এই উপকার পাইয়াছিলাম। থিয়োডোর পার্কারের গ্রন্থাবলীর উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। নিউম্যানের 'সোল'ও বোধ হয় এই সময় পড়িয়া থাকিব। তৎপরে আমাদের এল.এ কোর্সেই আর্থর হেল্পসের "এসেস্ রীট্‌ন্ ইন্ দি ইন্‌টার্‌ভ্যাল্‌স্ অফ্ বীজনেস্" ছিল, তাহাদ্বারা এত উপকৃত হইয়াছিলাম যে, সেই সূত্রে হেল্পসের "ফ্রেণ্ডস্ ইন্ কাউন্সিল্" আনিয়া পড়ি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আমার সেই ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম উদ্যমে আমি উভয় গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাই। তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌখিক ও লিখিত উপদেশ ইত্যাদি।" (১৪০ পৃষ্ঠা) এগুলিতে কি শিখিতেন তাহাও আছে:—

"মানুষ সংগ্রাম করিয়া প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের জীবনের মহত্বসাধন করিয়াছে, ইহা দেখিলেও আমার আনন্দ হয়,

ভাবিতে সুখ হয়; আমি তাহার মধ্যে মানবজীবনের দারিদ্র ও ঈশ্বরের কৃপায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই।" ১৪০ পৃষ্ঠা।

এখন দেখা যাউক পণ্ডিত শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম কি অবস্থায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে পাঁচ বৎসরে তাঁহার এই ভাবের উন্মেষ হইতে পরিণতি পর্য্যন্ত ঘটে, তখন তাঁহার বয়স ১৮ হইতে ২২; লেখাপড়া প্রবেশিকার দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী; পড়াশুনা স্কুল কলেজের পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া পাশ্চাত্য লেখকদিগের কতিপয় নীতিগ্রন্থ। সংস্কৃত কলেজে কাব্য নাটক ছাড়া প্রাচ্যধর্ম্ম নীতি ও দর্শন বিষয়ক অধিক কিছু পড়া হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির আলোচনা—তখন কেন, জীবনে কদাপি শ্রদ্ধান্তরে করিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়। অন্ততঃ জিজ্ঞাসু ভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রের কোন কিছু পড়েন নাই, ইহা নিশ্চয়। এখন দেখুন প্রাক্তনের ফলে, পণ্ডিত শিবনাথ উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থিভাবে জীবন আরম্ভ করিয়াও, কিরূপে অপক্ক বয়সে শাস্ত্রবিগর্হিত সমাজ-বিরুদ্ধ পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পাশ্চাত্য মোহাবিষ্ট * রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কেশবচন্দ্র সেন দ্বারা উপদিষ্ট পথে চলিতে অভ্যস্ত হইয়া শেষে স্বয়ং এমন এক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইলেন যে, ইউনিটারিয়ান্ খ্রীষ্টান্ হইতে তাঁহাকে পৃথক ভাবিবার আর কোন পরিচিহ্ন রহিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু অথবা বৈষ্ণব মহাজনগণ যে সাধনার রীতি দেখাইয়া দিয়াছেন—অথবা রামপ্রসাদ বা রামকৃষ্ণ যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন—পণ্ডিত শিবনাথ তাহার খোঁজ খবরও

---

* এই বিশেষণটি আমার নিজের রচিত নহে। বিচারপতি সার্ জন্ উড্রফ্ রামমোহন রায়েরই নামাঙ্কিত মন্দিরে কোনও ব্যাপারে সভাপতিভাবে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং পাশ্চাত্য হইয়াও রামমোহন রায়ের প্রতি এই বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

রাখিয়াছেন কি না সন্দেহ *। নচেৎ প্রাগুল্লিখিত নগর-সংকীর্ত্তনের পদ (যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাই তাতে জাতবিচার) শুনিয়া সেটাকে "নূতন একটা কিছু" মনে করিয়া বিচলিত না হইয়া চারিশত বৎসরের পুরাতন কীর্ত্তনা-বলীর একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র ভাবিয়া প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিতেন। আর অপক্ক বয়সে অল্পশিক্ষা লাভ করিয়া দুচারি-দিন কোন উপদেশমূলক গ্রন্থ পড়িয়া বা বক্তৃতা শুনিয়াই আপনার হৃদয়ে যাহারা "ঈশ্বরের আদেশ" শুনিতে পারে—এবং সেই আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া সাধু মাতাপিতার বক্ষঃস্থলে শেলের আঘাত করিতে পারে—(হিন্দুর চক্ষে ইহা অত্যন্ত পাপজনক বটেই খ্রীষ্টীয় মহাত্মা সেন্টপলের উক্তি ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" দেখা যাইতেছে) তাহারা অতীব কৃপার পাত্র—ইহাই জেঠামির একশেষ; বাল্যাবধিই যে 'জেঠামি' ও প্রশংসানুরাগ পণ্ডিত শিবনাথের প্রকৃতিগত ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, তিনি শেষ বয়সেও সামলাইতে পারেন নাই। তদীয় সুহৃৎ 'গোঁসাইজী' ও "বিদ্যারত্ন ভায়া" যখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিলেন—তখন সনাতন পথ ধরিলেন, কিন্তু তিনি পড়িয়াই থাকিলেন। একদিন তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন বটে—সেই প্রার্থনাও বৈষ্ণব মহাজনগণের পরকীয় ভাবের অনুকরণ মাত্র—"নিবিদ্ধ প্রণয়ে আসক্ত নারী যেমন তাহার প্রেমাস্পদের জন্য পিতামাতা গৃহ পরিবার আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়াও আপনার অলঙ্কারের বাক্সটি সঙ্গে লয় কিন্তু আবশ্যক হইলে তাহাও পথে ফেলিয়া যায়, তেমনি আমি সকল ছাড়িয়াও যেটি

* তিনি দুএকদিন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের নিকট গিয়াছেন বটে কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসুভাবে যান নাই; দশজন যায়, তাই তিনিও "কৌতূহল" প্রণোদিত হইয়াই গিয়াছিলেন।

ধরিয়া আছি, হে ভগবান্ আবশ্যক হইলে সেটিও ছাড়াইয়া আমাকে লইয়া যাও।" (২৩৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু কৈ, যেটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন তা তো ছাড়েন নাই! কিন্তু বিদ্যারত্ন ও গোস্বামী তাহা ছাড়িয়াছিলেন। ফলতঃ পণ্ডিত শিবনাথের মোহ এজীবনে আর কাটে নাই। তিনি "প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিয়া নিজের মহত্ত্ব সাধন করিতেই" জীবন ব্যয় করিয়া গেলেন।

অথচ নিজের সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—"আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি (থিওলজি) ধর্ম্মবিকাশ অপেক্ষা (প্রাক্‌টিক্যাল রিলিজন্) ধর্ম্ম জীবনের প্রতি আমার চিরদিন অধিক দৃষ্টি, অথচ ভাবিতে ক্লেশ হয়, লিখিতে চক্ষে জল আসিতেছে, এই প্রাকটিক্যাল রিলিজনেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হারিয়া গিয়াছি। আমার আকাঙ্ক্ষা চিরদিন আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে রহিয়াছে। কিন্তু প্রবৃত্তিসকলকে আমার আকাঙ্ক্ষার বশীভূত করিতে পারি নাই। কাজেই নানাপ্রকার দুর্ব্বলতার সহিত মহাসংগ্রামে বাস করিতে হইয়াছে।" (১৪০ পৃঃ) এইটি কবুল জবাব। যাহা করিলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়—তাহার ব্যবস্থা হিন্দুর ধর্ম্মসাধনার শাস্ত্রে বহুতর রহিয়াছে—এবং সেইটি দেখাইয়া দিবার জন্যই মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ৺আনন্দমোহন বসুও শেষকালে তদর্থে উন্মুখ হইয়াছিলেন কিন্তু ইনি সাধকের বংশে জন্মিয়াও অদৃষ্টদোষে সেদিক ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। *

---

* আত্মচরিতের শেষ প্যারায় আছে—রোগ-শয্যায় পড়িয়া অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার সময় পাইয়াছি, নবশক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন ভাব মনে আসিয়াছে—অবশিষ্ট যে কয়েক বৎসর জগতে থাকি নূতন ভাবে কাটাইব মনে করিতেছি।" ইহা ১৯০৮ অব্দের কথা। আত্মচরিত ১৯১৮ অব্দে (মৃত্যুর এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে) প্রকাশিত হইলেও এই দশ বৎসরে "নূতন ভাব' অবলম্বনে [illegible]

ফলতঃ পণ্ডিত শিবনাথ ধর্ম্মসাধক অপেক্ষাও সমাজসংস্কারক ভাবেই প্রথমাবধি বিভোর ছিলেন ; পৌত্তলিকতা বর্জ্জন, ধর্ম্মসংস্কার, জাতিভেদ বর্জ্জন ও নারীজাতির পুংস্করণ * ইহাই সমাজসংস্কারের বিষয়। সমাজ-সংস্কারের কথা এস্থলে বিশেষ আলোচনা করার বাসনা নাই, করিয়া ফলও বেশী কিছু নাই। সংস্কারকেরা এই সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির ভালদিক্ দেখিবেন না—পাশ্চাত্য মোহাবিষ্ট হইয়া কেবল ছিদ্রই অন্বেষণ করিয়া থাকেন। পণ্ডিত শিবনাথ আজীবন তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বিলাত গিয়া ইংরেজ জাতির অন্ধকারের দিক্ দেখিয়াও দেখেন নাই—আলোকের দিক্টা বেশ জাঁকাল ভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার দুই একজন খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন এদেশের কোন ভাললোকের কথা তাঁহার আত্মচরিতে প্রায়শঃ দেখা যায় না—তবে সংস্কারকদলের বহুশঃ গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। উদাহরণার্থ ধরুন, প্রতিনিয়ত প্রার্থনার ভাব। তিনি জর্জ্জ মূলারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—এদেশে কেবল ব্রাহ্ম কালীনারায়ণ গুপ্তের কথা বলিয়াছেন (৪১৫-১৬ পৃঃ)। কিন্তু এতদ্দেশে অতি সামান্য

করিলেন—কিছু জানা গেলনা—সম্ভবতঃ বিশেষ কিছুই হয় নাই। নচেৎ আত্মচরিত এভাবে ছাপাইতেনমা, হয় তো অন্য ভাবে ইহা লিখিতেন।

* শব্দটি উদ্ভট সন্দেহ নাই, কিন্তু এক কথায় নারীজাতি বিষয়ক সংস্কারাবলীর নাম-করণে এই শব্দটিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাবব্যঞ্জক। পুরুষের ন্যায় অধিক বয়সে বিবাহ, কলেজে পড়া, দ্বিতীয়বার বিবাহ, স্বাধীনতা ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ই এই একটি শব্দে প্রকাশিত হইতে পারে। স্ত্রী পুরুষে সমান অধিকারই আজকালকার মূলকথা ; কিন্তু ইহার পরিণাম যে কোথায় শ্রীভগবান্—যিনি স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনিই জানেন।

গৃহস্থ শত শত এখনও আছেন যাঁহারা প্রতিকাজে শ্রীভগবন্নাম স্মরণ করিয়া থাকেন—তবে তাঁহারা নিজের ঢক্কা নিজেই বাজান না, অপরেও তাঁহাদের খোঁজ খবর জানেনা—ঐ শ্রেণীর হিন্দু আত্মগোপনই ভাল বাসেন।

তিনি ইংরাজ জাতির সাধুতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ব্যবসায়ীদের কথা পাড়িয়াছেন। ফলতঃ অনেষ্টী যেখানে 'বেষ্ট পলিসি' সেখানে সাধুতা প্রায়শঃ ধর্ম্মানুরোধে না হইয়া 'পলিসি'-অনুরোধেও হইতে পারে। এদেশের তাঁতি কর্ম্মকার যে হাহাকার করিতেছে—ইহার মূলে কোন সাধুতা দেখিয়াছিলেন কি? ইউরোপীয় জাতি নিজেদের মধ্যে যথাসম্ভব পরস্পর সুখ সম্পদের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন—এটা আমাদের অনুকরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কালোরংএর জাতির সহিত ব্যবহারে কোন 'ত্যাগ' ইঁহারা সচরাচর দেখান কি?

যাউক সে কথা; পণ্ডিত শিবনাথ জাতিভেদ দূরীকরণার্থ কেবল বক্তৃতা দিয়া ক্ষান্ত হন নাই—নিজের ছেলে মেয়ের বিবাহ, আচার ব্যবহার ইত্যাদিতে ঐ বিষয়ে খুবই উদারতা দেখাইয়া ব্রাহ্ম সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন—তাঁহার ঐ সমাজে জনপ্রিয়তার (পপুলারিটির) এই একটা মস্ত কারণ। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ যেন এই ভাবটা খুব সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতেছে না—যেন সকলেই উচ্চবর্ণের সঙ্গে সম্পর্ক করিবার জন্যই উৎসুক। * তার পর বিলাতি সমাজের ন্যায় ঐ সমাজে কাঞ্চন কৌলীন্য যেন এখনই দেখা দিতেছে।

* পণ্ডিত শিবনাথও যে সম্পূর্ণ "কুসংস্কার" বর্জ্জিত ছিলেন একথা বলিতে পারি না। কেননা, তাহা হইলে মান্দ্রাজে পীড়িত অবস্থায়—"I see my career is going to end in the arms of a sweeper woman" (আমি দেখিতেছি আমার জীবনের শেষটা মেথরাণীর হাতেই যাইবে)—বলিয়া আক্ষেপ করিতেন না। (৩২৫পৃঃ)

নারীসমস্যাও যে ভাবে সংস্কারকগণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণভাবে বিলাতেরই অনুকরণ। পণ্ডিত শিবনাথ স্বয়ং বন্ধুবান্ধবের স্ত্রীদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন—এমন কি কোন কোন স্থলে যে এক গৃহে শয়ন করিতেন সে কথাও আছে। অথচ নারীদের সঙ্গে তাঁহার লৌহ-চুম্বকের ভাবের কথাও ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি স্বয়ং সংযমী ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ কখনই সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না। তাঁহারই কোনও বিশিষ্ট বন্ধু বৃদ্ধকালে কন্যাতুল্যসম্পর্কিতা যুবতীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যে সমাজে ডাইভোর্স অহরহঃ ঘটিতেছে ও বিবাহ বন্ধন অনাবশ্যক বলিয়া আন্দোলন চলিতেছে—সেই বিলাতী সমাজের প্রথা এখানে আমদানী করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। তারপর পুরুষোচিত শিক্ষা পাইয়া নারীগণ ক্রমশঃ বিলাসিনী হইয়া উঠিতেছে—অন্নপূর্ণার কার্য্যকে ঘৃণ্য মনে করিতেছে—গন্ধতৈল, বস্ত্রালঙ্কার, নাটক, নভেল ইত্যাদির খুব প্রচার ইহাদের দ্বারা হইতেছে; একান্নবর্ত্তী পরিবার, পারিবারিক ধর্ম্মোন্নতি প্রভৃতির মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে। এই নারী-সমস্যায় ইউরোপ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তো নিরুপায় হইয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া জগদম্বার নাম স্মরণ করিতেছি!

ফলকথা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পণ্ডিত শিবনাথের ন্যায় ব্যক্তি— যিনি স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ ও স্বকীয় সমাজে শ্রদ্ধাবান্ থাকিলে তাঁহার নিজের *—তথা হিন্দুসমাজের উপকার হইত, অদৃষ্ট দোষে

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে পণ্ডিত শিবনাথের ব্রাহ্মসমাজে প্রভূত সমাদরের মূলে উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, সোমপ্রকাশের বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে সম্পর্ক, ইত্যাদি ও অনেকটা ছিল।

* তিনিও তাঁহার আত্মচরিতে বলিয়াছেন, তাঁহাকে প্রবল প্রবৃত্তিকুলের

ভগ্ন পথের পথিক হইয়াছিলেন। কিন্তু এ আক্ষেপ বৃথা! সর্ব্বনিয়ন্তা যাহাকে দিয়া যাহা করাইবার করাইয়াই থাকেন।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"—তাঁহার নিরঙ্কুশ জটিল বিধানের মর্ম্ম দুরবগাহ। হয়ত ইহাদ্বারা সনাতনধর্ম্ম ও সমাজের পরিণামে কোন অভাবনীয় কল্যাণও সাধিত হইতে পারে।

শিবনাথ—তথা রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি—স্বকীয় কার্য্যে এবং জীবনে হিন্দুর যে পথে যাইতে নাই তাহা যেমন সুস্পষ্ট দেখাইয়া গেলেন এমন আর কেহই করেন নাই। সনাতন পথ ছাড়িয়া কি অতুলনীয় শক্তির অপব্যয় হইয়া গেল! হিন্দু তাহা দেখিয়া বুঝিয়া নিজের পথেই থাকুন—এই সমালোচনার ইহাই উদ্দেশ্য।

সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে—"আমি বহু বৎসর যেন দুই হাত দিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে পারিনাই, এক হস্তকে প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রামে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে—অপর হাত দিয়া ঈশ্বরের সেবা করিয়াছি।" (২৪৮ পৃঃ) কিন্তু তিনি যদি স্বীয় প্রপিতামহ কিংবা মাতার "সাধনপথ" ধরিতেন, তাহা হইলে এরূপ অনুতাপ করিতে হইত না। পরন্তু অদৃষ্ট-বশতঃ মোহান্ধ হইয়া পড়াতে নিজের ঘরে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তিনি ঠিক্ পথ দেখিলেন না!

"পৃথ্বীরাজ" ও "শিবাজী"

ইদানীন্তন প্রখর সভ্যতালোকের যুগে মহাকাব্য প্রণয়ন হইতে পারে কিনা * এ সম্বন্ধে বোধ হয় লর্ড মেকলেই প্রথম তদীয় 'মিল্টন' বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার তর্কবিতর্কের সমস্ত কথা এস্থলে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক, নিম্নে কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত হইল :—

"He who in an enlightened and literary society, aspires to be a great poet, must first become a little child. He must take to pieces the whole web of his mind. He must unlearn much of that knowledge which has perhaps constituted hitherto his chief title to superiority. His very talents will be a hindrance to him, His difficulties will be proportioned to his proficiency in the pursuits which are fashionable among his contemporaries, and that proficiency will in general be proportioned to the vigour and activity of his mind. And it is well if, after all his sacrifices and exertions, his works do not resemble a lisping man or a modern ruin."

---

* গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "শিবাজীর" প্রস্তাবনায় এই কথাটার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যথোচিত আলোচনা করেন নাই।

পঠদ্দশায় যখন এ সকল কথা পড়িয়াছিলাম, তখন যেমন দস্তুর এগুলিকে বেদবাক্যের ন্যায় মানিয়া নিয়াছিলাম। নাবিক সিন্ধবাদের স্কন্ধে সেই আরণ্যবৃদ্ধ তেমন চাপিয়া বসিয়াছিল, আমাদেরও কাঁধে তেমনি মেকলে প্রভৃতিরা চাপিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ভগবৎ-কৃপায় যখন ইংরেজীর ভূতের বোঝা কতকটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া একটু স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিলাম, তখন দেখিলাম, ইহার ন্যায় এতবড় ছেঁদো কথা আর হইতে পারেনা। যে 'মিণ্টন' সম্বন্ধে মেকলে এই প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন—তিনি যদি বাইবেল সাহিত্যে পরম পণ্ডিত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি তদীয় মহাকাব্য "প্যারেডাইজ্ লষ্ট্" লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তার পর সুষ্ঠু শব্দ প্রয়োগ অলঙ্কারের অবতারণা ইত্যাদির নিমিত্তও শব্দশাস্ত্রে ও অলঙ্কার শাস্ত্রাদিতে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে চলে না। পূর্ব্বতন সাহিত্যা-দিতে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলেও স্বীয় রচনার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারপূর্ব্বক দোষসংস্কারের ক্ষমতা জন্মে না। ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদির দখল থাকিলে ঐ সকল বিষয়াবলী হইতেও কাব্যের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ইহার চমৎকারিত্ব সম্পাদন করা যাইতে পারে। আমাদের কালিদাস সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন—তাঁহার রঘুবংশ তাই সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাকাব্য হইয়াছে। মাঘ ভারবি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ছিলেন। বাঙ্গালাভাষারও মহাকাব্য লেখকগণ—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি--এক একজন অত্যুচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কালিদাসের যুগ ভারতবর্ষের এক অত্যুৎকৃষ্ট যুগ ছিল—উচ্চ সভ্যতার আলোকে উহা প্রোজ্জ্বল ছিল। আর ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রখররশ্মিপাতের সময়েই মধুসূদনাদির অভ্যুদয় হইয়াছে। ফলতঃ সাহিত্যদর্পণাদিতেও 'মহাকাব্যের' যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাতে বরং এমন সব কথা রহিয়াছে,

যাহাতে সুসভ্য সময়ের সুশিক্ষিত ব্যক্তিরই এ কার্য্যে হাত দেওয়া সঙ্গত মনে হইবে—অবশ্য তাঁহার কবিপ্রতিভা থাকা চাই।

অতএব শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কোন অসঙ্গত কাজ করেন নাই—বরং তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা যতদূর অবগত আছি, তিনি এ কার্য্যের খুবই উপযুক্ত ব্যক্তি।

পরন্তু সুযোগ্য গ্রন্থকার যোগীন্দ্র বাবু নানা প্রকারে আমাদের এমন ধারণা জন্মাইয়াছেন, যেন তাঁহার গ্রন্থকে আমরা 'কাব্য' মাত্র না ভাবি। 'পৃথ্বীরাজের' উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন—"কবিতার রসবিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। "উপক্রমণিকা" ও"প্রস্তাবনা" লিখিয়া সুদীর্ঘ 'মুখবন্ধ' প্রদান করিয়া, ভূরি ভূরি পাদটীকা এবং নানাবিধ চিত্র * দ্বারা তিনি গ্রন্থদ্বয়কে পরিশোভিত করিয়া ইহাদের এমন একটা আকার দিয়াছেন, যাহাতে আমরা এগুলিকে পদ্যেগ্রথিত ঐতিহাসিক নিবন্ধ মনে করি। কবি তাঁহার কাব্য লিখিয়া যাইবেন—তাহা অবশ্যই "কান্তাসম্মিততয়া" উপদেশ প্রদায়কও হইবে। পরবর্ত্তী রসজ্ঞগণ উহার সমালোচনা লিখিবেন, টীকা করিবেন; প্রকাশকগণ চিত্রাদিদ্বারা উহার সৌষ্ঠব বিধান করিবেন। স্বয়ং কবিই যদি সব করিয়া গেলেন—তবে সমালোচকগণের জন্য থাকিল কি? বিশেষতঃ "কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ" ইহা মনে রাখিয়াও গ্রন্থকৎ-কবির টীকাটিপ্পনী হইতে বিরত থাকাই উচিত। ফলতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কবি—ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত যে কোনও ভাষারই গ্রন্থ লিখিয়া থাকুন—এমনটি করিয়াছেন বলিয়া তো মনে হয় না। এটা যোগীন্দ্র বাবুর একটা বিশেষত্ব, সন্দেহ নাই।

---

* যখন এতগুলি চিত্র দিয়াছেন, তখন দুই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ঘটনাবলীর স্থান নির্দ্দেশক দুখানি মানচিত্র দিলেই শোভন হইত।

কাব্যদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়াবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কবি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক মনে করি—কেন না যোগীন্দ্র বাবুই মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে "মটো" (motto) রূপে "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরো গুরুতর লাভ"—ইত্যাদি ৺বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ যোগীন্দ্র বাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় হয় নাই—কোনও সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। ইহাও কবিজনোচিত বিবিক্তপ্রিয়তারই নিদর্শন, সন্দেহ নাই।

যোগীন্দ্র বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন; এবং সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি এযাবৎ মাতৃভাষার সম্যক্ চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। বহুদিন দেওঘরে হেড্‌মাষ্টারি করিয়াছিলেন;—সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহোদয় ঐস্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াও তদীয় সাহিত্য সেবাপ্রবৃত্তি সম্যক্ উৎসাহিত হইয়া পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে—একথা অবশ্যই আমরা ধরিয়া লইতে পারি। তখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিনা জানি না; তবে তাঁহার প্রাথমিক রচনার মধ্যে "একাদশ অবতার" নামক একখানি ব্যঙ্গকাব্যের বিষয় আমরা অবগত আছি; গ্রন্থকার তাহাতে "ধূর্জ্জটি" নাম ধারণপূর্ব্বক স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) প্রভৃতির (তদানীং "বঙ্গবাসীর" পরিপোষক দলের) উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছিলেন। * তারপর যোগীন্দ্র বাবু

* পুস্তক খানি এখন দুষ্প্রাপ্য—স্বয়ং গ্রন্থকারের নিকট চিঠি দিয়াও পাওয়া যায় নাই। বাল্যে ইহা পড়িয়াছিলাম, একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র আছে। তবে ইহা যে 'সরস' জিনিষ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রম করিয়া মেঘনাদবধকাব্যের মহাকবি মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত সঙ্কলনপূর্ব্বক বঙ্গীয় সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইয়াছেন; এইগ্রন্থে তাঁহার মৌলিকত্ব, গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও লিপিচাতুর্য্য সম্যক্ প্রকটিত হইয়াছে। অথচ চরিতাখ্যায়কের প্রেমান্ধতা ইহাতে নাই বলিলেই হয়; মধুসূদনের যে যে স্থলে দোষ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইয়াছে, যোগীন্দ্র বাবু তাহা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই এবং ঐরূপ স্থলে প্রায়শঃ তাঁহার সমাজহিতৈষণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সাধু সাধ্বীগণের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনেও যোগীন্দ্র বাবু লেখনী প্রয়োগ করিয়াছেন—'তুকারাম চরিত,' 'অহল্যাবাইএর জীবন চরিত' এবং "পতিব্রতা গ্রন্থাবলী" তাহার ফল। আর্য্যরমণীগণের একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যধর্ম্মের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা পরপুরুষের ছায়াস্পর্শও সহিতে পারে না, সেই ভাবের ব্যত্যয় ঘটাইতে একদল লেখক আজকাল বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—এবং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ এই দলের অগ্রণী। সনাতন ধর্ম্মের খাদ্যাখাদ্য, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার যেমন এখন একদল উৎপথ-প্রতিপন্ন লোকে "হাঁড়িধর্ম্ম" "ছুৎমার্গ," ইত্যাদি বলিয়া আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতেছে—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও তেমনি পাতিব্রত্যের সনাতন উচ্চ আদর্শের খর্ব্বতা বিধানে কৃতসংকল্প হইয়া নারীসমাজের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। যোগীন্দ্র বাবু ঐ গ্রন্থাবলীতে ভারতের আদর্শ সতী-সাধ্বীদিগের চিত্রপ্রদর্শনপূর্ব্বক মহিলাগণের মহান্ উপকার করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার স্বদেশ ও স্বকীয় সমাজের হিতেচ্ছা প্রকটিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে তিনি কবিত্বশক্তিরও অনুশীলন করিয়াছেন—তদীয় "কঠোপনিষদের পদ্যানুবাদ" বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার একখানি

কবিতাপুস্তকও * প্রকাশিত হইয়া প্রশংসালাভ করিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে একটি কবিতা বিদ্যালয়ের বালকগণের পুরস্কার বিতরণী সভায় বহুস্থলে আবৃত্ত হইতে শুনিয়াছি, সেইটির নাম "মানচিত্র-দর্শনে"। কবিতাটি দেশভক্তির উদ্দীপক এবং রচয়িতার মাতৃভূমির প্রতি অনাবিল প্রেমভাবের পরিচায়ক।

এইরূপে, সাহিত্যক্ষেত্রে সুলেখক, সুকবি ও স্বদেশানুরাগিরূপে প্রথিতযশা হইয়া পরিণতপ্রজ্ঞ যোগীন্দ্র বাবু 'পৃথ্বীরাজ' রচনায় প্রবৃত্ত হন। মধুসূদন দত্ত প্রথমবয়সে ইংরেজী ভাষায় 'কবিযশঃপ্রার্থী' হইয়া 'ক্যাপ্টিভ্ লেডী' লিখেন। এই 'লেডী'—পৃথ্বীরাজমহিষী 'সংযুক্তা'। মধুসূদনচরিত লেখক যোগীন্দ্র বাবু "পৃথ্বীরাজ" লেখনে 'ক্যাপ্টিভ্ লেডী' কোনওরূপ অনুপ্রাণন করিয়াছে কিনা, তাহা বলিতে পারি না—তবে উভয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে ঘোরতর প্রভেদ বর্ত্তমান। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' আলোচনার ফলে তদীয় চরিত-কারের হৃদয়ে মহাকাব্য লিখিবার সংকল্প জাগিয়াছিল কিনা, তাহাও বলা যায় না। "পৃথ্বীরাজে" মেঘনাদের অমিত্রাক্ষরছন্দঃ ব্যবহৃত হয় নাই—বরং পরবর্ত্তী "শিবাজী" এই ছন্দে আগাগোড়া রচিত। পরন্তু 'মেঘনাদবধ' যেমন সোনার লঙ্কার পতনের ইতিহাস, 'পৃথ্বীরাজও' স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির অধীনতাপাদনের ইতিবৃত্ত; উভয়ই বিষাদাত্মক কাব্য—মেঘনাদের প্রমীলার চিতারোহণ দৃশ্যে পরিসমাপ্তি, পৃথ্বী-রাজেরও শেষ দৃশ্য সংযুক্তার চিতারোহণ। তবে, মধুসূদন ঐ বিষাদাত্মক কাব্যের পরে অবসাদের প্রতিক্রিয়ার্থক অপর কোনও কাব্য লেখেন নাই—যেমন তাঁহার আদর্শকবি মিল্টন 'প্যারেডাইজ্

* এ ছাড়া আরো পুস্তক (পদ্য এবং গদ্য) তৎকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে—বাহুল্য বশতঃ উল্লেখ করা হইল না। সবগুলিই সুলিখিত ও সর্ব্বজন প্রশংসিত।

নষ্ট' লিখিবার পরে "প্যারেডাইজ্ রিগেইণ্ড" লিখিয়াছেন। এবিষয়ে যোগীন্দ্র বাবু মিল্টনের মত "পৃথ্বীরাজ" কাব্যের অবসাদ দূরীকরণার্থে "শিবাজী" লিখিয়া আমাদের হতাশহৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন।

"পৃথ্বীরাজ" কাব্যে গ্রন্থকার হিন্দুর পতনের ইতিহাস বিবৃত করিতে গিয়া এই অধঃপতনের নিদাননির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে তিনি তাঁহার স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুসারে স্বদেশের হিত-সাধনকল্পে নানাভাবে সমাজের—তথা হিন্দুধর্ম্মেরও—গলদ ঘাটিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার দেশহিতৈষণার আন্তরিকতাসম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই—এবং তজ্জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; অথচ তিনি একজন প্রবীণ ও প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী বলিয়াও আমাদের অশেষ সম্মানভাজন। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার কতকগুলি কথা আমরা প্রতিবাদের যোগ্য মনে করি এবং তৎকরণার্থই এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

জগতের সমস্ত ব্যাপারই শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশেচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে। এইটি সর্ব্বপ্রথম কথা। তারপর ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়—পুণ্যে বৃদ্ধি, পাপে ক্ষয়—এটাও একটা মোটা কথা। এরূপ কথাই ইংরাজীতে 'ট্রুইজম্' বলিয়া আখ্যাত হয়। যোগীন্দ্র বাবু 'পৃথ্বীরাজে' ভারতের পতনের কারণ ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'শিবাজীতে' তো 'মটো'রূপে বলিয়াছেন—"পাপে ধ্বংস পুণ্যে স্থিতি বিধি বিধাতার," ইত্যাদি। ইহাতে বাদপ্রতিবাদের কোনও কথা নাই। আমরাও বলিব, সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ কলিপ্রভাবে দিনদিন অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। একখানি পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলেই কলির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে:—

"ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিততপো বিরহিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং
ক্ষৌণী মন্দফলা নৃপাশ্চ কুটিলাঃ শাস্ত্রজ্ঞা ব্রাহ্মণাঃ।

লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়োঽতিচপলাঃ পাপানুরক্তা জনাঃ
সাধুঃ সীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি প্রায়ঃ প্রবৃত্তে কলৌ ॥"

স্থানবিশেষে জলবায়ু দূষিত হইয়াছিল বলিয়াই যেমন ম্যালেরিয়া, কলেরা রোগ ইত্যাদি অভিনব ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তেমনি এই কলিকলুষিত সমাজের উপপ্লবের নিমিত্ত নানা দিগেদশ হইতে বিভিন্ন জাতি আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কলি যদি এপ্রকারেই হইল, তবে কি লোক ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া অধর্ম্মের আশ্রয় করিবে? তা নয়;—ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দ্বারা ভূরিশঃ আক্রান্ত হইলেও লোক যেমন ঔষধ ব্যবহার করে—আক্রমণ পরিহার করিবার জন্যও যেমন সাবধান হয়, তেমনই, অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইলেও আমাদিগকে তৎপ্রতিষেধক ব্যবস্থার অধীন হইতে হইবে—সাবধানে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ "ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিতঃ" সন্দেহ নাই—তথাপি একপাদ ধর্ম্ম এই ঘোর কলিতেও থাকিবে—নচেৎ সংসারস্থিতি অসম্ভব, কেন না, 'ধর্ম্মই' সকলকে "ধারণ" করিয়া রাখিয়াছে—"ধারয়তীতি ধর্ম্মঃ"। অতএব আমাদের সকলেরই এই এক চতুর্থাংশের ভিতরে অবস্থানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হওয়া উচিত। এই ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিতে পারিলে, আপাততঃ মন্দদশাপন্ন হইলেও পরিণামে কল্যাণ অনিবার্য্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে, যাইতেছে; কলির পর পুনরায় সত্যযুগের আগমন সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত বিষয়। প্রকৃতির যে লীলা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাহাতে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন, সায়ং, রাত্রি ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতেছে—আবার গ্রীষ্ম বর্ষাদিও চক্রবৎ ঘুরিতেছে। যে বৃক্ষটি আজ পুষ্পফলে সুশোভিত, কিয়দ্দিন পরে ইহা পত্রাদিশূন্য মৃতপ্রায় পরিলক্ষিত হইবে, তৎপর পুনরায় নূতন পত্রমুকুলাদির আবির্ভাবে ইহা শ্রীসম্পন্ন হইয়া আমাদের নেত্রোৎসবের কারণ হইবে। আমাদের 'সনাতন'

ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধেও ঐ কথা বলিতে পারি—এবং এই অবসাদের মধ্যে এইরূপ ভাব পোষণ করিয়াই আমরা সান্ত্বনালাভ করিয়া থাকি। স্পষ্ট কথায় বলিব যে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, অথবা মূর্ত্তিপূজা, অথবা আচারধর্ম্ম ইত্যাদি যে সকল বিষয় সনাতনধর্ম্মের বিশেষত্ব এগুলির উপর সেই মোসলমান আক্রমণের সময় হইতে (কেবল তাই বলি কেন, বৌদ্ধবিপ্লবের যুগ হইতেই) প্রচণ্ড আঘাত হইতেছে; মনে হয় যেন সনাতনধর্ম্মের ভিত্তিভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু ভয় নাই; যিনি গীতায় শ্রীমুখে বলিয়াছেন "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" তিনিই এই সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবেন। এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে—সমস্তই কলির বিকার—কালক্রমে এই বিকার কাটিয়া যাইবে। "ভাল"র জায়গায় "মন্দ" আসিতে দেখিয়া ঈশ্বরবিশ্বাসী ইংরেজ কবি টেনিসনের উক্তি মনে পড়ে—

> Old order changeth yielding place to new
> And God fulfils himself in many ways
> Lest one good custom should corrupt the world.

যখন লোকের দশায় মন্দ ঘটে, তখন তাহার গুণও দোষে পরিগণিত হয়; গরীব যদি বিনীতভাবেও অপরের ত্রুটি দেখাইয়া দেয়, তবে তাহার উপর "বে আদব" প্রভৃতি কটূক্তিবর্ষণ হয়; ভাগ্যবান্ যদি অন্যের দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহার মর্ম্মপীড়াও জন্মান, তথাপি তিনি "স্পষ্টবাদীর" সুখ্যাতি লাভ করেন। তাই প্রবাদ হইয়াছে "দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশিনাশী'—এবং "তেজীয়সাং ন দোষায়"। হিন্দুরমণী জীবনের সারসর্ব্বস্ব পতিদেবতার অসহ্য বিয়োগযাতনা পরিহারকল্পে—তথা পরলোকে স্বামীর সহ চিরসম্মিলন আকাঙ্ক্ষায়—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস-পূর্ব্বক জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল, ইহার ব্যাখ্যা হইল "নৃশংস বর্ব্বর" প্রথা। কেননা, হিন্দু এখন

পরপদানত ভাগ্যহীন জাতি। এদিকে রুশবিজয়ী জেনারেল নোগি সস্ত্রীক "হারিকিরি" করিয়া স্বর্গত মিকাডোর অনুগমন করিলেন—জগতে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। কেননা জাপানের এখন একাদশস্থ বৃহস্পতি—জাপান সৌভাগ্যশালী। এই ভাবেই আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ—অর্থাৎ ইংরেজী-শিক্ষাদীক্ষায় যাঁহারা গঠিত,—সনাতনধর্ম্ম ও সমাজের ব্যবস্থাগুলির বিচার করিয়া থাকেন। বিজেতা জাতির যা' কিছু তা'ই ভাল, আর আমরা পদানত, আমাদের যা' কিছু তা'ই খারাপ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাদের এইটিই ধারণা; তাই হিন্দুদের বর্ণাশ্রম বিভাগকে "জাতিধর্ম্ম বেষ" নামে "পৃথ্বীরাজ"-কবি ভূয়োভূয়ঃ অভিহিত করিয়া, ইহা আমাদের অবনতির একতর নিদানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং" বলিয়া শ্রীভগবান্ যাহা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন; "যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত্য দেশের কাউন্ট টল্‌ষ্টয় প্রভৃতি মনীষিগণের ও সোশিয়ালিষ্টগণের জীবনের চরম স্বপ্ন; ভারতবর্ষীয় যে সমাজে শৃঙ্খলার ফলে এখনো হিন্দু জাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অন্য জাতীয়গণের তুলনায় অনেক কম; ভারতবর্ষের যে পুণ্য সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্যদেশের দারুণ জীবন সংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়;"* কেবল কাউণ্ট টল্‌ষ্টয় কেন, গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর "রিপ্লাবিক্"এ এবং কোম্‌তের দর্শনেও যাহার ন্যায় সমাজব্যবস্থা আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছে; সেই বর্ণবিভাগ-ব্যবস্থাকে এভাবে হেয়রূপে প্রতিপাদিত করা সমাজহিতৈষী যোগীন্দ্র বাবুর উচিত হয় নাই। হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, কাল প্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই বর্ত্তমান অধোগতি ঘটিয়াছে।

* ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কৃত "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। ডাঃ রায় জাতিবিভাগের বিষমবিরোধী হইয়াও যে এইটুকু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা আমাদের শ্লাঘ্য বটে।

যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় অনেকেই ইহার ভিতরে একটা "দ্বেষ" দেখেন—ইহা ব্রাহ্মণকে শূদ্রের প্রতি "তুই হীন," "তুই ছোট" বলিতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু তাঁহারা এটুকু তলাইয়া দেখেন নাই যে, জাতিভেদের সঙ্গে অপর একটা বিষয়ও আছে, তাহা "জন্মান্তর বাদ"। ব্রাহ্মণ জন্ম যদি শ্লাঘনীয় হয়, তবে ইহা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতেরই ফল; ইহজন্মে দুষ্কৃতি করিলে আবার নীচযোনিতে যাইতে হইবে। এই যদি শাস্ত্র ব্যবস্থা হয়, তবে দম্ভদ্বেষ ইত্যাদির অবসর কোথায়? একজন অন্যের হাতে না খাইলেই যদি ঘৃণাপ্রকাশ হয়, তবে সদাচার ব্রাহ্মণ যে অনুপনীত বা অমন্ত্রক প্রাণাধিক আত্মীয়ের হাতেও খান না, এটাও কি 'ঘৃণা' বশতঃ? ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে আছে, তদীয় প্রপিতামহদেব তাঁহাকে কত স্নেহ কত আদর করিতেন; কিন্তু একদিন বালক শিবনাথ প্রপিতামহের পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করাতে তিনি আর সেদিন আহার করেন নাই। আমাদের পল্লীগ্রামে আমরা নাপিত ধোবা এমন কি মোসলমানকেও দাদা, কাকা, চাচা ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া সম্মান দেখাইয়াছি। তবে শহরে শুনিয়াছি সাহেবের হোটেলে গিয়া আহারে বসিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিবিশেষকে দেখিয়া বাবু বলিয়া উঠিলেন, "বেটা উইল্‌সন্ এবার আক্কেলটা মারলে—সোনার বেণের সঙ্গে এক সাথ খেতে বসালে!" এরূপ চিত্র দেখিয়া কোনও ব্যবস্থার বিচার চলে না।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জাতিভেদকে পতনের কারণ বলা কোনও রূপেই সঙ্গত হয় না। 'জয়চন্দ্র' ও 'পৃথ্বীরাজ' উভয়েই একজাতীয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত; ইহাদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ তো জাতিভেদমূলক নহে। সেইরূপ মীর্ জাফর ও সিরাজউদ্দৌলা একই ধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি ভেদ আসিল কোথা হইতে? পতনের মূলে একতার অভাব, তাহা বর্ণভেদমূলক নহে, দুরাকাঙ্ক্ষা স্বার্থপরতা ইত্যাদিই অনৈক্যের নিদান। রাজনীতিক্ষেত্রে ইহাই সার কথা—

United we stand, divided we fall—

"একতায় স্থিতি আর অনৈক্যে পতন"।

কবি রঙ্গলাল যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন ;
সেভাব থাকিত যদি পার হ'য়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন ?"

অতএব জাতিবিচারের উপর দোষারোপ করা বৃথা। বরং ভিন্ন জাতীয়ের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ এবং আহার বিহার ইত্যাদি না করাতে হিন্দুর বিশেষত্বটুকু এত শতাব্দীর অধীনতা সত্ত্বেও বজায় আছে—নচেৎ হয়তো এই জাতি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইত।

যোগীন্দ্র বাবু 'পৃথ্বীরাজ' কাব্যের 'গ্রন্থাভাসে', 'দ্বিতীয় সর্গে' ও 'পঞ্চদশ সর্গে' হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অনেক গলদ ঘাটিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি যে ন্যায্য কথাই আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আবার কতকগুলি বিষয় গ্রন্থকারের সমাজসংস্কারবিষয়ে পক্ষপাতিত্ব হেতুক কাব্যে স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে 'জাতিধর্ম্মদ্বেষ' বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। সুখের বিষয়, প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে মোসলমানদের টিট্‌কারীর সুন্দর জবাব কবি তুঙ্গাচার্য্যের মুখে (দশম সর্গে) দেওয়াইছেন।* এছাড়া আমাদের, অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী শাস্ত্রবিশ্বাসীর, মনে আঘাত লাগিতে পারে এমন অনেক কথা প্রাগুল্লিখিত

* এই নিমিত্ত আমরা যোগীন্দ্রবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ; ধূর্জ্জটিরূপে যে সংস্কারকদের দলভুক্ততা তাঁহার সম্বন্ধে অনুমিত হইয়াছে, তাঁহারা তো মূর্ত্তিপূজাকে 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া এটাও পতনের একটা কারণ মনে করিয়া থাকেন ;—"enervating influence of idolatry" কথাটা ইঁহাদেরই উক্তি।

অংশে রহিয়াছে—সেগুলির জবাব চলিতে পারে; তন্মধ্যে সহমরণ প্রথাসম্বন্ধেও ইতঃপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু অপর সকল কথার আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিবিস্তৃত হইয়া যায়, তাই এস্থলে ক্ষান্ত হইলাম। বিশেষতঃ ঈদৃশ দু'একটি বিতর্কের জবাব ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধের উত্তরে "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস" নামক পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

যেগুলি ন্যায্য বলিয়া ধরিয়া নিয়াছি সে সকল বিষয় প্রত্যেক জাতির পতনের ইতিহাসেই দেখা যায়; যথা গৃহবিবাদ মূলক অনৈক্য ইত্যাদি।

আমাদের জাতিগত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে কবি মোসলমানদের আক্রমণ ও ভারত অধিকার কল্পনা করিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার নিজেরই উক্তি প্রতিকূল বলিয়া বোধ হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অর্থতো পাপের সংশোধন ও দূরীকরণ?—মোসলমান আসাতে আমাদের কোন্ পাপটা লুপ্ত হইয়াছে, কবি তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে ভাল হইত। "পৃথ্বীরাজ" কাব্যে সমাজের যে যে দোষ কবি দেখাইয়াছেন, তাহা শিবাজীর অভ্যুত্থান সময়েও প্রায় সমস্ত বর্ত্তমান ছিল—তথাপি শিবাজীর অভ্যুদয় হইল কেন?

"শিবাজী" কাব্যের একাদশ সর্গে রামদাসস্বামীর মুখে কবি যে সকল যুক্তিদ্বারা শিবাজীকে উৎসাহ দান করিয়াছেন, তাহার অনেকটা পৃথ্বীরাজেও খাটে; এবং দু'একটা কবির কল্পনাপ্রসূতও বটে। শিবাজীর ন্যায় পৃথ্বীরাজও উৎসাহী শূর ছিলেন, একবার মোসলমানদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিতও করিয়াছিলেন। শিবাজীর যেমন 'সখীবাই' পৃথ্বীরাজেরও 'সংযুক্তা' "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ" ইত্যাদি ছিলেন। পরন্তু পৃথ্বীরাজের চিত্তোররাজের ন্যায় মিত্রও ছিলেন—শিবাজীর ঈদৃশ কোনও মিত্র সহায় ছিলেন না। পৃথ্বীরাজের যেমন কনোজ কাশ্মীর প্রতিপক্ষ

ছিল, শিবাজীরও জয়সিংহ প্রভৃতি রাজপুত একদিকে, অপরদিগে বিজাপুর প্রতিপক্ষ ছিল—অথচ মোগল তখন সম্রাট্‌ভাবে মহারাষ্ট্রের উপরও আধিপত্যসম্পন্ন ছিল; পৃথ্বীরাজের শত্রু মোসলমানের তখন ভারতবর্ষে কোনও অধিকারই ছিল না। সমগ্র মহারাষ্ট্র যেমন শিবাজীর অনুরক্ত ছিল, আজমীর ও দিল্লী এই দুই রাজ্যের লোকও পৃথ্বীরাজের জন্য প্রাণ দিতে সতত প্রস্তুত ছিল। শিবাজীর যেমন সাধু রামদাস গুরু ছিলেন কবি পৃথ্বীরাজকেও তাদৃশ একটি গুরু—তুঙ্গাচার্য্য—দিয়াছেন। জাতিভেদ মহারাষ্ট্রেও ছিল, দিল্লীতেও ছিল। ধর্ম্মভেদ (শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি) দিল্লীতেও যেমন ছিল, মহারাষ্ট্রেও তেমনই ছিল। কবি যে শৈব ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের দাঙ্গা, অথবা দেবমন্দিরে দেবদাসীর প্রশ্রয় অথবা চাণ্ডালের (পারিয়ার) প্রতি ব্রাহ্মণের ঘৃণার ভাব * ইত্যাদি (পৃথ্বীরাজের) পঞ্চদশ সর্গে দেখাইয়াছেন—সেগুলিতো আধুনিক কথা, শিবাজীর অভ্যুদয়ের পরের কথা, এসকল চিত্র "শিবাজী"তেও তো (অগস্ত্য মুনি ইচ্ছা করিলে রামদাসকে) দেখাইতে পারিতেন—যেমন পৃথ্বীরাজে" তুঙ্গাচার্য্যকে দেখান হইয়াছে। "পৃথ্বীরাজে" যেমন মোসলমানেরা হিন্দুদের ধর্ম্ম ও সমাজের নিন্দা করিয়াছে, "শিবাজী"তেও (পঞ্চম সর্গে এবং দ্বাদশ সর্গে) তেমনই করিয়াছে—ইহাতে অন্য ধর্ম্মীর চক্ষে উভয়ের সময়েই হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের মৌলিক বিষয়গুলি নিন্দনীয়ভাবেই প্রতিভাত হইয়াছে।

অতএব মোসলমানের আগমনে আমাদের প্রায়শ্চিত্তটা (কেবল অত্যাচার ভোগ ব্যতীত) কিরূপে হইল, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। কলির প্রবলতা হেতুক ধর্ম্মের সঙ্কোচবশতঃ আমরা যে পাপের ভোগ

---

* পরন্তু গুণবান্ চণ্ডালের প্রতি সম্মাননার কথাও তো দেখা যায়—যথা "চাণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ," "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে" ইত্যাদি।

ভুগিয়াছি ও ভুগিতেছি, সেটা নিঃসন্দেহ। মোসলমান দ্বারা সংশোধনটা কোন্‌ভাবে হইল তাহা বুঝা গেল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগতের সমস্ত কার্য্যই ভগবদিচ্ছায় ঘটিতেছে; এই মোসলমান কর্ত্তৃক ভারত অধিকার অবশ্যই তাঁহারই ইচ্ছায় সংঘটিত। কবি যোগীন্দ্র বাবু ইহাতে "উদ্দেশ্য" দেখিয়াছেন এবং "শিবাজী" কাব্যের অন্তিম সর্গে রামদাস স্বামীর মুখে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।—

দুর্জ্ঞেয় বিধির বিধি, কিন্তু লক্ষ্য তাঁর
চরম কল্যাণ। বৎস দেখ বুঝি তুমি,
অধর্ম্মে অসদাচারে জাতিজাতি বেধে
মগ্ন দেখি হিন্দুগণে বিশ্বপতিদেব
পাঠাইলা মুসল্মানে, অভিপ্রায় তাঁর
জ্ঞানে প্রেমে ধর্ম্ম তারা করিবে প্রচার;
হবে শিষ্য, হবে গুরু আদানে প্রদানে।
শিখিবে মাধুর্য্য প্রেম ঔদার্য্য হিন্দুর;
শিখাইবে মানবের ত্রাতাপাতা যিনি
প্রচারলা যাঁর কথা পূর্ব্ব ঋষিগণ
এক অদ্বিতীয় তিনি, অরূপ অব্যয়।
বুঝাইবে তাঁর কাছে চণ্ডালে ব্রাহ্মণে
নাহি ভেদ জাতিদর্প ধর্ম্মবিঘ্নকর।
কিন্তু মোহবশে ভুলি' কর্ত্তব্য আপন
পঞ্চশত বর্ষ তারা রহি হিন্দুস্থানে
না পড়িল হিন্দুশাস্ত্র, না লভিল জ্ঞান;
না পারিল শিখাইতে না শিখিল নিজে;
বিচারিল ধ্বংসে ভয়ে সিদ্ধ হবে কাজ।

প্রভুত্ব ঐশ্বর্য্য লভি মজিল ব্যসনে,
অবজ্ঞায় অত্যাচারে পীড়িল হিন্দুরে।
প্রচারিল জাতিভেদ জেতাজিতরূপে
শতগুণ মর্ম্মন্তুদ।—"

এখানে, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে এই যে একটা "উদ্দেশ্য" আরোপিত হইল, কবি দেখাইলেন যে সেই উদ্দেশ্য বিফল হইল—মোসলমানগণ না শিখাইল, না শিখিল—অর্থাৎ ভগবানের চালে ভুল হইল। যোগীন্দ্র বাবু বোধ হয় এটা ভাবিয়া দেখেন নাই—দেখিলে এরূপ লিখিতেন না। অপিচ মোসলমানের ঈশ্বর আর আর্য্যঋষিগণের 'ব্রহ্ম' (অরূপ অব্যয় দ্বারা ইহাই বোধ হয়) একই জিনিস নহে; "নেদং যদিদমুপাসতে" আর মোসলমানের উপাস্য (সগুণ) "রহিম ও রহমান্" (দয়ালু ও ন্যায়বান্) আল্লা একবস্তু হইতেই পারেন না। দুঃখের বিষয়, কবি ("পৃথ্বীরাজ" দশম সর্গ) তুঙ্গাচার্য্য দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে মোসলমানদিগকে তর্কে নিরুত্তর করাইয়াও ভবানীভক্ত শিবাজীর গুরুর মুখে এইরূপ বলাইলেন।

কবি আরও একটি ভুল করিয়াছেন—এই "শিবাজী"রই "প্রস্তাভাসে"। তিনি ক্ষত্রিয়-বিনাশ নিমিত্ত পরশুরামকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। পরশুরাম ত্রেতাযুগের অবতার—ত্রেতার মধ্যভাগে তিনি ত্রিসপ্তকৃত্বঃ ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" যিনি মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যে আইসেন, পরশুরাম তিনিই; তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপ—সেটাও ত্রেতা দ্বাপর কলিব্যাপী—বড়ই অশোভন হইয়াছে। প্রাণিবধে পাপ আছে—বিষধর সর্প মারিলেও কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; পরশুরাম তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু বলগর্ব্বিত যে দুষ্টক্ষত্রিয়গণ নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের সমূলে ধ্বংস সাধন করিয়া তাঁহার

অনুতপ্ত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। তাঁহার ক্ষত্রিয় নাশের ফলে ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয়হীন অথবা বীর্য্যহীন হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং পরশুরামের পরবর্ত্তী—এবং পরশুরামের ক্ষাত্রতেজোগর্ব্ব দূরীকরণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণে পরিণত করিয়াছিলেন। * ইহারও বহুকাল পরে মহাভারতের যুদ্ধ হয়—তাহাতে অসংখ্য ক্ষত্রিয় যোগদান করেন এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ভারতযুদ্ধের পর অশ্বমেধ পর্ব্বেও সুবহু ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দেখা যায় এবং দ্বারকায় যদুবংশ তাহারও পরে (মুষলপর্ব্বে) বিধ্বস্ত হয়। যোগীন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণ পরশুরামের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া বরং ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা জ্ঞাতিবধজনিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেই শোভন হইত। তবে শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা বহুদিন হইল সংবরণ করিয়া গিয়াছেন, শিবাজীর আবির্ভাবের প্রাক্কালে তাঁহাকে টানিয়া আনা যায় না, এই যদি আপত্তি হয়, তবে স্থানটা "সহ্যাদ্রি" স্থলে "বৈকুণ্ঠ" করিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। যত নষ্টের মূল তো শ্রীকৃষ্ণই—কেন না অর্জ্জুন তো জ্ঞাতিবধ করিতে নারাজ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইনিই "যুধ্যস্ব ভারত" বলিয়া প্ররোচনা দিয়া বিপুল কুরুকুল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু বহু ক্ষত্রিয়ের সংহারসাধন করিয়াছিলেন। ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া অশ্বমেধে হতাবশিষ্ট বহু-ক্ষত্রিয়ের বিনাশে সহায় হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজের অতি বিশাল বংশটি নির্ম্মূল করিয়া তবে ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। কবি বরং আরো আড়াই হাজার বৎসর পরবর্ত্তী আর একজন অবতারকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পারিতেন—ইনি রাজ্যপাট ছাড়িয়া প্রথম যৌবনেই যতিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বলিয়া যে এক বাণী প্রচার করিলেন, ইহার ফলেই ভারত নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল,

* ব্রাহ্মণের কুলে ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন পরশুরামের জন্মরহস্য এস্থলে স্মরণযোগ্য; বাহুল্য ভয়ে সেই কাহিনী বিবৃত করা হইল না।

এটা অনেকেই বলিয়া থাকেনও বটে। * সে যাহা হউক, পরশুরাম ব্রাহ্মণ বলিয়া এবং তৎকৃত ক্ষত্রিয়ধ্বংস ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিত বিগ্রহ ব্যাপার বলিয়া যদি কায়স্থ কবি এই উদ্ভট দৃশ্যের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। তবে যোগীন্দ্র বাবু কায়স্থকে ক্ষত্রিয় মনে করেন কিনা, এবং তাঁহার ঈদৃশ জাত্যভিমান আছে কিনা, আমরা অবগত নহি; তাঁহার কাব্যে তো জাতিধর্ম্মদ্বেষের বহুশঃ নিন্দাবাদই রহিয়াছে।

এখন পৃথ্বীরাজের পতন এবং শিবাজীর উত্থান সম্বন্ধে যথামতি দুএকটি কথা বলা যাইতেছে।

শৌর্য্যবীর্য্য আভিজাত্য ইত্যাদি নানাবিষয়ে পৃথ্বীরাজ শিবাজী অপেক্ষা শ্রেয়ান্ ছিলেন,—শিবাজী সামান্য একজন জায়গীরদারের ছেলেমাত্র, শিক্ষাদি বিষয়েও হীন ছিলেন। তথাপি শিবাজীর পরম সৌভাগ্যবশতঃ সদ্গুরু লাভ হইয়াছিল এবং তাঁহার কৃপায় 'ভবানী'তে দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। "পৃথ্বীরাজে" তুঙ্গাচার্য্য কবির কল্পনামাত্র—এবং এই তুঙ্গাচার্য্যকেও কবি এক "মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি"র উপাসক করিয়াছেন—"দেবী শুভঙ্করী" দেশমাতৃকার সাকার মূর্ত্তি—৺ভূদেব বাবুর "পুষ্পাঞ্জলি"তে এইরূপ মূর্ত্তি কল্পিতা হইয়াছেন এবং ৺বঙ্কিম বাবু "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে ইঁহারই বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু রামদাসশিষ্য শিবাজী এইরূপ 'কল্পিত' মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন না—তন্ত্রসম্মত জাগ্রৎ দেবীমূর্ত্তির ভক্ত ছিলেন—তাঁহার কৃপালব্ধ 'অসি' দ্বারা সমরবিজয়ী হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ নানা গুণসম্পন্ন হইয়াও ইন্দ্রিয়-বিজয়ী পুরুষ ছিলেন না—দেশের প্রতি মোসলমানদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন প্রণয়ব্যাপারের প্রশ্রয় দিবার সময় নহে। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের

* নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলম্" এরূপ কথা পুরাণে আছে; তদ্দ্বারা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অল্প পরেই যে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হয়, তাহাই সূচিত হইতেছে।

সাক্ষাৎ মাতৃষস্রের ভ্রাতার কন্যা—কবি এই সম্পর্কই গ্রাহ্য করিয়াছেন। শাস্ত্রতঃ এই কন্যা পরিণয়যোগ্যা নহে। তাও আবার প্রবল প্রতিপক্ষের দুহিতা। পৃথ্বীরাজের ঐদিকে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এদিকে শিবাজী এ সকলের অতীত ছিলেন; ৺ভূদেব বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস "অঙ্গুরীয় বিনিময়ে" দেখা যায়, শিবাজীর নিমিত্ত একটা প্রণয়ের ফাঁদ কল্পিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে পতিত হন নাই। শিবাজী যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ যদি একটু অভিমান ত্যাগ করিয়া জয়চন্দ্রের ছন্দানুবর্ত্তন করিতে পারিতেন,—জয়চন্দ্রের "রাজসূয়ে" যোগ দিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যলিপি বোধ হয় অন্যরূপ লিখিত হইত। "মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ" দুর্য্যোধনও তো যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে উপস্থিত থাকিয়া আত্মীয়তা দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তাহা করা দূরে থাকুক তিনি জয়চন্দ্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার কন্যাহরণ করিয়া বিদ্বেষবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়াছিলেন। বিগ্রহ ব্যাপারে—বিশেষতঃ কূটকপট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে—যেরূপ চালের প্রয়োজন ছিল, পৃথ্বীরাজ সে বিষয়ে সম্যক্ অবহিত ছিলেন না—"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতি শিবাজী খুবই জানিতেন। তবে শিবাজী এবিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন—পূর্ব্ববর্ত্তী চারিশতাব্দী যাবৎ দেশের উপর মোসলমানদের যে শাসননীতি চলিয়া ছিল, শিবাজী তাহার খোঁজ খবর রাখিয়া স্বীয় নীতি গঠন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ সদ্গুরুর কৃপায় এবং ভবানীর প্রতি দৃঢ়ভক্তি হেতু শিবাজীর বুদ্ধিতে নির্ম্মলতা বাহুতে বল ও হৃদয়ে অপরিসীম উৎসাহ জন্মিয়াছিল, তাই তিনি প্রকৃত পথ দেখিতে পাইতেন; শত্রুর বলদর্প চূর্ণিত করিয়াছিলেন এবং ছত্রপতিপদাভিষিক্ত হইয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজের পতনের ও শিবাজীর অভ্যুদয়ের কাহিনী পাঠ করিয়া যাহাতে আমরা উদ্বুদ্ধ হই কবির এই সাধু অভিপ্রায় প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথম জীবনের ধূর্জ্জটিত্ব অর্থাৎ সমাজসংস্কারের ঝোঁক এখনও তাঁহার যায় নাই। তাই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে আস্থাবান্ ব্যক্তির প্রতিবাদযোগ্য অনেক কথা—অনেকটা অবান্তরভাবে—তদীয় কাব্যের বিষয়ীভূত হইয়াছে, আমরা ঈদৃশ দু'একটি কথার মাত্র প্রতিবাদ করিলাম। এতদতিরিক্ত কবি ও কাব্যসম্বন্ধে সামান্য কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে বটে, পরন্তু কাব্যের উৎকর্ষ বিচারে হস্তক্ষেপ কিছুমাত্রই করা হয় নাই,—তবে অপরাপর সুধীবর্গ ও সমালোচকগণ তদ্বিষয়ে যেরূপ প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, আমরা তাহাতেই যোগ দিয়া কবিকে অভিনন্দিত করিতেছি। * বর্ত্তমানে তাঁহার ধর্ম্মমত কি, জানিনা কিন্তু "শিবাজী" গ্রন্থে তিনি যেরূপ আন্তরিকতা সহকারে ভবানীস্তোত্রের' অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে দেবীর একজন বিশ্বাসী ভক্ত বলিয়াই মনে হয়। তাই উপসংহারে প্রার্থনা করিতেছি, আনন্দময়ী মা ভক্ত কবির জীবনের অপরাহ্নকাল আনন্দময় করুন।

---

* কবির ভাষা ও রচনাপদ্ধতি সুন্দর, শব্দপ্রয়োগও সুষ্ঠু হইয়াছে। তবে 'গ্রহাভাস' বোধহয় "গ্রহাভাষ" হইবে; "উচিৎ," 'নিশ্চিৎ' ইত্যাদি অবশ্যই ছাপার ভুল। 'ও' এবং 'ই' [যেমন কোন (ও); তার (ই) ইত্যাদি] বন্ধনী মধ্যে দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি; তত্তৎ স্থলে 'ও' ও 'ই' কে পুর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিলেই চলে, কেন না ঐ অক্ষর সর্ব্বদাই হসন্ত উচ্চারিত হইয়াছে, নচেৎ ছন্দঃপাত হইত। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারও 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' লিখিয়া এবিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা—২

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

৺ কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা হইতে
শ্রীগোপীচন্দ্র শর্ম্ম সাংখ্যতীর্থ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৮৩৬

৺কাশীধাম, ভারতধর্ম্ম প্রেসে,
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বাগচী দ্বারা
মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—
৺কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা
সোনারপুরা চৌরাস্তা বারাণসী।
নিগমাগম পুস্তকালয়
জগৎগঞ্জ বারাণসী।

মুখবন্ধ।

—:*:—

শ্রীশ্রী৺কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণ সভা কর্তৃক প্রবর্ত্তিত সমাজ হিতকর গ্রন্থমালার দ্বিতীয় সংখ্যারূপে "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ" প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের মূল প্রবন্ধত্রয়ের মধ্যে প্রথমটি "সাহিত্য" পত্রের ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায়, দ্বিতীয়টি ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় এবং তৃতীয়টি ১৩২৮ সালের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। "সাহিত্য" পত্রেই ঐ সকল প্রবন্ধের প্রতিবাদরূপে কতকগুলি লেখা বাহির হয়, ঐগুলির উত্তর ১৩২৮ সালের "সাহিত্যে" পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—তাহা এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টরূপে পুনর্মুদ্রিত হইল। তারপর "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে একটি প্রবন্ধ ঐ পত্রে "৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়" এই শিরোনামে ১৩২৯ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ "ব্রাহ্মণ সমাজ" ও "কায়স্থ পত্রিকা"য় বাহির হয়—সেই প্রতিবাদ দুইটির উত্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-তীর্থ ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী এই মহোদয় দ্বয় কর্তৃক যথাক্রমে "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রের ১৩৩০ সালের ভাদ্র ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'ব্রাহ্মণ সমাজে'র এই তিন প্রবন্ধ এতদ্ গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টরূপে পুনর্মুদ্রিত হইল। উত্তর হইতেই প্রতিবাদ প্রবন্ধ সমূহের প্রতিপাদ্য কথা গুলি হৃদয়ঙ্গম হইবে—তাই ঐসকল প্রতিবাদ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

পুনর্মুদ্রিত প্রত্যেক প্রবন্ধেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংশোধন ও সংযোজন করা হইল।

'সাহিত্যে' ও 'ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রে মদীয় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইলে বহু ব্যক্তিই আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া সমাজের হিতকল্পে

এগুলি পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দুইটি (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ) হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়া "মর্য্যাদা" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—ইহাতেও প্রবন্ধগুলির গ্রন্থাকারে পুনঃপ্রচারে সমধিক উৎসাহ জন্মে। পরিশেষে ৺কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণসভা কর্ত্তৃক প্রকাশভার গৃহীত হইলে এই গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল।

আমার পক্ষে "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রে প্রাগুক্ত যে দুই মহোদয় প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন, অপিচ, যাঁহাদের নিকট হইতে এই সকল প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে পুনঃ প্রচারার্থ উল্লেখিতানুরূপ উৎসাহ লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করিতেছি।

কিরূপে এবং কি উদ্দেশ্যে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহা প্রবন্ধাবলীর মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইবে—এস্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ইতি—

৪৫ নং হাউস কটরা,
৺কাশীধাম।
লক্ষ্মীপূর্ণিমা, শকাব্দাঃ ১৮৪৩। }

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আসামে বিবেকানন্দ।*

আজ (১৩২৭) ঠিক্ ২০ বৎসর হইল, স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি শহরে সদলবলে আগমন করেন ; এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ৺ কামাখ্যা দর্শনান্তে শিলং যান এবং তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ দু-একদিন এখানে থাকেন। তখন গৌহাটিতে সেন্‌সাস্ আফিস ছিল—সেই আফিসে কাজ করিতাম। তাই বিবেকানন্দের দর্শনলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল—শিলং যাওয়া-আসা উভয় কালেই তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল।

১৩০৭ সালের মহাবিষুব সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি শহরে আগমন করেন। সঙ্গে অনেক পুরুষ এবং দু-একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন—তাঁহার জননীও না কি ৺ কামাখ্যা দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবস্থানের নিমিত্ত একটি

---

* 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইবার জন্য যখন ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্র কয়েকখানি পাঠাই, তখন ৺সুরেশ সমাজপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, ঈদৃশ আরো চিঠিপত্র আছে কি না? উত্তরে লিখি, যে সকল চিঠি আছে, তাহার লেখকগণ সৌভাগ্যক্রমে জীবিত—তবে ৺স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি আসিলে তাঁহার সঙ্গে যে সকল আলাপ আলোচনা হয়, তাহা লিপি-বদ্ধ করিয়া প্রকাশার্থে পাঠাইতে পারি—কিন্তু সে সব স্বর্গীয় স্বামীজির তেমন গৌরবজনক না হইবার কথা—বিশেষতঃ আমি তাঁহার 'ভক্ত'ও নহি। ইহার উত্তরে সুরেশ বাবু লিখিয়াছিলেন, '* * * আমি বিবেকানন্দের পরম ভক্ত বটে, কিন্তু আর কাহারও অভক্ত হইবার অধিকার নাই, তাহা মনে করি না। ইহাও বোধ করি বিবেকানন্দেরই শিক্ষা। সে যাহা হউক প্রবন্ধটি পাঠাইবেন। পাঠান্তে আমার অভিপ্রায় আপনার জানাইব। * * *' প্রবন্ধ 'সাহিত্যে' প্রেরিত হইল ; কিন্তু হায় সুরেশবাবুর অভিপ্রায় হইতে ইহা বঞ্চিত হইল।

(লেখক)

সুবৃহৎ 'বাঙ্গলো' ঘর দেওয়া হয়—এবং গৌহাটিস্থ সর্ব্বসাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের আহার ও যাতায়াতের ব্যয় প্রদান করা হয়।

বিষুব সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নে জনৈক ভদ্রলোক সহ আমি ঐ বাঙ্গলো ঘরে যাই। বারান্দায় একখানি টুলের উপর একটি গৌরবর্ণ 'গেরুয়া ধুতি ও গেঞ্জি পরা' লোক একাকী বসিয়া আছেন—চুলগুলি এলোমেলো, পান চিবাইয়া ঠোঁট লাল হইয়াছে; দেখিয়া মনে করিলাম, ইনি বোধ হয় স্বামীজির কোনও "চেলা" হইবেন। ইহার পূর্ব্বে স্বামীজির ছবি দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বড় বড় দুইটি চোখ ছাড়া এই মূর্ত্তির সঙ্গে, ছবি দেখিয়া যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কোনও সাদৃশ্য দেখিতে পাই নাই।* সে যাহা হউক, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম—'স্বামীজির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি—দেখা হইবে কি?' ইনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'তা, আপনাদের কি কথা আছে বলুন।' † তখন বুঝিলাম, ইনিই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ। সঙ্গী ভদ্রলোকটি আমার পরিচয় দিলেন। তখন নানা রূপ প্রসঙ্গ হইতে লাগিল।

কথায় কথায় উঠিল—আমাদের প্রাচীন সভ্যতার কথা।

* এখানে একটি অবান্তর কথা বলিতেছি। যতদূর স্মরণ হয়, স্বামীজির কপালে একটা দাগ—কাটার চিহ্ন—যেন দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার ছবিতে এরূপ কোনও দাগ দেখা যায় না। তাঁহার জীবনচরিতেও এই দাগের কথা আছে (স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু কৃত ২৮ পৃষ্ঠা)। তবে ছবিতে দাগটা থাকা কি ভক্তগণের অনভিপ্রেত বলিয়াই ইহা নাই? চরিতাখ্যানেও কি এরূপ হস্তাবলেপ ঘটিয়াছে?

† এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, এতদিন পরে স্মরণ করিয়া লেখাতে অনেক কথাই লিখিত পারা গেল না—যাহা লিখিত হইল, তাহাতেও ঠিক এইরূপ ভাষাতেই উক্তি প্রত্যুক্তি হইয়াছিল, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারিব না। তবে 'মর্ম্ম' এইরূপই ছিল, এটুকু বলিতে পারি। দিন-তারিখ হুবহু ঠিক না হইতে পারে, কেন না আমার কোনও 'ডায়েরি' নাই।

স্বামীজি বলিলেন, "বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বে এদেশে স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় না।" আমি বলিলাম, "কেন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে কত উৎকৃষ্ট সৌধ প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে।" তিনি বলিলেন—"ও সব অত্যুক্তিপরিপূর্ণ বর্ণনা।" তার পর প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—"এই যে আপনার গলায় পৈতা, এটাও পারসীকদের কাছ হইতে পাওয়া গিয়াছে।" আমি বলিলাম "সে কি, উপবীত শোধনের যে বেদমন্ত্র আছে—তাতে 'যজ্ঞোপবীত' শব্দটিও তো স্পষ্ট রহিয়াছে!" তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, ঐ মন্ত্রটা পড়ুন তো?" পড়িলাম, "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং" ইত্যাদি। তখন বলিলেন, "দেখুন, এ মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত; ইহার শব্দ ও ছন্দঃ আধুনিক।" আমি একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলাম—"তা হ'লে স্বামীজি, আপনাতে আর দয়ানন্দে * কোনও প্রভেদ দেখিতেছি না; এরূপ অবস্থায় কোনও তর্ক চলিতে পারে না।" ফলতঃ ঐরূপ আলোচনার ঐখানেই বাধা পড়িল—আর কোনওরূপ 'তর্ক বিতর্ক' তাঁহার সঙ্গে আমার হয় নাই।

অতঃপর আরও কিছুকাল কথাবার্ত্তা হইল—অবশেষে জানা গেল স্বামীজি পরদিন সংক্রান্তিতে (খুব সম্ভব) কামাখ্যা দর্শন করিবেন এবং তৎপরদিন বশিষ্ঠাশ্রমে যাইবেন।

সঙ্গী ভদ্রলোকটীর সহিত পরামর্শ করিয়া আমরা কয়েকজন মিলিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে বশিষ্ঠাশ্রমে গেলাম। আশা ছিল, স্বামীজি সদলবলে সেখানে যাইবেন—তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইবার যথেষ্ট সময় ও সুবিধা পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগকে বড়ই নিরাশ হইতে হইল—কোনও কারণে তিনি সেদিন বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে পারেন নাই। ক্ষুণ্ণমনে শহরে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, স্বামীজির বক্তৃতা হইতেছে। দ্রুতগতিতে বক্তৃতার জায়গায় গিয়া দেখি, লোকারণ্য,

---

* পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

এই ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া তখন অসম্ভব হই দাঁড়াইয়াছে। শুনিলাম ইতঃপূর্ব্বে সভায় পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে না কি স্বামীজির সংস্কৃত ভাষায় কিছি কথোপকথন হইয়াছিল ; সকলেই তাঁহার সংস্কৃত আলাপে দক্ষতা দেখি মুগ্ধ হইয়াছিলেন ।

আমি যখন গিয়া জনতার পশ্চাদ্ভাগে কথমপি দাঁড়াইতে সম হইলাম, তখন সভা নিস্তব্ধ—স্বামীজি দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দিবে না, বসিয়াই দু'চারি কথা বলিবেন। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলে "একটা প্রসঙ্গ তুলুন—কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, তদবলম্বনে কি বলিতে পারি।" কিন্তু সমবেত জনগণের মধ্যে কেহই অগ্রসর হই কোনও প্রশ্ন করিতেছেন না দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সে ভট্‌চাজ্জি কোথায় ?" একজন, "ভট্‌চাজ"র সঙ্গে স্বামীজির সেই দিনে তর্কবিতর্কের কথা বোধ হয় শুনিয়াছিলেন, তাহ, বুঝিতে পারিয় উত্তর দিলেন—"উনি বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়াছেন।" তখন কিন্তু খো "ভট্‌চাজ্জি" জনতার অন্তরালে—সাড়া দিবার অবস্থায় না থাকা চুপ করিয়াই রহিয়াছিলেন। সে যাহা হউক—এই প্রশ্নোত্তরে সভা নীরবতা ভঙ্গ হইল—তাই অপর একজন ঐ সময়ে বলিলেন,—"জাতি বিচার উপলক্ষ্য করিয়া কিছু বলুন।"

তদুত্তরে স্বামীজি যাহা বলিলেন, তাহাতে জাতিভেদের উপকারিত প্রথমতঃ প্রদর্শন করিলেন ; অবশেষে ইহার সঙ্গে যে স্পৃশ্যাস্পৃশ বিচার জড়িত রহিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে বহু বলিলেন। সেই সময়েই দুই কথা তাঁহার মুখ হইতে শুনি ; (১) 'হাঁড়িধর্ম্ম,' (২) 'ছুঁৎমার্গ' তখন, "খুলিল বাক্যের দ্বার না লাগে কপাট"—'জাতিবিচার' ছাড়িয় নানা প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। এই জাতিটা একটা জড়পদার্থ, সেই মনুর সময় হইতে একই ভাবে চলিয়াছে—'রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনো

র্বত্মনঃ পরম্। ন বাতীয়ুঃ প্রজ্ঞাঃ'—এটা কি ভাল? এইরূপ জড়তায় দেশ উচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে—বুদ্ধি খাটাইয়া একটা কিছু কর—না হয় বড় দরের একটা চুরি ডাকাতি কর—তবুও বুদ্ধি খুলুক, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথা বলিলেন। তাঁহার সেইদিনকার বক্তৃতা শুনিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব ধারণা বহুল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; তাঁহার 'চিকাগো' বক্তৃতা অথবা অপর যে সকল বক্তৃতা পড়িতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইয়াছিল, ইনি একজন বেদান্তবাদী ধর্ম্মপ্রচারক। কিন্তু ঐ দিনকার বক্তৃতায় বুঝিলাম যে, ধর্ম্মপ্রচার একটা 'খোলস' মাত্র—ভিতরে স্বতন্ত্র ভাব। জাতিটা তাঁহার মতে নিদ্রিত—এটা জাগিয়া উঠুক—উঠিয়া একটা নাড়া-চাড়া দিউক; খাদ্যাখাদ্য বিচার ইত্যাদিতে তাঁহার মতে সমগ্র জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দিতেছে না, সেটা উঠিয়া যাউক, ইত্যাদি। প্রকৃত ধর্ম্মবক্তা জাতিটার উপর একটা মোহের আবরণ দেখিয়া উদ্‌বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন বটে—কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্য যাহা আছে, তাহা দূর করিয়া দাও, "না হয় একটা বড় দরের চুরি ডাকাতি করিয়া বুদ্ধি খোল" এইরূপ উপদেশ কখনও দেন না।

অতঃপর স্বামীজির শিলং যাত্রার পূর্ব্বে আবার দুই দিন বক্তৃতা হয়। সেই দুই বক্তৃতা ইংরেজীতে নিয়মমত বিজ্ঞাপন দ্বারা বিষয় নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়। প্রথম দিন জনৈক বাঙ্গালী প্রবীণ উকীল সভাপতি হন—অপর দিন আসাম ভ্যালি ডিভিশনের কমিশনর মিঃ এ, পোর্টিয়াস্ বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। একদিন বিষয় ছিল "Transmigration of the Soul" এটা খুবই স্মরণ আছে; কিন্তু অপর দিনের বক্তৃতার বিষয়টি ঠিক্ স্মরণ নাই; তাহাতে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য ছিল, ইহাদ্বারা অনুমান হয়—"Vedanta in Indian life" এইরূপ একটা বিষয় ছিল।*

* এই অনুমানের একটা কারণ আছে। স্বামীজির বক্তৃতা লইয়া

তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জিনিসই বটে। কি সুমিষ্ট আওয়া কি সুন্দর আবৃত্তি—কি সুষ্ঠু শব্দযোজনা। বিশেষতঃ প্রথম দিন যাঁহা দেখিয়া 'বিবেকানন্দ' বলিয়া ধরিতে পারি নাই—তাঁহার সেই পাগ সেই আলখেল্লা দেখিয়া মনে হইল, "হাঁ! ইনিই সেই স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর ছবি পূর্ব্বে দেখিয়াছি।" তাঁহার বক্তৃতার রীতি ছিল পায়চারি করি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলা, যেন যাত্রার দলের অধিকারী। তাঁহার উজ্জ বিশাল নেত্রদ্বয়, সস্মিত সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল * এও এক দেখিবা জিনিস। ফলতঃ আজ বিশ বৎসর পরেও যেন সেই মূর্ত্তি চোখে ভাসিতেছে—সেই কণ্ঠস্বর কাণে বাজিতেছে। সাধে কি আমেরিক ক্ষেপিয়াছিল?

এই দুই বক্তৃতার দিন অনেক সাহেব বিবি সভাস্থ হইয়া স্বামীজি বক্তৃতা শুনিয়া ঘন ঘন করতালির দ্বারা হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

অতঃপর স্বামীজি শিলং চলিয়া যান। † সেখানেও তাঁহার অবস্থান ও অভ্যর্থনার জন্য বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ চাঁদা তুলিয়াছিলেন। সেখানে একদিন মাত্র বক্তৃতা হইয়াছিল। তারপর শ্বাসকাশে অভিভূত

উকীলদের বৈঠকখানায় আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে নাকি কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'বক্তৃতায় নূতন কিছুই নাই—পূর্ব্বে প্রদত্ত বক্তৃতারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে—মুখস্থ শক্তি খুব অদ্ভুতই বটে।' মাদ্রাজের নটেশান প্রকাশিত স্বামীজির বক্তৃতাবলীর ঐ বিষয়ক বক্তৃতাতেই 'দ্বা সুপর্ণা' শ্লোকের উল্লেখ ও তরজমা আছে।

* শুনিয়াছি, চেহারার চাক্‌চিক্য বিধানার্থ নাকি স্বামীজি গ্লিসেরিন্ ব্যবহার করিতেন।

† স্বামীজির শিলং যাওয়ার কয়েক মাস পরেই আমিও সেন্‌সাসের কাজে শিলং গিয়াছিলাম—এবং তত্রত্য বন্ধুবর্গের প্রমুখাৎ তাঁহার কাহিনী শুনিয়াছিলাম—তাই যথাশ্রুত দু'একটি কথা লিখিতে পারিলাম।

হইয়া পড়াতে বক্তৃতা দিতে পারেন নাই, বৈঠকী আলোচনা অবশ্যই হইয়াছিল। লোকপ্রিয় শাসনকর্ত্তা (স্যার) হেন্‌রী কটন চিফ্ কমিশনর ছিলেন। তিনি স্বামীজির খুব তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তিনি সভায়ও যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলে, স্বামীজি বক্তৃতারম্ভে বলিলেন;—"তীর্থস্থান পরিভ্রমণই সন্ন্যাসীদের কর্ত্তব্য, তাই কামাখ্যা হইয়া শিলঙে আসিয়াছি। এস্থানেও হেন্‌রী কটনের ন্যায় সাধু পুরুষ রহিয়াছেন—তাই ইহাও একটি তীর্থ—তীর্থীকুর্ব্বন্তি মাধবঃ" ইত্যাদি। শিলং শহরে পাঁঠা খুব শস্তা, আহার্য্য বস্তুর মধ্যে মাংসসম্ভারই সমধিক থাকিত—একদিন তাহাতে কিছু ত্রুটি ঘটাতে সঙ্গীরা না কি ক্রোধ প্রকাশও করিয়াছিলেন। শিলং হইতে ফিরিবার কালে বোতলে বোতলে "সুরুয়া" পাথেয়স্বরূপ আনীত হইয়াছিল। এই সকল কারণে, বিশেষতঃ অনৈক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবমতাবলম্বী ভদ্রলোকের একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি একটা অশ্লীল কথা বলাতে, * শিলঙে অনেকেই তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। নদীয়া ভাজনঘাটের বৈষ্ণ গোস্বামিবংশীয় অনৈক অত্যুচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বিবেকানন্দ অভ্যর্থনায় চাঁদা দিয়াছিলেন বলিয়া পশ্চাত্তাপগ্রস্ত হইয়া একদিন না কি উপবাসও করিয়াছিলেন।

শিলং হইতে ফিরিয়া স্বামীজী গোহাটিতে দুই চারিদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এবারও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ আলাপ

* সেই ভদ্রলোকটি এবিষয়ে যাহা (সম্প্রতি) লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল:—'* * * কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি "নামরূপ মিথ্যা" বলিয়া উঠিলেন। আমি তাহা শুনিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যদি তাহাই হয় তবে, 'নিত্যলীলার' অর্থ কি?" এই কথা শুনিবামাত্র স্বামীজি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'ঐ নিত্যলিঙ্গ আর ঐ নিত্যযোনি কি, তাহা আমি জানি না।' বলাবাহুল্য, ঐ বিষম কটূক্তি শুনিয়া আমি ও আমার সঙ্গে সঙ্গে ❀ ❀ ❀ দাদা প্রভৃতি অনেকেই মর্ম্মাহত হইলেন। ❀ ❀ ❀ উত্তর দিবার জন্য যখন আমি উদ্যত, তখন ❀ ❀ দাদা আমাকে লইয়া তাঁহার বাসায় গেলেন। ❀ ❀ ❀"

করিয়াছিলাম। একটি 'রুমে' তিনি ও আমি নির্জ্জনে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলাম—তিনি অকপটে এবং অত্যন্ত অমায়িক ভাবেই আলাপ করিয়াছিলেন। হাঁপানিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজি, শুনিয়াছি যোগীদের শ্বাসের উপর অধিকার জন্মে—এ দেখিতেছি শ্বাস আপনার উপর আধকার করিয়া বসিয়াছে! ইহার অর্থ কি?" তিনি উত্তরে মাত্র বলিলেন—"ভট্‌চার্জ মশায়, বলুব, বলুব।" আমি আর বাড়াবাড়ি করি নাই—কিন্তু মনে মনে যাহা ভাবিলাম—তাহা (যখন স্বামীজিকে বলিতে সাহসী হই নাই, তখন) এস্থলেও না বলাই সঙ্গত।

কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার আমেরিকার কাজের বিষয় উত্থাপিত হইল। তিনি বলিলেন—'সেখানে এমন করিয়া আসিয়াছি যে, এখন যে কেহ গিয়া ক'রেকর্ম্মায়ে বেশ থাকতে পারবে, মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব'। থিয়সফিষ্টদের কথা উঠিল; আমি একটু প্রশংসাই করিলাম—"এঁরা সেই আমাদেরই শাস্ত্রের বহু কথা প্রচার করিতেছেন।" উত্তরে স্বামীজি যেন একটু উত্তেজিতভাবেই বলিলেন,—"সাহেবেরা আমাদের উপরে সব বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, আবার ধর্ম্মবিষয়েও আসিয়া গুরুগিরি করিবে, এটা আমি সহিতে পারি না।" * আমার জীবনের এক

* এই কথাটি আমার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল—১৯১১ অব্দে ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মেলনে যখন শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে একত্র কয়েকদিন অবস্থান করি, তখন একদিন তাঁহার কাছে এবিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, এবং 'বিবেকানন্দ ঠিক্‌ই বলিয়াছেন' এরূপও বলিয়াছিলাম। হীরেন্দ্র বাবু স্বয়ং থিয়সফিষ্ট দলের একজন নেতৃস্বরূপ। তিনি বলিয়াছিলেন—'সাহেবের গুরু হইবে কেন? তাঁহাদেরও তো নেতা আমাদেরই 'মহাত্মগণ।' "আমি বলিলাম, মহাত্মারা এদেশে কি লোক পাইলেন না যে, অলকট্ ব্লাভাট্‌স্কির স্কন্ধে ভর করিলেন?" উত্তরে বোধ হয় তিনি এই বলিয়াছিলেন—"সমগ্র জগদ্ব্যাপী কাজ করিবার সমর্থ লোক আমাদের দেশে কোথায়? এঁদের দ্বারা ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সমগ্র জগতে তত্ত্ববিদ্যার প্রচার হইতেছে।

উদ্দেশ্য ছিল—বেদান্ত দ্বারা ওদের জয় করা বহু সাহেব বিবি দ্বারা পা টেপাইয়াছি।" কথায় কথায় তাঁহার 'চিকাগো' বক্তৃতার সম্বন্ধে আলাপ হইল। বলিলাম, "স্বামীজি, আপনার গুরুদেব ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস তো প্রতিমা অর্চ্চনা করিয়াই চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আপনি তা'হলে চিকাগো বক্তৃতায় কিরূপে একথা বলিলেন, From high soaring flights of Vedanta philosophy to vulgar ideal of idolatry!' মূর্ত্তি পূজাটা কি 'Vulgar'?" স্বামীজি বলিলেন, 'আমি কি 'Vulgar' বলিয়াছিলাম?' আমি বলিলাম আমার তো যেন তাই মনে হয়।' তিনি বলিলেন "তা'হলে 'Vulgus=people, Vulgar অর্থ 'popular' এই আমি 'মীন্' করিয়াছিলাম" আমি বলিলাম 'তা হ'লে 'Vulgar' না বলিয়া সোজাসুজি 'popular' বলিলেই তো পারিতেন?" অতঃপর এ বিষয় আর কথা চলে নাই।*

আরও বহু কথা হইল—সব স্মরণও নাই—দু-একটা কথা (উপরে উল্লেখিত ছাড়া) মনে আছে তাহা নানা কারণে প্রকাশযোগ্য নহে। তবে পূর্ব্বের বৈঠকী বক্তৃতা শুনিয়া যে ধারণা হইয়াছিল, এই আলাপের দ্বারা তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। মনে হইল যে, এই সন্ন্যাসীর সাজপরা লোকটি যেন মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত একটী কেশরী!

আলাপাবসানে বিদায় গ্রহণের সময় তিনি 'ফ্রেঞ্চ নভেল' দুএকখানি পাঠাইয়া দিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন; তদর্থে কমিশনার

আমাদের দেশের অনেকেও এঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশ্বাসের আধিক্যবশতঃ উপকৃত হইতেছেন।"

* সত্যের অনুরোধে এখানে বলিতে হইল যে, আমার স্মৃত্যনুসারেই আমি তাঁহার বক্তৃতার ঐ বাক্যাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ইদানীং প্রকাশিত তাঁহার ঐ বক্তৃতায় কথাটি এ ভাবে আছে "From the high spiritual flights of Vedantic Philosophy * * * to the low ideas of idolatry." শব্দটা 'low' আছে, 'vulgar' নহে। এই 'low'টা স্বামীজি কিরূপে বসাইতেন, জানিনা।

পোর্টিয়স্ সাহেব নিকটে চিঠি দিয়া লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা পাঠাইয়াছিলেন কি না ইত্যাদির খবর আর নেহ নাই। একজন সন্ন্যাসীর 'ফ্রেঞ্চ নভেল' পাঠের স্পৃহাটা আমার কাছে তত ভাল ঠেকে নাই।

আসামে স্বামী বিবেকানন্দের পরিভ্রমণস্মৃতি আমাদের পক্ষ হইতে বিবৃত করা হইল। ঐ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের স্মৃতিও এ স্থলে আলোচনা-যোগ্য মনে করিতেছি।

বেলুড় মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গল্প করিয়াছিলেন। * * * কামাখ্যায় তন্ত্রমন্ত্রের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"এক 'শঙ্কর' দেবের নাম শুনলুম তিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুনলুম তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত; ঐ 'শঙ্কর' দেব আর শঙ্করাচার্য্য একই লোক কিনা বুঝতে পারিলাম না। তবে লোক-গুলকে দেখিয়া বোধ হইল ত্যাগী—সম্ভবতঃ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায়বিশেষ" *

যাঁহারা জ্ঞাতসার, তাঁহারা এইটুকু পড়িয়া স্বামীজির গবেষণার প্রসার দর্শনে স্তম্ভিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক মহাত্মা শঙ্কর দেবের নামটি 'শঙ্কর' দেব এই তুচ্ছভাবে উল্লেখ করা কতদূর সমীচীন, তাহাও বিবেচ্য। কোথায় কায়স্থ বৈষ্ণব গৃহস্থ শঙ্করদেব, আর কোথায় ব্রাহ্মণ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য। জানি না তিনি কার কাছে শঙ্করদেবের কথা শুনিয়াছিলেন, এবং কাহাদের দেখিয়া "ত্যাগী" বোধ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের এবং আক্ষেপের বিষয় যে, ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ আসাম অঞ্চলের এই সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারকের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানকল্পে

* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু প্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ—৪র্থ খণ্ড ১০২৪—২৫ পৃষ্ঠা।

কোনও প্রযত্ন করেন নাই; তাহা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে তাঁহারই জাতীয় একজন মহাপুরুষ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই কামরূপ অঞ্চলে কি এক প্রবল ধর্ম্মান্দোলন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য যেরূপ বঙ্গদেশে আপামর সাধারণের হিতার্থে হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই যেমন বঙ্গসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে, এই মহাত্মাও তাদৃশ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পার্ব্বত্য জাতীয়েরাও আজ তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে আসিতেছে—আসামীভাষা তাঁহারই স্বরচিত কীর্ত্তন ভাওনা (নাটক) প্রভৃতির দ্বারা পরিপোষিত হইয়াছে।*

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বে তাঁহার গুরু ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনচরিত পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে উঁহার পূর্ব্বজন্মের বহু তপস্যা সঞ্চিত ছিল। বাল্যাবধিই ভগবদ্বিষয়ে তাঁহার একটা প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়। বিশেষতঃ "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"—পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতা, শুচিশীলা সাধ্বী মাতা, প্রাক্তন পুণ্যফলেই লাভ করিয়াছিলেন। গৃহে দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজার্চ্চা হইত। সাধু সন্ন্যাসীর একটা

---

* যাঁহারা শঙ্করদেবসম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে সমুৎসুক, তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেব-প্রণীত 'শঙ্কর দেব' গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন।

আড্ডাও—তাঁহার বাড়ীর নিকটে জনৈক ভক্ত গৃহস্থের অতিথিশালায় ছিল—তিনি ঐ স্থানে গিয়া সতত সাধুসঙ্গ করিতেন। লেখা পড়া না শিখিলেও স্মরণশক্তি দেখা যায় বেশ ছিল—সাধুদের মুখে যে সকল শাস্ত্রকথা * ও যাত্রা ইত্যাদিতে যে সব গান শুনিয়াছেন, তত্তাবৎ যথেষ্ট মনে রাখিয়াছিলেন।

তারপর ভাগ্যক্রমে ভ্রাতার সঙ্গে ৺কালীমন্দিরের সেবার সহকারী হইলেন। প্রাণটি প্রাক্তন সুকৃতিবশতঃ সরল ছিল—লেখাপড়ার—বিশেষতঃ এ যুগের পাশ্চাত্যগন্ধি শিক্ষার দ্বারা চিত্তবৃত্তি বিকৃত হয় নাই। তাই অনন্যমনা হইয়া জগদম্বার অর্চ্চনা করিতে পারিয়াছিলেন। ফল শীঘ্রই ফলিল—ভগবৎসাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুলতা আসিল। শ্রীভগবানে চিত্তের প্রগাঢ় অভিনিবেশ হইলে যাহা হয়, তাহা আমরা ধ্রুবচরিত্রে দেখিতে পাই। এখানেও সাধনপথের প্রদর্শক গুরু, উত্তরসাধক 'তোতাপুরী' 'ব্রাহ্মণী'—ইত্যাদি যুটিতে লাগিলেন সাধনার সনাতনপদ্ধতিতে কাজ করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিলেন, তাহাতে সনাতন ধর্ম্ম-সাধনের উপায়গুলির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল। যখন সাকারোপাসনা ও সনাতন সাধনপথ অসার বলিয়া খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় হিন্দু-সমাজের উপর আঘাত করিতেছিলেন, তখন এই রামকৃষ্ণ পরমহংসের অভ্যুদয় সমাজের কল্যাণর্থেই ঘটিয়াছিল। তাঁহার অহর্নিশ অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে মনোনিবেশ, ভগবদ্বিষয়িণী কথা ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গে পরাঙ্মুখতা, কামিনী ও কাঞ্চনে অনাসক্তি, বালকের ন্যায়

---

* রামকৃষ্ণ। * * * আমি মূর্খোত্তম।

একজন ভক্ত। তা হ'লে আপনার মুখ থেকে বেদ বেদান্ত—তা ছাড়া আরো কত কি—বেরোয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) কিন্তু ছেলে বেলায় লাহাদের ওখানে (কামার পুকুরে) সাধুরা যা পড়তো বুঝতে পারতাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪র্থ ভাগ—১২ পৃষ্ঠা।

সরলতা, ইত্যাদি অনন্যসাধারণ অবস্থা দেখিয়া হিন্দুর ত কথাই নাই, যাঁহারা সনাতনপথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন—অনেকে পুনশ্চ এ পথে ফিরিয়া আসিলেন।

রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতেও নানা সাধু সন্ন্যাসী সজ্জনের সমাগম হইত; তাঁহাদের কাছ হইতেও নানাতত্ত্ব তিনি জ্ঞাত হইতেন। এইরূপ বাল্যে ও সাধনাবস্থায় সাধুসঙ্গ এবং গুরু ও উত্তর সাধকের নিকট হইতে তিনি অধ্যাত্ম জ্ঞান আহরণপূর্ব্বক নিজের সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতাদ্বারা ঐগুলি আয়ত্ত করিয়া সরল ভাষায় যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহা অতি অমূল্য জিনিস—এ সকল দ্বারাও হিন্দুসাধারণের অতিশয় উপকার সাধিত হইয়াছে।

তাঁহার কাছে আসিয়া যাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন, তন্মধ্যে এমনও দু'একজন ছিলেন, যাঁহারা ঈদৃশ অপর কোন সাধু মহাত্মা দেখেন নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে অবতার বলিয়া খ্যাপিত করিতে লাগিলেন। ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন। এতদ্দ্বারা রামকৃষ্ণ পরমহংসের অনিষ্ট সাধিত হইল। বালকের ন্যায় সরলস্বভাব পরমহংস অনবরত এই "অবতার" ভাবে সংক্লিষ্ট হইয়া পরিশেষে নিজেকে যেন তাহাই মনে করিতেন—শেষ অবস্থার যে সকল কথোপকথন "কথামৃত" প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা হইতে (ভক্তের অত্যুক্তিবাদ বর্জ্জন করিলেও) আমরা যেন ইহাই দেখিতে পাই। শ্রীশ্রীজগদম্বায় একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত ও সাধক রামকৃষ্ণদেব বার বছর আন্দাজ অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা এই "অবতার" সাপ্রাক্তে ধ্রুত ক্ষয়িত হইতে লাগিল—পরিশেষে তিনি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সংবৎসরকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

কেবল যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট হইল এমন নহে, তাঁহার সাধনার জীবন যে সমুন্নত সমাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিল—শেষে, কতকটা

'অবতার' বলিয়াই হউক, বা পীড়াগ্রস্ত বলিয়াই হউক, তিনি তাঁহার পূর্ব্বজীবনের সেই আদর্শানুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারেন নাই—ইহাতে সন্ন্যাস বা অবধূত আশ্রমের সমুন্নত ভাবের কিছুটা খর্ব্ব হইল; তাহাতে সমাজেরও কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইল।* তবে এটা বরং অতি সামান্য, কিন্তু এই 'অবতার'বাদের দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া কতস্থানে যে কত 'অবতার' দেখা দিতে লাগিলেন এবং কত উদ্ভট আচরণ ও উপদেশ দ্বারা যে সমাজের কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা যাঁহারা পূর্ব্ব-বঙ্গের কোনও অবতার বিশেষের কথা সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁহাদের অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পরন্তু পরমহংস রামকৃষ্ণের 'অবতারবাদ'টা প্রথমতঃ তেমন জমাট বাঁধে নাই। ভক্ত-রামচন্দ্র কৃত জীবনচরিত অথবা অক্ষয়কুমার সেন-রচিত কাব্যে অবতারবাদের কথা থাকিলেও সাধারণে ঐ কথা শিষ্যের গুরুস্তুতি মাত্র মনে করিয়াছিল। এই অবতার-বাদের অবতারণা দেখিয়াই বোধ হয়, রামচন্দ্রদত্ত-কৃত জীবনচরিতখান পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন ছাপাইবার জন্য নিয়াও তাহা প্রকাশিত করিতে নিরস্ত হন।

কিন্তু যখন স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম্ম-সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়া হঠাৎ লোকসমক্ষে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন, তখন রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ অবাধে মনের সাধে গুরুর মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও তখন নানা কাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল।

এতক্ষণে আমরা আমাদের প্রবন্ধের নায়কের নিকটে উপস্থিত হইলাম। স্বামী বিবেকানন্দ একজন অতি বড় লোক। অকস্মাৎ

---

* যথা, স্ত্রীর সেবা গ্রহণ—

শ্রীরামকৃষ্ণ। * * আমার মাগ' (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায় হাত বুলায়ে দেয় * *। — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৪র্থ ভাগ ৯০ পৃষ্ঠা।

হইলেও যখন আমরা তাঁহার প্রথম বার্ত্তা পাইলাম—চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিলাম—তখনই বুঝিলাম, এ ব্যক্তি যে-সে লোক নহেন। অদম্য সাহস, দৃঢ় অধ্যবসায়, ইংরেজী ভাষায় অসামান্য অধিকার, জগতের ধর্ম্মমতগুলিতে অভিজ্ঞতা, বিশিষ্ট বাগ্মিতা, ইত্যাদি এই একই ব্যাপারে সূচিত হইয়া পড়িল। বিশাল চীন সাম্রাজ্যকে পরাভূত করিয়া ক্ষুদ্র জাপান যেমন সহসা আমাদের নিকটে এক পরাক্রান্ত রাজ্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল—বিবেকানন্দও—যে পাশ্চাত্য ভূভাগ হইতে মিশনারীরা আসিয়া এদেশের সনাতন ধর্ম্মের নিন্দাবাদপূর্ব্বক খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন—সেই পাশ্চাত্য দেশে গিয়া সমস্ত সভ্যজগতের নানা ধর্ম্মাবলম্বীর সমবেত ধর্ম্মমহাসভার বক্তৃতা দিয়া বিজয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া আমাদের নিকটে এক অতি মহান্ পুরুষসিংহ-রূপে আবির্ভূত হইলেন। সমগ্র ভারতে তাঁহার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—নানাদিগ্দেশ হইতে তাঁহার নিকটে অভিনন্দনপত্র প্রেরিত হইল। তারপর জাপান যেমন রুষিয়াকে পরাভূত করিয়া সমধিক গৌরবান্বিত হইল—বিবেকানন্দও যখন আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার—তথা অনেক শ্বেতকায় নরনারীর গুরুরূপে পূজা লাভ—করিয়া বরেণ্য হইলেন তখন এ দেশের লোক তাঁহাকে সমধিক আদরের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভারতবর্ষের যে যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, সর্ব্বত্রেই রাজোচিত অভ্যর্থনা লাভে আপ্যায়িত হইলেন। জাপানের গৌরবে যেমন সমগ্র এশিয়া গৌরব বোধ করিয়াছে—বিবেকানন্দের বিজয়লাভে তেমনি ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের সমুদয় হিন্দু গৌরবানুভব করিয়াছে। তারপর জাপান সম্বন্ধে যাহা, বিবেকানন্দসম্বন্ধেও তাহাই—অন্ততঃ সনাতনধর্ম্মবিশ্বাসীর কাছে—ঘটিয়াছে। জাপানের গৌরবে আমরা যতই স্ফীতবক্ষ হই না কেন—এখন দেখা গেল এটা এক পাশ্চাত্যের একার অনুকরণে গঠিত—প্রাচ্য

আধ্যাত্মিকতা-বিবর্জ্জিত—চাকচিক্যময় সভ্যতা, পরিণামে যে কি হইবে, তাহা ভগবান্ই জানেন; জাপানীরা আপনাদের স্বার্থমাত্র ষোলআনা বুঝে—এশিয়াবাসীরা উঠিয়া দাঁড়াক্, এমন কল্পনা আপাততঃ উহাদের মধ্যে মোটেই দেখা যাইতেছে না। এই যুদ্ধের সময় যে সকল মাল জাপান ভারতবর্ষে চালাইয়াছে—তাহাতেই এরা কতদূর প্রবঞ্চক দেখা গিয়াছে এবং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি।

প্রোজ্জ্বল ময়ূখমণ্ডিত মার্ত্তণ্ডের বিম্বে আপাতদৃষ্টিতে রশ্মিচ্ছটা ব্যতিরেকে অপর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না—পরন্তু কোনও ক্রমে কিরণমালা অপসৃত হইলে যেমন তাহাতে উৎপাতসূচক ভীষণ কৃষ্ণগহ্বররাজি লক্ষিত হয়—সেইরূপ স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যদিগ্বিজয় করিয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ক্রমশঃ যখন তাহা হইতে বিজয়শ্রীর আবরণ সরিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহাকে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম, তখন তাঁহার ভিতরকার ভাব আমরা অনেকটা ধরিতে পারিলাম, বুঝিলাম সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর লগুড়াঘাতই যেন ইঁহার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়। কথাটা ক্রমশঃ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ ধরা যাউক, বিবেকানন্দের সন্ন্যাসগ্রহণ। * অর্থাৎ তিনি যে নামে † নিজেকে জগদ্বিখ্যাত

* প্রসঙ্গতঃ একদিন স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলাপ হয়—(বৈশাখ ১৩২৩; হাওড়ার শঙ্কর মঠের শ্রীযুক্ত পরমানন্দপুরী মহারাজও সেখানে ছিলেন)। স্যার গুরুদাস বলিয়াছেন, যে যখন বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন, তখন কেহ কেহ [স্যার গুরুদাস নাম বলিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা খুব স্পষ্টরূপে মনে না থাকায় উল্লেখ করিলাম না] আসিয়া তাঁহাকে বিবেকানন্দের অভিনন্দন-সভার সভাপতিত্বের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন "আপনারা যদি 'স্বামী বিবেকানন্দ' না বলিয়া 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন দেন, তা হ'লে আমি সভাপতি হইতে পারি।" যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাব গতিক বুঝিয়া সরিয়া পড়েন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা সতর্ক সাবধান—তাঁহারা পূর্ব্বাবধিই বিবেকানন্দের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

† এই নাম সম্বন্ধেও বেশ রহস্য আছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু এম-এ, বি-এল, প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ" (২য় খণ্ড—সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠায়) আছে—"তাঁহার

করিয়াছেন—সেই নামের তিনি কতটা অধিকারী। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস হইতে সন্ন্যাসে দীক্ষালাভ করেন। সেই দীক্ষার ইতিহাসটুকু এই—

"এই সময়ে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রাদি কয়েকজন যুবক ভক্তকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? তাঁহারা তাঁহার বাক্যে অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ পল্লীমধ্যে ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তিনি এতদ্দর্শনে বুঝিলেন—তাঁহারা প্রকৃতই বৈরাগ্যবান্ ও নিরহঙ্কার, এবং অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বহস্তে গৈরিক প্রদান ও সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।"

(শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু—কৃত "স্বামী বিবেকানন্দ" ১ম খণ্ড ১৩৯ পৃঃ।)

'এই সময়ে' অর্থাৎ মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে যখন পরমহংস ক্যান্সার রোগে পীড়িত হইয়া কাশীপুর বাগানে অবস্থিত; তিনি তখন 'অবতার'। সুতরাং তাঁহার কার্য্যের উপর কার কি বলিবার সাধ্য! পরন্তু, পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আমরা 'অবতারত্বে' আস্থাবান্ নহি—অপিচ ঈদৃশ উদ্ভট অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজের অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। বিবেকানন্দ কায়স্থ-সন্তান; কায়স্থেরা শূদ্র—'সৎশূদ্র'; ইদানীং ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার—

য বিবেকানন্দ নাম হইয়াছিল, তাহা তাঁহার গুরুভাইয়েরা কেহ জানিতেন না—কারণ স্বামীজি আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পরিচিত লোকদের হাত এড়াইবার জন্য অনেকবার নিজনাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কখনও নিজকে 'বিবিদিষানন্দ' কখনও 'সচ্চিদানন্দ' কখনও বা অন্য কিছু বলিয়া পরিচয় দিতেন। অবশেষে খেতড়ীর রাজার একান্ত অনুরোধে 'বিবেকানন্দ' নামই বজায় রাখিয়াছিলেন।" যাঁহারা যেন বোধ হয় 'বিবেকানন্দ' এই নাম রামকৃষ্ণপ্রদত্ত নহে। অপিচ ইহা হইতে বিবেকানন্দের প্রকৃতিরও অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু সেই দাবি কতটা বিচারসহ বলিতে পারি না। * বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের পরেই উপনয়নের বাড়াবাড়ি হইয়াছে—কিন্তু স্বধর্ম্মে প্রকৃত আস্থাবান্ অতি কম কায়স্থই ঐ দলভুক্ত হইয়াছেন। † সে যাহা হউক, উপনয়নাদি সংস্কার নাই, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম নাই, তথাপি 'সন্ন্যাস' ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেলেন! 'অধিকারী' 'অনধিকার' বিচার, 'সন্ন্যাস' দীক্ষার শাস্ত্রানুযায়ী পদ্ধতি ইত্যাদির কথা নাই তুলিলাম। রামকৃষ্ণ একদিন ভিক্ষাটা দেখিয়াই 'বৈরাগ্যবান্' 'নিরহঙ্কার' স্থির করিয়া ফেলিলেন! কিন্তু তিনি তো স্বয়ং নিজনাম রামকৃষ্ণ পরিত্যাগ করেন নাই—কেন না ইহাতে 'অভিমান' হয়। (রামচন্দ্র দত্তকৃত পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—৩য় সংস্করণ ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বিবেকানন্দ, 'স্বামীজি' সাজিয়া গেরুয়া পরিয়া রাজরাজড়ার মাথায় পা দেওয়া তো অল্প কথা, ব্রাহ্মণকে পর্য্যন্ত শিষ্য করিয়া, তাঁহার দ্বারা পদসেবা করাইয়াছেন। (দৃষ্টান্ত 'স্বামিশিষ্য সংবাদ' প্রণেতা)। ‡

* সিষ্টার নিবেদিতার লিখিত স্বামীজির সহিত ভ্রমণকাহিনীতে আছে : ‡‡ "বর্ত্তমান বাঙ্গালী কায়স্থেরা যে প্রাক্ মৌর্য্য ক্ষত্রিয়জাতির বংশধর, এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।" (স্বামী বিবেকানন্দ ৮৩৭ পৃঃ) অপিচ কোন মিত্র-গৃহিণী স্বীয় পত্রে 'দাসী' লেখায় আপত্তি করিয়া তিনি তাঁহাকে ক্ষত্রিয়া বলিয়া 'দেবী' লিখিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। (স্বামীজির পত্রাবলী ১ম ভাগ ৪পৃষ্ঠা।)

† মণিপুরী, কাছাড়ী, কোচ, তিপ্রা প্রভৃতি অনেক জাতিই "উপবীত-ধারী" ক্ষত্রিয় সাজিয়াছে—ইহাতে 'ক্ষত্রিয়ত্ব' খ্যাপনপূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ তেমন গৌরবজনকও রহে নাই। বুদ্ধিমান্ কায়স্থগণ অবশ্যই এইটুকু বুঝিয়াছেন।

‡ এই বিষয়ে তিনি তাঁহার কোনও ভক্ত আমেরিকান স্ত্রীলোককে লিখিয়াছেন—"আর প্রিয়ম—এই পা দু'খানা বোধ হয় শ'খানেক রাজবংশীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধোয়ান মুছান হইয়াছে ও পূজা পাইয়াছে" (স্বামী বিবেকানন্দ চতুর্থ ভাগ ৭৪৩ পৃষ্ঠা)। "একদা আহারাদির পর শরৎবাবু (শিষ্য চক্রবর্ত্তী) তাঁহার (গুরু স্বামীজির) পদসেবা করিতেছিলেন।" ঐ ৯০০ পৃষ্ঠা [ভবিষ্যতে এই 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ 'বিঃ' অক্ষর দ্বারা সূচিত হইবে।]

রপর জাতিভেদটা যে একটা কাল্পনিক, এটা কেবল মুখেই বলিয়াছেন, তাহা নহে, যদৃচ্ছাক্রমে যাকে তাকে উপনয়ন প্রদানপূর্ব্বক 'দ্বিজ' বানাইয়াছেন। নীলাম্বর বাবুর বাগানে শিষ্যদ্বারা অনেকগুলি পৈতার যোগাড় করিয়া বলিলেন—"* * * আজ ঠাকুরের (অর্থাৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের) জন্ম দিন। যে সব ভক্ত আজ এখানে আসবে, তাদের সকলকেই আজ পৈতে পরিয়ে দিতে হবে। দ্বিজাতি মাত্রেরই উপনয়ন-সংস্কারের অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। এঁরা সব ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত-সংস্কার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই আবার উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। * * *" তারপর এ ভাবে পৈতা পরা হইলে, বলিলেন—"কালে দেশের সকলকেই ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই।" ইত্যাদি (বিঃ ৮০৪—৫ পৃষ্ঠা) আর ব্রাহ্মণদের প্রতি স্বামীজির কি অগাধ প্রেম! তাঁহার অভিধানে ব্রাহ্মণ শব্দ "দুষ্ট পুরুত" দ্বারা অভিহিত। স্বামীজি এই 'দুষ্ট পুরুত'দের সম্বন্ধে বলিতেছেন "এস মানুষ হও। প্রথমে 'দুষ্টপুরুত'গুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন ভাল কথা শুনবে না—তাদের হৃদয় শূন্যময়, তারও কখন প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তাদের জন্ম; আগে তাদের নির্ম্মূল কর। এস মানুষ হও।"* মান্দ্রাজী বন্ধুদের নিকটে লিখিত ইংরেজী পত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ (পত্রাবলী নং ৩—প্রথম ভাগ ১৬ পৃষ্ঠা)

* বিবেকানন্দের এই ব্রাহ্মণদ্বেষ তদীয় অনুচরাদির হৃদয়ে কিরূপ ক্রিয়া করিতেছে, তাহার উদাহরণ দিতেছি। "উপাসনা" পত্রিকায় একজন "পতিত ব্রাহ্মণ" নামক কবিতা এ ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন—(১৩২৫ চৈত্র) "ওরে রে ব্রাহ্মণ তোরা শোন্ ওই প্রলয়ের শেষ জলোচ্ছ্বাস!" তৎপরে শেষের দিকে আছে—

"দুষ্ট পুরুত"গুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাতেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্ছে।" ঐ নং (৮) মান্দ্রাজী শিষ্যের নিকট লিখিত ইংরেজী পত্রের অনুবাদ—৪৯ পৃষ্ঠা।

"আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে।" ইত্যাদি মান্দ্রাজীদের প্রতি। ঐ নং ১১—৬৪ পৃঃ। অলমতিবিস্তরেণ।

এই গেল ব্রাহ্মণের প্রতি পেটের ভাব। * ক্ষত্রিয়ের প্রতি ভাব অন্যরূপ, বোধ হয় তাঁহার 'স্বজাতি' বলিয়া! পূর্ব্বোদ্ধৃত ৮নং পত্রেই

"পদাঘাত বাক্যজ্বালা আজ তোর কিরীটের কনকভূষণ।" ইত্যাদি; এই 'পদাঘাত ও বাক্যজ্বালা'র প্রমাণার্থেই বোধ হয় "ঐ পত্রেই (১৩২৭—মাঘ-সংখ্যায় 'দুঃখের দায়ে" ইতিশীর্ষক একটা গল্পে) নিরীহ ব্রাহ্মণ পোষ্টমাষ্টারের উপর পোষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দ্বারা 'পদাঘাত' দেওয়াইয়া বলান হইয়াছে "এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।" [এই উপাসনার সম্পাদক একজন ব্রাহ্মণ এবং স্বত্বাধিকারী একজন অতি নিষ্ঠাবান্ দেবদ্বিজসেবী ভক্ত বৈষ্ণব।]

* আমি 'পেটের ভাব' এজন্য বলিলাম যে, এই সকল উক্তি চিঠির মধ্যে লিখিত কথা;—বিবেকানন্দ তো ভাবেন নাই যে, এগুলি প্রকাশিত হইয়া "গুমর ফাঁক" করিবে। প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহের ভাবও আছে—মান্দ্রাজেই কোন এক সভায় বক্তৃবিশেষ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ জাতিকে শিক্ষাদান প্রথার দোষ প্রদর্শন করিলে স্বামীজি বলেন—"এই প্রথার ভাল মন্দ দু'দিকই আছে। ব্রাহ্মণগণ হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তা সম্পত্তির রক্ষকস্বরূপ। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন"। বিঃ ৬৭৩ পৃষ্ঠা। অপিচ, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে স্বামীজি যে সব উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে আন্তর্জাতিক

আছে—"* * ক্ষত্রিয়েরা মাংসই খাক্, আর নাই খাক্, তারাই হিন্দুধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিস দেখ্‌তে পাচ্ছ, তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিল কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন, তাঁরা জাতিনির্ব্বিশেষে সব্বাইকে ধর্ম্মের অধিকার দিয়েছেন আর যখনি ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখিয়াছেন, তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন এই ভাব তাঁদের দেখা যায়। আহম্মক, গীতা আর ব্যাসসূত্র পড় অথবা আর কারু ঠেঞে শুনে নাও। গীতার মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারী সকল জাতি, সকল বর্ণের অধিকার দিয়াছেন, আর ব্যাস গরীব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিত অর্থ করুছেন।" (পত্রাবলী ১ম ভাগ নং ৪—৫০ পৃষ্ঠা) আবার সিষ্টার নিবেদিতা-প্রণীত স্বামীজির সহিত ভ্রমণকাহিনীতে আছে, তিনি "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্বের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইতেন, ভারতের ইতিহাস কেবলমাত্র এই দুই জাতির সংঘর্ষের দৃশ্য, আর বলিতেন, ক্ষত্রিয়েরাই বারবার এদেশের লোকের শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। * * * ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে তিনি দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার স্রোত বলিয়া চিত্রিত করিতেন—একটি চিরপ্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও প্রাচীন আদর্শের গভীর খাতে ধীর সন্তর্পণ গতিতে প্রবাহিত। অপরটি ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত বিশ্বব্যাপী উদারবৃত্তি লইয়া যুগযুগান্তরের

বিবাহ প্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদসাধন প্রধান কল্প হইলেও "তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা তাঁহাদের নিন্দা গ্লানি প্রচার করিতে নিষেধ করিতেন; কারণ তাঁহারাই এই বিদ্যাকে (অর্থাৎ সংস্কৃত বিদ্যাকে) রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এক্ষণে ভারতের কুত্রাপি সংস্কৃত বিদ্যার অস্তিত্ব থাকিত না।" বিঃ ৭৭৭-৮ পৃষ্ঠা। তবে ইহাও বক্তব্য যে, বিবেকানন্দের মতের স্থিরতা খুব কমই ছিল। ঈদৃশ অসামঞ্জস্য পশ্চাৎ ভূয়িশঃ প্রদর্শিত হইবে।

লৌহনিগড় ভগ্ন করিতে উদ্যত এবং সামাজিক বিধানের প্রস্তরস্তূপকে অপসৃত করিয়া তাহার স্থলে নূতন ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুৎসুক। তিনি বলিতেন—এটি একটি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট ধারা যে রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ সকলেই ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আর ব্রাহ্মণের অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য ব্রাহ্মণত্বের প্রবল প্রতাপের প্রত্যুত্তর প্রদানের জন্যই জাত্যভিমান চূর্ণ করিবার বিরাট্ মুদ্গরহস্তে 'ক্ষত্রিয়দিগের উদ্ভাবিত' বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়। বিঃ ৮৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা।

বিবেকানন্দের এই সকল উক্তি তত্ত্বজ্ঞ পাঠক হয়ত "বিবেকানন্দের মূঢ়তা" মনে করিয়া 'হাসিয়া উড়াইয়া' দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমি এতদুপলক্ষে দু'চারটি কথা আলোচনাচ্ছলে না বলিয়া পারি না—ইনি লোকচক্ষে কিরূপ ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কতকটা দেখান সঙ্গত মনে করিতেছি।

হিন্দুধর্ম্মে যা কিছু মহৎ ও সুন্দর—তন্মধ্যে বুদ্ধকে এবং জৈনদের তীর্থঙ্করদিগকে আনিয়াছেন; এরা কি প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু'? এরা তো 'বেদ' না মানাতেই হিন্দু অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের বহির্ভূত।*

ব্রাহ্মণত্বের প্রভাবের উপর মুদ্গরাঘাত করিবার জন্যই যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়, তখন স্বামীজির মতে 'বুদ্ধ' অবশ্যই হিন্দুধর্ম্মের 'মহৎ ও সুন্দর'রূপে পরিগণিত হইবেনই! কিন্তু এই বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যে ভারতের অধঃপতন—এটাও স্বামীজিই বলিয়াছেন—

"বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মাংস ভোজনের প্রথা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে * * * আর এটাও ঠিক্ যে আমিষ-

---

* অথচ স্বামীজি প্যারিস নগরীতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"বেদই হিন্দু ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিভূমি!" (বিঃ ৯৬০ পৃষ্ঠা।)

ভোজন প্রথার অনাদর হওয়াতেই এদেশের লোকের শক্তি সামর্থ্য এত হীন ও জাতীয় অবনতি এত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে।" ইত্যাদি (বিঃ ৩৩২ পৃ) *

"উপনিষদ্ লিখিয়াছিল কাহারা ?" এই প্রশ্নের সঙ্গে যে সকল ব্যাপার জড়িত হইয়া পড়ে (যথা বেদের অপৌরুষেয়তা) ইত্যাদি তাহা না-ই ধরিলাম। কিন্তু তিনি যে মনে করিতেছেন—এটা ক্ষত্রিয়দেরই প্রচারিত বিদ্যা—এ বিষয়েরই আলোচনা করিব। কোনও কোনও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ শিক্ষা করিয়াছেন—এরূপ কাহিনী উপনিষদে আছে। পরন্তু তদ্বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহার বেদান্ত 'লেক্‌চারে' কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক। পঞ্চাল দেশের রাজা প্রবাহণের নিকট হইতে কিরূপে আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পঞ্চাগ্নি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই গল্পটি বিবৃত করিয়া পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহোদয় বলেন, "বৈদিক আখ্যায়িকার কিন্তু যাথার্থ্য নাই। অভিপ্রেত বিষয়ের উৎকর্ষখ্যাপনের জন্য আখ্যায়িকাগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত আখ্যায়িকার যাথার্থ্য স্বীকার করিলেও কেবল পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, উক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা এই মাত্র প্রতিপন্ন হইতে পারে। কেননা ঐ প্রশ্নাবলী ও তাহার উত্তরে (রাজা প্রবাহণ কর্ত্তৃক) পঞ্চাগ্নি বিদ্যাই বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা নহে। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণেরা জানিতেন এবং উপদেশ করিতেন। ভূরি ভূরি আখ্যায়িকাতে ইহা পরিব্যক্ত রহিয়াছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইল না।"

* আমরা স্বামীজির নিজের কথায়ই নিজের প্রতিবাদ প্রদর্শনার্থ ইহা উদ্ধৃত করিলাম। এইরূপ অসঙ্গতি আরও দেখান যাইবে। আমরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভারতের অধঃপতন অন্য কারণে হইয়াছে মনে করি এবং সেটা সনাতন ধর্ম্মের শ্রীহীনতা—যেমন এই যুগেও ঘটিতেছে।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপের লেক্‌চার—৫ম বর্ষ প্রথম লেক্‌চার ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা।

অতঃপর রাম ও কৃষ্ণের কথা। * শ্রীরামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠের নিকটে কিরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন—যোগবাশিষ্ঠই প্রমাণ; হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনি কর্তৃক সম্যক্‌ শিক্ষিত হন, এ কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র কোনও দিন ব্রাহ্মণবিরোধী তো হন-ই নাই। বরং অব্রহ্মণ্য কিঞ্চিৎ দমনার্থ যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নামগ্রহণে স্বামীজির সাবধান হওয়াই উচিত ছিল—আজ রাম-রাজত্ব থাকিলে সর্ব্বাদৌ স্বামীজিই (সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত, অন্ততঃ) দণ্ডকারণ্যের শূদ্র-মুনির দশাপ্রাপ্ত হইতেন! ধর্ম্মময় মহাক্রমের মূলরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ পরিকল্পিত;—সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সেবা ভিন্ন তদ্বিরোধি কোনও কিছু কদাপি করিয়াছেন—এমন তো পুরাণেতিহাসে পরিদৃষ্ট হয় না। স্বামীজি ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতার বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন; ব্রহ্মসূত্রের প্রথমেই 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' আছে—'অথ' এবং 'অতঃ' এর অর্থ স্মরণ করিয়া স্বামীজি অসুবিধা বোধ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই, কেননা তাহা হইলে তাঁহার 'বেব্‌সা'ই যে মাটি হইয়া যায়! আর গীতায় কি সর্ব্ববর্ণের সমান ব্যবস্থা আছে? বরং ক্ষণিক বৈরাগ্যে মুহ্যমান হইয়া অর্জ্জুন তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়ায় তাঁহাকে ভগবান্‌ বারংবার তিরস্কার করিয়াছেন—এবং বহু জ্ঞানের কথা উপদেশ করিয়া "শ্রেয়ান্‌ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" এই সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমরে নিয়োজিত করিয়া-

* শ্রীভগবান্‌ রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ রূপে ক্ষত্রিয়বংশেজাত হইয়াছিলেন বলিয়া যদি ক্ষত্রিয়ের শ্লাঘার কারণ হয়—তবে সর্ব্বাদৌ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ শ্লাঘ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বামন পরশুরাম ও ভবিষ্যকল্কির কথাও বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। তবে শেষের দু'জনের কথা ক্ষত্রিয়মন্য শ্লেচ্ছকল্প ব্যক্তির হৃৎকম্পকারী হইবারই সম্ভব!

ছিলেন, এই তো গীতার শিক্ষা। * গীতায় কদাপি "সকলকে সকল রকম অধিকার" দেওয়া হয় নাই। এই গীতায়ই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ' সেই ব্যাসদেব এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বামীজি ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে পার্থক্যের আরোপ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে ?

তারপর খাদ্যাখাদ্য-বিচার—স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচার সনাতন ধর্ম্মের আচারানুষ্ঠানের একটা মস্ত বিষয়—বিবেকানন্দ এটার প্রতি এত চটা যে তিনি 'হাঁড়িধর্ম্ম' 'ছুঁৎমার্গ' বলিয়া ইহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। এবিষয়ে শৈশবাবধিই তিনি স্বাধীন মতের পরিপোষক—ছেলে বেলায়ই মোসলমানের স্পৃষ্ট খাদ্য খাইতেন, মোসলমানের হুকায় মুখ দিতেন—তাঁহার পিতাও যেন খাদ্যাখাদ্যবিচার কম করিতেন (বিঃ ২৭ পৃষ্ঠা)। বিবেকানন্দ যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখাইয়াছিলেন (বিঃ ১০২ পৃষ্ঠা) এবং কিয়ৎকাল পরে পরমহংসদেব কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া যতির বেশ অবলম্বন করিলেও তিনি আহারবিষয়ে 'সবলোট' ছিলেন। মেথরের ক'ল্কে নিয়েতামাক খাওয়া (বিঃ ১৮৭পৃষ্ঠা) হইতে মুচির প্রস্তুত রুটি খাওয়া (বিঃ ৩৪৯ পৃঃ) এমন কি কয়েকদিন এক মেথর পরিবারে বাসকরা (বিঃ ৩৫৩ পৃষ্ঠা) পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। আর খাদ্য বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, মৎস্য মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে, তিনি, পূর্ব্বে যে গোমাংস পর্য্যন্ত ঋষিরা ভক্ষণ করিতেন, সে কথাটুকু না বলিয়া ছাড়িতেন না। (বিঃ ৩১২ পৃঃ ও ১০১১ পৃঃ)

* দুই হাজার বছর পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাস কর্ত্তৃক পরিকল্পিত এক অশিক্ষিত মৎস্যজীবী নিজের 'বেবসা' সমর্থন করিতে গিয়া গীতার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিয়াছিল—"সহজে কিল জে বিনিন্দিএ ণহু সে কম্ম বিবজ্জণীয়ে" (সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ—গীতা)। ফলতঃ শাস্ত্রানুসারে স্ব স্ব জাতিগত আচার পালনেই ভারতের আপামর সাধারণ আবহমান কাল হইতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

বিশেষতঃ আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়া আশ মিটাইয়া নির্ব্বিবাদে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন; অতএব ইঁহার নিকট হইতে আমরা খাদ্যাখাদ্য-স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবিচারের আর কি সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করিতে পারি?

বিবেকানন্দ তো গীতার প্রশংসাবাদী ছিলেন—সেই গীতায় সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিবিধ আহার বিচার রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায়ও তাঁহাদের মধ্যে বড় বড় লোক নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত জর্জ্জকুম্ব-লিখিত গ্রন্থের অনুসরণে "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে" আহারের বিচার করিয়া গিয়াছেন। সাহেবদের মধ্যেও নিরামিষাশী অনেক আছেন। ফল কথা খাদ্যাখাদ্য বিচার একটা সকল সমাজেই দেখা যায়। বিবেকানন্দের যেমন দস্তুর—এ বিষয়েও বিপরীত কথা অর্থাৎ খাদ্য বিচারের কথা—তাঁহার উপদেশমধ্যে দেখিতে পাই। পঞ্জাব ও রাজপুতানায় ভ্রমণকালে তিনি শিষ্য ও সঙ্গীদিগকে বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান্ হইতে এবং আমিষ আহার বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'আঠার ও বারো বছর নিরামিষাশী হইলে সিদ্ধ পুরুষ হওয়া যায়।" (বিঃ ১৯৬ পৃষ্ঠা)। যে সে লোকের হাতে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ অর্থাৎ স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আচরণ দ্বারাও যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হয়। "ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাস্ জল রাখা হইয়াছিল। সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস্ জল আনিতে বলিলেন। পরে শুনা গেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি এ জল স্পর্শ করিয়াছিল।" কথামৃত ১ম ভাগ ১৪২ পৃষ্ঠা। * এই যে স্পর্শদ্বারা শক্তিসঞ্চার বা রোগমুক্তি, যাতে

* এইরূপ কথা আরও আছে—"অনেক সময় পরমহংস দেব যাহার তাহার হাতে জল খাইতেন না বা যাহার তাহার স্পৃষ্ট খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেন না।

স্বামীজিরও বিশ্বাস ছিল—ইহার দ্বারাও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবাদ প্রমাণিত হয়। ফলতঃ সকল জীবেরই পরস্পর স্পর্শে ভাল মন্দ ভাবের আদান প্রদান হয়—তবে অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ অনুসারে পরিমাণে তারতম্য হয় মাত্র। অধ্যাত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন না হইলে ইহা অনুভব করা সুকঠিন; কিন্তু তাই বলিয়া এটা উড়াইয়া দেওয়া অসঙ্গত। *

এই বিষয়ে বিচারবিমূঢ়তার ফল আমরা একপ্রকার প্রত্যক্ষই দেখিতেছি—যত্র তত্র যা তা খাইয়া আমরা নিজে এবং আমাদের সন্ততিবর্গ যে কিরূপ অধোগতির পথে চলিয়াছে, আমাদের জীবনী-শক্তি যে কিরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সমাজহিতৈষী মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। "আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ;" "প্রমাদাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি"—এই মনুর বাক্য দ্বারা তাহার সত্যতা প্রমাণীকৃত হইতেছে। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রাচীন রীতিতে যাঁরা জীবন যাপন করিতেছেন—সেই অধ্যাপকগণ প্রায়শঃ নীরোগ ও দীর্ঘজীবী. আর নব্য চালচলনে অভ্যস্ত হইতেছেন যাঁরা—তাঁরা অনেক পীড়াগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। এই বিবেকানন্দই তার এক প্রমাণ। এমন সুন্দর সবল দেহ—যৌবনের মধ্যভাগেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িল—চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) মনে করিতেন উহা কুসংস্কার মাত্র, কিন্তু পরমহংস দেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—ঐ লোকগুলি বিশুদ্ধচরিত্র নহে। প্রথমে এ কথা নরেন্দ্রের তত বিশ্বাস হয় নাই; কিন্তু পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন, বাস্তবিকই লোকগুলি অতি হীনচরিত্রের।" বিঃ ১৩২ পৃষ্ঠা।

* এই বিষয়ে প্রবন্ধান্তরেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছিল— ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধের প্রতিবাদে এই বিবেকানন্দেরই উক্তির অসমীচীনতা দেখান হইয়াছে— অনুসন্ধিৎসু পাঠক "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস ১৭-২০ পৃষ্ঠা" দেখিতে পারেন, উহাতে অনেক ইউরোপীয় ডাক্তারের পরীক্ষালব্ধ তথ্যেরও উল্লেখ আছে।

পরমহংসের কৃপা এবং বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের কিঞ্চিৎ পরিপালন সত্বেও আচারব্যত্যয়ে বিবেকানন্দ অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। * এই ছুঁৎমার্গ ব্যাপারেও যেন বিবেকানন্দের শেষকালে উণ্টাসুর দেখা গিয়াছে। মঠের এক কুকুর ঠাকুর পূজার জন্য আনীত জল নষ্ট করিয়া দেওয়ায় যে ব্রহ্মচারীর উপর উহার তত্বাবধানের ভার ছিল, তাহাকে খুব বকিয়াছিলেন। [বিঃ ১০৭৬ পৃষ্ঠা]

স্বামীজির গুরু ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে এস্থলে পুনরপি কতকগুলি কথার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়ের অবতার বলিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনিই স্বয়ং সাধনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য বস্তু এক এবং সেই এক বস্তুই ব্রহ্ম। এইটি একেবারেই কোনও অভিনব বিষয় নহে। শ্রীভগবান্ তো গীতায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" বলিয়া সমস্ত সাধক মণ্ডলীকেই আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন। সপ্তশতীতেও শ্রীশ্রীজগন্মাতা ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সর্ব্বদেব-

* বিবেকানন্দের জীবনচরিতলেখকের কথায় প্রত্যয় করিলে বলিতে হয়, এই উন্মার্গগামিতার নিমিত্তে পরমহংসও কিয়ৎপরিমাণে দায়ী ছিলেন। তিনি নাকি বলিতেন "ও হচ্ছে আগুন, ওর স্পর্শে পাপ তাপ সব পুড়ে খাক্ হয়। ও যদি শোওর গরুও খায় কোন দোষ হইবেনা।" (বিঃ১৩৩ পৃঃ) ঐ পৃষ্ঠার ফুটনোটে আরো আছে :—"ভগবদ্ভক্তির হানি হইবে বলিয়া পরমহংস দেব স্বয়ং নানা নিয়ম পালনপূর্ব্বক ভক্ত সকলকে তদ্রূপ করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনিই আবার বলিতেন, নরেন্দ্র ঐ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কিন্তু তাহার কোনও প্রত্যবায় হইবে না। নরেন্দ্রের ভিতর জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দোষকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে," ইত্যাদি। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) যদি এরূপই ছিলেন, তবে তো স্বামীজির ছুৎমার্গাদি কথা বলিতে অধিকতর সাবধান হওয়াই উচিত ছিল; কেন না, সকলের ভিতর (এমন কি স্বয়ং পরমহংস ও তদীয় অন্যান্য ভক্তদের মধ্যেও যেন) 'জ্ঞানাগ্নি' তেমন তীব্রভাবে প্রজ্বলিত ছিল না! ফল কথা বিবেকানন্দের সঙ্গে পরমহংসও এরূপে জড়িত হইয়া বিড়ম্বিত হইয়াছেন—ইহা অতীব দুঃখের বিষয়।

শক্তিকে স্বীয় শরীরে বিলয় করিয়া অসুরকে বলিয়াছেন—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'। পুষ্পদন্ত মহিম্নঃস্তোত্রে বলিয়াছেন—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শিবমন্দির দেবীমন্দির প্রভৃতিতে গিয়া বন্দনা করিয়া নৃত্যাদি করিয়াছেন। ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"ঐ সে কালীকৃষ্ণ শিবরাম সকল আমার এলোকেশী।"

ত্রিপুরার দেওয়ান রামদুলাল আরো দূর অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন,—

"জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী॥

* * * * *

মগে বলে ফরাতারা গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা—মা
আল্লা ব'লে ডাকে তোমায় সৈয়দ পাঠান মোগল কাজী।" ইত্যাদি
এবং সর্ব্বশেষ বলিয়াছেন—

"একব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হ'য়েছে পাজী॥"

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এই সমন্বয়ের ভাব হিন্দুর ধর্ম্মে বরাবরই রহিয়াছে—দু'চার স্থলে অজ্ঞ বৈষ্ণব ও মূর্খ শাক্ত পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়াছে—তাও কবি দাশুরায় শেষটায় 'সমন্বয়' করিয়া দিয়াছেন।

এই 'সমন্বয়' দেখানের জন্য সাধনা, সুতরাং অনাবশ্যক ছিল। যাহা তখন আবশ্যক ছিল, তাহা সাকার-বাদের প্রমাণ—তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল প্রতিবাদ হইয়াছে—এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাধনা, উক্তি প্রভৃতি দ্বারা সনাতন সাধনরীতি ও ধর্ম্মচর্য্যার সারবত্তা প্রমাণিত হইয়া উন্মার্গপ্রস্থিত অনেকের উপকার হইয়াছে। এসকল কথা পূর্ব্বেও

বলিয়াছি। রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সার্থকতা এইখানেই—এবং এইজন্য তিনি আমাদের বরেণ্য।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিবাদ কেবল তাঁহারই দ্বারা হইয়াছে—একথাও মনে করা উচিত নহে। জ্বর প্রবল হইয়া খুব ঘর্ম্ম হইলে যেমন উপশম আরম্ভ হয়—তেমনই যখন ১৮৭২ সালে কেশবসেনের তিন আইন পাস্ হইল, তখনই প্রতিক্রিয়া আরব্ধ হইল—সুপ্রসিদ্ধ আদি ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতায় দেশে বিদেশে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ'সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "হিন্দুধর্ম্ম ডুবিতেছিল—রাজনারায়ণ বসু তাহা রক্ষা করিলেন।" পুণ্যশ্লোক ভূদেব বলেন, "আমাদিগের দেশের চূড়ামণিস্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ ও সর্ব্বপ্রাধান্য প্রকটন পূর্ব্বক স্বাভিমত ব্যক্ত করায় অনেকানেক স্বল্পবিদ্য অপরিণামদর্শী অশুচিকীর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিব্যূহের ভ্রমভঞ্জন এবং মোহান্ধকার তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোৎসব উচ্ছলিত হইয়াছে, তাহা বাক্যাতীত।" *

বোধ হয় এই সময়েই 'হিন্দুমেলার'ও সৃষ্টি হয়—এবং তদ্দ্বারা স্বদেশেরও পূর্ব্ব গৌরব স্মৃতি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া লোকের 'মোহ' কাটিবার সহায়তা হইয়াছিল। এবং প্রায় এই সময়েই থিওসফির দল ভারতে আসিয়া যোগ-মাহাত্ম্য প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক পরমহংসদেবের তথা বিবেকানন্দের ভক্তগণ কর্ত্তৃক

---

* বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ—১৫২ পৃঃ। ভূদেব বাবু পরমহংসদেব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন—কৌতূহল তৃপ্ত্যর্থে উদ্ধৃত হইল। "ইনি অতি সরল ভাষায় হিন্দুমতবাদের শাস্ত্রসম্মত সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ তাঁহার নিজের জীবনচরিত হইতে বুঝিয়া যদি প্রকৃত তান্ত্রিকসাধনায় বাঙ্গালী ভক্তিপূর্ব্বক রত হয়, তাহা হইলে আবার সমাজমধ্যে একাগ্রচিত্ত, উদ্যমশীল, নির্ভীক, কর্ম্মী ও ধার্ম্মিক লোকের বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে।" ১৬৪ পৃষ্ঠা।

লিখিত ও প্রচারিত গ্রন্থ সমূহের এবং স্বামীজির বক্তৃতাদিতে গুরু শিষ্য উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিব।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতা পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া ৺ কাশীতে বীরেশ্বর শিবের অর্চনা করাইয়াছিলেন—নিজেও শিবের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। অতঃপর একদিন স্বপ্ন দেখিলেন "যেন যোগীন্দ্র শঙ্কর যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুত্ররূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।" (বিঃ ১০ ও ১১ পৃষ্ঠা) পুত্রের জন্ম হইলে তাই জননী নাম রাখিয়াছিলেন 'বীরেশ্বর' (১২ পৃঃ)। * এদিকে যখন বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রথম বার † গিয়াছিলেন, তখন পরমহংসদেব (নরেন্দ্রের গান শুনিবার পরে) "হঠাৎ উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উত্তরের বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন ও ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া দরবিগলিত-ধারে অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে যেন বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় বলিতে

* ঢাকা দেওভোগের নাগ মহাশয় (শেষ অবস্থায়) স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াও বলিয়াছেন—"শ্রী শ্রী জয় শঙ্কর জয় শঙ্কর সাক্ষাৎ শিবদর্শন হল।" (বিঃ ২১৮ পৃঃ।

† ইহাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতলেখকের মত। শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গকার বলেন, এইটি দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎকার। (বিঃ ১০৭ পৃঃ ফুটনোট) অথচ উভয়েই স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছেন! এস্থলে ইহাও বক্তব্য, ৺ রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়-কৃত পরমহংসদেবের জীবনচরিতে বিবেকানন্দসম্বন্ধীয় এত সব কথা নাই—অথচ তিনি (রামচন্দ্র বাবু) বিবেকানন্দের আত্মীয় ও পিতৃ অন্নে পালিত 'রামদাদা' ছিলেন (বিঃ ১০৬-৭)। [পরমহংসদেব শ্রীচৈতন্য হইলে রামচন্দ্র দত্ত 'অদ্বৈত' (কেননা তিনি সর্ব্বাদৌ রামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলেন) এবং বিবেকানন্দ 'নিত্যানন্দ' ছিলেন। "ভারতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ" শীর্ষক, একটি চিত্রে দেখিলাম—শ্রীচৈতন্য যেমন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ সহ বিরাজমান—রামকৃষ্ণও রামচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ সহ সমাসীন। এইরূপে 'প্রচার' করিতে এই সম্প্রদায় কোনও কসুর করেন নাই। বাগচীর পঞ্জিকায় রামনবমীতে রামচন্দ্রের অথবা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর কোনও চিত্র নাই—কিন্তু পরমহংসের জন্মতিথিতে তাঁহার ছবি দেওয়া হইতেছে!]

লাগিলেন, 'এতদিন পরে আস্‌তে হয়! আমি যে তোর পথ চেয়ে হাঁ করে বসে আছি তা কি একটি বারও মনে কর্ত্তে নেই? বিষয়ী লোকেদের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার যে ঠোঁট পুড়ে যাবার মতন হয়েছে; এই কথা বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে আবার কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন 'প্রভু আমি জানি তুমি কে? তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নরনারায়ণ, জীবের দুর্গতিনিবারণের জন্যই তোমার শরীর ধারণ হইয়াছে'—ইত্যাদি * (বিঃ ১০৭—৮ পৃঃ)। পরে আছে, নরেন্দ্রের সম্বন্ধে "তিনি (পরমহংস) প্রায়ই বলিতেন 'ও খাপখোলা তলোয়ার।' 'পুরুষের ভাব ওর ভেতর।' 'ও অখণ্ডের (নিরাকারের) ঘর' 'সপ্তর্ষির একজন' 'নরনারায়ণ ঋষির নর' ইত্যাদি ইত্যাদি।" (বিঃ ১৩০ পৃষ্ঠা। সপ্তর্ষির মধ্যে 'নর-নারায়ণ' ছিলেন কি?—এবং একই ব্যক্তি নর (বা নারায়ণ) ও 'সপ্তর্ষির একজন' কিরূপে হইতে পারে? আরও দেখুন; "পরমহংসদেব বলিয়াছেন * * * ও (অর্থাৎ বিবেকানন্দ) যখন নিজকে জান্‌তে পার্‌বে ওকে তখনই দেহ ত্যাগ করবে।" (বিঃ ১০৮৫ পৃঃ) অথচ বিবেকানন্দ যে জাতিস্মর ছিলেন, তৎসম্বন্ধেও লেখা আছে; গোপালশীলের বাগানে অবস্থান কালে, (১৮৯৭ অব্দে) "হঠাৎ একজন স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা স্বামীজি, আপনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিষয় জানেন?' তিনি উত্তর করিলেন—'হাঁ, নিশ্চয়ই।' কিন্তু যখন তাঁহারা অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিবার জন্য তাঁহাকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন

* "লীলাপ্রসঙ্গপ্রণেতা বলেন, দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই পরমহংসদেব স্বামীজিকে এই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কথামৃতে (৩য় ভাগের প্রথম-সংস্করণে ২৮৭ পৃঃ আছে) প্রথম দিন নয়, কিন্তু অন্য আর একদিন। বিঃ ১০৮ পৃঃ ফুটনোট। [পূর্ব্ব পাদ-টীকায় উল্লেখিত ১০৭ পৃঃ ফুটনোটের সঙ্গে এইটুকুর তুলনা করিয়া যিনি যাহা পারেন বুঝুন।]

"আমি সবই জানি এবং ইচ্ছা করিলে আরো জানিতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।" (বিঃ ১০৫ পৃষ্ঠা) তিনি নিজের পূর্ব্ব কথা—তিনি যে কি—তাহা জানিতেন; তার পরেও পাঁচ বৎসর কাল দেহ ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পরমহংস দেবের কথাটা প্রমাণিত হইল কি?

আরো আছে—"স্বামীজির জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিয়াছিলেন যেন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আকাশের উত্তরপশ্চিম দিক্ হইতে কলিকাতার উত্তরভাগে শিমলা পল্লীর দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন 'এইবার যে আমার কাজ করবে সে এল।' এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কোন শহরের সহিত তাঁহার আগমনের সম্বন্ধ আছে এইরূপ আভাস দিয়াছেন। কে বলিবে সেই শহর ৺কাশীধাম কি না?" (বিঃ ১০৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা—ফুট্‌নোট্।)

বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩—জানুয়ারী; অতএব জ্যোতিদর্শন ১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে হইবার কথা। তখন রামকৃষ্ণ কোন্ অবস্থায় ছিলেন—সেটাও বিবেচ্য। সে যাহা হউক, এই জ্যোতিঃ নরনারায়ণের স্থান বা সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে আইসে নাই—কেননা উত্তর পশ্চিমের শহর বিশেষের সহিত ঐ আগমনের সম্বন্ধ ছিল। এবংবিধ নানা প্রকার কথা পরমহংস দ্বারা কথিত, এইরূপ প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার প্রতি আপনাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কি পরিমাণ অব্যাহত থাকিতে পারে—সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

তারপর বিবেকানন্দ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার নমুনা দিতেছি :—"অবতার বল্লে তাঁকে ছোট করা হয়।" (বিঃ ১৫১ পৃষ্ঠা) "পরমহংস ইচ্ছা করিলে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী করিতে পারেন।" (বিঃ অবতরণিকা ১৩ পৃষ্ঠা) "শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই" (পত্রাবলী ৮নং পত্র

৪৫ পৃষ্ঠা)। * ইত্যাদি। অবশ্য এগুলিতে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই !! এদিকে তো এই পর্য্যন্ত—পরন্তু পরমহংস দেবের জীবনের ঘটনাগুলিরও খবর তিনি ঠিক্ ঠিক্ রাখিতেন কিনা সন্দেহ। 'My Master বিষয়ক বক্তৃতায় পরমহংসদেবের স্ত্রীর যৌবন প্রাপ্তির পরে প্রথম সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—* * The husband had entirely forgotten that he had a wife. In her far off home the girl had heard that her husband had become a religious enthusiast * * *. She resolved to learn the truth for herself, so she set out and walked to the place where her husband was. When at last she stood in her husband's presence he at once admitted her right to his life; * * * The youngman fell at the feet of his wife and said: I have learnt to look upon every woman as Mother but I am at your service." The maiden was a pure and noble soul, and was able to understand her husband's aspirations and sympathise with them. She quickly told him that she had no wish to drag him down to a life of worldliness; but that all she desired was to remain with him, to serve him and to learn of him," (pp. 21—22 Natesan's collection of Speeches of Swami Vivekananda.) অথচ ৺ রামচন্দ্র দত্তকৃত জীবনবৃত্তান্তে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার স্ত্রী যখন ষোড়শবর্ষে উপনীত হন সেই সময় তাঁহার শ্বশুরালয়

* বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও তো স্বামীজি বলিয়াছেন—"মনুষ্যজাতির মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। (বি: [illegible] পৃ:)।

গমন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। * * * তন্ত্রমতে নাকি ষোড়শী পূজার বিধি আছে, তিনি তাঁহার স্ত্রীতে সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।" * তারপর, কিরূপে তিনি ঐ পূজা সম্পাদন করিলেন, সেই সকল এই অধ্যায়ে (১৮শ অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে আছে, "পরমহংস দেবের স্ত্রীর মনের ভাব বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি ষোড়শবর্ষে পতিত হইলে কি হইবে, তাঁহার তখন পর্য্যন্ত কুমারী ভাব ছিল। পতি কাহাকে বলে, তাহা তাঁহার সে পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় নাই, তন্নিমিত্ত এক্ষেত্রে তিনি ভালমন্দ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।"

আবার দেখুন, যখন প্রকৃতিভাবাবলম্বনে তিনি কিয়দ্দিন স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন—তদ্বিষয়ে ঐ বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলিতে-ছেন,—"He began to think that he was a woman; he dressed like a woman * * * and lived among the women of his own family, * * *" (p. 23. Natesan's collection of lectures). রামচন্দ্র দত্তকৃত জীবনবৃত্তান্তের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে—এবং তিনি যে জানবাজারে মথুর বাবুর বাড়ীর অন্তঃপুরে তখন অবস্থান করিতেন, সে কথা স্পষ্ট রহিয়াছে। পরের অন্তঃপুরে স্ত্রীবেশে থাকাটা ব্রীড়াজনক মনে করিয়াই কি স্বামীজি পরমহংসদেবকে স্বীয় পরিবারস্থ মেয়েদের সঙ্গে অবস্থান করাইয়াছেন?

তারপর পরমহংসদেব, জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ বিষয়ে স্পষ্ট শম্ভু মল্লিককে উপদেশচ্ছলে যাহা বলিয়াছিলেন, "কথামৃত" হইতে তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে:—"শম্ভু বল্লে, এই আশীর্ব্বাদ করুন, যা টাকা আছে সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়; হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করা, কূয়ো করা এই সব! আমি বল্লুম, এ সব কর্ম্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল,

* রামচন্দ্র দত্তকৃত পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত তৃতীয় সংস্করণ ৪৬ পৃষ্ঠা।

কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক্, এটা যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করা নয়। * * * এই সব অনিত্য বস্তু, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, তাঁকে লাভ হলে আবার বোধহয় তিনিই কর্ত্তা, আর আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁহাকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হলে, তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি হ'তে পারে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—প্রথম ভাগ ১২৭ পৃষ্ঠা।) এইরূপ আরো দু-এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন। স্বামীজি এ বিষয়ে বিপরীত পথেই চলিয়াছেন; রামকৃষ্ণ মিশন * সংস্থাপনে এখন হাস্পাতাল ডিস্পেন্সারিই সার ও মুখ্য সাধন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার গুরুভ্রাতারা ইহা পরমহংস-দেবের মতের বিরোধী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু বিবেকানন্দের সঙ্গে তর্কে আঁটিয়া উঠা তাঁহাদের কর্ম্ম নয়। 'মিশন' স্থাপিত হইলেও যখন একদিন জনৈক গুরুভ্রাতা ব্যাপারটা ঠিক্ হইতেছে না বলিলেন, তখন স্বামীজি প্রথম সব্যঙ্গগালি দিয়া, তৎপর ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"তোমরা মনে করেছো, যে তোমরাই তাঁকে বুঝ্‌তে পেরেছ, আর আমি কিছুই পারি নি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা নীরস শুষ্ক জিনিস। তার চর্চ্চা ক'রতে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে গলাটিপে মার্‌তে হয়। তোমরা যাকে ভক্তি বল্‌ছো সেটা যে দারুণ আহাম্মকী, কেবল মানুষকে দুর্ব্বল করে মাত্র, তা বুঝ্‌চো না। যাও,

* মিশন সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইল না—প্রয়োজন হইলে পশ্চাৎ করা যাইতে পারিবে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই এবং কাজও কিছু কিছু হইয়া থাকে। তবে মাতাপিতা প্রভৃতি অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নবযুবকগণ মঠে মিশনে আসিয়া চির-কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করে—ইহা কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না।

কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি মুক্তি চায়? দেখতে চায় তোমার শাস্ত্র কি বল্‌ছে? যদি আমি আমার দেশের লোককে 'তমোকূপ' থেকে তুলে মানুষ ক'রে গড়্‌তে পারি, যদি তাদের ভেতর কর্ম্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুল্‌তে পারি, তাহ'লে হাস্‌তে হাস্‌তে সহস্র নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ টামকৃষ্ণ কারুর কথা শুন্‌তে চাইনি। যে আমার মতলব অনুসারে কাজ কর্‌তে চায়, তারই কথা শুন্‌বো। আমি রামকৃষ্ণ কি কারুরই দাস নই—শুধু যে নিজের ভক্তি বা মুক্তি গ্রাহ্য না ক'রে পরের সেবা কর্‌তে প্রস্তুত, তারই দাস।"

(বিঃ ১২৩—২৪)

এই ঝড়ের পর কিঞ্চিৎ বর্ষণও হইয়াছিল; ঐরূপ বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কিছু সময় পরে যখন স্বামীজি বাহিরে আসিলেন, তখন ঠাকুরের জন্য যে তাঁর কত ভক্তিবেগ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ওঃ এখনও আমার অনেক কাজ বাকি রহিয়াছে; আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস, তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন, যত দিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই।" ইত্যাদি (বিঃ ১২৫ পৃঃ)। এই ঘটনা হইতে বুঝা গেল যে, তিনি রামকৃষ্ণদেবের যা অভিমত, তাহার অনুকূল ছিলেন না। মানুষ রাগিলেই পেটের কথা বাহির হইয়া যায়—এক্ষেত্রেও বিবেকানন্দ মনের কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—ফলতঃ তিনি "সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র"—কাহারো 'দাস' হইবার লোক ছিলেন না—"দত্ত কারো ভৃত্য নয়।" তবে দল না বাঁধিলে চলে না—তাই গুরু ভ্রাতাদের সঙ্গে 'আপোষ' করিয়া চলিয়াছেন—গুরুভ্রাতারাও বুদ্ধিমানের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে ইঁহারই নাম-ডাকের সঙ্গে তাঁহাদের গুরুদেবের তথা সম্প্রদায়ের সম্মানগৌরব বিজড়িত। তাই বোধ হয়, এ বিষয়ে অতঃপর আর তাঁহাদের কেহ কোনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই!

কথায় ও কাজে বৈপরীত্য সূচক দু'একটি বিষয় আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি সম্প্রতি আরো দেখান যাইতেছে। লাহোরে লালা হংসরাজকে তিনি প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন—"আর শাস্ত্রের গোঁড়ামী অপেক্ষা মানুষের গোঁড়ামী (ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলিয়া তাঁর আশ্রয় লইলেই মুক্তি— এইরূপ প্রচার) দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতি শীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। আমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতার রূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরু ভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমি ঐ প্রচারের বিরোধী। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্তু উহা পাকা হইয়া থাকে। যাহা হউক চা'র বৎসর অন্ততঃ এইরূপ উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিব। যদি উহাতে ফল না হয় (ফল হইবে বলিয়া যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস) তবে আমিও গোঁড়ামী প্রচার করিব।" (ভারতে বিবেকানন্দ—২য় সংস্করণ, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

এই কথা তিনি ১৮৯৭ অব্দের নভেম্বরে বলেন। এ দিকে ঐ কথার তিন মাস মাত্র পর (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮) [মতান্তরে ১৮৯৭ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ ঐ কথার ৯।১০ মাস পূর্ব্বেই] তিনি নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে রামকৃষ্ণের পোর্সিলেনের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় যোগ দিয়াছিলেন এবং মন্ত্রাদি বলিয়া যথানিয়মে পূজা করিয়াছিলেন। প্রণাম-মন্ত্রও রচিত হইয়াছিল—তাহা এই "স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে। অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥" (বিঃ ৮০০—৮০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঠাকুরের জন্মদিনে ব্রাত্য দ্বিজ সকলেই তাঁহার নাম লইয়া শুদ্ধ হইয়াছিল—এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। "গোঁড়ামী" আর কাকে বলে?*

* অথচ ঢাকায় তাঁহাকে একটি ছেলে, কোনও ব্যক্তির একখানি 'ফটো'

যখন রামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের চারি বৎসর পরে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতভ্রমণে বহির্গত হন, তখন একদা একজন কৃতবিদ্য থিয়োসোফিষ্টকে রেল গাড়ীর কামরায় পাইয়া মহাত্মগণের অলৌকিক শক্তিসম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া স্বামীজি তাঁহার সহিত কিঞ্চিৎ কৌতুকালাপের পরে উপদেশচ্ছলে বলিলেন—"* * * ধর্ম্মের সঙ্গে অলৌকিক ব্যাপারের বা সিদ্ধির যে নিত্যসম্পর্ক আছে, এটা কেমন করে তোমার মাথায় সেঁধুল? কিন্তু এটা দেখ্‌ছ না ঐরূপ সিদ্ধির ব্যবহার যাহারা করে তাহারা কত বড় কামনার দাস? অহঙ্কারের ঢেঁকি! যথার্থ ধর্ম্ম মানে চরিত্র—সেইটাই হচ্চে প্রকৃত শক্তি। চরিত্রবান্ পুরুষের রিপু দমন ও বাসনা ক্ষয় হয়েছে। আর যারা সিদ্ধি সিদ্ধি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও একটা অলৌকিক শক্তি চাচ্ছে, তারা জীবনসমস্যা সমাধানের পথে একটুও এগোয় নি, খালি দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপব্যবহার কচ্ছে ও স্বার্থপঙ্কে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। * * * বৃথা শক্তি-ফক্তির লোভে ছুটো না। ও সব আলেয়া।" (বিঃ ৩৪৭ পৃঃ)

কিন্তু যখন তিনি ঐ বারই বরাহনগর মঠ হইতে হিমালয় যাইবেন বলিয়া যাত্রা করেন, তখন গুরু ভাইদিগকে বলিয়াছিলেন, "এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদ্‌লে ফেল্‌তে পারার ক্ষমতা লাভ না করে ফির্‌ছি

দেখাইয়া ইনি 'অবতার' কি না পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে, স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"বাবা, এখন থেকে একটু ভাল করে খেয়ো দেয়ো। তা হলে মাথাটা খুল্‌বে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তোমার মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে গেছে।" আবার বলিলেন "গুরুকে শিষ্যেরা অবতার বল্‌তে পারে বা যা ইচ্ছে ধারণা কর্ত্তে পারে। কিন্তু তাই বলে দেশশুদ্ধ লোক অবতার হবে, এ কি রকম? ভগবানের অবতার যেখানে সেখানে বা যখন তখন হয় না।" ইত্যাদি) বিঃ ১০২৯ পৃঃ)। এই অবতার গজাইবার জন্য যে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রধানতঃ দায়ী—ইতঃপূর্ব্বেই এ কথা বলা হইয়াছে। ফলতঃ 'অবতার' সাজার মত নিরাপদ আর কিছুই নহে—'যা' 'তা' বলিলে বা করিলে "ঠাকুরের লীলা" মাত্র বলিলেই সমস্ত সঙ্গত হইয়া যায়।

না।" (বিঃ ২০৫ পৃঃ) এটা কি "অলৌকিক" কিছু নয়? এটা যে একটা স্পৃহণীয় ও প্রশংসার জিনিস, তা' তো পরমহংসদেবের "ভস্মাবশেষরক্ষিত কৌটাটি" গঙ্গাজলে ধুইয়া নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে খাওয়াইয়া তাঁহাকে ১০৭ ডিগ্রী জ্বর হইতে মুক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "ত্বাখ্ ঠাকুরের শক্তি দেখ্। তিনি কি না করতে পারেন।" (বিঃ ১০৫৩ পৃঃ) এমন যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঠাকুর, তিনি যাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ ছিলেন, সে পদার্থটা তো ঠাকুরের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শরীরেই সংক্রামিত হইয়াছিল। সে কথা তিনিই শিষ্য শরৎ বাবুকে বলিয়াছিলেন—"স্বামীজি। ব'সে থাক্‌বার যো আছে কি বাবা ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাক্‌তেন, ঠাকুরের দেহ রাখ্‌বার দু তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাদের এদিক ওদিক্ কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়"—ইত্যাদি, এই বলিয়া প্রথম খণ্ডে (বিঃ ১৪৮ পৃঃ) উল্লেখিত পরমহংস দেব কর্ত্তৃক তাঁহার মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ঘটনাটি বিবৃত করেন। (বিঃ ১০৩৪-৩৫ পৃঃ)

স্বয়ং 'কালী' যাঁর দেহ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন—তার আর কোনও সিদ্ধাই অর্জ্জনের দরকার ছিল কি? সর্ব্বশক্তিমান্ পরমহংস তো তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছিলেন—"তোর ভিতর দিয়েই আমার সিদ্ধাই কাজ করবে।" (বিঃ ১৪৯ পৃষ্ঠা) পাঠকবর্গ এই সকল কথার সঙ্গতি বিধান করুন। স্বামীজি কাশ্মীরে (জুলাই ১৮৯৮) অমরনাথে গেলে নাকি "স্বয়ং অমরনাথ তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন; এবং মৃত্যুঞ্জয় শিবের কৃপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরলাভ করিয়াছিলেন।" * (বিঃ ৮৮৭ পৃঃ) প্রায় সেই সময়েই (মে ১৮৯৮) নৈনিতালে অনেক মোসলমান অদ্বৈতবাদী নাকি "স্বামীজি দর্শনে ও তাঁহার আধ্যাত্মিক

* দুরারোগ্য রোগে ভুগিয়া অকালে ৩৯ বৎসর বয়সে যিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন—তিনি নিশ্চয়ই "ইচ্ছামৃত্যু" বরপ্রাপ্ত!

শক্তির পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন, "স্বামীজি, যদি ভবিষ্যতে কেহ কখনও আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে মনে রাখিবেন—আপনার এই মুসলমান বান্দাই তাহাদিগের সকলের অগ্রণী হইবে।" (বিঃ ৮২৮-২৯ পৃঃ) কিন্তু বিবেকানন্দের কোষ্ঠীর তেমন জোর ছিল না* তাই তিনি অবতার হইলেন না—কিন্তু তাঁহার জন্মতিথিতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির সাক্ষাতে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক পূজার্চ্চা হইয়াছে—এ সংবাদ আমরা শুনিতে পাইয়াছি।

কি উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকায় গমন করেন, এ বিষয়ে হায়দ্রাবাদে "My mission to the west" শীর্ষক বক্তৃতায়, সর্ব্বশেষে তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—"এই উদ্দেশ্য মাতৃভূমির লুপ্তগৌরব উদ্ধার ব্যতীত আর কিছুই নহে!" সভায় তিনি সুস্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিলেন যে, এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে ধর্ম্ম-প্রচারকের বেশে দূরতম পাশ্চাত্য প্রদেশে যাইতে হইবে এবং বেদ-বেদান্তের অতুলনীয় মহিমা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে।" (বিঃ ৩৭৪-৩৭৫ পৃঃ) পরন্তু মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই যেন উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হইল—তিনি আমেরিকা যাত্রার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের সময়ে বলিয়াছিলেন—"আমার যাওয়া যদি মার অভিপ্রেত হয়, তবে সাধারণ লোকদের নিকটই ভিক্ষা পাওয়া উচিত; 'কারণ আমি যে আমেরিকা যাইতেছি সে শুধু ভারতের দরিদ্র বা সাধারণ নরনারীর জন্য।" (বিঃ ৩৭৭ পৃঃ) বোধ হয় হায়দ্রাবাদে আমীর ওমরাহদের সভায় দরিদ্রের কথাটা স্বামীজির মনে উদিত হয় নাই। তবে তাঁর "প্রিয় ম—"র নিকটে লিখিত চিঠিতে কিন্তু আছে—" * * * জীবনের

* এই কথাটা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে—বিবেকানন্দের দেহপতি শনি ধর্ম্মস্থানে উচ্চাভিলাষী—পরমহংসের শনি তুঙ্গ বা উচ্চস্থ। "সুতরাং তাঁহার (পরমহংসের) তুলনায় (শনি) অল্প ফলপ্রদ এবং সেই জন্যই ইনি (বিবেকানন্দ) তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।" (বিঃ কোষ্ঠী বিচার দ্রষ্টব্য।)

সারাংশটা আমেরিকায় কাটিয়ে এলুম, নিজের যতটা শক্তি ছিল, সব খোয়ালুম—কেন? না, ও দেশের লোককে উদার উন্নত কর্‌বার জন্য ও ওদের আধ্যাত্মিক মার্গে নিয়ে যাবার জন্য" (বিঃ ৭৪৪ পৃঃ)। পরন্তু আমার বোধ হয় গুজরাটে পোরবন্দর রাজসভায় পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য দেশে যাইবার জন্য উৎসুকতা জন্মে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন "সত্যই স্বামীজি, ভারত আপনার উপযুক্ত স্থান নহে। আপনি পাশ্চাত্য দেশে গমন করুন এবং সে দেশে আগুন জালিয়া আসুন—দেখিবেন এ দেশের লোক আপনার প্রত্যেক কথায় উঠিতেছে, বসিতেছে।" (বিঃ ২৭৮-৭৯ পৃঃ) একটা বড় কিছু হব—এই উৎসর্পিণী বাসনা—ইংরাজীতে যাকে 'এম্বিশন' (ambition) বলে—বিবেকানন্দের প্রকৃতিতে অতীব বলবতী ছিল। *

এইরূপ লোকের একটা প্রবল আত্মাদর থাকে—সামান্য লোকের বিষয়ে ঐটাই দম্ভ বলিয়া আখ্যাত হয়। মহাকবি ভবভূতির প্রতিধ্বনি করিয়া 'ভারতী' সম্পাদিকার নিকটে লিখিত পত্রে তিনি বলিয়াছেন—কিন্তু আশা এই—"সম্পৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।" (পত্রাবলী নং ১৫ প্রথম ভাগ ৮২ পৃষ্ঠা)।

তিনি ইউরোপ হইতে এক পত্রে শিষ্যদিগকে লিখিয়াছেন—"আমি ভারতের যেমন, সমুদয় জগতেরও তেমনি। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি

* তদীয় জীবনচরিতের অবতরণিকায় (৩ পৃষ্ঠায়) গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"প্রাচীন কালের জুলিয়াস্ সীজার, আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট্ ও ইদানীন্তন কালের মহাবীর নেপোলিয়ন্ প্রভৃতি ২।৪টি মহাগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে শক্তিশালী পুরুষ বোধ হয় ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।" এই বাক্যে উৎকট অত্যুক্তি থাকিলেও কিছুটা যথার্থতা আছে—সীজার, আলেক্‌জাণ্ডার ও নেপোলিয়ান্ ইহারা সকলেই দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি ছিলেন—বড় লোক ছিলেন, কিন্তু পুণ্যশ্লোক ছিলেন না।

আমার পশ্চাতে এক মহাশক্তি দাঁড়িয়ে আমায় চালাচ্ছেন। আমি কারও সাহায্য চাই না। * (বিঃ ৫২৫ পৃঃ)

শিলংএ নাকি শ্বাসের পীড়ায় কাতর হইয়া আপনা-আপনি বলিয়াছিলেন—"যাক্ মৃত্যুই যদি হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম দেড় হাজার বছরের খোরাক।" (১০২৩) [তিনি না 'ইচ্ছামৃত্যু' বরপ্রাপ্ত—তবে এই 'মৃত্যুই যদি হয়' ইত্যাদি কেন?]

শিষ্যকে বলিতেছেন,—হীন সাহস হইলে ভাবিবে—"আমি * * অমুকের (অর্থাৎ স্বয়ং স্বামীজির) চেলা, * * এইরূপ খুব অভিমান রাখ্‌বি।" (বিঃ ১০৫০-৫১)

মৃত্যুর দিনেও নাকি অস্ফুট স্বরে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকৃতো, তবে বুঝ্‌তে পারৃত বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।" (বিঃ ১০৮৭ পৃঃ)। এ সকলের উপর টীকা অনাবশ্যক।

স্বামীজি আমেরিকায় গিয়া তত্রত্য স্ত্রীলোকদের হইতে যখন খুব প্রশংসা ও সহায়তা লাভ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের সম্বন্ধে যে সব চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উহাদের অতিশয় সুখ্যাতিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন। মাদ্রাজে শিষ্যগণের নিকটে ২।১১।৯৩ তারিখের চিঠিতে আছে—'আর ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত' (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৩১পৃষ্ঠ)। শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রের নিকটে লিখিত ২৮।১২।৯৩ তারিখের চিঠিতে আছে "* * এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। * * * এ দেশের তুষার যেমন ধবল,

* বিবেকানন্দ মহাসভায় বক্তৃতা দিয়া নামজাদা হইবার পূর্ব্বে মাদ্রাজী শিষ্যদের নিকটে লিখিত পত্রে তো সাহায্য প্রেরণের জন্য আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন! (পত্রাবলী—প্রথম ভাগ ১৫-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তখন এই 'মহাশক্তি' কোথায় ছিলেন?

তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন। * * * * আর এদেশের মেয়েরা কি পবিত্র। ২৫।৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হ'লে খারাপ হ'য়ে যাবে। আমরা কি মানুষ? * * * * ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যান্ত ব্রহ্মচর্য্য করে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি কর্‌ছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা) খেতড়ির রাজাকে ১৮৯৪ অব্দে যে পত্র দেন, তাহাতে ছিল—"আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের নারীর মত চাল-চলন নহে—তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখ, শান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি, ঐ প্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত। আমেরিকাবাসিনী রমণীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শতজন্মেও শোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না।" তারপর কিরূপে তিনি অসহায় অবস্থায় ঐ সকল রমণীদের নানাপ্রকারের সাহায্য লাভ করেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—পরে বলিয়াছেন—"কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি—কত শত জননী দেখিয়াছি, যাহাদের নির্ম্মল চরিত্রের—যাহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই—কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্ম্মল—আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং

সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না।* তবে তিনি তাহাদের মন্দ ভাগও যে দেখেন নাই—তা নয়—কিন্তু তাহার উল্লেখ কি সংযত ভাবে ও সাবধানে করিয়াছেন—"তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে, ভাল মন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাহা-দিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপদার্থ অসার অংশ দর্শনে সমগ্র জাতির ধারণা করিলে চলিবে না, কারণ উহারাও আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র, তাহাদ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে।" (বিঃ ৭৫১-৫৩ পৃঃ) খুব উদার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু দুই বৎসর পরে আমেরিকা হইতে ইউরোপে আসিয়াই যেন "বদলিয়ে গেল মতটা।" ১৮৯৬ অব্দে বিলাতে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"The Hindus to produce a little chastity in the race, have degraded all their children by child marriage, which in the long run has degraded the race. † At the same time I cannot deny that this child marriage makes the race more chaste. What would you have?

---

* কথাগুলি সমস্তই জানা আবশ্যক বলিয়া একটু বিস্তৃত 'কোটেশন' করা হইল। বিবেকানন্দের জীবনী লেখক এই সকল কথার উল্লেখ করেন নাই—করিলে ডাঃ ব্যারোজ বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহা যে অন্ততঃ আংশিক সত্য, এটা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন।

† এটা কি ঠিক্? তিনি তো "My Master" বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—This boy (রামকৃষ্ণ) had been married at the age of about eighteen to a little girl of five. Of course such a marrige is but a betrothal. The real marriage takes place when the wife grows older when it is customary for the husband to go and bring his wife to his own house (Natesan's Collections p 21).

If you want the nation to be more chaste, you degrade men and women physically by this awful child marriage. On the other hand, are your safe on your side ? No, because chastity is the life of a nation. Do you not find in the history that the first death sign of a nation has come through unchastity ? When that has entered, the end of the nation is in sight Where shall we get a solution of these miseries then ? If parents select husbands and wives for thir own children, then this evil of love is prevented. The daughters of India are more practical than sentimental. Very little of poetry remains in their lives. Again, if people select their own husbands and wives that does not bring much happiness. The Indian woman is very happy, there is scarcely a case of quarrelling between husband and wife. On the other hand, in the United States, where the greatest liberty obtains, scarcely is there a happy home. There may be some, but the nuuber of unhappy homes and marriages is so large that it passes all description. Scarcely could I go to a meeting or society but I found three quarters of the women present had turned out their husbands and children. It is so here there and everywhere." Natesan's Collections, "Maya and Illusion"—pp 203—204).

এই গেল আমেরিকার নারীবিষয়ক কথা। এখানে এইটুকু

উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি যে, যিনি সভাপতিরূপে তদানীং অপরিচিত বিবেকানন্দকে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বক্তৃতার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেই ডাঃ ব্যারোজ ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে গিয়া বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ করেন—তন্মধ্যে আমেরিকার নারীগণের অযথা নিন্দাও একটা বিষয়। এই অভিযোগের উত্তরে স্বামীজি আমেরিকায় জনৈক বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছেন—"একটা বক্তৃতায় আমি মিস্থদের (অর্থাৎ মিশনারিদের) সম্বন্ধে ও তাদের উৎপত্তি নিয়ে দু'একটা কথা বলেছিলাম—অবশ্য ইংরেজ ধর্ম্মযাজকদের বাদ দিয়ে—আর সেই সঙ্গে আমেরিকায় চার্চ্চওয়ালা স্ত্রীলোকদের ও তাদের কুৎসা উদ্ভাবনের শক্তিসম্বন্ধে একটু উল্লেখ করেছিলাম। এটাকে নিয়ে মিস্থরা খুব লাফালাফি করে বলে বেড়াচ্ছে, আমি নাকি সমস্ত আমেরিকার নারীজাতির নিন্দা করেছি—মতলব আর কিছুই নয়—ওদেশে আমি যে একটা করে এসেছি, সেটা পণ্ড করা। ইত্যাদি (বিঃ ৭৪৩ পৃঃ)।* এ সকলের সঙ্গতিবিধান পাঠকগণ নিজেরাই করিবেন। আমিতো দেখিতেছি কেবল 'মায়া ও ইলিউশন' !!

ভারতের নারীগণের সম্বন্ধেও বিবেকানন্দের দু'রোখা কথা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। সাধারণ জনগণ সম্বন্ধেও তদীয় মতামত উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি।

আমেরিকার পথ হইতেই চীন ও জাপান দর্শনান্তে মান্দ্রাজী বন্ধুগণের নিকটে লিখিত চিঠিতে আছে—"শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে,

* বিবেকানন্দচরিত-লেখক মহাশয়ও বলিয়াছেন "কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বামীজীর কোন লেখায় বা বক্তৃতায় আমেরিকান রমণীগণের বিরুদ্ধে একটি কথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।" ইত্যাদি (বিঃ ৫৮১ পৃঃ।)

তোমরা কি বল দেখি?" আবার আছে "এসো মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্তথেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ সব জাতি কেমন উন্নতিপথে চলেছে" তারপর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মান্দ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন প্রদান করবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হইয়াছে তাদের মানুষ করবার জন্মে আমরণ চেষ্টা করবে?" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ১৩ ১৪ পৃষ্ঠা) তারপর ভারতে আসিয়া একদিন এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—"সংগ্রামশীলতাই জীবনের চিহ্ন, যে জাতির চেষ্টা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই, সে জাতটা মরেছে—যেমন আমাদের জাত।' (বিঃ ৬৯৮ পৃঃ) এখন পাশ্চাত্য সমাজের লোকসাধারণের কিরূপ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, দেখা যাউক। মাদ্রাজী শিষ্যগণের নিকটে ২।১১।৯৩ তারিখে চিকাগো হইতে লিখিত পত্রে আছে "এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের অনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজা রাজড়া হইতে অধিক শিক্ষিত। আমরাও কেননা উহাদের মত শিক্ষিত হইব? অবশ্য হইব।" আমরা দরিদ্র বলিয়া যদি ওজুহাত দেই—এই মনে করিয়া তিনি লিখিয়াছেন "মনে করিওনা আমরা দরিদ্র *; অর্থ জগতে শক্তি নহে, সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কিনা।" (পত্রাবলী প্রথমভাগ ৩৪ পৃষ্ঠা) এই পাশ্চাত্য "সুশিক্ষিত"

---

* অথচ আমেরিকার পথ হইতে প্রাগুল্লিখিত পত্রের একস্থানে আছে "চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতাসোপানে একপদও অগ্রসর হইতে পরিতেছে না, দরিদ্রের অতি দারিদ্র্যই তাহার এক প্রধান কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাঁহার প্রাত্যহিক অভাবই তাহার সময়ের এতদূর ব্যাপৃত করিয়া রাখে যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না। (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৮ পৃষ্ঠা)।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।

গতবারে (১৩২৬ সালে) যখন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি গৌহাটিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন একদা কথাপ্রসঙ্গে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁহার সহিত যে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎভাবে আলাপ-পরিচয় ছিল, এ কথা অনেক গ্রন্থেই পাঠ করিয়াছিলাম; তাই কৌতূহলী হইয়াই ঐ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই—বিশেষতঃ পরমহংস তাঁহার 'চাপরাশ' আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনিও যখন ৺রামকৃষ্ণ গলনালীর পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন—তখন পীড়াযুক্ত স্থানে মন একাগ্র করিলেই পীড়া সারিয়া যাইবে, একথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন; এই দুই বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি ঐ সময় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পরমহংস দেবের ভক্তগণের লিখিত বিবরণ হইতে বিশেষভাবে বিভিন্ন; এবং তাঁহার সম্বন্ধে চূড়ামণি মহাশয় সাধারণতঃ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও পরমহংসের ভক্তগণের প্রচারিত গ্রন্থাদি পাঠে তৎসম্বন্ধে যেরূপ অবগত হওয়া যায়—তাহা হইতে অনেক পৃথক্ রকমের বোধ হইয়াছিল।

৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—এবং একজন উচ্চদরের সাধু মহাত্মা বলিয়াই তাঁহাকে মনে করিয়া থাকি। তাঁহার ভক্তগণের রচিত জীবন-চরিত ইত্যাদি ছাড়াও অপরের লিখিত

পরমহংস-দেবসম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া আমি তাঁহার প্রতি ভক্তির ভাব পোষণ করি—এমন কি হিন্দু সাধনশাস্ত্রে ও দেবদেবীতে যাঁদের বিশ্বাস আদৌ ছিল না, এমন অনেক লোককে আমি পরমহংস দেবের উক্তি ও জীবন-চরিত পাঠ করিতে বলিয়াছি, কেহ কেহ তদ্দ্বারা ফলও পাইয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য বর্ত্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই—বরং তিনি প্রকৃত যাহা ছিলেন, তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হউক—এই অভিপ্রায়ই এই প্রবর্ত্তনার কারণ।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগুলি যথাযথ লিখিয়া রাখিতে পারি নাই—তাই সেদিন তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, আমার নিকট তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন। তদুত্তরে তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশিত করা গেল।

পরন্তু আগে পূর্ব্বপক্ষ সম্যক্ না বলিলে উত্তরপক্ষ ঠিক্ বোঝা যাইবে না। তাই রামকৃষ্ণদেবের ও পণ্ডিত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মধ্যে 'চাপরাশ' ও মনঃসংযোগ দ্বারা রোগশান্তিবিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা, ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপই এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

"চাপরাশ" সম্বন্ধে কথা।

"একদা এই রঙ্গমন্দিরের সম্মুখস্থিত ভক্তিভাজন ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে রামকৃষ্ণদেবের আগমন হইয়াছিল। এই স্থানে পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণির নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি গমন করেন। আমরা সকলেই পশ্চাৎগমন করিয়াছিলাম। আমাদের সহিত নরেন্দ্রও ছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে "হ্যাঁগা তুমি যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ, তোমার চাপরাশ আছে?" চূড়ামণি মহাশয় কোন উত্তরপ্রদান করিতে

পারিলেন না এবং আমরা সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনরায় কহিলেন, "দেখ যখন রাস্তায় অনেক লোক গোলমাল করে, তখন পাহারাওয়ালা আসিবামাত্র সকলে সরিয়া পড়ে। লোকের হিসাবে পাহারাওয়ালা স্বতন্ত্র কোন প্রকার জীব নহে। তবে লোকে কেন সরিয়া যায়? কেন তাহাকে ভয় করে? কেন তাহার কথা শুনে? পাহারাওয়ালা সামান্য লোক, তাহার বেতন ৯৲ টাকা, তাহাকে কেহ ভয় করে না। কিন্তু তাহার যে চাপরাশ আছে, তাহা দেখিয়া লোকে ভীত হইয়া থাকে, যেহেতু চাপরাশ মহাশক্তির পরিচায়ক। সেইরূপ ভগবানের আদেশ এবং ইচ্ছা না হইলে তাঁহার শক্তি কাহার ভিতর না প্রবিষ্ট হইলে, যে যত পণ্ডিত হউক, যে যত বহুদর্শী হউক, যে যত শাস্ত্রজ্ঞ হউক, যে যত সুবক্তা হউক, কেহ কখন লোকের মন হরণ করিতে পারে না।" ইত্যাদি * রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

মানসিক একাগ্রতা দ্বারা রোগপ্রশমনের কথা।

"শশধর তর্কচূড়ামণি পরমহংসদেবকে কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, সমাধির সময় ক্ষতস্থানে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহা আরোগ্য হইয়া যাইবে। পরমহংসদেব সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "সমাধি করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে হইবে? এ অতি রহস্যের কথা।" † পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৪৫ পৃষ্ঠা।

---

* এ বিষয়টি শ্রীম—কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগ একাদশ খণ্ডে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষত:) বর্ণিত আছে; তাহাতে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—শ্রীম—মহাশয় বেশ একটু মোলায়েম করিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু দুই জন "সাক্ষাৎ দ্রষ্টা"র বর্ণনায় এইরূপ পার্থক্য হওয়াটা একটু আশ্চর্য্যজনক নহে কি?

† এ কথাটাও গ্রন্থান্তরে আর এক রকমে আছে:—ঠাকুরের তখন অসুখ—কাশীপুরের বাগানে—বাড়াবাড়ি। শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, সঙ্গে কয়েকজন,

এখন শ্রীযুত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

৺সদাশিবঃ শরণং।

বহরমপুর

† ২৭।৯।২৫ *

পরম স্নেহাস্পদেষু—সানুনয় সমাবেদনমিদং—

মহাত্মন্! † অনেকদিন হয় আপনার পত্রখানি পাইয়াছি, উত্তরে অনেক কথা লিখিতে হইবে, তাদৃশ অবকাশের প্রতীক্ষায় এতদিন বিলম্ব হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মহাশয়ের (পরমহংসের) সম্বন্ধে আমি যতটা বিদিত আছি, তৎসমস্তই সংক্ষেপে জানাইতেছি। এতদ্দ্বারাই আপনার জিজ্ঞাসিত সকল বিষয়ের উত্তর হইবে।

রামকৃষ্ণ 'পরমহংস' উপাধি কাহার নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা

অসুখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয় শাস্ত্রে পড়েছি, আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক্ মনে ক'রে মন একাগ্র ক'রে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখিলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন—"তুমি পণ্ডিত হ'য়ে এ কথা কি করে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এ ভাঙ্গা হাড়মাংসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?" পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন। ইত্যাদি স্বামী সারদানন্দপ্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ৭৪ পৃষ্ঠা।

* অর্থাৎ ২৫শে পৌষ ১৩২৭। পূর্ব্বে সনের অঙ্ক লেখাটাই সনাতনরীতি; পাশ্চাত্যের সঙ্গে এখানেও আমাদের প্রভেদ। (লেখক)

† তর্কচূড়ামণি মহাশয় পণ্ডিত—এবং "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"—তাই এই ক্ষুদ্রকেও এতাদৃশ সম্বোধন করিয়াছেন।

আমি জানি না। খুব সম্ভব ইহা সাধারণ লোকের নিকটই পাইয়াছিলেন। আজকাল সাধারণ লোকেরাই ঋষি, মহর্ষি, অমুকানন্দ, অমুক স্বামী, অমুক পরমহংস ইত্যাদি উপাধি দিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত কলিকাতা অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। রামকৃষ্ণের পরমহংস নামও বোধ হয় সেই ভাবেই হইয়াছিল। আর যদি তাঁহার গুরুই ঐ উপাধি দিয়া থাকেন, তবে তাহাও ভ্রান্তিমূলকই বুঝিতে হইবে, কারণ শাস্ত্রমতে যেরূপ অবস্থা হইলে পরমহংস বলা যায়, সে লক্ষণ তাঁহাতে আমি দেখিতে পাই নাই। এ কারণে তাঁহার প্রতি ঐ উপাধিটি ব্যবহার করিতে আমি সাহস পাই না, তবে তাঁহাকে আমি মহাশয় লোক বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এই জন্য আমি তাহাই বলিয়া থাকি। আর আশ্রমের ভাবে ধরিলে তাঁহাকে কোনও সংজ্ঞাই অকুণ্ঠিতভাবে দেওয়া যায় না। তাঁহার পরমহংসের লক্ষণ যেমন ছিল না, তেমন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-ত্রয়েরও শাস্ত্রতঃ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই—দণ্ডীও ছিলেন না, তবে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যবস্থামতে তাঁহাকে 'অবধূত আশ্রমী' বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অতএব আমার বিবেচনায় তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণ অবধূত' বলাই উচিত।

রামকৃষ্ণের সহিত আমার অনেকদিনই দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রথম তিনিই আমার কলিকাতার বাসায় গিয়াছিলেন। তৎপরে আমিও তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, শেষে তিনিও মধ্যে মধ্যে আসিতেন, আমিও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাইতাম। "ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন চাপরাশ আছে কি না" আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমি তাঁহাকে দেই নাই। সুতরাং ঐ ভাবে আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না এবং তিনি করেনও নাই। তিনি যে লেখাপড়া কিছু জানিতেন না এবং শাস্ত্রও পড়েন নাই, এ বিষয়ে তিনি বেশ ধারণা রাখিতেন এবং আমি যে তখন ২০।৩০ বৎসর

পর্য্যন্ত যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতেন। আমাকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বা তাহার অনুচরগণের একতম বলিয়াও মনে করিতেন না ; কাযেই আমাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে ।

আমি কোন ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা বা উপদেশ লওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকট যাই নাই ; কারণ তিনি কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং আধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়, বা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় বা তৎপ্রাপ্তি-সাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না। তাঁহার যাহা বিদিত ছিল, তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্রবিষয়ে যাহারা একেবারেই অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই তাহা উপযোগী হইতে পারে ও হইত ; 'রামকৃষ্ণকথামৃত' দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি শাস্ত্রাদি না জানিলেও কেবল গুরুর উপদেশ অনুসারে নিজের অনুষ্ঠান করিয়া অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিক বন্ধনও কতকটা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন ; ইহা আমি বিশ্বাস করি এবং ভক্তি রাজ্যেও তিনি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা আমি স্বীকার করি ; কিন্তু সে অনুষ্ঠান বা ততটুকু ভক্তিশিক্ষা অনেকের আবশ্যক বা উপযোগী হইলেও সকলের নহে।

তাঁহার ভক্তিমাখা গান শুনিতে বড় ভাল লাগিত, ভক্তির ভাব দেখিতেও আনন্দ হইত। তদ্ব্যতীত তিনি কতটা উন্নত হইতে পারিয়া-ছিলেন, তাহা বুঝিবার জন্য কুতূহল ছিল। আর তিনি অকপট সাধু প্রকৃতির লোক বলিয়া ধারণা ছিল।

এই সকল কারণে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে যাইতাম। আর তিনি সাধারণ লোকের নিকট হাসিতে হাসিতে যে সকল টোট্‌কা কথা বলিতেন, তাহাও বেশ মিষ্ট লাগিত। কিন্তু আমার নিকট তিনি কি কারণে সময় সময় আসিতেন, তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না। তবে

শাস্ত্রের ২। ৪টি কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা স্মরণ আছে। আর আমাকে তিনি বিশেষ একটু মমতার দৃষ্টিতে দেখিতেন এইরূপ আমার মনে হইত। আমি ধর্মব্যাখ্যাকার্যে ব্রতী ছিলাম, তাহাতেও তিনি বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন, মমতার কারণ বোধ হয় তাহাই হইবে। তিনি আমার কিছু বয়োজ্যেষ্ঠও ছিলেন।

তাঁহার উন্নতি কি পরিমাণ হইয়াছিল, তাহা স্থির করিয়া বলা সুকঠিন. তবে বাহিরে যে সকল লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে একজন সাধুপ্রকৃতির লোক এবং অধ্যাত্মরাজ্যেও এই স্থূলদেহের সম্বন্ধ কাটাইয়া আন্তররাজ্যের মনোময় কোষ অর্থাৎ প্রথম ভূমিকায় আরোহণ করিতে পারিতেন. ইহা বেশ বুঝিয়াছিলাম। অহঙ্কার, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তিগুলিও তিনি অনেকটা দমন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়াছিলাম। তিনি সকলকেই প্রায় সস্নেহে হাস্যমুখে কথা বলিতেন। ভোগ্যবস্তু বিষয়েও তাঁহার আসক্তি অনেকটা কমিয়াছিল, ইহা আমার ধারণা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তিনি এক শ্রেণীর অবধূত, সে অবস্থায় প্রসাদ মৎস্য মাংসাদি ভোজন তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে; কিন্তু খাইতেন কি না তাহা আমার স্মরণ নাই।

তবে রীতিমত তৈলাভ্যঙ্গপূর্ব্বক স্নান এবং বারংবার পান খাওয়া দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকদিগকে তিনি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতেই থাকিতেন, সেখানে মায়ের নানাবিধ উত্তম উত্তম ভোগ হইয়া থাকে, সেই প্রসাদ খাইতেন। তৎপর তাঁহার গুণগরিমা সাধারণে প্রকাশিত হইলে, অনেকেও উৎকৃষ্ট দ্রব্য লইয়া তাঁহাকে দিত, বাড়ী আনিয়াও অনেকে খাওয়াইত। সুতরাং আহার তাঁহার উৎকৃষ্ট মতই হইত, বাসস্থানও উৎকৃষ্টই ছিল। অতএব তাঁহার টাকাকড়ির কোন প্রয়োজনও ছিল না, তাহা নিতেনও না। এ কারণে তাঁহাকে একটি উন্নত পুরুষ অবশ্যই বলিতে হইবে। স্বয়ং গান করিতে,

করিতে কিংবা অন্যের গান অথবা ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ শুনিলে কিছু কালের মত তাঁহার একপ্রকার সমাধির মত অবস্থা হইত, তখন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না কিয়ৎকাল পর জাগ্রত হইয়া উঠিতেন। এই সমাধির ভাব তাঁহার মনোরাজ্যে থাকিয়াই হইত, তাহার উপরে নহে কারণ তিনি ঈশ্বরের রূপগুণেই মগ্ন থাকিতেন, তাহার উপরে নহে। রূপানুভূতি মনোরাজ্যেই হইয়া থাকে, ইহা অধ্যাত্মবিদ্যার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। তাহার পর যে অধ্যাত্মরাজ্যের অসংখ্যপ্রকার স্তর আছে, সমাধিরও অসংখ্য অবস্থা আছে, আর সর্ব্বোপরি যে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তস্বভাব বস্তু আছে,—যেখানে গিয়া নির্বীজ বা নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে পারে, সে সকল বিবরণ তিনি জানিতেনও না, সে সকল সমাধি হওয়ার সম্ভাবনাও তাঁহার ছিল না। সে সকল তত্ত্ব যাহাতে আছে, সেই অধ্যাত্মশাস্ত্র বা ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ তাঁহার একেবারেই অবিদিত ছিল। তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না। সে সকল তত্ত্ব এত দুরূহ যে, রীতিমত দর্শন এবং উপনিষদ্ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরু উপদেশে তাহার ধারণা বা জ্ঞান বা তাহাতে কোন অনুষ্ঠান কদাপি হইতে পারে না, কাজেই তিনি স্থূলদেহ ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেও মনোময় কোষ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা বুঝিয়াছিলাম।

তাঁহার যে সমাধির ভাব হইতে দেখিয়াছি, তাহা সমাধির নিয়মানুসারে হয় নাই; গানাদি শ্রবণমাত্রে অমনি তৎক্ষণাৎ হইয়া গিয়াছে। আবার কিছুকাল পর হঠাৎই তাহা ভঙ্গ হইত। এতদ্বারা এই সমাধিকে ঠিক্ অনুষ্ঠানের ফলও বলা যায় না। ইহা মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষের ফল হওয়াই অধিকতর সম্ভব। যাহাদের মস্তিষ্কের অংশবিশেষ অধিক দুর্ব্বল থাকে, তাহাদের কোন কোন বিষয়ের সামান্য ঘটনাও মস্তিষ্কে গুরুতররূপে জানাতেই, তখন অবস্থাবিশেষে তাহারও বাহ্য সংজ্ঞার লোপ হইয়াও থাকে। গানাদি শ্রবণেও ইহা

দেখা গিয়াছে। হাওড়ার নিকট শিবপুরে এক ব্রাহ্মণের একটি ছেলে দেখিয়াছিলাম, তাহার ৫।৬ বৎসর বয়স হইতেই খোল করতালিসহ কীর্ত্তনাদি গান হইলে, অনেকক্ষণ বাহ্য সংজ্ঞার অভাব হইত, ২০।২৫ পল বা অর্দ্ধ দণ্ড পর আবার সে প্রকৃতিস্থ হইত, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল। ১৬ বৎসরের পর একেবারেই সারিয়া গেল। তখন সে অতি কুপাত্র হইয়াছিল। ৫ বৎসরের সময় ইহার অবস্থা দেখিয়া নব্য অবতারের আবিষ্কারকগণ ইহাকে গৌরাঙ্গের অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অজ্ঞের মহিমা অপার! আমার একজন শিষ্য দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এরূপ অবস্থা হইত, এখন তাহা সারিয়া গিয়াছে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। রামকৃষ্ণ মহাশয়ের মস্তিষ্কের অবস্থাও অত্যন্ত অনুভবশীল ছিল। কোন কুলোক বা সুলোকে তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, কিংবা কোন পানভোজন করিতে দিলে, তদ্দ্বারা তাহাদের শক্তি যেটুকু সংক্রান্ত হইত, তাহাও তাঁহার অনুভবে আসিত। স্বর্ণাদি ধাতব বস্তু স্পর্শেও তিনি বিশেষত্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল থাকার অন্যান্য প্রমাণও যথেষ্ট আছে। সেই কারণেই গান করা বা শুনাকালে তাঁহার ঐরূপ বাহ্য সংজ্ঞা বিলোপ হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। অজ্ঞান অবস্থায় যে তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিতেন, সেই বিক্ষেপ ইহারই ফল বলিয়া মনে হয়। সমাধিশাস্ত্রে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে ঐরূপ অবস্থায় যে তাঁহার মনোময় কোষে সমাধির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অমূলক। তবে তিনি বিজনে বসিয়া কতদূর কি করিতে পারিতেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেই মনোময় কোষে যাইতে পারিতেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় নাই। তিনি দেহত্যাগ

করার পূর্ব্বে মাস ৫।৬ পর্য্যন্ত গলরোগের দারুণ যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক মনোময় কোষে উঠিতে পারিলে, তাঁহাকে এ যন্ত্রণা মোটেই ভোগ করিতে হইত না। এই সময় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল, তখন এই যন্ত্রণানিবৃত্তির জন্য এই জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "আমি একাগ্রতার চেষ্টা করিলে ইষ্ট দেবতার দিকেই লক্ষ্য বাড়ে; সুতরাং আমি ইহা করিতে পারিব না।" তাহা হইলেও তিনি, যোগ-শক্তিবলে মনোময় কোষাদিতে উঠিতে পারুন আর নাই পারুন, একটি সাধুপ্রকৃতিসম্পন্ন মহাশয় লোক ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তের কোনও বাধা নাই। কিন্তু দেহাবসানের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কিছু নামিয়া পড়িয়া-ছিলেন, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম।

আমি এইটুকু বুঝিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আত্মীয়ভাবে আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা আপনার প্রীতিকর হইবে কিনা ভাবিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, আপনি অবশ্যই তাহা বলিবেন। আমি বলিলাম, আপনার সহিত আমার পরিচয় হইলে, প্রথমভাগে আপনার অবস্থা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার একটু নিম্নদিকে পরিবর্ত্তন মনে হইতেছে; ইহা সত্য কিনা তাহাই জানিতে বাসনা, নিজের অবস্থা আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন। তখন তিনি একটু বিষাদের সহিত বলিলেন, আপনিতো ঠিক্ ধরিয়াছেন। আপনি ইহা কেমন করিয়া বুঝিলেন, আমি তো সর্ব্বদাই আমার অবস্থান্তর অনুভব করিতেছি। ইহার কারণ আপনার কি মনে হয় বলুন দেখি? আমি বলিলাম, অন্য কিছু কারণ থাকিলে, আমার অবিদিত; আপনি কুসংসর্গের আবর্ত্তে পতিত হইয়া আছেন, ইহাই আমি প্রধান কারণ মনে করি। তিনি বলিলেন, ইহা তো আপনি ঠিক্ বুঝিয়াছেন, আমি ইহা বেশ অনুভব

করি এবং এ সংসর্গ ত্যাগেরও চেষ্টা সর্ব্বদাই করি। * * * † উহারা যে আমারে ছাড়ে না। এখন আমি উহাদের খপ্পরের মধ্যে পড়িয়াছি। এখন এ বন্ধন কাটানের কোন উপায় নাই। কাজেই এবার এই ভাবেই যাইবে। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার গলরোগ, তৎপরে দেহাবসান হয়।

তাঁহার যোগজ কোনও বিভূতি আমি দেখি নাই; তবে বক্ষাদিতে হস্তামর্ষণের দ্বারা কাহারও কাহারও বেদনাদি অল্পকালের জন্য তিরোহিত হইতে দেখিয়াছি। ইহা যৌগিক শক্তির কার্য্য নহে, নৈসর্গিক শক্তির কার্য্য; ইহা বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে।

ইহার উপদেশের দ্বারায় কলিকাতা অঞ্চলে অনেক লোক উপকৃত হইয়াছিল। যাহারা পুরাতন পথেই অবস্থিত, তাহাদের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্মকর্ম্মের আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমন কি যাঁহারা সনাতন পথভ্রষ্ট, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন শুনিয়াছিলাম ৺ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির নবাবিষ্কৃত মতের পরিবর্ত্তন ইহার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল, এ উপকার হিন্দুসমাজের চিরস্মরণীয়। রামকৃষ্ণ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই মাত্র যথাজ্ঞান আপনাকে বিদিত করিলাম। আপনি ইচ্ছা করিলে, ইহা যে কোনরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। এই পত্রের প্রাপ্তিসংবাদ সহ আপনার কুশলবার্ত্তার অভিলাষ করি। অত্র মঙ্গল ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ শ্রীশশধর শর্ম্মণঃ।

পণ্ডিত প্রবর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ৺রামকৃষ্ণ দেবকে "পরমহংস" লক্ষণাক্রান্ত না দেখিয়া তাঁহাকে 'অবধূত' বলিয়াছেন; 'অবধূত' যে 'পরমহংস' অপেক্ষা কম কিছু, তাহা মনে করা অনুচিত—'অবধূতঃ

† বোধ হয় কোনও কোনও ব্যক্তির নাম হইবে। চূড়ামণি মহাশয় তাহাদের উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেন নাই।

শিবঃ সাক্ষাৎ অবধূতঃ সদাশিবঃ'—ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কি হইতে পারে?

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কোন্নগরনিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় ৺রামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর লক্ষণ না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি কি আমার সমজ্ঞ?" (৺রামচন্দ্র দত্ত-কৃত পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—) ৬২পৃষ্ঠা। *

তারপর ৺রামকৃষ্ণের ভাবাবেশসম্বন্ধেও তর্কচূড়ামণি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই বোধ হইতেছে; কেন না তিনি সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেও এইরূপ মধ্যে মধ্যে অচেতন হইতেন। ৺রামচন্দ্র দত্ত-কৃত জীবনবৃত্তান্তে আছে, "ঠাকুর-দেবতার প্রতি রামকৃষ্ণের ভক্তি ছিল এবং স্বহস্তে মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতেন ও সময়ে সময়ে তিনি তদ্ভাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন।" (৪ পৃষ্ঠা)

অতএব এইরূপ ভাবাবেশ যোগজাত সমাধি নহে বলিয়াই বোধ

---

* কিন্তু এইরূপ সন্দেহ করাতে ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত পণ্ডিতপ্রবরকে তীব্র আক্রমণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ওরূপ ভাব ঠিক্ নহে। মনে রাখা উচিত, কেহই 'অন্তর্য্যামী' নহে—বাহ্য আকার আচরণ দেখিয়াই লোকে অপরকে বিচার করিবে—বিশেষতঃ শাস্ত্রদর্শীরা শাস্ত্রের কষ্টিপাথরেই লোককে কষিয়া দেখিয়া তদ্বিষয়ে ধারণা করিবেন—ইহাই স্বাভাবিক। [সম্প্রতি ৺তারকেশ্বরের মহন্তসম্বন্ধীয় আন্দোলন উপলক্ষে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার পণ্ডিতবর্গ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বিষয়ে যে শাস্ত্রবাক্য উদাহৃত করিয়াছেন তাহাতে আছে—

দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥

৺রামকৃষ্ণদেবে এ সকল লক্ষণ কতটা লক্ষিত হইত?]

হয় *—ইহার অধিক বলিতে আমার অধিকার নাই—তবে ধর্ম্মসাধনে অভিজ্ঞ পণ্ডিতবর্য্য তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা যে প্রণিপানযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেষাবস্থার পরমহংসদেবের 'কু-সংসর্গ' সম্বন্ধে তর্কচূড়ামণি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আমরা ৺ রামচন্দ্র দত্ত-কৃত জীবনবৃত্তান্তে পাইয়াছি।—"তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমাদের সকলের পাপভার গ্রহণ করিয়া আমি অসুস্থতা ভোগ করিতেছি।" (১৫৪ পৃষ্ঠা) †

মোটের উপর চূড়ামণি মহাশয় ৺ রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে অনুকূল ভাবই পোষণ করিয়াছেন,—তবে তাঁহার ভক্তগণ যে সকল শক্তিমত্তা তাঁহার উপর আরোপ করেন—সে গুলি চূড়ামণি মহাশয় অনেকটাই স্বীকার করেন না। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। অথচ শ্রদ্ধাসহকারেই ৺ রামকৃষ্ণ দেবের নিকটে যাইতেন। তাঁহার কথাগুলি, সুতরাং সমাদরযোগ্য। বিশেষতঃ শাস্ত্র ও দেব-দেবীতে যখন বিশ্বাস হারাইয়া হিন্দুসমাজ বিধ্বস্তপ্রায় হইতে বসিয়াছিল—তখন যেমন ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসের আদর্শে ও উপদেশে সমাজের উপকার হইয়াছিল—পণ্ডিত শশধরের ধর্ম্মবক্তৃতার দ্বারা তাদৃশ—এমন কি তদপেক্ষা অধিক—উপকার হইয়াছিল। তাঁহার অনেক শিষ্য কর্ত্তৃক প্রচারিত ও তৎকর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত "বেদব্যাস" পত্রে "সাধুদর্শন" শীর্ষক কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত

* ব্রাহ্মপ্রচারক ৺ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে "পীড়া" বলিয়াছেন। তদীয় আত্মচরিতে আছে "তদ্ভিন্ন তাঁহার (অর্থাৎ পরমহংসের) একটি পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকিতেন।" (২০৮ পৃষ্ঠা) [ইহা "নার্ভাস্‌নেস্" বলিয়াই বোধ হয়।]

† কৌতূহলী পাঠক "জীবনবৃত্তান্তে"র এই প্রসঙ্গটি সমগ্র পড়িয়া দেখিবেন।

হইয়াছিল—তাহাতে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী প্রভৃতির সঙ্গে ৺ রামকৃষ্ণেরও প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে. তর্কচূড়ামণি মহাশয় সর্ব্বদাই ৺ রামকৃষ্ণ দেবকে আদরের চক্ষেই নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেন। *

৺ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার যেটুকু ভক্তি বিশ্বাস পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি—অবশ্য তাঁহার ন্যায় সাধু মহাত্মার সম্বন্ধে কথা বলার আমি নিতান্তই অনধিকারী। তথাপি স্বীয় ধারণা অনুযায়ী কয়েকটি কথা এস্থলে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

শ্রীশ্রীভগবতীর ইচ্ছায় জগতের সমস্তই হইতেছে—এই যে রামকৃষ্ণ দেবের বঙ্গদেশের রাজধানীর সন্নিকটে আবির্ভাব, তাহাও তাঁহার একটা বিধান। সনাতন ধর্ম্মের যখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা—সাকার উপাসনার—তথা ধর্ম্মসাধনের-সনাতন রীতির প্রতি যখন ইংরেজীশিক্ষিত লোকের অনাস্থা হইতেছিল, তখন অনেকগুলি বিষয় মহামায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী

* এ স্থলে অপর একজন অতিবিশিষ্ট পণ্ডিত মহোদয়ের কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না; পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাই, তৎসময়ে পূর্ব্বদিন আমার জনৈক পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺————মহোদয়ের সহিত ৺রামকৃষ্ণপরমহংস সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "বাপু হে, লোকটি বেশ চতুর ছিলেন, কিন্তু তুমি যে বল, তিনি ভগবতীর দর্শন পাইয়াছিলেন, এ সব বাজে কথা—এমন যে পূর্ণানন্দ পরমহংস—তিনিও সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ, কেননা তাঁহার গ্রন্থে "এটাও হইতে পারে, ওটাও হইতে পারে," এরূপ সন্দেহ আছে, যাঁর ভগবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁর সন্দেহ থাকিবে কেন?" উত্তরে বলিয়াছিলাম—"মহাশয়, যে দেবতাকে এমন ব্যাকুলভাবে ডাকিলে বা ঈদৃশ কঠোর তপস্যা করিলেও দর্শন করা যায় না, এমন দেবতা আমি মানি না—পূর্ণানন্দের যে স্থলে সন্দেহ বলিতেছেন, তাহা যদি এমন হয় যে, এটা ওটা উভয়টাতেই ঈপ্সিত বিষয় সমানভাবেই সিদ্ধ হইতে পারে, তাহ'লে?" পণ্ডিতমহাশয় এই অজ্ঞকে হঠাৎ প্রাজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতে দেখিয়াই বোধ হয় "মৌনমত্র হি শোভনম্" মনে করিয়া আর তর্ক বাড়ান নাই।

কৃপায় সংঘটিত হইয়াছিল—৺ রামকৃষ্ণ দেবের অভ্যুদয়ও তাহার মধ্যে একটি। তাঁহার উক্তি ইত্যাদি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়া আমার প্রতীতি এই জন্মিয়াছে যে, তিনি শাস্ত্রানুসারে সাধন ভজনাদি করিয়া যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন তাহা প্রায়শঃ শাস্ত্রের বিধিরই অনুযায়ী—এবং সনাতন ধর্ম্মেরই পোষক। তাঁহার কথায় ও আদর্শে অনেকের স্বধর্ম্মে আস্থা হইয়াছে—ইহাতে সনাতনধর্ম্মের উপকার হইয়াছে। চূড়ামণি মহাশয়ও একথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ মধ্যে অনেকে সনাতন রীতি নীতির বিরুদ্ধে নানা উপদেশ প্রচার করিয়াছেন—এবং রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে 'অবতার' সাজাইয়াছেন—তাঁহারা অপর সাধু মহাত্মগণের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, 'অবতার' না হইয়াও তাঁহাদের বর্ণনানুরূপ (যাহাতে বহু কথা অতিরঞ্জিত আছে) মনুষ্য ভারতবর্ষে অনেকেই ছিলেন। ৺ ত্রৈলিঙ্গস্বামী ৺ ভাস্করানন্দ স্বামী, বারদীর ব্রহ্মচারী, বামাক্ষেপা, ৺ রামদাস কাঠিয়া বাবা প্রভৃতি বহু মহাত্মা ভারতের নানাস্থানে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া শিষ্য ও ভক্তগণকে চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

রামকৃষ্ণের যাঁহারা মন্ত্রশিষ্য—তাঁহাদের গুরুদেবকে ভগবান্ মনে করা খুবই সঙ্গত—কিন্তু 'অবতার' বলিয়া প্রচার করাতে এই অনিষ্ট হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণের দেখাদেখি বঙ্গদেশময় বহু 'অবতারের' আবির্ভাব হইয়াছে—এবং রামকৃষ্ণ এই সকল উদ্ভটশ্রেণীর লোকের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অবতারবাদীরা শ্রীচৈতন্যের অনুকরণে রামকৃষ্ণের 'লীলা' প্রচার করিতেছেন—ইহাতে শ্রীচৈতন্যেরও কিঞ্চিৎ লাঘব হইতেছে। *

* চৈতন্যভাগবতাদি পড়িয়া জনৈক ব্যক্তির ধারণা হইয়াছিল, মহাপ্রভু

তারপর ৺ বিবেকানন্দ 'হাঁড়িধর্ম্ম' 'ছুৎমার্গ" ইত্যাদি বলিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, জানিনা, আজ ৺ রামকৃষ্ণদেব জীবিত থাকিলে তিনি শুনিয়া কি বলিতেন ; লোকে যা'তা' খাউক, যার তার পাত চাটুক —এরূপ উপদেশ তাঁহার উক্তি বা আচরণে কোথাও পাইয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। ৺ রামচন্দ্র দত্ত-চরিত "জীবনবৃত্তান্তে" আছে— "তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতি লাভ করিতেন, কিন্তু এরূপ স্থানে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন। (১৩২ পৃষ্ঠা) ফলতঃ সাধু মহাত্মারা শাস্ত্রদৃষ্ট সনাতন রীতি নীতির বিরুদ্ধে চলিবার জন্য উপদেশ দিবেন—বা তদনুরূপ আচরণ করিবেন, ইহা কদাপি সম্ভাবিত নহে। * বরং অবস্থাভেদে সাধারণের আচার আচরণ হইতে উদাসীন অবধূত কোনও সাধু বিভিন্ন আচারানুষ্ঠান করিলেও তাহা গর্হিত হইত না—তথাপি ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস ওরূপ কিছু করিয়াছেন বলিয়া তো দেখা যায় না। বরং তিনি বলিতেন, "আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি—ওরা দৌড়িয়ে মুতিবে।" তাই নিজের আচরণের প্রতি যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতেন। †

সনাতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে ৺ বিবেকানন্দ যে সকল কথা বলিয়াছেন—এবং তিনি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয়ে ইতোধিক কিছু বলা এস্থলে অনুচিত মনে করিতেছি—ইচ্ছা আছে প্রবন্ধান্তরে এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

একজন অবতারই হইবেন—তাই জন্মাষ্টমীর ন্যায় ফাল্গুনী পূর্ণিমাতেও উপবাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের এ সকল জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহার মনে হইল—যাহা ইদানীং ঘটিতেছে—৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ তাহাই হইয়াছিল—অর্থাৎ ভক্তেরা অত্যুক্তিপূর্ণ কাহিনী রচিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি এখন আর ঐ তিথিতে উপবাস করেন না।

* শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থাবলীতেও এমন দেখা যায় না যে, চৈতন্যদেব "সবলোট" হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। পুরীতে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ নাই—তথাপি সেখানেও তিনি ব্রাহ্মণের বাড়ী ভিন্ন ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় নাই। অথচ তিনি সন্ন্যাসী সুতরাং বর্ণভেদের অতীত ছিলেন।

† অবশ্য, রামকৃষ্ণ কথামৃতে বা লীলাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের আচরণে বা বাক্যে শাস্ত্র ও সদাচার বিরোধী ভাব দেখা যায় ; এসম্বন্ধে ইতঃপশ্চাৎ আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

কুলি প্রভৃতির জ্ঞান ও চরিত্র কিরূপ, স্বামীজির বর্ণনায় দেখা যাইবে। তিনি গল্প করিয়াছিলেন, "এক বিশপ একদিন এক কয়লার খনিতে গিয়াছিলেন * * * * জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি খ্রীষ্টকে জানো?' তাহাতে শ্রোতৃবর্গের একজন বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত উত্তর করিল, 'আজ্ঞে তার নম্বরটা কত?' * *" এই বলিয়া স্বামীজি গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "পাশ্চাত্যের লোকেরা এশিয়ার লোকের মত ধর্ম্মপ্রাণ নহে। সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের চিন্তাই নাই। একজন ভারতবাসী লণ্ডন বা নিউইয়র্কে গেলে প্রথমেই দেখে—সেখানকার দুর্নীতিপরায়ণতা তাহার কল্পিত নরকের চেয়েও বেশী। এশিয়ার লোক যতই অধঃপতিত হউক, লণ্ডনের হাইড্‌পার্কে দিন দুপুরে যে সব কাণ্ড ঘটে তা দেখলে তারও মনে ঘৃণা হয়।" * তিনি বলিতেন, "পাশ্চাত্য দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু যে তাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ, তা নয়, এদিকে খুব গোঁড়া ও অসভ্য।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন, এক কয়লার গাড়ীর গাড়োয়ান তাঁহার প্রাচ্য পোষাকের উপর একটা কয়লার চাঁই ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। (বিঃ ৮৩০-৩১ পৃষ্ঠা) তবে আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর জন্য স্বামীজির এত দরদ কি জন্য? এদের 'পশুত্ব' কোথায়? দারিদ্র্য তো নিম্ন শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ নহে—সমস্ত শ্রেণীতেই তাহা অল্পাধিক রহিয়াছে—পুরোহিতশ্রেণীতে তো দারিদ্র্য নিত্যসিদ্ধ। তারপর 'জাতটা মরেছে' বলিয়াছিলেন—আবার তিনিই অন্যরূপও বলিয়াছেন। যদি কেহ বলিত, ভারতীয় জাতি জরাগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা

* কিন্তু ভারতে অপরাধীর সংখ্যা অল্প বলায় নাকি তিনি সিষ্টার নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, "হা ভগবন্! এরূপ না হইয়া যদি ইহার বিপরীত হইত! কারণ এই আপাতদৃষ্ট ধর্ম্মভাব বা অপরাধের অল্পতা, এটা মৃত্যুর লক্ষণ।" (বিঃ ১৬৫ পৃষ্ঠা) এর উপর আর কথা চলে না। ইহাই কি "ধর্ম্মপ্রচারকের" উক্তি!!

হইলে তিনি নানা উদাহরণ দ্বারা দেখাইতেন, "জাতিটা প্রাচীন হইলেও যুবার ন্যায় সবল ও সতেজ আছে, তাহার প্রমাণ এই, এদেশের সমাজ যত শীঘ্র বিদেশের সভ্যতাকে আপন শরীরের অংশবিশেষে পরিণত করিয়া লয়, অপর কোনও সমাজ তাহা পারে না।" (বিঃ ৮২০-২১ পৃঃ)।

তিনি পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করিয়া এক ইংরেজী বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"Social matters in India have not been free, but religious opinion has. Here (অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে) a man may dress any way he likes, or eat what he likes, no one says nay or objects; but if he misses attending the Church Mrs. Grundy is on him. "Maya and the conception of God"—Natesan's Collection p. 222. (বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত হইল না)। কিন্তু এই তুলনা কি ঠিক্? এখানে কি কেহ কোনও পোষাকে কোনও দিন আপত্তি করিয়াছে? এই যে ইংরেজীশিক্ষিতের দল কেহ কোট্-প্যাণ্ট, কেহ চোগা চাপকান্, কেহ হেট্-কোট্, কেহ পাগড়ী, কেহ শাম্লা, কেহ ক্যাপ, নানারূপ পোষাক পরেন—এজন্য কি কেহ সমাজচ্যুত হইয়াছেন? অবশ্য খাদ্যাখাদ্য বিচার একটা আছে—কিন্তু তাহাতেও কেহ ভাত, কেহ লুচি, কেহ মৎস্য মাংস, কেহ নিরামিষ ভোজন করিতেছে—তজ্জন্য কে কবে সমাজবহিষ্কৃত হইয়াছে? আর পাশ্চাত্যেরা এখানে আসিয়াও এই গ্রীষ্মের মধ্যেও ধুতি পরে না—তাহাদের আঁট-সাট পোষাকই পরিধান করে—কচিৎ ভাত খায়—পরন্তু মদ্যমাংসভূয়িষ্ঠ আহারই করে। ও দিকে বিদেশীয়েরা পাশ্চাত্য দেশে গিয়া যদি অন্যরূপ পোষাক পরর, তবে যে বিড়ম্বনা হয়, ইতঃপূর্ব্বে স্বামীজির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই দেখান হইয়াছে। তাঁহার একখানি পত্রেও আছে:—"এদেশের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পোষাক সম্বন্ধে বড়ই খুঁৎখুতে, আর এদেশে তাহাদেরই

প্রভুত্ব”—(পত্রাবলী ১ম ভাগ ২৭ পৃঃ) তবেই তো কেবল বিদেশীর নয়, ওদের দেশের লোকেরাও যদৃচ্ছা পোষাক পরিতে পারে না। আহার সম্বন্ধেও বিবেকানন্দই প্রমাণ। তিনি কাঁটাচামচের পরিবর্ত্তে শুধু হাত দিয়া খাইতে চাহিতেন, “প্রথম প্রথম ও দেশের লোকেরা তাঁহাকে শুধু হাতে খাইতে দেখিলে যেন স্তম্ভিত হইয়া যাইত—কারণ ওদেশে কাঁটাচাম্‌চে ব্যবহার না করা ঘোর অসভ্যতার চিহ্ন।” (বিঃ ৫৬৩) তা' হলে স্বাধীনতা কোথায়? বরং এদেশে এইটুকু উদারতা আছে যে, বিদেশীর যাদৃচ্ছিক আহার বা পোষাক সম্বন্ধে কেহ কুত্রাপি কটাক্ষপাতও করিবে না।

স্বামিজী এদেশে কাহাকেও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ-পরিহিত দেখিলে বিরক্ত হইতেন। কতিপয় সিংহলবাসীর ঐরূপ পোষাক দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “এরূপ অন্ধ অনুকরণ অতীব হেয়। বিশেষতঃ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতের পক্ষে অচল। কালা চেহারায় ওসব মোটেই মানায় না।” (বিঃ ৬৩৭ পৃঃ) তিনি আরও বলিয়াছেন—“যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয় বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত।” (বিঃ ৯১৬) উত্তম কথা। কিন্তু তিনি যখন শেষের বার পাশ্চাত্য দেশ বেড়াইয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁর পোষাকটি কি রকম ছিল? বোম্বাই হইতে কলিকাতার পথে “স্বামীজি ইউরোপীয় পরিচ্ছেদ পরিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে মন্মথ বাবুও তাঁহাকে ভালরূপ চিনিতে পারেন নাই—ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কি জানি যদি অন্য কেহ হয়।” বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলে বাগানের মালী ছুটিয়া গিয়া মঠের লোকদিগকে সংবাদ দিল, “একো সাহেবো আউচি।” (বিঃ ৯৮০ পৃষ্ঠা)।

তিনি ধর্ম্মব্যাখ্যা যে ভাবে করিয়াছেন, তাহাও অনেক সময়েই আপত্তিজনক। তিনি বলিয়াছেন ‘প্রেতপূজাতেই হিন্দুধর্ম্মের আরম্ভ।

প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের শরীরে কোন মৃত আত্মীয়ের প্রেতাত্মাকে আবাহন করিয়া তদুদ্দেশ্যে পূজা ও বলি প্রদানের প্রথা ছিল। ক্রমে দৃষ্ট হইল যে, যে সকল ব্যক্তির শরীরে প্রেতের আবির্ভাব হয়, তাহারা বড় শারীরিক দৌর্ব্বল্য অনুভব করে, সুতরাং এ প্রথার পরিবর্ত্তে কুশপুত্তলীতে প্রেতানয়নের ব্যবস্থা হইল এবং তাহারই উদ্দেশ্যে পিণ্ড ও পূজা প্রদত্ত হইতে লাগিল। বৈদিক যুগের দেবতাদির আহ্বান ও পূজাও তিনি এই প্রেতপূজারই পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।" (বিঃ ৭৯০ পৃঃ)। 'শিবলিঙ্গ' ও 'শালগ্রাম' সম্বন্ধে তিনি (প্যারিসে কোনও এক সাহেবের প্রবন্ধের আলোচনায়) বলিয়াছেন—"বেদে, বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদসংহিতায় যূপস্তম্ভকে পরব্রহ্মের প্রতিকৃতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা হইতেই পরে শিবলিঙ্গের প্রচলন হয়।" এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেও পারিতেন—কিন্তু তাহা নয়, আবার বলিলেন—"পরে হয় তো বৌদ্ধদিগের আমলে এই শিবলিঙ্গপূজার পদ্ধতি আরও স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; কারণ ঐ সময়ে বৌদ্ধেরা যে সকল 'স্তূপ' নির্ম্মাণ করিত, তন্মধ্যে স্বয়ং বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কোন একটি স্মরণ-চিহ্ন রক্ষিত হইত এবং ঐ স্তূপকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। দরিদ্র বৌদ্ধেরা ধনাভাবে অতি ক্ষুদ্রস্তূপাকৃতি শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ করাতে কালে সম্ভবতঃ ঐ ক্ষুদ্রাবয়ব স্মারকস্তূপও পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে ও স্মারকস্তূপের প্রতি সম্মান স্তম্ভাকার শিবলিঙ্গপূজায় পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম 'ধাতুগর্ভ।' স্তূপ মধ্যস্থ শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। শালগ্রাম শিলা উক্ত অস্থি ভস্মাদি রক্ষণ শিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ পূজিত হইয়া কালে বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।" (বিঃ ৯৫৯-৬০)।*

* এইরূপ কথা কোনও সাহেবের মুখ হইতে বাহির হইলে বরং সহনীয়

স্বামীজি যখন প্রায় জীবনপ্রান্তে পৌঁছিয়াছেন, তখন একদিন তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন,—"খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একে ত এই dyspeptic (পেটরোগা) রোগীর দল—তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি দেখ্‌বি খোল করতালই বাজ্‌ছে। * * ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষি বাজনা শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হ'য়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? * * * যে সব musicএ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছু দিনের জন্য এখন বন্ধ রাখ্‌তে হবে।" ইত্যাদি। তবে কি করিতে হইবে, তিনি বলিতেছেন: "ঢাক ঢোল দেশে কি তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মিলে না—ঐ সব গুরু গম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। * * * ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুল্‌তে হবে "মহাবীর মহাবীর" ধ্বনিতে এবং হর হর বোম্ বোম্ শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত কর্ত্তে হবে। * * * বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণ সঞ্চার কর্ত্তে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আন্‌তে হবে।" ইত্যাদি (বিঃ ১০৪৯—৫০ পৃষ্ঠা)। "খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প করিলে" পেট রোগা হইতে পারে কি না—এ বিষয় ৺গিরিশ ঘোষকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়। চৈতন্যলীলায় বোধ হয় তিনি জগাই মাধাই দ্বারা বলাইয়াছেন, সারারাত্তি কীর্ত্তন করিয়া "ওরা ক্ষিদে বাগিয়ে নেয় আর দিস্তার দিস্তা লুচি সাবাড় করে।" বৈরাগী

হইত। একজন সন্ন্যাসিবেশধারী ধর্ম্মপ্রচারক প্রসিদ্ধ হিন্দুর পক্ষে এরূপ ব্যাখ্যা কিরূপ শোভন— সুধীভির্ব্বিভাব্যম্। (ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা এরূপ আরও দুএক স্থলে দেখা গিয়াছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।)

বর্ণনায় পণ্ডিত কবিও তো বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তন পতনে মল্লশরীরঃ।" আর তুরী ভেরীর আওয়াজে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদের—বিশেষতঃ শিশুদের পীলে চমকাইবে না কি? 'কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণে' দেশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়, আর ডমরু শিঙ্গা বাজাইয়া 'মহাবীর' (অর্থাৎ হনুমানজীর) ধ্বনি করিলে দেশটা খুব সাত্ত্বিক হইবে! (হনুমানের রাজসিক প্রকৃতি যে পাইবে—চপল স্বামীজিই ইহার প্রমাণ।) স্বামীজি চান দেশে কেবল একতাল—রুদ্র তালই বাজুক, আর বৈষ্ণব ভাব তিরোহিত হউক! এই কি শেষ 'সমন্বয়'!!

ফলকথা স্বামীজির ভাব স্বভাব সন্ন্যাসিত্বের বিরোধী—তিনি প্রকৃত যাহা ছিলেন—তাহা সন্ন্যাসীর সাজে আবৃত ছিল মাত্র—কিন্তু বাক্যে ও কার্য্যে তাহা সততই প্রকট হইত। সেই সম্বন্ধেই এখন আলোচনা করিব।

তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলিতেছেন—"তাঁহার চরিত্রে দুইটি অসমঞ্জস্য প্রকৃতি অতি সুসমঞ্জসরূপে পরস্পর বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিত—একটি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব, অপরটী আনন্দের শুদ্ধবিগ্রহরূপে জগৎ-রস আস্বাদনের ভাব।" (বিঃ ৯৭ পৃঃ) এটা সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বের কথা হইলেও, তাঁহার সমগ্র জীবনেই এই দুইটি ছিল—তবে জীবনচরিতকার যে ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেভাবে নয়। মুখে ও পোষাকে ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসিত্ব, কিন্তু আচার আচরণে পূর্ণ "জগদ্রসাস্বাদনের ভাব।" এই দুইটিতে 'সমন্বয়' (?) যদি হয়—তবে এভাবেই হইয়াছে। ত্যাগের মধ্যে এই মাত্রই দেখা যায় যে, তিনি বিবাহ করেন নাই—কিন্তু বিবাহ করিলেই যে সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট—ভোগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, এটাও বিবেচ্য।* সাংসারিক কর্ম্ম করিলে তিনি হয়তো একটা "দুষ্ট

---

* আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সুরসিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু সেদিন কোনও প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 'বিসর্জ্জন' শিরোণামে) লিখিয়াছেন "এদেশে সিজার এলেক্স জাণ্ডার নেপোলিয়ন বীর নহেন, এদেশে বীর বিবেকানন্দ

উকীল" (পত্রাবলী ১ম ভাগ—১৩ পৃষ্ঠা) হইতে পারিতেন, কিন্তু সন্ন্যাসী সাজায় যে ব্রাহ্মণ ও রাজরাজড়ার দ্বারা পদসেবা করান যায় * এটাও আদত কায়েতের ছেলে বিবেকানন্দ বিলক্ষণই বুঝিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী সাজিয়া বিবেকানন্দ ত্যাগ যে কতটা করিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখা যাউক। চা চুরুট মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ ত চলিতই— 'লঙ্কা' প্রিয়তার জন্য মধ্যে মধ্যে মিথ্যা ওজুহাতও দিতে হইত। এক স্থলে আছে—"লঙ্কামরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য স্বামীজির বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন—পর্য্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশে নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ নিবারণের জন্যই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকেন। আমিও সেই জন্য লঙ্কা খাই।" (বিঃ ২৯৬) আমেরিকায় অবশ্যই "নানাপ্রকার দূষিত জল পানের" আশঙ্কা ছিল না—সেখানের ওজুহাত শুনুন—"তিনি তরকারিতে এত ঝাল দিতেন যে, আর কেহ তাহা খাইতে পারিত না। তিনি নিজে ঝাল ভালবাসিতেন বলিয়া যে দিতেন শুধু তাহাই নহে,

---

স্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি। * * * ত্যাগই এদেশে বিজয়ী"। অমৃত বাবু, ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতিকে এভাবে (বিবেকানন্দের সঙ্গে—তাও আবার পরে—নাম গ্রহণ করিয়া) অবমাননা কেন করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। এ যে 'শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ'!

* এ স্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও কায়স্থ গৃহস্থ গিরীশ বাবুকে প্রণাম করিয়াছেন (বিঃ ৬৯০ পৃঃ) ও নাগ মহাশয়কে পত্রে 'অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ' জানাইয়াছেন (পত্রাবলী ১ম ভাগ ১০ পৃঃ) এবং সাক্ষাৎকালে প্রণাম (বিঃ ৯১৮ পৃঃ) করিয়াছেন। [এই নাগ মহাশয় সম্বন্ধে স্বামীজি বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু নাগমহাশয়ের মত মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।' (বিঃ ৯২৫ পৃঃ) অথচ পাওহারিবাবা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "রামকৃষ্ণ দেবের পরই পাওহারি বাবার স্থান।" (বিঃ ৮৫১ পৃঃ) তবে কি নাগ মহাশয় পরমহংস ও পাওহারি বাবা অপেক্ষাও বড় ছিলেন?]

অনেক সময়ে দেখিতেন ওদেশের জিহ্বার কতটা ঝাল মসলা সহ্য হইতে পারে। তিনি বলিতেন যে, ঐসব ঝাল মসলা তাঁহার লিভারের পক্ষে ভাল। বস্তুতঃ কিন্তু ঠিক্ তার বিপরীত। তবে তাঁহার মুখে ভাল লাগিত বলিয়া তিনি ঝাল দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না।" (বিঃ ৫৬৬ পৃঃ)। [তাঁহার জীবনচরিতলেখকও এখানে কি বলিতেছেন, দেখুন।] আর ঝাল খাইবার জন্য আগ্রহ কত, সুইজার-ল্যাণ্ডে লুসারণ হ্রদের ধারে তিনি একদিন খুব ঝাল লঙ্কা দেখিতে পাইলেন। পাশ্চাত্য দেশে গিয়া অবধি এরূপ লঙ্কা দেখেন নাই। তাঁহাকে কতকগুলি কাঁচা লঙ্কা চিবাইতে দেখিয়া বিক্রেতা অবাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু তিনি মহাপরিতৃপ্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার এর চেয়ে ঝাল লঙ্কা আছে?' (বিঃ)। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ১৭। ৯

স্বামীজির প্রকৃতি ইহা হইতেই ধরা পড়িতেছে—রজোগুণ তাঁহাতে প্রবল ছিল—তাই "গায়ের জোরের" কথা এত শুনিতে পাই। সংযম অভ্যাস সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। কিন্তু সামান্য 'ঝাল' বা 'লঙ্কা' খাইবার প্রকৃতিটা দমন করিতে পারিলেন না! মেথরের হাত হইতে কল্‌কে নিয়া তামাক খাবার গল্প শুনিয়া নাটককার গিরিশঘোষ বলিয়াছিলেন—"তুই গাঁজাখোর, তাই নেশার ঝোঁকে মেথরের কল্‌কে টেনেছিলি!" (বিঃ ১৮৭ পৃঃ) স্বামীজি অবশ্য অন্যরূপ জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় গিরিশ বাবুই ঠিক্ বলিয়াছিলেন। কেননা এডেনেও তিনি এক হিন্দুস্থানী পালওয়ানের কাছে গিয়া "ভেইয়া তোমারা ছিলুমঠো দো" বলিয়া কলিকা লইয়া মহাস্ফূর্ত্তিতে টানিয়াছিলেন * (বিঃ ৬২৫পৃঃ) চামারের প্রস্তুত রুটি খাইবার ওজুহাত দিয়াছিলেন—'সে সময়ে আমি

* জীবনচরিতকার অবশ্য ইহাতে 'অমায়িকতা' মাত্রই দেখিতে পাইয়াছেন—তাই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে অগ্নিস্পর্শ করি না।' (বিঃ ৩৪৯ পৃঃ) কিন্তু চুরুট—তামাক্ 'সে সময়' ছাড়িয়াছিলেন কি? তাহাতে তো অগ্নিস্পর্শ হইত! জুনাগড়ে তো "তিনি রন্ধনাদি কার্য্যে সুপটু ছিলেন—এবং অতি উত্তম রসগোল্লা প্রস্তুত করিতে পারিতেন।" (বিঃ ২৬৫ পৃঃ) এইরূপ তিনি মহীশূরে বলিয়াছিলেন—"রাজন্! আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি পরিব্রাজক অবস্থায় অর্থস্পর্শ বা কোনও দ্রব্য সঞ্চয় করিব না।" তবে কি আমেরিকা ইত্যাদিতে যাওয়ার কালে 'পরিব্রাজক অবস্থা'টা ঘুচিয়া গিয়াছিল? কেননা যাবার সময় তাঁহার নিকটে যে অর্থ কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইয়াছিল, সেটা পত্রাবলী হইতেই জানিতে পারা যায় (প্রথম ভাগ ৪ নং পত্র দ্রষ্টব্য)। আমেরিকায় তো বক্তৃতা দিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া বেলুড়মঠ নির্ম্মাণে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। (বিঃ ৮০৬ পৃঃ)।

বিলাসিতার ভাব তাঁহার জীবনে বহুশঃ দেখা গিয়াছে—অন্ততঃ একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এরূপটা অবাঞ্ছনীয়। যখন শ্রীযুত হরিপদ মিত্রের আবাসে (বেলগাঁওয়ে) গেলেন, সঙ্গীয় জিনিস মধ্যে একখানি মাত্র পুস্তক ছিল—সেখানি ফরাসী সঙ্গীতসম্বন্ধীয়। (বিঃ ২৯১ পৃঃ) ফরাসীদের সঙ্গীতে বৈরাগ্যের উদ্দীপক উপাদান আছে কিনা জানি না। নবেলের প্রেম কাহিনীতে যে বিলক্ষণ রুচি ছিল * তাহা তাঁহার কথা হইতেই জানিতে পারি—"তোমরা কি জানো যে, আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেমকাহিনী পর্য্যন্ত পড়তে পারি না" (বিঃ ৬২৫) এই উক্তি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময়ে—বোধ হয় ১৩০৪ সালে। তিনি "রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কষ্টে অতিশয় অস্থির হইয়া ইহার (নটুকৃষ্ণ নামক শিষ্যের) নিকটে একখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট প্রার্থনা

---

* তিনি এই লেখকের নিকটে ফ্রেঞ্চ নভেল পড়িবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ("আসামে বিবেকানন্দ" প্রবন্ধ [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ] দ্রষ্টব্য।) তখন জীবনের প্রায় শেষ ভাগ (১৩০৮ বৈশাখ)।

করায় ইনি (নটুকৃষ্ণ) বলিয়াছিলেন, "কি গুরুজি বিলাস ঢুকেছে নাকি ?" (বিঃ ৭৮৫ পৃষ্ঠা)। 'বিলাস' আমেরিকায় নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্র তার সময়েও দেখা গিয়াছে—তথায় প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেন। আমেরিকায় নাকি কানাডা ব্যতীত আর কুত্রাপি ফার্ষ্ট ক্লাস ছাড়া গাড়ী নাই। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সুতরাং আমাকে ফার্ষ্টক্লাসে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে * * আমি কিন্তু উহার পুলমান গাড়ীতে চড়িতে ভরসা করি না।" কারণ পত্রেই ছিল,—"এগাড়ীতে (ফার্ষ্ট ক্লাস) বড়ই আরাম * * * তুমি যেন হোটেলেই আছ, বোধ করিবে ; কিন্তু বেজায় খরচ।" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ২৫ পৃষ্ঠা।) ভ্রমণকালে রাজা রাজড়াদের অতিথি হইয়া "রাজকুমারদের সহিত অশ্বারোহণ বা অন্যান্য ক্রীড়ায় যোগ দিতেন।" (বিঃ ২৭৪ পৃঃ)। ইউরোপ আমেরিকায় স্ত্রীলোক-দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই মেলামেশা করিয়াছেন—ফান্সে অভিনেত্রী ও গায়িকার সঙ্গে কেবল ঘনিষ্ঠ পরিচয় নহে—পরন্তু গায়িকার সঙ্গে একত্র ভ্রমণও করিয়াছেন। (বিঃ ৯৭১ ও ৯৭৯ পৃষ্ঠা)। আমেরিকায় নাকি তাঁহাকে "সভ্যসমাজের রীত্যনুযায়ী কখনও কখনও নৃত্য করিতে হইয়াছিল; তিনি ওদেশের নাচের অনেক বোলও শিখিয়াছিলেন !" (বিঃ ৭৭ পৃঃ ফুটনোট্।) ধন্য বিবেকানন্দ! তুমি না গিরিশ ঘোষকে বলিয়াছিলে "ঠিক্ ঠিক্ সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করা মহাকঠিন, কথায় ও কাজে একচুল এদিক্ ওদিক্ হবার যো নাই।" (বিঃ ১৮৭ পৃঃ) আর তোমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস তো ভূয়োভূয়ঃ স্ত্রীলোকের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। "সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখিবে না। * * * সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয় হইলেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিবে না—ভক্ত স্ত্রীলোক হইলেও বেশীক্ষণ আলাপ করিবে না।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগ—৯৯ পৃঃ। *

* আমেরিকায় বিবেকানন্দসম্বন্ধে একটা কুৎসিত অভিযোগ উঠিয়াছিল যে,

ফলতঃ বিবেকানন্দের সন্ন্যাসধর্ম্ম একটা বাহ্য আবরণ মাত্র। সন্ন্যাসী শোক দুঃখে অবিচলিত—স্তুতিনিন্দায় নির্ব্বিকার হইবেন। এদিকে ফচ্‌কে হওয়াও অনুচিত। কাশ্মীরে ভ্রমণের সময় একজন তাঁহার ফষ্টি নষ্টি বা চাপল্য দেখিয়া আপত্তি করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"আমরা জ্যোতির সন্তান, আনন্দের তনয় আমরা কেন মুখ অন্ধকার করে থাকবো' (বিঃ ৮৭০-৭১ পৃঃ) অর্থাৎ চাপল্যেই কেবল উজ্জ্বলমুখ হয়। প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগকারী মহাত্মগণের বদনে যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি ফুটিয়া উঠে—তাহাই লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ফষ্টি-নষ্টিতে চিত্তবিক্ষেপই সূচিত হয়। এদিকে বলরাম বাবুর মৃত্যু সংবাদে যখন স্বামীজি রোদন করিতেছিলেন—তখন এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন—"আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোকপ্রকাশ অনুচিত।" তখন এই তার্কিকচূড়ামণি বলিয়া উঠিলেন—"বলেন কি, সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হৃদয়টা বিসর্জ্জন দিব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত। * * * * * * যে সন্ন্যাসে হৃদয়কে পাষাণ কর্ত্তে উপদেশ দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।" (বিঃ ২০৩-৪ পৃঃ) 'গ্রাহ্য' যে করেন নাই—ইহাই ঠিক! এদিকে বেলুড়মঠ স্থাপিত হইলে "নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচারব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন। * "চলতি নৌকায় আরোহিগণ বেলুড়মঠ

তিনি কোনও গৃহস্থের এক পরিচারিকার সঙ্গে 'অসংযত আচরণ' করেন, (বিঃ ৫৬৯ পৃঃ) কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলা মেশা হইতেই এই অপবাদ উদ্ভূত হইতে পারিয়াছিল। "মৃষা বা সত্যং বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।"

* না-ই বা করিবেন কেন? "মঠে পাঁউরুটি প্রস্তুতের জন্য স্বামীজি বিবিধ প্রকারের খামির লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃ

দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতে * * * কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু স্বামীজি বলিতেন—

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকায়ে হাজার।
সাধুন্‌কো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার।" ইত্যাদি।
(বিঃ ১৬৮ পৃষ্ঠা)

বেশ কথা। কিন্তু কাজে কি হইল? মঠে প্রতিমা আনিয়া যথাবিধি দুর্গোৎসব করা হইল—"বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়ার পরিচিত, অপরিচিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল; * * তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ববিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া ধারণা জন্মে যে, মঠের সন্ন্যাসীরা হিন্দু সন্ন্যাসী।" (১০৪১-৪২ পৃঃ) 'অভীঃ' মন্ত্রের প্রচারক অবশেষে লোকবাদের নিকট মাথা নুয়াইলেন! *

এখন এই আলোচনার উপসংহার করিতে হইবে। যে জীবনচরিত-খানি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে—তাহাতে অত্যুক্তিবাদ বহু আছে—এবং জীবনচরিতে এরূপ থাকে। তবে এ সকলের অনেকগুলিই প্রতিবাদযোগ্য; কিন্তু প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি ভয়ে কেবল একটিমাত্র (নমুনা স্বরূপ) দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। স্বামীজি আল্‌মোড়ায় হিন্দী ভাষায় একটী বক্তৃতা দেন; তদুপলক্ষে চরিতকার বলেন, "হিন্দী ভাষাও সুললিত বক্তৃতা-প্রদানোপযোগী বলিয়া পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না।" ইত্যাদি (বিঃ ৭২৬ পৃষ্ঠা)। আর

পুনঃ অকৃতকার্য্য হইলেও চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই। (বিঃ ১০৫০ পৃঃ) নামে মঠ, কিন্তু 'পাউরুটি' প্রভৃতি খাওয়া চাই!

* তিনি একদা সিষ্টার নিবেদিতার দ্বারা এক ছিলিম তামাক সাজাইয়াছিলেন—কেন না কোনও কোনও লোকের ধারণা ছিল, "তিনি নাকি শ্বেতকায়দিগের স্তুতি ও ছন্দানুবর্ত্তন দ্বারা তাহাদিগকে আপন শিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" (বিঃ ৯২৬ পৃঃ) দেখুন, 'সাধুন্ কো দুর্ভাব নেহি' কত দূর!

কাহারও কথা আমি বলিতে পারিব না,—কিন্তু ইহা নিশ্চিতভাবেই অবগত আছি যে, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গালী হইয়াও হিন্দী ভাষায় অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার ঐ ভাষায় উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

বিবেকানন্দ শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই—এবং তাঁহার বাগ্মিতাও অসাধারণ ছিল। বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং তর্কশক্তি খুব প্রখর ছিল। ইংরাজীতে তাঁহার অসামান্য দখল ছিল,—সংস্কৃতেও তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। নানা বিষয়েই তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন—বিশেষতঃ ইউরোপীয় ও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। এরূপ ব্যক্তি কালাপানি পার হইয়া তাঁহার পূর্ব্বে ইউরোপে ও আমেরিকায় অতি কমই গিয়াছেন। অতএব ঐ সকল দেশে তাঁহার নাম যশঃ হওয়া প্রত্যাশিত বিষয়ই ছিল। তিনিও তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ঐ সকল দেশে সীমাবদ্ধ রাখিলে, আমার বোধ হয়, জগতের সমধিক উপকারই হইত। কিন্তু ভারতবর্ষ ইউরোপ বা আমেরিকা নহে যে, এখানে তিনি যাদৃচ্ছিক-ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন—আর লোকে তাহা 'নূতন একটা কিছু' বলিয়া গ্রহণ করিবে। এদেশে 'বেদান্তের' বাণী অনেকশঃ নানাভাবে শ্রুত হইয়াছে। এখানে তিনি যাহা প্রচার করিবার জন্যতঃ অধিকারী ছিলেন এবং রজোগুণাধিক্য যাতে দরকার—তাহা ছিল 'রাজনীতি'; এবং তিনি স্বয়ং যাহাই বলুন না কেন * তাঁহার দ্বারা পাকে প্রকারে 'রাজনীতির' ভাবই প্রচারিত হইয়াছে। প্রবন্ধে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই বোঝা যাইবে—তিনি (এদেশে অন্ততঃ) ধর্ম্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণের অনধিকারী ছিলেন।

---

* কাপুরুষতা কি রাজনৈতিক বাঁদরামির সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি রাজনীতি মোটেই বিশ্বাস করি না।" ইত্যাদি (শিষ্যদের নিকট লিখিত পত্র)—বিঃ ৫২৫ পৃঃ।

তবে আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ স্কুল কলেজের ছেলেরা কোনও রূপ ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা পায় না—তাই ধর্ম্মের নামে যাহাই খুব চোটপাটের সহিত শুনে বা পড়ে, তাহাই অবিচারিতভাবে গ্রহণ করে—বিশেষতঃ ইউরোপ আমেরিকা দিগ্বিজয় করিয়া দু'একজন সাহেব বিবি শিষ্য করিয়া বিবেকানন্দ তাহাদের তরুণ হৃদয়ে তৎপ্রতি একটা প্রশংসানুরাগের ছাপ মারিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অপিচ তরুণবয়স্কদের ভাবপ্রবণ চিত্তে বিচারক্ষমতা স্বল্প থাকায়— তাঁহার সমগ্র লেখা ও বক্তৃতায় যে পরস্পর বিরোধী নানা বিষয় আছে, তাহা উহারা ধরিতে পারে না—শিক্ষার অভাবে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না থাকায় তাঁহার উক্তির অশাস্ত্রীয়তাও বুঝিতে পারে না। এই নিমিত্তে বিবেকানন্দভক্ত অনেক বালক এবং বালকোপম যুবক ও প্রৌঢ় দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সময়েও এইরূপই ঘটিয়াছিল। সেই স্রোতঃ যেমন ফিরিয়াছে, আশা করি ভগবদিচ্ছায় এই বিবেকানন্দী মোহও ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে। এই আশয়েই বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশে অধ্যবসায়ী হইয়াছি।

বিবেকানন্দ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বহুশঃ গালি দিয়াছেন—আমরা যদি আবেগবশতঃ তাঁহার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কটু বলিয়া থাকি, আশা করি তাহা ক্ষমার যোগ্য হইবে।

প্রথম পরিশিষ্ট।

"রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি"—

প্রবন্ধের প্রতিবাদের উত্তর।

বিগত ১৩২১ সালের পৌষ-মাঘ যুগ্মসংখ্যক "সাহিত্য" পত্রে "৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহাতে রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে পূজ্যপাদ তর্কচূড়ামণি মহোদয়ের একখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল— তন্মধ্যে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অবস্থা কতদূর কি ছিল, এই বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয় কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের অনেক ভক্ত ঐ সব কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেহ মৌখিক আলাপে, কেহ চিঠি দিয়া এবং অপরে (স্বনামে এবং বে-নামেও) প্রবন্ধ লিখিয়া স্বকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও ইঁহাদের উক্তির অধিকাংশই গালাগালি ও বাজে কথায় পরিপূর্ণ, তথাপি যে সকল কথাতে কিঞ্চিৎ যুক্তির আভাস আছে—বিশেষতঃ রাঁচির শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে (সাহিত্য আষাঢ় ১৩২৮) যে সকল শাস্ত্রীয় কথার অবতারণা রহিয়াছে, সেইগুলির প্রতি আমি শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করি। অপিচ, চূড়ামণি মহাশয়ের শিষ্য ৺ ভূধর চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত "বেদব্যাসে" পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল—

---

* ইহাই এই গ্রন্থের "প্রথম পরিচ্ছেদ"।

সেগুলি পশ্চাৎ সংগ্রহ করিয়া * পাঠ করাতে দেখিলাম, তন্মধ্যে উল্লেখিত কতকগুলি কথা চূড়ামণি মহাশয়ের পত্রে প্রকাশিত অভিমতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। আমি ঐ সকল কথার প্রতিও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করি, কেননা তথ্য প্রকাশই আমার অভিপ্রায়। উত্তরে চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট হইতে যে চিঠিখানি পাইয়াছি, তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

৺সদাশিবঃ শরণং।

পরম স্নেহাস্পদ!

আপনার ৩০শে শ্রাবণের পত্রখানা যথা সময়ে আসিয়াছিল, কিন্তু তখন আমার দৌহিত্রটী টাইফয়েড জ্বরে পীড়িত থাকায় অত্যন্ত বিব্রত ছিলাম, আবার সে একটু সুস্থ হইলে নিজেও অসুস্থ হইয়াছিলাম। এজন্য আপনার পত্রখানির উত্তর দিতে অসমর্থ ছিলাম। সম্প্রতি ৺ কৃপায় সে সব ঝঞ্ঝাট্ সারিয়াছে, তাই অদ্য উত্তর দিতেছি।

লোকের তিরস্কার ও পুরস্কারের কথা আর কি লিখিব। সে যাহার যেমন ইচ্ছা হয় করুক, তাহা তাহার মুখ আর হৃদয়েই থাকিবে, তদ্দ্বারা আমার বা আপনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মহাত্মা ৺ রামকৃষ্ণ বিষয়ে আমার যেরূপ ধারণা, তাহাই বিদিত করিয়াছি। তাঁহার মহিমার লাঘব করিবার মানসে কিছুই লিখি নাই; সুতরাং আমার ধারণার মূলে কোন অংশে ভ্রম থাকিলেও আমি পাপী নহি।

৺ ভূধর চট্টোপাধ্যায় আমার দীক্ষিত শিষ্য, ছাত্র নহে। ভূধর আমার বা অন্য কোন অধ্যাপকের নিকট কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন না। যথাসম্ভব অনুবাদাদি পাঠেই সাধারণ ভাবে ভূধরের কিছু জ্ঞান ছিল। অতএব নির্ব্বিকল্পসমাধি, সবিকল্পসমাধি ভূধরেরও

* পূর্ব্ব প্রবন্ধে [অর্থাৎ এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে] আমি যে এগুলির উল্লেখ করিয়াছিলাম—তাহা প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে "বেদব্যাস" পাঠের স্মৃতি মাত্র।

বিদিত ছিল না। যেটুকু বিদিত ছিল, তদনুসারেও রামকৃষ্ণ নির্ব্বিকল্প-সমাধির উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং দিবসত্রয়ে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, একথা লিখিত হয় নাই। ৺রামকৃষ্ণের প্রথম অবস্থায় হৃদয়ের শৈশবকাল ছিল। সুতরাং সে স্বয়ং তাঁহার সে অবস্থায় কিছু দেখে নাই। তাঁহার নিজের মুখেও সে একথা শুনে নাই। অন্য লোকের মুখেই শুনিয়া লিখিয়াছে। সাধারণ লোকেরা কতজনেই কত কিছু কথা বলে, সে সকল কথার যথেষ্ট মূল্য দিলে সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, তবে তিনি তোতাপুরীর নিকট দীক্ষিত বা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এ কথাটা মিথ্যার গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করা অসঙ্গত। তদানীন্তন অনেক লোকেই একথা বিদিত ছিলেন। তাঁহাকে তান্ত্রিক-ভাবের সন্ন্যাস দেওয়াও সত্য হওয়ারই সম্ভব, এবং সেইজন্যই তিনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে অবধূত সন্ন্যাসী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহার চিতারোহণাদি অনুষ্ঠান এবং আমার পূর্ব্বলিখিত তাঁহার অন্যান্য আচরণ সেই বিষয়েরই প্রমাণ করে। তদনুসারে তাঁহার গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি উপাধি হইতে পারে অথবা হইয়াইছিল। 'পরমহংস' সেরূপ কোন উপাধি নহে, উহা সর্ব্বত্যাগী শেষাশ্রমীর সংজ্ঞা। ৺রামকৃষ্ণের সেরূপ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কাজেই তাঁহাকে পরমহংস বলা ঠিক্ নহে। তবে দশজনে যখন পরমহংস বলে, আমিও তাহার অনুকরণে পরমহংস বলিতাম, কিন্তু হৃদয়ে তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না। অবধূত আর পরমহংস কথার অর্থ শাস্ত্রানুসারে প্রায় এক হইলেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গিরি, পুরী, ভারতী আর বন, পর্ব্বত, সাগর, এই ছয়দলের তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণের অবধূত সংজ্ঞার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী পুরীর শিষ্য, সুতরাং তিনি শঙ্করাচার্য্যের মতে অবধূত, ইহা আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু অবধূত গীতার প্রকৃত অবধূত নহেন। তৎকালের "বেদব্যাস" পত্র বা

"সাধুদর্শন" আমার নিকট নাই বা পাইবার উপায় নাই; সুতরাং তাহা আমার দেখা অসম্ভব। রামকৃষ্ণের ভক্তিগদ্গদ অপূর্ব্বভাব দেখিয়া আমি আনন্দিত হইতাম, ইহা এখনও বলিতেছি এবং উহা যে অসাধারণ, তাহাও সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নির্ব্বিকল্পসমাধি হইত, ইহা আমি কখনও বলি নাই, ইহা নিশ্চয়।

"বেদব্যাসে" আমার যে সকল কথা প্রকাশিত হইত, তাহাই আমি দেখিতাম। ভূধর বা অন্যের লেখা দেখি নাই বা অনুসন্ধানও করি নাই।* আমি বেদব্যাসের সম্পাদক ছিলাম না।

শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরুর নিকট দুই চারিটী কথা শুনিয়া অধ্যাত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়া দুই তিন দিনের মধ্যে নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা যদি ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইত, অথবা জ্ঞান হইতে পৃথগ্ভূত ভক্তিনামক কোন কিছুর দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করা নিরর্থক বা উন্মত্তের অনুষ্ঠান মধ্যে বিসর্জ্জন করিতে হয়। আর উপনিষদ্ অধ্যয়ন এবং মননশাস্ত্র শিক্ষার পর যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া যে গুরুর নিকট যোগ শিক্ষা করার উপদেশ শাস্ত্রের অসংখ্য স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহাও প্রলাপ মধ্যেই পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ভাগবতোক্ত ভক্তিও কেবল সত্বশুদ্ধিরই কারণ এবং সত্বশুদ্ধি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানই প্রকৃত মুক্তির কারণ, ইহা ভাগবতেই (২য়ঃ প্রথম স্কঃ) লিখিত আছে। এজন্য ভাগবতও অধ্যাত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার কথায় পরিপূর্ণ, সুতরাং ভাগবতের মতেও জ্ঞান ত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি জীবকে কৃতার্থ করিতে পারেন না। অনধীতশাস্ত্র কোন লোক যে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, এপর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টান্তও নাই। সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করা

* বেদব্যাস ৩য় বর্ষ ১ম অধ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (২য় পৃষ্ঠায়) ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায়ও এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন।

মাত্রেই যে অধ্যাত্মরাজ্যের অসংখ্য পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, শাস্ত্রা-ধ্যয়নের দ্বারা তাহাদের পরিচয় না থাকিলে, সে কোন্‌টি ধরিবে, কোন্‌টি না ধরিবে, সে ঈশ্বরতত্ত্বের দিকে গেল, কি অন্য তত্ত্বের দিকে সরিয়া পড়িল, এবং তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হইতেছে, উহা কোন্ লক্ষণের অন্তর্গত, কিংবা উহা সত্য বা ভ্রমদর্শন, ইহা কি প্রকারে বুঝিবে ? তবে যদি গুরু তৎসমস্তই শিষ্যকে মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে সাধক যথানিয়মে উঠিতে পারে, ইহা সত্য ; কিন্তু সেরূপ শিক্ষাতো অধ্যয়নের নামান্তর। তাহা ২।১ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, আর নিরক্ষর লোকের অত কথা মনে রাখাও সম্ভবপর নহে ; কাজেই শাস্ত্র অধ্যয়ন আবশ্যক। আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন যে, আজকাল এমন গুরুর অসদ্ভাব নাই, যিনি ৫৲ টী টাকা দক্ষিণা পাইলেই অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে ভ্রূর উর্দ্ধভাগে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ব্রহ্ম দর্শন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রহ্মদর্শনে কোনরূপ অধ্যয়নেরই প্রয়োজন নাই। উহা অন্ধগণেরই ব্রহ্ম এবং তাহাদেরই সন্তোষাবহ। ঐ শ্রেণীর গুরু এবং ঐ শ্রেণীর শিষ্যগণই শাস্ত্রাধ্যয়ন বা জ্ঞানের অত্যন্ত বিরোধী এবং তাহারাই আত্মসম্মান বা আত্মতুষ্টি রক্ষার জন্য শাস্ত্রীয় অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাদির অকিঞ্চিৎকরতা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিয়া থাকে। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, রীতিমত শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত জীবের ব্রহ্মরাজ্যে বা অধ্যাত্মরাজ্যে আরোহণ করা গগনকুসুমের ন্যায় অসম্ভবপর।

আমি একথা কখনও ভাবি নাই যে, যথারীতি যোগানুষ্ঠানাদি না করিয়া বিবেকবৈরাগ্যাদিশূন্য লোকের কেবল অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই কৃতার্থতা হয় ; কিন্তু শুভাদৃষ্ট থাকিলে শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বীজসমাধি হইয়া কৃতার্থতা হইতে পারে, অজ্ঞের পক্ষে তাহা অসম্ভবপর, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

কি অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ, কি শাস্ত্রীয় বিদ্যা, ইহার কোন বিষয়েই আমি আমাকে, ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা উচ্চলোক বলিয়া এখনও মনে করি না। বরং বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞতা এবং নীচতাদিরই অনুভব করিতেছি। কিন্তু এতদিন পর্যান্ত শাস্ত্রারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানদেবতার কৃপার নিমিত্ত নানাদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছি, একথা সত্য এবং যাঁহারা তাহা করেন নাই, তাঁহাদের তুলনায় এ অংশে আমি একটু অগ্রসর। আর তাঁহারা সেই অরণ্য হইতে দূরে অবস্থিত। এরূপ ধারণা যদি দাম্ভিকতা, আত্মশ্লাঘা বা অহঙ্কারের নামান্তর হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি এ অংশে অপরাধী। কিন্তু শাস্ত্র এ ধারণাকে তাহা বলে না। শাস্ত্রমতে ইহা স্বরূপ জ্ঞানমাত্র। যে ভাবটি অন্যের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া নিজকে স্ফীত করিয়া তোলে, তাহাই অহঙ্কার বা দম্ভাদির অন্তর্গত। অতএব, "আমি ২৫ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছি, আর ৺রামকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, ইহা তাঁহার বিদিত ছিল", এইরূপ বলা শাস্ত্রের মতে দাম্ভিকতাদিমূলক নহে। অধিক আর কি লিখিব। ইতি

ভবদীয়

শ্রীশশধর শর্ম্মা। *

এই চিঠি পাইয়া শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে আমি দুএকটি কথা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ পূর্ব্বজন্মের প্রভূত সুকৃতি থাকিলে পরজন্মে সাধক স্বল্পকাল মধ্যেই অভীষ্টলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন—যেমন ধ্রুব প্রহ্লাদ শুকদেব প্রভৃতি হইয়াছিলেন; ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসও হয়তো সেইরূপ কারণেই অত্যল্প সময়ের সাধনায়ই নির্বিকল্পসমাধি লাভ করিয়াছিলেন; ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? অপিচ তদীয় পত্রের শেষাংশে চূড়ামণি মহাশয়

* চিঠিখানিতে তারিখ নাই; ইহা ২রা আশ্বিন (১৩২৮) আমার হস্তগত হইয়াছিল।

লিখিয়াছেন, "বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞতা এবং নীচতাদির অনুভব করিতেছি;" ইহা তাঁহার বিনয়াতিশয় মনে করিয়া, পত্রখানি প্রকাশ করিবার সময়ে, ঐ বাক্যটি ছাড়িয়া দিতে অথবা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিতে তাঁহার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এ সকলের উত্তরে চূড়ামণি মহাশয় আর একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন, যাও এস্থলে প্রকাশ করা গেল। *

৺সদাশিবঃ শরণং

বহরমপুর ২৪।৭।২৮

পরম স্নেহাস্পদ!

আপনার পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। নানা ঝঞ্ঝাটবশতঃ এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি এই পত্রে যে সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার যাহা বিবেচনা তাহা জানাইতেছি।

অবধূত রামকৃষ্ণের নির্ব্বিকল্পসমাধি হইত কি না, তাহার সমর্থন ও অসমর্থন এই উভয় পক্ষেরই প্রমাণ সুদৃঢ় নহে; তবে যতটা দেখা গিয়াছে, তদ্দ্বারা যাহা বিবেচনা হয়, তাহাই বলিয়াছি এবং এখনও তাহাই বলিতেছি। তবে যদি আমার বুঝিতে ভ্রম হইয়া থাকে আর সত্য সত্যই তিনি নির্ব্বিকল্পসমাধি ও নির্ব্বীজ সমাধি লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাহা পরমানন্দের বিষয়। তিনি শুক নারদাদির মত মুক্তপুরুষ হইলে বা তাঁহার অনন্ত যশঃকীর্ত্তি ও মহিমা প্রকাশ হইলে আমার পৈত্রিক বা নিজ সম্পত্তির কোন হানি হয় না, সুতরাং সে বিষয়ে আমার দুঃখিত হওয়া বা তাহার অপলাপের জন্য আমার চেষ্টার কোন কারণ নাই। সমাজে যত বড় লোক হয়, ততই সমাজ ও দেশের উন্নতি, ইহা আমি সম্যক্ বিদিত আছি। কিন্তু তাই বলিয়া নিজের

* যাঁহার দ্বারা এ চিঠি লিখান, তিনি বহু বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি করাতে সংশোধনপূর্ব্বক ইহা প্রকাশিত হইল।

জ্ঞানবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নহি। ৺ রামকৃষ্ণকে আমি কিরূপ জানিতাম, তাঁহার সহিত আমার কিরূপ কথাবার্ত্তা হইত—ইহাই আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়। সুতরাং আমি যাহা জানিতাম, তাহা বলিয়াছি। ইহাতে যদি তাঁহার অনুগত লোকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎর্সনা করেন, তবে করুন, আমি সেই ভয়ে সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। এজন্য এবারও আমার বিশ্বাস অনুরূপ লেখাই লিখিতেছি।

নির্ব্বিকল্পসমাধিতে অধ্যাত্মতত্ত্ব আর ব্রহ্মতত্ত্বের অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু এই উভয় বিষয়েরই কোন কথা তাঁহার নিকট শুনিতে পাই নাই। তাঁহার কথা বলিয়া যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও উক্ত বিষয়ের কোন কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি লেখা পড়া জানিতেন না বলিয়া সে বিষয়ে উপনিষদাদি কোন গ্রন্থ তিনি পড়িতে পারেন নাই, তবে যদি কাহারও উপদেশে ২।১ দিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগানুশাসন আয়ত্ত করিয়া সমাধির অসংখ্য স্তর কাটাইয়া নির্ব্বিকল্পসমাধিক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়া কেহ সন্তুষ্ট হন, তবে সে বিষয়ে আমি কি বলিব? তাঁহাদিগকে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, ব্রহ্মবিদ্যাদি ও সমাধিব্যাপারের অবস্থা ভাবিয়া দেখিতে বোধ হয় তাঁহারা সুযোগ পান নাই, সেইজন্য ঐরূপ বলিতে সাহস করিতে পারেন। ধ্রুব বহুদিন পর্য্যন্ত অনশন ব্রতাদি করিয়া, বহুদিন পর্য্যন্ত আরাধনা দ্বারায় ভগবৎকৃপাভাজন হইয়া গিয়াছিলেন, তদ্দ্বারায় মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গবিশেষে (ধ্রুবলোকে) গমন করিয়াছিলেন, ইহা ভাগবতেই লিখিত আছে। কিন্তু মুক্তির তুলনায় সে স্বর্গ নরকবিশেষ। প্রহ্লাদও যাবজ্জীবন আরাধনা দ্বারায় স্বর্গবিশেষেই গমন করিয়াছিলেন, ইহাও লিখিত আছে। শুকদেবও জন্মাবধি বহু বৎসর পর্য্যন্ত পিতার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা ও যোগাভ্যাসাদি করিয়া-

ছিলেন, এবিষয় শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে। তাহাতে তাঁহার বশীকার বৈরাগ্য হইবার কথাও পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির কথা লিখিত নাই। অতএব পূর্ব্বজন্মের শুভানুষ্ঠান থাকিলেও ২।১ দিন মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা, যোগবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিয়া মানুষ নির্ব্বিকল্পসমাধি-ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ধ্রুব বা প্রহ্লাদ নহেন, শুকদেবও নহেন। ধ্রুব প্রহ্লাদের যদি সমাধি হইয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরবিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাই ঘটনা দ্বারায় প্রতিপন্ন হয়।

যিনি নির্ব্বিকল্প-সমাধিভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ, তিনি ব্যুত্থানের অবস্থায়ও শারীরিক ও মানসিক পীড়ার দ্বারা পরিবাধিত হন না এবং বাধাবোধ হইলেও তৎক্ষণাৎ সমাধির আশ্রয়ে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত গলরোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। অতএব তাঁহার নির্ব্বিকল্প-সমাধি হইত, ইহা আমি বলিতে পারি না।

আমি যে ক্রমেই আমার অজ্ঞতা ও নীচতা অনুভব করিতেছি, ইহা লিখিয়াছি, তাহা বিনয় বা ভদ্রতাপ্রকাশের জন্য নহে। উহা আমার বিশ্বাসমতেই লিখিয়াছি। বিদ্যা, মহাবিদ্যা জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি জগদম্বারই নামান্তর। সত্য, অনন্তও তাঁহারই নাম। সুতরাং বিদ্যা বা জ্ঞান অসীম ও অনন্ত। যে কোন দিক দিয়া যদি বিদ্যাদেবীর অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে মানুষ প্রাণের ব্যাকুলতায় কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, সেজন্য গর্ব্বিতও হইতে পারে, কিন্তু তাহার পর, যখন অকূল সমুদ্র দেখিতে পায়, তখন সর্ব্ব গর্ব্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে। তখন বিদ্যাদেবীই যে অনন্ত ব্রহ্মের রূপান্তর, এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হয়, সেই সময়ে নিজের অজ্ঞতা না বুঝিতে পারে এমন মানুষ বোধ হয় নাই; কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সেই পারকূলশূন্য সমুদ্র হইলেও তাহার দিকে অগ্রসর হইতে নিশ্চেষ্ট হয় না।

ইহা মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। আমি এখন সেই দশা ভোগ করিতেছি। জগন্মাতা মহাবিদ্যার অন্বেষণের জন্য এক এক দিক্ দিয়া কতকটা কতকটা অগ্রসর হইয়া যতদিন তাঁহার প্রকৃত সংবাদ কিছুই জানিতাম না, ততদিন তাঁহার চরণসংস্পৃষ্ট এক একটু বায়ুমাত্র দূর হইতে স্পর্শ করিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম বলিয়া বৃথা আনন্দানুভব করিতাম। এখন কতকপরিমাণে হিজিবিজি, কাঁটা জঙ্গল ছাড়াইয়া একটু আলোকের ভাব পাইয়া বিদ্যামূর্ত্তির অসীমতার একটু আভাস বুঝিতে পারিয়া, সেই মিথ্যা দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছি, আর নিজের অজ্ঞতা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি এবং প্রাণের ব্যাকুলতা বশতঃ সেই অকূল সমুদ্র লক্ষ্য করিয়াই প্রাণের সর্ব্বশক্তি সমর্পণ করিয়া আর একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বিদ্যামূর্ত্তির কোন অংশই পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং আমি অজ্ঞ, ইহা সত্য।

আমি নীচও বটে। যতদিন দৈহিক অবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খাইতাম, ইহার বাহিরে নিজের জীবাত্মার মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিতাম না, ততদিন আত্মবিষয়ে নিদ্রিতবৎ তমসাচ্ছন্ন ছিলাম। সুতরাং আমি ভাল কি মন্দ, সুস্থ কি অসুস্থ, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখন বহুকষ্টে প্রাণপণ চেষ্টায় আবর্ত্ত বা কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করিয়া অনেক সময় নিজের জীবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। দৈবিক প্রবৃত্তি বা আসুরিক প্রবৃত্তি কি তাহার কিছু পরিচয় আছে, সুতরাং এখন দেখিতে পাই, আমার নিজের জীবশরীর অসংখ্য আসুর বা অপবিত্র প্রবৃত্তির ব্রণগুলি পচিয়া অতি দুর্গন্ধান্বিত ও অসহ্য যন্ত্রণাপ্রদ হইয়াছে। সুতরাং আমাকে আমি অতি নীচ ও অতি দুঃখী ব্যতীত কি বুঝিব?

সত্য কথাই আপনার নিকট লিখিয়াছি। ৺ নিকট প্রার্থনা করুন যেন আমি এই জন্মেই এই ব্যাধিগুলির যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইতে পারি। আমি স্বয়ং লিখিতে ও পড়িতে পারি না, ইহা বিদিত আছেন। অন্ত-

দ্বারায় লিখিতে ও পড়িতে হয়; সুতরাং অধিক আর লিখিতে পারিলাম না। এখানে দৈহিক একরূপ কুশল। আপনার কুশলাদি লিখিয়া সন্তোষিবেন, ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

পূজ্যপাদ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এই পত্রখানি পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। গ্রীক দার্শনিকপ্রবর সক্রেটিস্‌কে যখন ডেল্‌ফির দৈববাণী "জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন "দেববাক্য অব্যর্থ, সন্দেহ নাই; তবে আমি একটা কথা জানি যে আমি কিছুই জানি না, অন্যেরা হয়তো ঐটা জানেন না।" ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিউটন মৃত্যুর প্রাক্‌কালে বলিয়াছিলেন "জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমিতে দু একটা উপলখণ্ড মাত্র সংগৃহীত করিতে পারিয়াছি—অসীম অনন্ত রত্নাকর পুরোভাগে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।" শ্রুতি বলিয়াছেন—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌॥

—তাই বিগত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ যিনি শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন—যাঁহার সাধনপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থ অনেকের ধর্ম্মসাধনের সহায় হইয়াছে, সেই ষড়্‌দর্শনবেত্তা বিদ্বচ্চূড়ামণি শাস্ত্রাচারপূত বর্ষীয়ান্‌ ব্রাহ্মণ স্বকীয় আধ্যাত্মিকী অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই শ্রদ্ধার বিষয়—তাহাতেই তাঁহার নিষ্কপট সত্যসন্ধতা প্রমাণিত হইতেছে—প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক তদুপরি কটূক্তি বর্ষণ ব্যর্থ হইতেছে।

চূড়ামণি মহাশয়ের চাপ্‌রাশ সম্বন্ধীয় কথার অস্বীকার মিথ্যা বলিতে গিয়া বাবু সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন, "তবে আশঙ্কা হয় ঐ প্রশ্ন (চাপ্‌রাশ আছে কি না) স্বকর্ণে শুনিয়াছেন পরমহংসের শিষ্যগণ ব্যতীত এমন ব্যক্তি এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও জীবিত

আছেন, এ সংবাদ শুনিয়া চূড়ামণি মহাশয় লজ্জিত হইবেন।" * সত্যেন্দ্র বাবু যদি যথার্থ সরল প্রকৃতির ভদ্রলোক হইতেন, তবে সেই জীবিত ব্যক্তিটির নাম ধাম প্রকাশপূর্ব্বক সত্যানুসন্ধানের উপায় করিয়া দিতেন—তা না করিয়া কটূক্তি বর্ষণপূর্ব্বক নিজেরই পরিচয় মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মায়ের ছেলে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস বালকের ন্যায় সরল ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বে-আদব ছিলেন না ইহা নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ যে বাড়ীতে তিনি চূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গিয়াছিলেন, সেই বাড়ীর বাসিন্দা ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় ঐ দিনকার ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে সুধীবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল যে ঐ প্রশ্ন হয় নাই, এমন নহে—তাদৃশ প্রশ্নের কোনও অবকাশই ছিল না। "বেদব্যাস" ২য় খণ্ড (১২৯৪) ১০ম সংখ্যা হইতে ৺ভূধর বাবুর প্রবন্ধের ঐ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"একদিবস আচার্য্যদেব [অর্থাৎ তর্কচূড়ামণি মহাশয়] তাঁহার কলিকাতার আবাসভবনে বহুতর ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্য্যদেব ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে কখন দেখেন নাই, অন্য কোনওরূপ পরিচয়ও ছিল না। তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবা মাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করাইতে যাইবেন, অমনি দেখেন, পরমহংসদেব অচৈতন্য—একেবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্য দেবের দুই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি যেন ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া অনিমেষলোচনে

* সাহিত্য—১৩২৮। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠা।

পরমহংসের সেই সমাধিপরিমার্জ্জিত প্রফুল্ল মুখকমলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এ অবস্থায় অতীত হইল। গৃহ নিস্তব্ধ, কাহারও বাঙনিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া জ্ঞানী ও ভক্তের অদ্ভুত মিলনের অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। ক্রমে পরমহংসের অল্প অল্প বাহ্যজ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'মা শশধরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পাঠালি, পাঠাইয়ে আমায় এমন করে দিলে কেন মা। আমি যে তোর ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছি না। মা আমায় ভাল করে দে মা।" এইরূপ বলিতে বলিতে আরও একটু বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "ভাই শশধর! দেখ্ আজ মায়ের কাছে বসিয়া আছি এমন সময় মা আমায় বলিলেন যে, হাঁরে রামকৃষ্ণ আমার শশধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা কর্‌লিনি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। আজ তাহার কাছে যা, গিয়ে দেখা ক'রে আয় গে। মা বল্লেন, আর থাকিতে পারিলাম না। আমি চলে এলাম। অনেক দিন আসিব আসিব করিতেছিলাম, আজ তা হইয়া গেল।" এইরূপ বলিতে বলিতে আবার সমাধি হইয়া গেল—কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় জ্ঞান সঞ্চার হইল। তৎপর দুইজনে নানা ভাব ভঙ্গিতে কত কি কথা হইল। অবশেষে পরমহংসদেব প্রেমে মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে আচার্য্য দেবকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন।"* • বেদব্যাস ২য় ভাগ, ১০ম খণ্ড, ২৪০-৪১ পৃঃ।

* ৺ ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সাধু দর্শন" নামক পুস্তকেও এ সকল কথাই অবিকল আছে, কেন না "সাধুদর্শন" বেদব্যাসে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

১২৯৩ সালে ৺পরমহংসের তিরোভাব—এই প্রবন্ধটি তৎপরবর্ত্তী বৎসরই লেখা হয়। * ৺ভূধর বাবুর প্রবন্ধে পরমহংস দেব সম্বন্ধে তৎসময়ে প্রচলিত অনেক গ্লানিকর কথার প্রতিবাদ আছে—(প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ভাগ—বেদব্যাস ২য় খণ্ড ১১শ সংখ্যা ২১৪ পৃষ্ঠাবধি দ্রষ্টব্য)। এ অবস্থায় ৺ভূধর বাবুর ন্যায় রামকৃষ্ণ দেবের ভক্তের স্বচক্ষে দৃষ্ট ও স্বকর্ণে শ্রুত ঘটনা ও কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। † এখন দেখুন, যিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতা হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে দেখিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহার পক্ষে "তোমার চাপরাশ আছে কি?" এরূপ প্রশ্ন সম্ভাব্য কি না? কেশব সেন বা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকটে গিয়াছেন। পরে উঁহাদের মুখের উপর দু'একটা স্পষ্টকথা সরলভাবে বলা এক কথা,—আর কোনও দিন জানা শুনা আলাপ পরিচয় নাই—এরূপ দেশবিশ্রুত পণ্ডিত ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়া "চাপরাশ আছে কি না" প্রশ্ন করা অন্য কথা, ইহা অভদ্রতা—পরমহংসদেব তাদৃশ অভদ্র ছিলেন না নিশ্চয়ই। তবে তিনি যে সব লোকের খপ্পরে পড়িয়াছিলেন, তাঁদের অসাধ্য কোনও কিছুই নাই। ইহারা কয়েকটী কারণেই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি বিরাগের ভাব পোষণ করেন বলিয়া মনে হয়। (১) প্রথমতঃ তিনি ব্রাহ্মণ—ইহারা ব্রাহ্মণ-বিরোধী। (২) তিনি সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচারক—ইহারা বর্ণাশ্রমের তেমন পক্ষপাতী নহেন। (৩) তিনি 'পণ্ডিত'—ইহারা

* আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "কথামৃত" "লীলা প্রসঙ্গ" প্রভৃতি ইহার পরে প্রকাশিত হইলেও ৺ভূধর বাবুর এ সকল কথার কোন উল্লেখ বা প্রতিবাদ এগুলিতে নাই। রামকৃষ্ণভক্তেরা তাঁহার সম্বন্ধে কোথায় কে কি লিখিল, এ সকলের অনুসন্ধান রাখিলে, ইহাও প্রকাশিত হইত।

† বরং উল্লেখিত পরমহংসদেবের বিবরণীতে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মত-বিরুদ্ধ (যথা 'সমাধি' ইত্যাদি) অনেক কথাও যে আছে—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পাণ্ডিত্য-বিরোধী—শাস্ত্রের ধার বড় ধারেন না। (৪) তিনি খাদ্যাখাদ্য বিচার, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার ইত্যাদি সদাচারের পক্ষপাতী ও প্রচারক—ইঁহারা হাঁড়িধর্ম্ম, ছুৎমার্গ ইত্যাদি বলিয়া এসকলের সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন। * অতএব চূড়ামণি মহাশয়কে "খাব্" করিবার এরূপ প্রয়াস আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নহে। †

আমাদের এই ধারণার সমর্থনার্থ, এস্থলে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" গ্রন্থে এই "চাপরাশ" সম্বন্ধীয় ব্যাপার কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে:—"এবৎসর (১৮৮৫ খৃঃ) রথের দিনে শ্রীযুত ঈশানের বাটীতে আগমন করিয়া ঠাকুরের ভাটপাড়ার কতকগুলি ভট্টাচার্য্যের ‡ সহিত ধর্ম্মবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তা হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে পণ্ডিতজির [অর্থাৎ চূড়ামণি মহাশয়ের] কথা শুনিয়া এবং তাঁহার বাসা অতি নিকটে জানিতে পারিয়া ঠাকুর শশধরকে ঐদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিতজির কলিকাতাগমন সংবাদ স্বামীজি (অর্থাৎ বিবেকানন্দ) প্রথম হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন; কারণ যাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণে তিনি ধর্ম্মবক্তৃতাদানে আগমন করেন, তাঁহাদের সহিত স্বামীজির পূর্ব্ব হইতেই আলাপ পরিচয় ছিল এবং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার বাসভবনে স্বামীজির গতায়াতও ছিল। আবার পণ্ডিতজির আধ্যাত্মিক ধর্ম্মব্যাখ্যাগুলি ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ বলিয়া ধারণা হওয়ায় তর্কযুক্তি দ্বারা তাঁহাকে ঐ বিষয়

* এই দলে শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচার ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণভক্ত দুই একজন যে না আছেন, একথা আমি বলিতেছি না—অবশ্যই আছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহারা এমনই "মোহগর্ত্তে নিপতিত" হইয়া আছেন যে, এই সম্প্রদায়ের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কীদৃশ অপকার হইতেছে, তাহাই দেখিতেছেন না।

† ৺ রামকৃষ্ণকে (এবং তৎসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে) বাড়াইবার জন্য অপর লোকদের খাটো করিবার প্রয়াস "কথামৃত" "লীলাপ্রসঙ্গ" প্রভৃতিতে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়।

‡ "কতকগুলি" ভট্টাচার্য্য !!

বুঝাইয়া দিবার প্রয়াসেও স্বামীজির ঐ গমনাগমন এই সময়ে কিছু অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। * স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন এইরূপে স্বামীজি পণ্ডিতজির সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইয়া ঠাকুরকে উহা বলেন এবং অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত দর্শনে লইয়া যান। পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়া ঠাকুর সেদিন পণ্ডিতজিকে নানা অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে "চাপরাশ" বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইলে উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় এবং কথন কথন প্রচারকের অভিমান অহঙ্কার বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, এ সকল কথা ঠাকুর পণ্ডিতজিকে এই প্রথম দর্শনকালেই বলিয়াছিলেন। এই সকল অমন্ত শক্তিপূর্ণ মহাবাক্যের ফলেই পণ্ডিতজি কিছুকাল পরে প্রচারকার্য্য ছাড়িয়া ৺কামাখ্যা পীঠে গমন করেন, ইহা আর বলিতে হইবে না।" লীলাপ্রসঙ্গ গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ ২২৩-৪ পৃষ্ঠা।

লীলাপ্রসঙ্গকার কিরূপে অবগত হইলেন যে, পণ্ডিতজি বক্তৃতা ছাড়িয়া ৺কামাখ্যায় তপস্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন? চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মবক্তৃতা প্রসঙ্গেই কামরূপেও আসেন এবং ৺কামাখ্যা দর্শনাদি করিয়া যান। আমরা জানি, তিনি ১৮৮৮-৮৯ অব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলে বক্তৃতা করিয়াছেন। ফলতঃ এ সকল লেখক যে কত অসত্য এভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

প্রকৃত পক্ষে রামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতের সম্মান যথেষ্ট করিতেন। চূড়ামণি মহাশয়কে অপ্রতিভ করিতে যাওয়া দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই লীলাপ্রসঙ্গকারের লেখাই উদ্ধৃত করিতেছি—"ঠাকুর। ওগো পণ্ডিত তোমায় দেখলুম। [অর্থাৎ সমাধি সহায়ে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তোমার অন্তরে

* এসব কথার মূলে সত্য যে কতদূর তাহা ভগবান্‌ই জানেন। পরন্তু ইহা বিবেকানন্দকেও বাড়াইবার প্রয়াস নয় কি?

কিরূপ পূর্ব্ব সংস্কার সকল আছে, তাহা দেখিলাম—(প্রসঙ্গকারের ফুটনোট)] তুমি বেশ লোক। গিন্নী যেমন রেঁধেবেড়ে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে, গামছা খানা কাঁধে ফেলে পুকুর ঘাটে গা ধুতে কাপড় কাচ্‌তে যায়, আর হেঁসেল্ ঘরে ফিরে না—তুমিও তেমনি সকলকে তাঁর কথা বোলে কোয়ে যে যাবে আর ফির্‌বে না।" ঐ উত্তরার্দ্ধ ২৩৯ পৃঃ।

'কথামৃত'কারও লিখিয়াছেন, যখন বলরাম বাবুর বাড়ী চূড়ামণি মহাশয় (প্রথম সাক্ষাৎকারের সপ্তাহমাত্র পরে) ৺রামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে যান, তখন তাঁহাকে—"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) বলিতেছেন—আমরা সকলে বাসর শয্যায় জেগে আছি—কখন বর আসবে।"

(কথামৃত ৪র্থ ভাগ ১২৬ পৃঃ)

আবার আছে—"পণ্ডিত বিদায় লইলেন। ঠাকুর বল্‌লেন, এঁকে গাড়ী আনিয়ে দাও। পণ্ডিত। আজ্ঞে না, আমরা অম্‌নি চলে যাব। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তা কি হয়—ব্রহ্মা যাঁরে না পায় ধ্যানে—" (কথামৃত ঐ ১৩০ পৃষ্ঠা)।

প্রতিবাদী কেহ কেহ চূড়ামণি মহাশয়ের উপর একটী অভিযোগ এই বলিয়া করেন যে, এই দীর্ঘ ৩৪ বৎসর পরে কেন তিনি 'চাপরাশে'র কথার প্রতিবাদ করিতেছেন—অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে কেন প্রতিবাদ করেন নাই। এ বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয়কে তদীয় বক্তব্য জানাইতে লিখি নাই—লেখা বাহুল্য মনে করিয়াছি। মদীয় পূর্ব্ব প্রবন্ধের সূচনায়ই লেখা আছে যে, তিনি (তিন বৎসর পূর্ব্বে) গৌহাটি আসিলে আমি তাঁহাকে ৺পরমহংস দেবের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি—'চাপরাশ' সম্বন্ধেও তখনই কথা হয়, পরে আমিই নির্ব্বন্ধসহকারে চিঠি দিয়া তাঁহার লিখিত মন্তব্য (আমার পত্রের উত্তরচ্ছলে) আনাইয়াছিলাম। চূড়ামণি মহাশয়ের উপরে বহুবিধ অত্যাচারের ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও কিছুর প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া

আমি অবগত নহি। এমন কি, আজ ২।৩ বৎসর হইল ঢাকা হইতে প্রকাশিত "প্রতিভা' পত্রে * দুইবার "৺শশধর তর্কচূড়ামণি" বলিয়া তাঁহার নাম উল্লেখিত হইয়াছিল—তিনি তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার প্রথম পত্রের প্রতিবাদের উত্তরেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (এতৎসহ প্রকাশিত) পত্রগুলি লেখেন নাই—আমিই বারংবার চিঠি ও তাগিদ দিয়া এগুলি লেখাইয়াছি।

উপসংহারে "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ের কথার কিঞ্চিৎ উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না তিনি লিখিয়াছেন—(সাহিত্য আষাঢ় ১৩২৮ বৈঠকী দ্রষ্টব্য) "তর্কচূড়ামণি মহাশয় সুপণ্ডিত এবং সদ্ব্যাখ্যাতা, পরন্তু তিনি গৃহী। তিনি গহনে দুর্গম বনে ঘুরিয়া কখনই সাধু সন্দর্শন করিবার তেমন অবসর পান নাই" ইত্যাদি। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় সেই গৌহাটীতে যখন তিনি শেষবার আইসেন তখনই—এবং তাহাও কয়েক মুহূর্ত্তের মাত্র। তৎকালে আলাপ প্রসঙ্গে, শ্রীহট্ট জেলার জয়ন্তীয়া স্থিত ৺বামজঙ্ঘা-মহাপীঠে গিয়া জনৈক সাধুর সহিত তাঁহার যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। ঐস্থান তখন (১২৯৫ সালে) দুর্গম ও শ্বাপদাকীর্ণ ছিল এবং তিনি যে জীবনে তাদৃশ অনেক বড় লোকের সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন, এ কথাও বলিয়াছিলেন। † ফলতঃ গৃহী হইলেও যাঁহারা তীর্থসেবী, তাঁহাদের সাধুদর্শনের সুবিধা বহুশঃই ঘটিয়া থাকে।

এ সকল প্রতিবাদের উত্তরচ্ছলে আমার নিজের বক্তব্য প্রবন্ধান্তরে লিখিত হইয়াছে। (পরবর্ত্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

---

* ১৩২৬ সাল—৪১ পৃঃ ও ১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† শ্রীজয়ন্তী মহাপীঠ এবং উক্ত সাধু (ব্রহ্মচারী রাজ প্রসাদ) সম্বন্ধে পত্রান্তরে (ব্রাহ্মণ সমাজ ১৩২৮ পৌষ সংখ্যায়) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত ঐ সাধু দর্শন বিষয়ে একখানি চিঠিও প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম পরিশিষ্ট।

খ। রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ

বিষয়ক প্রসঙ্গের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম, সে গুলির প্রতিবাদ হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত চিঠিতে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যে সব কথা ছিল, তৎপ্রতিবাদের উত্তর পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে; ঐ প্রবন্ধে চূড়ামণি মহাশয়ের পক্ষ হইতে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার কথার যে প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বপ্রবন্ধেই বলিয়াছি, প্রতিবাদগুলির অধিকাংশই গালিপূর্ণ। কটু কথা কখনও 'যুক্তি' বলিয়া গ্রাহ্য হয় না—ইহাতে প্রতিবাদীরই পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এরূপ কটূক্তি অপ্রত্যাশিত নহে; 'সত্যপ্রিয়' স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিসমূহও খুব 'ঝাল' হইত—তদীয় অনুবর্ত্তিগণের ভাষায়ও সেটুকু থাকিবে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ যেখানে তর্ক চলে না—প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা যায় না—সেখানে 'গালি' ভিন্ন আর উপায়ই বা কি?*

পরন্তু রাঁচির শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথোচিত ভদ্রভাবেই তাঁহার প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। চূড়ামণি মহাশয়ের বিরুদ্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন—তদুত্তর চূড়ামণি মহাশয়ই দিয়াছেন—আমি এ বিষয়ে কিছুই বলিব না। আমার সম্বন্ধে তিনি যেটুকু লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। ৺পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আমার

---

* গালির আর একটা অবান্তর ফল আছে; যুক্তির উত্তরে যে স্থলে কটূক্তিবর্ষণ হয় সেস্থলে "অপমানং পুরস্কৃত্য" সাধারণতঃ কেহ কোনও কিছু বলিতে অগ্রসর হন না; অতএব 'গালি' অনেকটা নিরাপত্তাজনক।

মন্তব্য পড়িয়া তিনি বলেন যে, "রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ছিলেন না, এটা আমি 'প্রতিপন্ন করিতে' চেষ্টা করিয়াছি।" একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়া দেখিলে বোধ হয় তিনি এভাবে কথাটা বলিতেন না। আমি আমার 'ধারণা' মাত্র বলিয়াছি;—তাঁহাকে আমি 'অবতার' মনে করি না, একথা অবশ্যই বলিয়াছি—এবং ভক্তেরা তাঁহাকে 'অবতার' বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন, একথাও বলিয়াছি; অপিচ এইরূপ অবতার বলাতে কিরূপ 'অনিষ্ট' হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও সামান্য কিছু বলিয়াছি। ইহাতে তিনি অবতার নহেন—ইহা 'প্রতিপন্ন করার চেষ্টা' বুঝায় না; কেন না কোনও একটা বিষয় 'প্রতিপন্ন' অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ করিতে হইলে যুক্তি দিতে হয়। অবতারের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া একরূপ অসাধ্য। শাস্ত্র যাঁহাদিগকে অবতার বলিয়াছেন—আমরা তাঁহাদিগকে অবতার মানিব—ইহাই একমাত্র 'প্রমাণ' মনে করি। অবশ্য গীতার—'যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংহংশসম্ভবম্॥'

অথবা পুরাণের "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে অবতারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে; তথাপি স্পষ্টতঃ যে সকল নাম অবতারের তালিকাভুক্ত, তাহা ছাড়া অপর অবতার স্বীকার করা নিরাপদ্ নহে। একবার 'অবতার' খ্যাপিত হইয়া পড়িলেই আর কোনও বালাই নাই; তিনি যদি লম্পট হন—নজির হয় "শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণ, রাসলীলা ইত্যাদি করিয়াছিলেন"; তিনি যদি শঠ বঞ্চক হন, ভক্তেরা বলিবেন "বামনদেব বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। এ অবস্থায় যুক্তি তর্ক চলে কি? এমন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাঁহারও 'অবতার'ত্ব এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।* অবতারের প্রয়োজনই বা কি? আমাদের

* হরিসঙ্কীর্ত্তনাদিতে—"গৌরচন্দ্রিকা" এখন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যখন মনে করা যায় যে, তিনি এইরূপ কীর্ত্তনের "গুরু" তখন

তো অনেক অবতারই আছেন—এ ছাড়া—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' বহুবিধই হইয়াছে। রামকৃষ্ণকে যাঁরা গুরুরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁহার পূজা করিতে পারেন। আমি লিখিয়াছিলাম, "রামকৃষ্ণের দেখাদেখি বঙ্গদেশময় বহু অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে—এবং রামকৃষ্ণ এই সকল উদ্ভট শ্রেণীর লোকের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।" ইহাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, "বঙ্গদেশে আধুনিক বহু অবতারের কথা আমরা তো শুনি নাই।" তিনি যদি না শুনিয়া থাকেন, তবে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করি। শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু-প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ড ১০২৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, স্বামীজি বলিতেছেন, "এক ঢাকাতেই শুনলুম্ তিন চারিটি অবতার বেরিয়েছেন।" * এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ আরো যাহা বলিয়াছিলেন, (পুনরুক্তি হইলেও) তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিলাম। (ঢাকার একজন বালক একটা 'ফটো' দেখাইয়া স্বামীজিকে বারংবার জিজ্ঞাসা করে—ইনি অবতার কিনা? তদুত্তরে) স্বামীজি বলেন "বাবা এখন থেকে একটু ভাল করে খেয়ো দেয়ো; তাহলে মাথাটা খুলবে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তোমার মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে গেছে।" আবার বলিলেন "গুরুকে শিষ্যেরা অবতার বলতে পারে বা যা ইচ্ছে ধারণা কর্ত্তে পারে।

ঈদৃশ বন্দনা (যেমন কবিরা বাল্মীকির বন্দনা করেন) সঙ্গতই মনে করা যাইতে পারে।

* ফলতঃ আজকাল লোকে যেমন ডাক্তার কবিরাজ না ডাকিয়া স্বল্পমূল্যের প্যাটেন্ট ঔষধ খাইয়া আরোগ্যলাভ করিতে চায়—এ সকল উদ্ভট অবতার-বাদীরাও 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ *** যেন গচ্ছন ন রিষ্যতে' সেই শাস্ত্রসম্মত সাধন ভজনের পথ ছাড়িয়া অনায়াসে ভবব্যাধির প্রতীকারার্থ ঈদৃশ সহজ মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে। তবে প্যাটেন্ট 'ফলেন পরিচীয়তে'—ফলাফল স্পষ্ট দেখা যায়, এদের ফলাফল চিত্রগুপ্তেরই মাত্র বেদিতব্য। গ্র

কিন্তু তাই বলে দেশশুদ্ধ লোক অবতার হবে, এ কি রকম? ভগবানের অবতার যখন তখন যেখানে সেখানে হয় না।") * (স্বামী বিবেকানন্দ—৪র্থ খণ্ড ১০২৪ পৃষ্ঠা।)

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ সকল কথায় প্রতিও একটু প্রণিধান করিবেন কি? কেবল ঢাকায় কেন, পূর্ব্ববঙ্গের আরো দু এক জেলার খবর জানি—যাতে এরূপ উদ্ভট অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। এক খানি পুস্তকের নামও উল্লেখ করিয়া দিলাম, "ঠাকুর দয়ানন্দ"—৺ মহেন্দ্র নাথ দে এম, এ, বি, এস্-সি প্রণীত। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেন তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করেন এবং এই 'ঠাকুর'টির একটু তথ্যানুসন্ধানও করেন।

আমি আক্ষেপ প্রকাশার্থই লিখিয়াছিলাম যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসও এসকল উদ্ভট অবতারের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পরমহংস দেবের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আছে—একথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি; † কিন্তু "অবতার" বলিয়া তাঁহাকে মানিতে পারিব না; বরং অবতার সাজাইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হইয়াছে—একথা ভূয়োভূয়ঃ বলিব। অবতার প্রতিপাদনার্থ "কথামৃত" 'লীলা প্রসঙ্গ' প্রভৃতিতে কত যে অত্যুক্তি ইত্যাদি রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ‡

---

* যাঁরা রামকৃষ্ণ দেবকে অবতার মনে করেন তাঁহাদেরও এসকল কথা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি?

† কেবল যে এখন বলিতেছি তাহা নহে। ১৩১৭ সালের কার্ত্তিকসংখ্যক "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রে "শঙ্করনাথ" শিরোনামে একটি গল্প প্রকাশিত করিয়াছিলাম—তাহাতে পরমহংসদেবের উল্লেখ সভক্তিক করা হইয়াছে। [তাহাতে চাপরাশের কথাটাও আছে, কিন্তু চূড়ামণি মহাশয়ের সম্পর্কে নহে।]

‡ ইতঃপূর্ব্বে 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ ৺রামকৃষ্ণদেব ঈদৃশ অত্যুক্তিবাদিগণ কর্ত্তৃক কিরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছেন, তাহার দু' একটী উদাহরণ দেখাইয়াছি। অলং বাহুল্যেন।

—বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এ সকল অতিরঞ্জন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

অন্যান্য প্রতিবাদকারীদিগের কটূক্তিভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধের উত্তরে আমার বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই; তবে ইহাদের বিচারশক্তি ও তথ্যানুসন্ধিৎসা বৃত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। বাবু সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার লিখিয়াছেন, (সাহিত্য জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮—১৫৫ পৃঃ) "পত্র খানির [অর্থাৎ চূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত পরমহংস দেব সম্বন্ধীয় প্রথম পত্রের] তারিখ দৃষ্টে বুঝা গেল, ইহা দুই বৎসর পূর্ব্বের লেখা"। সত্যেন্দ্র বাবু ঐ পত্রখানির তারিখ দেখিয়াছেন "২৭।৯।২৫"—ভাবিয়াছেন "২৭শে পৌষ ১৩২৫"; কিন্তু ঐ তারিখের পাশে একটি '।' চিহ্ন দিয়া পাদটীকায় লেখা হইয়াছে, "অর্থাৎ ২৫ পৌষ ১৩২৭—পূর্ব্বে সনের অঙ্ক লেখাটাই সনাতন রীতি", ইত্যাদি [প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] ফলতঃ প্রতিবাদী মহাশয়ের 'তলাইয়া দেখার' অভ্যাসটী থাকিলে ঐরূপ ভ্রম ঘটিত না। এই 'দুই বৎসর পূর্ব্বের লেখা' বলিয়া তিনি যে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

বিগত (১৩২৮) শ্রাবণের 'সাহিত্যে' "মিথ্যা অভিযোগ" শীর্ষক প্রতিবাদ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—"কিন্তু আমরা জানি রামকৃষ্ণ দেব আপনাকে অবতার বলিয়া মনেই করিতেন না। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, ভগবানের কি cancer হয়?" কথাটা ঠিক্; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও নাকি এরূপ কথাই পরমহংসদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠে আছে— * * * "পরমহংস দেবের শেষ মুহূর্ত্তে * * তিনি [অর্থাৎ বিবেকানন্দ] তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, "আচ্ছা, উনি তো অনেক সময়ে নিজকে ভগবানের অবতার ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। এখন এই সময়ে যদি

বল্‌তে পারেন, 'আমি ভগবান্‌' তবেই বিশ্বাস করি।" কি আশ্চর্য্য সেই মুহূর্ত্তে নিদারুণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যে পরমহংসদেব তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হোলো না? সত্যি সত্যি বল্‌ছি, যে রাম যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।"

যে বিবেকানন্দ এরূপ কথা (প্রতিবাদকারিণীর * মতে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা) প্রচার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও উচ্চ ধারণা হইতে পারে কি? আমরা যদি পাকেপ্রকারে 'প্রবঞ্চক' ঠাওরাইয়া থাকি, তবে কি আমাদের খুব গুরুতর অপরাধ হইবে? এইরূপ ব্যক্তির বাণী কি 'বীরবাণী' হইবার উপযুক্ত? ঈদৃশ লোকই কি সন্ন্যাসের বা ধর্ম্মপ্রচারের অধিকারী?

এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, 'কথামৃত', 'লীলা প্রসঙ্গ' ইত্যাদিতেও রামকৃষ্ণ যে নিজকে অবতার মনে করিতেন, এরূপ কথা পাওয়া যায়। তবে কি এ সকলের লেখকগণও (এই প্রতিবাদ-লেখিকার মতেও) অসত্যের প্রচারক? অপরের লেখাকে "মিথ্যা অভিযোগ" বলিয়া অভিহিত করিবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় তৎসম্প্রদায়ের লিখিত কাহিনী ভাল করিয়া পড়াটা কি উচিত ছিল না?

ঐ শ্রাবণ মাসের "সাহিত্যে" অপর একজনের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি উপসংহারে এই অধমকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন 'তবে হঠাৎ নাম করিতে হইলে ঢক্কা কি বাঘ ঠেঙ্গান দরকার, নচেৎ নাম ফাটিবে না।' পরেই নিজের পরিচয় এ ভাবে লিখিয়াছেন,—

"শ্রী * * * * কবিশেখর কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার সমিতি, * * * * ষ্ট্রীট" †

---

* ইনি নিজেকে 'বেথুন কলেজের ছাত্রী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় প্রবন্ধের ভাষা ইত্যাদিতে স্ত্রীজনসুলভ শালীনতার অথবা উচ্চ-শিক্ষাজনিত বিনয়ের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। [প্রবন্ধ ছদ্মনামেও লেখা হইতে পারে।]

† নাম ও ঠিকানা নানাকারণে এস্থলে প্রকাশ করা হইল না।

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। * ইহাতে যিশুখৃষ্টের বাণীই মনে পড়ে—'The mote thou seest in the eyes of others, but not the beam in thine own."

ইনি বলিয়াছেন "লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ জাতিস্মর ছিলেন"। আমার লেখা যিনিই অভিনিবেশ সহকারে পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, যে 'বিবেকানন্দ জাতিস্মর ছিলেন' একথা আমার স্বীকার উক্তি নহে; একথা তাঁহার জীবন-চরিতে (স্বামী বিবেকানন্দ—১৫০ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত তাঁহার নিজের উক্তি হইতে গৃহীত হইয়াছে। পরমহংস বলিতেন, "ও (বিবেকানন্দ) যখন জানতে পারবে ও কে, তখনই দেহত্যাগ করবে।" অথচ মৃত্যুর ৫ বৎসর পূর্ব্বেই দেখা যায় বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা, অর্থাৎ তিনি কে, ইহা জানিতেন—অথচ তখনই দেহত্যাগ করেন নাই। দুই কথার অসঙ্গতি দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল,—এই স্পষ্ট কথাটাও প্রতিবাদলেখকের বোধগম্য হয় নাই!

অন্য একজন প্রতিবাদকারী এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, আমি স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত থাকিতে কেন এ সকল কথা প্রকাশ করি নাই, আর তাঁহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে কেন তাঁহার কথার ও কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেছি। এই অভিযোগ অতি অকিঞ্চিৎকর; তথাপি ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, গোহাটিতে বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাত্র বৎসরেকের পরেই তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। অতএব ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলেও তাঁহার জীবিত সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবকাশই

* সযত্ন পরিচয়ের ঘটা দেখিয়া মনে হয় কবিরাজ মহাশয় শিখণ্ডী হইয়া দণ্ডায়মান—পশ্চাতে কোনও ধনঞ্জয় অবস্থিত হইয়া কটূক্তির বাণ বর্ষণ করিতেছেন।

ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার দু'চারিটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ভিন্ন (আমেরিকার প্রথম এক দুইটি বক্তৃতা ছাড়া) আমি তাঁহার বিশেষ কোনও কিছু তখন পর্য্যন্ত পড়ি নাই—তাঁহার কোন জীবনচরিতও তখন দেখি নাই। এই সে দিন মাত্র তাঁহার পত্রাবলী (১ম খণ্ড) 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতি দু' একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি—এবং যে জীবন-চরিত-খানি হইতে আমার প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা প্রবন্ধলেখার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে মাত্র হস্ত-গত হইয়াছে। তবে যখনই সুবিধা পাইয়াছি, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছি; ১৩১৬ সালে (স্বামীজির মৃত্যুর মাত্র ৭বৎসর পরে) যখন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করি, তখনই রায় মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বিবেকানন্দের কথার উত্তরে স্বামীজির সম্বন্ধে দু' একটী স্পষ্ট কথা লিখিয়াছিলাম। * ঐ সকল কথা পড়িয়া স্বামীজির জনৈক ভক্ত (১৩২৩ সালে) আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক চিঠি লিখিয়া-ছিলেন; তদুত্তরে তাঁহার প্রবোধার্থে গৌহাটিতে বিবেকানন্দের সহিত আমার যে সব কথা হয় এবং তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিয়া স্বামীজির সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা জন্মে, এ সকল সংক্ষিপ্তভাবে যথাযথ লিখিয়া পাঠাইয়া-ছিলাম †—ইহা হইতেই "আসামে বিবেকানন্দ" প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। অতএব 'কুড়ি বছর পরে' যে এই প্রথম এইরূপ বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিলাম, ইহা ঠিক নহে। তারপর, বিবেকানন্দ পরলোক

* "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস" (গৌহাটী সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত) ১৬ পৃঃ হইতে ২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† ঐ ভক্তটি আমার একজন আবাল্যবন্ধু—শিলং থাকিতেন। সেই স্থানের আরো অনেকে আমার সেই স্মৃতিমূলক লেখা পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ইহার উপর আর তর্ক চলে নাই। লেখাটা ফেরত পাইয়াছিলাম।

প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—তাঁহার কীর্ত্তি, তদীয় গ্রন্থাবলী, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাই বলিয়াছি, এরূপ অভিযোগ অকিঞ্চিৎকর।

এক্ষণে পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্প্রদায়-ভুক্ত যে সকল বিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কীয় যে সকল গ্রন্থে তাঁহাদের উক্তি ও কার্য্যাবলী সাধারণ্যে প্রচারিত হইতেছে, এগুলির ভিতরে পরস্পরবিরোধী বহু অসমঞ্জস কথা রহিয়াছে—আমি দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিলাম। এইরূপ অসামঞ্জস্য থাকা সম্প্রদায়ের গৌরবজনক নহে। তাঁহারা ঠিক কি ছিলেন, এরূপ অসঙ্গত উক্তিগুলি পাঠ করিয়া বুঝা যায় না। অপিচ অতিরঞ্জন দ্বারা এবং অপরকে খর্ব্বীকৃত করিয়া * তাঁহাদিগকে বাড়াইবার যে একটা প্রয়াস দেখা যাইতেছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে অশোভন। বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী কথা থাকিলে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসীর হৃদয়ে আঘাত লাগিবেই এবং তাহা হইলে এ সকলের তীব্র প্রতিবাদও অবশ্যই হইবে। আবার পরমহংস দেবের বা বিবেকানন্দের নিষ্ঠুরতোদ্গীর্ণবাক্যাদি † সবই যে প্রকাশ করিতে

---

* এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কতক বলিয়াছি—এ স্থলে এতৎসমর্থক কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে হইল। রামকৃষ্ণের গুরু পরমহংস তোতাপুরী এবং উত্তরসাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী কি ভাবে (রামকৃষ্ণের উৎকর্ষ প্রদর্শনচ্ছলে) বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা "লীলাপ্রসঙ্গ" গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

† উদাহরণ:—শ্রীযুক্ত অধরের বাটীতে খুব কীর্ত্তন হইয়াছে, অনেকেই তাতে নাচিয়াছেন; কীর্ত্তনান্তে রামকৃষ্ণ "সহাস্যে বল্‌ছেন 'ছাকরা' নেচেছিল। নরেন্দ্র (সহাস্যে) আজ্ঞা, একটু একটু। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) একটু একটু? নরেন্দ্র (সহাস্যে) ভুঁড়ি আর একটি জিনিষ নেচেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) সে আপনি দোলে—না দোলাতে—আপনি দোলে (সকলের হাস্য)।" কথামৃত—৪র্থ ভাগ, ১৭শ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ। কীর্ত্তনের সময় গুরু শিষ্যের দৃষ্টিটা কোন্ দিকে ছিল, দেখুন—অশ্লীলতার কথা না-ই বলিলাম। ছাকরার

হইবে, এমনও নহে; বরং জুগুপ্সিত বিষয়ের অন্বেষণই বাঞ্ছনীয়, নচেৎ লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিবার কথা। আশা করি তাঁহারা এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিবেন—এবং এই অধম এ সকল অনেকটা ঘাটিয়া দেখাইয়াছে বলিয়া যেন রুষ্ট না হন। রামকৃষ্ণদেবকে আমি বাল্যাবধি শ্রদ্ধা-ভক্তির চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি—তাই তাঁহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে কথা বলিয়াছি; পরন্তু তাঁহার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা যাঁহার নাই, তাদৃশ সমালোচক এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পরমহংস-দেবকেও বিড়ম্বিত হইতে হইবে। *

পরিশেষে এতদুপলক্ষে "সাহিত্যে"র মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যে সকল 'বৈঠকী' আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে দু একটি কথার প্রতিবাদ না করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। তিনি আমাদের সম্মানার্হ; কিন্তু "দোষা বাচ্যা গুরোরপি"। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বাধিত। কিন্তু আমার বোধ হয় সম্পাদকীয় ভাবে তিনি এ সকল প্রবন্ধের আলোচনা না করিলেই ভাল হইত। সে যাহা হউক, তিনি [সাহিত্য ১৩১৮] "বৈশাখে"র 'বৈঠকীতে' আমার প্রবন্ধাবলীকে 'সুললিত সন্দর্ভগুলি' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—এবং এগুলির উপলক্ষে তাঁহার উপর রোষ ও অভিমান প্রকটনপূর্ব্বক অনেকে যে চিঠি পত্র লিখিতেছিলেন, তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশও করিয়াছিলেন। বলা আবশুক যে, সেই মাসেই "স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়—এবং তৎপূর্ব্বেই প্রবন্ধের সমগ্রটা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

অপরাধ, তিনি পরমহংস দেবের সমক্ষেই তৎসম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে অপ্রিয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন।

* ইতোমধ্যেই কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তত্ত্ববিভূতি বিদ্যাভূষণ লিখিত "সহজিয়া ধর্ম্মমত" প্রবন্ধ (ব্রাহ্মণ সমাজ, ভাদ্র ১৩১৮) দ্রষ্টব্য।

"জ্যৈষ্ঠ" সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য কিছুই ছিল না, তবে এই সংখ্যায়ই প্রথম প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়—তাহাতে এ দীনের উপর নিছক গালি বর্ষণ হয়—সম্পাদক মহাশয় তাহা যথাযথ পত্রস্থ করিয়াছেন—তবে অভদ্রোক্তিগুলি বাদ দিলেও প্রতিবাদ প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইত না। *

তারপর "আষাঢ়" সংখ্যায় 'বৈঠকী'তে লিখিলেন, "বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তেমন নির্ম্মৎসর ভাবে লেখনী চালাইতে পারিতেছেন না—তাঁহার লেখায় একটু যেন রীষের বিষ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।" অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'সাহিত্যে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলেও সমগ্র প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বৈশাখের 'বৈঠকী'তে প্রশংসাবাদের পূর্ব্বেই পাঠান হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এই আষাঢ়ী বৈঠকীর তৈল নিক্ষেপেও প্রতিবাদের তরঙ্গ থামে নাই; 'বেঙ্গলী' ও 'সার্ভেন্ট' পত্রে একজন পত্রপ্রেরক প্রবন্ধলেখক সহ সম্পাদক মহাশয়কেও গালি দিয়া 'সাহিত্য' বয়কটের ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। †

অতঃপর "শ্রাবণে"র 'বৈঠকী'তে সম্পাদক মহাশয় হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে বহু কথার অবতারণাপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহার সবটা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছি একথা বলিতে পারি না; তবে বোধ হয় তাঁহার বক্তব্য মোটামুটি নিম্নোক্ত প্রকারে শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে; (১) বাঙ্গালী গুরুপুরোহিতের অভাবে দলে দলে গুরুপুরোহিতভূমিষ্ঠ

* প্রতিবাদী যে প্রবন্ধের সমালোচনায় এত কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার নিজের কথা সামান্যই ছিল, এবং তাহা পরমহংসদেবসম্বন্ধীয় বলিয়া যথোচিত সংযতই ছিল। কিন্তু প্রতিবাদকারীর দৃষ্টি ছিল বোধ হয় বিবেকানন্দ-বিষয়ক পরবর্ত্তী প্রবন্ধে যাহা ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাখে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতেও প্রতিবাদীর প্রকৃতির পরিচয় আরো একটু পাওয়া যাইতেছে।

† এই ভয় প্রদর্শনের কিয়ৎকাল পরেই "সাহিত্য" পত্রখানি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা বিবেকানন্দী দলের কাজ বলিয়াই একজন প্রতিবাদকারীর প্রবন্ধ (ব্রাহ্মণসমাজ ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) হইতে অনুমিত হয়। অনুমান সত্য হইলে, ইহাদের প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি কত বেগবতী ইহাই সূচিত হয়।

মোসলমান সমাজে ঢুকিতে আরম্ভ করিল, শেষে খৃষ্টানও হইতে লাগিল, তাই ক্ষুদ্রতর বাঙ্গালায় ২॥ কোটি মোসলমান ও ৩০ লক্ষ খৃষ্টান; (২) আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় হিন্দুর ধর্ম্মের কর্ম্মের এবং সমাজের কোনও চিহ্ন থাকিবে না; (৩) রামকৃষ্ণসম্প্রদায় এই ভাঙ্গনের মুখে বালির বস্তা ফেলিবার চেষ্টায় আছেন; (৪) ইঁহাদের কর্ম্মের পরিমাণ বনুনন্দনী গজে হইবে না; (৫) স্বামী বিবেকানন্দও নাকি বলিয়াছেন "চাই, বেদান্তের প্রচার দ্বারা 'আমি'কে জাতি-বর্ণধর্ম্মনির্বিশেষে প্রকট করা।"

এ সকল দফার বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। সংক্ষেপতঃ প্রথম দফার উত্তরে এই বলা যায় যে, ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই সাধারণ লোক—নমঃশূদ্র পর্যান্ত—ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ পাইয়াছে—মোসলমান হইবার প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। শতাধিক বর্ষব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টায়ও খৃষ্টান পাদরীরা এদেশে কিছুই করিতে পারিলেন না—খাসিয়া গারো সাঁওতাল ইত্যাদির মধ্যেই যা কিছু সামান্য প্রচার করিতে ইঁহারা সমর্থ হইয়াছেন। মোসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রধানতঃ বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহেরই ফল—এরূপ বৃদ্ধি দারিদ্র্য ও তজ্জনিত চৌর্য্যাদি অপরাধের উৎপাদক—জেলখানার দিকে তাকাইলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। খৃষ্টানও নূতন করে বড় কেহ হইতেছে না। দ্বিতীয় দফার উত্তর ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা না হইলে কিরূপে দেওয়া যায়? তবে যে সনাতন সমাজ বহু বিপ্লবের ভিতর দিয়া আসিয়া আজও টিকিয়া রহিয়াছে এবং শ্রীভগবান্ স্বয়ং যাহার স্রষ্টা (চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্) এবং রক্ষক (ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে) বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এরূপ বলা বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষে অতিশয় সাহসের কাজই হইয়াছে। তবে পরিবর্ত্তন সমাজে কালক্রমে হইবেই—সেই

পরিবর্তনটা যাতে স্বল্পীভূত হয়, সমাজহিতৈষী মাত্রেরই সেই চেষ্টা হওয়া উচিত—এবং এই চেষ্টা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আস্থাবান্ শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচার ব্রাহ্মণাদি দ্বারাই হওয়া আবশ্যক। তৃতীয় দফার উত্তরে বক্তব্য যে, আজ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় হিন্দুসাধারণের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই—অতএব এযাবৎ "বাণিজ্য প্রস্তাবের" পরিচিহ্ন কোনও কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। চতুর্থ দফার উত্তরে আমার কিছুই বলিবার নাই—কেন না বিবেকানন্দের চেষ্টা যে রঘুনন্দনের ব্যবস্থাশাসিত সমাজ বিধির প্রতিকূল, তাহা আমি ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছি। বলা আবশ্যক রঘুনন্দন ঋষি প্রণীত শাস্ত্রেরই প্রচারক—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হরিভক্তি বিলাসেও শাস্ত্রাদি অবলম্বনপূর্ব্বক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ইহাতে সনাতন ধর্ম্মের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবারই প্রয়াস আছে। রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের হরিভক্তি-বিলাসকারের ন্যায় বিদ্বানের অত্যন্তাভাব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম পণ্ডিত ও অশেষ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ছিলেন—তিনি শাস্ত্রানুমোদিত যাহা স্বয়ং শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার অনুসরণেই 'হরিভক্তি বিলাস' সঙ্কলিত হইয়াছে; রামকৃষ্ণ শাস্ত্র জানিতেন না—যদিও গুরূপদেশ ও সাধুসঙ্গে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার দ্বারা উপদিষ্টকৈহ 'হরিভক্তি বিলাসের' ন্যায় গ্রন্থ রচনায় সমর্থ হন নাই। তাঁহার যে সকল উক্তি সোজা কথায় আছে, তাহাই 'টেনে বুনে' রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কিছু কিছু ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়াছেন—কিন্তু ইহাতে শাস্ত্র বিচার নাই। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সংস্কারকগণও যথাসম্ভব শাস্ত্রের উপর ভিত্তিস্থাপনপূর্ব্বক প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিয়া স্বীয় মত চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণসম্প্রদায় তেমনটা করেন নাই, করিবার শক্তিসামর্থ্যও ইহাদের নাই।* পঞ্চম দফা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিব যে 'বেদান্তের প্রচার', যে দেশে

* ফলতঃ যাঁহারা স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণের জীবন চরিত বা ধর্ম্মক

করিবার অধিকার স্বামী বিবেকানন্দের ছিল, তথায় অর্থাৎ ভারতবর্ষের বাহিরে বরং কিছুটা ফল হইয়াছিল—এদেশে তাঁহার কাছ হইতে বেদান্তের বাণী কেহ শুনিবে না, শুনেও নাই। এ দেশের লোক তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর (বেদান্তে) ব্যুৎপন্ন রামমোহন রায়ের কথাই শুনে নাই। এমন কি রামমোহনের অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মেরাই 'Vedantism discarded' করিয়া যাদৃচ্ছিক পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ লালা হংসরাজকে বলিয়াছিলেন, "আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের গোঁড়ামি (ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলিয়া তাঁর আশ্রয় লইলেই মুক্তি—এইরূপ প্রচার) দ্বারা আরো অদ্ভুতরূপে ও অতিশীঘ্র সম্প্রদায়ের বিকৃতি হয়, ইহাও আমার জানা আছে।" ইত্যাদি (ভারতে বিবেকানন্দ ৩৭১ পৃষ্ঠা)। তিনি অবশেষে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি পূজার বিধানব্যবস্থা যে তিনিই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এখন সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নিবেদন এই যে, বিবেকানন্দ তো প্রায় কুড়ি বৎসর হইল চলিয়া গিয়াছেন—এবং রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ও আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ ('মিশন' প্রতিষ্ঠার কাল হইতে) কাজ করিতেছেন। কোথায় কোন্ পতিত জাতির উদ্ধার সাধন তাঁহারা করিয়াছেন এবং মোসলমান ও খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে তাঁহারা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কি বিবৃত করিয়া দেখাইবেন? হাসপাতালের সংখ্যা দু একটা বাড়াইয়াছেন, সন্দেহ নাই—এবং দুর্ভিক্ষাদিতে গিয়া সেবার ব্যবস্থা করেন, ইহাও প্রশংসার বিষয়। পরন্তু

অচ্ছিদ্রভাবে প্রচার করিতে পারেন নাই, এমন কি তাঁহাদের 'চিত্রে'ও যে মধ্যে মধ্যে সঙ্গতির অভাব আছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, তাঁহারা 'হরিভক্তি বিলাসের' ন্যায় রঘুনন্দনের স্মৃতির অনুকল্প কিছু দাঁড় করাইতে পারিবেন, ইহা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

এই যে বৈষ্ণব গোস্বামীরা অনার্য্য জাতীরদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া হিন্দুর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহারা সেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন কি? মনে রাখিবেন যে, মিশনারীগণ ঐ সকল স্থলেই দুর্ভিক্ষাদিতে সহায়তা করিয়া লোকদের খ্রীষ্টান বানাইয়া খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। তারপর একটা মোটা কথা এই যে, যদি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটাইয়া শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করাইয়া মোসলমান বা খৃষ্টান হওয়ার তরঙ্গ রোধ করিতেই হয়—তাহা কি আমাদের বাঞ্ছনীয়? বর্ণাশ্রমবিরোধী সম্প্রদায়ে এবং খৃষ্টানে বা মোসলমানে আমাদের নিকট পরমার্থতঃ পার্থক্য কি? ফলতঃ ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া হিতসাধন কিরূপে সম্ভাবিত? *

তারপর সম্পাদক মহাশয় আমার প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ পক্ষে সমর্থন করিলেন না।" তাঁহারা বৃথা এ বিষয়ে যোগ দিতে কেন আসিবেন? তাঁহারা তো (সম্পাদক মহাশয়েরই ন্যায়) দেখিতেছেন "কোন প্রতিবাদী আগাগোড়া সবটা পড়িয়া ঠিক্‌মত উত্তর দিল না।" তবে তাঁহারা কেন আসরে নামিবেন? পরন্তু এ দীন লেখককে দু'একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাচনিক এবং চিঠি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, একথা সম্পাদক মহাশয়ের অবগত্যর্থে নিবেদন করিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক লিখিত 'ব্রাহ্মণ সমাজের' গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। † একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এই প্রবন্ধগুলি

---

* হিন্দু সমাজ ভঙ্গের তরঙ্গ রোধিতে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় বালির বস্তা ফেলিতে কৃতকার্য্য হউন—আর না-ই হউন সম্পাদক মহাশয়ের ঐ সম্প্রদায় তথা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এরূপ লেখা যে প্রতিবাদের গালির তরঙ্গে বালির বস্তার কাজ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না ঐ সংখ্যায় মদীয় 'বিবেকানন্দ' প্রবন্ধের শেষাংশ প্রকাশিত হইলেও, অতঃপর আর কোনও প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

† বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার প্রবন্ধাবলীর কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু

পড়িয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এস্থলে উল্লেখ করা উচিত মনে করিতেছি:—"আমরা তো এত কথা জানিতামই না; তাই বিবেকানন্দ সোসাইটিতেও যোগ দিতাম; তবে একবার ঐ সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে গিয়া অধিকার অনধিকার সম্বন্ধে কিছু বলাতে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যেন উহার কর্তৃপক্ষীয়েরা আমার কথা সমর্থন করেন না; সেই হইতে আমি উক্ত সোসাইটির সম্পর্ক এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছি।" এ ছাড়া বঙ্গের জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যিক (যিনি ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু খুব "গোঁড়া হিন্দু" নহেন) লিখিয়াছেন "* * * যে যুগ আসিয়াছে, সে নবীন যুগ—পুরাতনের সহিত অনুবন্ধহীন অভূতপূর্ব্ব অভিনব যুগ। ইহার শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণা সমস্তই অভিনব—বহুবিষয়ে উচ্ছৃঙ্খল। তাহার মধ্যে শৃঙ্খলার অধিকার কামনা এবং সেই কামনা পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা নিরর্থক। * * * তথাপি ব্রাহ্মণ্যের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া "নেদং যদিদমুপাসতে" বলা ব্রাহ্মণের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে (সে কালেও সেরূপ উক্তির প্রয়োজন ছিল, এ কালেও সে প্রয়োজন একেবারে উড়িয়া যায় নাই) সেই হিসাবে আমি আপনার আলোচনা নিবিষ্টমনে পাঠ করিয়া থাকি—তাহাতে ভাব পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। * * *" (পত্রের শেষার্দ্ধ হইতে উদ্ধৃত)।

উপসংহারে বক্তব্য যে দুর্ভাগ্যবশতঃ সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ও সমাজের পক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতি পক্ষের আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার লোক দিন দিনই বিরল হইয়া পড়িতেছেন—অযোগ্য হইলেও এ সময় স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে পিতৃ পিতামহের ধর্ম্ম ও সমাজের অনুকূলে, বিশেষতঃ বিপক্ষের প্রতিকূলে, দুচারি কথা না বলিয়া উদাসীন থাকা কাপুরুষতা মনে করি। ইহাতে যদি প্রতিপক্ষের কটূক্তির আঘাত সহ্য করিতে হয়, তাহাতে প্রস্তুত আছি; কেবল বলিব, ভাই, Strike but hear—মারো কিন্তু শুন।

তাহা তদীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে পড়িয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। এগুলি পূর্ব্বে পাইলে তাঁহার প্রবন্ধের হয়তো কিঞ্চিৎ রূপান্তরও হইত।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

ক। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়।

"সাহিত্য" পত্রে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মদীয় প্রবন্ধাবলী * প্রকাশিত হইবার পরে "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ মহোদয় ঐ বিষয়ে 'ব্রাহ্মণসমাজে'ও কিছু লিখিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাঁহার সেই অনুরোধ বশতঃ লিখিত হইল। বলা বাহুল্য যে ইহা "সাহিত্যে" প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর কেবল পুনরাবৃত্তি বা সারসংক্ষেপ মাত্র নহে; ইহাকে ঐ গুলির "পরিশিষ্ট" বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। †

পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নাম রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনচরিত, 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থেই উল্লেখিত হইয়াছে। তিনি পরমহংসদেবের সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। চূড়ামণি মহাশয় একজন শাস্ত্রদর্শী ধর্ম্মবক্তা ও সাধনাসম্পন্ন ব্যক্তি; অথচ পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধানুরাগও যথেষ্ট ছিল—নচেৎ তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেই বা তিনি যাইতেন কেন?

---

* "সাহিত্য" ১৩২৭ সাল পৌষ-মাঘ ও ফাল্গুন-চৈত্র" ১৩২৮ সাল বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, পৌষ ও মাঘ; এই সংখ্যাগুলি (অর্থাৎ এই গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং প্রথম পরিশিষ্ট) দ্রষ্টব্য।

† ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ গুলির যে সকল কথার পুনরুল্লেখ হইয়াছে—সে সব বাদ দিতে পারিলে ভাল হইত; কিন্তু পরবর্ত্তী দুইটি প্রবন্ধ (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট খ ও গ) এই প্রবন্ধেরই প্রতিবাদের সমালোচনা হওয়াতে, ইহার অঙ্গহানি করা হইল না—কেননা তাহা হইলে ঐ দুই প্রবন্ধ অনায়াসে বোধগম্য হইত না। আশা করি সুধী পাঠকগণ এই পুনরুক্তি দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

পরমহংসদেবের প্রতি আমারও ছাত্রাবস্থা হইতেই ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব রহিয়াছে; "ব্রাহ্মণ সমাজে" ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত "শঙ্কর নাথ" প্রবন্ধ হইতে তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

চূড়ামণি মহাশয় আজ ৪ চারি বৎসর হইল গৌহাটীতে আসিলে, তিনি ৺ পরমহংসদেবকে দেখিয়াছেন—তাঁহার নিকট হইতে পরমহংসের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিব, এই মনে করিয়াই তদ্বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—তন্মধ্যে একটী এই ছিল যে পরমহংস তাঁহাকে "চাপরাশ" আছে কি না, * ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি না। চূড়ামণি মহাশয় চাপরাশের কথা একেবারেই অস্বীকার করেন। অথচ ৺পরমহংসের জীবনচরিত লেখক ৺রামচন্দ্র দত্ত, কথামৃতকার শ্রীম, এবং লীলাপ্রসঙ্গ লেখক স্বামী সারদানন্দ সকলেই ঐ 'চাপরাশ' সম্বন্ধীয় কথা হইয়াছিল, বলিয়াছেন। চূড়ামণি মহাশয়ের ঐ কথা "সাহিত্য" পত্রে (১৩২১ পৌষ মাঘ সংখ্যায়) প্রকাশিত হইলে তৎপ্রতিবাদচ্ছলে একজন লিখিয়াছিলেন যে 'চাপরাশের' কথা যিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু প্রতিবাদকারীর এটা একটা ধাপ্পাবাজী মাত্র, নচেৎ এই সাক্ষীটির নাম ধাম প্রকাশ করিয়া দিয়া তথ্যানুসন্ধানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন †—আমরাও দেখিতাম চূড়ামণি মহাশয়ের কথা বিশ্বসনীয় কি উঁহাদেরই কথা প্রত্যয়যোগ্য। এদিকে যেদিবসের সাক্ষাৎকার সময়ে পরমহংস একথা চূড়ামণি মহাশয়কে

* রামচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন—চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন "হ্যাঁ গা তুমি যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ, তোমার "চাপরাশ" আছে?" রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী ৪৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† প্রতিবাদীর উত্তরে "সাহিত্য" ১৩২৮—মাঘ সংখ্যায় [প্রথম পরিশিষ্ট ক] এতাদৃশ মন্তব্য করা হইলেও অদ্যাপি তিনি তাঁহার সাক্ষীর নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই।

বলিয়াছিলেন বলিয়া ৺রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ দিনকার সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেদব্যাস' পত্রের ২য় খণ্ড (১২৯৪ অব্দ) ১০ম সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—তাহাতে 'চাপরাশে'র নামগন্ধও নাই,—অথচ ঐ সাক্ষাৎকার ভূধর বাবুর বাড়ীতে হইয়াছিল এবং তিনি ঐ স্থানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনকার বিবরণী লেখকদের মধ্যে ভূধর বাবুই আদি এবং অকৃত্রিম বলিয়া আমার বিশ্বাস। ফলতঃ একজনের বাড়ী গিয়া (চূড়ামণি মহাশয় তখন ভূধর বাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন) তাঁহাকে "চাপরাশ" আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাটা অস্বাভাবিক ও অতি অভদ্রতা; ৺পরমহংস তাদৃশ অভদ্র ছিলেন না। তবে তদীয় জীবনচরিতকার ও 'কথামৃত' 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি রচয়িতৃগণের ৺পরমহংসদেবকে বাড়াইবার জন্য অন্যকে লঘুকৃত করাটা এই নূতন নহে—ইহা তাঁহাদের অভ্যস্ত কার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর একখানি জীবনচরিতে আছে—"... ... পরমহংসদেবের জীবনী লেখকের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সহিত গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মবিষয়ে কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া অযথা কল্পনা ও অশোভন উক্তির প্রশ্রয় দান করিয়াছেন। এতৎ প্রসঙ্গে গোস্বামীপ্রভু পুরীধামে অবস্থানকালে একদিন বলিয়াছিলেন—'আমার ও পরমহংসদেবের মধ্যে সময়ে সময়ে ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক যে সকল গূঢ় কথোপকথন হইত, তাহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ করিবারই অধিকার ছিল না। তাঁহারা (জীবনীলেখকেরা) তাহা কি প্রকারে বুঝিতে সক্ষম হইবেন?' ['গোস্বামীপ্রভুর শ্রীমুখাৎ শ্রুত।']" *

"লীলাপ্রসঙ্গ"কার তো উদ্দাম কল্পনাবলে লিখিয়াছেন যে চূড়ামণি

---

* শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনা ও উপদেশ—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনগুপ্ত প্রণীত—তৃতীয় সংস্করণ ২১৯ পৃষ্ঠা।

এই কুসংসর্গবশতঃ নামিয়া পড়ার বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তাঁহার ভক্তেরা অবতার মনে করেন—আমরা অবশ্য তাহা করি না। কিন্তু অবতার হউন আর না হউন—তিনি যে একজন সাধুব্যক্তি ছিলেন তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। পূর্ব্ব জন্মের অশেষ সুকৃতিবশতঃ বাল্যাবধি তাঁহার প্রাণের টান শ্রীভগবানের প্রতি পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার মস্তিষ্ক ও হৃদয় কোমল হওয়াতে তিনি সহজেই ঐগুলি ভগবদভিমুখ করিতে পারিয়াছিলেন—ভক্তের হৃদয় কোমল না হইলে তাহাতে ভগবদধিষ্ঠান কিরূপে সম্ভবে? যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভের জন্য তিনি ব্যাকুলচিত্তে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন—ধ্রুবের মত একাগ্রতা সহকারে ভগবদ্দর্শনের জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল—তাই সদ্গুরুলাভ করিয়াছিলেন, উত্তম উত্তর সাধক পাইয়াছিলেন—সাধন-ভজনের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেই চলিয়াছিলেন। জীবনের প্রৌঢ়াবস্থায় ৺ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়—কেশববাবুরাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে সাধারণ্যে পরিচিত করিয়াছিলেন। পরন্তু প্রায় তখন হইতেই কু-সংসর্গও আরম্ভ হইল। এখানে 'কু' অর্থে চরিত্রহীন লোক যেন কেহ না বুঝেন। বরং ইহারা অনেকেই সরল ও সচ্চরিত্র এবং সুশিক্ষিতও ছিলেন। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা পাশ্চাত্য রীতিতে হওয়াতে ইহারা প্রায়শঃ সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্যক্ অপ্রবিষ্ট ছিলেন এবং জীবনে অপর কোনও খাঁটি সাধু সন্ন্যাসীও বোধ হয় দেখেন নাই। তাই পরমহংসদেবের অবস্থা দর্শনে এবংবিধ ব্যক্তিরাই তাঁহাকে 'অবতার' বলিয়া প্রচারিত করিতে লাগিলেন। যাঁর বর্ণজ্ঞানও ছিল না বলিলেই হয়—যাঁর রাণিরাসমণির কৈবর্ত্ত ঠাকুরবাড়ীতে পূজকের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—তাঁহার নিকটে আসিয়া সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ বহু

ঘরের ছেলেরা সব স্তবস্তুতি করিতে লাগিল—ইহাতে তিনি যে সম্পূর্ণ বিগড়িয়া যান নাই—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা চোখের সামনে দেখতেছি—যাঁহারা পদে পদার্থে, ধনে মানে, শিক্ষা দীক্ষায়, সমাজের শিরোভূষণ এমন সব লোকও "তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু" বাদীদের খপ্পরে পড়িয়া সুনাম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার অপার করুণার পাত্র—তাঁহার এই সাংসারিক অভিজ্ঞতাশূন্য সরল প্রকৃতির ছেলেটির পা পিছলিয়াছিল *—কিন্তু তিনি তাঁহাকে একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইতে দেন নাই—তবে কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক অবনতি ও দৈহিক যন্ত্রণা ভোগাইয়া পরিশেষে তাঁহার ক্রোড়ে স্থানদান করিয়াছিলেন।

এই যে 'স্তবস্তুতি' বা 'অবতার' খ্যাপন—এতদ্দ্বারা পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক অবনতির কতকটা লক্ষণ তাঁহার শেষ জীবনে—বৎসরের খবর আমরা 'কথামৃত' প্রভৃতি হইতে পাই—দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় 'সাধুর লক্ষণ কি ?' এ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ—

"সাধু যিনি তিনি আত্মপ্রশংসা করেন না, পরনিন্দা করেন না, আঘাত দিয়া কথা বলেন না, কাহাকেও নিজের মতে টানিতে চেষ্টা করেন না, কোনও প্রকার বুজরুকি দেখান না, সাধুরা মনগড়া কথা কাহাকেও

* লাওনাইজ্ (Lionize) করিয়া লোকে স্কটলণ্ডের খ্যাতকবি বার্ণস্ (Burns) এর অনিষ্ট করিয়াছিল—কারলাইল তদীয় "হিরো ওয়ার্শিপ" (Hero worship) গ্রন্থে লিখিয়াছেন And yet alas, as I have observed elsewhere, these Lion hunters were the ruin and death of Burns. ... ... He could not get his Lionism forgotten, honestly as he was disposed to do. ... ... Richter says, in the island of Sumatra there is a kind of 'Lightchafers', large fireflies, which people

বলেন না, শাস্ত্র ও সদাচারের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া কথা বলেন, এবং তিনি প্রাণ গেলেও কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না। সাধু সর্ব্বদা সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন" (৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশ—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন গুপ্ত প্রণীত—১৪৩ পৃষ্ঠা) পরমহংস দেবের মধ্যে এই লক্ষণগুলির কোনও কোনওটির ব্যত্যয় আমরা "কথামৃত" ইত্যাদিতে দেখিতে পাই। পরমহংস হাজরাকে উপদেশ দিবার সময় অবশ্যই বলিয়াছেন "কারো নিন্দা করো না—"* তথাপি হাজরা বেচারার নিন্দায় তিনি ও ভক্তগণ সকলেই পঞ্চমুখ ছিলেন। স্বয়ং কথামৃতকারও ছাড়েন নাই—হাজরার অপরোক্ষে বলিয়াছিলেন "হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র্ ফড়র্ করে বকে, চুপ না কর্‌লে কিছু হবে না।" কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২৩০ পৃঃ।

হাজরা বরং অন্তরঙ্গ ব্যক্তি; আদি সমাজের আচার্য্য, ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের ছাত্র, এমন কি যে শম্ভুমল্লিক একজন 'রসদদার' ছিলেন তিনিও নিন্দার বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। (কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২১০ পৃঃ, ২৩৯ পৃঃ ২৪০ পৃঃ, যথাক্রমে দ্রষ্টব্য)। এও বরং মার্জ্জনীয়; লীলাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বীয় গুরু তোতাপুরীর দোবোদ্‌ঘাটনের কথাও আছে—এবং তাঁহাকে যে 'শ্যালা' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন—এটাও উল্লেখিত আছে। (গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ অষ্টম অধ্যায় ২৬১-২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) গুরুকে খাটো করিয়া নিজের বড়াই দেখানো কতদূর অধোগতির পরিচায়ক

---

stick upon spits and illumine the ways with, at night. ... ... Great honour to the firefly! But—"

একথাগুলির অনেকটা কি পরমহংসদেব বিষয়ে প্রযোজ্য হয় না? বার্ণসের সঙ্গে পরমহংসদেবের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও কিছুটা দেখা যায়।

* হাজরার অভ্যাস ছিল অপ্রিয় কথা বলা; পরমহংসদেবকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন, ধনীর ছেলে দেখে সুন্দর ছেলে দেখে তুমি ভালবাস। (কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২৩৯ পৃঃ।)

লীলাপ্রসঙ্গকারের সে বোধটুকু থাকিলে তিনি উহা (যদি সত্যই হয়) চাপিয়া যাইতেন; তা' তো করেনই নাই, বরং ইহার উপর অবতারত্বের বনিয়াদ গাঁথা হইয়াছে!

আঘাত দিয়া কথা বলা—তথা শাস্ত্র ও সদাচারের সঙ্গে মিল না রাখিয়া কথা বলারও একটি উদাহরণ দিতেছি।

অধরবাবু জাতিতে সুবর্ণবণিক্। তাঁর বাড়ীতে পরমহংস সশিষ্য নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন।

"মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ—মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়কে ঠাকুর বলিতেছেন 'কি গো, তোমরা খেতে যাবে না?' তাঁহারা বিনীতভাবে বলিতেছেন "আজ্ঞা, আমাদের থাক্।" শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) এঁরা সবই কচ্ছেন শুধু ঐটেতেই সঙ্কোচ। * একজনের শ্বশুর ভাসুরের নাম হরি, কৃষ্ণ, এই সব। এখন হরিনামতো কর্‌তে হবে? কিন্তু হরে কৃষ্ণ বলবার যো নাই। তাই সে জপ কচ্ছে—

ফরে ফৃষ্ট ফরে ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে।

ফরে রাম ফরে রাম রাম রাম ফরে ফরে।।"

কতদূর নামিলে এরূপ কথা একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা সাধুর মুখ হইতে বাহির হইতে পারে, তাহা কথামৃতকারের না বুঝিবারই কথা। কেননা তিনি ইতঃপর বলিতেছেন "অধর জাতিতে সুবর্ণবণিক্। তাই ব্রাহ্মণ ভক্তেরা কেহ কেহ প্রথম প্রথম তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিছুদিন পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, তখন তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল।" (কথামৃত ৪র্থ ভাগ—১৫০ পৃঃ)

---

* পাঠকবর্গ মনে করিবেন না যে এই মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় নিতান্ত দুরাচার ছিলেন। কথামৃতের চতুর্থভাগ ২৩১ পৃষ্ঠায় ভাইটি বড় বেশ সরল, একথা বলা হইয়াছে—তবে ছোট ভাইটিকে 'কৃপণ' বলিয়া একটু নিন্দা করা হইয়াছে, এইমাত্র। তাহা হইলে 'এঁরা সবই কচ্ছেন' এরূপ উক্তি কেন?

এখানে বলা আবশ্যক যে ৺রামচন্দ্র দত্তকৃত পরমহংসদেবের জীবন-চরিতেআছে (এবং তাহা আমি পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় ১ম প্রবন্ধে উদ্ধৃতও করিয়াছি)—"তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্র ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতিলাভ করিতেন; কিন্তু এরূপ স্থলে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন।" ইহার সঙ্গে কথামৃতের উপরি উদ্ধৃতাংশের সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে অধরের বাড়ীতে ভোজন তাঁহার শেষ অবস্থার ঘটনা—তখন সঙ্গদোষে তিনি "সব-লোট" হইয়া পড়িয়াছিলেন; কেননা তখন যাঁহারা তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরূপে যুটিয়াছিলেন—তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ফেরতও কেহ কেহ ছিলেন—তাঁহারা প্রায়শঃ শাস্ত্রাচারে পরাঙ্মুখ ছিলেন। * সে যাহা হউক "প্রমাদাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি"—এই শাস্ত্রবাক্যের প্রতি ঔদাস্যের ফল পরমহংস (পীড়াগ্রস্ত হইয়া) ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দের (এবং তদুপলক্ষে পরমহংস দেবের শিষ্যশাখায়) বিষয়ে আলোচনা করিব। সর্ব্বপ্রথমে ৺রামচন্দ্র দত্তই বিস্তারিতভাবে পরমহংসের জীবনচরিত ও উপদেশাবলী প্রচার করেন—যদিও তৎপূর্ব্বে অপর কেহ কেহ সামান্য ভাবে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বাবুর লেখার দ্বারা পরমহংসের নামযশঃ খুবই বিস্তৃত হয়। তিনি বোধ হয় সর্ব্বাদৌ পরমহংসকে 'অবতার' বলিয়া খ্যাপিত করেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ যখন হঠাৎ চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসম্মিলন সভাতে বক্তৃতা দিয়া কীর্ত্তিমান্ হইয়া পড়িলেন, তখন হইতেই তাঁহার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম

* অবশ্য সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতিবিচার না থাকিলেও, তাঁহারা যত্রতত্র ভোজন করিয়া আধ্যাত্মিক পাতিত্যপ্রস্ত হইবেন এটাও সদাচারানুমোদিত নহে। শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

ভারতময়—এমন কি পৃথিবীময় সুপ্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারাও পরমহংসের নাম জনসাধারণের মধ্যে খ্যাপিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়া কেবল যে নিজে যশস্বী হইয়াছিলেন এমন নহে—হিন্দুধর্ম্মের একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা বেশ কৃতিত্বসহকারেই তিনি ঐ সভায় সমবেত পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে করিয়া ছিলেন—তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের খৃষ্টান অধিবাসীদের নিকটে হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ব্যাপারে তিনি, স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি বক্তৃতা শক্তি প্রভৃতি দ্বারা, বিশিষ্ট অধিকারী হইলেও, এই দেশে সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকটে ধর্ম্মব্যাখ্যায় তিনি শাস্ত্রসম্মত অধিকারী ছিলেন না, একথা বলিতেই হইবে।

ধর্ম্মময় মহাক্রমের 'মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ" অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্, তন্নিঃশ্বসিত স্বরূপ বেদ (এবং বেদমূলক শাস্ত্রজাত) ও বেদজ্ঞ শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণ—এই তিনের উপরেই সনাতনধর্ম্মের ভিত্তি। ভগবত্তত্ত্ববেত্তা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণই "আপনি আচরি ধর্ম্ম" জগৎকে শিক্ষা দিবেন—তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

আজকাল কলির প্রভাবে ঈদৃশ ব্রাহ্মণ বিরল হইয়া পড়িয়াছেন সন্দেহ নাই; তবে ষোল আনা না হউক কিয়ৎ পরিমাণে তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এখনও আছেন—এবং তাঁহারাই সনাতনধর্ম্ম প্রচারের অধিকারী। গায়ের জোরে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিবিশেষ সন্ন্যাসীর উপাধি ও পোষাক নিয়া অপরকীয় শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলে

যাহা প্রচারিত হইয়া থাকে—তাহা হয়তো আজকালকার ধর্ম্মোপদেশ-বিহীন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত ধর্ম্মাচারবিহীন ব্যক্তিগণের নিকট উপাদেয় হইতে পারে—এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশীয় লোকের কাছেও বেশ বিকাইতে পারে; কিন্তু এদেশের যাঁহারা সদাচারনিষ্ঠ যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি, তাঁহাদের নিকটে, উহা অকিঞ্চিৎকর—এমন কি অনিষ্টসূচক বলিয়াই প্রতীত হইবে।

বিবেকানন্দের জীবনচরিত হইতে আমরা জানিতে পারি যে আবাল্য তিনি হিন্দুচিত আচারের অপক্ষপাতী ছিলেন—তাঁহার পিতাও নাকি আচার বিষয়ে বিচারশীল ছিলেন না। পঠদ্দশাতেই বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, ৺ কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় বক্তা হইবেন এরূপ আকাঙ্ক্ষাও পরিপোষণ করিতেন। পরমহংস-দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও আচারে ব্রাহ্ম-ভাবের বিশেষ কোনও ব্যত্যয় দেখা যায় নাই; এমন কি গান করিতে বলিলেও তিনি প্রায়শঃ 'ব্রহ্মসঙ্গীত'ই ধরিতেন। যখন তিনি পরমহংসদেবের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেন তখন পরমহংসের নামযশঃ কেশবচন্দ্র প্রভৃতির দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ প্রশংসাবাক্যকে বিষবৎ ভাবিয়া পরিহার করিবে। বিশেষতঃ, যিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহার পক্ষেতো এসব অতীব হেয়। তাই পরমহংসের সে সময় অবধি অবনতির সূত্রপাত ঘটে—এবং বিবেকানন্দ প্রভৃতির সমাগমে ঐ অবনতির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে—সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বিবেকানন্দ কায়স্থ (অর্থাৎ সৎশূদ্র) হইলেও (অধিকার বিহীন হইয়াও) সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সমাজে আজকাল যে সব 'বাবু-সন্ন্যাসী' (বা সন্ন্যাসী সাহেব) দেখা যায় তাঁহাদের আদর্শ অনেকটা বিবেকানন্দই ঘটেন—যদিও তাঁহার পূর্ব্বেও তাদৃশ সন্ন্যাসী কেহ ছিলেন না একথা

বলা যায় না। সে যাহা হউক বিবেকানন্দ ঘোরতর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন—শাস্ত্রগুলিও ব্রাহ্মণ-প্রণীত বলিয়াই তাঁহার নিকট হেয়রূপে পরিগণিত হইত। * তাই তিনি শাস্ত্রের বিধিনিষেধের ধার ধারিতেন না; যে ধর্মে খাদ্যাখাদ্যের বিচার আছে, তাঁহার নাম 'হাঁড়ি-ধর্ম'—যাহাতে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিধান আছে, তাহার নাম "ছুঁৎমার্গ"। ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষায় একেই লোক শাস্ত্রাদেশ পালনে পরাঙ্মুখ, ইহার উপর এ সকল "সন্ন্যাসী"—"অবতার" বিশেষের দোহাই দিয়া—এরূপ সব কথা বলিলে সহজেই লোকের—বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ যুবকদিগের—চিত্তাকর্ষণ হইবার কথা। ফলতঃ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্মের এ ভাবেই বহুতর অনিষ্ট ঘটিতেছে।

সে যাহা হউক বিবেকানন্দই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন বটে, কিন্তু পরমহংসের উক্তিসমূহ হইতে আমরা তাঁহার যাদৃশ উপদেশ লাভ করি, বিবেকানন্দ (এবং তাঁহার দল) অনেক ব্যাপারেই তদন্যথা আচরণ ও প্রচার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে বিবেকানন্দের কীর্ত্তি 'রামকৃষ্ণ মিশন' সম্বন্ধেই বলিতেছি। পরমহংস শম্ভুমল্লিককে বলিয়াছিলেন "... ... এটা যেন মনে থাকে যে তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ; হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করা নয়। * * ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু; তাঁকে লাভ হইলে আবার বোধহয় তিনিই কর্ত্তা আর আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভহ'লে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি হইতে পারে।" কথামৃত ১ম ভাগ

* বিবেকানন্দের অভিধানে ব্রাহ্মণের প্রতিশব্দ ছিল "দুষ্ট পুরুত"; তিনি মাদ্রাজী শিষ্যের নিকট পত্রে লিখিয়াছেন "দুষ্ট পুরুতগুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে এত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাতেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্ছে।" পত্রাবলী ১ম ভাগ ৪১ পৃষ্ঠা।

১২৭ পৃঃ। পরন্তু বিবেকানন্দ করিলেন রামকৃষ্ণ 'মিশন' (মিশন শব্দটাও লক্ষ্যের বিষয়), যাহাতে প্রধানতঃ "হাসপাতাল ডিস্পেন্‌সারি"র কার্য্যই হইতেছে। এই 'মিশন' খ্রীষ্টানদের অনুকরণে অনেকটা মুক্তি-ফৌজের ধরণে স্থাপিত—যদিও বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দ-মঠের'ও যেন কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। উদ্দেশ্য খুবই মহৎ, সন্দেহ নাই; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার দ্বারা সামাজিক অনিষ্ট এই হইতেছে যে, অপরিণতবয়স্ক বালকগণ মাতা পিতা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিতেছে। ইংরেজী একটা কথা আছে—Charity begins at home: আগে স্বগৃহের অভাব দূর কর—তারপর পরোপকার করিও। পরন্তু আমি জানি, যে ছেলেটিকে বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন মনে করিয়া কষ্টেসৃষ্টে পিতা লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন, যে বিবাহ করিয়া বংশধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে ভাবিয়া পিতামাতা ভরসা করিতেছিলেন—সে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়া ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়া গেল!! যাঁহারা পুরাণে কৃতবোধের উপাখ্যান পড়িয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে যোগযাগ তপস্যাদি অপেক্ষাও মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা আধ্যাত্মিক সমাধিকউন্নতি সাধিত হয়। গৃহস্থ আপনার কর্ত্তব্য করিয়া অবশ্যই সাধ্যানুসারে পরের উপকার—সমাজের হিতসাধন করিবেন; এবং আমাদের সমাজবন্ধন যে ভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি স্বতঃই হইয়া থাকে। ছেলে জন্মিল, জনক জননীর ন্যায় জ্ঞাতিদেরও জননাশৌচ হইল; পিতা মরিলেন, পুত্রের ন্যায় জ্ঞাতিদেরও মৃত্যাশৌচ হইল—দহন বহনাদি করুন আর নাই করুন। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কেহ মরিলে সকলে মিলিয়া বহন করিয়া শবদেহ শ্মশানে লইয়া দাহকরা হয়—শ্রাদ্ধে সকলে সহায়তা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করে। তখন বৈষয়িক বিবাদ বিসংবাদ থাকিলেও ঐ সব ভুলিয়া একে অন্যের সাহায্যে রত হয়।

এ কেবল জাতির মধ্যেই যে তাহা নয়; ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই আপদ্‌বিপদে পরস্পরের সহায়তা করা সমাজের লোকের একটা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। তবে এখন ক্রমশঃ ধর্ম্মলোপ বশতঃ সমাজ পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটাতে কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব দেখা যাইতেছে। অতএব দেখা গেল, পরোপকার আমাদের সমাজের মজ্জাগত ভাব—সে ভাব বর্দ্ধিত করিতে গেলে ধর্ম্মভাব যাহাতে বাড়ে—শাস্ত্রে বিশ্বাস, পিত্রাদি গুরুজনে ভক্তি, সদাচার পরিপালন ইত্যাদি যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় হয়—তদর্থে যত্ন করাই স্বধর্ম্ম পরায়ণ সমাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা তাহা হইতেছে কি? বরং অনধিকারে সন্ন্যাস গ্রহণ অথবা বিবাহ না করিয়া আশ্রমবিরোধী আচরণ ইত্যাদি দ্বারা সমাজের অনিষ্টই সাধিত হইতেছে। মিশনের যুবকদলের অনেককেই চা চুরুট মৎস্য মাংস ইত্যাদি ব্রহ্মচর্য্যবিরুদ্ধ জিনিসের উপভোগ করিতে দেখিয়া উঁহাদের জীবনের পরিণাম শুভ হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে।

দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন মহামারী ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সময়ে মিশনের দ্বারা উপকার যথেষ্ট হইয়াছে; এসকল নৈমিত্তিক উপদ্রবের সময়ে যাহাতে আপামর সকলেই পরস্পর সহানুভূতি দেখাইয়া যথাসম্ভব সহায়তা করিতে প্রস্তুত হয় তজ্জন্য সমাজের লোকদিগকে প্রস্তুত করা উচিত। তজ্জন্য একটা "মিশন" করিয়া তাহাতে যুবকদিগকে আপনাপন সমাজের ও পরিবারের ক্রোড় হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইবে ইহার কোন অর্থ নাই; এবার উত্তর বঙ্গে জলপ্লাবনে যেভাবে লোক-সাধারণ সহায়তা করিয়াছে—তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে একটা 'মিশন' এতদর্থে অনাবশ্যক। * সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসভাজন একজন মাত্র মহাপ্রাণ ব্যক্তি—তিনি অশ্বিনীকুমার দত্তই হউন বা স্যার প্রফুল্লচন্দ্রই হউন—উদৃশ

* বরং রামকৃষ্ণমিশন এবার (১৩২৯ সালে) সুনামও রাখিতে পারে নাই। সম্পাদক "ইংলিশম্যান" পত্রিকায় যে পত্র ছাপাইয়াছেন তাহাতে অনেকেই মিশনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন।

বিপৎকালে দাঁড়াইলেই তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া শতসহস্র ব্যক্তি সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইবে—তজ্জন্য কায়েমী ব্যবস্থার—মিশন ইত্যাদির—কোনও প্রয়োজন নাই।

বস্তুতঃ বিবেকানন্দ ধর্ম্মপ্রচারক অপেক্ষা রাজনীতির প্রচার কার্য্যের সমধিক উপযুক্ত ছিলেন—সে দিকে কিছুটা কাজও তিনি করিয়াছেন বলা যায়। তাঁহার প্রকৃতিতে সাত্ত্বিকতা অপেক্ষা রাজসিকতাই প্রবল ছিল; ইহার প্রমাণ স্বরূপ তদীয় জীবনচরিত, পত্রাবলী ও বক্তৃতা হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে—কিন্তু তাহা হইলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কৌতূহলী পাঠক "সাহিত্য" পত্রে তৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী * পড়িয়া দেখিতে পারেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পরে যাঁহাদের নাম ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাহাত্ম্যখ্যাপনকারিগণের মধ্যে গণনীয়, তন্মধ্যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের লেখক গুপ্তনামা 'শ্রীম—' সর্ব্বাদৌ উল্লেখ যোগ্য।

কথামৃতকার শ্রীম—মহাশয় শুনিয়াছি একজন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু তিনি যে একজন চতুর চূড়ামণি তাহা এই কথামৃতের প্রকাশপদ্ধতি হইতেই অনুমিত হইতেছে। তিনি ১৮৮১ কি ৮২ খৃষ্টাব্দে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখেন ও তদবধি তাঁহার সঙ্গে যখনই একত্র হইতেন তখনই যাহা যাহা দেখিতেন বা শুনিতেন নোট্ করিয়া রাখিতেন। তিনি এই কথা নিজগ্রন্থেই বলিয়াছেন। প্রথম হইতেই ৺রামকৃষ্ণ যে একজন অবতার বিশেষ তাহাও বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার কথাগুলিও যে অমৃতবৎ লোকের প্রিয় ও হিতজনক ইহাও

* সাহিত্য ১৩২৭—ফাল্গুন চৈত্র যুগ্মসংখ্যা। ১৩২৮ বৈশাখ হইতে শ্রাবণসংখ্যা (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ) [শ্রাবণ সংখ্যায় প্রতিবাদ আছে, তাহার উত্তর ঐ সালেরই (১৩২৮) পৌষ সংখ্যায় (এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্ট—খ তে) দ্রষ্টব্য।

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—নতুবা নোট্‌ করিবেনইবা কেন? এস্থলে লক্ষ্যের বিষয় এই যে, পরমহংসের জীবিতকালে যদিও অনেকে তাঁহার উক্তি ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন,—এই শ্রীম—মহাশয় তাঁহার সঞ্চিত অমৃতভাণ্ড গুপ্তধনের ন্যায় অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন। যদি তখন তিনি কথামৃত প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিতেন—একদিনের ঘটনা পরদিন বা কিছুদিন পরে কোন পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেন, তাহা হইলে অমৃত-পিপাসু আমরা অনেকে ৺পরমহংসের সান্নিধ্যলাভে লোলুপ হইয়া দক্ষিণেশ্বর ইত্যাদিতে গমন করিতাম—ভক্তসংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইত। এদিকে যাঁরা কিঞ্চিৎ চক্ষুষ্মান্—বিনা পরীক্ষায় কোনও কিছু গ্রহণ করিতে নারাজ, তাঁরাও একটু নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতেন কথাগুলিতে সত্য কি পরিমাণ আছে—যেমন এই লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া 'চাপরাশ' সম্বন্ধীয় কথার তথ্যানির্ণয় করিতে পারিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আর একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম জয় মুখুয্যে জপ করছে কিন্তু অন্যমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম।" কথামৃত ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৩য় পৃষ্ঠা)।

এই কথা ১৮৮২।১৬ই অক্টোবর তারিখের। ইহার কিছুদিন পরেই যদি এটা প্রকাশিত হইত, অনুসন্ধিৎসু পাঠক ব্যাপারটা ঠিক্ কিনা "জয় মুখুয্যে"কে জিজ্ঞাসা করিতেন। কেননা তখনও "জয় মুখুয্যে" জীবিত ছিলেন। ইদানীং যে সকল ব্যক্তি ইহা পাঠ করেন এবং "জয় মুখুয্যে"কেও চিনিতেন, তাঁহারা এটা অসম্ভব মনে করেন। জয় মুখুয্যে বরাহনগরের ঘাটেই বা কেন জপ করিতে যাইবেন? আর তাঁহাকে চাপড় মারিয়া কেহ যে আস্ত শরীরে পার পাইতে পারিয়াছে—এটা নিতান্তই অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়। *

* তথ্যানুসন্ধানার্থ ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত (ইদানীং স্বর্গত) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরকে চিঠি লিখিয়াছিলাম।

তার পর যাহা তিনি ৺পরমহংসের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত করিতে-ছেন তাহাও তারিখওয়ারি ধারাবাহিকরূপে করিতেছেন না। প্রথম ভাগের (দ্বাদশ খণ্ডে) ১৮৮৪ অব্দের কথা আছে—আবার ২য় ভাগের (প্রথম খণ্ডে) ১৮৮২ অব্দের কথা বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ। ইহাতে তিনি নিজের হাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা রাখিয়াছেন, প্রয়োজন মতে নূতন নূতন কথাও আবির্ভূত হইতে পারে—এইরূপই ধারণা জন্মে।

অপিচ সর্ব্বাদৌ যখন কথামৃত কোনও কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন গ্রন্থকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণকে অবতার-রূপে দেখাইবার তেমন প্রয়াস করেন নাই। এমন কি গ্রন্থকার যখন প্রথম কথামৃত পুস্তকাকারে ছাপাইলেন তখনও যথেষ্ট সাবধানই ছিলেন। প্রথম ভাগের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশ কালে, প্রথম সংস্করণের ৬ বৎসর পরে (১৩১৪ অব্দে), ভূমিকায় সাহসপূর্ব্বক লিখিলেন—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে তাঁহাকে চিন্তা করিলেই হইবে, আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি জগতের আদর্শ, তাঁহাকে চিন্তা করাই মুখ্যসাধন। আর সাধন যদি দরকার হয়, তিনিই সমস্ত করাইয়া লইবেন।" আবার ৪র্থ ভাগের প্রকাশ কালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) "পূজা ও নিবেদন" শীর্ষক ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"ভক্তদের জন্য এবারে একটি বিশেষ শুভসংবাদ আছে। ঠাকুর বলিতেছেন—'মা! এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়'। [২২২ পৃষ্ঠা] এই শুভ অঙ্গীকার-বাণী ভক্তদের যেন স্মরণ থাকে।"

উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন—"আমার ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আলাপ ছিল। তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। বরং তাঁহার সম্বন্ধে দক্ষিণেশ্বরে যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হয় নাই। আমার পিতা সম্বন্ধে তিনি বা অপর কেহ কোনও কথা বলিলে তাহাতে আমি সুখী বা দুঃখিত হই না—তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-স্বরূপ দেখিতাম।"

এই বাণী অবশ্যই গ্রন্থকার পরমহংসের জীবদ্দশায় শুনিয়াছিলেন—তখন প্রকাশ করিলে এতদিনে অনেকেই যে সিদ্ধ হইয়া যাইত! সিদ্ধ হইবার এই সোজা উপায়টা এতদিনের পর গ্রন্থকার প্রচার করিলেন—ইহাই পরম আক্ষেপের বিষয়!!

কি জানি, কেহ এই 'কথামৃতে' অবিশ্বাস করে, তাই এই ৪র্থ ভাগের (ইহাই আপাততঃ শেষ ভাগ) দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩২১ সালে), সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বেকার শ্রীশ্রী৺মার আশীর্ব্বাদ ছাপাইয়াছেন। মা লিখিয়াছেন "বাবাজীবন—তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোনও ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে আবশ্যক মত তিনি প্রকাশ করাইতেছেন। এ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। ... ... ২১শে আষাঢ় ১৩০৪।"

এতদিন পরে এই "সাফাই" উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজনেই বোধ হইতেছে, সন্দেহের বিশেষ কারণ থাকিতে পারে। 'কথামৃত' আদ্যন্ত যাঁরা পাঠ করিয়াছেন, তাঁরা কিন্তু কদাপি "শ্রীশ্রী৺মা"কে (অর্থাৎ পরমহংসদেবের পত্নীকে) ঐ সকল 'কথা'র মধ্যে উপস্থিত দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ, অথচ তাঁহার কাছ হইতে সার্টিফিকেট্ গ্রহণ করা হইয়াছে!!

পরন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কথামৃতের এই গুপ্তনামা লেখক একজন সুচতুর ব্যক্তি—অথচ সুশিক্ষিতও বটেন; তিনি গ্রন্থে পরমহংসের ভাষার যথাসম্ভব অনুকরণ করিয়া এবং কথোপকথন নাটকের রীতিতে সাজাইয়া বেশ স্বাভাবিকতাভাস প্রদর্শন করিয়াছেন—ইহাতে পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হয়—অমৃতে অনৃতের হলাহল কিঞ্চিৎ মিশ্রিত আছে কিনা মোহবশতঃ তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সামর্থ্যও লোপ পায়—

বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ যুবক পাঠকের পক্ষে। গ্রন্থকার যতই দেখিতেছে তাঁহার কথামৃত লোকে বেশ আগ্রহ সহকারে ও অবিচারে গ্র করিতেছে—ততই সাহসও পাইতেছেন, ক্রমশঃ অবতারত্ব খ্যাপনে মাত্রা বাড়াইতেছেন। †

কথামৃতকার তবুও অনেকটা রহিয়া সহিয়া এবং সাবধানতা অবল করিয়া কথা বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ লেখক একেব 'বেপরোয়া'—যাহা খুশী লিখিয়া গ্রন্থ বাড়াইয়াছেন—তথ্যানুসন্ধানে ধার যে বিশেষ ধারেন নাই, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি বিষয়ক পূ উল্লেখিত কথা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ দেবে অবতারত্ব খ্যাপনই তাঁহার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—এবং তাহা করি গিয়া জুগুপ্সিত বিষয়ের উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই—যথা রাম কর্তৃক গুরুর নিন্দাবাদ। রামকৃষ্ণকে অবতার বানাইতে হইবে—ত দীক্ষাগুরু তোতাপুরী, উত্তর সাধিকা ব্রাহ্মণী—ইঁহাদিগকে পর্য্যন্ত খা করিতে হইবে—পণ্ডিত শশধর ইত্যাদি তো পরের কথা! বিবেকবু বিশিষ্ট ব্যক্তি যে এরূপ কথায় রামকৃষ্ণের উপরেও বিরক্ত হই পারেন—এ বোধও এই 'লীলাপ্রসঙ্গ'কারের নাই। আমার তো বোধ এইরূপ লেখার দ্বারা রামকৃষ্ণ পরমহংসের যশোভাতি মলিন হইয়াছে গোঁড়ারা যাই কেন মনে করুননা।

তারপর রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় এই অভিনব অবতারের প্রচারক কেবল যে পুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন—এমন নহে, নানা উদ্ভট ছবিও ছাপাইয়াছেন; ফেরিওয়ালারতো অভাব নাই—নানা স্থা 'মিশন' বা সেবাশ্রম রহিয়াছে, উহাদের প্রধান কার্য্য এ সকল বি

† কথামৃত রচয়িতার অন্তর্য্যামিত্ব গুণও আছে, যথা—"মণি চুপ ক ভাবিতেছেন, ঠাকুর "সূর্য্যোদয়ের সূর্য্য" আর 'অচীনে গাছ' এই সব ব যা বল্লেন, এরই নাম কি অবতার? এরই নাম কি নরলীলা? ঠাকুর অবতার?" ইত্যাদি।

করা। এ যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ কি মহাদেব প্রভৃতির যে সব ছবি ডিজাইন করা হইয়াছে—তাহা তাঁহাদের লীলা বিশেষ অবলম্বনে—যেমন কালীয়-দমন বা মদনভস্ম। এমন কি শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ও গৌরাঙ্গের জীবনের ঘটনাবিশেষ অবলম্বনে ছবি প্রকাশ করিয়াছেন—যেমন নগর-সংকীর্ত্তন, অথবা সার্ব্বভৌম নিকটে ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রকাশ। পরন্তু এই রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় সঙ্গতি অসঙ্গতি এ সকলের ধার বড় ধারেন না—পরমহংসের কোনও জীবনচরিত বা 'লীলা'প্রসঙ্গে যে বিষয়ের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না—তাহা ছবিতে প্রকটিত করা হইয়াছে। তাদৃশ একটি ছবির বর্ণনা দিতেছি—ইহা সুবহুস্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। রামকৃষ্ণ যোগারূঢ় অবস্থায় বসিয়া আছেন, উপরে ওঁকারভেদ করিয়া হৃদ্‌হৃদ্‌বিলাসিনী শ্রীশ্রীশ্যামামূর্ত্তি বিরাজমানা; ভাবটি অতি সুন্দর সন্দেহ নাই, কেননা ইহাই রামকৃষ্ণের ধ্যেয়-মূর্ত্তি। কিন্তু তাঁহার দুই দিকে চারিটি মূর্ত্তি আছেন—একদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবতী (পার্ব্বতী) অপর দিকে রাধিকা ও মহাদেব। কৃষ্ণের বামহস্ত এবং রাধার দক্ষিণ হস্ত রামকৃষ্ণের মস্তকে সংস্থাপিত; ভগবতী * কৃষ্ণের পেছনে দাঁড়াইয়া স্বীয় হস্ত তাঁহার বাহুমূলে রাখিয়াছেন—এবং মহাদেব রাধার পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া তাঁহার [অর্থাৎ রাধার] বাহুমূল দুইটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন!

প্রথম কথা এই যে যোগের অবস্থায় সাধকের চিত্তবৃত্তি ইষ্টে বদ্ধলক্ষ্য হয়—তখন বস্ত্বন্তর তাঁহার ভাবনার বিষয়ীভূত হইতেই পারে না—কেননা, তাহা হইলে সাধক ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া

---

* প্রথমতঃ আমি 'ভগবতী'কে লক্ষ্মী ভাবিয়াছিলাম—কিন্তু কোনও বন্ধু আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দেন। কেননা, তাহা হইলে নারায়ণ লক্ষ্মীর অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট হইয়া পড়েন (নারায়ণের মাথা স্ত্রীমূর্ত্তির চিবুক স্পর্শ করিয়াছে)।

পড়েন। রামকৃষ্ণ অবশ্যই ওঁকার [ইহা কি শক্তি-বীজ ?] ভেদী স্বীয় ইষ্ট শ্যামামূর্ত্তিতে ধ্যানবদ্ধচিত্ত ছিলেন ; তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে অবশ্যই চিন্তা করেন নাই,—তাঁহারা তবে অনাহূতভাবে আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া কি ধ্যান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ? দ্বিতীয়তঃ, সাধকের মস্তকোপরি তো শিবশক্তি রহিয়াছেনই—তাঁহারা আবার তখনই আসিয়া রাধা ও কৃষ্ণের পেছনে দাঁড়াইলেন কিরূপে ? তৃতীয়তঃ আমাদের দেবীরা (বিশেষতঃ ভগবতী) সতীত্বের আদর্শ ভাবেই বর্ণিত—লীলাচ্ছলেও অপর পুরুষ-দেবতার গাত্র সংস্পর্শে কদাপি আসেন না—এই চিত্রে রাধা ও ভগবতীর এইরূপ বিড়ম্বনা প্রকৃত হিন্দুর নিকটে বড়ই আপত্তিজনক।* অথচ এই ছবি বেশ বিকাইতেছে। এই চিত্রটির নামকরণ হইয়াছে—"সিদ্ধিলাভ"; তাহা হইলে পরমহংসকে সহজ অবস্থায় চিত্রিত করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতির উপাস্য সমস্ত দেবদেবীকে—এমন কি খ্রীষ্ট ও মহম্মদকে পর্য্যন্ত—দণ্ডায়মান করাইলেই বরং শোভন হইত।

এ তো কল্পিত ছবি ; বিবেকানন্দের জীবনচরিতে আছে, আবাল্য তাঁহার কপালে একটা কাটার দাগ ছিল—গৌহাটিতে তাঁহার মৃত্যুর বছর খানিক আগে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম—ঐ দাগটিও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু বিবেকানন্দের কোনও ছবিতে এই দাগটা দেখা যায় না। এই সামান্য বিষয় হইতেই এতৎসম্প্রদায়ের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। *

ইঁহাদের বিশেষ পরিচয় "সাহিত্য"পত্রে মদীয় প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইবার সময়েও পাওয়া গিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধগুলিতে আমি নিজের বক্তব্য যথাসম্ভব সাবধানে বলিয়াছি—সমস্ত কথাই

* এই ছবির কল্পনাটি বিলাতী ঢং-এর ; সাহেবী সমাজে পরস্ত্রীকে বগল-দাবা করাটা নাকি শিষ্টাচার সম্মত !

পরমহংসদেবের তথা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত প্রভৃতি ঐ সম্প্রদায়ের লিখিত ও প্রচারিত গ্রন্থ হইতে স্থলবিশেষের নির্দ্দেশ ক্রমে প্রমাণিত করিয়াছি। ইহাদের পক্ষ হইতে যে সব প্রতিবাদ হইয়াছিল —তাহাতে যুক্তিতর্কের ভাগ অতি কমই ছিল—ছিল প্রভূতপরিমাণে বিদ্রূপ ব্যঙ্গ ও গালাগালি! 'সাহিত্য'পত্রে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হওয়াতে, ঐ পত্র 'বয়কট্' করার চেষ্টাও হইয়াছিল! 'সাহিত্যের' সম্পাদক মহাশয়ও, "আলোচনা ও বিচারের উদ্দেশ্যে" আমার প্রবন্ধাবলী ছাপাইয়াছিলেন; পরন্তু তিনি হতাশ হইয়া বলিয়াছেন, 'প্রতিবাদের ভঙ্গী দেখিয়া, গালাগালির বহর বুঝিয়া, সাহিত্যকে বয়কট্ করিবার আলোড়ন শুনিয়া বুঝিলাম, তাহা হইবার নহে। অতএব ... —র অশেষ পরিশ্রমজাত এই সংগ্রহ থাকুক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় সঞ্চিত। যদি আবার জীবন হয়—আবার মানুষ দেখা দেয়, তখন প্রকৃত উত্তর পাইব।" ইত্যাদি (সাহিত্য শ্রাবণ ১৩২৮—৩১৮ পৃষ্ঠা)

ফলকথা এই সম্প্রদায়ে প্রকৃত জ্ঞানী শাস্ত্রাভিজ্ঞ লোকের খুবই অভাব, অথচ গোঁড়ামি যথেষ্ট আছে। এদিকে নামে সন্ন্যাসী হইলেও চালচরিত্রে আহারাদিতে বিলাসী; ব্রহ্মচর্য্যেও চা চুরুট্ চলে; এইরূপ আদর্শে এদেশের তত্ত্বপিপাসু লোক কখনও আকৃষ্ট হইবে না। তবে বিলাতে বা আমেরিকায় গিয়া হিন্দুধর্ম্মের দু'একটা আধ্যাত্মিক কথা * শুনাইয়া দু'চারজন সাহেব বিবি চেলা করিলে এক শ্রেণীর লোকের

* আমেরিকায় বহুবর্ষ বেদান্ত (?) প্রচার করিয়া প্রত্যাবৃত্ত কোনও "আনন্দ"কে জনৈক বেদান্তবিৎ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি বেদান্তের কোন্ কোন্ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং উপদেশই বা কি দেন?" তদুত্তরে ঐ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—"এই—ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির অনুবাদ দু'একখানি বই পড়িয়াছি—আর 'ঠাকুর' (অর্থাৎ রামকৃষ্ণ) যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাই বেদ তাই বেদান্ত। আমরা তাই প্রচার করি।" ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

নিকট বাহবা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই,—পরন্তু প্রকৃত সমাজহিতৈষী কখনও ইহাতে ভুলিবেন না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে পরমহংসদেবের অথবা স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা তৎসম্প্রদায়ের দোষোদ্ঘাটনমাত্র করিবার জন্য এরূপ প্রবন্ধ প্রচার করিতে অধ্যবসায়ী হই নাই—পরন্তু এই সম্প্রদায়ের দ্বারা আমাদের সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধভাব প্রচারিত হইতেছে, তাই সমাজের জনগণের সাবধানতা বিধানার্থ এই প্রয়াস। কলির প্রাবল্যবশতঃ এতাদৃশ আরো দুই চারিটি সম্প্রদায় এই বঙ্গীয় সমাজে দেখা দিয়াছে ; তবে এই রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের ন্যায় ঐগুলি এখনও তেমন বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। আশাকরি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমাজ হিতৈষিগণ এসব অভিনব সম্প্রদায় কি ভাবে কতদূর অনিষ্টসাধন করিতেছে তাহা সম্যক্ অবধারণপূর্ব্বক সাবধান হইবেন—এবং যথাসম্ভব এই গুলির প্রশ্রয় দানে সর্ব্বথা বিরত থাকিবেন।

ব্রহ্মণ্যদেব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কল্যাণবিধান করুন এবং তদর্থে আমাদিগকেও সামর্থ্য প্রদান করুন।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

খ। "৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়"

প্রবন্ধের প্রতিবাদের সমালোচনা।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর কাব্যব্যাকরণ-ন্যায়তীর্থ)

বিগত ১৮৩৪ শকের মাঘসংখ্যক 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ লিখিত "৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়"শীর্ষক একটি প্রবন্ধ* প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ ইহার প্রতিবাদ করিয়া

---

* দ্বিতীয় পরিশিষ্ট—ক দ্রষ্টব্য।

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "ব্রাহ্মণসমাজে" এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনিই লিখিয়াছেন যে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের আচরণে সদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে কিছু কিছু আঘাত পড়িতেছে, তবে তিনি "কিছু কিছু" বলিয়াছেন—আমরা তাহা মনে করি না। প্রকাশ্য শত্রু (ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টিয়ান্) বরং ভাল কিন্তু হিন্দুসমাজের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া গোঁড়িধর্ম্ম ছুংমার্গ বলিয়া খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার না করা, অনধিকারীর ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস গ্রহণ করা, আচার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি দেওয়া, সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণবিদ্বেষ এবং পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা ইত্যাদি হেতু রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় আর্য্যসমাজীদের ন্যায় সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছে। এতদিন এই সম্প্রদায় বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সমাজ অনভিজ্ঞ ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাদির অথবা রামকৃষ্ণকথামৃত লীলাপ্রসঙ্গাদির ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বড় একটা কিছু খোঁজ খবর রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, * নচেৎ এতদিন পণ্ডিত মহাশয়গণ—তথা স্বধর্ম্মপরায়ণ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্গ—এই সম্প্রদায়ের বিষয়ে এরূপ উদাসীন থাকিতেন না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ঐ সম্প্রদায়ের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সনাতন সমাজের পক্ষ হইতে যেরূপ দক্ষতাসহকারে "সাহিত্য" পত্রে প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক প্রতিবাদকারীর উত্তর যেরূপ অকাট্যভাবে দিয়াছিলেন, তাহাতেই আহ্লাদিত হইয়া বোধ করি 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম্-এ, মহাশয় "ব্রাহ্মণসমাজের"

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি যে পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া যে "চাপরাশের" কথা এতদিন চলিয়াছিল, তিনি তাহার খবরই রাখিতেন না। গত ৩।৪ বৎসর হইল তাঁহার নিকট এ কথা উত্থাপিত হইলে পর তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; এবং তৎফলেই এই পত্রে "৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রতিবাদী ভাগবত ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রের প্রতিও মন্তব্য প্রকটন করিতে ছাড়েন নাই। আমাদের বিশ্বাস বর্ণাশ্রম বিরোধী এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করিয়া বিদ্যাবিনোদমহাশয় সমগ্রব্রাহ্মণসমাজের তথা সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসী সদাচার পরায়ণ হিন্দু মাত্রেরই ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। বরং আমরা অনুরোধ করিতেছি, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তদীয়প্রবন্ধাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাহাতে এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত তথ্য সমাজে সুপ্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।

রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের দ্বারা সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের উপর আঘাত পড়িতেছে—ভাগবত মহাশয় ইহা স্বীকার করিতেছেন—তথাপি এতদিন কৈ এবিষয়ে তিনি কোনও বাঙ্ নিষ্পত্তি কোথাও করিয়াছেন বলিয়া তো আমরা অবগত নহি। তিনি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে যে ভাবে লিখিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি সে ভাবেও তো প্রবন্ধ লিখিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত অভিনব মতের সহিত শাস্ত্রের এক-বাক্যতা সাধন করিতে পারিতেন—তাহা করিয়াছেন কি? আশা করি এখন হইতে তাহা করিবেন—এবং ঐ সম্প্রদায়ের মুখপত্র উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার সামঞ্জস্য বিধায়ক প্রবন্ধ যেন আমরা দেখিতে পাই।

তিনি প্রবন্ধে বলিয়াছেন "আমি রামকৃষ্ণ মিশনের চেলা নই।" আমরা ব্রাহ্মণের বাক্য একেবারে মিথ্যা বলিব না, তিনি মিশনের চেলা না হইলেও তাঁহার প্রতিবাদের ধরণে বোঝা যায়, যে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিরোধী দলের আওতায় পড়িয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের চেলা নহেন কিন্তু রামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত অথচ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরক্ত সদ্-

ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি, ভাগবত মহাশয় কিন্তু সেরূপ নহেন, তিনি একটু বেশী চাপা পড়িয়াছেন। মিশনের চেলার মধ্যেও এমন দু একজন এখনও আছেন যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অনুরক্ত, ভাগবত মহাশয় সেরূপ চেলা হইলেও ভাল ছিল, কিন্তু তিনি সেরূপও নহেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি শিখণ্ডী ভাবে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন—পশ্চাতে কোনও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী ধনঞ্জয় অবস্থিত হইয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছেন!

তাই বর্ণাশ্রম বিরোধী যাঁহারা এযাবৎ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহাদের কতকগুলি লক্ষণ আমরা ভাগবত মহাশয়ের প্রবন্ধেও দেখিতেছি; ক্রমশঃ তাহা বলিতেছি—

(১) যাহা প্রকৃত নহে তাহা বলা। যথা, "তাঁর (পরমহংসের) কাছে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ই ছুটিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পরমহংসদেব তাঁর কাছে কোন দিন যান নাই।" এ কথা প্রকৃত নহে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের যে প্রবন্ধের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতেই আছে "একজনের বাড়ী গিয়া (তর্কচূড়ামণি মহাশয় তখন ভূধর বাবুর বাড়ীতেই ছিলেন) তাঁহাকে চাপরাশ আছে কি না জিজ্ঞাসা করা অস্বাভাবিক ও অতি অভদ্রতা। পরমহংস তাদৃশ অভদ্র ছিলেন না।" ইত্যাদি (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য)। "সাহিত্যে" যে প্রবন্ধ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রথম লিখিত হইয়াছিল, * তাহাতে শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; ঐ পত্রে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে পরমহংসই তাঁহার নিকটে প্রথম আসিয়াছিলেন—পরে তিনি গিয়াছিলেন। এরূপ মধ্যে মধ্যে পরমহংসও তাঁহার নিকটে আসিতেন, তিনিও পরমহংসের নিকট যাইতেন।

* এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) দোষ ঢাকিবার জন্য ধাপ্পা দেওয়া। যথা—"মহাপ্রভু যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যবর্ণের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না বলিয়া বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় বলিয়াছেন সেটি তাঁহার লীলা আলোচনা না করিবারই ফল, আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে তাহার ভূরি প্রমাণ দেখান যাইবে।" বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সাবধানে বলিয়াছেন, "চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।" ইহার উত্তরে ভাগবত মহাশয় স্বীয় প্রতিবাদ সমর্থনার্থ দু একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলেই শোভন হইত। তাহা তিনি করেন নাই ভবিষ্যতের জন্য মুলতোবি রাখিয়াছেন। ৺শিশির ঘোষ প্রভৃতির আধুনিক গ্রন্থে তো চৈতন্যগুরু ঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বলা হইয়াছে—তাদৃশ কোনও গ্রন্থে মহাপ্রভুও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা থাকিতে পারে, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তাহারও নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল।

এইরূপ চাপরাশের কথাও স্বকর্ণে শুনিয়াছে এরূপ লোক এখনও আছে বলিয়া এক প্রতিবাদী খুব জোরে বলিয়াছিলেন—তারপর এখন তো আহ্বান করিলেও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না! *

(৩) চতুরতা। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সর্ব্বদাই পরমহংসের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন—তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে একাধিকবার একথা স্পষ্ট রহিয়াছে। তথাপি তাঁহার উপর 'বিদ্বেষের অভিযোগ' চাপান হইয়াছে; বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তদীয় প্রবন্ধের

---

* ভাগবত মহাশয় প্রকারান্তরে চাপরাশের কথা তুলিয়াছেন কিন্তু "তুমি যে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছ, চাপরাশ আছে?" এরূপ জিজ্ঞাসা, আর কথাপ্রসঙ্গে "তাঁর কাছ থেকে শক্তি না পেলে কিছুই হয় না" এরূপ বলা, কি সমান কথা? প্রকৃতপক্ষে যে সব কথা হইয়াছিল তাহা ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সাধু দর্শন" গ্রন্থে অথবা তৎসম্পাদিত "বেদব্যাস" পত্রে আছে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত (প্রথম পরিশিষ্ট ক) প্রবন্ধেও এসব কথা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

উপসংহারে "দোষোদ্ঘাটন" মাত্র করিবার জন্য যে প্রবন্ধ লেখেন নাই, তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন,—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধভাব প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া জনসাধারণকে সাবধান করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, একথা বলাসত্ত্বেও—চালাকি করিয়া কোন কারণ না দর্শাইয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিয়া, প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে সার (?) সংকলন পূর্ব্বক, "জগৎপূজ্য ব্যক্তিকে 'সবলোট' 'স্নায়ুবিকার গ্রস্ত' "পাপাচারী' 'পথভ্রষ্ট' 'অধঃপতিত' ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত করিয়াছেন"—এরূপ অভিযোগ তাঁহার উপর আনিয়াছেন। এক 'সবলোট' ভিন্ন আর সব বিশেষণ তো বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধে খুঁজিয়া আমরা পাইলাম না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নার্ভাস (nervous) বলিয়াছেন—* ইহার তরজমা হইয়াছে 'স্নায়ু বিকারগ্রস্ত'। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কি সুন্দরভাবে পরমহংসের কথা লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীজগদম্বার অপার করুণার পাত্র তাঁহার এই সাংসারিক অভিজ্ঞতা শূন্য সরলপ্রকৃতির ছেলেটির পা পিছলিয়াছিল কিন্তু তিনি তাঁহাকে একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইতে দেন নাই—তবেকিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক অবনতি ও দৈহিক যন্ত্রণা ভোগাইয়া পরিশেষে তাঁহার ক্রোড়ে স্থানদান করিয়া ছিলেন।" (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।) বলি, ইহাতে 'বিদ্বেষ ভাব' প্রকাশিত হয় কি? "পাপাচারী পথভ্রষ্ট অধঃপতিত" ইত্যাদি বিশেষণ এরূপ লেখা হইতে আহরণ করা যায় কি? ফলকথা, এরূপ 'চালাকি' না করিলে তো বিষয়টা ঘোরালো করা যায় না—পরমহংসের প্রতি কটূক্তি করা হইয়াছে এরূপ না দেখাইলে তো বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি গালি বর্ষণের সুবিধা হয় না।

(৪) কোন কিছুর অনুসন্ধান করিয়া দেখার অসামর্থ্য। "হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র্ ফড়র্ ক'রে বকে"—এই কথা পরমহংস বলিয়া-

* বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নার্ভাস্ মাত্র বলিয়াছেন; ব্রাহ্ম প্রচারক ৺শিবনাথ শাস্ত্রী তদীয় "আত্ম-চরিতে" স্পষ্টই ইহা "পীড়া" বলিয়াছেন।

ছিলেন, ভাগবত মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধে আছে—ইহা স্বয়ং কথামৃতকার বলিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ "৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে" "জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়" লিখিয়া সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন "শাস্তরসাস্পদ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি। নানা-কারণে এ বিষয়ের আলোচনা বাড়াইতে চাইনা—কিন্তু ভাগবত মহাশয় ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধায় (তথা তদীয় পুত্র ৺প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়) সম্বন্ধে যে কিছুই জানেন না, বা জানিবার চেষ্টাও করেন নাই—ইহাই প্রতীত হইতেছে।

(৫) বুঝিবার অক্ষমতা। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিয়াছিলেন "সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতিবিচার না থাকিলেও তাঁহারা যত্রতত্র ভোজন করিয়া আধ্যাত্মিক পাতিত্যগ্রস্ত হইবেন, এটাও সদাচার অনুমোদিত নহে।" ভাগবত মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—"সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতিবিচার নাই, একথা বলিলেন, আবার যত্রতত্র ভোজন করিলে পাতিত্য জন্মে ইহাও বলিলেন, ইহার সামঞ্জস্য কি?" এস্থলে পাতিত্যের পূর্ব্বে 'আধ্যাত্মিক' কথাটি ছাড়িয়া দিয়াই গোল বাধাইয়াছেন। 'সামাজিক' 'পাতিত্য' সন্ন্যাসীর নাই—কেননা তাঁহারা গৃহস্থ-সমাজের বাহিরে। কিন্তু "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" এই বাক্যের বিষয়ীভূত সন্ন্যাসীও বটেন; তাই নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতাবস্থা বজায় রাখিবার জন্য সন্ন্যাসীও যত্র তত্র যা তা খান না, তবে নব্য সম্প্রদায়ের 'আনন্দ' বর্ণের কথা স্বতন্ত্র, ইহারা প্রকৃতই 'সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র'।

(৬) শাস্ত্রের দু'একটা বোল চাল প্রকটন—কিন্তু শাস্ত্রতত্ত্বে অপ্রবেশ। ঋষিবাক্যে বা ভগবদ্বাক্যেও অসঙ্গতি আছে, অতএব রামকৃষ্ণের বা বিবেকানন্দের আচরণে ও কথায় না থাকিবে কেন? এইরূপ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ভাগবত মহাশয় কতকগুলি শাস্ত্রবাক্যের উদ্ধার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তেও তিনি "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।" ইত্যাদি

ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেদিন নৈহাটি সাহিত্যসম্মিলনে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় দর্শন শাখার সভাপতি রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্' ইত্যাদি বাক্যের কি সুন্দর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন— ভাগবতমহাশয় তাহা দেখিয়াছেন কি? সে যাহা হউক, শাস্ত্রের নানা স্থলে আপাত বিরোধ সূচক কথা দৃষ্ট হয়, অতএব রামকৃষ্ণ বা তৎসম্প্রদায়ের কথায় ও কাজে অসামঞ্জস্য থাকিবে, ইহা কি যুক্তি? শাস্ত্রেরও তো আপাত বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য বিধান হইয়া থাকে—ইঁহাদের দু একটা পরস্পর বিরুদ্ধ কথার বা আচরণের সামঞ্জস্য ভাগবত মহাশয় দেখাইলেন কোথায়? সেটা দেখাইয়া পরে শাস্ত্রের নজির আনা উচিত ছিল।

(১) রামকৃষ্ণাদি সম্বন্ধে অত্যুক্তিবাদ। ভাগবত মহাশয় প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে "রামকৃষ্ণকে একজন অবতার বলিয়া সকলে স্বীকার না করিলেও তিনি যে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ এসম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই।" আমরা তো অবতার দূরে থাকুক রামকৃষ্ণ যে একজন 'সিদ্ধ মহাপুরুষ' ছিলেন ইহাও সম্যক্ স্বীকার করিতে পারি না। "বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই" একথা তাঁহার অত্যুক্তিবাদ। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, রাজা প্যারীমোহন, প্রভৃতি (বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথা নাই বলিলাম) অনেকেই তো তাঁহাকে তাদৃশ মনে করেন না—বিবেকবান্ শাস্ত্রদর্শী কেহই ঐরূপ মনে করিবেন না। "স্বাধীন কুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ"—এটা মস্ত কথা। যে ব্যক্তি পীড়ায় ভুগিয়া, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া, ডাক্তার প্রভৃতির তথা শিষ্যাদির দীর্ঘকাল চিকিৎসাও সেবা শুশ্রূষার অধীন হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাঁহাকে সিদ্ধমহাপুরুষ বলা ঐ সম্প্রদায়ের গোঁড়াদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু বিচারশক্তি যাঁদের আছে তাঁরা একথা বলিবেন না—'অবতার' বলা তো নিতান্তই হাস্যাস্পদ

বিষয়। * শুনিয়াছি পরমহংস নিজেও বলিতেন, "অবতারের কি ক্যানসার হয় গা ?"

তারপর বলা হইয়াছে "রামকৃষ্ণসম্প্রদায় যে প্রসার লাভ করিয়াছে শত শত মহামহোপাধ্যায়ের চীৎকারেও তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না, কেবল চীৎকার করিয়াই গলাভাঙ্গিবে।" "শত শত" দূরে থাকুক একজন "মহামহোপাধ্যায়ের" লেখার চোটেইতো দেখিতেছি সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ। যদি 'বিন্দুমাত্র ক্ষতি' না হয় তবে "সাহিত্য" পত্রের পেছনে এই সম্প্রদায় লাগিয়াছিল কেন—এবং এই ভাগবত মহাশয়ও 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রের বিভীষিকা জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন ? যদি "বিন্দুমাত্র ক্ষতি" না হয়, তবে এই "প্রতিবাদ" করণার্থে অধ্যাবসায়ই বা কেন ? বৃথা চীৎকার করিয়া গলাভাঙ্গা দূরে থাকুক, এই মহামহোপাধ্যায়ের লেখা পড়িয়া অনেকেরই চোখ ফুটিতেছে—এই সম্প্রদায়ও যে তাহা না বুঝিয়াছে এমনও মনে হয় না। সে যাহা হউক, ভাগবত মহাশয় মনে রাখিবেন সত্যের জয় চিরকাল—শত মিথ্যা একদিকে আর একটি সত্য একদিকে, সত্যের জয় হইবেই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেই সত্যপক্ষ আশ্রয় করিয়া অত্যুক্তি, অসারোক্তি, মিথ্যাবাদ ইত্যাদি নির্ভীক ভাবে দেখাইয়াছেন। প্রতিবাদী পক্ষ যে সব লেখা ছাপাইয়াছেন সেগুলি প্রায়ই অসার বলিয়া প্রতীত হইতেছে—প্রতিবাদ দ্বারা তাঁহারা নিজেরই অনিষ্ট করিতেছেন—আমরা ইহাই দেখিতেছি, এবং "সত্যমেব জয়তি নানৃতম্' ইহাই বুঝিতেছি।

(৮) পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্য। রামকৃষ্ণ তাঁহার গুরুকে 'শ্যাল বলিলেন, তখন তিনি "জগদম্বার ক্রোড়ের সরলশিশু।" আর যখ

* এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসে একজন সাধু পুরুষ এবং সাধক ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করি। 'বাড়াবাড়ি' কি বরং তাঁহার প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা এ সব গোঁড়ারাই আনিয়াছেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি বিনীত ভাবে বলিলেন "আপনাকে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম এখন যেন একটু নামিয়া গিয়াছেন বোধ হইতেছে"—তখন রামকৃষ্ণ নিজের অবনতি ভাব স্বীকার করিলেন, এটা 'সরলতা' হইল না; এটার বেলায় ভাগবত মহাশয় বলিতেছেন " তর্কচূড়ামণি মহাশয় যদি তাঁহাকে ঐরূপ বুঝিয়া ঐরূপই বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ঐরূপ উত্তরই সুসঙ্গত কিনা তাহা বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়গণ বিচার করুন।" ঐরূপ উত্তর—যাহা, তাহা "কায়স্থ পত্রিকার" একজন লেখক খুলিয়া বলিয়াছেন। তিনি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথাগুলি সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—ধীমান্ পাঠক, পণ্ডিতজীর এই চিত্র হইতেই কি পরমহংসদেবের নিম্নাবতরণা লক্ষ্য হয়? ... ... জ্ঞানাভিমানী প্রেমভক্তিহীন বিষয়মোহিত মানবকে ইহা কি ছলনা নয়?" (কায়স্থ-পত্রিকা ফাল্গুন ১৩২৯, ৪১৯ পৃষ্ঠা)। জিজ্ঞাসা করি 'সরল শিশু' কি 'ছলনা' জানে? আমরা মনে করি পরমহংস সরলই ছিলেন—প্রকৃতই জগদম্বাকে মাতৃভাবে সাধন করিয়া তিনি নিজকে শিশুভাবেই গঠন করিতে সতত প্রয়াস করিয়াছিলেন—তাই আমরা বিশ্বাস করি তিনি শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে সরলভাবেই নিজের ঈষদবনত অবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন। নচেৎ যিনি গুরুকে শ্যালা বলিয়া শাসাইতে পারিয়াছিলেন—তিনি চূড়ামণি মহাশয়কেও তাদৃশ গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিতেন।

(৯) পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যের প্রতি অবহেলা। ভাগবত মহাশয় অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী চূড়ামণি মহাশয়কেও পরমহংসের "পরীক্ষক"রূপে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই জানেন যে "গুরুপরীক্ষা" পর্য্যন্ত করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে, সেটা দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিষ্যই করিবে। এই "পরীক্ষা" ব্যাপারের প্রকৃত কর্ত্তা শাস্ত্র—শাস্ত্রাদিষ্ট লক্ষণ দেখিয়াই বিচার

করিতে হয়। রামকৃষ্ণ কি তাহারও অতীত? শাস্ত্রে অপ্রবিষ্ট কয়েকজন গিয়া "পরীক্ষা" করিয়া রামকৃষ্ণ যে "অবতার" তাহা নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিলেন—সে বিষয়ে ভাগবত মহাশয় নীরব। আর তাঁহারই মতে 'বহুশাস্ত্রদর্শী পরমপণ্ডিত এবং একজন সাধক' তর্কচূড়ামণি মহাশয়—যিনি শ্রদ্ধাসহকারেই পরমহংসের নিকট যাইতেন—তিনি 'পরীক্ষা' করিয়া কিছু বলিবার অনুপযুক্ত!! কলির লক্ষণে আছে "কুলবধূ কুলটাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবে"—তাহাই আমাদের মনে হয়। "শত শত মহামহোপাধ্যায়কে" চীৎকার করাইয়াও তিনি বেশ পণ্ডিতমর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন!

(১০) নিজের দোষটি না দেখা, কিন্তু অপরের দোষ দর্শন। ভাগবত মহাশয় রামকৃষ্ণের পক্ষে বলিবার সময় তো বলিলেন "দোষা বাচ্যা গুরোরপি" ইত্যাদি। পরন্তু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বেলায় তো খুব কবিত্ব ফলাইয়া বলিতে পারিলেন "ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।" বেশ কথা। কিন্তু তিনিতো নিজেই বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে উনি একজন "শিক্ষাপরিমার্জ্জিতরুচিব্যক্তি" "তেজস্বী ব্রাহ্মণ" "স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মের অকপট বান্ধবতায় (?) আবার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত" ইত্যাদি। এইরূপ ব্যক্তিকে কিরূপে তিনি প্রকারান্তরে মহতের প্রতি অপভাষী "পাপভাক্" বলিয়া খ্যাপিত করিলেন? ঐ উপসংহার অংশটা বাদ দিলেও তো তাঁহার বক্তব্যের কোন হানি হইত না।

(১১) অসম্বদ্ধভাষণ। তিনি বলেন, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে গলদ আছে—কেননা সকল সম্প্রদায়েরই তাহা আছে। এ তো বড় মজার কথা! দোষ আছে—স্বীকার করিবে—কিন্তু কেহ সেই দোষ ঘাটিয়া দেখাইতে গেলে তাহার উপর বিদ্বেষের অভিযোগ আনিবে কেন?

গলদ থাকে এবং তাহাতে সমাজের যদি অনিষ্ট হয়, তাহা সমাজ-হিতৈষী ঘাটিয়া দেখাইতে বাধ্য—বিশেষতঃ এইরূপ সম্প্রদায় যদি নিতান্ত অর্ব্বাচীন হয়। রামকৃষ্ণের রোগ সম্বন্ধে বলেন—কলিকালে কঠোর সাধনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই রোগাক্রান্ত হইয়াছেন—যথা দেবাদিদেব শঙ্কর। দেবাদিদেব কি "কলিকালে" কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন? এবং রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কি তিনি অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন? কলিকালে ত্রৈলিঙ্গস্বামী, বামাক্ষেপা, ভাস্করানন্দ, রামদাস কাঠিয়া বাবা প্রভৃতি কত শত সাধক মহাপুরুষ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত ছিল। যদি কোনও সাধক কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে তাঁহার মধ্যে একটা গলদ ছিল। তার পর রামকৃষ্ণের পীড়া কি "সাধনার কঠোরতার" ফল? তাহা হইলে ইহা তাঁহার জীবনের প্রথমাবস্থায়ই দেখা দিত। পরিশেষে যখন তিনি (ভক্তদের চক্ষে) সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়াছিলেন এবং (কত ভক্তের নিকটে) 'অবতার'রূপে প্রতীত হইয়াছিলেন, তখন সাধনার কোনও কঠোরতা তো তাঁহাতে দেখা যায় নাই—তখন এই পীড়া হইল কেন? তাই, সঙ্গদোষে আচারভ্রষ্ট হওয়াতেই ইহা ঘটিয়াছিল, একথা ভিন্ন আর কি বলা যায়?

ভাগবত মহাশয় বলেন, পরমহংস রসদদার শম্ভু মল্লিকের 'নাকটেপা'—অসরলতার কথা বলিয়া কোন দোষ করেন নাই; কেননা তাহা হইলে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বক্তৃগণ অধিকাংশই ঐরূপ নিন্দুক পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন। "জ্যোতিঃশাস্ত্রের বক্তৃগণ" কি অপরের নিকটে কাহারও কুলক্ষণ বর্ণনা করিয়া উহাকে সাধারণ্যে হেয় প্রতিপন্ন করেন? শম্ভু মল্লিক যদি রামকৃষ্ণের নিকটে নিজের লক্ষণাদি জানিতে যাইতেন [illegible] যদি শম্ভু মল্লিকের মুখের উপর তাঁহার টেপানাকের

দোষ বর্ণনা করিতেন, তবেই তিনি "জ্যোতিঃশাস্ত্রের বক্তৃগণ" সহিত তুলিত হইতে পারিতেন। অলংবাহুল্যেন।

এখন শিখণ্ডীভূত ভাগবত মহাশয়কে আমরা কতকগুলি কথা বলিতে চাই।

(১) নানাবিধ দর্শনের বিভিন্নমতে যে শ্রুতি ব্যাখ্যা ভেদ আছে তাহা কল্পিত নহে, অধিকারী ভেদে সর্ব্বজ্ঞানাকর শ্রুতি বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ইহাই ব্যাখ্যা ভেদের মূল—দল বান্ধিবার জন্য কল্পনা নহে; বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাকে সেইরূপ অর্থভেদে ব্যবহার করার উপদেশ প্রদান—শ্রুতির অবমাননা করা এবং বাহ্য প্রতিষ্ঠার হেতুমাত্র। ব্রাহ্মণের লেখাতে এমন ভাব প্রকাশ একান্ত অনুচিত।

(২) রামকৃষ্ণ পরমহংস দ্বারা যে সমাজের কতক উপকার হইয়াছিল, ইহা—কি পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি কি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়—কেহই অস্বীকার করেন নাই। বরং ঐ উপকারের কথা চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার চিঠিতে এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট দোষে কতকগুলি লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুটিয়া সব মাটী করিয়াছে। তিনিও কষ্ট পাইয়া গেলেন, আমরাও ইহাদের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের প্রাচুর্ভাব দেখিয়া সমাজের কল্যাণ বিষয়ে আতঙ্কিত হইতেছি। বশিষ্ঠধেনু বিশ্বামিত্র সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ঐ ধেনুর পুচ্ছদেশ হইতে যবন সেনার আবির্ভাব হয়; ঐ সেনা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদল পরাজিত করিয়া ধেনুর রক্ষাবিধান করে। পরন্তু ধেনু কর্ত্তৃক সৃষ্ট যবন বংশ দ্বারাই ধেনুকুলের ঘোরতর অনিষ্টসাধন হইয়াছে। পরমহংস দ্বারা যেটুকু উপকার হইয়াছিল, তৎসম্প্রদায়ের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট ঘটিতেছে।

(৩) পরমহংসদেব 'দল' হউক, ইহা ইচ্ছা করিতেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন 'এঁদো পুকুরেই দল বাঁধে' ইত্যাদি। তারপর

ডিস্পেন্সারী হাস্পাতালেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এখন তাঁহারই নামে 'দল' বা সম্প্রদায় (মিশন, সঙ্ঘ ইত্যাদি) হইতেছে এবং উহারা ডিস্পেন্সারি, হাসপাতাল ইত্যাদিই করিতেছে। তবে এরূপটা করার জন্য রামকৃষ্ণই মূলতঃ দায়ী; শেষাবস্থায় তিনি—ভরত যেমন হরিণ শিশুর মোহে পড়িয়াছিলেন—কতকগুলি লোকের মায়াজালে জড়িত হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে কি হইল তাহা এই প্রবন্ধে বলা পুনরুক্তি মাত্র।

(৪) পরমহংসকে (বা বিবেকানন্দকে) সমগ্র দেশের লোক জগদ্বরেণ্যই মনে করুক বা নাই করুক, তাহাতে আমরা ভুলিব না—শাস্ত্রের ও সদাচারের দিক্ দিয়া তাঁহাদের চাল-চরিত্র দেখিয়া তারপর তাঁহাদের সম্বন্ধে ধারণা গঠন করিব। রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন তাঁহারাও সমগ্র দেশের লোকের নিকট ঐরূপ "বরেণ্য" ছিলেন—তাই বলিয়া তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা যদি সমাজের অনিষ্ট হইয়া থাকে—তজ্জন্য সমাজহিতৈষীর নিকট তাঁহারা শত্রুরূপেই বিবেচিত হইবেন। ব্যক্তিবিশেষ অপেক্ষা 'সমাজ' বড়—ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে; অতএব সর্ব্বাগ্রেই সমাজ, স্বধর্ম, স্বদেশ ইত্যাদি দেখিতে হইবে—তারপর ব্যক্তিবিশেষকে বিচার করিতে হইবে। সমাজসমষ্টির হিতাহিত কাহার দ্বারা কিরূপ হইয়াছে, তাহাই মাপকাঠি করিব। এই হিতাহিত বোধ কয়জনের আছে? বিশেষতঃ আজকাল শাস্ত্রবিশ্বাসী লোক বড়ই বিরল, আবার শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন লোক মুষ্টিমেয় বলিলেই হয়। শাস্ত্রানুশাসিত সমাজের প্রকৃতপক্ষে কি হিত কি অহিত শাস্ত্রবিশ্বাসী ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিই বলিতে পারেন। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের নিকট রামকৃষ্ণ বা তদীয় সম্প্রদায় কিরূপ সমাদৃত, তাহাই দেখিতে হইবে। শাস্ত্রে অবিশ্বাসী ও জ্ঞানবর্জ্জিত শতসহস্র পুত্তলিকা সদৃশ জনতার প্রশংসাবাদে বিশেষ কিছু আসে যায় না—কোনও স্থায়ী ফলও হয় না। তবে আজকাল এইরূপ জনতা সাহায্যেই অনেকে বেশ পসার করিয়া লইতেছে। ঈদৃশ জনতা

হাতে রাখিবার জন্য ইহারা তদনুকূল মত প্রচার করিতেছে। যথেচ্ছ আহার বিহার কর—সদাচার বা শাস্ত্র কিছুই নহে, এসব ব্রাহ্মণের কারসাজি—কিন্তু "ঠাকুর" যাহা বলিয়াছেন তাহাই বেদ, তাহাই বেদান্ত; ঠাকুর বলিয়াছেন "আমাকে চিন্তা করিলেই সব আপনা আপনি হইয়া যাইবে; সাধন ভজনের কোন দরকার নাই;" ইত্যাকার বিবিধ উপদেশ প্রচার হইতেছে। রামকৃষ্ণসম্প্রদায় এখন এইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে!

(৫) গন্ধতৈল, প্যাটেণ্ট ঔষধ ইত্যাদি যেরূপ বিজ্ঞাপনের জোরে খুব চলে—এই সম্প্রদায়ও সেইরূপ নানাভাবে বিজ্ঞাপনজারী করিয়া প্রসারলাভ করিয়াছে; মিশন, সেবাশ্রম ইত্যাদি ঐসকল বিজ্ঞাপনের এজেন্সী স্বরূপ। ছবি ছাপাইয়া পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তো যথাসাধ্য প্রচার হইতেছে, এছাড়া 'মিল্' হইতে স্কুলের ছেলেদের খাতায় পর্যান্ত রামকৃষ্ণের নামের ছাপ পড়িয়াছে। তাহাতে কয় দিন বেশ চলিবে, তৎপরে ক্রমশঃ পসার কমিয়া আসিবে। লোকে এসব চতুরতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের দেখাদেখি আরো 'অবতার'দের সম্প্রদায়ও দেখা দিতেছে, সেগুলিও এইরূপই।

(৬) রামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল 'সাধন ভজন কর' 'মাকে ডাক' ইত্যাদি; আর তৎসম্প্রদায় এখন সমাজবিরুদ্ধ আচরণ শিখাইতেছে। নীতিবিরুদ্ধ কথাও প্রচারিত হইয়াছে, যেমন বিবেকানন্দ বলিতেন "না হয় একটা বড়রকের চুরি ডাকাতি কর—বুদ্ধি খুলুক"। সংসারানভিজ্ঞ ভাবপ্রবণচিত্ত যুবকগণ অনেকে এসব উদ্ভট উপদেশও সাগ্রহে শিখিয়া সমাজে অশান্তি আনয়ন করিতেছে; নিজেরাও শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে।

ভাগবত মহাশয় একজন ব্রাহ্মণ সন্তান; আশা করি তিনি এসব বুঝিয়া দেখিবেন।—শিখণ্ডী হইয়া ক্লৈব্য প্রকটন না করিয়া, "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি" এই ভগবদ্বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাঁহারা নির্ভীক ভাবে সমাজ সেবার্থ চেষ্টা প্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের অনুকরণে সমাজ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যত্নপরায়ণ হইবেন।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

গ। "৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়" প্রবন্ধের পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

(শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী)

[সম্পাদকীয় মন্তব্য—১৮৪৪ শকাব্দের মাঘসংখ্যক 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ লিখিত "রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য) কেহ ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ কিছু লিখিলে, তাঁহার উচিত যে সর্ব্বাদৌ "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রিকায় তাহা প্রেরণ করেন। * কিন্তু শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা এই ছদ্মনামা জনৈক কায়স্থ (?) তাহা করেন নাই—ইনি "ব্রাহ্মণসমাজ ও পদ্মনাথ" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত উপরি উক্ত প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ "কায়স্থ পত্রিকায়" প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন ইত্যাদি আছেই—এছাড়া, তিনি কায়স্থ বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়াই তদীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, একথাও লেখা হইয়াছে। "কায়স্থ পত্রিকায়" লিখিত প্রবন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপরে সাধারণ ভাবে "কায়স্থ বিদ্বেষ" অযথা আরোপিত হইয়াছে—ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কামরূপ কায়স্থ সমাজের অগ্রণী স্বরূপ শ্রীযুক্ত প্রসন্ন

---

* প্রতিবাদ "ব্রাহ্মণসমাজে" পাঠাইলে যে উহা প্রকাশিত হইত—তাহার প্রমাণ গত জ্যৈষ্ঠসংখ্যক পত্রিকাতেই আছে— তাহাতে শ্রীযুক্ত ভাগবত ভট্টাচার্য্য লিখিত প্রতিবাদ (তেমন সারগর্ভ না হইলেও) প্রকাশিত হইয়াছে।

নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন—এই প্রবন্ধটির তিনি নাম দিয়াছিলেন—"প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।" প্রথমতঃ তিনি প্রবন্ধে স্বীয় নাম স্বাক্ষর না করিয়া "জনৈক কামরূপ বাসী কায়স্থ" এইরূপ পরিচয় মাত্র দিয়া কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে প্রবন্ধ পাঠান—কিন্তু সম্পাদক নিকটে লিখিত পত্রে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দেন। সম্পাদক মহাশয় উক্ত প্রবন্ধটি ফেরত দিয়া লিখেন যে নাম না দিলে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইবে না (অথচ যে প্রবন্ধের ইহা উত্তর সেই প্রবন্ধে প্রকৃত নাম নাই—একটা ছদ্ম নাম আছে)। তারপর শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া পুনরায় ইহা প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে প্রসন্ন নারায়ণ বাবুর বিশেষ পরিচিত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের শিরোমণি স্বরূপ প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় এই প্রবন্ধের কথা শুনিয়া এবং ইহা ফেরত গিয়াছে জানিয়া এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, ইহা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি ইহার প্রকাশার্থ অনুরোধ করিবেন। তদনুসারে দ্বিতীয়বারের ঐ নাম স্বাক্ষর-যুক্ত প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর নিকটই প্রেরিত হয়। সম্প্রতি নগেন্দ্র বাবু জানাইয়া দিয়াছেন, "প্রতিবাদ প্রবন্ধটি (অর্থাৎ প্রসন্ন নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ) আমার অনুরোধে পত্রিকা পরিচালনসমিতিতে দেওয়া হয়, কিন্তু নানাকারণে প্রবন্ধটি পত্রিকায় বাহির হইবে না একারণ ফেরত পাঠাইতেছি"। *

---

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু জানাইয়াছেন যে "বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি পত্রিকাসম্পাদক বা পত্রিকা পরিচালনসমিতির অজ্ঞাতসারে পত্রিকায় বাহির হইয়াছে তজ্জন্য সমিতি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষে যে উক্তি করা হইল, তাহা পত্রিকাসম্পাদকের অজ্ঞাতসারে কিরূপে হইল, আমরা বুঝিলাম না। অপিচ, প্রবন্ধটি ফেরত পাঠান হইয়াছে এরূপ লেখা সত্ত্বেও নাকি উহা পাওয়া যায় নাই; ভাগ্যবশতঃ ঐ প্রবন্ধের একটা নকল ছিল, তাই ইহা প্রকাশিত হইতে পারিল।

সম্প্রতি শ্রীযুক্তপ্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' পত্রিকায় প্রকাশার্থ আমাদের নিকট আসিয়াছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ লেখকের প্রবন্ধই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধটির সঙ্গে "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রিকার যথেষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহা 'ব্রাহ্মণ-সমাজে' প্রকাশিত প্রবন্ধ-বিশেষের প্রতিবাদের উত্তর—এবং ইহা প্রকাশ না করিয়া কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক তথা পরিচালন সমিতি ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রবন্ধ লেখক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর যে অবিচার করিয়াছেন, আমরা ইহা প্রকাশ না করিলে সেই অবিচারের অংশভাজন হইব বলিয়াই মনে করি। তাই ইহা পত্রিকাস্থ করা হইল। কায়স্থ-সমাজপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ (অর্থাৎ বর্তমান প্রবন্ধটি যাহার উত্তর) এই সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত করা অনাবশ্যক মনে করিলাম, কেননা উত্তরের মধ্যেই ঐ প্রবন্ধের কথাগুলি প্রায়শঃ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তথাপি যাঁহারা ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে চান তাঁহারা কায়স্থ পত্রিকা একবিংশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩২৯) দেখিতে পারেন।]

বিগত (১৩২৯ সালের) মাঘমাসের "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; ফাল্গুন মাসের "কায়স্থপত্রিকায়" শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা মহাশয় ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন।* বর্ত্তমান প্রবন্ধ বর্ম্মামহাশয়ের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

কেবল "ব্রাহ্মণ-সমাজে"র প্রবন্ধ নহে 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লিখিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকা-

* প্রবন্ধ যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রতিবাদও সেই পত্রিকায়ই প্রেরিত হওয়া উচিত ছিল; বর্ম্মামহাশয় কিজন্য তাহা করেন নাই বুঝিতে পারিলাম না।

নন্দ সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রবন্ধেরই খবর আমি রাখি; বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বারংবার বলিয়াছেন তিনি পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্; এবং তাঁহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা সহকারেই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় প্রথম প্রবন্ধ (আসামে বিবেকানন্দ) 'সাহিত্যে' পাঠাইবার পূর্ব্বে তিনি ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে স্পষ্টই জানাইয়াছিলেন তিনি স্বামীজির ভক্ত নহেন, তথাপি ৺সমাজপতি মহাশয় প্রবন্ধ পাঠাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন "আমি বিবেকানন্দের পরম ভক্ত বটে, কিন্তু আর কাহারও অভক্ত হইবার অধিকার নাই, তাহা মনে করি না। ইহাও বোধ করি বিবেকানন্দেরই শিক্ষা।" (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ফুটনোট দেখুন)। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ যে একজন "অতি বড়লোক" তাহা এবং স্বামীজির গুণাবলীর কথাও আমরা তদীয় প্রবন্ধাবলীতে দেখিতেছি। * অতএব নেহাৎ অনাহূতভাবে এবং বিদ্বেষভাব *প্রণোদিত হইয়াই যে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন* একথা কিরূপে বলা যায়? পরমহংসদেবের সম্বন্ধে তিনি কুত্রাপি কোনও তীব্র মন্তব্যও করেন নাই। তবে তৎসম্বন্ধীয় তথ্য নির্ণয়ার্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চিঠি পত্রাদি প্রকাশ করিয়াছেন—বরং চূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে বিতর্কও করিয়াছেন (প্রথম পরিশিষ্ট—ক দেখুন)। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই মধ্যে মধ্যে তীব্র মন্তব্য আছে—সে বিষয়ে উপসংহারে তিনিই বলিয়াছেন "বিবেকানন্দ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বহুশঃ গালি দিয়াছেন—আমরা যদি আবেগবশতঃ তাঁহার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কটু বলিয়া থাকি, আশা করি তাহা ক্ষমার যোগ্য হইবে।" (তৃতীয় প্রবন্ধ—শেষ অংশ)

শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা মহাশয় ব্যাপারটা বেশ 'ঘোরালো' করিবার নিমিত্তই বোধ হয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর কায়স্থ বিদ্বেষের অভিযোগ করিয়াছেন। এই অন্যায় অভিযোগই প্রধানতঃ এই দীন কায়স্থকে বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে তিনি কায়স্থের উপনয়ন সংস্কারে, ক্ষত্রিয়ত্ব খ্যাপনে, অথবা সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই, একথা বলাতেই যদি 'কায়স্থ' জাতির উপর তাঁহার বিদ্বেষ সূচিত হইয়া থাকে তবে এই অধমকেও স্বজাতি বিদ্বেষে অভিযুক্ত করিতে পারেন। আমাদের এই অঞ্চলে অন্ততঃ, সদাচার কায়স্থ কেহ বেদবিহিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় সাজেন নাই। শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছি যে যাঁহারা খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করেন না, সমাজে একাকারের পক্ষপাতী, আচার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, ব্রাহ্মণের প্রতি বিরাগবান্ বঙ্গদেশের এইরূপ কায়স্থও নাকি পৈতা নিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের বড়াই করিয়া থাকেন। বৈদ্যের উপর টেক্কা মারিবার জন্যই বোধ হয় এই আন্দোলনের সৃষ্টি। অশৌচকালের সংক্ষেপ ভিন্ন ইহা দ্বারা কোনও লাভ * হইয়াছে কিনা জানিনা। কায়স্থেতর জাতির নিকট এই নিমিত্তে কায়স্থের সম্মান অণুমাত্রও বাড়িয়াছে বলিয়াও তো বোধ হয় না। এই অঞ্চলের কোচ কলিতাগণও এভাবে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেছে—কিন্তু উহাদের সামাজিক সম্মান পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

সে যাহা হউক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের যে কায়স্থ বিদ্বেষ কিছুমাত্রও নাই, কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা তাহার সমর্থন করিতেছি—

---

* ইহাও কি লাভ? বরং আমি মনে করি অনেককাল বাধ্য হইয়া [সা]ত্ত্বিক (নিরামিষ) আহার ব্যবস্থা কল্যাণ জনক, অথচ আমাদের কর্ত্তব্য [বৈ]দিক সন্ধ্যাদির নিষেধও নাই। বলা আবশ্যক যে কামরূপের কায়স্থগণ [ত]াহাদের কায়স্থ সূচক (মালাকারে) সূত্র ধারণ করেন কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বসূচক [১]২ দিন অশৌচ মানেন না, ৩০ দিনই মানেন।

পাইয়াছে—"বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বমানব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ;" "সন্ন্যাসি (?) শিরোমণি বিবেকানন্দের মেঘমন্দ্র বাণী জগৎ আলোড়িত করিয়াছে ; চক্ষুষ্মান্ চাহিয়া দেখ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ; চাহিয়া দেখ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী কি ভাবে উড়াইতেছেন।" "সমবেত ভাবে নাম দিয়া বা নাম না দিয়া যেখানেই সেবাকার্য্য আরম্ভ হউক সেই খানেই বিশ্বপ্রেমিক, ভারত প্রেমিক, বাঙ্গালীকুল শিরোমণি বিবেকানন্দের শ্রীকর চিহ্ন বর্ত্তমান।" অথচ এ সকল উক্তিতে প্রমাণ প্রয়োগের কোন বালাই নাই! *

পরমহংস অবশ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তবে তাঁহাকে অবতার সাজাইবারও এরূপ মতলব হইতে পারে যে তাঁহার মুখ দিয়া স্বামী বিবেকানন্দের প্রশংসাবাদ (যথা, ও যদি অখাদ্য খায় তবে দোষ হইবে না ইত্যাদি প্রচার) করা হইয়াছে ; নচেৎ অনাচারী স্বামীজির প্রতি হিন্দুসাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারিত।

স্বামী বিবেকানন্দ কায়স্থ জাতির—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির—গৌরবের জিনিস, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাঁহার চিঠি পত্র বক্তৃতাদিতে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর বিষম আঘাত পড়িয়াছে, ইহাতেও সংশয় নাই। তিনি খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না—তজ্জন্য বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মকে বলিতেন "হাঁড়িধর্ম্ম" ; স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারকে বলিতেন

সেন মহাশয়ের সম্বন্ধেও এইরূপ অত্যুক্তি করিয়া থাকেন। ফলতঃ নূতন সম্প্রদায়ের গোঁড়ারা প্রবর্ত্তকদের সম্বন্ধে প্রায়শঃ এতাদৃশ অন্ধভক্তি প্রকটিত করিয়াই থাকেন।

* চন্দ্রদত্ত বাবু লিখিয়াছেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "জাতিকলহ" "জাতি-বিদ্বেষ" দ্বারা প্রণোদিত হইয়া "মহাপুরুষ নিন্দায়" প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ—কায়স্থ বিবেকানন্দ তাঁহার "জাতি" হইলেন কিরূপে? চন্দ্রদত্ত বাবু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে অগ্নিহোত্রী বলিয়াছেন—এই উদ্ভট

"ছুংমার্গ"; ব্রাহ্মণদিগকে—শাস্ত্রকারদিগকে—বলিতেন "দুষ্টপুরুত"। এ সকল হলাহল স্বামীজির সম্প্রদায়স্থ লোকেরা পুস্তকাদিতে সমাজমধ্যে প্রচার করিতেছেন—স্বদেশে অনভিজ্ঞ সরল প্রকৃতির নবযুবক অনেকে এ সব অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে সদাচার বিদ্বেষী ও ব্রাহ্মণদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে। জনসেবার ব্যপদেশে অনেক যুবক পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া মঠে বা আশ্রমে যোগ দিতেছে, ইহাতেও সমাজের নানাদিক্ দিয়া ক্ষতি দেখা যাইতেছে। তারপর স্বামীজির অনুকরণে আজকাল অনেক অমুকানন্দ তমুকানন্দ দেখা দিতেছেন, তাঁহাদের ত্যাগের মধ্যে এক বিবাহ না করাটাই দেখিতে পাই—সেটা করিলে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িতে হয়! কিন্তু তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া চলা বসা পোষাক পত্র (একটা গেরুয়ার আবরণ ছাড়া) বিলাসিতারই পরিচায়ক; ইহাতে সন্ন্যাসের আদর্শ হত্ব হইয়াছে। এই সকল কারণে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধাবলীর সহিত আমাদের ঐকমত্য খ্যাপন করিতেছি এবং আশা করি যে এগুলি দ্বারা সমাজের অনেকের চোখ ফুটিবে—এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত তথ্য * জানিয়া অনেকেই সাবধান হইবেন। আমরা জানি, এই সকল প্রবন্ধের জন্য তিনি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ধর্ম্মবিশ্বাসী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হইতে ধন্যবাদ পাইয়াছেন—এমন কি এসকল প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ছাপাইবার জন্যও অনুরোধ আসিতেছে। ইতোমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী

* একটি অভিনব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যোদ্ঘাটন করিতে হইলেই ঐ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের ব্যক্তিগত কথা—তাঁহাদের কার্য্য বাক্য ইত্যাদি—আলোচনার বিষয় হইয়াপড়া অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে যদি গলদ প্রকটিত হইয়া পড়ে সে জন্য আলোচক দায়ী নহেন—তবে তিনি সর্ব্বদাই প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় মন্তব্য সমর্থন করিবেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন।

হিন্দী ভাষায় (জনৈক হিন্দুস্থানী লেখক কর্ত্তৃক) অনুবাদিত হইয়া প্রসিদ্ধ হিন্দীমাসিক "মর্য্যাদা" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব চন্দ্রদত্ত বাবু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি যেরূপ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। এবং তাঁহাকে "পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা আবশ্যক" এই উপদেশ প্রদান করাটা নিতান্তই হাস্যকর। শুনিয়াছি পুরাণে নাকি আছে—কলিতে চোর সাধুকে, দুর্জ্জন সজ্জনকে, স্বৈরিণী পতিব্রতাকে শাসাইবে; তাই এরূপ উপদেশ সম্ভাবিত হইল * !!

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে তো উপদেশ দেওয়া হইল; কিন্তু চন্দ্রদত্ত বাবু জানেন কি, নূতন সম্প্রদায় যাঁহারা প্রবর্ত্তনকরেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় কি একটা গল্প করিতেন? গল্পটা সংক্ষেপে এই। নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মৃত্যুর পরে যমপুরী গেলে ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বিচার সভায় দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ করিলেন। তারপর ঐ সম্প্রদায়ের কেহ যমালয়ে আসিলে প্রশ্ন হইল "আমি তোমাকে যাদের ঘরে জন্ম দিয়াছিলাম তুমি তাদের কুলক্রমাগত সাধনপথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে কেন গিয়াছিলে?" ঐ ব্যক্তি সেই স্থলে দণ্ডায়মান নবধর্ম্মগুরুকে দেখাইয়া উত্তর করিল "হুজুর উঁহার উপদেশে আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম।" তখন হুকুম হইল—একে লাগাও ৫০ বেৎ—তবে অর্দ্ধাংশ (২৫ ঘা) প্রবর্ত্তকের প্রাপ্য।" অবশ্য এটা গল্প মাত্র; তবে ইহার ভিতর যে নীতিকথা আছে আশা করি বন্দ্য মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া

* বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি যে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ এই যে তিনি বিবেকানন্দ সোসাইটির অধিবেশন বিশেষে তদীয় বন্ধু জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সভাপতিত্ব করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ তো ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন, তবে সভাপতিত্বের নিমিত্তে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ধরা হয় কেন? নিষেধ না করাটা বরং তাঁহার পক্ষে বাতুলোচিত কার্য্য হইত না।

দেখিবেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তো পিতৃপিতামহের পথেই যথাশক্তি চলিতেছেন—সুতরাং তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য তেমন ব্যগ্র না হইলেও ক্ষতি হইবে না।

নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবে চন্দ্রদত্ত বাবু পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে তদীয় প্রবন্ধে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন, পরমহংসদেব শেষাবস্থায় কিছু নামিয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ চিঠি যে কেবল 'সারথি' পত্রে ছাপা হইয়াছিল, এমন নহে, ইহা ১৩২৭ সালের সাহিত্যপত্রের পৌষ-মাঘ যুগ্ম সংখ্যায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। (এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন।) পরমহংসদেব স্বয়ংই নাকি তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে একথা বলিয়াছিলেন। এই চিঠির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া চন্দ্রদত্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ধীমান্ পাঠক পণ্ডিতজীর এই চিত্র হইতে পরমহংসদেবের নিম্নাবতরণ লক্ষ্য হয়? জ্ঞানাভিমানী প্রেমভক্তিহীন বিষয়মোহিত মানবকে ইহা কি ছলনা নয়?" অবশ্য এই অধম নিজকে "ধীমান্" মনে করে না; তথাপি চূড়ামণি মহাশয়ের বর্ণনায় আগুন্ত মনোযোগ সহকারে পড়িয়া তো বুঝা যায় ইহাতে ছলনার নামগন্ধও নাই—বেশ সরলভাবেই পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ভাবিয়া তৎসমীপে নিজের আধ্যাত্মিক অবতরণের অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। পরমহংসদেব তো বালকের ন্যায় সরল ছিলেন—তিনি কাহাকেও কস্মিন্‌কালে ছলনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তিনি তো তাঁহার পীড়ার সম্বন্ধে বলিতেন "অবতারের কি ক্যান্সার হয় গা?" অথচ গোঁড়া ভক্তেরা বলিতেন—"তিনি ডাক্তারের অভিমান বাড়াইবার জন্য পীড়া করিয়া বসিয়া আছেন!" প্রকৃত সরল ভাবকে এরূপ জটিল করা কি উচিত? সে যাহা হউক ছলনার কোনও কারণ এস্থলে দেখা যায় না। চূড়ামণি মহাশয় অতি বিনীত ভাবে কথাটি উপস্থাপিত

করিয়াছিলেন—তাঁহার জিজ্ঞাসায় কোনও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় নাই। চন্দ্রদত্ত বাবুই তো বলিতেছেন চূড়ামণি মহাশয় "পরমহংসদেবের শ্রীচরণদ্বয় নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ" করিয়াছিলেন। এই কি "প্রেম-ভক্তিহীনের" লক্ষণ? তিনি কদাপি পরমহংসদেবের নিকটে "জ্ঞানা-ভিমান" ও দেখান নাই; চন্দ্রদত্ত বাবুই তো বলিয়াছেন, চূড়ামণি মহাশয় পরমহংসদেবের আলাপ শুনিয়া বলিয়াছিলেন "যাহা কিছু শুনিতেছি ইহা বেদবাক্য তুল্য—এমন কথা এ জীবনে শুনি নাই।" * এরূপ উক্তি কি "জ্ঞানাভিমান" দ্যোতক? পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে 'বিষয় মোহিত' বলিয়াও মনে করিতেন না, কেননা পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়ের মধ্যে জ্ঞানের চিহ্ন দেখিতেন (কথামৃত ৪র্থ ভাগ ১১৯পৃঃ দেখুন)—জ্ঞানী কখনও বিষয়মোহিত হইতেই পারেন না। অতএব ছলনার কারণ গুলির কোনওটি টিকিতেছে না। বিশেষতঃ পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে বড়ই আপনার মনে করিতেন। কথামৃত (তৃতীয়ভাগ ৯৭ পৃঃ) আছে, তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে বলিতেছেন "আবার আস্‌বেন। গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখ্‌লে আহ্লাদ করে—গরু আপনার জনকে দেখ্‌লে গা চাটে ইত্যাদি।" এ অবস্থায় ছলনার ভাব আসিতে পারে কি?

চন্দ্রদত্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ইনি কি সেই পণ্ডিত শশধর যিনি বাগবাজারস্থ বসু বলরামের মন্দিরে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় উপদেশ কথা শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া বলিয়াছিলেন

---

* চূড়ামণি মহাশয় পরমহংসদেবের শ্রীচরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা এবং এই উক্তি (এমন কথা এ জীবনে শুনি নাই) যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না; এ বিষয়ে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। তবে চূড়ামণি মহাশয় যে "অভিমান শূন্য" ও গানাদি শুনিয়া "প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন" করিতেন—একথা "[illegible]" আছে (৪র্থ ভাগ ১১৯ পৃঃ ১২১ পৃঃ দেখুন)

'যাহা কিছু শুনিতেছি, ইহা বেদবাক্য তুল্য। এমন কথা এজীবনে শুনি নাই?' ইনি কি সেই পণ্ডিত শশধর যিনি মহাভাব সমাধিস্থ পরমহংসদেবের শ্রীচরণদ্বয় নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন?" ইহার পর প্রমাণার্থ বলিতেছেন "এই দৃশ্য দ্রষ্টা ও শ্রোতা এখনও বর্ত্তমান।" তাঁহার জিজ্ঞাস্য—তিনি চূড়ামণি মহাশয়ের কাছে পৌঁছাইয়াছেন কিনা জানি না—এবং তিনিই বা কি উত্তর দিবেন, বলিতে পারি না। তবে বসু বলরামের মন্দিরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আর এক প্রত্যক্ষ "দ্রষ্টা ও শ্রোতা" (সেই দিনই নোট্ করিয়া রাখিয়া) পুস্তকমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কথামৃত ৪র্থ ভাগ পঞ্চদশ খণ্ডে ঐদিনের ঘটনা লিখিত রহিয়াছে—তাহাতে ঐরূপ কথার নামগন্ধও নাই। * অন্যত্র কোনও স্থলেও এরূপ কথা (অন্ততঃ কথামৃতে) আছে বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু হঠাৎ এই 'জিজ্ঞাসা'টা কেন করা হইল তাহার কারণ ভাল বোঝা গেল না। চূড়ামণি মহাশয় তো পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ই ছিলেন। তবে অত্যুক্তিবাদ বা গড়াইয়া পড়া না শুনিলে বা না দেখিলে কি চন্দ্রদত্ত বাবুর আশ মিটেনা?

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় (পূর্ব্বে উল্লিখিত) অত্যুক্তি গুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। চন্দ্রদত্ত বাবুর লেখায় এরূপ প্রতীতি হয় যে মহাত্মা গান্ধী বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যাহা করিতেছেন তাহা স্বামী বিবেকানন্দের 'মেঘমন্দ্র বাণীর'

---

* 'চাপরাশ' সম্বন্ধীয় কথা (অর্থাৎ পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি যে ধর্ম্ম প্রচার কর, চাপরাশ আছে?) প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তি ঈদৃশ সাক্ষীর কথা বলিয়াছিলেন—কিন্তু যখন সাক্ষীর পরিচয় চাওয়া হইল তখন তিনি নীরব রহিলেন। (প্রথম পরিশিষ্ট—ক দেখুন।)

জগদালোড়নের ফল। কিন্তু মহাত্মার অথবা শ্রদ্ধানন্দের সাধন জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র স্বামীজির মেঘমন্দ্রবাণী দ্বারা কি ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি—এবং চন্দ্রদত্ত বাবুও বলেন নাই। তবে মহাত্মা যে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, তিনি যে সব নীতির প্রচার করিতেছেন, স্বামীজি বা তৎসম্প্রদায় তাহা করিয়াছেন কি? মহাত্মার উপদেশাবলীর এক আধটা বিবেকানন্দের বাণীর সদৃশ হইতে পারে,* তেমন সাদৃশ্য চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশাবলির সঙ্গেও মহাত্মার কথা-গুলির আছে—বরং অধিকতরই আছে। মহাত্মা কোনও 'আনন্দ' সাজিয়া গেরুয়া পরেন নাই—অথচ আহারে পোষাকে, চলায় ফিরায় সংযম সাধনায়, স্বামীজির বা তদনুবর্ত্তী 'আনন্দ' গণের সহিত তাঁহার কত প্রভেদ! তারপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যে ভাবে শুদ্ধি চালাইতেছেন—স্বামী বিবেকানন্দ বা তৎসম্প্রদায় সেরূপ কি করিয়াছেন? দুই এক জন বিলাতী বা মার্কিনী সাহেব মেমকে গেরুয়া পিন্ধাইয়াছেন বটে—কিন্তু স্বামীজির বহুপূর্ব্বে থিয়সফি দলে ঢুকিয়া অনেক সাহেব মেম হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি সংজ্ঞাভাজন হইয়াছেন; এমন কি মুক্তি ফৌজের দলেও গৈরিকবস্ত্র এবং হিন্দুনাম গ্রহণ পর্য্যন্ত হইয়াছে শুনিয়াছি। বিবেকা-নন্দের সম্প্রদায় এদেশের কয়জন মোসলমানকে হিন্দু করিয়াছেন? এমনকি, বৈষ্ণব গোস্বামীরা কত পার্ব্বত্য জাতিকে হিন্দু বানাইয়াছেন—সে দিকেও তো এই সম্প্রদায় কিছু করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। তারপর 'সমবেত ভাবে নাম দিয়া বা নাম না দিয়া যেখানেই সেবাকার্য্য আরদ্ধ হউক, সেইখানেই বিবেকানন্দের শ্রীকর-চিহ্ন বর্ত্তমান'—ইহার অর্থ কি এই নয় যে স্বামীজি কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন সংস্থাপনের পূর্ব্বে এদেশে কুত্রাপি সমবেত ভাবে কোনও সেবাকার্য্য ছিল না? যাঁদের

* মহাত্মার "অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন" ও স্বামীজির 'ছুৎমার্গ' পরিহার ঠিক একার্থ বাচক কিনা তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে।

কাছ হইতে মিশন শব্দটি ধার করা—আমি এস্থলে তাঁদের (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান্ মিশনারীগণের) কথা বলিব না—তাঁহারা দুর্ভিক্ষাদিতে ও পীড়ার সময়ে এদেশীয় নর নারীর সেবা করিয়া ধর্মোপদেশে লোকদের খ্রীষ্টান করিতে চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মগণের কথাও বলিব না—তাঁহারাও খ্রীষ্টিয়ানদের অনুকরণে 'মিশন' (স্বামীজির বহু পূর্বেই) করিয়াছেন। আমি আমাদের সমাজের কথাই বলিব। হিন্দুদের সমাজ বন্ধন যেরূপ তাহাতে পরস্পর সহায়তার ভাব ফুটিয়া উঠে—জ্ঞাতি মরিলে সকলে মিলিয়া বহন দহন করে, অশৌচ মানে—শ্রাদ্ধে সকলে সাহায্য করিয়া ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। ব্যষ্টিভাবে দরিদ্র সেবার জন্য মুষ্টিভিক্ষা, শ্রাদ্ধাদিতে কাঙ্গালী ভোজন ইত্যাদিতো রহিয়াছেই। সমষ্টিভাবেও গ্রাম দেশে যুবকদের এক-একটা দল থাকে *—উহারা বিপদ্ আপদে লোকের সাহায্য করে—ডাকাত পড়িলে বা আগুন লাগিলে উহারাই অগ্রসর হয়—আবার উহারাই বার-ইয়ারি পূজা করে, বরযাত্রীর দল পুষ্ট করে; ইদানীং স্কুল ডিস্পেন্সারীর জন্য সামাজিক ক্রিয়া কলাপের সময়ে চাঁদাও উঠায়। আর পাশ্চাত্য অনুকরণেও "শোভাবাজার বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি" প্রভৃতি দু'একটা অনুষ্ঠান † স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বেও হইয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা। কংগ্রেসে ভলাণ্টিয়ারের দল গঠিত হইত—এবং আমার বোধ হয় ১৮৯১ সালে যে "অর্দ্ধোদয়যোগ" হয় তাহাতে কলিকাতায় তাদৃশ ভলাণ্টিয়ারদল গঠিত হইয়া সমাজ সেবায়ও নিযুক্ত হইয়াছিল। অতএব রামকৃষ্ণ মিশন খৃষ্টান ও ব্রাহ্মদের অনুকরণে গঠিত হইলেও হিন্দুসমাজের পক্ষেও একেবারে অভিনব জিনিস নহে। সন্ন্যাসীর দল তো চিরকালই পরার্থপরায়ণ—এমনকি বিশে ডাকাতের

---

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত "যুগান্তর" উপন্যাসে বঙ্গদেশের একটি পাড়াগাঁয়ের চিত্র আছে—তাহাতে 'হাঁসের দল' নামক এক যুবকসঙ্ঘের বর্ণনা আছে। কল্পিত হইলেও বাস্তবের উপর ইহার ভিত্তি বলিয়াই মনে হয়।

† সেদিন সংবাদ পত্রে "কলিকাতা অনাথ আশ্রমের ৩১ শ বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ পড়া গেল। তাহা হইলে, ১৮৯২ অব্দে—বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে—ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে।

দলও নাকি দরিদ্রের সেবা করিত, যদিও ধনীর ঘাড় ভাঙ্গিত। বরং স্বামীজির প্রবর্ত্তিত মঠ * সেবাসমিতি প্রভৃতিতে (খৃষ্টানদের ন্যায়) নিজেদের সম্প্রদায় প্রচারার্থ পুথি ছবি ইত্যাদির বিক্রয়, স্বামীজিদের কেহ আসিলে অভিনন্দনার্থ সভা করা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা করা, রামকৃষ্ণের পূজার্থ মন্দির করা ইত্যাদির প্রচেষ্টা দেখা যায়—তাহাতে জনসেবা "নিঃস্বার্থ" ভাবে হইতেছে বলা যায় না।

রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা উপকার অবশ্যই হয়—কোন্ মিশন দ্বারাই বা কিছুটা না হয়? তবে যখন দেখিতে পাই, যে নব্যযুবকগণ পিতামাতার সেবা ছাড়িয়া মিশনে যোগ দিতেছে ও উপার্জ্জনশীল গৃহস্থ না হইয়া ভিক্ষুকের দল বাড়াইতেছে, † আর (বঙ্গদেশের আখড়ার মোহান্ত বাবাজীদের ন্যায়) 'স্বামীজি'রাও সেই ভিক্ষুকের দলের অর্জ্জনের (ভিক্ষা এবং ছবি ও সমাজ-বিরুদ্ধমতপ্রচারক পুস্তকাদি ফেরি করিয়া যাহা হয় তাহার) দ্বারা বেশ বড় লোক মাফিক চলাফেরা করিতেছেন, তখন মনে হয়—এই ব্যবসায় চলিতেছে মন্দ নয়! নচেৎ কোথায় কবে দুর্ভিক্ষ প্লাবন বা মহামারী হইবে—তারজন্য এইরূপ করিয়া দল বাঁধিয়া রাখার প্রয়োজনই বা কি ছিল? চন্দ্রদত্ত বাবু ইহাও লিখিয়াছেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের জন্মগ্রামে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইলে, দেখিয়া তিনি সুখী হইবেন। তাঁহার উপদেশ অবশ্যই মূল্যবান্। তবে যতটা জানিতে পারিয়াছি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রামের সামাজিক অবস্থা এখনও এমন পরস্পর সহানুভূতিশূন্য হয় নাই যে, 'সেবাশ্রম' একটা করা নিতান্তই আবশ্যক। বরং এরূপ 'সেবাশ্রম' যে স্থানে আবির্ভূত হইবে, সেখানে লোক ক্রমশঃ পরার্থপরতা ভুলিয়া যাইবে। বিলাতের লোক যেমন ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়া 'পুয়র হাউস' দেখাইয়া দেয়—এখানেও হয় তো লোকে আত্মীয় বা প্রতিবেশীকে সেরূপ সেবাশ্রম

* বঙ্কিম বাবুর আনন্দ মঠ পড়িলে, নানা বিষয়ে আধুনিক এই মঠের সাদৃশ্য মনে হইবে; বঙ্কিম বাবুও নাকি বাস্তবের উপরেই কল্পনার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

† ইহারা অনেকেই সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত যুবক; বিবাহ করিয়া সমাজে থাকিলে সদ্গৃহস্থের সংখ্যা বাড়িত, ইহাতে ক্রমশঃ ক্ষীণভূত হিন্দু সমাজের ও লাভ হইত।

দেখাইয়া দিবে। *

চন্দ্রদত্ত বাবু বলিয়াছেন—"নদীয়ার প্রেমাবতার একবার ছেঁড়া পুথির উপর ঘা দিয়াছিলেন। তাহাতে আবনন চণ্ডাল উন্নত হইয়াছে," এই "ছেঁড়া পুঁথি"র অর্থ অবশ্যই শাস্ত্র গ্রন্থ—এবং এইরূপ উক্তি স্বামীজির সাধু অনুকরণ সন্দেহ নাই—সাধে কি পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিবেকানন্দের প্রতি বিরাগবান্? শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রের উপর আঘাত দেওয়া দূরে থাকুক তিনি স্বয়ং অগাধ শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন; তাঁহার শিক্ষানুসারে রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া গিয়াছেন। এমনকি চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থেও পদে পদে শাস্ত্রের বচন উদ্ধারপূর্ব্বক তত্ত্ব বিচার আছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা বৈষ্ণব সমাজের অগ্রণী সেইসব প্রভুপাদগণও এক একজন প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন। ইদানীং গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত পরীক্ষায় বৈষ্ণবদর্শনশাস্ত্রেরও মর্য্যাদা লাভ হইয়াছে।

ফলতঃ যাহারা এযুগেও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া প্রখ্যাত (যেমন রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি) তাঁহারাও শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন—শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তবে কেশব চন্দ্র সেন (যিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না) হইতেই শাস্ত্রমর্য্যাদার লোপ হইয়াছে—ফলও তেমনি হইয়াছে—ব্রাহ্মসমাজ কিছুদিন বেশ জমকাল হইয়াছিল—এখন নিষ্প্রভ প্রায়। স্বামীজি ব্রাহ্মসমাজেরই মেম্বর ছিলেন—তিনি ঐ ধারাই ধরিয়াছিলেন। ভূত দেখিয়া যদি ভবিষ্যৎ বিচার করিতে হয়, তবে পরিণাম কি হইবে তদীয় সম্প্রদায় বুঝিয়া লউন। †

---

* ইতোমধ্যেই শুনিতেছি অনাথ আতুরদের আত্মীয় স্বজন কেহ কেহ নাকি উহাদিগকে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পৌঁছাইয়া দিতেছে। ঐ সকল নিরুপায় ব্যক্তিকে জীবনের এই চরমকালে আজন্ম পোষিত সংস্কার (অন্নগ্রহণে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার) সেবাশ্রমে গিয়া পরিত্যাগ করিতে হইতেছে!

† পরমহংসদেব সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না—তিনি গুরুমুখে ও সাধুসঙ্গে শাস্ত্রমর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার একটা "সম্প্রদায়" হউক এমনটা যেন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না—প্রকৃত পক্ষে ইহা স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রবর্ত্তিত। তথাপি পরমহংসদেব গুরু (এবং অবতার) বলিয়া—ইহা তাঁহার 'সম্প্রদায়' রূপেই প্রায়শঃ কথিত হইয়া থাকে।

বড় বড় 'কথা' আমরা বহু শুনিয়াছি ও শুনিতেছি; কিন্তু কথায় কোনও দিন চিড়া ভিজে না। কথা যিনি বলিবেন, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেখিবেন তাঁহার চরিত্র ও অনুষ্ঠানাদি কথার অনুরূপ কিনা। এই জন্যই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক স্বামীজির কার্য্যে ও কথায়, অনুষ্ঠানে ও উপদেশে সামঞ্জস্য কতদূর তাহা পরীক্ষা করিবার বিষয়—বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহাই করিয়াছেন—এবং বেশ বিচক্ষণভাবেই করিয়াছেন। যদি গলদ থাকে তাহা ঘাটিতে হইবেই—এখন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের উচিত ঐসব যথাসম্ভব দূর করা, সমালোচককে গালি মাত্র দিয়া কোনও লাভ নাই। "চালাকি দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না"—"প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়" এইরূপ উপদেশ দেওয়া বা প্রচার করা খুবই সহজ—কিন্তু কাজের বেলায় কি দেখিতে পাই?—দেখি আগাগোড়া 'চালাকি' (যথা চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে পরমহংসদেবের নিজের অবস্থা সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি ছলনা মাত্র এইরূপ বলা); দেখি "প্রেমের" পরিবর্ত্তে গালি, (যেমন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর বর্ষিত হইয়াছে); দেখি "সত্যানুরাগের" পরিবর্ত্তে অত্যুক্তিবাদ ও অপ্রমাণিত কথা (যথা স্বামীজির বিশেষণাদি—এবং চূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক পরমহংসদেবের শ্রীচরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ ইত্যাদি); এবং দেখি "মহাবীর্য্যের" পরিবর্ত্তে অবিনয় ও অভদ্রতা (যেমন প্রতিবাদ প্রবন্ধের 'টোন্' ও বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের ভাব)!!

উপসংহারে বক্তা মহাশয়ের প্রতি এই দীনের বিনীত নিবেদন এই যে, তদীয় প্রবন্ধে যে 'মহাত্মা'র এবং 'প্রেমাবতারের' উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহাদের শিক্ষায় তিনি অনুপ্রাণিত হউন; তাঁহাদের সারল্য, সহিষ্ণুতা, অমায়িকত্ব ও পবিত্রতা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করুন; এবং কৃপা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখকের ধৃষ্টতা যেন তিনি মার্জ্জনা করেন।

—:o:—

প্রবন্ধাষ্টক।

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ

প্রণীত।

কলিকাতা

মূল্য ॥৶০ মাত্র।

মহিলা প্রেস্

২৭, ২৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীবিপিন বিহারী নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এবং
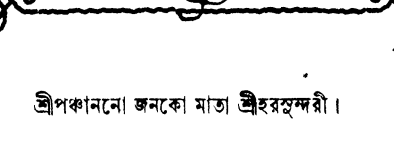
শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী কর্ত্তৃক

২০নং পটুয়াটোলা লেন হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

শ্রীপঞ্চাননো জনকো মাতা শ্রীহরসুন্দরী।
স্বর্গতৌ তৌ স্মৃতৌ ভক্ত্যা জগতঃ পিতরাবিব ॥

মুখবন্ধ।

ভারতীর বরপুত্র কালিদাসই যখন তদীয় মহাকাব্য রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্", অথচ রঘুবংশ তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ নহে বলিয়াই সকলের বিশ্বাস; তখন, যে ব্যক্তি অদ্য ক্ষুদ্র একখানি প্রবন্ধপুস্তক হস্তে লইয়া সাহিত্যপ্রাঙ্গনে প্রবেশ লাভার্থ কৃতোদ্যম, সে আর কি বলিবে?

জননী মাতৃভাষার চরণ প্রান্তে, যাঁহারা কৃতিসন্তান তাঁহারা বহুমূল্য মণিমুক্তাদি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন; যাহার শক্তি সামান্য সে অকিঞ্চিৎকর কোনও কিছু মাত্র প্রদান করিতে পারিলেই নিজকে ধন্য মনে করে; জননী কখনই সন্তানের ভক্তি উপহার উপেক্ষা করিতে পারেন না। ইহাই প্রবন্ধাষ্টক প্রকাশে ভরসা।

এই পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পত্রিকাদিতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহার মধ্যে আটটি প্রবন্ধ লইয়া এই প্রবন্ধাষ্টক সংকলিত হইল।

"সারস্বতপত্র" ও "সাহিত্যসেবকের" সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটু ঘনিষ্ঠ ছিল; অবান্তর হইলেও এতৎ সম্বন্ধে দুই একটি কথা এই স্থলে বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

ঢাকাস্থ সুবিখ্যাত সারস্বতসমাজের সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় উক্ত সমাজের মুখপত্র "সারস্বতপত্রের" সম্পাদন ভার কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত তাঁহার এই অকৃতী ছাত্রের উপর অর্পণ করেন।

তখনও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তরণ কার্য্যের সমাপন হয় নাই, এবং তৎকাল পর্য্যন্ত আমি বাঙ্গালা ভাষায় কোনও প্রবন্ধ রচনা করি নাই। সেই সাপ্তাহিক পত্রে নূতন উদ্যমে লিখিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে দুইটি, নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন হইলেও, এই গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। দুঃখের বিষয় সারস্বত পত্র বহুকাল হইল কালের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে।

রাজকার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম আমাকে আসামের রাজধানী খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী শিলং সহরে যাইতে হইয়াছিল। সেইস্থলে কতিপয় বঙ্গসাহিত্যানুরক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত "শিলং সাহিত্যসভা" নামক একটি পুস্তকাগার ছিল; ইহাকে অন্বর্থনামা করিবার জন্য ইহার একটি সমালোচনী শাখা স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ হইত। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধ "ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার" তদানীং বঙ্গবাসী পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকর্ত্তৃক সুদক্ষ ভাবে পরিচালিত "জন্মভূমি" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটি ও প্রবন্ধাষ্টকের একতমরূপে পুনঃ প্রকাশিত হইল।

এই সাহিত্য সভার সদস্যগণ "সাহিত্যসেবক" নামে একখানি মাসিক পত্র কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকাল প্রকাশিত করিয়াছিলেন; ইহার সম্পাদক সমিতির সভ্যরূপে আমাকে কাজ করিতে হইয়াছিল। সেই পত্রিকায় মল্লিখিত প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া "সাহিত্য-সেবকের" এবং অধুনা বিলুপ্ত "শিলং সাহিত্যসভার" স্মৃতি সংরক্ষণার্থ কথঞ্চিৎ প্রয়াস করিয়াছি।

আসাম প্রদেশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এবং মোসলমান মহাপুরুষগণের বিষয়ে বঙ্গদেশীয় জনসাধারণ অতি অল্পই অবগত আছেন। এই নিমিত্ত ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত "আরতি" পত্রিকায় লিখিত "পূর্ণানন্দগিরি ও কামাখ্যামহাপীঠ" নামক প্রবন্ধটি এবং ইদানীং নির্ব্বাপিত "প্রদীপ"

পত্রে প্রকাশিত "ফকির শাহজলাল" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এতদ্ গ্রন্থভুক্ত করিয়া পুনশ্চ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইল।

সমস্ত প্রবন্ধেই অল্প অল্প সংশোধন করিতে হইয়াছে। কিন্তু কুত্রাপি বিশেষ ভাবে পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধনের প্রয়াস পাই নাই। সুদূরবর্ত্তিস্থান হইতে প্রূফ্ দেখিতে হইয়াছে, তজ্জন্য দুই চারিটি স্থলে অশুদ্ধি থাকিয়া গেল। সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন।

ইতি—

কটন কলেজ, গৌহাটি। }
১৩১৭ বঙ্গাব্দাঃ। }

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি।

সকল কাজেরই একটা উপক্রম আছে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, একাধিকবার উপক্রমের পর কার্য্যের সুচারু সাধন হইয়া থাকে। সকৃদুপক্রমের ফলাফলের উপর নির্ভর করিলে, এ জগতে অনেক বড় বড় কাজ অদ্য পর্য্যন্ত সুসিদ্ধ দেখিতে পাইতাম না।

যাঁহারা আজ কাল বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইলে সঙ্কুচিত চিত্তে পরিহার প্রার্থনা করেন, সেই সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকট দুই একটি কথা বলাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। উপরি লিখিত কথাগুলি অবশ্যই তাঁহারা বিদিত আছেন। লিখিবার উদ্যম মাত্রেই যে কেহ বঙ্কিমচন্দ্র কি কালীপ্রসন্ন হইয়া বসিবেন, ইহা প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না; এবং চেষ্টা করিলেও, সকলেই যে "সুলেখক" সংজ্ঞাভাক্ হইবেন, এ কথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে, সাধারণের নিকট সকলেরই অনেক সময় কিছু কিছু বলিবার থাকিতে পারে; তাহা প্রায়শঃ মৌখিক বলিবার সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে না, ঘটিলেও তাহা সচরাচর নিতান্ত ক্ষণস্থায়ীই হয়। সুতরাং যাহা বক্তব্য, হাতে কলমে তাহা বিজ্ঞাপিত করাই সুবিধা। সকলেই, চেষ্টা করিলে, "সুলেখক" না হউন, মনের কথাটা

ভালরূপে সাধারণের পরিজ্ঞানার্থে পত্রস্থ করিতে পারেন, ইহা এক প্রকার ধ্রুব। এবং তন্নিমিত্ত উপক্রম করা সুশিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের নিকট লোকে অনেক প্রত্যাশা করিয়া থাকে; তাঁহারা কোন্ বিষয়ে কি মতামত প্রকাশ করেন, ইতর-সাধারণ উহা জানিবার নিমিত্ত উদ্গ্রীব হইয়া থাকে। সদাশয় ইংরাজ-রাজের কৃপায়, শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ নানাদেশের নানা জাতির যে সকল জ্ঞানরাশির অধিকারী হইয়াছেন, দেশস্থ সাধারণ ব্যক্তিবর্গের সমীপে উহার প্রচার করা কি বিধেয় নহে?—অজ্ঞতা বা কুশিক্ষা প্রভাবে দেশে ও সমাজে যে সকল কদাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বা হইতেছে, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শাস্ত্র এবং ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির আলোচনাদ্বারা মার্জ্জিতবুদ্ধি সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উহা দূরীকরণার্থে লেখনী ধারণ করা কি কর্ত্তব্য নহে?—এবং যদি ইহা বিহিত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই মনের ভাব সুন্দররূপে লেখনী-মুখে ব্যক্ত করিতে যত্ন করা কি উচিত নহে?

বর্ত্তমানে অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের একটা বড়ই কলঙ্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা শিক্ষাবিভাগের বহির্ভাগে বিচরণ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেই পূর্ব্বাধীত বিদ্যা একেবারে ভুলিয়া যান। অপর সাধারণ লোকহইতে তাঁহাদিগকে বাছিয়া বাহির করা এক প্রকার দায় হইয়া উঠে। কেন এমন হইল?

বাইবেলে একটি উপকথা আছে। কোন প্রভু তদীয় ভৃত্য-ত্রয়কে যথাক্রমে পাঁচটি দুইটি ও একটি মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বিদেশ চলিয়া যান। প্রথম ভৃত্যটি তাহার পাঁচটি মুদ্রাদ্বারা ব্যবসায় করিয়া আর পাঁচটি লাভ করিল। দ্বিতীয় ভৃত্যও ঐরূপে আর দুইটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিল। তৃতীয় ব্যক্তি, প্রভুর মুদ্রা প্রভুকে ফিরাইয়া দিতে হইবে ভাবিয়া, তদ্বর্দ্ধনার্থে কোনও চেষ্টা করা বিধেয় বিবেচনা করিল না। যথাসময়ে প্রভু প্রত্যাগত হইলে আপন আপন বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া প্রথম ব্যক্তি দশটি, দ্বিতীয় চারিটি এবং তৃতীয় একটি মুদ্রা আনিয়া, তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিল। প্রথম ও দ্বিতীয়ের প্রতি প্রভু নিরতিশয় প্রীত হইয়া যথোচিত পুরস্কার বিধান করিলেন; পরন্তু তৃতীয় ভৃত্যকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক দূর করিয়া দিলেন।

আমাদের বর্ত্তমান-কালীন শিক্ষিতের দল ও প্রভুর তৃতীয় ভৃত্যের সম-শ্রেণীস্থ নহেন কি? তাঁহারা বিদ্যালয়প্রদত্ত জ্ঞান সাধারণ মধ্যে প্রচার রূপ ব্যবসায় দ্বারা পরিপুষ্ট করেন না, তাই সুধীসমাজকর্ত্তৃক তিরস্কারের ভাজন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট এই মাত্র নিবেদন,—তাঁহারা একটু আলস্য পরিত্যাগ করুন; একবার অধীত বিদ্যার আলোচনা করুন; এবং দেশ-মধ্যে উহা প্রচার করিয়া উপার্জিত শিক্ষিত কলঙ্ক অপনোদন করুন।

গ্রন্থার্জ্জিত-জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়-নির্গত ব্যক্তি-বৃন্দই যে কেবল এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত, এমন নহে। "শিক্ষিত"

পর্য্যায়ে এমন সকল ব্যক্তিকেও ধরা গিয়াছে, যাঁহারা নিজের ভূয়োদর্শনের ফলে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মানব সাধারণকে শিখাইবার ও বুঝাইবার উপযুক্ত অনেক বিষয় শিখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, যাঁহাদের চরণসমীপে বসিয়া অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বরপুত্র, সংসার, সমাজ, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের সমীচীন মীমাংসা শিক্ষা করিতে পারেন। অর্ব্বাচীন সমাজের উপদেশার্থ, উল্লেখিত প্রাচীনগণের লেখনী ধারণ করা কি উচিত নহে ?

এক্ষণে দেখা গেল যে লিখিবার জন্য, অর্থাৎ মনের ভাব সুন্দররূপে লেখনীমুখে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত, চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিষয়টি একটু তলাইয়া দেখিলে কিছু সহজ বলিয়াই অনুমিত হইতে পারে। মানব মাত্রেই আমরা নিজ নিজ মনের ভাব বাগ্‌যন্ত্র কিম্বা লেখনীযন্ত্রের সাহায্যে আশৈশব প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা ছাত্রাবস্থায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সাংবৎসরিক, বৈশ্ববিদ্যালয়িক প্রভৃতি অগণন পরীক্ষাসূত্রে উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের অত্যুদার ব্যবহার করিয়াছেন; সম্প্রতি সংসার-মঞ্চে উকীল, হাকিম, কেরাণী ও শিক্ষক ইত্যাদি বিবিধ বেশে ঐ দুই যন্ত্রেরই সহায়তায় বিচরণ করিতেছেন, এবং এতদ্দ্বারা মনের নানা ভাব ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ইহার নিমিত্ত প্রয়াসের কথা কেন ? কথাটা এই যে, যাহা সাধারণের সমালোচনার অধীন করিয়া পত্রস্থ করিতে হইবে, তাহা যেরূপে একটু সংযত করিয়া ও বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়, তৎপক্ষেই চেষ্টার প্রয়োজন; কেন না বিষয়কর্ম্মে

বা চিঠিপত্রে আমরা ভাষার সংযত ও বিশুদ্ধ ভাবের প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর সচরাচর পাইয়া উঠি না।

কিন্তু আরও একটি কথা, একটু গুরুতর কথাই বক্তব্য রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে বাগ্‌যন্ত্র ও লেখনীযন্ত্রের পরিচালনার কথা উল্লেখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ স্থলেই, মাতৃভাষার সঙ্গে অধুনাতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ থাকে না। বাল্যে বিদ্যালয়ে এবং সম্প্রতি বিষয়কর্ম্মে ইংরাজী ভাষারই চর্চ্চা করাতে, তাঁহাদের অধিকাংশই নিজের মাতৃভাষার আলোচনায় নিতান্ত পরাঙ্মুখ; ইংরেজী ভাষা যেন তাঁহাদের চিত্তটা যুড়িয়া রাখিয়াছে, স্বদেশের ভাষা যেন স্থিতিবিরোধিতা নিয়মে উহার কাছেও ঘেঁসিতে পারিতেছে না। "বিবাহ-বিভ্রাটের" মিঃ সিংহের ন্যায় প্রকৃতই তাঁহাদের বাঙ্গালা বলিতে যেন কষ্ট হয়, এবং যাহা বলেন, তাহা যেন মনে মনে ইংরাজী হইতে তরজমা করিয়া এবং শতকরা নিরনব্বইটি ইংরেজী শব্দের বুক্‌নী দিয়া বাহির করিয়া থাকেন। তাঁহারা সংবাদ পত্র পাঠ করিবেন ইংরেজীতে, পুস্তকাদি পাঠ করিবেন ইংরেজীতে, পরস্পর আলাপ করিবেন ইংরেজীতে, এমন কি পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির নিকট চিঠিখানাও লিখিবেন ইংরেজীতে। সুতরাং ইহাঁরা বঙ্গভাষায় কোন কিছু বলিতে বা লিখিতে গেলে তাহা পারিবেন কেন? যখন তাঁহাদের মনে সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করিবার উপযোগী কোন ভাবের উদয় হয়, তাহা অগত্যা ইংরেজীতেই ব্যক্ত হইয়া থাকে, বঙ্গভাষায় উহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা উঁহারা খুঁজিয়াই পান না।

উপরি লিখিত প্রথার পক্ষে প্রায়শঃ একটি যুক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ আমাদের রাজা; শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কাজ কর্ম্ম প্রায় অধিকাংশ স্থলে রাজভাষাতেই সম্পাদন করিতে হয়; এবং রাজপুরুষগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে হইলে, উত্তমরূপে রাজভাষা লিখনের ও কথনের অভ্যাস করা আবশ্যক; অতএব ইংরেজী ভাষার সম্যক্ আলোচনা করাও আবশ্যক। আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের ভাষাটারও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা রাখা কি সঙ্গত নহে? শিক্ষিত ব্যক্তিগণই যখন দেশের মুখপাত্র, তাঁহারা যদি মাতৃভাষার পরিচর্য্যা না করেন, তবে ইহা আর কাহার নিকট আশ্রয় লাভ করিবে? বিশেষতঃ তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে ইদানীন্তন কালে যাঁহারা বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ইংরেজী ভাষায় বিশেষ কৃতী এবং অনেকেই রাজপুরুষগণের সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধ। কাব্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সাধারণ সাহিত্যে ভূদেব, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, প্রভৃতির কথা বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ফলতঃ, ঐ যে মাতৃভাষানুশীলনে ঔদাস্য, উহা দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক মহতী জড়তার পরিসূচক ভাব মাত্র; নচেৎ যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা একটু মনোযোগ দিলেই এতদ্বিষয়ে ন্যূনাধিক কৃতিত্ব-লাভ অবশ্যই করিতে পারেন।

অনেকে এই বলিয়াও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে,

দেশীয় ভাষায় পাঠোপযোগী গ্রন্থ বা পত্রিকা আদৌ নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ বলিলে এক প্রকার মানিয়া লইতাম; বর্ত্তমানে বঙ্গ ভাষার অনেক পুষ্টিসাধন হইয়াছে, এখন সে কথা স্বীকার্য্য নহে কিন্তু তথাপি বঙ্গভাষার অনেক অভাব আছে, এবং সেই সকল অভাব দূর করিবার জন্যইত শিক্ষিতগণকে আহ্বান করা যাইতেছে। যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা এই অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে বঙ্গভাষার যুগান্তর সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা যদি ঐরূপ যুক্তি ধরিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষা ভারতবর্ষের অধুনাতন প্রচলিত ভাষাবলীর মধ্যে আজ এক অতি প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারিত কি? তাই নিবেদন, ভবিষ্য বংশের শিক্ষিতগণ যাহাতে মাতৃভাষায় পড়িবার জিনিস আরও অধিক পরিমাণে পান, বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গভাষায় লিখিবার জন্য অভ্যাস করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা কিরূপে উহা করিবেন, তাহা স্বয়ংই বাছিয়া লইতে পারেন। তথাপি এতৎ সম্বন্ধে দুই একটি কথা তাঁহাদিগের বিবেচনাধীন করা যাইতেছে :—

(১) প্রাচীন ও আধুনিক বিখ্যাত বঙ্গীয় লেখকগণের রচিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ইদানীং যে সকল গ্রন্থকারের রচনা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বলিয়া বিখ্যাত তাঁহাদের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্বীয় রচনা গঠিত বা মার্জ্জিত করিতে হইবে।

(২) বঙ্গভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ করা কি চিঠি

পত্র লেখা, এবং রাজকার্য্য পরিচালনা পক্ষে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য্য; কিন্তু তদিতর বিষয়ে মাতৃভাষারই অনুশীলন কর্ত্তব্য। * কথাবার্ত্তায় তবু শিক্ষিত সম্প্রদায়, অবিমিশ্র না হউক, বঙ্গভাষা কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু চিঠিপত্রে আদৌ উহার প্রচলন নাই। পিতা পুত্রের নিকট, এবং পুত্র পিতার নিকট পত্র লিখিতেও "মাতৃ" ভাষা বর্জ্জন করেন, ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের কথা কি হইতে পারে?

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দিনলিপি (diary) ও স্মারক লিপি (note-book) প্রভৃতি লিখিবার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজীর পরিবর্ত্তে ঐ সকল বঙ্গভাষাতেই লেখা উচিত। চিঠি পত্রাদি অপরের গোচরীভূত হয়, কিন্তু ঐ গুলি কেবল নিজের নিকটেই থাকে, সুতরাং শিক্ষানবিশের পক্ষে ঐরূপে রচনাভ্যাসে কোনরূপ সঙ্কোচের ভাবও আসিতে পারে না।

(৩) বিবিধ ভাষার গ্রন্থরাজির অংশবিশেষ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা উচিত। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে রচনা শিক্ষার উহা একটি সুগম উপায়। বিশেষতঃ, নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ জ্ঞানরাশি হইতে ভাবসংগ্রহ পূর্ব্বক মাতৃভাষার পরিপুষ্টি সাধন করা, ভাষার এই ক্রমিক উন্নতির অবস্থায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অতি প্রধান কর্ত্তব্য। দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির যে অভাব

---

* সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহোদয় "সাহিত্য-পরিষদে"র সভ্যগণকে পরস্পর আলাপ ও চিঠি পত্রাদিতে বঙ্গভাষার ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে পরিষদের সভ্যগণ কতদূর মনোযোগ দিতেছেন, জানা যায় নাই।

বর্ত্তমানে অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা ঐ রূপেই পূরণ করিতে হইবে, এবং অনুবাদ অভ্যাস থাকিলে তৎপক্ষে বিশেষ সহায়তা হইতে পারে।

(৪) রচনাবিশুদ্ধি এবং শব্দসম্পত্তি লাভের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করা আবশ্যক। সংস্কৃত অতি জটিল ভাষা এবং সম্যক্ আয়ত্ত করা কঠিন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিয়দ্দূর প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে অবশ্যই কিছু না কিছু সংস্কৃতালোচনা করিতে হইয়াছিল; এবং যদিও বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইয়া কি তৎপূর্ব্বেই তাঁহারা সংস্কৃতের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি, জড়তা পরিহার করিয়া পূর্ব্বাধীত গ্রন্থগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই, বোধ হয়, অনেকে সাধারণ সংস্কৃত বুঝিতে পারিবেন। এইরূপে কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু আয়াস স্বীকার করিলে, তাঁহারা শকুন্তলা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রসাস্বাদন করিয়া পরিশ্রমের সফলতাও অনুভব করিতে পারিবেন। সংস্কৃত না জানাতে অনেকে সামান্য পত্রখান লিখিতে গিয়াও যে কত বর্ণাশুদ্ধি, শব্দের অপপ্রয়োগ প্রভৃতি অমার্জ্জনীয় দোষ ঘটাইয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

(৫) প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, উদ্যমমাত্রেই কৃতিত্বলাভ করা দুঃসাধ্য। উদ্যমকারী যে সকল রচনা করিবেন, তাহা দুই একবার নিজে সংশোধিত করিয়া, অপেক্ষাকৃত খ্যাতিমান্ লেখকদিগের মধ্যে কাহাকেও দেখান উচিত। অতিশয় শালীন-

শীলতা কিংবা প্রভৃত আত্মনির্ভরতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় রচনা অপরকে না দেখাইয়া, অভিনব রচয়িতা যেন সহসা উহা বিবৰ্জ্জিত বা প্রকাশিত না করেন; কেননা নিজের দৃষ্টিতে যাহা অবিসংবাদিভাবে মন্দ বা ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়, অপরের চক্ষুতে তাহা তদ্বিপরীত প্রতীয়মান হইতে পারে।

প্রবন্ধাদি লিখিতে গেলে দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন—ভাব ও ভাষা; প্রবন্ধকে একটা চেতন পদার্থ ভাবিয়া ভাষাকে উহার শরীর ধরিলে ভাবকে উহার প্রাণ বলিতে হইবে। ভাষারূপ শরীরের উপাদান বিষয়ে বরং মতামত প্রদান করা যাইতে পারে, এবং এতৎপ্রবন্ধে ঐ বিষয়েই দুই একটি কথা বলা হইল, কিন্তু ভাবরূপ প্রাণ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বড়ই কঠিন। ভাব দ্বিবিধ,—প্রতিভা-জাত এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ। হৃদয়ে যার সত্তা থাকিলে ভাষা আপনা আপনি বহির্গত হয়, সেই ভাব প্রতিভা-সম্ভূত। উহা যাঁহার আছে, সেই প্রতিভাশীল ব্যক্তিকে লিখিবার নিমিত্তও অনুরোধ করিতে হয় না, ভাষা বিষয়েও উপদেশ দিতে হয় না। তিনি যাহা লিখিবেন তাহাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য, তাঁহার ভুল ভ্রান্তিও আর্ষ্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। পরন্তু যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভূয়োদর্শনের ফলে এবং গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা ভাব-সংগ্রহশীল, সেই সকল ব্যক্তিই এতৎ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

জগতে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ ভাব সৃষ্টি করিয়া যান, অপর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহা আয়ত্ত করিয়া আলোচনা ও আন্দোলন

দ্বারা লোক মধ্যে উহার প্রচার করিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেমন আচার্য্য ঋষিগণের ঋণ স্বাধ্যায় অধ্যাপনা তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা আছে, ভাবশাস্ত্রেও তদ্রূপ প্রতিভার ঋণ আলোচনা ও প্রচার কার্য্য দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা স্মরণ রাখিয়া, যথাশক্তি এতৎ-কার্য্যে এই সাহিত্য-সেবকের সঙ্গে যোগদান করেন, ইহাই প্রার্থনা।

[সাহিত্য-সেবক, ফাল্গুন ১৩০২ ।]

আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষা সমালোচনা।

এমনও দিন গিয়াছে যখন নব্যবঙ্গ, সংস্কৃত গ্রন্থ কি সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পরিপোষণ করিতেন। সম্প্রতি সে ভাবের তিরোধান হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে, অনেকেরই পূর্ব্ব পুরুষদিগের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। দেশের লোক বুঝিয়াছেন, সংস্কৃত চর্চ্চাই স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাসের অবগতি এবং পৈতৃক সনাতন ধর্ম্মের অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইলে যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, তৎকরণে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ। অর্থকরী ইংরেজী বিদ্যার অনুশীলনেই সর্ব্বদা তাহাদিগকে যত্নশীল দেখা যায়।

অনেকেই আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে যে সমস্ত ষোল আনী পণ্ডিত দেখা যাইত এখন তেমন পণ্ডিত আর দেখিতে পাই না। কালধর্ম্মবশতঃ লোকের ধারণা শক্তির হ্রাস হইতেছে ইহাও উহার অন্যতম কারণ বটে; কিন্তু প্রধান কারণ এই যে আমাদের অনেক পুত্র থাকিলে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ সচরাচর তাহাকেই আমরা সংস্কৃত শিক্ষার্থে উৎসৃষ্ট করিয়া থাকি। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ অপর সন্তানগুলিকে, অর্থহেতু

ইংরেজী শিক্ষায় নিয়োজিত করি। এমন ব্যক্তিদিগের দ্বারা পণ্ডিতবর্গের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশা করা বৃথা।

বুদ্ধিমান্ ছাত্র যে সংস্কৃত শিক্ষায় জীবন উৎসর্গ করে না এমনও নহে। কিন্তু আজকালকার সংস্কৃত শিক্ষার যে প্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত তাহাতে অনেক বুদ্ধিমান্ ছাত্রকেও পরিশেষে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

সর্ব্বাগ্রে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাই সংস্কৃত শিক্ষার রীতি; তাহা প্রশস্তই বটে। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রণালীতে যে গলদ প্রবেশ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বঙ্গদেশে মৌলিক ব্যাকরণ অধীত হয় না। পাণিনীয় প্রভৃতি ব্যাকরণের খুঁজ খবরও অনেকে রাখে না। কলাপ ব্যাকরণকে সম্পূর্ণাবয়ব মৌলিক ব্যাকরণ বলিতে পারি না।* অজ্ঞ রাজাকে অনধিক আয়াসে সংস্কৃতের মোটামুটি জ্ঞান দিবার জন্যই এই ব্যাকরণের সৃষ্টি। সুতরাং কলাপ ব্যাকরণে মোটামুটি মাত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। চূড়ান্ত জ্ঞান জন্মাইবার জন্য, পরিশেষে, পরিশিষ্ট, পঞ্জী, কবিরাজ ইত্যাদি অধ্যয়ন করিতে হয়। এ সমুদয় একত্র করিলে মৌলিক পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রায় দ্বিগুণ আয়তন হয়, অথচ একমাত্র পাণিনীয় ব্যাকরণ পড়িলেই, অধিক না হউক, অন্ততঃ সেই জ্ঞানটুকু অবশ্যই হইবার কথা।

তারপর ব্যাকরণের ভাষা। অবশ্য, প্রথম শিক্ষার্থীকে যে

* পূর্ব্ব বঙ্গের চতুষ্পাঠীর ছাত্র ও অধ্যাপকমহোদয় দিগকেই লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল; তাই কলাপ ব্যাকরণেরই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

অনেকটা না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিতে হইবে তাহা অপরিহার্য্য। কিন্তু প্রথমতঃ, বঙ্গভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকার ন্যায় ব্যাকরণের অধ্যয়ন দ্বারা শব্দ, ক্রিয়া, কারক, সমাস প্রভৃতির সাধারণ একটু জ্ঞান জন্মাইতে অতি অল্প বয়স্ক শিশু-দিগেরও অধিক দিন লাগিতে পারে না; অথচ "সিদ্ধো বর্ণ সমাম্নায়ঃ" প্রভৃতি সূত্রের অর্থ বোধ না হউক, অন্ততঃ অন্বয় বোধ অনায়াসেই হইবে এবং এতদ্দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র সূত্রাদির অর্থ পরিগ্রহ ও আয়ত্তীকরণের অনেক সাহায্য হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার এই রীতি প্রচলিত নাই। সন্ধি ও চতুষ্টয় পর্য্যন্ত কেবল শুকবৃত্তিই অবলম্বিত হয়, তারপর যদি ছাত্রের অদৃষ্টে থাকে আখ্যাতে খ্যাতি লাভ করিতে পারে। কলাপ পড়িয়া পাঁচ বৎসরের ন্যূনে অতি বুদ্ধিমান্ ছাত্রকেও ব্যাকরণে পারদর্শী হইতে সচরাচর দেখা যায় না। পাণিনীয় ব্যাকরণ যে এতদপেক্ষা অনেক অল্পতর সময়েই আয়ত্তীকৃত হইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহ; অথচ ইহাতে একটা মৌলিক ব্যাকরণ অধীত হয়। বিশেষতঃ কলাপ পড়িয়া যখন ছাত্রগণ সাহিত্যাদি পড়িতে যায়, তখন মল্লিনাথ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণের টীকাতে কলাপের সূত্রাদির নাম গন্ধও না দেখিয়া হতাশ হয়, এবং নূতন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকরণান্তরের সূত্রাদি পুনরভ্যস্ত করিতে হয়। গোড়া হইতে পাণিনি পড়িলে এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না।

এই গেল ব্যাকরণের কথা। দর্শন স্মৃতি প্রভৃতির অধ্যয়নেও

ঐ রূপ গলদ। ন্যায় ছাড়া বঙ্গদেশে আর কোনও দর্শন প্রচলিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জন যে অনেক দিন হইল হইয়াছে, তাহা আর উল্লেখ করিয়া দুর্দ্দশার স্মৃতি দ্বারা মনকে বৃথা ক্লিষ্ট করিতে চাই না। ঐ যে সন্ধ্যা উপাসনার সময় গোটা কতক মন্ত্র, শ্রাদ্ধাদির সময় পঠিত কতকগুলি বচন, তাহাও সাপের মন্ত্রের ন্যায় অর্থ গ্রহণ না করিয়া উদগার্ণ করা হয়; ইহাতেই আমাদের বেদজ্ঞান পর্য্যবসিত। বেদের অস্তের সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তেরও অন্তর্দ্ধান এবং বেদাঙ্গেরও অঙ্গহানতা হইয়াছে। যে বলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, যাহার মহিমায় আর্য্যগণ অসার বিষয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, সেই বেদান্ত ও উপনিষদাদির আলোচনা চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ফল তর্কাদি শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করাতেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অধঃপতন ঘটিয়াছে; তাঁহারা বিষয়লোলুপ হইয়াছেন এবং বিধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের আক্রমণ হইতে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের দুরবস্থার কথা আর কি বলিব? মূল গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি সঙ্কেতাবলম্বনে নিরক্ষরপ্রায় গণকগণের দ্বারা ইহার চর্চ্চা হইতেছে। * আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সৌভাগ্যক্রমে

* এই সকল কথা এই পত্রের বিগত সংখ্যায় "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" সমালোচনার্থে লিখিত প্রস্তাবে আমাদের মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন গুপ্ত এম. এ মহোদয় বিশদভাবে দেখাইয়াছেন।

বৈদ্য মহোদয়গণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহাতেই এই ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনেও উহার বিলোপ না হইয়া একটু উন্নতিই দেখা যাইতেছে। কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আগম শাস্ত্র হাতুড়েদের হাতে পড়িয়া প্রায় পটল তুলিয়াছে। আরও কত শাস্ত্র যে বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে?

ব্যাকরণ ব্যতীত আজ কাল যাহা কিছু আলোচিত হয় তাহা কেবল স্মৃতি, পুরাণ, ন্যায় এবং কিয়ৎ পরিমাণে সাহিত্যগ্রন্থ। স্মৃতিশাস্ত্র কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদায়ক, কেননা তৈলবটাদিতে কিছু কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা; সুতরাং তাহার আলোচনাদিও হইয়া থাকে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মূল প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থাদি উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ঋষিপ্রতিম রঘুনন্দন ভাগ্যে একখানা সংগ্রহ গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাই আমাদের স্মৃতি ব্যবসায়ীদের বেশ একটু পসার চলিতেছে; নতুবা যে কি হইত বলা যায় না। সংহিতাদির আলোচনা বর্তমানে সম্যক্ হয় না বলিলেও অন্যায় হয় না। পুরাণ শাস্ত্রও কিছু একটু অর্থদায়ক; কেননা, পাঠকতা করিতে গেলে এবং শিষ্যাদি রাখিতে গেলে পুরাণের অধ্যয়ন প্রয়োজনীয়; কিন্তু তাহাও বড় বেশী লোককে পড়িতে দেখা যায় না। ন্যায়শাস্ত্রের দুর্দ্দশা ও বিড়ম্বনার কথা এক মুখে আর কত কহিব? গৌতমাদি ঋষির মৌলিক সূত্রাদির চর্চ্চা অতি অল্প মাত্রই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কি কুক্ষণে ফাঁকি ও পাত্‌ড়া রূপিণী দুইটা রাক্ষসী আসিয়াছিল, যে যাঁহারা

ন্যায়গহনে প্রবেশ করেন, তাঁহারাই হয় অর্দ্ধ পথ হইতে পলায়ন করেন, নয় একেবারে মাথাটা হারাইয়া আইসেন; দৈববশে কচিৎ কেহ রাক্ষসীর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

বর্ত্তমানে কাব্যাদির এবং তৎসঙ্গে অলঙ্কার শাস্ত্রের সমধিক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। তবে কি পণ্ডিত মহাশয়েরা কাব্যামৃত রসের আস্বাদ করিতে ভালবাসেন?

ইংরেজী বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের যাহা কিছু চর্চ্চা হয় তাহা কেবল সাহিত্যেরই। স্কুল-কলেজে সাহিত্য গ্রন্থাদি অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে। তাই পণ্ডিতির আশায় অনেকে কাব্যের প্রতি মন দিতেছেন এবং অলঙ্কার না জানিলে সাহিত্য চলেনা, সুতরাং তাহারও কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিয়া থাকেন। কঠোর ও নীরস ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে কোমল মধুর কাব্যের কিছু কিছু আলোচনা হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভয় হয় পাছে কাব্যের রসে বিভোর হইয়া অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূর্ণ মাত্রায় বিলাসী হইয়া পড়েন। যেরূপ কালমাহাত্ম্য দেখা যায়, ইহা যে না ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবেইত হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা।

উপসংহারে আমাদের এই বক্তব্য যে আজ কাল ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের যেরূপ হ্রাস দেখা যায় তাহাতে শঙ্কা হয় পাছে বা ক্রিয়া কাণ্ডেরই লোপ হয়। এই রূপ হ্রাসের কারণ এই যে

ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে সংযম-ধন নহেন, সেই "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ" প্রভৃতি নীতি ভুলিয়া জীবনসংগ্রামে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা কালের ধর্ম্ম এবং সমাজের দুর্ভাগ্যের হেতু সন্দেহ নাই। অতএব সংস্কৃত শিক্ষার রীতির জটিলতা ও বিষয়ের গভীরতা একটু কমাইয়া, যাহাতে অল্প বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও ভাষা এবং বিষয়ে একটু প্রবেশ লাভ করিতে পারে তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়া অধ্যাপক মহোদয়গণের কর্ত্তব্য। যে সকল ছাত্র ইচ্ছা সত্ত্বেও সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালীর ও বিষয়াবলীর দুরূহত্বে ভীত হইয়া সুখ-পাঠ্য ইংরেজী বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, বিষয় ও প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইলে তাহারা সংস্কৃতই অধ্যয়ন করিবে এমন আশা করা যাইতে পারে। সেরূপ পরিবর্ত্তন কি উপায়ে করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপাধ্যায় মহোদয়েরাই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন, আমরা তৎকরণে অনধিকারী। তবে এই মাত্র বলা যায়, যে এক্ষণে আর ফাঁকি পাতড়ার দিন নাই ; সুতরাং এই সকল আগাছা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপে মৌলিক দর্শন, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থাদি আলোচিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কাব্য পুরাণ ইত্যাদি অধ্যাপিত হয় তাহা করিতে হইবে। বিশেষতঃ এই ধর্ম্ম বিভ্রাটের সময়, ছাত্র-গণ যাহাতে স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রথমতঃ নিজে বুঝিয়া, পশ্চাৎ উন্মার্গ প্রস্থানোম্মুখ সামাজিক ব্যক্তিদিগকে বুঝাইতে পারে, অধ্যাপক মহাশয়েরা উহাদিগকে সেইরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদান করিবেন। বর্ত্তমানে প্রয়োজন, যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে একাধারে নৈয়ায়িক, শাব্দিক, স্মার্ত্ত, ধর্ম্মোপদেষ্টা সমস্ত হইতে হইবে; এ ছাড়া

ব্রাহ্মণকৃত্য যাজনিক ক্রিয়া কাণ্ডেও পারদর্শী হইতে হইবে। সুতরাং কেবল ন্যায়-ব্যাকরণের ফাঁকি পাত্‌ড়ায় দিন কর্ত্তন করিলে অবশেষে দুরবস্থার পরিসীমা থাকিবে না। বিচারমল্লের বিজয়ের দিন চলিয়া গিয়াছে, সেই জন্য অনুশোচনা করি না, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে নানা শাস্ত্রের সারজ্ঞ হয়েন না এবং তাঁহাদের নিকট যাইয়া ধর্ম্মতত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিরা যে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

[সারস্বত পত্র, ২৬শে বৈশাখ ১২৯৯।]

ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার। *
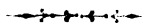
"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃপরনির্ব্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥"

কোন কাব্যের টীকাদি লিখিবার পূর্ব্বে প্রাচীন টীকাকারগণ প্রায়শঃ মম্মটভট্টের এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। উক্ত কবিতাতে কবির কাব্য লিখিবার প্রয়োজন এবং পাঠক সাধারণের উহার আলোচনা করিবার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কবি কাব্য লিখেন,—(১) "যশসে"—অমর কীর্ত্তি লাভ করিবার নিমিত্ত; (২) "অর্থকৃতে" ধন লাভের জন্য;—উদাহরণ স্থলে "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" বলা হয়। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের কবিযশঃস্পৃহা বড়ই বলবতী ছিল, অথচ তদনুরূপ কবিত্ব শক্তি ছিল না. তাই দরিদ্র কবি ধাবককে প্রচুর ধনদান পূর্ব্বক রত্নাবলী নাগানন্দ প্রভৃতি প্রণয়ন করাইয়া "শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ" এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। † কবির কাব্য লিখিবার তৃতীয় প্রয়োজন—"শিবেতরক্ষতয়ে" অমঙ্গল বিনাশনের নিমিত্ত; যেমন ময়ূরভট্ট সূর্য্যশতক প্রণয়ন

* শিলং সাহিত্য সভার সমালোচনী শাখার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম, এ কর্ত্তৃক পঠিত হইত। জন্মভূমি-সম্পাদক।

† এই উদাহরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনেকেরই কিন্তু সন্দেহ আছে।

করিয়া দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই গেল কবির কথা। তারপর পাঠকের কথা। উঁহারা কাব্যালোচনা করিবেন,—(১) "ব্যবহারবিদে"—লোকাচার পরিজ্ঞানের নিমিত্ত; যেমন মৃচ্ছকটিক নাটক পড়িলে রাজা শূদ্রকের সময়ে (প্রায় ৩০০ খৃঃ পূঃ) ধর্ম্মাধিকরণে কিরূপ বিচার প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা জানা যায়।" (২) "সদ্যঃ পরনির্ব্বৃতয়ে" কাব্যপাঠমাত্রেই কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়, তাহার অনুভবের নিমিত্ত। বিশেষতঃ (৩) "কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে"—শ্রুতি প্রভৃতি আমাদিগকে প্রভুর ন্যায় আদেশ করেন, পুরাণেতিহাস বন্ধুর ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু পতি হিতৈষিণী প্রণয়িনী যেরূপ উন্মার্গগামী ভর্ত্তাকে অবসর বুঝিয়া নানাছাঁদে বিনাইয়া কোমল মধুর স্ফুটাস্ফুট বচনাবলীদ্বারা ধীরে ধীরে সৎপথে আসিতে উপরোধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কাব্যও পাঠকের মনে নানা রস ও ভাবের অবতারণা করিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া মহৎ চরিত্রের সাধু আদর্শ প্রভৃতি অলক্ষিত ভাবে হৃদয়-পটে মুদ্রিত করিয়া, অল্লাধিক উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলীর কোনটি অবলম্বন পূর্ব্বক ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার তদীয় মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উহা পাঠ করিলে পাঠকেরই বা কি ফল লাভ হয়, তাহা প্রসঙ্গক্রমে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। উপস্থিত, ভট্টিকাব্য কাহার রচিত—ইহাই আমাদিগের প্রধানতঃ আলোচনার বিষয়। তর্ক-

হরিনামক কবি এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যে দুইজন কবি ভর্ত্তৃহরি নামে খ্যাত ছিলেন * বলিতে হইবে ;—(১) শৃঙ্গার-শতক, নীতি-শতক এবং বৈরাগ্য-শতক এই কোষকাব্যত্রয়ের গ্রন্থকার এবং (২) ভট্টিকাব্যের রচয়িতা। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, দুই জন ভর্ত্তৃহরি কল্পিত না হইয়া একজন কবিকেই শতকত্রয় এবং ভট্টিকাব্যের রচয়িতা বলা যায় না কেন? এই আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত দুই প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করা যায়। প্রথম বাহ্য; কোষ-কবি ভর্ত্তৃহরি এবং ভট্টি-কবি ভর্ত্তৃহরির ভিন্ন ভিন্ন জীবনাখ্যায়িকা লোক সমাজে প্রচারিত আছে। দ্বিতীয় আভ্যন্তর; তাঁহাদিগের রচিত কাব্য মধ্যে বিভিন্ন ভাব ও রুচি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শৃঙ্গার-শতক প্রভৃতি রচয়িতা ভর্ত্তৃহরি রাজা ছিলেন। কথিত আছে, তিনি—ভারতের হারুণ-অর্-রশিদ—রাজা বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ছিলেন। মধ্য যুগের রাজন্যবর্গের যেমন রীতি ছিল, তিনিও তদ্রূপ বিলাসী রাজা ছিলেন। কথিত আছে, একদিন কোন সন্ন্যাসী একটি ফল আনিয়া রাজাকে বলিলেন যে এই ফল ভক্ষণকারী ব্যক্তি চিরযৌবনসম্পন্ন হইবেন। ভোগ-বিলাস-পরায়ণ স্ত্রৈণ রাজা, নিজে না খাইয়া, সেই ফল রাণীকে উপহার দিলেন। রাণীর এক উপপতি ছিল, তিনি তাহাকে দিলেন। ঐ ব্যক্তির

* শব্দ শাস্ত্রের সম্প্রদায়-বিশেষের-গুরু, বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থ রচয়িতা প্রসিদ্ধ ভর্ত্তৃহরি এই দুইজনের অন্তর্গত কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। ভং সং।

অপর এক উপপত্নী ছিল, সে উহাকেই ফল অর্পণ করিল। সেই রমণীর আবার রাজার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি ছিল, সে পরকীয়া ভাবের নিষ্কামত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজাকেই ফল প্রদান করিল। এইরূপে ফলটি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং অনু-সন্ধানপূর্ব্বক আমূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সংসারে বীতরাগতা-বশতঃ তৎক্ষণাৎ অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিলেন। প্রবাদ—তদীয় নীতি-শতকের প্রথম শ্লোকে এই ঘটনাই উল্লিখিত হইয়াছে—

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সা চান্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যরক্তঃ।
অস্মৎকৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ॥"

এই ভর্ত্তৃহরির জীবনী অনেক পরিমাণে শান্তিশতককার শিহ্লন মিশ্রের * অনুরূপ। শৃঙ্গার, নীতি ও বৈরাগ্য শতকের উদ্দেশ্য ও ভাব প্রায় শান্তিশতকেরই ন্যায়। এমন কি, ভর্ত্তৃ-হরির অনেক কবিতা শান্তিশতকে অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়; উদাহরণ স্থলে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইল। ইহাতে উভয় কবিই যেন সমস্বরে স্বীয় জীবনের পূর্ব্ব কাহিনী এবং তাৎকালিক ভাব জন-সমাজে বিবৃত করিতেছেন।

"যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং
তদা জাতং নারীময়মিদমশেষং জগদপি।

* শিহ্লন মিশ্রের জীবনী বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনীর অবিকল অনুরূপ;—অধিক কি, উভয়কে একই ব্যক্তি বলিয়া যেন সন্দেহ হয়।

ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং
সমীভূতা দৃষ্টি স্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে॥"

ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকারের জীবনী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি, পরম ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামীর পুত্র। তাঁহার অদ্ভুত শৈশব কাহিনী বাঙ্গালা ভক্তমালগ্রন্থহইতে উদ্ধৃত করা গেল—

"শ্রীল শ্রীধর স্বামী জগতে বিদিত।
শ্রীমদ্ভাগবত টীকা কৈল বিস্তারিত॥

* * *

শাঙ্করী বিরুদ্ধ গৌণ লক্ষণা ব্যাখ্যান।
দূষিয়া স্থাপিলা শুদ্ধ মত বিলক্ষণ॥

* * *

গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণ গর্ভবতী।
ত্যজিয়া যাইতে বন হইল দৃঢ় মতি॥
হেন কালে নারী, পুত্র প্রসব হইয়া।
কাল প্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখিয়া॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তিত, বালক এই কেবা রক্ষা করে॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জ্যেঠি-ডিম্ব।
চাল হতে প'ড়ে গেল বিনা অবলম্ব॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হতে বাচ্ছা নিকলিয়া।
খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া॥
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।

সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল ॥
এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল ॥
সেই শিশু, কালে মহা পণ্ডিত হইল।
ভট্টিনামে রাম-লীলা সাহিত্য রচিল ॥"

গ্রন্থকার নিজ কাব্যের উপসংহারে আত্ম পরিচয়স্থলে এই মাত্র বলিয়াছেন—

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধর সেন (?) নরেন্দ্র পালিতায়াম্ ॥"*

ইহাতে দেখা যায় যে, ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার বলভী-নগরাধিপ শ্রীধর সেন (?) ভূপতির আশ্রয়ে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করেন।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তদ্দারা উভয় কবির জীবনীতে বিলক্ষণ বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতেছে এবং উহাই উভয় কবি একই ব্যক্তি না হইবার যথেষ্ট প্রমাণ। † এই গেল বাহ্য প্রমাণ; আভ্যন্তর প্রমাণও দুই একটী প্রদর্শিত হইতেছে।

কোষকাব্যের রচয়িতা ভর্তৃহরির উদ্দেশ্য ভাল হইলেও, শৃঙ্গারশতকে আদি-রসের অযথা অনেক ছড়াছড়ি করিয়া উক্ত

* বলভী এক সময় ভারতবর্ষের মধ্যে সুসমৃদ্ধ রাজধানী ছিল, সেই সময়ের এবং তৎস্থলীয় রাজগণের বিস্তৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। সং, সং।

† উভয়ের আবির্ভাব-কালেরও বিলক্ষণ অন্তরায় রহিয়াছে। ভর্তৃহরির অনুজ বিক্রমাদিত্যের অনেক পরে শঙ্করাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্যের অনেক পরে ভট্টিকারের পিতা শ্রীধরস্বামী জন্ম পরিগ্রহ করেন।

শতকের নাম সার্থক করিয়াছেন এবং স্বীয় রুচিরও বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভট্টিকাব্যের রচয়িতা তদীয় প্রকাণ্ড গ্রন্থে অনতিস্থূল একটী সর্গে (একাদশে) মাত্র আদি রসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য বুঝা যায়;—প্রথম, সমস্ত রসের প্রধান আদি রস একটা মহাকাব্যের অঙ্গী না হইলেও অঙ্গরূপে থাকা আবশ্যক; * দ্বিতীয়, গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য শব্দশাস্ত্রের নানাবিষয়ক উদাহরণ-প্রদর্শন, তাই কাব্যমধ্যে আদি রসের উদাহরণেরও প্রয়োজন। টীকাকারও বলেন,—"মাধুর্য্যমপি কাব্যস্য গুণ উক্তঃ। ইতি তৎ প্রদর্শনার্থং লঙ্কাপ্রভাতবর্ণনমধিকৃত্য আহ।" এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এ বিষয়ে কবি অনেক পরিমাণে সংযত রুচির অনুসরণ করিয়া মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির অপেক্ষাও সমধিক প্রশস্য হইয়াছেন।

আর একটী আভ্যন্তর প্রমাণ দেখা যায়। কোষ-কাব্যের কবি ভর্ত্তৃহরি প্রগাঢ় শৈব ছিলেন। তিনি বৈরাগ্য-শতকে শিবার্চ্চনা-বিষয়ক শ্লোক-মালার একটীতে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

"মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে
জনার্দ্দনে বা জগদন্তকারণে।
ন বস্তুতো মে প্রতিপত্তিরস্তি
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে॥"

* শৃঙ্গার বীর শান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে। অঙ্গানি সর্ব্বেঽপি রসাঃ।
—সাহিত্য-দর্পণ।

মহাকালাধিষ্ঠিত উজ্জয়িনীর ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বরের এবং সম্প্রতি অবধূতাশ্রমাবলম্বীর ইহা হইবারই কথা। কিন্তু ভট্টি কাব্যের গ্রন্থকার একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈষ্ণবের সন্তান, তাঁহার অবশ্য বৈষ্ণব হওয়াই স্বাভাবিক এবং "রামলীলা-সাহিত্য" রচনা করিয়া তিনি ঘোরতর বৈষ্ণব ভক্তমাল রচয়িতারও প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। বিশেষতঃ টীকা মুখে ভট্টীকাব্যের টীকাকার-গণ সমস্বরে স্বীকার করিয়াছেন যে, কাব্যের প্রথম শ্লোকে "সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্" এই বাক্য দ্বারা কবি স্বীয় ইষ্ট-দেবতাকেই স্মরণ করিয়াছেন।

ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকারের নাম কি ছিল, তাহা অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। টীকাকার জয়মঙ্গলের মতে গ্রন্থকারের নাম ভট্ট বা ভট্টি এবং কবির অনুকরণে তিনিও স্বকৃত টীকার নাম "জয়মঙ্গলা" রাখিয়াছেন।

তাঁহার টীকার উপক্রমণিকায় আছে—"শ্রীস্বামি সূনুঃ কবি র্ভট্টিনামা রামকথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার"। আবার পরি-সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন, "ইতি শ্রীস্বামিসূনোর্ভট্টমহাব্রাহ্মণস্য কৃতৌ" ইত্যাদি। বৈদ্য টীকাকৃৎ ভরতমল্লিক বলেন,—"ভর্ত্তৃ-হরির্নাম কবিঃ শ্রীরামকথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার।" কবি আপন গ্রন্থমধ্যে আপনার নাম কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই; অপর কবিগণ হইতে ইহাও তাঁহার এক বিশেষত্ব। বঙ্গানূদিত ভক্ত-মালেও * তাহার নাম দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ভক্তমালোদ্ধৃত

* মূল ভক্তমালগ্রন্থ দেখিবার নিমিত্ত বলবতী স্পৃহা সত্ত্বেও এ যাবৎ লেখকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই অনুমান হয় যে, যেহেতু পরম ভাগবত পিতা শ্রীধরস্বামী অনাথশরণ ভগবান্ শ্রীহরির উপরেই নবজাত শিশুর ভরণের ভারার্পণ করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাহাতে কবির নাম "ভর্ত্তৃহরি" হওয়াই স্বাভাবিক। শৈশবে "গ্রাম্য লোক" দ্বারা প্রতিপালিত হওয়াতে তদীয় নামের প্রাকৃতাপভ্রংশ হইয়া "ভট্টি" এই অদ্ভুত আকার ধারণ করাও নিতান্ত অসম্ভব নহে। অথবা, "কালে সেই শিশু মহাপণ্ডিত" হইলে 'ভর্ত্তৃহরি ভট্ট' এই নাম ধারণ করিয়া, পিতা শ্রীধর স্বামী যেমন মাত্র 'স্বামী' নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ, "ভট্ট" এই খ্যাতিতেই, বোধ হয়, তৎকালে পরিচিত হইতেন এবং তজ্জন্যই তদ্রচিত কাব্যও 'ভট্টিকাব্য' এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। এইরূপ কল্পনা দ্বারা জয়মঙ্গল ও ভরতমল্লিকের বিবাদের এক প্রকার সমন্বয় হইতে পারিত, কিন্তু তাহাতে এক মহান্ অন্তরায় রহিয়াছে। সাহিত্য-দর্পণে মহাকাব্য লক্ষণে আছে,—

"কবের্ব্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা। নামাস্য—" দর্পণ টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ (১৬২৩ শকাব্দে) উক্ত কারিকার উদাহরণ স্থলে লিখিয়াছেন—"কবিনামকং মহাকাব্যং যথা মাঘভারবিপ্রভৃতি; বৃত্তনামকং কুমারসম্ভবাদি; নায়কনামকং রঘুপ্রভৃতি; ইতরনামকং ভট্টিপ্রভৃতি।" ইহাতে জয়মঙ্গলের মত সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইতেছে। তবে, কবির নামে, নাম না হইলে, "ভট্টিকাব্য" এই সংজ্ঞার তাৎপর্য্য কি? এতৎ সম্বন্ধে কাব্যের পরিসমাপক

নিম্নোদ্ধৃত দুইটী শ্লোক দ্বারা দুই প্রকার মীমাংসা কল্পিত হইতে পারে।

(১) "ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥

ইহাতে এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকার পণ্ডিত (ভট্ট) গণের পরিতোষার্থে কাব্য রচনা করাতে কাব্যের নাম "ভট্টিকাব্য" হইয়াছে।

(২) "কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধর সেন * নরেন্দ্র পালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥"

এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, কাব্য-রচনার শ্রেষ্ঠতম ফল "কীর্ত্তি" আশ্রয়দাতা ভট্টারকের নামে উৎসর্গীকৃত হওয়াতেই 'ভট্টিকাব্য' এই নাম সিদ্ধ হইয়াছে।

যাহা হউক, ভরত মল্লিকের মতই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া এতদ্দেশে গৃহীত হইয়াছে এবং ভর্তৃহরি নামক কবি ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার, ইহা একরূপ সর্ববাদিসম্মত। "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ভরতমল্লিকের মত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন টীকাকার জয়-

* বঙ্গীয় পুস্তকে এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু 'শ্রীধরসূনু' এই পাঠই যেন গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বোধ হয়। লিপিকর প্রমাদে 'ন' স্থলে 'স' হওয়া বিচিত্র নহে। জয়মঙ্গল "শ্রীধর সূনু" এই পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মঙ্গলকে প্রামাণিক বলিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি বলেন,—"ভট্টিকাব্য ভর্ত্তৃহরি রচিত—ইহা অসম্ভব, কেন না ভর্ত্তৃ-হরি স্বয়ং রাজা হইয়া বলভীরাজের আশ্রয়ে ছিলেন তাহা হইতে পারে না।" যদিও উক্ত প্রমাণ বড় অকাট্য নহে, তথাপি তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মত বিরোধ নাই; বরং উহা অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণাবলীর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা ভর্ত্তৃহরি ভট্টিকাব্যের রচয়িতা নহেন। ভরত মল্লিকও এমন কথা বলেন নাই যে, কোষকাব্যপ্রণেতা রাজা ভর্ত্তৃহরি ভট্টিগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই আপাত-বিরোধ মীমাংসার জন্যই দুইজন ভর্ত্তৃহরি কল্পিত করা গিয়াছে। অপর, জয়মঙ্গল প্রাচীন টীকাকার বলিয়াই যে প্রামাণিক হইবেন, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে, তাহা হইলে কালি-দাসের 'দুর্ব্বাখ্যাবিষমূর্চ্ছিতা' ভারতীকে সঞ্জীবনী দ্বারা উজ্জীবিতা করিবার প্রয়াস অর্ব্বাচীন মল্লিনাথকে করিতে হইত না। যাহা হউক, জয়মঙ্গল প্রামাণিক সন্দেহ নাই; তথাপি যে ভরত মল্লিক অধুনাতন হইয়াও তাঁহার মতের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি নিজ মত পোষক সবিশেষ প্রমাণ অবশ্যই পাইয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ, প্রাগুক্ত দর্পণ-টীকাকার প্রায় দ্বিশতবর্ষপ্রাচীন তর্কবাগীশকেও ভরতেরই তুল্যমতাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়। জয়মঙ্গল যে তাৎকালিক কোন অমূলক কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে একটা মত স্থাপন করিয়া যান নাই, কে বলিতে পারে? অপিচ ইতিপূর্ব্বে কাব্যের পরিসমাপক যে দুই শ্লোক

উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, বিদ্বদ্বর্গের পরিতুষ্টির জন্য এবং স্বীয় আশ্রয় দাতা যশস্বী হউন—এই উদ্দেশ্যেই, তিনি কাব্য রচনা করেন। কাব্য লিখিয়া নিজে নাম করিব—এমন ভাব তাঁহার দেখা যায় না। এমন কি, অপর কবিগণের ন্যায় তিনি সর্গসমাপ্তিসময়েও আপনার নামোল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন; এরূপ বিনীত নিষ্কাম কবি নিজ নামে কাব্যের নামকরণ করিয়াছেন—ইহা আপাতদৃষ্টিতেই যেন অসঙ্গত বোধ হয়।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" সংস্কৃত ভাষায় সরল, মধুর, ললিত প্রভৃতি রচনার উদাহরণস্থলে ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের প্রথম হইতে উনবিংশ শ্লোক, উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ফলতঃ ভট্টির দ্বিতীয় সর্গের প্রথমাংশ পাঠ করিলে, বোধ হয়, যদি কবি সাধ করিয়া ব্যাকরণের নিগড়বদ্ধ না হইতেন, তাঁহার স্থান মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষের, পূর্বে না হউক, পার্শ্বেই হইত। শব্দ শাস্ত্রের উপর তাঁহার যেরূপ অধিকার ছিল, অপর কোন কবির তদ্রূপ ছিল কি না সন্দেহ; অথচ সহৃদয়তা এবং কবিত্বও তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল। কাব্য লিখিয়া নিজের কবিত্ব খ্যাপন করা অপেক্ষা যাহাতে তাঁহার শক্তি বিদ্যার্থীর উপকারার্থে নিয়োজিত হয়, ইহাই যেন কবির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

এই কাব্য প্রণয়ন সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে এক অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। কবি একজন অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন;

নানা দিগেদশ হইতে অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়নমানসে আসিত। একদা তিনি অধ্যাপনা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ও ছাত্রদিগের মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা হস্তী চলিয়া গেল এবং তজ্জন্য এক বৎসর অধ্যাপনা বন্ধ রাখিতে হইল। বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের পাঠ বন্ধ থাকিলেও কাব্যাদি উপশাস্ত্র সম্বন্ধে তত আঁটা আঁটি নাই; এই নিমিত্ত, শিষ্যদিগের উপরোধে, তিনি ব্যাকরণ শিক্ষার সাহায্যকারী কাব্য গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন এবং সংবৎসর কাল মধ্যে উহা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছিলেন।* এই জনশ্রুতির তথ্যানুসন্ধান সুদূর পরাহত।

মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অনধ্যায়-প্রকরণে বিধান আছে;—

"পশুমণ্ডূকমার্জ্জার শ্বসর্পনকুলাখুভিঃ।
অন্তরাগমনে বিদ্যাদনধ্যায়মহর্নিশম্॥"

"পশুর্গবাদিঃ"—(কুল্লূক ভট্ট)। গবাদিতে হস্তীও থাকিবার কথা, তাহা হইলে এক অহোরাত্র মাত্র অনধ্যায় হওয়া উচিত ছিল;—সংবৎসর অনধ্যায়ের কোন হেতু দেখা যায় না। তবে মূষিক, নকুল, ভেক, সর্পাদি ক্ষুদ্র জন্তুর অন্তরাগমনে যে ব্যবস্থা, একটা প্রকাণ্ড জন্তুর পক্ষেও কি সেই ব্যবস্থা? এইরূপ বিতর্ক-

* এদেশে প্রচলিত প্রবাদ:—অধ্যয়নে অনাবিষ্ট রাজপুত্র, ভর্ত্তৃহরির নিকটে অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হন। রাজপুত্রের ষড়্‌যন্ত্রেই পাঠকালে অধ্যাপক এবং রাজপুত্রের মধ্য দিয়া হস্তী চালিত হয়। তৎপরে ভর্ত্তৃহরি সেই ষড়্‌যন্ত্র জানিতে পারিয়া কাব্যচ্ছলে ব্যাকরণের উপদেশ দেন। জং সং

কারী কোন তার্কিকদিগ্‌গজ গজপক্ষে অনুপাতক্রমে এক বৎসর অনধ্যায় বিধান করিয়া এই একটা অমূলক কিংবদন্তী রটাইয়াছেন কি না, কে বলিতে পারে?

অস্মদ্দেশীয় টোলের ছাত্রদিগের নিকট ভট্টিকাব্যের বিলক্ষণ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আশৈশব ব্যাকরণের সূত্রগুলি শুষ্ক উদাহরণ সহ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে; তাই, এই সকল সূত্রের সুপ্রযুক্ত সরস উদাহরণ-মালা দেখিয়া তাহারা বড়ই প্রীতি সহকারে সেইগুলি আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ব্যাকরণবিমুখ ইদানীন্তন কাব্যমধুকরগণের পক্ষে ভট্টিকাব্য নিতান্ত নীরস ও কর্কশ বোধ হইবারই কথা। বস্তুতঃ প্রথম কয়েক সর্গ ভিন্ন ভট্টির অপর সর্গগুলি যেন ব্যাকরণের এক এক পরিচ্ছেদ। কাব্য-বিভাগে ভট্টি যেমন দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, ব্যাকরণ বিভাগে উহা আবার, প্রধানতঃ, চারি কাণ্ডে বিভক্ত;—প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ—প্রকীর্ণ কাণ্ড, ষষ্ঠ হইতে নবম—অধিকার কাণ্ড, দশম হইতে ত্রয়োদশ—প্রসন্ন কাণ্ড এবং চতুর্দ্দশ হইতে দ্বাবিংশ—তিঙন্ত কাণ্ড। প্রকীর্ণ কাণ্ড নানাবিষয়ক, সুতরাং ইহাতে কবির কবিত্বের স্ফূর্ত্তিলাভের একটু অবকাশ ছিল; তাই প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ * সাহিত্যসেবীর কথঞ্চিৎ মনোরঞ্জন করিতে পারে এবং এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কয় সর্গের অধিকতর আদর। অধিকার কাণ্ডে কৃত্তদ্ধিতাদি প্রত্যয়ের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসন্ন কাণ্ডে কবি

* পঞ্চম সর্গ 'প্রকীর্ণ' ও 'অধিকার' এই উভয় কাণ্ড মিশ্রিত।

বাক্যের প্রসাদ সূচক অলঙ্কার প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন, এবং তিঙন্ত কাণ্ডে আখ্যাত প্রকরণ অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থূল বিভাগ ব্যতীত প্রত্যেক কাণ্ডের আবার নানা উপ-বিভাগ আছে,—এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ব্যাকরণই কবির একমাত্র লক্ষ্য হওয়াতে কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচনে তিনি মৌলিকতা প্রদর্শনের অবসর পান নাই; কিন্তু আধুনিক কবিগণের প্রধান উপজীব্য বাল্মীকির অমর গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করাতে কাব্যের উপাদানের নিমিত্ত তাঁহাকে বড় বেগ পাইতেও হয় নাই।

এখন এই প্রবন্ধ-সূচনায় উদ্ধৃত মম্মট ভট্টের কারিকাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখা যাউক, এই মহা কাব্য লিখিয়া গ্রন্থ-কারের কি প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে এবং উহা পাঠে অধ্যয়ন কারীরই বা কি ফললাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার 'কবি-যশঃ-প্রার্থী' ছিলেন না—বরং তৎ-কাব্যজনিত কীর্ত্তি কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ আশ্রয়দাতা নরেন্দ্র নৃপতিকেই উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু কবি স্বয়ং কিছু প্রার্থী না হইলেও, উল্লিখিত নিষ্কাম সহৃদয়তা প্রদর্শন করাতে, তদীয় ন্যায্যপ্রাপ্য কবিযশঃ সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ব্যাকরণাধ্যায়ীদিগের দুষ্প্রাপ্য উদাহরণ রাশি রসাত্মক বাক্যাকারে গ্রথিত করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করাতে, কবি-কীর্ত্তির সঙ্গে তদীয় পাণ্ডিত্যকীর্ত্তি সম্মিলিত হইয়া গ্রন্থকারকে অনন্য-সাধারণ যশোভাজন করিয়া তুলিয়াছে; সুতরাং ভট্টিকাব্য তদীয়

প্রণেতার 'যশসে'ই হইয়াছে বলিতে হইবে। * অধ্যয়নকারীরও বিশেষ ফল আছে। মম্মটমতানুযায়ী 'ব্যবহার' পরিজ্ঞান ইহাতে কিঞ্চিৎ হয় বটে, কিন্তু কবিগুরু বাল্মীকি অনেক পূর্ব্বেই অধিকতর দক্ষতা সহকারে তাহা সর্ব্বজন গোচরীভূত করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের অংশ বিশেষ (যথা দ্বিতীয় সর্গ) পাঠ করিলে 'সদ্যঃপর-নির্ব্বৃতি'ও হইয়া থাকে। কিন্তু প্রধানতঃ এই মহাকাব্য পাঠকের 'উপদেশযুক্তে'ই প্রণীত হইয়াছে। রাম-চরিত্রের পুণ্য কাহিনী যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহা কাব্যাংশে যেরূপই হউক না কেন, অধ্যয়নকারীর অন্তঃকরণে নায়কের মহৎ চরিত্রের ছায়া অল্পাধিক পাতিত করিবেই করিবে। এই নৈতিক উপদেশ ব্যতীতও ভট্টিকাব্যানুশীলনকারীর অন্যবিধ উপদেশ লাভ হয়, যাহা অপর কাব্যগ্রন্থ হইতে লাভ করা দুষ্কর। ধৈর্য্য-সহকারে এই গ্রন্থ সমগ্র অধ্যয়ন করিতে পারিলে শব্দশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু যিনি এই উপদেশ প্রার্থী, তাঁহার গ্রন্থোপসংহার কালীন গ্রন্থকারের একটি কথা মনে রাখা উচিত।

"দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেদ্ব্যাকরণাদৃতে॥"

---

* কাব্যের কীর্ত্তি উপহার লাভ করিয়া, রাজা নরেন্দ্র কবির কিঞ্চিৎ পুরস্কার বিধান করিয়াছিলেন কি না এবং রামলীলাত্মক কাব্য-প্রণয়নে কবির কোন (আধ্যাত্মিক বা শারীরিক) অশিবোপশম হইয়াছিল কি না, জানা যায় নাই। সুতরাং ভট্টিকাব্য গ্রন্থকারের 'অর্থকৃতে' এবং 'শিবেতরক্ষতয়ে' হইয়াছিল কি না বলা অসম্ভব।

ফলতঃ অগ্রে ব্যাকরণ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন না হইয়া এই কাব্য অধ্যয়ন করিলে যথেপ্সিত ফল লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব।

"মধুরেণ সমাপয়েৎ",—সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আরও একটি কথা বলিতে হইল। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের মুখে একটি শ্লোকার্দ্ধ শুনা যায়—

"ভট্টাবেকস্ত্রয়ো মাঘে রঘৌ কাব্যং পদে পদে।"

এই "একে"র ব্যাখ্যা কেহ করেন 'সর্গ', কেহ করেন 'শ্লোক'। সর্গবাদীরা দ্বিতীয় সর্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; তৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। শ্লোক বাদিগণের মধ্যে কেহ উক্ত সর্গের ষষ্ঠ, কেহ বা ঊনবিংশ শ্লোক নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, এই উভয় শ্লোকই অতি মধুর এবং তজ্জন্য তাহা পাঠক সাধারণের সুবিদিত হইলেও, এই প্রবন্ধের উপসংহারে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"প্রভাত বাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীশং সহতেঽন্যসঙ্গমম্॥"

* * *

"ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্পদম্।

নষট্ পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ ॥"

আশা করি, এতদ্দারা ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকারের স্বভাব সিদ্ধ কবিত্ব শক্তি কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারা যাইবে।

জন্মভূমি, আষাঢ় ১৩০২।

কালিদাসের কাহিনী।

(১) বিবাহ।

মহাকবি কালিদাস ভারতের অমূল্যরত্ন। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, যাঁহার গৌরবে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার জীবনীসম্বন্ধে সমস্তই অন্ধকারের গভীর গহ্বরে নিহিত রহিয়াছে। ফলতঃ, জীবনাখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা এতদ্দেশে বর্ত্তমান না থাকাতে, প্রাচীন ভারতের বড় বড় লোকের জীবনের ইতিহাস জানা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে। এই জীবনাখ্যায়িকার অভাব নিবন্ধন, এই সকল বড় লোকের সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু ধারণা, তাহা কতকগুলি লোক-পরম্পরাগত কাহিনীর উপরই অগত্যা নির্ভর করিতেছে। কালি-দাসসম্পর্কে যাহা কিছু সাধারণের গোচরীভূত, তাহাও এই অজ্ঞাতমূলা কিংবদন্তীর উপরেই সংস্থাপিত। এই সকলের আলোচনায় বিশেষ কোন লাভ না থাকিলেও আমোদ যথেষ্টই আছে।

জগতে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রথিত এই যে কালিদাস, তিনি নাকি বাল্যে একজন গণ্ড-মূর্খ ছিলেন! কেবল স্বয়ং মূর্খ নহেন, মূর্খের পুত্র মূর্খ। পিতামহও মূর্খ ছিলেন কি না, এতদ্বিষয়ে কিংবদন্তী নীরব। কালিদাস কোন্ সময়ের লোক—

তাহা লইয়া গবেষণাপটু মনীষিগণের মধ্যে এযাবৎ বিচার-বিতণ্ডা চলিতেছে। তাহাতে আরও একটি ক্ষুদ্র সমস্যা যোগ করা যাইতেছে। যে সময় হইতে ব্রাহ্মণগণ মনুসংহিতার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া আপনাপন সন্তানদিগকে শাস্ত্রাধ্যয়ন রূপ নিগড়পাশ হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই কালিদাস জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাসের দ্বৈ-পুরুষিকী মূর্খতার প্রমাণও জন-শ্রুতি,—আজকাল এই 'শ্রুতির' প্রমাণ কতদূর গ্রাহ্য হইবে বলিতে পারি না।

কালিদাস বাগ্দেবীর অসাধারণ কৃপাপাত্র—নানা দিগ্দেশ হইতে অসংখ্য ছাত্রবর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। অধ্যাপকের অসামান্য পাণ্ডিত্য দর্শনে শিষ্যগণ ভাবিল, না জানি তাঁহার পিতৃদেব কতই অগাধ বিদ্বান্,—কারণ, তখনকার লোকের ধারণা ছিল, জগতে পাণ্ডিত্যের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রস্ব হইতেছে। কালিদাসের সময়ে শিষ্যেরা "গুরু কুলে" বাস করিত কি না, গবেষণাসাপেক্ষ; কিন্তু কালিদাসের শিষ্যগণ গুরুর পিতৃদেবের সাক্ষাৎকার লাভ সহজে করিতে পারে নাই, একথা নিশ্চিত। যাহা হউক, শিষ্যগণের বহু অনুরোধে কালিদাস স্বীয় জনকের সহিত উহাদের পরিচয় করাইতে সম্মত হইলেন। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বার্দ্ধক্যোচিত বেশে সজ্জিত হইয়া জপ-মালা হস্তে উচ্চৈঃ-স্বরে তারকব্রহ্ম 'রাম' নাম মাত্র বারংবার উচ্চারণ করিতে পুত্র কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, কালিদাস-জনক কুতূহলী ছাত্রবর্গের সম্মুখে আগমন করিলেন। কালিদাসের পিতা যে কেবল মূর্খ ছিলেন

এমন নহে; জীবনের পূর্ব্বতন কালে যে কোন দিন তিনি ভগবন্নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই, বক্ষ্যমাণ ঘটনায় তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃদ্ধ 'রাম', 'রাম' উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া মূর্খত্বসূচক জিহ্বার জড়ত্ব নিবন্ধন "রাভণ" "রাভণ" বলিতে লাগিলেন। অধ্যাপক-জনকের এই দিগ্‌গজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া শিষ্যগণ ঈষদ্ধাস্যে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কালিদাস অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা বুঝিতে পারিলে না, পিতৃদেব তোমাদিগের নিকট এই পূর্ব্ব পক্ষ করিলেন,—

"কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি ভকারোঽস্তি বিভীষণে।
রক্ষঃশ্রেষ্ঠে কুলজ্যেষ্ঠে স কথং নাস্তি রাবণে?"

কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এই দুয়েতেই ভকার বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হইয়াও এমন কি অপরাধ করিলেন যে, তাহাতে মহাপ্রাণ ভকার নাই?" কালিদাসের ছাত্রগণ এই পূর্ব্বপক্ষের কোনও মীমাংসা করিতে পারিয়াছিল কি না, আমরা তাহা অবগত নহি।

এমন মূর্খের পুত্র মূর্খ হইবে না ত কি? এই পৈতৃক প্রকৃতি লইয়া "মন্থনের পূর্ব্বে অনভিব্যক্তরত্নোৎপত্তি অর্ণবের ন্যায়" যখন কালিদাস, ব্রাহ্মণ হইয়াও গোচারণের মাঠে বিরাজমান হইয়া গো-নিতম্বোপরি লবণ রক্ষা পূর্ব্বক মূর্খত্বেরফল-স্বরূপ, সঙ্কার বদরীর স্বাদ গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন যে জগতে পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ছিল না, এমন নহে; বরং উহা কেবল পুরুষের

করায়ত্ত না থাকিয়া কোন কোন রমণী রত্নেরও আয়ত্ত হইয়াছিল। ভারতের কোন এক রাজার পরম রূপসী কন্যা সার্থকনাম্নী বিদ্যোত্তমা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, "যিনি আমাকে বিচারে পরাজয় করিবেন, তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন।" সৃষ্টির আদ্যা নায়িকা মহাবিদ্যা যে প্রতিজ্ঞাবাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, * এতৎ কাহিনীর নায়িকা বিদ্যোত্তমা তাহারই প্রতিধ্বনি করিলেন। বররুচির নায়িকা 'বিদ্যা' (ভারতচন্দ্রের কৃপায় বঙ্গদেশে যিনি সুপরিচিতা) যে এই বিদ্যোত্তমারই এক অনুকৃতি নহেন, তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ বররুচি কালিদাসেরই সহযোগী (এবং প্রতিযোগী) ছিলেন, এ কথাও স্মর্ত্তব্য। অথবা, শক্তিরূপিণী নারীজাতির মধ্যে কোন একটা শক্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ হইলেই বুঝি, তত্তৎ শক্তি দ্বারা পুরুষবিজিগীষাই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও কোন 'বিদুষীর' জীবনী ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে। যাহা হউক, বিদ্যোত্তমার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া অনেক মহামহোপাধ্যায় আসিয়া জুটিতে লাগিলেন, কিন্তু একে একে সকলেই পরাস্ত হইয়া গেলেন। হায়, বিদ্যোত্তমার ভাগ্যে বুঝি আর "সুন্দর" বা "মেধাবী" পতিলাভ ঘটিবে না!

---

* শুম্ভপ্রেরিত দূতের প্রতি ভগবতীবাক্য—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

নির্জ্জিত পণ্ডিতদিগের মধ্যে কতকগুলি যুবক একত্র ষড়্যন্ত্র করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই বিদ্যোন্মত্তা বিদ্যোত্তমার সঙ্গে একটা হস্তি-মূর্খের বিবাহ দিতে হইবে এবং এতদাশয়ে তাঁহারা তদ্রূপ মূর্খের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহাদের মনোরথ সফল হইতে বিলম্ব হইল না, অচিরেই দেখিলেন, এক যুবক এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া ঐ শাখারই মূলভাগ কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সে এমনই মূর্খ যে, ছেদনকার্য্য সমাপ্ত হইলেই যে শাখাসহ স্বয়ং ভূমিসাৎ হইবে, ইহাও তাহার মনে উদিত হয় নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর মূর্খ মিলিবে না ভাবিয়া পণ্ডিতের দল উহাকে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করাইলেন। বলা বাহুল্য, ইনিই আমাদের গল্পের নায়ক—সরস্বতীর ভাবী বরপুত্র। বৃক্ষাবতীর্ণ কালিদাসকে পণ্ডিতের দল বুঝাইলেন যে, তাহাকে এক রূপবতী রাজকন্যা বিবাহ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল তাঁহাদের অনুগামী হইতে হইবে এবং বিবাহক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মৌনাভাবাবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। বিবাহের নামে কাষ্ঠপুত্তলিকাও নাকি মুখব্যাদান করিয়া থাকে। তাই মূর্খ কালিদাস উহাতে অবশ্যই সম্মতি দিলেন।

পণ্ডিতেরা কালিদাসকে তাঁহাদের অধ্যাপক বলিয়া রাজকন্যার নিকট পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন, ইনি সম্প্রতি 'বাচংযম'—কাহারই সহিত আলাপমাত্রও করেন না, ইঙ্গিতে মাত্র স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। একটি যুবক এতগুলি পণ্ডিতের অধ্যাপক, ইহাতে বিদ্যোত্তমা বিস্মিতভাবে কালিদাসের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলে, মূর্খ কালিদাস কি জানি কি ভাবিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি বক্র করিয়া দেখাইলেন। ইহাতে পণ্ডিতের দলে মহা-কোলাহল পড়িয়া গেল, তাঁহারা ব্যাখ্যা করিলেন, আমাদের অধ্যাপক দুই হস্তের (বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত) অষ্টাঙ্গুলি বক্র করিয়া বুঝাইলেন যে, অষ্টাবক্র ঋষি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে জনক রাজার সভা জয় করিয়াছিলেন, সুতরাং "তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে"। এইরূপে কালিদাস যে কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি করিলেন, পণ্ডিতদিগের কেহ না কেহ তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিতে লাগিলেন। অতঃপর অধ্যাপকের হইয়া পণ্ডিতেরা বিদ্যোত্তমার সঙ্গে বিচার আরম্ভ করিলে, যে যে স্থানে রাজকন্যা পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া আনেন, সেই সেই স্থলেই অমনি এক জন পণ্ডিত গিয়া কালিদাসের পশ্চাদ্ভাগে চিম্‌টি কাটিতেন, তাহার যন্ত্রণায় মৌনী কালিদাস হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন। * রাজকন্যা এই সকল দেখিয়া কালিদাসকে মহাপণ্ডিত স্থির করিলেন এবং শিষ্যগণকে ছাড়িয়া অধ্যাপকের সঙ্গে সাংকেতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যোত্তমা কালিদাসের প্রতি এক অঙ্গুলি প্রদর্শন করিলেন; মূর্খ কালিদাস কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রথমতঃ এক অঙ্গুলি পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া দুই অঙ্গুলি দেখাইলেন। এবার অতি-

* গল্প আছে, কোনও বিদ্যালয়পরিদর্শক একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলত ব শব্দের উত্তর ঙস্ (ষষ্ঠীর একবচনে) করিলে কি হয়?" অধ্যাপক দেখিলেন ছাত্র ঠকিয়া আসিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে ছাত্রের পশ্চাতে গিয়া জোরে একটি চিমটি কাটিলেন, অমনি ছাত্র "উঃ" করিয়া উঠিল, প্রশ্নেরও উত্তর হইয়া গেল। এই অধ্যাপকও বুঝি কালিদাসের শিষ্যীভূত পণ্ডিতগণের কাহারও শিষ্যপরম্পরাভুক্ত ছিলেন।

বুদ্ধিমতী রাজকন্যা আপনিই পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং সেই মূর্খের গলায় বরমাল্য প্রদান করিয়া পণ্ডিতের দলের মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। সভাস্থ সকলে রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি প্রশ্ন করিলেন, কি উত্তরই বা মিলিল, যে ইহাকে বরণ করিলেন?" বিদ্যোত্তমা উত্তর করিলেন, 'আমি ইঁহাকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ''একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম বিষয়ক পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিলাম, ইনি ইঙ্গিতে প্রথমতঃ স্বীকার করিলেন—ব্রহ্মপদার্থ এক, কিন্তু তথাপি প্রকৃতি পুরুষ এই দুইয়ে বিভক্ত না হইলে ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল হয়েন না, পশ্চাৎ ইহাই বুঝাইলেন।'

যথারীতি বিদ্যোত্তমা ও কালিদাসের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কোন স্মার্ত্ত পাঠক অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "রাজকন্যা অবশ্যই ক্ষত্রিয়ের দুহিতা ছিলেন, (কেননা তখনও আজিকালিকার ন্যায় ঔপাধিক চাতুর্ব্বর্ণিক রাজা সৃষ্ট হয়েন নাই, ইহা নিশ্চয়।) তবে ব্রাহ্মণ কালিদাসের সঙ্গে কিরূপে তাঁহার বিবাহ হইল?" এতদুত্তরে মহাকবি ভারতচন্দ্রের "পণে জাতি কেবা চায়?" এই কথার দোহাই দিয়া কন্যাপক্ষকে সান্ত্বনা করিতে পারা যায়; কিন্তু বরপক্ষকে সহজে বুঝান দায়। তবে, অপর বিষয়ে কথঞ্চিৎ মানবিক উদারতা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াবিবাহ প্রথা) বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই ধরিয়া লইয়া কিংবদন্তীর পক্ষ অনুসরণ করিতে হইবে।

বিবাহান্তে দম্পতী বাসরগৃহে নীত হইলেন। তথায় পালঙ্কোপরি মশারি ঝুলান ছিল। মূর্খ কালিদাসের মনে হইল, 'কন্যা

পালঙ্কোপরি বসিয়াছে, আমাকে বুঝি তদুপরি বিস্তৃত মশারির উপর বসিতে হইবে।' এই ভাবিয়া মশারির উপর আরোহণ করিবার চেষ্টা করিবামাত্র উহা ছিঁড়িয়া গেল, এবং কালিদাস রাজকন্যার উপরে পড়িয়া গেলেন। এত বড় দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের এইরূপ ব্যবহারে বুদ্ধিমতী বিদ্যোত্তমার বিস্মিত হইবার কথা বটে ; কিন্তু একটা ঘটনার উপর সকল সময় মতামত নির্ভর করে না, কেননা তাহা আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে। তথাপি রাজকন্যার অন্তরে সন্দেহ জন্মিল। তখন সহসা একটা উষ্ট্র ডাকিয়া উঠাতে রাজকন্যা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ডাকিতেছে ?" এইবার বরপাত্রের প্রথম বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল,—তিনি একবার বলিলেন, 'উস্ট', পরক্ষণে আবার বলিলেন, 'উট্র'। এতক্ষণে বিদ্যোত্তমার চৈতন্য হইল ; তিনি বিজিত পণ্ডিতগণের এই গূঢ় পরিহাসরূপ ষড়্‌যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দারুণ মনস্তাপ উপস্থিত হইল। তখন, তাদৃশ অবস্থাগত ব্যক্তির ন্যায়, দোষ দিবার অপর পাত্র না পাইয়া, দগ্ধকপাল বিধাতাকেই উপলক্ষ করিয়া বলিলেন,—

"কিং ন করোতি বিধির্যদি রুস্টঃ
কিং ন করোতি স এব হি তুস্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রংবা ষংবা
তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা ॥"

বিদ্যোত্তমে ! আক্ষেপ করিলে কি হইবে ? সংসারের গতিই ঈদৃশী,—তোমার সম দুঃখভাগিনী জগতে তোমার অনেক ভগিনীই

ছিলেন, আছেন ও হইবেন। কিন্তু এ—ছি ছি!—কি করিলে? মূর্খ বলিয়াই কি স্বামীকে (ব্রাহ্মণকে) পদাঘাত করিতে হয়? এই কি তোমার বিদ্যাশিক্ষার পরিণাম? ঐ দেখ গণ্ড-মূর্খ হইলেও তোমার এই জড়বুদ্ধি স্বামী লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে, ম্রিয়মাণ হইয়া এই গভীর রজনীর অন্ধকারে কোথায় লুকাইতে চলিয়াছে। তুমি আজ অভিমানে অহঙ্কারে উহা দেখিলে না; কিন্তু একদিন তোমাকে এই নিমিত্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতে হইবে—ইহা কি তুমি বুদ্ধিমতী হইয়াও বুঝিলে না?

পাঠক! মূর্খের কীদৃশী মর্য্যাদা, বুঝিলেনত? কাহারও গৃহে যেন মূর্খত্বের প্রশ্রয় দেখিতে না হয়। আজ এই পর্য্যন্ত।

সাহিত্যসেবক, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩।

কালিদাসের কাহিনী।

(২) বিদ্যালাভ।

কিন্তু গল্প লিখিতে বসিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, পূর্ব্বে ইহা জানিলে, এ কাজে হাত দিতাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকল গল্পের মূল জন-শ্রুতি; বাজারে আজকাল আসল "শ্রুতি"রই ততটা বিশ্বসনীয়তা নাই, এ'ত 'জন-'শ্রুতি। তুমি বলিলে, "তোমার এই কাহিনীর মুখপাতই ঘোরতর অবিশ্বাস্য; কেন না, এত বড় পণ্ডিত কালিদাস,—তিনি যুবা বয়সেও নিরেট মূর্খ ছিলেন, এটা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা; দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যোত্তমা হেন প্রতিভা-শালিনী রাজকন্যাও কিনা বাসর ঘরে না যাওয়া পর্য্যন্ত একটা গণ্ডমূর্খের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইতে পারিলেন না! ইতিমধ্যে একটা বিবাহক্রিয়াও ত নিষ্পন্ন হইয়া গেল? মনূক্ত দশবিধ বিবাহ, কিংবা সুধীবর কালীপ্রসন্ন ঘোষের "প্রমোদলহরী"তে উল্লেখিত অশেষবিধ বিবাহ, ইস্তক ৭২ সালের কৈশবী-সংহিতা-বিহিত বিবাহ, এতৎ সমুদয়ের পদ্ধতিরাশি খুঁজিয়া দেখিলাম, কৈ কোন পদ্ধতিতেই ত একেবারে একটা বিকট মূর্খ প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিত বলিয়া পার পাইতে পারে, এরূপ কোনও ফাঁক দেখা গেল না; জানি না, বিদ্যোত্তমার সঙ্গে কালিদাসের কিরূপে নিরা-পদে বিবাহব্যাপার সম্পাদিত হইয়া গেল!" আমি তোমার এই পূর্ব্ব পক্ষের যুক্তি ত পূর্ব্বেই এক প্রকার মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু

তথাপি তুমি যে দুইটি কারণ প্রদর্শন করিতেছ, তাহার বিরুদ্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। (১) জীবনের মধ্যবয়স পর্য্যন্ত অজ্ঞ থাকিয়াও জগতে অনেকে পরিণামে প্রগাঢ় বিদ্যাবান্ হইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে কোনও দৃষ্টান্ত তুমি প্রামাণ্য বলিয়া না মানিতে পার, কিন্তু সচরাচর কালিদাসকে যাহার সঙ্গে উপমিত করা হয়, সেই পাশ্চাত্য কাব্যকুঞ্জের কোকিল শেক্সপীয়রকেই ধর না কেন? যিনি যৌবনের প্রারম্ভে উদ্দাম অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেন, সেই ব্যক্তি জীবনের গভীর সমস্যারাজি নাটকমুখে ব্যক্ত করিবেন, কে অনুমান করিয়াছিল? ভারতে ইংরাজ রাজ্যের প্রবর্ত্তক সুচতুর লর্ড ক্লাইবের কীর্ত্তি কাহিনী শুনিয়া তদীয় বৃদ্ধ জনক নাকি বলিয়াছিলেন "after all, Booby has sense!"—(যা' হউক, বুবিরও দেখিতেছি বুদ্ধি আছে!)। আরও দৃষ্টান্ত চাও ত ৺ বিদ্যাসাগরের "চরিতাবলী" খুঁজিয়া দেখ। (২) যাঁহারা বিচারসভায় একটা দিগ্‌গজ মূর্খকে মহামহোপাধ্যায় * করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিতের দল বিবাহসভাতেও অবশ্যই হাজির ছিলেন; তখন দশচক্রে যেমন ভগবান ভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভূতকল্প কালিদাসকে উঁহারা দশজনে মিলিয়া 'ভগবান্' করিয়া তুলিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিশেষতঃ কালিদাস মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার

* বঙ্কিমের কৃপায় জানি, 'দিগ্‌গজ' অর্থে গণ্ড মূর্খ। কিন্তু তদ্বিপরীত "মহামহোপাধ্যায়" শব্দের যে কি অর্থ, উপাধির তালিকা দেখিলে, তদ্বিষয়ে কিছু গোলযোগ ঘটে বটে।

রূপের অভাব ছিল না ; বরং তিনি যে সুশ্রীক যুবা পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সবিশেষ প্রমাণ আছে—তাহা পশ্চাৎ বলিব। একে ত "কন্যা কাময়তে রূপং", তায় বিদ্যোত্তমা বিদুষা হইলেও যুবতী,—এ অবস্থায় মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়, সূক্ষ্মদর্শন চলিয়া যায়, 'বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি'!—পাশ্চাত্য জগতেও অনুরাগকে 'অন্ধ' বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সুতরাং রাজকন্যা প্রতিভাশালিনী হইলেও এ ক্ষেত্রে প্রতারিত হইবেন, ইহা বড় বিস্ময়কর নহে। যাহাই হউক, প্রাচ্য রীত্যনুসারে "স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" এই বচনের দোহাই দিয়া মদীয় বক্তব্যের মধুরেণ সমাপন করিলাম। এই উত্তর তোমার হৃদয়গ্রাহী না হয় ত আমি আর কি বলিব? এস্থলে স্পষ্টই বলা ভাল,—আমি আর এইরূপ কৈফিয়তের অধীন হইতে চাই না—দিবার চেষ্টাও করিব না—তোমার জন্য আমি গল্পের রসভঙ্গ করিতে পারিব না।

আজ অনেক দিন হইল কালিদাস নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কবিসময়প্রসিদ্ধ কতকগুলি কথা আছে, তন্মধ্যে "পাদাঘাতাদশোকঃ বিকসতি * * যোষিতাং",—অর্থাৎ সুন্দরীগণের পদপল্লবাঘাতে অশোকতরুর মুকুলোদ্গম হইয়া থাকে। কবি কালিদাস বহুবার এই প্রসিদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারই জীবনের অবস্থা বিশেষের আভাস পাওয়া যায়;—তিনি নিজেই অশোক তরু জাতীয় কিছু ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়; কেননা, স্বীয় বনিতার

পাদাভিহত হইবার পরই যেন তদীয় জ্ঞানমুকুল উদ্গত হইল। তিনি অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ পুর্ব্বক বিদ্যাদেবীর উদ্দেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দর্শনে কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহাকে সরস্বতীমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। একাগ্রচিত্তে বহুদিন সরস্বতী সাধনার পর তাঁহার প্রতি অভীষ্ট দেবতার দয়া হইল—এমনই হইল, যে আজিও বাগ্দেবীর আরাধনা সময়ে ভক্ত বলেন—দেবি, অধমের প্রতি ঐরূপ কৃপা প্রদর্শন কর, "যা কালিদাসে করুণা তবৈব।"

কালিদাস যে স্থলে সাধনা করিতেছিলেন তাহার সন্নিকটেই একটি কুণ্ড ছিল, তাহার নাম "সরস্বতী কুণ্ড"। সাধনার সম্যক্ ফলপ্রদান মানসে দেবী আদেশ করিলেন, "বৎস, সরস্বতী কুণ্ডে অবগাহন কর, তোমার অভীষ্ট ফললাভ হইবেক। কালিদাস কুণ্ডে একবার ডুব দিয়া উঠিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিলে?" কালিদাস প্রাকৃত ভাষায় বলিলেন "পাঁক"। দ্বিতীয়বার ডুব দিতে আদিষ্ট হইয়া, তৎকরণান্তর তৎপ্রতি প্রশ্ন হইল "এবার কি দেখিলে?" কালিদাস তখন সংস্কৃতে বলিলেন "পঙ্ক"। তৃতীয়বার ঐ প্রকারে ডুব দিয়া দুই হস্তে দুইটি ফুল লইয়া ভাসিলেন, এবং পুনশ্চ ঐপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, বলিলেন "পঙ্কজ"। তখন কালিদাসের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে—তিনি তখন সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া কবিতা রচনা করিলেন :—

পদ্মমিদং মম দক্ষিণহস্তে
বামকরে লসদুৎপলমেকং।

ব্রূহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজনেত্রে

কর্কশনালমকর্কশনালম্ ॥

হে কমললোচনে ! আমার দক্ষিণ হস্তে এই একটি পদ্ম, আর বাম করে একটি সুন্দর উৎপল রহিয়াছে; বল, কোন্‌টি তোমাকে দিব,—কর্কশনাল পদ্ম না মসৃণনাল উৎপল?

আরাধ্যাদেবতা ভারতী বরপুত্রের মুখে এইরূপ সামান্য নায়িকার ন্যায় সম্বোধন শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং বলিলেন, বৎস! দেবতার পাদ-মূলে দৃষ্টি না করিয়া একেবারে মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করা সুরুচিবিরুদ্ধ; যদিও তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে, তথাপি তোমার বুদ্ধিদোষে তুমি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া গণিকা গৃহে প্রাণ হারাইবে।" কালিদাসের অন্তিমকাহিনী আপাততঃ আলোচ্য নহে, নতুবা দেবীর অভিশাপের সফলতা প্রদর্শন করা যাইত। কিন্তু কালিদাস তদবধি সাবধান হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; তাই কুমারসম্ভবে উমার রূপবর্ণনা কালে পাদপদ্ম হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। হায়! কবির এই জ্ঞানটুকু যদি সরস্বতীকুণ্ডে অবগাহন মাত্রেই জন্মিত তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ কলঙ্ককাহিনীও শুনিতে পাইতাম না, তাঁহার অকালে শোচনীয় মৃত্যুও ঘটিত না।—যাউক্, সে সকল কথা পশ্চাৎ বলিব।

দেবী-বরে জ্ঞানলাভ হইলে কালিদাস গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কালিদাস 'জ্ঞানী' হইলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই উহার প্রমাণ। তাই অবমাননাকারিণী স্বীয় বনিতার গৃহাভিমুখেই তিনি ধাবিত

হইলেন, কারণ বিদুষী কলারসজ্ঞা রাজকন্যার সহবাসে অর্থকাম-লালসার সম্যক্ পরিতৃপ্তি সাধনের আশাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। রাজবাটীতে পৌঁছিয়া কালিদাস বরাবর বিদ্যোত্তমার কক্ষের কবাটে গিয়া আঘাত করিলেন। কে, কি জন্য আগমন, এইরূপ কিছু প্রশ্ন হইলে, কালিদাস বলিলেন, "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্বিশেষঃ।" * বিদুষীবিদ্যোত্তমা এই সংস্কৃতোত্তর শুনিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক, পরিণেতার আকস্মিক পুনরাগমন এবং অবস্থান্তর প্রাপ্তি দেখিয়া, অবশ্যই যুগপৎ সন্ত্রস্ত, হৃষ্ট ও লজ্জিত হইলেন; এবং বোধ করি, উভয়ের মধ্যে প্রণয়সন্ধি স্থাপন করিতেও বেশীক্ষণ লাগিল না। প্রিয়তমের প্রথম সম্ভাষণ প্রণয়িনীর হৃদয়ে অবশ্যই অপূর্ব্ব স্মৃতি-মূলক হইয়া বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাই বিদ্যোত্তমা "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্বিশেষঃ" এই কথা কয়টি যাহাতে জগতে চিরদিন সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে অটুট বন্ধনে দৃঢ় বদ্ধ থাকে, তাহারই বিধান করিলেন। ভার্য্যা বিদ্যোত্তমার অনুরোধেই কবি "অস্তি" † শব্দে "কুমার-সম্ভবের", "কশ্চিৎ" ‡ শব্দে "মেঘদূতের", এবং "বাগ্বিশেষঃ" পদের প্রয়োজনীয়াংশ "বাক্" §

* উত্তরটা কিছু 'খাপ্-ছাড়া' বোধ হইতে পারে;—এই কি ভারতীর বর-পুত্রে প্রাথমিক প্রিয়া-সম্ভাষণ? কিন্তু কিংবদন্তী-মূলক গল্পের অনুসরণ করিতে হইলে ইহা কেন এতদপেক্ষা বেখাপ'-তর কথাও বলিতে হইবে।

† অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, ইত্যাদি।

‡ কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, ইত্যাদি।

§ বাগর্থাবিবসংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে, ইত্যাদি।

শব্দে "রঘুবংশের" ভিত্তিসংগঠন পূর্ব্বক তিন খানি অমূল্য কাব্য গ্রন্থন দ্বারা জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

কালিদাস এতদ্ভিন্ন প্রিয়তমাকেই সম্বোধন করিয়া দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন,—একখানি "ঋতুসংহার" নামক ষড় ঋতু বর্ণনামূলক খণ্ডকাব্য, অপরখানি সাধারণতঃ প্রচলিত কতক-গুলি ছন্দের লক্ষণাত্মক "শ্রুতবোধ" নামক পুস্তিকা। ইহাতে কালিদাসের প্রণয়িনী যে একজন কাব্যরসজ্ঞা ও লাবণ্যবতী রমণী ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। "বিক্রমোর্ব্বশীতে" কাননমধ্যে উর্ব্বশীকে হারাইয়া পুরুরবার, "রঘুবংশে" ইন্দুমতীর বিয়োগে অজের এবং "মেঘদূতে" প্রণয়িনীর নিমিত্ত যক্ষের যে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ বর্ণিত আছে, কে জানে ঐ সকল কচিৎ-প্রোষিত, অথবা মৃত-ভার্য্যা কবির আত্মানুভূতির ফল কি না?

[সাহিত্য-সেবক শ্রাবণ ১৩০৩।]

কালিদাসের কাহিনী।

(৩) কর্ণাট-বিজয় যাত্রা।

প্রাচীন ইতিহাসে যেমন ভূপতিবৃন্দের দিগ্বিজয়ের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ পণ্ডিত বর্গেরও নানা দিগ্দেশীয় রাজ-সভা-বিজয়ের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দু-স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শস্ত্রের দিগ্বিজয় বহু দিন হইল বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রের দিগ্বিজয় অদ্যাপি ক্বচিৎ কদাচিৎ কিঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে খ্যাতনামা নরপতিগণ অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের সভায় নানাশাস্ত্রবিশারদ বহু মহামহোপাধ্যায় সমাগত হইয়া অশেষবিধ শাস্ত্রালাপ দ্বারা রাজগণের প্রীতি উৎপাদন করিতেন। বিশেষতঃ, তখন ভূপতিগণ মন্বাদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে রাজ্যের যাবদীয় কার্য্যনির্ব্বাহ করায়, তাঁহারা সন্দিগ্ধ-স্থলের মীমাংসার নিমিত্ত নানাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। পরন্তু, এতাবৎ পণ্ডিতসভা পরিপোষণের প্রধানতম উদ্দেশ্য হইলেও, প্রত্যুৎপন্নমতি কবি এবং কাব্যালঙ্কারনিপুণ পণ্ডিতগণদ্বারাই রাজসভার প্রকৃত শোভা সম্পাদিত হইত এবং তাঁহাদিগের রসময়ী ভারতী রাজগণের কঠোর রাজকার্য্যের মধ্যে সাতিশয় চিত্তবিনোদ সাধন করিত। এতদ্ভিন্ন আপন সভাসদ

কবি বা পণ্ডিত অপর রাজার আশ্রিত সভাসদগণকে স্ব-প্রতিভায় পরাজয় করেন, ও তদ্দ্বারা তদীয় পণ্ডিতবর্গ অপর রাজ্যাধিষ্ঠিত বিদ্বন্মণ্ডলী অপেক্ষা সমধিক যশস্বী হয়েন, সহজ-বিজিগীষু তাৎকালিক নৃপতিবর্গের ইহাও এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং এতদর্থে তাঁহারা স্বীয় সভাস্থ বিদ্বজ্জনমাত্রকেই সাতিশয় প্রোৎসাহিত করিতেন। ফলতঃ, তখন প্রতিভাশালী পণ্ডিতমাত্রই কোন না কোন নৃপতির সভায় বিশেষ আদর ও সম্মানের সহিত অবস্থান করিতেন এবং স্বীয় প্রতিভাদ্বারা অপর রাজার পণ্ডিত-সভাকে পরাস্ত করিয়া নিজের ও আশ্রয়দাতা নৃপতির যশোবর্দ্ধনে সতত যত্নশীল থাকিতেন।

এইরূপে কবি কালিদাসও রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় আশ্রয়লাভ করেন। এই ভূপতির সভায় আরও আটজন পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন, সম্প্রতি কালিদাসকে লইয়া নয়জনে "নব-রত্ন" * হইলেন। বলা বাহুল্য, ভারতীর বরপুত্র অচিরেই শ্রেষ্ঠতম "রত্ন" হইয়া উঠিলেন এবং দিগ্বিজয়ার্থ নানাস্থলে প্রেরিত হইতে লাগিলেন।

তৎকালে কর্ণাট-রাজের সভাও অশেষ বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা পরিশোভিত হইয়া চতুর্দ্দিকে যশঃসৌরভ বিস্তার করিতেছিল।

---

* ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য ॥

বিজিগীষু কালিদাস, একদা, বররুচি নামক অন্যতম "রত্ন"কে ভৃত্য সাজাইয়া, কর্ণাট-রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা তদীয় আগমনবার্ত্তা শ্রবণে বহির্বাটিকায় আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া রজনীযোগে এক বিদুষী রমণীকে কবির পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। গভীর নিশীথে একাকিনী রমণীকে অন্তঃপুর হইতে নির্ভয়ে আসিতে দেখিয়া কালিদাস চমৎকৃত হইলেন, এবং উহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"উন্নাদাম্বুদ বর্দ্ধিতান্ধতমসা প্রভ্রষ্ট দিগ্মণ্ডলে
কালে জাগ্রদুদগ্র যামিক ভট প্রারব্ধ কোলাহলে।
কর্ণস্থা সুহৃদম্বুরাশি বড়বা বহ্নেনদন্তঃপুরা-
দায়াতাসি তদম্বুজাক্ষি কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাম্॥"

গুরুনিনাদকারী মেঘসমূহ দ্বারা রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর হওয়াতে দিঙ্ নির্ণয় হওয়া দুরূহ; সময় বুঝিয়া নিশা-প্রহরীরা জাগিয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; ঈদৃশাবস্থায় শত্রু-নিসূদন কর্ণাটরাজের অন্তঃপুর হইতে, হে সুলোচনে, তুমি আসিতে পারিয়াছ, ইহাতে অনুমান হয়, স্ত্রীজাতি ভীরু—একথা অমূলক।

কবিতাটি বিদুষার বড় মনঃপূত হইল না।‡ তিনি বলিলেন, "আমি কর্ণাট-রাজের প্রেয়সী,—একজন প্রসিদ্ধ কবি আসিয়াছেন শুনিয়া, তিনি কীদৃশ—জানিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এখানে কবির অসদ্ভাব দেখিতেছি—

‡ কর্ণাট-রাজের ও এইটি ভাল লাগে নাই। সে কথার আলোচনা পরে করা যাইবে।

"একোঽভূন্নলিনাদেকশ্চপুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপরঃ
সর্ব্বে তে কবয়স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যোনমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যলিখনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দদামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া॥"

একজন বিষ্ণুর-নাভিকমল, একজন নদীসৈকত, অপর বল্মীক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; অর্থাৎ, ব্রহ্মা, ব্যাস এবং বাল্মীকি;— তাঁহারা সকলেই কবি, তাঁহাদিগকে বন্দনা করি। আধুনিক অপর কেহ যদি গদ্যপদ্য রচনা দ্বারা চিত্ত চমৎকৃত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি, কর্ণাট-রাজপ্রেয়সী, তাঁহাদের বামচরণ মস্তকে ধারণ করি।"* কবি রমণীর এবম্প্রকার উক্তি শুনিয়া নীরব রহিলেন। ইহাতে কর্ণাট-রাজ-রঙ্গিনী কালিদাসকে নির্ব্বোধ স্থির করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন এবং রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজা কবিকে তৎপরে তদীয় সভাসদ কবি বল্লনের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে, বোধ হয়, নিয়ম ছিল যে কোন নূতন কবি রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা অগ্রে তাঁহাকে গোপনে পরীক্ষা করিতেন এবং যদি তদ্দ্বারা আগন্তুকের গুণগ্রামের বিশেষ পরিচয় লাভ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে আপন সভাস্থ পণ্ডিত দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া পরে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেন। এই জন্যই বোধ হয় কালিদাসকে বল্লন-ধামে পাঠান হইল।

* এখানে একটু শ্লিষ্টাৰ্থ আছে; শেষ পদের অর্থ "তাহাদের মস্তকে আমি বামপদ দেই" এরূপও হইতে পারে।

বল্লন লোকটী সরল প্রকৃতির ছিলেন না। এইজন্য, পরীক্ষার্থ যখন বল্লন কালিদাসকে প্রভাতবর্ণন সূচক একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন, তখন কালিদাস মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, "যদি কবিতা উত্তম হয়, তবে রাজসাক্ষাৎকার দুর্লভ হইয়া উঠিতে পারে, অতএব ইহার সমক্ষে মূর্খত্বের ভাণ করাই শ্রেয়ঃ।" এই বিবেচনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কালিদাস উত্তর করিলেন ঃ—

"প্রাতরুত্থায় ভূপাল মুখং প্রক্ষালয় স্মটঃ।
নগরে ভাষতে কুক্কুশ্চবৈতুহিচবৈতুহি॥" †

'হে রাজন্! নগরে কুক্কুট-ধ্বনি হইতেছে,—প্রভাত হইয়াছে,—উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করুন।'

এই অদ্ভুত কবিতা শুনিয়া বল্লনকবি ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "বাঃ, দিব্য কবিতা! অনুগ্রহ করিয়া যদি লিখিয়া দেন, আমার বালকদিগকে শিখাইতে পারি।"

কালিদাস বল্লনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার আদেশ মত ঐ কবিতাই লিখিয়া দিলেন। ইহাতে বল্লনের মনে বড় হর্ষোদয় হইল। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, একটা দিগ্‌গজ কবি আসিয়াছে; রাজা, হয় ত, তাঁহার কবিতা-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বল্লনকে স্থানচ্যুত করিবেন; অধুনা কালি-দাসোক্ত শ্লোক শ্রবণ করিয়া তাঁহার সে আশঙ্কা দূরীভূত হইল।

† পূর্ব্বার্দ্ধে 'ট' এবং পরার্দ্ধে 'কুক্কু' মিলিয়া "কুক্কুট"! একটি অনুষ্টুভে স্ম, চ, বৈ, তু, হি এই পাঁচটি নিরর্থক পাদপূরক অব্যয়, তাহার মধ্যে চারিটির দ্বিরাবৃত্তিও ঘটিয়াছে।

যথা সময়ে তিনি কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় চলিলেন'—হস্তে কালিদাসের রচিত "প্রভাত-বর্ণনা!" পথে একটা বৃষ দেখিয়া তিনি পুনশ্চ কালিদাসকে একটী কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস কহিলেন—

"গোরপত্যং বলীবর্দ্দো ঘাসমত্তি মুখেন সঃ।
লাঙ্গুলং বিদ্যতে তস্য শৃঙ্গঞ্চাপিতু বর্ত্ততে॥

গরুর বেটা বলদ, সে মুখে ঘাস খায়, তার লেজ আছে, শিংও আছে!

এবার কালিদাসের মূর্খত্ব বিষয়ে বল্লন নিঃসন্দেহ হইলেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে কালিদাসকে লইয়া রাজসভায় আগমন করিলেন। সভাসদ বল্লনকবিকে সমাগত দেখিয়া রাজা প্রণাম করিলেন। বল্লন আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"রাজন্নভ্যুদয়োহস্তু"—

হে রাজন্! জয় হউক।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল্লনকবে হস্তে কিমাস্তে তব?"

বল্লনকবে! আপনার হস্তে কি?

বল্লন। "শ্লোকঃ।"

একটি কবিতা।

রাজা। "কস্য?"

কাহার রচিত?

বল্লন। "কবেরমুষ্য কৃতিনঃ।"

এই আগন্তুক নিপুণ কবির রচিত।

রাজা। "তৎপঠ্যতাং"

উহা পাঠ করুন।

এই সময়ে কালিদাস আর নিশ্চিন্ত রহিলেন না; বল্লন তাঁহার "প্রভাত বর্ণন" পাঠ করিতে উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, তিনি তাহাতে বাধা দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রাজার নিদেশের উত্তরে বলিলেন—

পঠ্যতে। *

কিন্ত্বাসামরবিন্দ সুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনৈ রুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লী-কঙ্কণ ঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাং॥"

"পড়া যাইবে। কিন্তু এই সকল কুবলয়নেত্রা সুন্দরীগণ ঘন ঘন চামরান্দোলন করাতে, তাহাদের হস্ত-সঞ্চালন-জনিত কঙ্কণ-ঝনৎকারে কিছুই শুনা যাইবে না—ক্ষণকাল উহা বারণ করুন।"

অদ্য আমাদিগের লেখনীও এই স্থানেই বিশ্রাম করুন।

সাহিত্য সেবক আশ্বিন ১৩০৩

---

* সমগ্র শ্লোকার্দ্ধ এই—"রাজন্নভ্যুদয়োহস্তু বল্লনকবে হস্তে কিমাস্তে তব শ্লোকঃ কস্য কবেরমুষ্যাকৃতিনস্তৎ পঠ্যতাং পঠ্যতে।"

কালিদাসের কাহিনী।

(৪) কর্ণাট রাজ প্রশস্তি।

কালিদাস বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমন্নাথ তবাননে ভগবতা বাণী নরীনৃত্যতে
তদ্দৃষ্ট্বা কমলা সমাগতবতী লোলাপি বদ্ধা গুণৈঃ।
কীর্ত্তিশ্চন্দ্র করীন্দ্র কুন্দ কুমুদ ক্ষীরোদনীরোপমা
ত্রাসাদম্বুনিধিং বিলঙ্ঘ্য ভবতো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

হে রাজন্, সপত্নী সরস্বতী তোমার বদনবিবরে সতত নৃত্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়াও কমলা চঞ্চলা হইলেও ত্বদীয় গুণরাশি দ্বারা আবদ্ধা হইয়া তোমাতেই বিরজমানা রহিয়াছেন। চন্দ্র, ঐরাবত, কুন্দ, কুমুদ এবং ক্ষীরোদনীরের সহিত যাহার উপমা সম্ভবে, ঈদৃশী ভবৎ-কীর্ত্তি * (কমলার বন্ধনাবস্থা দর্শনে যেন) ত্রাসিতা হইয়া সাগর পার হইয়াও বিশ্রামলাভ করিতে পারিতেছে না।

যশোমুক্তাভিস্তে গুণিবর গুণৌঘৈঃ কমলভূ-
রতি প্রেম্না হারং গ্রথিতুমতুলং যত্নমকরোৎ।

---

* "যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাস-কীর্ত্ত্যোঃ"—সাহিত্য-দর্পণ।—কীর্ত্তিতে 'ধবলতা' আরোপ করা একটি কবি-সময়-প্রসিদ্ধি।

গুণান্তং মৌক্তং বা গুণবিবরমালোক্য ন চিরা-
দ্রুষা ক্ষিপ্তাস্তেন ক্ষিতিতিলক তারা বিয়তি তাঃ ॥

হে গুণিবর, কমলযোনি ব্রহ্মা ত্বদীয় যশোরূপ মুক্তাসমূহ লইয়া তোমার গুণাবলী দ্বারা অতি আদর করিয়া একটি হার গাঁথিতে যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও গুণের অন্ত কিংবা মুক্তায় ছিদ্র না পাইয়া বিরক্ত হইয়া তিনি ঐ মুক্তারাশি ছড়াইয়া ফেলিয়া দেন; হে নরপাল, ঐগুলি সম্প্রতি নক্ষত্র রূপে আকাশে অবস্থিতি করিতেছে।

শ্রীমন্নাথ ভবদ্‌যশোবিটপিনঃ খেতারকাঃ কোরকা-
স্তেষামেকতমঃ পুরা বিকশিতো যঃ পূর্ণিমাচন্দ্রমাঃ ॥
তেনেদং মকরন্দসুন্দরসুধাস্যন্দৈর্জগন্মণ্ডিতং
শেষেষ্বেযু বিকশ্বরেষু ভবিতা কীদৃঙ্‌ ন জানীমহে ॥

হে নরনাথ, আকাশের তারকারাজি তোমার যশোবৃক্ষের কোরক। উহাদের একটি পুরাকালে প্রস্ফুটিত হইয়া পূর্ণিমার চন্দ্র হইয়াছে। তাহা হইতে ক্ষরিত মকরন্দ সদৃশ সুধাধারা দ্বারা জগৎ আপ্যায়িত হইয়াছে। না জানি অবশিষ্ট সকলগুলি (তারকাকোরক) বিকসিত হইলে কিরূপ শোভাই হইবে!

ত্বদ্বাহুব্যূহবেগক্ষতধরণিতলে বৈরিবামাশ্রুপঙ্কে
ক্ষিপ্তোন্মত্তেভকুম্ভস্থল দলন বশান্মৌক্তিকন্তত্র বীজম্‌।
তজ্জাতা কীর্ত্তিবল্লীগগনবনচরীমূলমস্যাঃ ফণীন্দ্রঃ
শুভ্রাণ্যভ্রাণি পত্রাণ্যুড়ুগণকলিকাশ্চন্দ্রমাঃ ফুল্লপুষ্পম্‌ ॥

তোমার বাহুবলে পৃথিবী ক্ষতবিক্ষত হইয়া (যেন) চষিত

হইয়াছে; তাহাতে শত্রুনারীগণের অশ্রুধারা পতিত হইয়া কর্দ্দম হইয়াছে; উহাতে মদমত্ত মাতঙ্গের বিদারিত কুম্ভস্থল হইতে মুক্তা বীজরূপে পতিত হইয়া তোমার কীর্ত্তিলতার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই কীর্ত্তিলতা আকাশরূপ কাননে অদ্যাপি বিরাজিত; ফণিরাজ অনন্ত ইহার মূল, শুভ্র মেঘগণ ইহার পত্র, নক্ষত্রসমূহ ইহার কলিকা এবং চন্দ্রমা ইহার বিকশিত কুসুম।

ধীর ক্ষীরসমুদ্রসান্দ্রলহরীলাবণ্যলক্ষ্মীমুষ-
স্ত্বৎকীর্ত্তেস্তুলনাং কলঙ্কমলিনো ধত্তে কথং চন্দ্রমাঃ।
স্যাদেবং ত্বদরাতিসৌধশিখরে প্রোদ্ভূতশষ্পাঙ্কুর-
গ্রাসব্যগ্রমনাঃ পতেদ্যদি পুনস্তস্যাঙ্কশায়ী মৃগঃ॥

হে ধীর, ক্ষীর সমুদ্রের নিবিড় লহরী লীলার যে সৌন্দর্য্য, তত্তুল্য শোভাশীলা তোমার কীর্ত্তির সঙ্গে কলঙ্কমলিন চন্দ্রের কিরূপে উপমা সম্ভবে? তবে উহা সঙ্গত হইতে পারে, যদি তোমার নির্জ্জিত শত্রুগণের সৌধশিখরে জাত শষ্পাঙ্কুর ভক্ষণার্থ ব্যাকুল হইয়া চন্দ্রের ক্রোড়স্থ মৃগ বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

সংগ্রামাঙ্গনমাগতেন ভবতা চাপে সমাসাদিতে
দেবাকর্ণয় যেন যেন সহসা যদ্যৎসমাসাদিতম্।
কোদণ্ডেন শরঃ শরেণ হি শিরস্তেনাপি ভূমণ্ডলং
তেন ত্বং ভবতাপি কীর্ত্তিরতুলা কীর্ত্যাচ লোকত্রয়ম্॥

হে দেব, রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া তোমার ধনুঃ ধারণ করিবামাত্রেই সহসা কোন্ কোন বস্তু কি কি প্রাপ্ত হইল, তাহা শুন—ধনুঃ বাণ [প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ ধনুতে বাণ যোজিত

হইল)]; বাণ শত্রুর শির (পাইল); সেই শির পৃথিবী; পৃথিবী তোমাকে; তুমি অতুল কীর্ত্তি; এবং সেই কীর্ত্তি ত্রিভুবন প্রাপ্ত হইল।

পাঠক, এই সকল শ্লোক পড়িয়া কি রঘু-মেঘ-কুমার-রচয়িতার কবিতা বলিয়া বোধ হয়? ধন্য রে কিংবদন্তি! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই চতুষ্পাঠীর সরল-বুদ্ধি ভট্টাচার্য্যবর্গ ও অন্তেবাসিগণকে কি কুহকেই ফেলিয়াছিস্ যে তাঁহারা এই সকল অর্ব্বাচীন কবিকল্পের লেখনী-কণ্ডূয়নজাত "হিণ্ডীর-পিণ্ডী"কে ভারতীয় বরপুত্রের স্কন্ধে চাপাইতে কুণ্ঠিত হয়েন না!

যাহা হউক, রাজা এতক্ষণ কালিদাসের অভিমুখ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এই সকল শ্লোক শ্রবণানন্তর বিপরীত দিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া বসিলেন। এই সকল কবিতার পুরস্কার স্বরূপ রাজা সম্মুখস্থ রাজ্যবিভাগ কবিকে মনে মনে দান করাতেই রাজার এই পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের কারণ; কিন্তু কালিদাস বুঝিলেন অন্যরূপ। তাই পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—

মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরতয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
হে কর্ণাট বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতি ভূধরাম্বুদনদীভূভাগবৃন্দাটবী
বাত্যামারুত চন্দ্র চন্দনগণাস্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

হে কর্ণাটরাজ, প্রত্যুপকারে কাতরতা নিবন্ধন পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিও না, আমার সুধাময়ী শ্লোকাবলী শ্রবণ কর। পর্ব্বত, মেঘ, নদী, প্রদেশ, বন, ঝড়, বায়ু, চন্দ্র, চন্দন প্রভৃতি কত কি বর্ণনা করিয়াছি, উহাদের হইতে আমি কবে কি প্রাপ্ত হইয়াছি?

অর্থাৎ, কিছু পাইবার আশায় কালিদাস ভারতীপ্রয়োগ করিতে আসেন নাই; আর, এই পৃষ্ঠ প্রদর্শনেও কালিদাসের কিছু আসে যায় না :—

পুরো বা পশ্চাদ্বা ক্বচিদপি বসামঃ ক্ষিতিপতে
তদা কা নো হানির্বচনরচনৈঃ ক্রীতজগতাং।
বনে বা হর্ম্ম্যে বা কুচকলসহারে মৃগদৃশাং
মণেস্তুল্যং মূল্যং সহজসুভগস্য দ্যুতিমতঃ॥

বাক্যরচনা দ্বারা জগৎক্রয়কারী আমাদের পুরোভাগে অবস্থানেই বা গৌরব কি, এবং পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান ঘটিলেই বা হানি কি? অকৃত্রিম উজ্জ্বল মণি বনেই পড়িয়া থাকুক, প্রাসাদেই রক্ষিত হউক, অথবা সুন্দরীর কুচোপশোভী হার মধ্যেই গ্রথিত থাকুক, উহার মূল্য তুল্যরূপই থাকিবে। *

অবশ্য, ক্ষণকাল পরেই রাজা ও কবিতে আপোষ হইল। বেচারা বঙ্গন কাণ্ড দেখিয়া বোধ হয় অবাক্ হইয়া গেল!

রাজার কিন্তু 'সুধাসিক্তসূক্ত'রসপিপাসা মিটিল না। তিনি শৈব ছিলেন, কবিকে স্বকীয় ইষ্টদেব রুদ্রের বর্ণনা করিতে বলিলেন। শুনিবার দোষে 'রুদ্র' স্থলে কবি বুঝিলেন 'সমুদ্র'; তাই বলিলেন—

কিংবাচ্যো মহিমা মহাজলনিধের্যস্যেন্দ্রবজ্রাহতি-
ত্রস্তো ভূভৃদমজ্জদম্বুনিচয়ে কুলীরপোতাকৃতিঃ।

* সাটোপ ভাব টুকু বাদ দিলে এই দুইটি শ্লোক কালিদাসের লেখনীর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

মৈনাকোঽতিগভীরনীরবিলসৎপাঠীনপৃষ্ঠোল্লস-
চ্ছৈবালাঙ্কুরকোটিকোটরকুটীকুট্যন্তরে সংস্থিতঃ॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রাহত হইবার ভয়ে মৈনাক পর্ব্বত কক্কট শাবকের ন্যায় নিমগ্ন হইয়া যাহার গভীর নীরে বিচরণকারী কোনও পাঠীন মৎস্যের (বোয়াল মাছ, ইতি ভাষা) পৃষ্ঠলগ্ন শৈবালাঙ্কুরের কোটি কোটি কোটরের এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিল, সেই মহাসমুদ্রের মহিমা আর কি বলিব ?

রাজা একটু হাসিলেন।—শ্লোকের উৎকটত্ব নিমিত্ত নহে, কেন না ঈদৃশ গল্পাধিনায়ক রাজন্যবর্গের যেন একটু স্বাভাবিকী রসবধিরতা ছিল, এইজন্য এতাদৃশী "কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী" শ্লোকাবলী ভিন্ন অপর মৃদুতর রচনা তাঁহাদের শ্রবণ বিবরাভ্যন্তরে বোধ হয় পৌঁছিত না ; রাজা রুদ্রবর্ণনা করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাই কি রুদ্রবর্ণনা ? কবি অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন, তাই বলিলেন, হাঁ মহারাজ, ইহাই রুদ্রবর্ণনা ; এখনও ত বর্ণনা শেষ হয় নাই,—

ঈদৃক্ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতা মহীভৃদ্ভিরভ্রঙ্কষৈ-
স্তাবদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতা পৃথুপৃথুদ্বীপৈঃ সমন্তাদিয়ং।
যস্য স্ফারফণামণের্নিমিলিতা তির্য্যক্ কলঙ্কাকৃতিঃ
শেষোঽপ্যেকমগাদ্‌যদঙ্গদপদং তস্মৈ * * * ॥

ঈদৃশ সাতটা সমুদ্র এবং ঐ সংখ্যক বিমানস্পর্শী পর্ব্বত দ্বারা মণ্ডিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত এই যে পৃথিবী, উহা যাহার শিরঃস্থিত স্বচ্ছ মণিতে সংলগ্ন হওয়াতে মণির কলঙ্কের ন্যায় প্রতিভাত হয়, সেই নাগরাজ শেষও যাঁহার কেয়ূর

রূপে একতম অঙ্গের ভূষণ মাত্র, তাঁহাকে———,এইমাত্র বলিয়া "বেটা বল্ ত রে" বলিয়া কবি শ্লোকের সমাপ্তি করিলেন। নিকটে ভৃত্যরূপী বররুচি দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি বলিলেন "নমঃ শম্ভবে"। * কালিদাস নাকি শিবের নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, তাই এই বিড়ম্বনা !

কিন্তু, রে কুহকিনি কিংবদন্তি, ধন্য তোর সাহস ! "বেটা বল্ ত রে" এই নিতান্ত আধুনিক প্রাকৃত বাঙ্গালা বুলিটাও কি কালিদাসের মুখনিঃসৃত বলিয়া বাজারে বিকাইতে চাহিয়াছিলি ? তোর কি এটাও খেয়াল হইল না যে 'উজ্জয়িনীর' উজ্জ্বল রত্ন, 'বিক্রমাদিত্যের' সভাসদ, কালিদাস বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার জন্মের বহুপূর্ব্বে এবং বঙ্গদেশের বহুপশ্চিমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ? + তোর অমূলকত্বের ইহা অপেক্ষা আর কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে ?

এখানেই কালিদাসের এই কর্ণাটবিজয় কাহিনী শেষ হইত। কিন্তু রাজা ছাড়িবার পাত্র নহেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং" ইত্যন্ত শ্লোকটি "কর্ণাটরাজপ্রিয়া," কি স্বয়ং কর্ণাটরাজ, কাহারই মনোনীত হয় নাই। তাই কালিদাসকে

* সুতরাং শ্লোকের শেষ পদটি হইল—

"শেষোঽপ্যেকমগাদযদঙ্গদপদং তস্মৈ নমঃ শম্ভবে ॥"

+ কিন্তু "কালিদাস" এই নামটি বঙ্গজ এবং আধুনিক বলিয়াই প্রতীত হয় ; কিংবদন্তীর বোধ হয় উহাতেই এই সাহস। অনেক স্থলে কালিদাসকে দিয়া বাঙ্গালা প্রশ্নেরও উত্তর বঙ্গভাষায়ই দেওয়ান হইয়াছে।

বিদ্রূপ করিবার নিমিত্তই যেন রাজা "কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং" এই কথাটি দুই একবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ভাব বুঝিয়া, কবি ঐ কথাটিকেই অবলম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্লোক রচনা করিলেন—

উগ্রগ্রাহমুদম্বতো জলমতিক্রামত্যনালম্বনে
ব্যোম্নি ভ্রাম্যতি দুর্জ্জয়ক্ষিতিভুজাং মূর্দ্ধানমারোহতি।
ব্যাপ্তং যাতি বিষাকুলৈরহিকুলৈঃ পাতালমেকাকিনী
কীর্ত্তিস্তে মদনাভিরাম "কৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং"॥

হে মদনসুন্দর, তোমার কীর্ত্তি কোন অবলম্বন বিনাই একাকিনী ভীষণ হাঙ্গরসমাকীর্ণ সমুদ্রবারি অতিক্রম করিতেছে; আকাশোপরিস্থ স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছে; দুর্জ্জয় নৃপতিগণকে নির্জ্জিত করিয়া তাহাদের মস্তকোপরি আরোহণ করিতেছে; এবং বিষধরসর্পসমূহাকীর্ণ পাতাল প্রদেশেও গমন করিতেছে। ইহাতে বোধ হয় স্ত্রীলোকের ভয় কৃত্রিম মাত্র।

এই রূপে কবির কৃতিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া রাজার আর কিছু বক্তব্য রহিল না—বিজয়সূচক জয়পত্র লিখিয়া দিয়া তাঁহার যথোচিত 'মর্য্যাদা' বিধান করিলেন। বলা বাহুল্য, জয়পত্রসহকৃত কবি বিক্রমাদিত্যসভায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে বিক্রমাদিত্যও হৃষ্টচিত্তে কবিকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন।

[সাহিত্যসেবক অগ্রহায়ণ ১৩০৩।

কালিদাসের কাহিনী।

(৫)—নানা সমস্যাপূরণ।

কর্ণাটরাজের ন্যায় ধারানগরাধিপতি ভোজরাজেরও অশেষ বিদ্বদ্বৃন্দপরিশোভিত রাজসভা ছিল। * এই সভার পণ্ডিতগণের একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইঁহারা সকলেই শ্রুতিধর ছিলেন এই সভাতে আসিয়া কেহ কোন কবিতা বলিলে সভাস্থ পণ্ডিতগণ তৎক্ষণাৎ উহা আবৃত্তি করিতেন এবং শ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। সুতরাং ভোজরাজসভায় কেহ "নূতন" কবিতা বলিতে পারিতেন না। ভোজরাজও ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যিনি নূতন শ্লোক শুনাইতে পারিবেন, তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করা যাইবে।"

ইদানীন্তন 'পণ্ডিত'গণের ন্যায় কালিদাস নিতান্ত "সরল" ছিলেন না; তিনি উক্ত ঘোষণাশ্রবণে প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিয়া কূটবুদ্ধিবলে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি সহসা একদিন ভোজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—

* ইতিপূর্ব্বে কালিদাস কর্তৃক কর্ণাট সভা বিজয়ের যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, উহার আর একটি সংস্করণ আছে, সেইটি ভোজরাজের সভা বিজয়। পুনরুক্তি দোষাশঙ্কায় এই কাহিনী পরিত্যক্ত হইল। কর্ণাট রাজ বর্ণনার শ্লোকগুলির ন্যায় ভোজ-রাজ স্তুতিও বাগাড়ম্বরপরিপূর্ণ স্বল্পভাববিশিষ্ট কতিপয় শ্লোকসমষ্টি মাত্র। অন্যান্য ঘটনা উভয়ত্রই অবিকল এক।

"স্বস্তি শ্রীভোজরাজস্ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটী মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নোবা জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতি চেদ্দেহি লক্ষং ততো মে॥"

ত্রিভুবনবিজয়ী ধর্ম্মিষ্ঠ সত্যপরায়ণ শ্রীমান্ ভোজরাজের জয় হউক। মহারাজের পিতৃদেব আমা হইতে এককোটী নিরনব্বুই লক্ষ রত্ন ধার করিয়াছিলেন, উহা ত্বরায় আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। ইহা যে সত্য, এই সকল পণ্ডিতেরাই বিদিত আছেন; যদি উঁহারা না জানেন, তবে ইহা আমার নূতন রচিত শ্লোক বলিয়া আমাকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

বলা বাহুল্য, ভোজরাজ এবং তৎসভাস্থ পণ্ডিতগণ ইহাতে বিলক্ষণ শিক্ষালাভ করিলেন। তদবধি ভোজরাজের সহিত কালিদাসের পরম সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল। *

বীরশ্রীমণ্ডিত শূরগণ যেমন পরদেশবিজয় এবং শত্রু হইতে স্বদেশরক্ষা এই দ্বিবিধ উপায়ে স্বকীয় বীর্য্যবল প্রদর্শিত করেন, বিচারমল্ল পণ্ডিতগণও তদ্রূপ অপর সভাবিজয় এবং বিজিগীষু পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য খর্ব্ব করিয়া স্বকীয় সভার গৌরব রক্ষা দ্বারা

* "ভোজপ্রবন্ধ" নামক গ্রন্থে ধারানগরাধিপ ভোজরাজের সভায় কালিদাসের অনেক কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক উক্ত গ্রন্থ পাঠ দ্বারা কৌতুহল চরিতার্থ করিতে পারেন; অধুনাতন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই কালিদাসকে উজ্জয়িনীর সভাসদ ভারতীর বরপুত্র হইতে পৃথক্ করিয়া "ভোজ-কালিদাস" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভোজ-প্রবন্ধের কালিদাস স্বয়ং আপনাকে বিক্রমাদিত্যের কালিদাস বলিয়াই পরিচয়প্রদান করিয়াছেন।

নিজের কৃতিত্ব খ্যাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং এদিকে যেমন কর্ণাট ভোজ প্রভৃতি রাজসভা বিজয় করিয়া কালিদাস স্বকীয় কীর্ত্তিনিশান উত্তোলিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিক্রমাদিত্য-সভাবিজিগীষু অপর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গের দর্প চূর্ণ করিয়া উহা অক্ষুণ্ণভাবে সমুচ্ছ্রিত রাখিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

একদা এইরূপ কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভায় আসিয়া আপন পাণ্ডিত্য বল ঘোষণা করিয়া দিলেন। নৃপতি কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া পণ্ডিত স্নানাহ্নিকার্থ সরোবরে গমন করিলে কালিদাস নারীবেশে কলসীকক্ষে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ঐ পণ্ডিতের প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দিগ্বিজয়ী কহিলেন—

"কিং মাং মু পশ্যসি ঘটেন কটিস্থিতেন
বক্ত্রেণ চারুপরিমীলিতলোচনেন।
অন্যং বিলোকয় জনং তব কর্ম্মযোগ্যং
নাহং ঘটাঙ্কিতকটিং প্রমদাং স্পৃশামি॥"

সুন্দরি! কক্ষে কলসী লইয়া ঈষন্মুকুলিত নয়ন দ্বারা আমাকে কেন নিরীক্ষণ করিতেছ? তোমার উপযুক্ত অন্য কাহারও নিকট গমন কর; ঘড়া বহিতে বহিতে যাহার কোমরে দাগ পড়িয়া গিয়াছে এমন রমণীকে আমি স্পর্শও করি না। *

* ইতিপূর্ব্বে একস্থলে বলা হইয়াছে "কালিদাস সুশ্রীক পুরুষ ছিলেন"—এতৎকাহিনী-বর্ণিত ঘটনা উহার একটি অথান্তর প্রমাণ।

পণ্ডিতের এই অবজ্ঞাসূচক সাটোপ বাক্য শুনিয়া রমণীরূপী কালিদাস সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিলেন—

"সত্যং ব্রবীষি মকরধ্বজবাণপীড় !
নাহং ত্বদর্থমনসা পরিচিন্তয়ামি।
দাসোঽদ্য নো বিঘটিতস্তবতুল্যরূপী
স বা ভবেন্নহি ভবেদিতি মে বিতর্কঃ ॥"

হে কামাকুলিতচিত্ত পণ্ডিত, সত্যই বলিয়াছ ! বস্তুতঃ আমার অন্তঃকরণে তোমার বিষয়ে ভাবনা উপজাত হয় নাই। আমাদের চাকর, ঠিক তোমারই ন্যায় আকৃতি, আজ কোথা পলাইয়া গিয়াছে,—তোমাকে দেখিয়া "এই বা সেই" এই চিন্তাই করিতেছিলাম।

কলসবাহিনীর মুখে এইরূপ ব্যঙ্গপূর্ণ রসিকতার আস্বাদ পাইয়া দিগ্বিজয়ী চমৎকৃত হইলেন, এবং রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কালিদাসের পরিচারিকা বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিল। পণ্ডিত মনে ভাবিলেন, যাহার পরিচারিকাই ঈদৃশ পাণ্ডিত্যসম্পন্না সেই কালিদাস না জানি কত বড় পণ্ডিত। এই ভাবিয়া পুনশ্চ রাজসভায় না গিয়া দিগ্বিজয়ী হতাশচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এ যেন ঈসপ-কথিত "ব্যাঘ্রের দ্বারে বৃহৎ পাকস্থলী দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন" !

অন্যদা কোন দিগ্বিজয়ী * বিক্রমাদিত্য সভায় আসিয়া "নষ্টস্য কান্যাগতিঃ" এই সমস্যা দিয়া উহা পূরণ করিতে বলেন।

* কেহ বলেন, 'রাক্ষস'। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের নাম 'রাক্ষস' দেখা যায়—যথা, মুদ্রারাক্ষসের অধিনায়ক নন্দবংশের কুলমন্ত্রী।

কালিদাস তখন উপস্থিত ছিলেন না; অপর পণ্ডিতগণ উহার সদুত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায় দিগ্বিজয়ী তিন দিনের সময় দিয়া বলিলেন, এই তিন দিনের মধ্যে সমস্যা পূরিত না হইলে রাজ-সভার পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। ইতিমধ্যে কালিদাস আসিলেন এবং এই ব্যাপার অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক ভিক্ষুবেশে ঐ প্রশ্নকর্ত্তার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। উক্ত পণ্ডিত ভিক্ষা প্রদানার্থ অন্যান্য দ্রব্য দিতে উদ্যুক্ত হইলে ভিক্ষুক, মাংস না হইলে চলে না, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুকের এই স্পর্দ্ধা অবলোকনে চমৎকৃত হইয়া দিগ্বিজয়ী বলিলেন—

"ভিক্ষো মাংসনিষেবণং প্রকুরুষে?"

হে ভিক্ষুক, তুমি মাংসভক্ষণ কর?

ভিক্ষুরূপী কালিদাস বলিলেন:

"কিং তত্র মদ্যং বিনা?"

তাহাতে আবার মদ্য না হইলে কি চলে?

দি। "মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং"

মদও তোমার প্রিয় পদার্থ?

কা। "প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।"

বিলক্ষণ প্রিয়, তবে বারাঙ্গনার সঙ্গে হইলেই ভাল।

দি। "বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং?"

বেশ্যার প্রয়োজন হইলে ত টাকা চাই, তুমি টাকা কোথায় পাইবে?

কা। "দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা"

জুয়া খেলিয়া কিংবা চুরি করিয়া।

দি। "চৌর্য্যদ্যূতপরিগ্রহোঽস্তি ভবতঃ ?"

তোমার জুয়া খেলার ও চুরি করার ঝোঁকটুকুও আছে ?

কা। "নষ্টস্য কান্যা গতিঃ॥" *

নষ্টের অন্য কি গতি আছে ?

ঈদৃশ অভাবনীয় উপায়ে সমস্যা পরিপূরিত হইতে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং পূরণকারী ছদ্মবেশী কালিদাসকে ধন্যবাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

এই সকল কার্য্যে কালিদাস ছদ্মবেশ ধারণ করিতেই যেন একটু আমোদ পাইতেন। সুচতুর যোদ্ধা যেমন সঙ্গোপনে একবারে শত্রুর শিবির অধিকার করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত বিপক্ষেরও অনায়াসে পরাজয় সাধন করেন, কালিদাসও তদ্রূপ আপনাকে গোপন রাখিয়া প্রতিপক্ষের অভাবনীয় উপায়ে তাহাকে চমৎকৃত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেন। কবিবরের এই সম্মুখ-যুদ্ধে বৈমুখ্য বিষয়েও কিংবদন্তী একটি কাহিনী প্রচারিত করিয়াছে।

একদা দেবী সরস্বতী স্বীয় বরপুত্রের কৃতিত্ব পরীক্ষার্থ বালিকা বেশ ধারণ করিয়া একটি ছিন্নপত্রে এক শ্লোকের

* সমগ্র শ্লোকটী এই—

"ভিক্ষো মাংসনিষেবণং প্রকুরুষে কিংতত্র মদ্যং বিনা
মদ্যঞ্চাপি তবপ্রিয়ং প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা
চৌর্য্যদ্যূতপরিগ্রহোঽস্তি ভবতো নষ্টস্য কান্যা গতিঃ॥"

প্রথমার্দ্ধ ভাগ লিখিয়া বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

আমার স্বর্গীয় জনক একটি শ্লোক রচনা করিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন, আমি এই পত্রে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে উহার শেষার্দ্ধটুকু এই পত্রের অর্দ্ধাংশের সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—আপনাদের কেহ যদি দয়া করিয়া উহা বলিয়া দিতে পারেন, চিরবাধিত হইব। শ্লোকার্দ্ধটি এই—

"যাতু যাতু কিমনেন তিষ্ঠতা
মুঞ্চ মুঞ্চ সখি সাদরং বচঃ।"

কোন মানিনী প্রিয়তমকে উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন—সখি! উহাকে এখানে থাকিবার জন্য এত মিস্ট বাক্য বলিতেছ কেন? যাইতে দাও।

রত্নগণের মধ্যে একজন শ্লোকটি এইরূপ পূরণ করিলেন

"পামরীবদনলোলুপো যুবা
নোহি বেত্তি কুলজাধরামৃতং॥"

বেশ্যার বদনমধুতে যার আসক্তি সে কি কখন কুলবধূর অধরামৃত পানের স্বাদ বুঝে?

উহা শুনিয়া বালিকা বলিলেন, "আমার যতদূর স্মরণ হয়, পিতার শ্লোকটি এইরূপ ছিল না।" তখন অপর পণ্ডিত বলিলেন—

"কোকিলাকলরবো বনে বনে
নূনমস্য নিগড়ো ভবিষ্যতি ॥"

কাননে কাননে উদ্দীপক কোকিলার কুহুস্বর ধ্বনিত হইতেছে, উহাই ইহার নিগড় স্বরূপ (অত্রাবস্থিতির কারণ) হইবে।

উহাতেও বালিকার তৃপ্তি হইল না দেখিয়া স্বয়ং মহারথী কালিদাস উত্তর করিলেন—

"নূনমেষ মদপাঙ্গনির্জ্জিতো
যত্নতঃ কতি পদানি গচ্ছতি ?"

আমার কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়া এ আর কয় পা চলিতে সমর্থ হইবে ?

ইহাতেও প্রশ্নকারিণী সন্তুষ্টা হইলেন না দেখিয়া কালিদাস বিষম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বালিকার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। বাগেদবী তখন প্রকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "বৎস, পণ্ডিতের ঈদৃশ ক্রোধবশীভূত হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। তুমি আমারই কৃপায় অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালা বিদ্বান্ ও কবিকুল-চূড়ামণি হইয়াছ বটে, কিন্তু আমার অভিশাপে সম্মুখবিচারে তোমার পাণ্ডিত্যের স্ফূর্ত্তি পাইবে না, সুতরাং জয়লাভও ঘটিবে না।" *

---

* সম্মুখবিচারে কালিদাসের পরাভূতির দৃষ্টান্তের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ মেছুনী ও কুম্ভকারের হস্তে কবিবরের দর্পচূর্ণের কাহিনী জনশ্রুতিতে প্রচারিত আছে। যাহা হউক, অবশেষে কালিদাসের অশেষ স্তুতি বিনতিতে প্রসন্না হইয়া বাগেদবী, কেবল একদিন সম্মুখ বিচারে জয়লাভ হইবে, এরূপ বর দেন; ঐ একদিন নাকি কালিদাস বৃহস্পতি অধিষ্ঠিত ইন্দ্রের সভা জয় করেন।

ফলতঃ স্বকীয় সিদ্ধান্তে প্রতিপক্ষকে আপত্তি প্রদর্শন করিতে দেখিয়া যে পণ্ডিত ক্রোধে অধীর হন, বিচারক্ষেত্রে তিনি জয়-লাভ করিতে সমর্থ হন না।

এতাদৃশ সমস্যা পূরণে কালিদাসের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কোন কবি এক রাজমহিষীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হন। রাজা জানিতে পারিয়া শাস্তি স্বরূপ কবিকে শূলারোপিত করেন। ঐ কবি স্বীয় শোণিত দ্বারা শূলের পার্শ্বে স্বকীয় দশাপরিণতিসূচক একটি শ্লোক লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু—

"কেবা ন সন্তি ভুবি তামরসাবতংসা
হংসাবলীবলয়িনো জলসন্নিবেশাঃ।"

এই ভূমণ্ডলে প্রফুল্ল পঙ্কজপরিশোভিত হংসমালাপরিবেষ্টিত কতই জলাশয় বর্ত্তমান আছে ;—

এই অর্দ্ধাংশ লিখিবামাত্রই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। রাজা এই শ্লোকার্দ্ধ দেখিয়া উহার অপরার্দ্ধ কীদৃশ হইবে এই কৌতূহলপরবশ হইয়া নানাদিগ্‌দেশস্থ পণ্ডিতগণকে উহা পূরণ করিতে দেন। কিন্তু কেহই উক্ত কবির মনোগত ভাবানু-রূপে কিংবা রাজার তৃপ্তিকররূপে উহা পরিপূরিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে কালিদাসসমীপে ঐ শ্লোকার্দ্ধ নীত হইলে তিনি এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন—

'কিং চাতকঃ ফলমবেক্ষ্য সবজ্রপাতাং
পৌরন্দরীং কলয়তে নববারিধারাম্।"

তবে তৃষিত চাতক কি ফল প্রত্যাশা করিয়া ইন্দ্রপ্রবর্ত্তিত বজ্রপাত সমন্বিত নবমেঘ বর্ষণের প্রতি তাকাইয়া থাকে ?

রাজা এই শ্লোকপূর্ত্তিতে নিরতিশয় প্রীত হইয়া কবিবরের যথেষ্ট প্রশংসা ও পুরস্কার বিধান করিলেন।

আর একদিন কালিদাসের কোন বন্ধু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং" এই প্রথম পাদ, এবং "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" এই শেষ পাদ নির্দ্দেশিত করিয়া, আদিরসে একটি শ্লোক রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
স্পৃষ্ট্বা সখে দিব্যমহং করোমি।
যোগে বিয়োগে দিবসোঽঙ্গনায়া
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ॥

হে সখে! আমি এই পরম পবিত্র যজ্ঞসূত্র স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, প্রিয়তমার সঙ্গমে দিবস যেন অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বোধ হয়, আর তাহার বিয়োগে মহান্ অপেক্ষাও দীর্ঘতর জ্ঞান হয়।

এইরূপ সমস্যা পূরণের অনেক কাহিনী প্রচারিত আছে। বাহুল্য ভয়ে এবারে এইস্থানেই শেষ করা গেল।

[সাহিত্যসেবক ফাল্গুন ১৩০৩।

কালিদাসের কাহিনী।

(৬) উপসংহার।

একদা এক রাক্ষস বিক্রমাদিত্যের সভায় আসিয়া বলিল, "তন্নষ্টং"। যদি ত্রিরাত্র মধ্যে এই সমস্যার পূর্ত্তি না হয় তবে রাজ্য শুদ্ধ লোক সংহার করিয়া ফেলিব। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া রত্নগণ, মায় কালিদাস, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইলেন। পথে কালিদাস দেখিলেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নগ্নপদে প্রতপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া অতি ক্লেশে পথ চলিতেছেন; স্বভাবসুকুমার কবিহৃদয়ে দয়া উপজাত হইল,—কবি স্বীয় জীর্ণ পাদুকাযুগল ব্রাহ্মণকে দান করিয়া স্বয়ং নগ্নপদে গমন করিতে লাগিলেন। অল্প দূর গিয়াই তিনি একটি অস্বামিক সসজ্জ অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং তদারোহণে উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর উত্তীর্ণ হইলেন। এতদ্ ঘটনায় কবির মনে যে ভাবরাশি আবির্ভূত হইল, উহাতেই রাক্ষসের সমস্যা পূরিত হইল। কালিদাস রাজসভায় প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন—

"দ্বিজায় পাদুকা দত্তা শতবর্ষীয়জর্জ্জরা।
তৎফলাদশ্বলাভো মে তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে॥"

বহু পুরাতন এক যোড়া জুতা ব্রাহ্মণকে দিয়াছিলাম, তাহার ফলে একটা ঘোড়া পাইলাম। ফলতঃ যাহা দান না করা যায়, তাহাই নিষ্ফল।

সে যাত্রা এইরূপে রাক্ষসের হস্ত হইতে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য রক্ষা পাইল।

আর একবার এক সমস্যা হইল "ততঃ কিং, ততঃ কিং, ততঃ কিং, ততঃ কিং?" কালিদাস পূরণ করিলেন—

"গিরেস্তুল্যবিত্তং ন দানং ততঃ কিং?
কুশাগ্রীয় বুদ্ধির্ন পাঠস্ততঃ কিং?
বপুঃ কর্ম্মশক্তং ন তীর্থস্ততঃ কিং?
ন ভর্তুঃ প্রিয়ঞ্জীবিতঞ্চেত্ততঃ কিং?"

পর্ব্বতপ্রমাণ ধন থাকিলেও দান না হইলে লাভ কি? তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও যদি পড়াশুনা না থাকে তবে উহাতে ফল কি? শরীরে শক্তিসামর্থ্য থাকা সত্বেও তীর্থাদি পর্য্যটন না করিলে কি লভ্য হইল? যদি স্বামী ভাল না বাসেন তবে বাঁচিয়া থাকায় কি ফল?

ভারতীর বরপুত্রের ঈদৃশী ক্ষমতা ছিল যে অপরের যাহা জানা অসম্ভব তাহাও প্রজ্ঞাচক্ষুর্বলে তিনি দেখিতে পাইতেন। এই ক্ষমতা একবার তাঁহার সমূহ বিপত্তিরও হেতুভূত হইয়াছিল। কোন শিল্পী রাজা বিক্রমাদিত্যের মহিষী ভানুমতীর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া নবরত্নাধিষ্ঠিত রাজসভায় আনয়ন করে। সকলেই উহার সবিশেষ প্রশংসা করেন, কিন্তু কালিদাস উহাতে যেন কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে এরূপ ভাব প্রকাশ করেন। ইহাতে শিল্পী ক্রোধভরে স্বীয় তুলিকা নিক্ষেপ করাতে এক বিন্দু মসী ঐ নগ্ন প্রতিকৃতির উরুদেশে পতিত হইল, তখন কালিদাস

"এইবার ঠিক্ হইয়াছে" এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। সকলেই কালিদাসকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কবি বলিলেন, "রাজমহিষীর উরুদেশে একটি তিল আছে, শিল্পী অজ্ঞতাবশতঃ উহা চিত্রিত করিতে পারে নাই, এখন তন্নিক্ষিপ্ত তুলিকানিঃসৃত মসী বিন্দুতে উহা সংসাধিত হইয়াছে।"

কালিদাসের কথা শুনিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে মহিষীর গুপ্ত প্রণয়ী বিবেচনা করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বীয় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। কবি নিরুপায় ভাবিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গোপনে উজ্জয়িনীতেই কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজপুত্র মৃগয়া উপলক্ষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনের পথ না পাইয়া এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রজনী যাপনে কৃত সংকল্প হইলেন। ঐ বৃক্ষে জাম্ববানের এক বংশধর অবস্থান করিতেছিল। শ্বাপদত্রস্ত রাজপুত্র উহার আশ্রিত হইয়া উহার সহিত মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিশ্রব্ধহৃদয় ভল্লুক কিয়ৎক্ষণ পরে মিত্র রাজপুত্রের ক্রোড়দেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা গেলে হঠাৎ এক ব্যাঘ্র আসিয়া রাজপুত্রকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। আত্ম-প্রাণরক্ষার্থ রাজপুত্র তখন ভল্লুককে ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভল্লুক কোন মতে বৃক্ষাবলম্বন করিয়া রহিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে ভল্লুক সেই মিত্রদ্রোহী রাজপুত্রকে চপেটাঘাত করিয়া "সসেমিরা"

এইমাত্র বলিয়া প্রস্থান করিল। পরে রাজপুত্র উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কেবল "সসেমিরা" এই বাক্য জপ করিতে লাগিলেন।

বহু চিকিৎসাদি করিয়াও রাজপুত্রের আরোগ্য হইল না; বিক্রমাদিত্য ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে রাজপুত্রকে সুস্থ করিতে পারিবে তাহাকে প্রভূত পুরস্কার দিবেন। পুরস্কার লোভে অনেক চিকিৎসক আসিয়া অকৃতকার্য্য হইল। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন রাজা স্বীয় তনয়ের আরোগ্য বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িলেন। ছদ্মবেশী কালিদাস তখন আপন আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে আসিলেন, এবং রাজপুত্রকে দেখিতে চাহিলেন। রাজপুত্র আসিলে তাঁহার "সসেমিরা" উক্তি শুনিয়া স্ত্রীবেশী কালিদাস কহিতে লাগিলেন—

"সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারোহ্য সুপ্তানাং হত্বা কিংনাম পৌরুষম্॥"

প্রণয়াবদ্ধ ব্যক্তিকে বঞ্চনা করাতে কি বাহাদুরী হইল? ক্রোড়শয়িত নিদ্রাগত ব্যক্তির বধসাধন করিতে যাওয়া কি পৌরুষের কার্য্য?

"সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥"

যাহারা ব্রহ্ম বধ করিয়াছে তাহারাও সেতুবন্ধে, সমুদ্রজলে বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন পূর্ব্বক পাপমুক্ত হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহীর কদাপি মুক্তি নাই।

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক, ঐ সকল ব্যক্তি যতদিন পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন নরক ভোগ করিবে।

"রাজর্ষে রাজপুত্রস্য যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥"

হে রাজন্! যদি রাজপুত্রের কুশল কামনা করেন, তবে ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান এবং ভক্তিভরে দেবতার্চ্চন করুন।

"সসেমিরা"র সমস্যা এইরূপে * পূরিত হইলে রাজপুত্র আরোগ্য লাভ করিলেন এবং অরণ্যের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হইয়া ছদ্মবেশী কালিদাসকে বলিলেন

"গৃহে বসসি সুশ্রোণি অটব্যাং নৈব গচ্ছসি।
কথং নৃশার্দ্দূলর্ক্ষাণাং বৃত্তান্তমবগচ্ছসি॥"

হে সুন্দরি, তুমি বনে কখনও যাও না, গৃহে বসিয়া কিরূপে এই মনুষ্য, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র ঘটিত বৃত্তান্ত অবগত হইলে?

স্ত্রীবেশী কবি বলিলেন—

"দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥"

হে ভূপ, দেবতা ও গুরুদেবের কৃপায় আমার জিহ্বাগ্রে

* উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ের আদ্য অক্ষর লইলে 'স সে মি রা" হইবে। এই গল্পটি বররুচি সম্বন্ধেও কহিত হইয়া থাকে।

সরস্বতী স্বয়ং বিরাজমানা ; আমি এই কারণেই এই সকল গুহ্য বৃত্তান্ত অবগত আছি, এই জন্যই ভানুমতীর তিলের কথাও জানি।

তখন বিক্রমাদিত্যের চৈতন্য হইল এবং ছদ্মবেশী রমণীকে কালিদাস জানিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

একদা কালিদাস স্বীয় পুত্রকে পড়াইতেছিলেন—"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" দৈবাৎ ঐ পথ দিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য যাইতেছিলেন ; রাজা কেবল স্বদেশে এবং বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্য, এই কথা তাঁহার অসহ্য হইল। তখন রাজাও কবি পরামর্শ করিলেন, উভয়েই আকৃতি গোপন করিয়া বিদেশে পর্য্যটন করিবেন, দেখা যাইবে কাহার কত সম্মান। কিছু দিন ভ্রমণ করিলে পর রাজার অর্থ ফুরাইয়া গেল ; অবশেষে স্বীয় হস্তের অঙ্গুরীয় বিক্রয় পূর্ব্বক উদর পোষণ করিবেন, এই অভিপ্রায়ে মণিকারের দোকানে গেলে ঐ ব্যক্তি উহাতে বিক্রমাদিত্যের নাম অঙ্কিত দেখিয়া ছদ্মবেশী রাজাকে চোর মনে করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক তদ্দেশীয় নরপতির সমীপে আনয়ন করিল। এদিকে কালিদাস ঐ দেশেরই নৃপতির সভায় আসিয়া বিদ্যাবলে রাজার সন্তুষ্টি সাধন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছিলেন। চোর বেশে বিক্রমাদিত্য যখন রাজসভায় আসিলেন, তখন কালিদাস চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" তখন সমস্তই প্রকাশ পাইল, জগতে বিদ্যার গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল।

কালিদাস তিথি বিশেষে মৌনাবলম্বন করিয়া ছদ্মবেশে থাকিতেন। এতদবস্থায় একদা রাজপুরুষেরা তাঁহাকে সামান্য লোক বিবেচনায় রাজার শিবিকা বহনে নিযুক্ত করিয়া দিল। অনভ্যস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ক্ষণমধ্যেই কবিবরের শ্রান্তি জন্মিল; ইহাতে রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি॥"

রে মূঢ়, যদি তোর কাঁধে বেদনা ধরিয়া থাকে তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর্। "বাধতি" এই পরস্মৈপদী অশুদ্ধ প্রয়োগ শুনিয়া কালিদাসের মৌনব্রত ভঙ্গ হইয়া গেল; তিনি বলিয়া ফেলিলেন,—

"ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে॥"

আমার কাঁধে তেমন ব্যথা বোধ হইতেছে না, যেমন আপনার মুখে "বাধতি" প্রয়োগ শুনিয়া বোধ হইল।

ইংলণ্ডীয় কবি গোল্ড্স্মিথের ন্যায় কবি কালিদাসও দান-কার্য্যে অপরিণামদর্শী ছিলেন। একদা সর্ব্বস্ব দান করিয়া, এমন কি পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত বিলাইয়া দিয়া, কবিবর আবক্ষঃ জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য জানিতে পারিয়া বলিলেন—

"অসম্যগ্ ব্যয়শীলস্য গতিরেতাদৃশী ভবেৎ।"

যাহারা ব্যয় করিতে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেনা, তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটে!

কালিদাস উত্তর করিলেন—

"তথাপি প্রাতরুত্থায় নাম তস্যৈব গীয়তে ॥"

তথাপি লোক নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঐ ব্যক্তিরই নাম কীর্ত্তন করে, কৃপণের নাম কেহ লয় না।

কালিদাস অলোকসামান্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইলেও, কিংবদন্তীর মতানুসারে, তিনি নাকি তত "ভাবুক" ছিলেন না। তাই রাজা বিক্রমাদিত্য কবিতারসমাধুর্য্য বুঝাইয়া দিবার জন্য একজন "ভাবুক" রাখিয়াছিলেন। কালিদাস কিন্তু এ বিষয়ে বড় রাজি ছিলেন না। তাই রাজা একদিন ভাবুকের আবশ্যকতা দেখাইবার নিমিত্ত কবি ও ভাবুক সমভিব্যাহারে সান্ধ্য সমীরণ সেবনার্থ বহির্গমন করিলেন এবং কবিকে মৃদুলবাতসঞ্চালিত একটি মুকুলিত আম্রবৃক্ষ দেখাইয়া উহা বর্ণনা করিতে বলিলেন। কবি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—

ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহমুপগতো হন্ত মলয়াৎ
ত্বমেকা ত্বদ্গেহে বিনয়বতি নেষ্যামি রজনীম্।
সমীরেণেত্যুক্তা নবকুসুমিতা চূতলতিকা
ধুনানা মূর্দ্ধানং নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে ॥

"সন্ধ্যা হইয়াছে, আমি বহুদূর মলয়পর্ব্বত হইতে আসিয়াছি, তুমি একাকিনী আছ; হে বিলাসিনি, অদ্য রজনী তোমারই গৃহে যাপন করিতে ইচ্ছা করি।" পবন এই কথাগুলি বলিলে অচিরপুষ্পিতা চূতলতা যেন মস্তক বিকম্পিত করিয়া 'না' 'না' 'না' এইরূপ করিল।

কবি তদীয় শ্লোক যথারীতি ব্যাখ্যা করিলে রাজা প্রশ্ন করি-

লেন, 'নহি' এই শব্দটি তিনবার উক্ত হইল কেন? কবি ছন্দঃ ও অলঙ্কার প্রভৃতি সম্পর্কীয় কারণ দর্শাইলে পর রাজা অসন্তুষ্ট চিত্তে ভাবুককে উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। তখন ভাবুক বলিলেন, চূতলতাকে "নবকুসুমিতা" বলা হইয়াছে। "স্ত্রীরজঃ পুষ্পমার্ত্তবং।" ইহাতে, তিনবার 'নহি' বলাতে, "ত্রিরাত্র আমার সঙ্গে থাকা হইবে না" চূতলতা ইহাই সূচনা করিতেছে। তখন ঐ ভাবুকেরই জয়জয়কার পড়িয়া গেল।

কালিদাস সম্বন্ধে এইরূপ নানা কাহিনী কিংবদন্তীমুখে প্রচারিত আছে, সমস্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশিত করিতে গেলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তথাপি কালিদাসের বেশ্যাসক্তি বিষয়ক দুইটি গল্প বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। প্রবাদ আছে, কালিদাস ও রাজা বিক্রমাদিত্য একই বারবনিতাতে আসক্ত ছিলেন। ইহাতে উভয়ে পরস্পর কিছু ঈর্ষ্যান্বিতও ছিলেন। একদিন বিক্রমাদিতা বারবনিতাকে শিখাইয়া দিলেন, "কালিদাস আসিলে তাহার মাথা মুড়াইয়া দিবে।" বারবনিতা তাহাই করিল, কিন্তু কালিদাসও উহাকে শিখাইয়া দিলেন, "তুমি রাজা আসিলে তাঁহাকে ঘোড়া সাজাইয়া তাঁহার উপর আরোহণ করিবে এবং তাঁহার দ্বারা ঘোড়ার হ্রেষারব করাইবে।" ঐ স্ত্রীলোক কালিদাসেরও অনুরোধ পালন করিল। অনন্তর পরদিন রাজ-সভায় সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে সমাসীন হইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে প্রশ্ন করিলেন—

"কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ মুণ্ডনং কুত্র তে কৃতং।"

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস! কোথা আপনার মুণ্ডন করা হইল?

কালিদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—

"যস্মিন্ ভবান্ হয়োভূত্বা চিঁহিঁ শব্দমথাকরোৎ"

যেখানে মহারাজ ঘোড়া হইয়া হ্রেষা রব করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য পরাস্ত হইলেন।

আর একদিন কালিদাস বারবনিতার ভবনে গিয়াছেন, এমন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্যও হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কালিদাস অমনি পার্শ্বস্থ গৃহে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। নানা হাস্য-পরিহাসের পর রাজা ঐ বনিতার স্তনযুগলে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—

"তব তন্বি স্তনাবেতৌ নিয়তৌ চক্রবর্ত্তিনৌ।"

হে সুন্দরি! তোমার স্তনযুগল নিশ্চয়ই চক্রবর্ত্তী রাজার ন্যায়।

বিক্রমাদিত্য এই শ্লোকার্দ্ধ বলিয়া অপরার্দ্ধ বলিতে না বলিতেই কালিদাস উত্তর করিয়া বসিলেন—

"আসমুদ্রকরগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ॥"

যেহেতু সাগরান্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র করগ্রহণকারী মহারাজাধিরাজ স্বয়ং উহাতে কর (অর্থাৎ হস্ত বা রাজস্ব) প্রদান করিয়া থাকেন।

ইহাতে রাজা লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বারবনিতার গৃহ হইতে চলিয়া যান। রাজা রুষ্ট হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর আসিবেন না, এবং কালিদাসই ইহার মূল, এই ভাবিয়া ঐ

পাপিষ্ঠা কালিদাসের বধ সাধন করিল। সরস্বতীর অভিশাপ সফল হইল। *

[সাহিত্য সেবক জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

---

* ভোজ প্রবন্ধের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। উহাতেও কালিদাসকে লম্পট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের তিরোভাবের পর ভোজসভায় আগমন করেন। তাহা হইলে কালিদাসের এই মৃত্যু কাহিনী নিশ্চয়ই অলীক। অপিচ, অষ্টসিদ্ধিযুক্ত রাজা বিক্রমাদিত্য জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক ও বিলাসশূন্য ছিলেন; ইহাতে তদীয় বেশ্যাপরায়ণতার গল্পও অলীক বলিয়াই বোধ হয়।

কাদম্বরীর উপাদান।

সহৃদয় সংস্কৃত সাহিত্য সেবক মাত্রেই বোধ হয় মহাকবি বাণভট্ট কৃত কাদম্বরীর সমগ্র না হউক কোনও না কোনও অংশ অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু, কাদম্বরী রসভরে মত্ততানিবন্ধন, বোধ হয় অনেকেই কোন্ উপদানে এই কাদম্বরী প্রস্তুত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধানের অবসরও প্রাপ্ত হন নাই।

বড় বড় কাব্যকারগণ গ্রন্থ প্রণয়নে কুম্ভকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কুম্ভকার প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, তাহার উপাদান মাটি, খড়, বর্ণ তুলিকা কিছুই তাহার নিজের প্রস্তুত নহে; কবিগণ কাব্যে যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহার একটিও নিজের নির্ম্মিত নহে। কুম্ভকার দুর্গামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে ধ্যানাদি পুরাণোক্ত বর্ণনা অবলম্বন করিয়া; কালিদাস কুমারসম্ভব প্রণয়ন করিলেন শিবপুরাণ সমাশ্রয় করিয়া। কুম্ভকার যেরূপ বাজার হইতে বর্ণ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিয়া প্রতিমার সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধন করে, সেইরূপ কবিও শব্দ ও কাব্য বাজার হইতে রস ও অলঙ্কার আহরণ করিয়া কাব্যের শোভা সম্পাদন করেন। সুদক্ষ কৃষ্ণনগরের কুম্ভকার যেরূপ মধ্যে মধ্যে প্রাকৃতিক জীব জন্তু প্রভৃতির অবিকল মুর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লোকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে, সুনিপুণ কবিগণও তেমনি প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে

মধ্যে মধ্যে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সহৃদয় জনগণের হৃদয়াকর্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কুম্ভকারের বাহাদুরী উপাদানের যথাস্থানে সন্নিবেশ করা, কবিরও চমৎকারিত্ব ঠিক্ ঐ স্থলেই। ফলতঃ অন্যস্থান হইতে উপাদান আহরণে যে কবির কি শিল্পকরের মহত্ত্বের কিছু হ্রাস হইবে এমন ভাব হৃদয়ে পরিপোষণ করা অসহৃদয়তার কার্য্য। কবি বলেন, "সহস্রগুণমুৎস্রষ্টু-মাদত্তে হি রসং রবিঃ"; আমরাও তাঁহারই সম্পর্কে বলিব, "সহস্রগুণ মুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং কবিঃ।"

যাহা হউক, বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরীকথা কথাসরিৎসাগর হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কথাসরিৎসাগর আবার বৃহৎকথা নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। বৃহৎকথার কথামাত্র অবশিষ্ট আছে; গ্রন্থ খানি এখন আর দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐরূপ কত বৃহৎকথার যে লোপ হইয়াছে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? নানা কথোপকথাবলীর সমষ্টীভূত কথাসরিৎসাগর বাস্তবিক অন্বর্থনামা, এবং কাদম্বরী, রত্নাবলী, নাগানন্দ ইত্যাদি অনেক রত্ন এই সাগর হইতে আহৃত হইয়াছে। প্রকাণ্ড কথাসরিৎসাগর যে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার সেই বৃহৎকথা যে কত বৃহৎ ছিল, তাহা সহৃদয়ের অনুমেয় মাত্র।

কথাসরিৎসাগর আরব্যোপন্যাসের ন্যায় নানাগল্পসমন্বিত। বাদশাহপত্নী শাহারজাদী স্বামী ও ভগিনীর চিত্ত বিনোদনার্থ নানা গল্পের অবতারণা করেন, তাহাতেই আরব্যোপন্যাসের গল্পবিন্যাস। কথাসরিৎসাগরেও বৎসরাজ, তৎপত্নী, কি তৎপুত্র

নরবাহন দত্তের মনোরঞ্জনার্থ মন্ত্রী অমাত্য পারিষদ প্রভৃতির প্রমুখাৎ নানা গল্পের অবতারণা হইয়াছে।

একদা বৎস রাজের পুত্র নরবাহন দত্ত, কোনও এক দিব্যাঙ্গনার রূপলাবণ্যে মোহিত ও তদীয় পাণিপীড়নে লোলুপ হইয়া নিতান্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন ও বিরহানুভব করিতে করিতে অবশেষে হতাশ হইয়া পড়েন। বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী গোমুখ তদীয় উৎকট আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন হতাশাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, সান্ত্বনার নিমিত্ত উপদেশচ্ছলে, অদ্ভুত শুক ও চণ্ডালদারিকার প্রস্তাবের অবতারণা করেন, এবং "এ জগতে মানবের ভবিতব্য মিলনাদি অতিদীর্ঘ বিচ্ছেদের পরেও ঘটিতে পারে" এই বলিয়া উহার উপসংহার করেন। সেই প্রস্তাবই প্রকৃত প্রস্তাবে কাদম্বরীর উপাদান।

উক্ত গল্পটি যদিও কাদম্বরীর প্রস্তাবের ন্যায় সুদীর্ঘ নহে, তথাপি উহার আয়তন এত ক্ষুদ্র নহে যে এতৎ পত্রের দ্বাদশ পৃষ্ঠেও উহার সঙ্কুলন হইবে। অথচ ইহার একটি ছত্রমাত্র বাদ দিলেই হয়ত গল্পের অবয়বের হানি হইবেক, ইহা এতদূর সংক্ষিপ্ত! কথাসরিৎসাগরের উনষষ্টিতম অধ্যায়ে গল্পটি লিখিত আছে। যাঁহারা কাব্যামোদী তাঁহারা উক্ত স্থানটি পাঠ করুন, বুঝিবেন কবি কীদৃশ সামান্য উপকরণ সম্বল করিয়া কিরূপ মনোহর বস্তু জগতের বিনোদনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কাদম্বরী সমগ্র বাণভট্টের রচিত নহে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কাদম্বরীর পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ যে টুকু বাণ স্বয়ং রচনা

করিয়া গিয়াছেন, তাহার রক্তমাংসস্বরূপ অসংখ্য রূপকোপমোৎপ্রেক্ষাপরিসংখ্যাসমন্বিত অশেষ সুদীর্ঘসমাসাঢ্যপদরাজিবিরাজিত শূদ্রকপুরী, বিন্ধ্যাটবী, জাবালির আশ্রম, অচ্ছোদ সরোবর, তপস্বিনী মহাশ্বেতার আশ্রম প্রভৃতির সুমধুর অথচ অতিবর্ণনাগুলি পরিত্যাগ করিলে যে অস্থিপঞ্জর নিরীক্ষিত হইবে, তাহা অবিকল কথাসরিৎসাগর হইতে উদ্ধৃত। তবে যে কিছু পার্থক্য, তাহা কেবল কথাস্থ নায়ক উপনায়ক প্রভৃতির নামকরণে এবং ঘটনাবলীর স্থান নির্দ্ধারণে। কিন্তু, কথা সরিৎসাগরস্থ প্রস্তাবের জ্যোতিষ্প্রভ, সোমপ্রভ, হর্ষবতী, কাঞ্চনাভ, মকরন্দিকা ইত্যাদি নামের সঙ্গে যথাক্রমে কাদম্বরীকথোল্লিখিত তারাপীড়, চন্দ্রাপীড়, বিলাসবতী, হেমকূট, কাদম্বরী প্রভৃতি নামের অর্থ ও ধ্বনিগত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার কাদম্বরী কথাতে, চন্দ্রাপীড়ের পরিচারক ও পরিচারিকা মেঘনাদ ও পত্রলেখার সামান্য চরিত্র ভিন্ন, নূতন চরিত্র আর কিছুই সমাবেশিত হয় নাই বলিলেও চলে। ফলতঃ বাণভট্ট নূতন ঘটনা বা চরিত্র আবিষ্কারে বড় পারদর্শী ছিলেন না, ইহা কাদম্বরী (এবং হর্ষরাজের প্রকৃত জীবনীর ঘটনাবলম্বনে লিখিত হর্ষচরিত) দৃষ্টে স্পষ্টই অনুমান করা যায়। কিন্তু তিনি যে প্রকার রচনামালা দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যে রূপ মনোহারি বর্ণনাদি দ্বারা কাব্য ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, শুকনাসের মুখে চন্দ্রাপীড়ের প্রতি উপদেশ, চন্দ্রাপীড়ের মুখে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী মহাশ্বেতার পাতিব্রত্যের প্রশংসা, প্রভৃতি স্থলে

যে সকল জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সাহিত্য সংসারে সচরাচর সুদুর্ল্লভ।

বাণভট্ট কাদম্বরীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ রচনা করিয়া পরলোক গত হইলে তদীয় উপযুক্ত পুত্র ভূষণ ভট্ট গল্পের শেষ কামনায় অপরাংশ স্বয়ং রচনা করেন। তাঁহার রচনা কিরূপ, পিতার রচনা-পেক্ষা উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট, ইত্যাকার বিষয় অদ্য আমাদের আলোচ্য নহে; কিন্তু তাঁহার স্বরচিত কাদম্বরীর শেষাংশ এবং সরিৎসাগরস্থ গল্পের অবশিষ্টাংশ তুলনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে তিনি কথা-সরিৎসাগরের সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তিনি কথাসরিৎসাগরের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন ইহা কল্পনা করাও বাতুলত্ব মাত্র। তাঁহার উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন না করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে পর্য্যন্ত অব-লম্বনে বাণভট্ট পূর্ব্বার্দ্ধ লিখিয়া যান সৌভাগ্য বশতঃ সে পর্য্যন্ত কথাসরিৎসাগরের প্রস্তাবটি বেশ একটু সুসঙ্গত ও প্রীতিপ্রদ। কিন্তু ইহারই পর হইতে প্রস্তাবটি যেন হঠাৎ ও অসঙ্গতরূপে উপসংহৃত হইয়াছে। সুতরাং পিতার লিখিত অংশের সুসঙ্গতো-পসংহার করিতে হইলে, বাণপুত্রের এতাদৃশ অসঙ্গতাংশ পরিহার ও সঙ্গত প্রস্তাবের নূতন কল্পনা করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। দৃষ্টান্ত স্থলে ধরুন, কথাসরিৎসাগরস্থ গল্পের প্রারম্ভে কাদম্বরী-কথার ন্যায়, লিখিত আছে যে জ্যোতিষ্প্রভ (তারাপীড়)-মহিষী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন তাঁহার মুখে চন্দ্রমা প্রবিষ্ট হইতেছেন, এবং তজ্জন্যই নবজাত কুমারের নাম সোমপ্রভ (চন্দ্রাপীড়)

রাখা হয়। কথাসরিৎসাগরের গল্পের কোনও অংশে এই অলৌকিক ঘটনার আর কোনও উল্লেখ বা হেতুপ্রদর্শন কিছুই নাই। বাণপুত্র সেই ঘটনাটির উপর নির্ভর করিয়া, চন্দ্রও পুণ্ডরীকের পরস্পর অভিশাপ এবং তন্মূলক নানা বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন, যাহার কিছুমাত্র উল্লেখও কথা সরিৎ-সাগরে নাই। বস্তুতঃ বাণপুত্র শেষাংশে কথা সরিৎসাগরের অবলম্বন না করিয়া যে ভালই করিয়াছেন, তাহা, যিনিই উভয় প্রস্তাব পাঠ করিবেন, তিনিই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পুত্র, মাত্র পিতার গল্পটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, নিজের কল্পনার আশ্রয়ে, যতদূর সঙ্গতি সহকারে পারেন, গল্পটির উপসংহারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ হইয়া পড়িল। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ দেখিলেন, বাণভট্টের কাদম্বরীকথার, ঐ কথাসরিৎসাগরস্থ গল্পটিই প্রধান উপাদান। কিন্তু যে উপাদান প্রভাবে কাদম্বরী সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেরই আদরণীয়া ও মনোমুগ্ধকরী, এবং কথাসরিৎসাগর হইতে সহস্রগুণে অধিকতর প্রসিদ্ধা, তাহা কেবল কবির স্বকীয় প্রতিভা। সেই প্রতিভা বলে বাণভট্ট যতদিন সংস্কৃত ভাষা জগতে বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন অমর হইয়া গদ্য কবিকুলের চূড়ামণি রূপে অবস্থান করিবেন। * [সারস্বতপত্র ১২ই বৈশাখ ১২৯৯।

---

* পাশ্চাত্য মতানুযায়ী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌বিদ্বৎসমাজের এই মত যে কথাসরিৎসাগর কাদম্বরীর অনেক পরে সঙ্কলিত হইয়াছে। তবে যে কথাসরিৎসাগরস্থ গল্পটি ও কাদম্বরী

পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ।

ইদানীং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এবং গোয়ালন্দ ডাক-জাহাজ প্রভৃতির কল্যাণে আসাম প্রদেশে যাতায়াত অতিশয় সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে যখন মাত্র মাল জাহাজ ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া আসিত, তখনও আসাম আসা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুটা সুগম হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যখন জলপথে নৌকা এবং স্থলপথে পর্ব্বতভেদী রাস্তা মাত্র গতায়াতের উপায় ছিল তখন আসামে ভিন্নস্থানের লোক আসিতে চাহিত না। যাহারা আসিত তাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আসিত; দেশে অনুপায় না হইলে কেহ এখানে আসিত না। একবার আসিলে পথক্লেশ স্মরণ করিয়া এবং স্বদেশের অসচ্ছলতা ইত্যাদি ভাবিয়া সহজে বড় কেহ ফিরিয়া যাইতে

কথার এত ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্য, তাহার কারণ এই যে বৃহৎকথা অবশ্য কাদম্বরীর পূর্ব্বেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং সেই বৃহৎকথারই সংক্ষিপ্ত সার কথাসরিৎসাগর। যাহা হউক, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শ্রুত্যনুসারে, সরিৎসাগর, বৃহতের সংক্ষিপ্তসার হেতুতে পুত্র। পিতার অবর্ত্তমানে, পিতৃধনে পুত্রেরই অধিকার, এই স্মৃত্যনুসারে, বৃহৎকথা চিরবিলুপ্ত হওয়াতে কাদম্বরীকথোপাদানত্বমূলকযশোধনের অধিকারী কথাসরিৎসাগর কি না, এবং "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ" এতৎ প্রবচনানুসারে, যে বৃহৎকথা বিনষ্ট হইয়া ভূতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কথা বারংবার উল্লেখ করতঃ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা বর্ব্বরত্ব মাত্র কি না, তাহা সুধীগণের বিভাব্য। বোধ হয় তন্নিমিত্তই প্রবন্ধকার বৃহৎকথার কথা না বলিয়া বারংবার কথাসরিৎসাগরের কথাই বলিয়াছেন। ইতি কস্যচিৎ কাদম্বরীপ্রসঙ্গপ্রমত্তস্য।

চাহিত না। এইখানেই বিবাহাদি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই নিমিত্তই বোধ হয় প্রবাদ হইয়াছিল, "আসামে আসিলে ভেড়া বনিয়া যায়।"

যখন অবস্থা এই ছিল, তখন ভাল লোক আসামে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া যে আসামের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিবে তাহার সম্ভাবনাও কম ছিল। সুতরাং আসামের ইতিহাস কেহ বড় জানিত না। না জানাটা বড় একটা যে ক্ষতির বিষয় ইহাও কেহ মনে করিত না। ফল কথা আসাম ও ইহার ইতিবৃত্ত বিষয়ে বঙ্গদেশে একটা ঔদাস্য-অবহেলার ভাবই পরিলক্ষিত হইত।

তখন মা কামাখ্যাই আসামকে বহির্জ্জগতের সঙ্গে কিছুটা জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালীজাতি চিরকালই তীর্থপর্য্যটনের নিমিত্ত বিখ্যাত। গয়া, কাশী, হরিদ্বার বৃন্দাবন বা শ্রীক্ষেত্র যে খানেই যাও না কেন, যাত্রিকের ভূরিভাগ বাঙ্গালী দেখিতে পাইবে। কামাখ্যা দর্শনের নিমিত্ত সুতরাং বাঙ্গালাদেশীয় নর-নারী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কামরূপে আসিত। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মার্থে আসিত, তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ প্রাচীন তত্ত্বের অনুসন্ধানলোলুপ লোক দেখা যাইত। কামাখ্যার মন্দির কে কখন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, কামাখ্যার সেবাপূজার বিধিব্যবস্থা কে করিয়া দিয়াছেন, ইহারও কেহ খবর লইত কিনা সন্দেহ, কামাখ্যা মহাপীঠের আবিষ্কার কিরূপে হইল, তাহা ত দূরের কথা।

বঙ্গদেশের জনগণমধ্যে বোধ হয় সাধকপ্রবর মহাত্মা পূর্ণানন্দ গিরিই সর্ব্ব প্রথম কামাখ্যা তীর্থ দর্শন করিতে আসেন;

অথবা বোধ হয় তিনিই সর্ব্ব প্রথম বঙ্গীয় জনসমাজে এই মহাপীঠের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তাই সাধারণ লোকের মধ্যে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে পূর্ণানন্দ গিরিই এই মহা-পীঠের আবিষ্কর্ত্তা এবং সেই ধারণা আজিও কোন কোন স্থানে অব্যাহত রহিয়াছে।

মহাত্মা পূর্ণানন্দ বঙ্গদেশের গৌরবাস্পদ। তিনি কামাখ্যা পীঠের আবিষ্কারক এই ধারণাই যে তাঁহাকে গৌরবের আসনে বসাইয়াছে তাহা নহে। তিনি শক্তিসাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিয়া স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। "পূর্ণানন্দ বংশীয়" বলিয়া আজিও তদীয় বংশধরগণ স্বীয় সমাজে আপামর সাধারণের নিকট অশেষ সম্মান লাভ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিগণের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নাম শাক্ত হিন্দুসমাজে আবহমান কাল কৃতজ্ঞতা ও সম্মান সহকারে স্মৃত হইবে। ফলকথা, তিনি কামাখ্যা পীঠের আবিষ্কারক নহেন, ইহা প্রচারিত হইলে তাঁহার গৌরব-মাহাত্ম্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

বহুদিন হইল "আরতি" পত্রিকায় * "পূর্ণানন্দ পরমহংস" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার লেখক মহাশয়ও সাধারণ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে কামাখ্যা পীঠের উদ্ধারকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে উক্ত

* আরতি, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০৯।

প্রবন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, এই ধারণার মূলে যে যাথার্থ্য নাই, ইহা, এবং মহাপীঠের আবিষ্কার সম্বন্ধে আসাম প্রদেশের ইতিহাসে কি কি কথা বর্ণিত আছে তাহা, এবম্বিধ পীঠ-সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য অপর দুই একটি বিষয় বলিবার নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কোচবিহার রাজ্যের অধিপতিগণ শিববংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে কোচ-রমণীর গর্ভে মহাদেবের ঔরসে বিশু ও শিশু নামে দুইটি বালক জন্মে। ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বাহু-বলে জন্মস্থানের আধিপত্য লাভ করিয়া "বিশ্বসিংহ" ও "শিবসিংহ" এই নাম ধারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ রাজ্যের বিস্তার করিতে করিতে সমগ্র কামরূপ প্রদেশের অধীশ্বর হইয়া উঠিয়া-ছিল। সেই সময়ে কামরূপ করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কালক্রমে পূর্ব্বাংশ হইতে পশ্চিমাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিশ্বসিংহের বংশধরগণের রাজত্ব কোচবিহারে সীমাবদ্ধ হইয়া যায় এবং 'কামরূপ'ও বর্ত্তমান সংকুচিতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাদেবের ঔরসজাত কোচবিহার রাজবংশের আদিপুরুষ এই বিশ্বসিংহ মহারাজই কামাখ্যা মহাপীঠ আবিষ্কার করেন। এই বিষয় রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর কৃত "আসাম বুরঞ্জি" (ইতিহাস) গ্রন্থে † আসামীয় ভাষায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"বিশ্বসিংহ রাজা হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্য পালন করিতে

† ৫৫—৫৬ পৃষ্ঠা (২য় সংস্করণ)।

লাগিলেন। কমতাপুর নগর লওয়াতে এবং অন্যান্য মেছ ও কোচজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে পরাস্ত করাতে তাঁহার অনেক শত্রু হইল। সেইগুলিকে ক্রমশঃ দমন করিয়া রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়েই উজাইয়া গৌহাটির দিকে আসিলেন। এক দিন দুই ভাই নীলাচল পর্ব্বতে গেলেন। সম্প্রতি যেমন এই পর্ব্বত বহুজনাকীর্ণ স্থান হইয়াছে, তখন তেমনটি ছিল না। অতি সামান্য মেছ বা কোচকুলের কয়েক জন মানুষ মাত্র সেখানে ছিল। বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ দুই ভ্রাতা সঙ্গের লোকজন হারাইয়া সেই মেছ বসতিতে গিয়া কোনও পুরুষ মানুষের সাক্ষাৎ পাইলেন না। কেবল একজন বৃদ্ধার দেখা পাইলেন। ঐ স্ত্রীলোকটি একটা বট গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। সেই স্থলে একটা মাটির ঢিবি ছিল। অতিশয় পিপাসাতে রাজা ঐ বৃদ্ধার কাছ হইতে শুশ্রূষা পাইলেন। গাছের নীচের মাটির ঢিবি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে, বৃদ্ধা উহা তাহাদের দেবতা বলিয়া কহিল। রাজা সঙ্গীয় লোকজন সত্বর পাইবার জন্য সেই স্থলে প্রার্থনা করার অল্প পরেই উহারা আসিয়া সকলেই উপস্থিত হইল। এই প্রকারে সেই দেবতার মাহাত্ম্য জানিয়া রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে, উহাতে পূজা করিতে হইলে শূকর ও কুক্কুট কাটিয়া বলি দিতে হয় এবং উপচাররূপে স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রালঙ্কার দিতে হয় শুনিয়া, উহা শক্তি-পীঠ বা শক্তির স্থান জ্ঞানে তিনি এই সংকল্প করিলেন যে যদি তাঁহার দেশ সুস্থির হয় এবং রাজ্য নিষ্কণ্টক হয় তাহা হইলে সোণার মন্দির

নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন। রাজা আপন দেশে ফিরিয়া আসার পর ক্রমশঃ দেশ সুস্থির হইল। তিনি সমস্ত পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া আনিয়া সেই দেবতা স্থানের বিষয় অনুসন্ধান করাতে উহা কামাখ্যার পীঠস্থান বলিয়া জানিলেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত, রাজা সেই গাছটি কাটাতে তাহার নিম্নে কামাখ্যার পীঠ বাহির হইল। এইরূপে যোগিনীতন্ত্র এবং অন্যান্য পুরাণ দেখিয়া রাজা তত্রস্থিত প্রায় সকল পীঠই বাহির করিলেন। কামাখ্যা মন্দিরের তলের ভাগটাও মাটির নীচ হইতে বাহির হইল। রাজা সেই তলের খণ্ডের উপরেই মন্দির করিয়া দিলেন এবং সোণার মন্দিরের পরিবর্ত্তে প্রতি ইষ্টকখণ্ডে একরতি করিয়া সোণা দিলেন।"

এই বৃদ্ধাটি কে তাহা বুরঞ্জিতে উক্ত হয় নাই। বুঝি বা জগন্মাতা, সদাশিবের ঔরসজাত পুণ্যশ্লোক মহারাজ বিশ্বসিংহই তদীয় মহাপীঠের আবিষ্কারক হইবার যোগ্যপাত্র মনে করিয়া, করুণা করিয়া স্বয়ং এই জরতীবেশে আপন পীঠের প্রকটনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

বুরঞ্জিতে সমস্ত পণ্ডিত আহ্বানের বিষয় উল্লেখ আছে। এই পণ্ডিতমণ্ডলীতে কি পূর্ণানন্দ ছিলেন? ইহাও অসম্ভব। মহারাজ বিশ্বসিংহ ১৪৫০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগামী হন। ইহা বুরঞ্জিলেখক গুণাভিরাম বাহাদুরের মত। কেহ কেহ এই ঘটনা ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে হয় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * তর্কের

* এই বিষয়ের বিচার-বিতর্ক Mr. Gait's Koch Kings of Kamarupa

খাতিরে বিশ্বসিংহের মৃত্যুর তারিখ ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দই ধরিয়া নিলাম। তাঁহার রাজত্বকাল ২৫ বৎসর বলিয়া কথিত আছে। তাহা হইলে ১৫৩৪ খৃঃ মৃত্যুর তারিখ ধরিলে সিংহাসনাধিরোহণ কাল ১৫০৯ খৃঃ হয়। বুরঞ্জির উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে রাজার নীলাচল গমন ব্যাপার হইতে পণ্ডিতআহ্বান করিয়া পীঠস্থান নিরূপণ পর্য্যন্ত ঘটনাগুলি তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশেই হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক ঐ পণ্ডিতআহ্বান কার্য্য তদীয় রাজত্বকালের মাঝামাঝি সময়ে হইয়াছিল ধরিলেও উহার তারিখ ১৫২০ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিলে বোধ করি কোনও রূপ অসঙ্গতি হইবে না।

তখন পূর্ণানন্দ কি করিতেছিলেন, দেখা যাউক। আরতির উল্লেখিত প্রবন্ধে দেখিতেছি যে শকাব্দা ১৪৪৮ সালের চৈত্র মাসে অর্থাৎ ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ণানন্দ জগদানন্দ শর্ম্মা রূপে বিষ্ণুপুরাণের এক প্রতিলিপি সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার তখন পাঠ্যাবস্থা মাত্র। তবে পূর্ণানন্দ কোন সালে কামাখ্যা আসিয়া ছিলেন, তাহার একটা আনুমানিক সময় নির্দ্ধারণ করা যাউক। পূর্ণানন্দ যখন বিষ্ণুপুরাণ নকল করেন (১৫২৭) তাহার কিছুকাল পরে কালীবিদ্যা বিষয়ে সাধনা আরম্ভ করেন; তৎপর তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বীয় গুরু ব্রহ্মানন্দের উত্তরসাধকতা করেন। ব্রহ্মানন্দ সাধনাবস্থায় শবসহ অন্তর্হিত

নামক প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে। Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, Part I, No. 4, 1893.

হইয়া মণিপুরে গিয়া এক চণ্ডাল রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। পূর্ণানন্দ সুদীর্ঘকাল দেশে দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক অনুসন্ধানের পর তাহাকে মণিপুরে তদবস্থায় প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাঁহাকে প্রতিবোধিত করিয়া গুরুশিষ্যে মিলিয়া কামাখ্যা পীঠে আসিয়া ইহার উদ্ধার সাধন করেন। উপরি উল্লেখিত প্রবন্ধে পূর্ণানন্দের উক্তরূপ কাহিনী দেওয়া হইয়াছে কিন্তু কোন্ সালে কি করিয়াছেন এইরূপ কোনও সময় নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সিদ্ধাবস্থায় পূর্ণানন্দ যে সকল গ্রন্থ লিখেন তাহাদের ধারাবাহিক উল্লেখ কালে প্রবন্ধ লেখক মহাশয় "শাক্তক্রমে"র নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন। উহার প্রণয়নের তারিখ ১৪৯৩ (কালাঙ্ক বেদেন্দু) শকাব্দা বা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দ। উহা অবশ্যই পূর্ণানন্দ গুরুর অন্বেষণ ব্যাপারাদি সমাপন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কামাখ্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরেই এই গ্রন্থ রচিত হয়, ইহা মনে করা অসঙ্গত নয়। সুতরাং এই প্রথম গ্রন্থ রচনার ৫ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ কামাখ্যা পীঠে আসিয়াছিলেন বলিলে অন্যায় হয় না। তাহা হইলে উহা ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা, অর্থাৎ যখন তিনি জগদানন্দরূপে বিষ্ণুপুরাণ নকল করেন, তাহার প্রায় ৪০ বৎসর পরের ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। এই ৪০ বৎসর সময় এতগুলি কঠিন ও কালসাপেক্ষ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল মনে করা বোধ করি অন্যায় হইবে না। যাহা হউক, ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে যদি পূর্ণানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ কামাখ্যা ধামে

আসিয়া থাকেন তবে তাঁহারা কি দেখিয়া গিয়াছিলেন? রাজা বিশ্বসিংহ যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। তখন বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ কামরূপ প্রদেশের সিংহাসনাধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভগ্নমন্দিরের পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কার কার্য্য আরব্ধ হইয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৮৭ শকাব্দে) এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। অদ্যাপি নরনারায়ণের কীর্ত্তিখ্যাপক একটী প্রস্তর-ফলক কামাখ্যা মন্দিরের দ্বারদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে মহারাজের ও তদীয় ভ্রাতা সেনাপতি শুক্লধ্বজের মূর্ত্তিযুগলও তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনীর সাক্ষ্যদান করিতেছে। ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ, এই নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাও বোধ হয় দেখিয়া গিয়াছিলেন।

তবে, এই আবিষ্কারের কথাটা রটিত হইল কেন? ইহার উত্তর এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই অনুমানতঃ প্রদত্ত হইয়াছে—কামাখ্যা মহাপীঠে সাধন ভজন পূর্ব্বক ইহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে বঙ্গীয় সমাজে ঘোষণা সগুরু পূর্ণানন্দ কর্ত্তৃকই হইয়াছিল; তজ্জন্যই বোধ হয় এই প্রবাদ। ইহার একটি নজিরও আছে। এখন সকলেই জানেন কলম্বস্ সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা খণ্ডের আবিষ্কার করেন। কিন্তু তথাপি আমেরিগো বেস্‌পুসি নামক অপর এক ব্যক্তির নামেই সেই মহাদেশের নামকরণ হইয়া গেল, অথচ এই ব্যক্তি কলম্বসের সাত বৎসর পরে আমেরিকার দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইবার কারণ এই ছিল

যে তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ড সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ রচনা করিয়া ইহার বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছিলেন।

কোচবিহারাধিপতিগণের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে প্রথমাবস্থায় কামাখ্যার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ হইলেও ইদানীন্তন তাঁহাদের সঙ্গে দেবীর বড় একটা সম্পর্ক দেখা যায় না। এমন কি মহাপীঠে আসিয়া সেই বংশের কেহ দর্শনস্পর্শন কি পূজাদিও করিতে পারেন না। এই সম্বন্ধে যেরূপ প্রবাদ আছে, গুণাভিরামকৃত আসামবুরঞ্জি * হইতে অনুবাদক্রমে তাহা উল্লেখিত হইল।

"কামাখ্যার পূজা চালাইবার জন্য এই রাজা (নরনারায়ণ) নিজ দেশ কোচবিহার হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া স্থাপিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেন্দুকলাই নামে পূজারি ব্রাহ্মণের কথা সকলেই জানেন। নীলাচলের পূর্ব্বদ্বারমুখে কেন্দুকলাই ঠাকুরের মস্তকহীন মূর্ত্তি আজিও বর্ত্তমান আছে। এখনও নীলাচলে যে কয় ঘর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের অনেকেই এই ঠাকুরের বংশধর। এমন একটি কথা প্রচারিত হইয়া আছে যে কেন্দুকলাই ঠাকুর যখন সন্ধ্যাকালে দেবীর পূজা করিয়া ঘণ্টা বাজাইতেন তখন দেবী আসিয়া নৃত্য করিতেন। নরনারায়ণ রাজা এই কথা জানিয়া দেবীকে চেতনাবতী দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ঠাকুরকে বলিলে, ঠাকুর রাজাকে এই উপদেশ দিলেন যে সন্ধ্যা আরতির সময় যখন তাঁহার ঘণ্টার শব্দ শুনা যাইবে তখন

* ৬২—৬৩ পৃষ্ঠা (৪র্থ সংস্করণ)

রাজা নাটমন্দিরের গবাক্ষদ্বারের ছিদ্রদিয়া তাকাইলে দেবীর দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। একদিন কথিত সময়ে সেই ঘণ্টাবাদ্য হওয়ায় রাজা ঐ ছিদ্রদিয়া মন্দিরের ভিতর দৃষ্টিপাত করাতে রাজার চক্ষুতে দেবীর চক্ষু পড়িল। দেবী তাহাতে লজ্জা পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কেন্দুকলাই ঠাকুরের মস্তক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং রাজাকে এই অভিশাপ দিলেন যে তিনি কিম্বা তাঁহার বংশের কোন লোক দেবী দর্শন করা দূরে থাকুক, নীলাচলপর্ব্বতের দিকে তাকাইতেও পারিবে না, চাহিলে মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন হইতে দেবী পূজার সময় প্রকটিত হওয়া ছাড়িলেন এবং শিববংশী কোচবিহার, বিজনী, দরঙ্গ বেলতলা প্রভৃতির রাজারা কি তাঁহাদের পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি নীলাচলের দিকে পার্য্যমাণ দৃষ্টিপাত করেন না।" *

এই অবস্থায় কোচবিহারাধীশ্বর ভূপ বাহাদুরগণ যে কামাখ্যা মাতার সেবাপূজা বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন

---

* রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি গল্পটি লিখিয়া তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা যে ভাবে করিয়াছেন, উহা পাঠকের কৌতুকাবহ হইবে বলিয়া তাহারও অনুবাদ দেওয়া হইল :—

"ইহা যে মোটেই প্রত্যয়ের অযোগ্য ইহা কে না বলিবে? রাজাকে দেবী দেখাইতে না পারিয়া কেন্দুকলাই ঠাকুর লজ্জা পাইয়া অকস্মাৎ পড়িয়া গেলেন; এবং অপস্মার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া থাকাতে রাজা ঠাকুরকে দেখিতে গেলে ঠাকুর অনেকক্ষণে চৈতন্য লাভ করিয়া, দেবীদর্শনের এই ফল বলিয়া রাজাকে দেবীদর্শন করিতে নিষেধ করিলেন। সেই হইতে রাজা ও রাজার পরিবারস্থ লোকে ঐরূপ বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া নীলাচলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, ছত্রদ্বারা আড়াল করিয়া যান।" কি চমৎকার ব্যাখ্যা!!

ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষতঃ কালক্রমে কামাখ্যাধাম তাঁহাদের রাজ্যের সীমার বহির্ভূত হইয়া পড়িল। আসামের অধিপতি আহোম জাতীয় ইন্দ্রবংশীয় স্বর্গদেবগণ কর্ত্তৃক এই স্থান অধিকৃত হইল। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্গদেব গদাধরসিংহ, রুদ্রসিংহ ও শিবসিংহের সময়ে রাজপরিবারে শাক্তধর্ম্মের প্রতি সবিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। কথিত আছে গদাধরসিংহ রাজা হইবার পূর্ব্বে তাৎকালিক আহোমরাজ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার ভয়ে যখন ছদ্মবেশে অরণ্যে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন একদা রাজসৈন্যদ্বারা অনুদ্রুত হইয়া আর্ত্তস্বরে "মা আমায় রক্ষা কর" বলিয়া আহ্বান করাতে সন্নিকটস্থ একটা প্রকাণ্ড শিলা হঠাৎ ফাটিয়া যায়, এবং তিনি উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সে যাত্রা প্রাণ রক্ষা করেন। আরও প্রবাদ আছে যে একদিন আহোম রাজার চরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গদাধর সিংহ যখন ধৃতপ্রায় হন, তখন পার্শ্বস্থ বৃক্ষ হইতে সহসা একটি শ্যামাঙ্গী স্ত্রীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া ঐ বৃক্ষের একটা শাখা নোয়াইয়া ধরেন এবং গদাধরকে তদবলম্বনে বৃক্ষের উপর তুলিয়া স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় গদাধরসিংহ সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া শাক্ত ধর্ম্মের প্রতি যে বিশেষ ভাবে অনুরাগী হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনিই আহোম রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেবালয় নির্ম্মাণে এবং দেবত্র ব্রহ্মত্র প্রদানে মুক্তহস্ত হন। উমানন্দের মন্দির ইঁহারই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই স্বর্গদেবের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পুত্র রুদ্রসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন রাজা আহোম বংশে অল্পই দেখা গিয়াছে।* রুদ্রসিংহ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নদীয়া-শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌম নামক একজন সাধক মহাপুরুষকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। কথিত আছে জলে নামিয়া স্নান আহ্নিক করিবার সময়ে এক শিঙ্গীমাছ কাঁটা ফুটাইয়া তাঁহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত করাতে ব্রাহ্মণের মন্যুপ্রভাবে জলাশয়স্থ সমস্ত শিঙ্গী মরিয়া ভাসিয়া উঠে; তদবধি উহাকে লোকে "শিঙ্গীমারা ভট্টাচার্য্য" বলিত। যাহা হউক দৈবগতিকে রুদ্রসিংহের কৃষ্ণরাম হইতে দীক্ষা-গ্রহণ ঘটিয়া উঠে নাই, তিনি তৎপূর্ব্বেই স্বর্গগামী হইয়াছিলেন। রুদ্রসিংহও অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ এবং দেবত্র ব্রহ্মত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তৎপুত্র শিবসিংহ সিংহাসনস্থ হইয়াই কৃষ্ণরাম হইতে দীক্ষা-গ্রহণ করেন। এই স্বর্গদেব ধর্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন; এমনও প্রবাদ আছে যে তিনি ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার

* ইঁহার পিতা গদাধর সিংহ যেমন দেবীর অনুগৃহীত ছিলেন, ইঁহার জননী জয়মতী তেমনি দেবীস্বরূপা ছিলেন। যখন স্বামী গদাধর ছদ্মবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন আহোমরাজ জয়মতীর নিকট হইতে গদাধর কোথায় আছেন এই সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। সাধ্বী জয়মতী স্বামীর খবর জানিয়াও তাহা প্রকাশ করেন নাই, মাসার্দ্ধকাল ব্যাপী ভীষণ অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিতে করিতে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রুদ্রসিংহ পুণ্যশ্লোকা মাতৃদেবীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ শিবসাগরে "জয়সাগর" নামে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন।
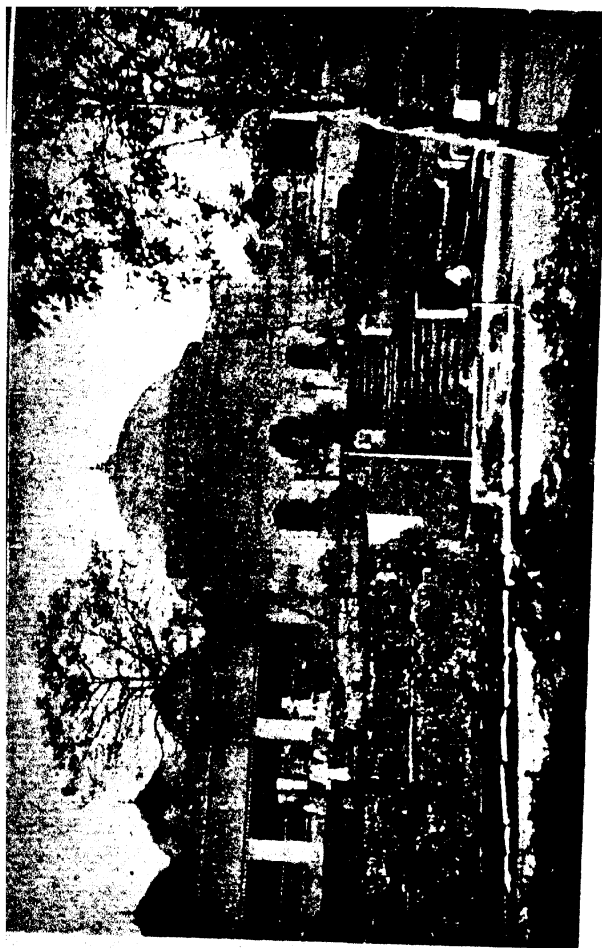
লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি গুরুদেব কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌমকে প্রভূত ব্রহ্মত্রবৃত্তি দিয়া নীলাচলে স্থাপিত করেন। কৃষ্ণরামের পর্ব্বতে অধিষ্ঠান হেতু তিনি এবং তদীয় বংশধরগণ "পর্ব্বতীয়া গোসাই" নামে খ্যাতি লাভ করেন। কামাখ্যাতে এবং কামরূপস্থ অন্যান্য দেবালয়ে অদ্য পর্য্যন্ত যেরূপ পূজাবিধি প্রচলিত আছে, এই কৃষ্ণরাম কর্ত্তৃকই তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এবং স্বকীয় স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া স্বর্গদেব শিবসিংহ কামরূপ প্রদেশের বহুস্থানে দেবালয় নির্ম্মাণ এবং দেবত্র ব্রহ্মত্র বৃত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়া ও চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত আসামে যত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশেই এই ধার্ম্মিক মহারাজের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

ইঁহারা ব্যতীতও অন্যান্য আহোমরাজ কামরূপস্থিত দেবতা এবং ব্রাহ্মণের সংরক্ষণ ও পরিপোষণ নিমিত্ত অল্প-বিস্তর বিত্ত-বিষয় সম্প্রদান করিয়া গিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাঁহাদের উল্লেখ করা হইল না। ফল কথা কামাখ্যা মহাপীঠ কোচবিহারাধিপতিগণের দ্বারা প্রথমতঃ আবিষ্কৃত এবং সেবিত হইলেও, অবশেষে ইঁহারা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে আহোমবংশীয় রাজগণই ক্রমশঃ এই পীঠের সেবা-পূজার ভার গ্রহণ করেন এবং বর্ত্তমানে কামাখ্যা মহা-পীঠে, অথবা দেবতাক্ষেত্র কামরূপের নানাস্থানে সংস্থিত অন্যান্য দেবালয়ে সেবাপূজার যে বন্দোবস্ত বা বিধিবিধান দেখা যায়, তাহাও এই আহোমবংশীয় স্বর্গদেবগণ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আরতি, বৈশাখ ১৩১৪

ফকির শাহ জলাল।

(১) সময় নিরূপণ

কি হিন্দু কি মোসলমান কি অপর ধর্ম্মাবলম্বী যে কোনও ব্যক্তিই শ্রীহট্টে নূতনকল্পে আসুন না কেন, তাঁহাকে একবার শাহ জলালের দরগায় যাইতে হয়। মোসলমান যান, সুপ্রসিদ্ধ ফকির শাহ জলালের পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে জিয়ারত করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত। হিন্দু যান, শ্রীহট্টের প্রাচীনতম ও প্রসিদ্ধতম মস্‌জিদ্ * নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত; বিশেষতঃ যে কোনও ধর্ম্মেরই আরাধ্য দেবতার অথবা সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া হিন্দুর রীতি; মহাত্মা শাহ জলালের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তও সুতরাং অনেকে গিয়া থাকেন। ইংরেজ প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ এই মস্‌জিদ দেখিবার জন্য এবং দরগা ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সুরম্য প্রাকৃতিক দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য গিয়া থাকেন। যখন ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রবর্ত্তন, তখন যাঁহারা এই জিলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিতেন তাঁহা-দিগকে এই দরগায় গিয়া অভিষিক্ত হইতে হইত। ১৭৭৬

* "The principal mosque in the district is that known as Shah Jalal's Darga in the Sylhet town." Hunter's Statistical Accounts of Assam vol. ii., page 283.

সালে মিঃ লিণ্ডসে নামক একজন সাহেব শ্রীহট্টে রেসিডেণ্ট (কালেক্টর) হইয়া আইসেন; তিনি স্বীয় অভিষেক ব্যাপার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

I was now told that it was cutomary for the new resident to pay his respects to the tutelar saint Shah Jalal. Pilgrims of the Islam faith flock to this shrine from every part of India and I afterwards found that the fanatics attending the tomb were not a little dangerous. It was not my business to combat religious prejudices and I therefore went in state as others had done before me. I left my shoes on the thresh-hold and deposited on the tomb 5 gold mohars as an offering. Being thus purified I returned to my dwelling place and received the homage of my subjects.

কথিত আছে যে সমাধিক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে সাহেবেরা দরগার পুষ্করিণীতে নিয়ম মত স্নান করিয়া যাইতেন।

শাহ জলালের দরগার চিত্রময় প্রতিরূপ পাঠকবর্গের গোচরীভূত করা হইল।* কিন্তু সেইস্থানে না গেলে উহার

* মস্জিদের উত্তর দিকে যে বৃক্ষরাজি দেখা যায় ইহারই অন্তরালে মহাত্মা শাহ জলালের ইষ্টকময় কবর বর্ত্তমান। চারিটি স্তম্ভে সংবদ্ধ এক চন্দ্রাতপ মাত্র দ্বারা এই কবর আচ্ছাদিত। উন্মুক্ত আকাশের আবরক এখানে আর কিছুই নাই।

চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কখনই অনুভূত হইতে পারে না। শ্রীহট্টভূমি প্রকৃতিদেবীর লীলানিকেতন বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ তন্মধ্যে যে স্থানে এই দরগা অবস্থিত সেই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয় সুতরাং অবর্ণনীয়। নিতান্ত চিন্তাভারে প্রপীড়িত কিম্বা দুঃখযন্ত্রণায় অবসন্ন হৃদয় লইয়াও যদি ঐ পরম রমণীয় স্থানে গমন করা যায়, তবে স্থানমাহাত্ম্যেই যেন ক্ষণকালের নিমিত্ত হৃদয় হইতে সমস্ত ভার অপসৃত হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে শান্তিরস আসিয়া মনঃপ্রাণ অধিকার করে।

ফকির শাহ জলাল দ্বারা শ্রীহট্টভূমি গৌরবান্বিত হইয়াছে। মোসলমানগণ মহাপুরুষদিগের সমাধিক্ষেত্রে আসিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদের মদিনাস্থিত পবিত্র সমাধিস্থল অবশ্যই সর্ব্বোপরি বরণীয়। তৎপর বাগ্দাদ নগরীস্থ বড় পীর শাহ আব্দুল কাদের জিলানীর সমাধি ভূমি, আজমীরের খাজেমৈন উদ্দীন চিষ্তির কবর স্থান এবং শ্রীহট্টস্থ ফকির শাহ জলাল মজঃরদের † সমাধিক্ষেত্র পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র মোসলমান সমাজের নিকট শ্রীহট্ট তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ‡

† তাৎকালিক মোসলমান জগতে অনেক শাহ জলাল ছিলেন তন্মধ্যে এই মহাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য শাহ জলাল হইতে বিশিষ্ট করিবার জন্য ইহাকে "মজঃরদ" অর্থাৎ চিরকুমার উপাধি দেওয়া হয়। এই মহাপুরুষ জীবনে কখনও নারীমুখ সন্দর্শন করেন নাই।

‡ দিল্লীর শেষ সম্রাট মোহাম্মদ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ ফকির শাহ জলালের সমাধিস্থান দর্শনার্থ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন।

ঈদৃশ মহাত্মার পবিত্র কাহিনী জানিতে কাহার না অভিলাষ হয়? এ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত কিরূপ আলোচনা হইয়াছে সর্ব্বাগ্রে তাহাই বলা যাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন *:—

"The prince (Raja Gaur Gobinda *alias* Gobinda Sinha) was overthrown by Shah Jalal *alias* Jalaluddin Khany, who following the footsteps of his predecessor Maluk Yazbeg led his army to the eastern parts of Bengal, invaded Sylhet in 1257 A. D., and brought some of the petty independent Rajas under his control. His success however was short-lived, for he was suddenly called back to defend Gaur from the invasion of Irsilan Khan and soon after killed in battle."

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতি সর্ব্বসাধারণের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি আছে জানি। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠ

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for August, 1880.

[আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল দক্ষিণ শ্রীহট্টে ভাটেরা নামক স্থানে দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। উহা বঙ্গদেশীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহার পাঠ উদ্ধার করেন। একটি শাসনে "গোবিন্দ" এই নাম দেখিয়া ডাঃ

করিলে তদীয় গবেষণার গভীরতা বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ আসে এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের হ্রাসতা জন্মে। তিনি শুনিয়াছিলেন শাহ জলাল শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাভূত করেন। এখন এই শাহ জলাল কে, তাহা বাহির করিতে হইবে। একটা রাজাকে যখন পরাস্ত করিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই একজন বীরপুরুষ হইবেন। বঙ্গীয় ইতিহাসের পত্রোদ্ঘাটন করিয়া "জালাল উদ্দিন খানি" নামক এক দিগ্বিজয়ীর বৃত্তান্ত দেখা গেল। যখন শাহ জলালেও "জলাল" আছে এবং জালাল উদ্দীনেও "জলাল" আছে তখন দুই এক না হইয়া যায় না। অতএব স্থির হইল ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে শাহ জলাল ওরফে জলাল উদ্দীন খানি শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়া কতিপয় ক্ষুদ্র স্বাধীন ভূমিপতিকে পরাভূত করেন কিন্তু হঠাৎ ইরসিলান খাঁর আক্রমণ হইতে গৌড় ভূমি রক্ষা করিতে গিয়া সেখানেই যুদ্ধে নিহত হন।

ডাক্তার মিত্র যদি অনুগ্রহ করিয়া তাম্রশাসন প্রেরয়িতা শ্রীহট্টের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত লটমেন জনসন সাহেবকেই শাহ জলাল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বিজ্ঞাপনের জন্য লিখিতেন তবে জানিতে পারিতেন যে, শাহ জলাল শান্ত দান্ত ফকির ছিলেন, নরশোণিতপিপাসু কোনও দুর্দ্দান্ত বীরপুরুষ ছিলেন না এবং তাঁহার সমাধিক্ষেত্র শ্রীহট্ট সহরেই বিরাজমান; অতএব গৌড় ভূমিতে গিয়া যুদ্ধে নিহত হইবার কথা তৎসম্বন্ধে

মিত্র উহাকেই শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দ বলিয়া মনে করেন এবং তদুপলক্ষে এতদ্ভূত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।]

অসম্ভাবিত। তিনি তদীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শাহ জলালের যে তারিখ (১২৫৭ খৃঃ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সুতরাং অশ্রদ্ধেয়।*

ডাক্তার W. W. Hunter সঙ্কলিত Statistical Accounts of Assam Vol. ii গ্রন্থে, History and Statistics of the Dacca Division—Sylhet section, ২৯১ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিনিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"Sylhet appears to have been conquered by a small band of Mohammadans in the reign of the Bengal king Shamsuddin (1384 A. D.). The supernatural powers of the last Hindu king Gaur Govinda proved ineffectual against the

* ভাটেরার তাম্রশাসনের উপর টিপ্পনী করিতে গিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে কেবল এই ভুল টুকুই করিয়াছেন তাহা নহে। তাম্রশাসনে গোবিন্দকেশব এই নামধারী নরপতির উল্লেখ দেখিয়া উঁহাকেই শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দ ওরফে গোবিন্দ সিংহ কল্পনা করিয়াছেন। গৌড় গোবিন্দ (বা গৌর গোবিন্দ বা গুরুগোবিন্দ বা গরুড় গোবিন্দ) যে কে ছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মধ্য ভারতের ভোজ বা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় একাধিক রাজার এই নাম ছিল কি না তাহাও এক সমস্যার বিষয়। যাহা হউক এই বিষয়ে সম্প্রতি বাগ্‌বিতণ্ডা অনাবশ্যক। ডাঃ মিত্র তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমি পরিমাণে 'হল' শব্দের ব্যবহার দেখিয়া ইহা কি তাহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত সুবহু পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ পংক্তিনিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া কোনও মীমাংসায় পৌঁছিতে পারেন নাই। অথচ শ্রীহট্টের যে কোনও নগণ্য হালিককে জিজ্ঞাসা করিলেও হালের পরিমাণ কত তাহা বলিয়া দিতে পারিত।

[এক হাল—৬৫৮৫৬ বর্গহস্ত]

still more extraordinary powers of the Fakir Shah Jalal who was the real leader of the invaders although he subsequently made over the active management of the secular affairs to the nominal leader Sikandar Ghazi."

সংক্ষেপে এই স্থানে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা শাহ জলালের ইতিহাসের সঙ্গে মিলে। তবে তারিখ (১৩৮৪ খৃঃ) যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয় পশ্চাৎ আলোচিত হইবে।

মহাত্মা শাহ জলালের দরগার তত্ত্বাবধান নিমিত্ত বহুকাল হইতেই খাদিম নিযুক্ত আছেন।* তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শাহ জলালের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। নসির উদ্দিন হায়দার নামক জনৈক মোনসেফ শ্রীহট্টে আসিয়া সাধু শাহ জলালের পরম ভক্ত হন এবং পূর্ব্বতন বিবরণীর সহায়তায় "সুহেলি এমন" † নাম দিয়া পারস্য ভাষায় এই মহা পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যান। এই গ্রন্থের অনুবাদ স্বরূপ "তোয়ারিখে জলালি" নামধেয় একখানি মোসলমানী কেতাব আছে। কিন্তু উভয় গ্রন্থই শিক্ষিত

* খাদিমগণের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহার উপাধি সরকুম। তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৯৩৶৩ বৃত্তি পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সরকুম মৌলবী আবুল হাফেজ সাহেব একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার নিকট হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ বিষয়ে অনেক সহায়তা পাওয়া গিয়াছে।

† শাহ জলালের জন্মভূমি আরবের (Yemen) এমন প্রদেশ ; সুহেলি এমন অর্থ এমনের নক্ষত্র।

সাধারণের নিকট অপরিচিত নতুবা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এইরূপ প্রকাণ্ড ভ্রম ঘটিত না এবং ষ্টেটিষ্টিকেল একাউণ্টেও শাহ জলাল বিষয়ে এইরূপ অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র থাকিত না। তাই সুহেলি এমন অবলম্বনে ফকির শাহ জলাল সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিবার নিমিত্ত সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কিন্তু সুহেলি এমনে শাহ জলালের শ্রীহট্ট আগমনের তারিখ হিজরীর ৫৬১ সন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ৫৬১ হিজরীতে খৃষ্টাব্দ ১১৬৫ হয়। এই তারিখ বিখ্যাত স্থানেশ্বরের যুদ্ধের প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। তখনও দিল্লী মোসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় নাই এবং সুদূর বঙ্গে মোসলমানের নামও শ্রুত হয় নাই। এতদবস্থায় ঐ তারিখ নিতান্তই অশুদ্ধ। সুহেলি এমনে এমন ভ্রম প্রমাদ আরও যে না আছে সে কথা বলিতে পারি না। তবে শাহ জলালের শ্রীহট্টে আগমনের তারিখ কিরূপে নির্ণীত হইবে ?

সুহেলি এমনের মতে যখন শাহ জলাল স্বীয় জন্মভূমি হইতে দিল্লীতে আইসেন তখন দিল্লীর সিংহাসনে আলাউদ্দীন অবস্থিত ছিলেন এবং দিল্লীতে ফকির নেজাম উদ্দীন নামে এক আউলিয়া বাস করিতেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল ১২৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। নেজাম উদ্দীনের শিষ্য প্রসিদ্ধ পারস্যকবি আমীর খসরু তাঁহার গুরুর উপদেশমালা সঙ্কলন কালে লিখিয়াছেন যে নেজাম উদ্দীন ৭২৫ হিজরীতে অর্থাৎ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহাদ্বারা শাহ জলালের

ভারতবর্ষে তথা শ্রীহট্টে আগমন সময় খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম কি দ্বিতীয় দশাব্দী (Decade) হইবে বলিয়া নির্দ্দেশিত করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ সঙ্কলিত রাজমালায় আছে ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ মুর ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা পীর শাহ জলালকে শ্রীহট্টে দর্শন করেন। ইহাতে বোধ হয় মহাত্মা শাহ জলাল বহুকাল, অন্যূন ৪০ বৎসর, শ্রীহট্টে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সুহেলি এমনে আছে যে শাহ জলাল ৬২ বৎসর বয়সে, শ্রীহট্টে আসিবার ৩০ বৎসর পরে, ৫৯১ হিজরীতে জেকাদার চাঁদের ২০শে তারিখ, দেহত্যাগ করেন। বড়ই দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় যে সুহেলি এমনের লিখিত এই সন তারিখ বয়ঃক্রম, অবস্থান কাল সমস্তই অবিশ্বাস করিতে হইল। যদি শাহ জলাল আলাউদ্দীনের মৃত্যুর বৎসরেও (১৩১৬ খৃঃ অব্দে) শ্রীহট্টে পৌঁছিয়া থাকেন তথাপি ৩০ বৎসরে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দ মাত্র হয়। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক ইবনে বতুতার সঙ্গে শ্রীহট্টে সাক্ষাৎ-কার সুতরাং অসম্ভব ব্যাপার অথচ ঐ পর্য্যটক অনৃত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন একথা বলাও গর্হিত। অতএব কাল নির্ণয় বিষয়ে সুহেলি এমনের কথা সর্ব্বতোভাবেই বর্জ্জনীয়।

মহামতি হাণ্টার সাহেবের উদ্ধৃত ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দের বিরুদ্ধে ইবনে বতুতাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হাণ্টার সাহেবের উদ্ধৃতাংশে বঙ্গীয় নরপতি শামসুউদ্দীনের যে উল্লেখ আছে তাহার কারণ বোধ হয় এই যে শাহ জলালের বিবরণের সঙ্গে জনৈক শামস-

উদ্দীনের নাম শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু মোসলমান রাজত্বের প্রথমাংশে বঙ্গের সিংহাসনে শামসউদ্দীন নামক একাধিক ব্যক্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৪৩-১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে যিনি বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন তাঁহার নাম সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস্ খাজে ছিল। ১৩৮৩-৮৫ খৃষ্টাব্দে যিনি বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন তিনিও শামস্উদ্দীন নামে অভিহিত ছিলেন। অপিচ শাহ জলালের কবরের গণ্ডীর ভিতরে যাইবার পথে তোরণ দ্বারের উপরিভাগে যে এক শিলাখণ্ড আছে তাহাতে উৎকীর্ণ লিপিমালায় অপর এক বঙ্গাধিপ সোলতান শামস্উদ্দীন ইউসুফ্ শাহের নাম আছে;* উঁহার রাজত্ব কাল ১৪৭৪-১৪৮১ খৃষ্টাব্দ। হাণ্টার সাহেব ধৃত বিবরণীতে দ্বিতীয় শামস্উদ্দীনকেই ফকির শাহ জলালের সমসাময়িক বলা হইয়াছে এবং ১৩৮৪ খৃঃ এই তারিখও ঐ ধারণা বশতঃই নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমোক্ত শামস্ উদ্দীন (ইলিয়াসখাজে) শাহ জলালের শ্রীহট্টে আগমনের

* In Darga of Shah Jalal at Sylhet an ancient basalt stone bearing an inscription of the Bengal Sultan Shamsuddin Yusuf Shah (1474—1481 A. D.) is at present used as a lintel over the small door leading to the enclosure where the saint lies buried. As both the beginning and the end of the inscription are hidden under the masonry of the wall it has been impossible to read the whole inscription. The inscription is of some interest as it proves that Sylhet was a part of the independent Muhammadan Kingdom of Bengal in the last quarter of the 15th century. (Extracts from letter No. 63 dated the 27th July 1903 from Dr. T. Bloch Archæological Surveyor, Bengal Circle, to the Secretary to the Chief Commissioner of Assam.)

না হউক অবস্থানের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইলেই কোন গোল ঘটে না—ইবনে বতুতার সঙ্গেও মিল হয়। শেষোক্ত শামসউদ্দীন (ইউসুফ শাহ) ফকির শাহ জলালের প্রতি ভক্তি-মান্ ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সমকালীন ছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ফল কথা শাহ জলাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশে শ্রীহট্টে আগমন করেন এবং এখানে উক্ত শতাব্দীর অন্ততঃ ৬ষ্ঠ দশাব্দী পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে এই মহাত্মার অলৌকিক জীবনকাহিনী আলোচিত হইবে।

[প্রদীপ—কার্ত্তিক ১৩১১।

ফকির শাহজলাল।

(২) জীবনকাহিনী।

| জন্মস্থান |—পুণ্যভূমি আরবের হেজাজ পবিত্রতম স্থান। ঐ স্থানে গিয়া মক্কা মদিনা প্রভৃতি মহাপুরুষ মোহাম্মদের লীলা ভূমি সন্দর্শনপূর্ব্বক হজব্রত উদযাপন করিয়া 'হাজি' নামে পরিচিত হইতে ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমান মাত্রেরই প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সেই হেজাজক্ষেত্রের সংলগ্ন ভূভাগই এমন এবং উহাই ফকির শাহ জলালের জন্মভূমি।

| জন্মসময় |—পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাহজলাল জন্ম পরিগ্রহ করেন।

[পিতামাতা |—হজরত মোহাম্মদ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন সেই কুরেষি বংশীয় এব্রাহিমের পুত্র মাহমুদ শাহ জলালের জনক ছিলেন। জননী সৈয়দ বংশীয়া ও সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। শাহ জলালের ৩ মাস বয়ঃক্রম কালে মাতা স্বর্গগামিনী হন, পিতা মাহমুদও কাফেরের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে গিয়া অচিরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

[ধর্ম্ম গুরু]—এই অনাথ শিশুর প্রতিপালন ভার তদীয় মাতুল * সৈয়দ আহমদ কবীর নামক মহাত্মা গ্রহণ করিলেন।

---

* একখানি হস্তলিখিত পুস্তকের মত অনুসরণ পূর্ব্বক প্রদীপের প্রবন্ধে "মাতৃষস্বপতি" লিখা হইয়াছিল।

তিনিই আবার শাহজলালের বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গুরুতর ভার গ্রহণকরিয়া তদীয় দীক্ষাগুরুর পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। গুরু পরম্পরায় শাহজলাল মোসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ হইতে অষ্টাদশ স্থানীয় ছিলেন। *

---

* মোহাম্মদ
|
আলী
|
হাসন বসরী
|
হবীব আজমী
|
শেখ দায়ুদ তায়ী
|
শেখ মারুফ্ কয়খী
|
শেখ সরিসগতী
|
মমসাদ দিনুরী
|
শেখ মোহাম্মদ
|
শেখ আহমদ দিমুরী
|
সেখ ওজিউদ্দীন
|
আবু নসর জিয়াউদ্দীন
|
মোকদ্দম বাহাউদ্দীন
|
আবুল ফজল সদর উদ্দীন
|
রুকুন উদ্দীন আবুফতাহ্
|
সৈয়দ জলাল উদ্দীন বোখারী
|
সৈয়দ আহমদ কবীর
|
শাহ জলাল মজঃরদ

[মৃগকাহিনী]—পবিত্র মক্কাধাম সৈয়দ আহমদ কবীরের বাসস্থান বা সাধনা স্থান ছিল। শিষ্য ও ভাগিনেয় শাহ জলালও তৎসঙ্গেই অবস্থান করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতেছিলেন। একদা এক হরিণ সহসা সৈয়দের কুটীরদ্বারে আসিয়া তদীয় পদপ্রান্তে পতিত হইয়া আপন ভাষায় তাহার দুঃখ কাহিনী কহিতে লাগিল; তির্য্যগ্ ভাষাবিৎ মহাত্মা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। মৃগের অভিযোগ এই যে সে তৃণপর্ণাহারী নিরপরাধ জীব,—এক দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার সুখ, শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে, তাহার যন্ত্রণায় বনে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দয়াবান্ সাধুরা বনচর পশু পক্ষীর প্রতিও করুণা পরবশ। তাই পীর আহমদ শিষ্য শাহ জলালকে আদেশ করিলেন, "বৎস, সেই অত্যাচারী শার্দ্দূলকে যথোচিত শাস্তি প্রদানপূর্ব্বক বন হইতে তাড়াইয়া দিবে, এবং যাহাতে এই নিরীহ হরিণ স্বচ্ছন্দে আপন আবাসে তিষ্ঠিতে পারে তাহার বিধান করিয়া আসিবে।" গুরুর আদেশে শাহজলাল এই দুষ্কর কার্য্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু সাধু মহাত্মগণ যেমন স্বয়ং জীবহিংসাপরাঙ্মুখ, সেইরূপ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণও তাঁহাদিগকে কদাপি আক্রমণ করে না। শাহজলাল বনে গিয়া ব্যাঘ্রকে রিক্ত হস্তেই ধরিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরু আহমদ কবীর আপন আশ্রমে থাকিয়া প্রত্যক্ষবৎ সমস্ত গোচর করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল বাঘটাকে দুই হাতে চড় মারিতে মারিতে বন হইতে তাড়াইয়া দিলেই ভাল

হয়। গুরুর হৃদয়ের এই ভাব তৎক্ষণাৎ শিষ্যের অন্তরে প্রতিফলিত হইল, তিনি দুই হস্তে চপটাঘাত পূর্ব্বক ব্যাঘ্রকে দূর করিয়া দিয়া গুরুসমীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। *

[সিদ্ধিলাভ]—এই কার্য্যে গুরু তাঁহার প্রিয় শিষ্যের সিদ্ধির পরিমাণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক শাহজলালকে বলিলেন "বৎস, তোমার অদ্যকার কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া বিশ্বাস হইল যে তোমার ও আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা একই প্রকার হইয়া গিয়াছে। আর এই স্থানে তোমার থাকিয়া প্রয়োজন নাই, হিন্দুস্থানের দিকে প্রস্থান কর।" তৎপর স্বীয় সাধনার স্থান হইতে এক মুষ্টি মৃত্তিকা আনিয়া শাহজলালের হস্তে দিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে যে মৃত্তিকা দিলাম, তাহা অতি যত্নে রাখিবে— যেন ইহার বর্ণ গন্ধ বা স্বাদ বিকৃত না হয়। ঈদৃশ মৃত্তিকা যে স্থানে পাইবে, সেইখানেই সতত অবস্থান করিবে। এই মৃত্তিকামুষ্টি যে স্থানে পরিত্যাগ করিবে, সেই স্থানের মাহাত্ম্যের আর তুলনা থাকিবে না।" †

* এই সামান্য (বা অসামান্য) ঘটনা ফকির শাহ জলালের ভবিষ্যজ্জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনার পূর্ব্বাভাস মাত্র। দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র কবল হইতে শরণাপন্ন হরিণকে যিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই পরিশেষে শ্রীহট্টাধিপ গৌড়গোবিন্দ কর্ত্তৃক নিরীহ মোসলমানের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। বিনা অস্ত্রে তিনি যেমন হিংস্র ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া ছিলেন, তেমনি যুদ্ধোপকরণ ব্যতীতই প্রবল পরাক্রান্ত গৌড়গোবিন্দকে তিনি রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয় স্থলেই দৃষ্ট হইবে যে মহাত্মা শাহজলাল কাহারও প্রাণ হনন করেন নাই।

† শাহ জলালের জীবনী (সুহেলি এমন) লেখক নসির উদ্দীন হায়দর ঢাকা নিবাসী ছিলেন। পরিশেষে শ্রীহট্টের এই মাহাত্ম্য বিশ্বাস করিয়া এই সহরেই অবস্থান করেন।

[চাষণি পীর]—শাহজলাল পাথেয় স্বরূপ গুরুর নিকট হইতে এই মৃত্তিকা-প্রসাদ লইয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে প্রথমত: বার জন চেলা যুটিলেন, তন্মধ্যে এক জন সেই মৃত্তিকার তহবিলদার হইলেন। তাঁহার উপর এই ভার থাকিল যে তিনি পথিমধ্যে যত জনপদ দেখিতে পাইবেন সমস্তেরই মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া (চাখিয়া) দেখিবেন ; যদি কুত্রাপি বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদে এই মাটির সমকক্ষ মাটি মিলে তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা শাহজলালের নিকট জানাইতে হইবে। এই ব্যক্তির নাম হইল চাষণি পীর।

[জন্মস্থান সন্দর্শন]—পরিব্রাজকব্রতে দীক্ষিত হইয়া প্রথমতঃই শাহজলাল জন্মস্থান দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। আপন গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে তাঁহার তপঃসিদ্ধির কাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল, এমন কি এমন প্রদেশের বাদশাহের কর্ণেও তদীয় সুখ্যাতি পৌঁছিতে সমধিক বিলম্ব হইল না।

[পরীক্ষা]—বাদশাহ চতুর রাজনীতিক ছিলেন। ফকির শাহজলালের বৃত্তান্ত শ্রবণে তিনি তদীয় পাত্র মিত্রকে কহিলেন, "দেখ, বহুদিন হইতে আমার এই অভিলাষ যে কোন সিদ্ধ দরবেশ পাইলে তাঁহার মুরিদ (শিষ্য) হইয়া ভক্তিভরে তদীয় সেবা শুশ্রূষা করিব। তবে প্রথমতঃ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব তিনি ঠিক্ সাধু কি না নচেৎ তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ হইবে না।" সুতরাং শাহজলালকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত

বাদশাহ এক কৌশল করিলেন। শরবতের পাত্রে বিষ মিশাইয়া জনৈক ভৃত্য দ্বারা উহা শাহজলালের নিকট প্রেরণ করিলেন। বাদশাহের আদেশে ভৃত্য সাধুর নিকট শরবৎ রাখিয়া উহা পান করিতে বলিল। ফকিরের অন্তঃকরণ দর্পণের ন্যায় ছিল, উহাতে অন্যের ভাল মন্দ সমস্ত ভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত হইত। তিনি বাদশাহের কূট নীতি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ভাল মন্দ সমস্তই নিজের অদৃষ্ট ফলকে লিখিত; যে যাহা মনে করে সে সেইরূপই ফল পাইবে। ফকিরের জন্য ইহা অমৃত, কিন্তু দাতার পক্ষে এই শরবৎ প্রাণান্তকারী হলাহল।" এই বলিয়া তিনি শরবৎ পান করিলেন; এদিকে বাদশাহ হঠাৎ গতাসু হইলেন। এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটনায় তাঁহার কপট কৌশল কাহিনী প্রকটিত হইয়া পড়িল।

[এমনের প্রহ্লাদ]—বাদশাহের পুত্র শেখ আলী এই সমাচার অবগত হইয়া পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক শাহজলালের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া সতত সেবা শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শাহজলাল ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং রাজকুমারকে দেশে থাকিয়া দয়াবান্ ও ন্যায়পরায়ণ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

[রাজপুত্রের বৈরাগ্য]—শাহজলাল জন্মভূমি হইতে চির-বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুস্থান অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাজপুত্রের দেশে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল; রাজ্যধন-

প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার আসক্তি রহিল না ; নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতিও তিনি দৃষ্টি করিলেন না। সাধু শাহজলালের পবিত্র সঙ্গসুখ তাঁহার প্রবল বাসনার বিষয়ীভূত হইল। তিনি অমাত্য স্বজনের চক্ষু এড়াইয়া শাহজলালের অন্বেষণে উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং চতুর্দ্দশ দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। প্রবল অনুরাগের নিদর্শন পাইয়া শাহজলাল রাজকুমারকে আপনার প্রিয় সহচর ভাবে গ্রহণ করিলেন।

[ভারতবর্ষে আগমন]—শাহজলাল দলবলসহ দিল্লী নগরীতে আসিলেন। সেইখানে তখন নেজাম উদ্দীন নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ পীর থাকিতেন। তাঁহার নিকট তদীয় এক শিষ্য আসিয়া শাহজলালের বিষয়ে কহিল, "আরব হইতে এক দরবেশ আসিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র অতি অদ্ভুত। এই সাধু স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত। তিনি চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়া পথ চলেন। আবাস গৃহে তিনি একটি বালককে নিজের সাক্ষাতে রাখেন, এবং তাহাকে প্রাণাধিক প্রেমাস্পদের ন্যায় দেখিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর কোনও কর্ম্ম দেখা যায় না।" *

[নেজাম উদ্দীন ও শাহজলাল]—পীর নেজাম উদ্দীনের মনে একটু খট্‌কা বাঁধিল। তিনি শাহজলালকে তাঁহার নিকটে আসিতে আহ্বানকরণার্থ একজন শিষ্য প্রেরণ করিলেন। শিষ্য শাহজলাল সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি উহার মনের

* এই উক্তি দ্বারা শাহজলালের জীবনীর একটি রহস্যময় সূত্রচিত্র গোচরীভূত হইবে।

অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, এবং কিছু না বলিয়া একটা কৌটায় কিছু তূলা এবং আগুন রাখিয়া বন্ধ করিয়া শিষ্যের হাতে উহা নেজাম উদ্দীনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নেজাম উদ্দীন কৌটা খুলিয়া অগ্নি ও তূলা দেখিয়া শাহজলাল তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। বাস্তবিক তপস্বী নেজাম উদ্দীনের তূলাসদৃশ সাদা ও কোমল ধর্ম্মিষ্ঠ অন্তঃকরণে যে শাহজলালের প্রতি সন্দেহ বহ্নির স্থান পাইয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, যোগসিদ্ধ শাহজলালের উহা বুঝিতে পারা তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

[জলালী কবুতর]—নেজাম উদ্দীন নিজকে অপরাধী মনে করিয়া স্বয়ং শাহজলালকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। দেবালয়, রাজা ও সাধুর নিকট কেহ রিক্ত হস্তে যায় না। নেজাম উদ্দীনের দুই জোড়া কাজলা রংএর কবুতর ছিল, তাহাই নিয়া সাধু শাহজলালকে উপহার প্রদান করিলেন। বোধ হয় শাহজলালের এই কপোত চতুষ্টয়ই পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে জলালী কবুতরের প্রাদুর্ভাবের নিদান। পারাবত মাংস এই অঞ্চলে ভক্ষ্য হইলেও জলালী কবুতর কেহই হিংসা করে না।

[গৌড় গোবিন্দ]—তখন শ্রীহট্টে গৌড় গোবিন্দ নামে এক অত্যাচারী ভূস্বামী ছিলেন। তাহার জন্ম গৌড় দেশে (বাঙ্গালার মধ্যে) ছিল বলিয়া তাঁহার নাম গৌড় গোবিন্দ হইয়াছিল। †

† এই গোবিন্দ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইতেছে তাহা স্থহেলি এমনের মত। আমাদের স্বীয় ধারণা এই যে 'গৌড় গোবিন্দ' প্রকৃতপক্ষে 'গুরু গোবিন্দ' ছিলেন। তিনি

গঞ্জেরোয়া উপাধি বিশিষ্ট জনৈক শাহজলাল কর্ত্তৃক জন্মস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া গোবিন্দ পলাইয়া শ্রীহট্টে আসেন এবং এখানে প্রভুত্ব লাভ করেন। ইনি এক প্রসিদ্ধ যাদুকর ছিলেন, বহু ভূত প্রেত তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল। * মোসলমানগণ তাঁহার দ্বারা অত্যাচারিত হইত।

[বুরহান্ উদ্দীন]—শ্রীহট্ট সহরে টুলটেকর নামক মহল্লায় শেখ বুরহান উদ্দীন বাস করিত। তাহার সন্তানাদি বহুকাল না হওয়ায় সে মানস করে যে ছেলে হইলে খোদার নিকট একটি গরু কুরবাণি করিবে। যাহা হউক কালে তাহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বুরহান উদ্দীনও তাহার মানস আদায় করিল। দৈবাৎ এক চিল এক টুকরা গোমাংস নিয়া গৌড়গোবিন্দের বসতি স্থলে ফেলিয়া দিল। হিন্দু রাজা গোবিন্দের তাহা অসহ্য হইল; তৎক্ষণাৎ তিনি গোহত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতে হুকুম দিলেন। যে উদ্দেশ্যে ও যৎকর্ত্তৃক গোবধ হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিয়া তিনি বুরহান ও তাহার পুত্রটিকে ধরিয়া আনাই-লেন এবং পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া পিতার হস্তচ্ছেদন করিয়া

খাসিয়া বা সিণ্টেঙ্ জাতীয় লোক ছিলেন। শ্রীহট্ট সহর হইতে ৬।৭ মাইল ব্যবহিত স্থান হইতে পাতর সংজ্ঞক যে সকল ব্যক্তি সহরে পাতা কাঠ কয়লা প্রভৃতি বিক্রয় করে, তাহাদিগকে 'গুরু গোবিন্দ' বলিয়া পরিচয় দিতে শুনিয়াছি। যাহা হউক গৌড় গোবিন্দ বিষয়ে যে নানারূপ প্রবাদ এদেশে প্রচলিত, পূর্ব্ব প্রবন্ধেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

* বোধ হয় গোবিন্দ তান্ত্রিক সাধনায় পিশাচাদি সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তন্ত্রপ্রধান কামরূপ প্রদেশান্তর্গত স্থানের অধিবাসীর পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে। মোসলমান লেখকের পক্ষে সুতরাং তাঁহাকে যাদুকর সংজ্ঞাদানও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

দিলেন। দারুণ পুত্রশোকে ও নিজের হস্তচ্ছেদ জনিত যন্ত্রণায় হতভাগ্য শেখ ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। *

[প্রতিশোধের কল্পনা]—বুরহান উদ্দীন অপমানে ও মনঃ-ক্লেশে নিজের বাসস্থান পরিত্যাগ করিল। অত্যাচারের প্রতি-হিংসার উপায় চিন্তা করিতে করিতে সে নব প্রতিষ্ঠিত মোসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইল। তৎকালে সোলতান আলাউদ্দীন শাহ দিল্লীর সিংহাসনাধিষ্ঠিত ছিলেন। বুরহানের দুঃখকাহিনী শুনিয়া বাদশাহের মনে দুঃখ হইল; তিনি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ অবশ্য কর্ত্তব্য ভাবিয়া আপন ভাগিনেয় সিকান্দর শাহকে শ্রীহট্টাভিমুখে সসৈন্যে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন এবং গৌড় গোবিন্দকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিতে হুকুম দিলেন।

[সিকান্দর শাহের অভিযান]—সিকান্দর বাদশাহের আদেশ ক্রমে সৈন্য সরঞ্জাম লইয়া যুদ্ধার্থ রোওয়ানা হইয়া কিছুদিন পরে ঢাকা প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি সোনারগাঁওএ ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে শিবির স্থাপন করিলে, শ্রীহট্টে তদীয় অভিযানের সংবাদ পৌঁছিল।

---

* সুহেলি এমনের মোসলমান গ্রন্থকার হিন্দুগণ কি চক্ষে গরুকে দেখেন তাহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। শেখ বুরহান উদ্দীন হিন্দু রাজার অধিকার স্থলে থাকিয়াও ততটা বিবেচনা করে নাই—নচেৎ গোবধ মানস করিত না। রাজা গৌড় গোবিন্দ অতি নৃশংস শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন। বুরহানের শেখ উপাধিতে বোধ হয় সে কিংবা তাহার পিতৃপিতামহ পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। গৌড় গোবিন্দও আমাদের মতে হিন্দুধর্ম্মে নব দীক্ষিত পার্ব্বত্য জাতীয়। এই উভয়েই অভিনব পরিগৃহীত ধর্ম্মে অন্ধ বিশ্বাসমূলক অবিমৃষ্যকারিতা দৃষ্ট হইবে।

[গোবিন্দের অগ্নিবাণ]—গৌড়গোবিন্দ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষালাভ করিবার জন্য যথাযুক্ত আয়োজন করিলেন। তাঁহার অধীন যত ভূতপ্রেত ছিল তাহারা যাদুর সরঞ্জাম তৈয়ার করিল। সিকান্দরের সৈন্যমধ্যে অগ্নিবাণ * চালান হইল। মোসলমান সৈন্যগণ কখনও এই প্রকার যাদু দেখে নাই—উহার প্রতিপ্রসব কিছু আছে কি না তাহাও জানিত না। বহু লোক পুড়িয়া মরিল, অনেকে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পলায়নপর হইল। সিকান্দরের প্রথম উদ্যম এইরূপে বিফল হইলেও তিনি আরও দুইবার সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কোনও মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

[বুরহান উদ্দীনের অন্য চেষ্টা]—বেচারা বুরহান উদ্দীন দেখিল গোবিন্দের যুদ্ধে পরাজয় সুদূরপরাহত। সে তখন খোদা তাল্লার কৃপাই একমাত্র ভরসার স্থল ভাবিয়া মদিনায় হজরত মোহাম্মদের কবরে গিয়া আত্মদুঃখ জ্ঞাপন করিতে সংকল্প করিল। কিন্তু ততদূর তাহাকে যাইতে হইল না।

[শাহ জলালের শ্রীহট্টাভিমুখে অভিযান]—তখন মক্কা মদিনা যাইতে দিল্লী হইয়া যাইতে হইত। বুরহান দিল্লী গিয়া শাহ জলালের দর্শন লাভ করিল। মহাত্মা শাহজলাল বুরহানের শোকাবহ কাহিনী শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং তাহার অপ-

* অগ্নিবাণ কামান-বন্দুক কিনা কে বলিতে পারে? ইহার প্রস্তুত প্রণালী সাধারণে তখন অবিদিত ছিল, তাই ইহা যাদুবিদ্যা বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে।

মানের প্রতিশোধ কল্পে গোবিন্দের যাদু দমনে বদ্ধপরিকর হইয়া সশিষ্য শ্রীহট্টাভিমুখে রোওয়ানা হইলেন।

[সিকান্দরের সাহায্য প্রার্থনা]—গোবিন্দের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সিকান্দর বাদশাহের সমীপে নিজের অদ্ভূত পরাজয় বার্ত্তা সবিস্তর জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়া সোলতান আলাউদ্দীনের বুদ্ধি লোপ পাইল। উজীর নাজির গণক প্রভৃতি দরবারের যাবতীয় ব্যক্তি উপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত পরামর্শে বসিয়া গেলেন।

[অদ্ভূত উপায়]—বহু পাঁজি পুথি দেখিয়া গণনা করিয়া এরূপ এক ব্যক্তির ঠিকানা বাহির হইল, যাঁহার দ্বারা এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার নাম না বলিলেও পরিচয় পাইবার এক ফিকির বলা হইল। বাদশাহের যত সৈন্যাধ্যক্ষ আছেন সকলকেই যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত হইয়া ডেরাখিমা ময়দানে বাহির হইতে বলা হউক। ময়দানে শিবির সংস্থাপন হইলে, সন্ধ্যার সময় এক বাতাস বহিবে। বাতাসে তাবৎ তাঁবুর প্রদীপ নিবিয়া যাইবে, কেবল একটীতে প্রদীপগুলির কিছুই হইবে না। সেই তাঁবুর মধ্যে যাঁহাকে পাওয়া যাইবে তিনিই উদ্দিস্ট ব্যক্তি।

[সৈয়দ নসির উদ্দীন সেপা সালার]—এই উপায়ে সৈয়দ নসির উদ্দীন নামক এক মহাত্মার উদ্দেশ পাওয়া গেল। তাঁহার জন্মস্থান বাগদাদ। তিনি ঐ খানে আউলিয়া দলের সরদার ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ মাওসুক নামক বাগদাদ প্রদেশাধিপতির সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তিনি জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীর

বাদশাহের অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ সেফায়েৎ জানিয়া বাদশাহ তাঁহাকে সেপাসালার উপাধি প্রদানপূর্ব্বক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বৃত করিলেন এবং অনেক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া সিকান্দর শাহের সহায়তা নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। যেখানে পুণ্যতোয়া প্রবাহিনী গঙ্গা ও যমুনা সম্মিলিত হইয়া হিন্দুর পরম তীর্থ প্রয়াগের মহিমা সংবর্দ্ধিত করিয়াছে সেই আল্লাবাদ সহরেই সেপাসালারের বাহিনী ও শাহজলালের অনুচরবর্গের পরস্পর সম্মিলন হইল। সেই গঙ্গা যমুনার সম্মিলিত প্রবাহের ন্যায় এই দুই মহাত্মা একত্র হইয়া পশ্চিমাভিমুখে একই উদ্দেশ্যে প্রস্থিত হইলেন।

[৩৬০ অনুচর]—পথিমধ্যে একে একে সঙ্গিসমূহ যুটিতে লাগিলেন। ক্রমে শাহজলালের ৩৬০ জন আউলিয়া অনুচর হইলেন—তন্মধ্যে সেপাসালারই সকলের সর্দ্দার বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

[শ্রীহট্টের সীমান্তে প্রবেশ] —যেখানে সিকান্দর পরাভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন শাহজলাল সানুচর সেইখানে পৌঁছিলেন। তখন গৌড়গোবিন্দের যাদুগিরির বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীহট্টে যাইবার নিমিত্ত তিনি ব্যগ্র হইলেন এবং সিকান্দরকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইতে হইল—কিন্তু নৌকা মিলিল না। তখন শাহজলাল নমাজের আসন খানি বিছাইয়া দিলেন তাহাতে আরোহণ করিয়াই সমস্ত লোকজন নদীপার হইল। বর্ত্তমানে যে স্থান চৌকি পরগণা

বলিয়া বিখ্যাত সেইখান পর্য্যন্তই তখন শ্রীহট্ট রাজ্যের সীমানা ছিল। যখন শাহজলাল ঐ স্থানে আসিয়া পড়িলেন, গোবিন্দ তখন তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিলেন।

[অগ্নিবাণ বিফল]—গোবিন্দ দস্তুরমত অগ্নিবাণ চালান দিলেন। কিন্তু সাধু শাহজলালের আশ্রিত কটকের উপর যাদুগিরির ফল বিপরীত হইল। তাঁহার নিজের শিবির ও দ্রব্য সামগ্রী পুড়িয়া ছারখার হইল। রাজা চমৎকৃত হইয়া অমাত্যগণের পরামর্শ চাহিলে, তাহারা রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতেই মন্ত্রণা দিল। তাহারা কহিল "মহারাজ, এ সিকান্দর শাহ নহে যে অগ্নিবাণে পুড়িয়া মরিবে; এই সৈন্যদলে এমন এক বীর আছেন, যাঁহার ভয়ে জঙ্গলের বাঘ পলাইয়া যায়; মন্ত্র তন্ত্র কিছুতেই তাঁহার কিছু হইবে না। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। আপনি না গেলে, অগত্যা আমাদিগকে বিদায় দিউন।"

[লৌহধনুতে গুণ যোজনা]—গোবিন্দ আর এক ফিকির উদ্ভাবিত করিলেন। লৌহ দ্বারা এক ধনু নির্ম্মাণ করাইয়া শাহজলালের নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন যে ইহাতে গুণ আরোপ করা হইলে তিনি শ্রীহট্ট ছাড়িয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে শাহজলাল সৈন্যসহ বাহাদুরপুরের কাছ দিয়া বরাক নদী পার হইলেন। তাঁহার নিকটে লৌহধনু পৌঁছিলে, তিনি স্বয়ং গুণ যোজনা না করিয়া সৈন্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে যাহার আহ্সরের নমাজ কোনও দিন বাধা হয় নাই তাহাকে তাঁহার নিকটে আনিয়া

হাজির করিতে হইবে। সমস্ত শিবির অনুসন্ধান ক্রমে সেপাসালার নসিরুদ্দীনকেই মাত্র ঈদৃশ নিয়মনিষ্ঠ পাওয়া গেল। শাহজলাল তাঁহাকেই ধনুতে গুণ যোজনা করিতে আদেশ করিলেন। নসিরুদ্দীন ভগবন্নাম স্মরণপূর্ব্বক অনায়াসে লৌহধনুতে গুণ আরোপ করিয়া দিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল। ধনু গোবিন্দের নিকট নীত হইলে তিনি জয়ের আশা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেন।

[সর্পপেটিকাভ্যন্তরে গোবিন্দ]—কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে গোবিন্দের বাসনা হইল শাহজলালের সন্দর্শন লাভ করেন। প্রকাশ্য ভাবে ফকিরের সাক্ষাৎ যাইতে আশঙ্কা করিয়া তিনি এক ফন্দী করিলেন। সাপের পেটিকার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া তিনি শাহজলালের সম্মুখে নীত হইলেন এবং উহার ভিতর হইতে তাঁহাকে এক নজর দেখিয়া লইলেন। শাহজলাল ভিতরকার ব্যাপার প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারিলেন—তাই সাপের খেলা দেখিবার পর পেটেরাগুলির অভ্যন্তর পরীক্ষা করিবার জন্য গোবিন্দের আশ্রয়ীভূত পেটেরাটিকেই খুলিয়া দেখাইতে আদেশ দিলেন। বাহকেরা আপত্তি করিলে শাহজলাল গোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন।

[গোবিন্দের পরাজয় স্বীকার]—গোবিন্দ অবনত মস্তকে পেটেরা হইতে বাহির হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে অঙ্গীকার করিলেন। অপিচ শাহজলালের কোনও কাজ তিনি করিয়া দিতে পারেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা

করিলেন। তখন শাহজলাল একটি মস্জিদ তৈয়ার করিবার নিমিত্ত কিছু পাথর দিবার জন্য গোবিন্দকে বলিলেন। গোবিন্দ তাঁহার ভূতপ্রেতাদি দ্বারা এত প্রস্তর আনাইয়া দিলেন যে তদ্দারা বহু মস্জিদ্ প্রস্তুত হইল। তন্মধ্যে চৌকিদীঘী নামক স্থানের আদিনা মস্জিদই প্রধান; ইহার ১২০টা গুম্বুজ ছিল এবং ইহাতে সকলে জুম্মার নমাজ পড়িত *।

[গোবিন্দের পরিণাম]—শাহজলালের আদেশ প্রতিপালন পুরঃসর গোবিন্দ তাঁহার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কি দশা হইয়াছিল কেহই তাহা ঠিক বলিতে পারে নাই। তবে কেহ কেহ না কি সহর হইতে প্রহর পরিমাণ দূরবর্ত্তী পেঁচাগড় নামক স্থানে তাঁহাকে পাষাণ মূর্ত্তিতে পরিণত এবং কটিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায় এখনও দেখিতে পায়!

[শাহজলালের শ্রীহট্ট সহরে প্রবেশ]—বলা বাহুল্য, এখন নিষ্কণ্টকে শাহজলাল শ্রীহট্ট সহরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। সূর্ম্মা নদী, ব্রহ্মপুত্র ও বরাকের ন্যায়ই, বিনা নৌকায় পার হইলেন। সহরে মোসলমান প্রভাব দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল। বুরহান উদ্দীন ও তদীয় ধর্ম্মভ্রাতৃগণের মনোদুঃখ দূর হইল।

[মৃৎ পরীক্ষা]—গুরুদত্ত মৃত্তিকার পরীক্ষক চাষণি পীর সহরের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানে যেখানে

* তৎপর নবাবি আমলে ইউসুফ্ ইনদিয়ার খাঁ নামক একজন নবাব ঐ সকল গুম্বুজ ভাঙ্গিয়া ইট পাথর আনিয়া বর্ত্তমান কবরের নিকটে এক মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

সাধুর সমাধি স্থান রহিয়াছে, সেই টীলার মাটিই বর্ণ গন্ধ ও স্বাদে ঐ মাটির সমান হইল। তাই মহাত্মা শাহজলাল সেইখানেই অবস্থাননিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া অবিরত ভগবদুপাসনায় কাল-কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

[অনুচরবর্গ]—তিনশতষাট্‌সংখ্যক আউলিয়ার মধ্যে অল্প কয়েকজন এবং এমনের রাজকুমার শাহজলালের সঙ্গে থাকিলেন। অন্যেরা শ্রীহট্টের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রেরিত হইলেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলের তথা পূর্ব্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত বংশীয় মোসলমানদিগের অধিকাংশই এই আউলিয়াগণের মধ্যে কাহারও না কাহারও বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

[শ্রীহট্টের শাসন কার্য্য]—সিকান্দর শাহ শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনিও সাধুর আদেশ মতেই কার্য্য করিতেন। নগরে সুশাসন প্রচলিত হইল, জোর জুলুমের লেশও থাকিল না।

[সিকান্দরের ভ্রম]—গ্রীষ্মপ্রধান স্থান হইতে আসা হেতু শাহজলালের সহচরবর্গ শিশিরাগমে শ্রীহট্টের শীতে নিতান্ত অভি-ভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা শীত বস্ত্রের জন্য সাধুকে ধরিলেন। শাহজলাল একদা সিকান্দর শাহকে কহিলেন "দেখ, দারুণ শীতের সময় আসিয়াছে, যাহাতে শীত নিবারণ হয়, করুর এমন উপায় করিবে।" সিকান্দর বিষয়ী লোক, তিনি এই সামান্য কথার বিপরীত অর্থ করিলেন। শীত নিবারক কন্থাকম্বলের আয়োজন না করিয়া শাহজলালের নিমিত্ত শীতহারিণী বনিতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

[সিকান্দরের পরিণাম]—অনেক চেষ্টায় পরম সুন্দরী এক রমণী জোগাড় করিয়া সিকান্দর শিবিকায় তাহাকে শাহজলাল সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া সাধু পরিতাপ করিয়া বলিলেন, "হায় সিকান্দর নিজে যেরূপ ডুবিয়াছে, আমাকেও কি সেইরূপ ডুবাইবে? আমি দীনহীন ফকির, মজঃরুদ, আমার জন্য কি এই ব্যবস্থা?" ইহার কিছু পরেই সংবাদ আসিল, সিকান্দর শাহ সূর্ম্মানদী পার হইতে গিয়া নৌকা ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তখন কোনও রূপ তুফান বা তরঙ্গ কিছুই ছিল না। বহু অনুসন্ধানেও সিকান্দরের মৃতদেহ পাওয়া গেল না। তাঁহার স্থলে অন্য লোক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

[রমণীর পরিণয়]—শাহজলালের সঙ্গে তদীয় প্রিয়তম যে সকল শিষ্য ছিলেন তন্মধ্যে হাজি ইউসুফের প্রতি আদেশ হইল যে তিনি সিকান্দরের প্রেরিত রমণীর যথারীতি পাণিগ্রহণ করেন। হাজিও সংসারবিরক্ত ছিলেন, তাই ধনদৌলতের অভাব এবং সাংসারিক ধর্ম্মে বীতস্পৃহতা জানাইয়া পরিহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শাহজলাল তাঁহাকে নানা যুক্তি ও নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনশ্চ আদেশ করাতে তিনি অগত্যা স্বীকার করিলেন। এই পরিণয়জাত সন্তানগণের বংশধরেরাই এক্ষণে সাধুর সমাধির তত্ত্বাবধায়ক এবং ইঁহাদের সরদার সর্কুমও এই বংশজাত।

[সূর্ম্মার জল সংস্করণ]—শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকে বুন্দাসিল নামক

পরগণার নিকট দিয়া সূর্ম্মা নদী প্রবাহিত হইত। তথায় জিয়া উদ্দীন নামক শাহজলালেরই জনৈক অনুচর থাকিতেন। তিনি নদীর জল বিস্বাদ দেখিয়া তাহার সংস্কারবিধানার্থ সাধুকে একবার সেইস্থানে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ভক্তের আহ্বানে শাহজলাল সেই স্থানে গিয়া নমাজ পড়িয়া একখণ্ড প্রস্তর জলে ফেলিয়া দিলেন, ইহাতেই জল বিশুদ্ধ হইল।

[ভূত প্রেত দমন]—বুন্দাসিল যাইবার পথে কুশী নদীর তীরে এক ভূত ছিল; সে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার কালে ধূলি উড়াইয়া চলিত। শাহজলাল উহাকে মারিয়া ধূলিতে মিশাইলেন। বুন্দাসিলেও অপর এক দেও (দৈত্য) ছিল; সাধু তাহাকেও সংহার করিয়া ঐ স্থানের নাম দেওরাইল রাখি-লেন। অদ্যাপি পরগণার সেই নামই প্রচলিত আছে।

[গোবিন্দের দুর্গ ধ্বংস]—একদা শাহজলাল আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিতে ছিলেন। হঠাৎ রাজা গৌড়গোবিন্দের দুর্গ তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই দুর্গের মালিক যাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারও সেই অবস্থা হওয়া উচিত ছিল। কেন না তাহা হইলে গৌড়গোবিন্দের চিহ্ন মাত্রই সহরে থাকিত না।" তাঁহার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র ঐ দুর্গ ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

[রমণী ও পুষ্করিণীর বিলোপ]—শাহজলাল জীবনে নারীমুখ দেখেন নাই; একদিন তাঁহার গৃহের উত্তর দিকস্থিত জলাশয়ে

একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল। তাহার আলুলায়িত কেশ-পাশে ও অনাবৃত বক্ষঃস্থলে সাধুর দৃষ্টি পড়িল। ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় তিনি "ইহা কি" তাহা পার্শ্বস্থ অনুচরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই। পরে উহা স্ত্রীমূর্ত্তি জানিতে পারিয়া তিনি সাতিশয় বিরক্তি সহকারে বলিলেন "এই পুষ্করিণীতে যদি রমণীমূর্ত্তিই দেখিতে হইল তবে ইহার অস্তিত্ব বিলোপ হইবে না কেন?" তৎপর স্ত্রীলোক বা পুকুর কিছুরই চিহ্ন মাত্র কেহ আর দেখিতে পাইল না।

[কূপ খনন ও জমজমের জলানয়ন]—বিধর্ম্মীর খোদিত জলাশয়ের জল ব্যবহার করিতে সাধুর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি একটি কূপ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মক্কাস্থিত পবিত্র জমজমের জল যাহাতে ঐ কূপে আইসে তজ্জন্য প্রার্থনা করিলেন। নিজের হাতের লৌহ যষ্টিও কূপে নিক্ষেপ করিলেন। সাধুর মনস্কামনা পূর্ণ হইল; জমজমের জল কূয়ায় আবির্ভূত হইল। এই কূপ সম্প্রতি ইষ্টক গ্রথিত হইয়াছে, এবং ইহা হইতে একটা নালা বাহিয়া অনবরত জল নির্গত হইতেছে।* বিশ্বাসী ভক্তগণ অনেকে ইহার জল খাইয়া রোগমুক্ত হইয়াছে এবং মোসলমানগণ রোজার সময় এই জলে আচমন করিয়া পারণা করিয়া থাকে।

[কূপের পরীক্ষা]—শ্রীহট্ট সহরের অনতিদূরস্থ খিত্তা পর-গণার জনৈক মোসলমান একদা তীর্থ ভ্রমণে মক্কা-মদিনায় গিয়াছিল। তাহার খরচ পত্র বাদে নয়টি স্বর্ণমুদ্রা উদ্বৃত্ত হইয়া-

* এই কূপটি একটী প্রস্রবণ বিশেষ।

ছিল। ঐ গুলি সঙ্গে নিয়া চলিলে চুরি হইবে মনে ভাবিয়া সে একটা কাঠের ডিবা মধ্যে মুদ্রাগুলি পূরিয়া মক্কার জমজমের জলে ফেলিয়া দিল এবং প্রার্থনা করিল যে যদি শাহজলালের কূয়ায় প্রকৃতই জমজমের জল গিয়া থাকে তবে তাহার ডিবাটিও যেন ঐ কূপে যায়। এদিকে কূপ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত এক খাদিম কূয়ায় নামিয়া একটা ডিবা পাইয়া তাহা নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। দুই বৎসর পরে যখন তীর্থযাত্রী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল তখন সে তাহার ডিবা অনুসন্ধান করিয়া উক্ত খাদিম হইতে বাহির করিল এবং নয়টি স্বর্ণমুদ্রা হইতে দুইটি দরগাতে প্রণামী দিয়া গেল।

[শাহজলালের তিরোভাব ও সমাধি]—শ্রীহট্টে আসিয়া শাহজলাল ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই স্বীয় গৃহে বসিয়া সাধনায় কাটাইতেন। তাঁহার বয়স যখন ৬২ বৎসর তখন তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। যে স্থলে তাঁহার আশ্রম ছিল সেই স্থলেই তাঁহার সমাধি হইল। এই সমাধি স্থানেরই পার্শ্বে এমনের ভক্ত রাজকুমারের সমাধি বর্তমান। শাহজলালের সমাধি স্থল প্রকৃতই শ্রীহট্টকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

[প্রদীপ, কার্ত্তিক ১৩১২।]

সুখ ও দুঃখ।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

জগতে যে কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, উহার মূলে সুখ লাভের ও দুঃখ মোচনের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখা যায়। ঐ যে রবিরশ্মিপ্রপীড়িত গলদ্ঘর্ম্ম কৃষাণ বহু কষ্টে হল চালনা করিতেছে; ঐ যে দারুণ শীতের সময় মৎস্যজীবী জলাশয়ের সুশীতল জল মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে; ঐ যে বিদ্যালয়ের ছাত্র আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবা নিশি গ্রন্থাধ্যয়নে স্বীয় শরীর কঙ্কালাবশিষ্ট করিতেছে; ঐ যে আফিসের কর্ম্মচারী প্রভুর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রাণপণে খাটিয়া শরীর পাত করিতেছে, সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য পরিণামে সুখলাভ ও দুঃখাপনোদন। কণ্টক দ্বারা যেমন কণ্টকোদ্ধার হয়, তদ্রূপ আপাতক্লেশকর কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কি কৃষাণ, কি মৎস্য জীবী কি ছাত্র, কি কর্ম্মচারী সকলেই ভবিষ্য দুঃখ নিবারণের তথা সুখ প্রাপ্তির উপায় সাধন করিতেছে।

সুখের জন্য সকলে লালায়িত হইলেও, রুচি ভেদে, প্রকৃতি ভেদে ও শিক্ষার তারতম্যে, মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ত্ম অনুসরণ পূর্ব্বক সুখান্বেষণ করিতেছে। আমার যাহাতে সুখ, অপরের

পক্ষে হয়ত তাহা ক্লেশজনক হইতে পারে। একটা স্থূল কথাই ধরা যাউক। সংসার সুখ আমাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষার জিনিস; কিন্তু শুক দেবের পক্ষে তাহা বিষবৎ হেয় পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।

মানুষের সুখ ও দুঃখ তাহার মানসিক বা শারীরিক অনুভূতি মাত্র। সুতরাং মনের বা শরীরের অবস্থার উপর উহা অনেকটা নির্ভর করে। উপস্থিত যে কার্য্যে আমার অপরিসীম সুখ, সময়ান্তরে, মনের ভাবান্তর হইলে, সেই কার্য্য দারুণ দুঃখ জনক হইতে পারে। আবার রুগ্ন ব্যক্তি বা স্থবিরের পক্ষে যাহা ক্লেশকর, এক সুস্থকায় ব্যক্তি বা যুবকের পক্ষে তাহা সুখজনক হইয়া থাকে।

সংসারের সকলই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং সুখ-দুঃখও অচির-স্থায়ী। আজ যাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বিষণ্ণ হই, কাল তাহারই প্রীতিপ্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ লাভ করি। ফলতঃ, নিরবচ্ছিন্ন সুখী কি দুঃখী লোক জগতে অতি বিরল।

সুখ বা সুখের আশা সকলেরই হৃদয়ে কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতি হীন দরিদ্র বিষম-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, যাহার এজগতে আপনার বলিতে কিছুই নাই তাহাকে দেখিয়া মনে করিতে পার, বুঝি, এই ব্যক্তি আপনার দুঃখময় জীবনের অবসান সততই কামনা করিতেছে; কিন্তু যদি কেহ উহার প্রাণ বিনাশে উদ্যত খড়্গ হয়, দেখিবে, সে প্রাণপণে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিবে। অবশ্যই কোনও সুখের আশাবন্ধ তাহার জীবনের অবলম্ব হইয়া রহিয়াছে।

আবার দুঃখানুভূতিও আপামর সকলেরই অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। তোমার দৃষ্টিতে যাঁহাকে আজন্ম সুখী দেখিতেছ যিনি মর্ত্ত্যে বসিয়া স্বর্গের ভোগ সুখ অনুভব করিতেছেন মনে কর, সেই অসামান্য সৌভাগ্যশীল ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে, কোনরূপ শোক বা দুঃখের স্মৃতি তাঁহার চিত্ত বিক্ষোভিত করিতেছে।

একটি গল্প বলিতে হইল। কোনও রাজা তদীয় সন্তানের মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনরূপে প্রবোধ দিতে না পারিয়া এক দিন তাঁহার সুচতুর মন্ত্রী আসিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমার একটী মুক্তার বাগান আছে, ইচ্ছা করিলে তাহা পরিদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু প্রাতঃকাল ভিন্ন উহা দেখান যাইতে পারে না। মন্ত্রীর উদ্যানে এক সর্ষপ ক্ষেত্র ফলিত হইয়াছিল; হৈমন্তিক প্রভাতে শিশির বিন্দু ক্ষেত্রোপরি উপচিত হইয়া অনতিপ্রখর প্রাতঃসূর্য্যের কিরণপ্রভায় ঝলমল করিতে করিতে মুক্তাফলের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছিল। দূর হইতে ঐ শোভা রাজাকে প্রদর্শন করাইয়া মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ, এজন্মে যে ব্যক্তি কখনও কোন শোক দুঃখের অধীন হয় নাই একমাত্র সেই ব্যক্তি উহার সমীপস্থ হইতে কিংবা ঐ মুক্তা ফল আহরণ করিতে পারিবে। রাজা, ঐরূপ ব্যক্তি কেহ আছে কিনা রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিলেও এতদবস্থ কাহাকেও পাওয়া গেল না। তখন মন্ত্রী রাজাকে বুঝাইলেন যে, যখন জগতের সকলেই শোক দুঃখের অধীন, তখন স্বীয় শোককে

মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবিনী একটা অবস্থা ভাবিয়া উহা সংবরণ করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

সুখের অর্জ্জনও দুঃখের বর্জ্জন জীবের প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইলেও স্বীয় বুদ্ধির ত্রুটিতে বা অসাবধানতার ফলে কৃত কর্ম্মের জন্য জীবকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব, সুখ ও দুঃখ অনেকটা নিজ কর্ম্মের ফলাফল। সুপথে চলিয়া সৎকর্ম্ম করিলে সুখ ও কুপথে চলিয়া কুকর্ম্ম করিলে দুঃখ হয়, ইহা অতি সাধারণ নীতি সূত্র। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে যাহারা কুপথে চলিয়া কুকর্ম্ম করে, তাহারা নিজের বিকৃত বুদ্ধিতে ঐ কর্ম্মে সুখ লাভ করিবে ভাবিয়াছিল; কেন না পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুখ প্রাপ্তিই মানবের সমুদয় ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। বুদ্ধির বিকৃতিতে জীবের দুঃখ হয়, এতদ্দৃষ্টেই বুঝি বা পাশ্চাত্য পুরাণের মতে বুদ্ধি-বৃক্ষের ফলাস্বাদনে দুঃখের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।*

এতদ্-ব্যতীত সুখ-দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে নিয়তির উপরও নির্ভর করে। নিয়তি বা অদৃষ্ট কেবল যে প্রাচীন জগতেই মান্য হইত এমন নহে; অধুনাতন দার্শনিকগণের মধ্যেও উহার প্রভাব দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, সদুদ্দেশ্যে সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, যাহার ফলে কর্ম্মকর্ত্তার ও সাধারণের সুখ ধ্রুব; কিন্তু হঠাৎ সমস্তই যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, প্রাচীনতম পদ কর্ত্তার সঙ্গে বলিতে হইল—

* ধর্ম্ম শাস্ত্রে পাপ ও পুণ্যকেই যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের নিদান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥"

শাশ্বতিক সুখ লাভ বা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যদিও আবহমান কাল হইতে মানবগণ নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা পাইতেছে, তথাপি এযাবৎ উহার কোন ধ্রুব উপায় কি কৌশল আবিষ্কৃত হইল না। চিন্তাশীল দার্শনিকগণ জগৎকে দুঃখময় জ্ঞান করিয়া, কিসে সুখ, উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন; ভাবুক কবিগণ নানাভাষায় নানাছন্দে উহারই অনুশীলন করিয়াছেন; এবং পারমার্থিক সাধুগণেরও উহাই সাধনার বিষয়; কিন্তু যত দিন জগতে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"—এই প্রবাদ থাকিবে, তত দিন এই সমস্যার সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত সুদূর-পরাহত। পরন্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেন সুখ ও দুঃখের মাত্রা যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইয়া উক্ত প্রহেলিকাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে।

এখন প্রকৃত সুখী কে, এই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। একবার বকরূপী ধর্ম্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠির মহারাজকে ঐ প্রশ্ন করা হইয়াছিল। উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,

"দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥"

দিনান্তে একবার যে ব্যক্তি শাক মাত্র আহার করে অথচ ঋণ-জালে জড়িত হয় না এবং (ধন লোভে) দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে না, সেই ব্যক্তিই সুখী। ফলতঃ যদি অভাবই দুঃখের মূল বলিয়া

ধরা যায় তবে যে ব্যক্তির কোন অভাব বোধ নাই, অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্টি আছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী।

সুখের মূল সন্তোষ ও দুঃখের মূল অভাব। নিদান স্থির হইলে ঔষধ নির্ব্বাচন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সন্তুষ্টির অনুশীলন ও অভাবের হ্রস্বীকরণ সুখ লাভের ও দুঃখাপনোদনের প্রকৃষ্ট উপায়। ভিন্ন করিয়া বলিলেও ঐ দুইটী একই কথা; যেহেতু সুখ ও দুঃখ উভয়ের মধ্যে এমনই সম্বন্ধ যে একের আবির্ভাবে অপরের তিরোধান সূচিত হয়।

আমরা সচরাচর যে সকল উপভোগের সামগ্রীকে সুখের উপাদান বলিয়া মনে করি. উহারা অনেকেই কিন্তু সন্তোষের অন্তরায় ও অভাবের প্রকৃত জনক। উহারা যত প্রশ্রয় লাভ করিবে, সন্তোষ ততই দূরবর্ত্তী হইতে থাকিবে এবং উহাদের অনুবন্ধী নূতন নূতন অভাবের আবির্ভাব হইতে থাকিবে। ঋষি শাপে রাজা যযাতির অকাল বার্দ্ধক্য হইয়াছিল। একে যৌবন কাল তাহাতে আবার বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অপ্রতিহত ক্ষমতা; রাজার এমন অবস্থায় বার্দ্ধক্যের উদয়ে মনে হইল, "হায়, জন্মের মত সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম; এমন কেহ কি নাই যে কিয়দ্দিন আমার জরাভার বহন করে? তাহা হইলে ইতি মধ্যে আমার ভোগসুখলালসটা চরিতার্থ করিয়া লইতে পারিতাম।" কনিষ্ঠ পুত্র পুরু যযাতির জরাভার অঙ্গীকার করিলেন। রাজা সুদীর্ঘকাল যৌবনলীলার সুখ ভোগ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে বুঝিলেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো ভূয়োঽভিবর্দ্ধতে॥"

ঘৃতাহুতিতে যেমন অগ্নি উদ্দীপিত হয় মাত্র, নির্ব্বাপিত হয় না, তদ্রূপ উপভোগ দ্বারা বিষয় লালসা নিবারিত না হইয়া কেবল পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষাই সুখ ভোগের অন্তরায়; কারণ আকাঙ্ক্ষামাত্রেই অভাব, অর্থাৎ দুঃখের নিদান, জড়িত থাকে। সুতরাং ভোগ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দান অপেক্ষা দমনের অনুশীলনই কর্ত্তব্য, ইহাতে ভোগ সুখের অভিলাষের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সন্তোষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সন্তোষই ধৃতি, তিতিক্ষা, দম, শম, বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলেরই নামান্তর বা ভাব বিশেষ মাত্র। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উহারই অনুশীলনার্থ ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সন্তোষ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে কীদৃশী অবস্থা হয়? আমরা উহার কি বলিব, কি বুঝিব? যেহেতু, আমরা কখন সুখের ভাবে উৎসিক্ত, আবার কখন দুঃখের তাড়নায় উদ্বেজিত! শুনিয়াছি যেমন পদ্মপত্রে জলবিন্দু পতিত হইলে অচিরেই তাহা পড়িয়া যায়, এক কণাও উহাতে লাগিয়া থাকিতে পারে না, ঐরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ও তদ্রূপ দুঃখাকর ভাব ক্ষণকালের জন্যও অধিকার লাভ দূরে থাকুক, প্রবেশ লাভ পর্য্যন্ত করিতে পারে না।

সন্তোষ সাধনের আর একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। ধন

জন প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ের উপর চিত্তের প্রবণতা জন্মিলে, উক্ত নশ্বর বস্তুর ভাবাভাবের উপর জীবের সুখ দুঃখ অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। পরন্তু, অবিনশ্বর পদার্থ কিছু যদি থাকে তৎপ্রতি প্রেম জন্মাইতে পারিলে এক চিরস্থায়ী আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়, দুঃখ তাহার নিকটে কদাপি আসিতে পারে না। ফলতঃ ভগবদাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণ যে কি এক অনির্ব্বচনীয় অবিমিশ্র সুখ লাভ করিয়া থাকেন তাহা কেবল তাঁহাদেরই অনুভূতির বিষয়।

উপরে সুখ লাভ ও দুঃখোৎপাদনের যে যে উপায় উল্লেখিত হইল, তাহা কেবল কয়েকটী স্থূলতম কথা মাত্র। পরন্তু উহাতে আভ্যন্তর অর্থাৎ মানসিক সুখ ও দুঃখের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে, ভৌতিক সুখ দুঃখ, অর্থাৎ শারীরিক ভোগ ও ক্লেশ, সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। এতৎ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের এমনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে একের অবস্থান্তরে অপরের অবস্থান্তর অবশ্য-ম্ভাবী। যাঁহারা সাধনা রাজ্যে কিছুমাত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, অন্তর্জগতের সংগ্রামে যিনি অত্যল্প পরিমাণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাঁহার বাহ্য প্রকৃতিকে পরাজয় করিতে অধিক আয়াস করিতে হয় না। উদ্বেলিত সুখ ও দুঃখের বাহ্য বিকাশ হাস্য ও ক্রন্দন। জগতের এমনই লীলা, সদ্যোজাত শিশুও এই সুখ দুঃখের অধীন, নতুবা তাহারও হাসি কান্না দেখিতে পাইব কেন? এই সদ্যোজাত "সাহিত্য সেবকে" সুতরাং

প্রথমেই এই সুখ দুঃখের কাহিনী গাহিতে হইল। সহৃদয় পাঠকের নিকট তজ্জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

[সাহিত্য সেবক ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা পৌষ ১৩১২]

আত্মোন্নতি

শ্রীভুবনমোহন দাস এম, এ, প্রণীত

প্রকাশক

বি, কে, দাস

১০এ শ্রীনাথ দাসের লেন,

কলিকাতা

১৩৩৬

[মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

১০এ শ্রীনাথ দাসের লেন,

কলিকাতা

ও

কলিকাতা পুস্তকালয়।

কলিকাতা

১৬নং মদন বড়াল লেনস্থ

লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

'আত্মোন্নতি' নামক দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিসন্তান শ্রীমান ভুবনমোহন দাস। গ্রন্থকার বয়সে যুবক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ এবং আলাপ, ব্যবহার ও গ্রন্থে ইঁহার সদাচারপূর্ণ গম্ভীর স্বভাব অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকার ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, ধনের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া, ধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন, ইহা তাঁহার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। যে দেশের ধনী-সন্তানগণ নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে, নিদ্রায়, আলস্যে ও বিবিধ ব্যসনে আসক্ত হইয়া অমূল্য মানবজীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন, অসুরসম্পদে মত্ত হইয়া দৈবী সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থন হন না, সেই হতভাগ্য দেশে এবংবিধ ব্যক্তির আবির্ভাব আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই। যে দেশ ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত, যেখানে ধন অপেক্ষা জ্ঞানের সমাদর, সেই দেশের লোক আজ বিজাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত, বিলাসব্যসনে মত্ত, অহং-ভাবদৃপ্ত ইয়োরোপ তাঁহাদের অনুকরণীয়। আজ কালক্রমে ঋষিসন্তান ও পূর্ব্বপুরুষগণের নিন্দায় আনন্দিত, প্রাচীন সদাচার পদদলিত করিতে কৃতসংকল্প। আজ ইয়োরোপের নবীন নবীন বিজ্ঞানালোক ভারতের নরনারীর চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছে, বহ্নির অভিমুখে ধাবিত পতঙ্গের ন্যায় সকলেই আত্মহারা হইয়া তাহার দিকে ছুটিতেছে। কোন্‌টী হেয়, কোন্‌টী উপাদেয়, তাহার বিবেক করিতে সমর্থ হইতেছে না। কিন্তু ভারতের এবংবিধ দুঃসময়ে অতি অল্পসংখ্যক স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকেও প্রাচীন সদাচার-রক্ষণে যত্নবান দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা মায়ামরীচিকার মধ্যে

হইলে বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহার দ্বারা চিত্ত-বিশুদ্ধি লাভ করে, বিশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞান উদিত হয়। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে কর্ম্মফলদাতা ভগবানে পরাপ্রীতি অর্থাৎ ভক্তি হইয়া থাকে, এই ভক্তিই আবার জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, সেই জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির কারণ। সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটীরই আবশ্যকতা আছে।

অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের এই প্রথম গ্রন্থ, সুতরাং এইরূপ দুরূহ বিষয়ে যদি কোনরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে, তাহা না ধরিয়া প্রীতির চক্ষে দেখা উচিত। তবে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যেন বিরত না হন। তিনি শাস্ত্ররহস্য সম্যক্‌রূপে অবগত হইবার জন্য বিশেরূপ চেষ্টা করুন, তাহা হইলে আরও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। আমরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি কুলোচিত ধর্ম্মে আস্থাবান হউন এবং নানাবিধ নবীনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করুন।

বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিয়া বর্ত্তমান বর্ষে "বঙ্গসাহিত্য সারস্বত মহামণ্ডল" হইতে (বিদ্যাভূষণ) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমিতি যোগ্যপাত্রেই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল সরস্বতীর সেবার দ্বারা উপাধির সদ্ব্যবহার করুন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা। ইতি—

ভবতারিণী সংস্কৃত বিদ্যালয়।
৬নং, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মা।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গ্রন্থকারের নিবেদন।

মিথ্যা অভিনয়ে মিথ্যা নাটকে যেমন আমাদের মন ব্যস্ত, সেইরূপ বাহিরের রূপ বাহিরের সৌন্দর্য্য ও দুঃখ কষ্ট লইয়া আমরা ডুবিয়া আছি। আজকাল নাটক নভেল খই-মুড়কির ন্যায় লোকে সাগ্রহে গ্রহণ করে, কিন্তু কোন শাস্ত্রের কথা শুনিলে দশহাত পিছাইয়া যায়। তথাপি সকলেরই এক একটী সময় আসে যখন দুঃখ-কষ্ট-ভারে নিষ্পেষিত হইয়া মানুষ দুঃখ কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত ভগবানের মুখাপেক্ষী হয় এবং প্রার্থনা করে যাহাতে তাহার দুঃখ কষ্ট অচিরে দূর হয়। দুঃখ কষ্টের ক্ষণিক লাঘব হইলেই সে আবার দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত হয়। মানুষ কি সত্যসত্যই দুঃখ কষ্টের বরাবর নিবৃত্তির জন্য প্রার্থনা বা চেষ্টা করে? তাহা হইলে সে সত্য তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া কাম্য বস্তুর জন্য দৌড়াদৌড়ি করিত না। সৃষ্টির আবির্ভাব হইতেই 'কিরূপে দুঃখ দূর হয়' এই একই প্রশ্ন মানুষকে চঞ্চল করিতেছে। মহাপুরুষগণ সেই সত্যের সন্ধান পাইয়া আপনারা মুক্ত হইয়াছেন এবং আমাদিগের জন্যও মুক্ত হইবার পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা এত ভ্রান্ত—এত অন্ধ যে, কাম্য বস্তুর জন্য লালায়িত হইয়া দৌড়াদৌড়ি করি, কিন্তু যে সত্য আমাদের দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার করে, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করি না। কেহ কেহ উহা বৃদ্ধকালের জন্য তুলিয়া রাখেন, কিন্তু কখন্ যে তিনি বৃদ্ধকালে উপনীত হন তাহা জানিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ আপন আপন কর্ম্মে এত ব্যস্ত যে সময়াভাব বলিয়া সত্যলাভের চেষ্টাও করেন না এবং সময়েরও কখন সুযোগ পান না। কেহ কেহ আপন

আপন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সত্যলাভের চেষ্টা নাস্তিকের প্রয়াস বলিয়া উড়াইয়া দেন, সুতরাং তাঁহারা লৌকিক ধর্ম্মেই চিরকাল আবদ্ধ থাকেন। সত্যলাভে সকলেরই সমান অধিকার আছে। পাপী হউন বা পুণ্যবান হউন, দরিদ্র হউন বা ধনবান হউন, হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, স্ত্রীলোক হউন বা পুরুষ হউন, সকলেই, চেষ্টা করিলে, আপন আপন অবস্থানুযায়ী, অল্পকালে বা দীর্ঘকালে, সত্যলাভ করিতে পারেন। সকল ধর্ম্মেই সত্যলাভ করিবার পথ আছে, কিন্তু সত্য কোন ধর্ম্মে আবদ্ধ নহে। যাহাতে সত্যলিপ্সু ব্যক্তি আপনার গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া আপনার কল্যাণসাধন করিতে পারেন, তাহাই দেখান এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। সত্যলাভ করিতে দেশ, কাল বা অন্য কোনও বাধা থাকিতে পারে না। সুদূর অতীত হইতে মুনি-ঋষিদিগের মুখ দিয়া মহাসত্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে, 'তোমাদের কল্যাণ তোমাদের হাতে, তোমাদের মূঢ়তা ও অজ্ঞানতা ব্যতীত তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার অপর কোন বাধা নাই—সময় থাকিতে তোমাদের কল্যাণ সাধন কর সিদ্ধ হইবে।'

শাস্ত্রীয় বিষয় লেখা ইহাই আমার প্রথম প্রয়াস। ইহা যে একেবারে নির্দ্দোষ বা নির্ভুল হইয়াছে তাহা বলিতে স্পর্দ্ধা করি না। তবে শাস্ত্রের কল্যাণকারী ও সুগভীর তত্ত্ব যাহা আমাদের পক্ষে হিতকর ও বহুবার বলিলেও কখন পুরাতন হয় না তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যাহাতে সর্ব্বসাধারণে শাস্ত্রতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এরূপ সরলভাষায় লেখা যে কিরূপ দুরূহ তাহা বলা যায় না—জানি না এই চেষ্টায় কতদূর সফল হইয়াছি। আশা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ পুস্তকের ভ্রম সংশোধন করিয়া পুস্তকনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইবেন। উহাই আমার কামনা ও তাঁহাদের সিদ্ধিই আমার পুরস্কার।

পরিশেষে পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয় আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, স্থানে স্থানে ভ্রম সংশোধন করিয়া যে একটী ভূমিকারূপ আশীর্ব্বাদে ভূষিত করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি—তাঁহার আশীর্ব্বাদের যোগ্য হইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু উদয়কুমার দাস মহাশয়ও পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করাতে তাঁহার উপদেশমত স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করি, এজন্য তাঁহার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। সর্ব্বোপরি যাঁহার সংস্পর্শে ও উপদেশে আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি, এবং যাঁহার অমৃতবাণী স্থানে স্থানে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি সেই মহাত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হই। পঙ্গুও অপরকে আশ্রয় করিয়া পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস করে—আমি ক্ষুদ্র ও অসমর্থ হইলেও তিনিই আমার ভরসা। অলমতি বিস্তারেণ।

১০এ, শ্রীনাথ দাসের লেন,
কলিকাতা।

শ্রীভুবনমোহন দাস।

সূচীপত্র।

—ঃ০ঃ—

———

আত্মোন্নতি।

দুঃখ।

দুঃখ যে কি তাহা সকলেই জানেন, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ভিখারী হইতে রাজা পর্য্যন্ত শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই দুঃখের আস্বাদ পাইয়াছেন। দুঃখ নানা রকমের; কেহ বা এক মুঠা ভাতের জন্য দুঃখিত, কেহ বা গাড়ী ঘোড়া চড়িতে পায় না বলিয়া দুঃখিত, আবার কেহ বা সোনা রূপার উপর গড়াইয়াও দারা সুতের নিমিত্ত দুঃখিত। কাহারও গহনা চুরি গেল বলিয়া দুঃখিত, কাহারও অকারণে একটী পয়সা হারাইল বলিয়া দুঃখিত, কাহারও আত্মীয় কুটুম্ব দারা সুত কালচক্রে ইহলোক পরিত্যাগ করিল বলিয়া দুঃখিত। কেহ বা সামান্য স্ফোটকে কষ্ট পাইতেছে, আবার কেহ বা বিসূচিকা রোগে মৃত্যু-যাতনায় ছট্ ফট্ করিতেছে। দুঃখের বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, কারণ, দুঃখের সংখ্যার সীমা নাই। আর্য্যঋষিগণ সকল দুঃখকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—যেমন আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই রকমের, যথা শারীরিক ও মানসিক। পূর্ব্বকথিত দুঃখগুলি প্রায় ইহারই অন্তর্গত। যাহা আমাকৃত নহে বা আমার ইচ্ছায় উৎপন্ন হয় নাই, এবং অন্য কোন প্রাণী হইতে উৎপন্ন তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে; যেমন পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ

কীট-পতঙ্গ বা বন্যজন্তু একজনকে দংশন করিল। যাহা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় নাই, যে দুঃখ দৈবকৃত তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে; যেমন একজন নিশ্চিন্তে আপন ঘরে আপন পুত্রকন্যার সহিত সুখে কালযাপন করিতেছে, হঠাৎ প্রাচীর ভেদ করিয়া কড়্ কড়্ শব্দে বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

এই সকল দুঃখের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাহার না ইচ্ছা যায় যে দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। রোগের যেমন পুস্তক, ডাক্তার বা ঔষধ আছে, দুঃখেরও সেইরূপ শাস্ত্র, চিকিৎসক ও দুঃখ-নিরাকরণের উপায় আছে। এবং চিকিৎসকের মধ্যে যেমন হাতুড়ে হইতে বিচক্ষণ ডাক্তার আছে তেমনি দুঃখ দূর করিবার জন্য সাধারণ ব্যক্তি ও মুনিগণেরও নানামত আছে। কেহ কেহ বলেন আধ্যাত্মিক বা শারীরিক দুঃখ ঔষধ খাইলেই সারে, আধিভৌতিক দুঃখ নির্জ্জনে বাস করিলে সারে এবং আধিদৈবিক দুঃখ মাদুলী প্রভৃতি ধারণ করিলে সারে; কিন্তু সে সারাত চিরস্থায়ী হয় না। তাহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে,—ক্ষুধা, তৃষ্ণা যেমন নিত্য নিত্য আহার ও পানের দ্বারা দূর হয়, সেইরূপ নিত্য পার্থিব সুখকর বিষয়ের উপভোগ দ্বারাই দুঃখ নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এইরূপ দুঃখ নিবৃত্তিও চিরকালের নিমিত্ত স্থায়ী হয় না। যতই কেন বিষয় সম্পদ লাভ হউক না, কেহ কখনও এইরূপ উপায়ে রোগ, শোক, জরা, মরণ হইতে নিষ্কৃতি পায় না। এই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ একেবারে উপশম হওয়ার নাম পরমপুরুষার্থ (*) ইহার জন্য মহামতি নারদ প্রভৃতি আর্য্য

---

* অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যান্তনিবৃত্তিরত্যান্ত পুরুষার্থঃ।

সাংখ্য প্রথম সূত্র।

ঋষিগণ ও বুদ্ধদেব প্রভৃতি ত্যাগিগণ আপনাদিগের সমস্ত বিষয় বৈভব জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর অভ্যাসবলে ইহলোকেই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন এবং যাহাতে আপামর সর্ব্বসাধারণ দুঃখ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পায়, তাহার উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন।

আমরা প্রথমে আধ্যাত্মিক দুঃখের বিষয়ে দু'চারিটী কথা বলিব। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক। তন্মধ্যে শারীরিক দুঃখ লইয়া অধিকাংশ লোক ব্যস্ত। শরীর ব্যাধির মন্দির, শরীরে একটা না একটা ব্যাধি লাগিয়া আছে, তাহার উপর মানসিক দুঃখ অহরহঃ উহাকে তাড়াইয়া বেড়ায়। শরীরের সহিত মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শরীরের ফূর্ত্তি না হইলে মনের স্ফূর্ত্তি হয় না, মনের স্ফূর্ত্তি না হইলে শরীরের স্ফূর্ত্তি হয় না। সংসারে ব্যাধি নাই, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—সামান্য স্ফোটক হইতে বিসূচিকা মহামারী পর্য্যন্ত মানবের চিরসহচর—কোথায়ও ইহার অভাব নাই। ইহা দরিদ্রের গৃহে যেরূপ, ধনবানের গৃহেও সেইরূপ আশ্রয় গ্রহণ করে। রোগ যেমন নানারূপ, রোগের চিকিৎসাও নানারূপ, যেমন এলাহপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ইউনিপ্যাথি, কবিরাজি, হাকিমি ইত্যাদি। সকল চিকিৎসাতেই ঔষধ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু পথ্য বা অন্যান্য নিয়ম প্রায় একরূপ। কেবল ঔষধ খাইলেই রোগ সারে না, পথ্য ও অন্যান্য নিয়ম আরোগ্যের বিশেষ সহায়তা করে। আমরা ঔষধ খাইতে কাহাকে নিষেধ করি না, ঔষধ ব্যতীত, শাস্ত্রীয় মতে রোগ দূর করিবার আরও যে অন্য উপায় আছে তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য।

সুস্থ শরীর কাহাকে বলে? যে শরীরে ব্যাধি নাই বা শরীর পালনে বা জীবন ইচ্ছামত চালিত করিবার কোন বাধা নাই। কখনও আমার হাত অবশ হইতেছে, কখনও পা অবশ হইতেছে, চক্ষুঃ দৃষ্টিহীন হইতেছে, কর্ণ

বধির হইতেছে, কখনও মন সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছে না,—এ সকলই ব্যাধির লক্ষণ। আমাদের শরীর একটী কারখানার মত। একই ইঞ্জিনে যেমন কারখানার নানারূপ যন্ত্র বা কল চালিত হয়, কোন একটা কল খারাপ হইলেও যেমন কারখানার অন্যান্য কল চলিতে থাকে, তেমনি আমাদের শরীরে একটা হাত বা একটা পা অবশ হইলেও, প্রাণ থাকিলে, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল কাজ করিতে থাকে। কোন একটা কলে ঢিল ফেলিয়া দেখ, ইঞ্জিন চলিলেও ঐ কলটা বন্ধ হইয়া যায়, আবার ঢিল সরাইয়া লইলে কলটা আপনি চলিতে থাকে। সেইরূপ এই শরীর যে সকল নিয়মে চলিতেছে তাহাতে কোনরূপ বাধা দিলেই ব্যাধি উৎপন্ন হয়, আবার নিয়মমত চলিলে এবং বাধা দূর হইলে ব্যাধি দূর হইবে।

ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে বা ভগবানের কোন কার্য্যে বাধা দান করিলে, তাহার ফল দুঃখভোগ করিতে হইবে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমরা সময় সময় ভগবানের আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দুঃখ ভোগ করি। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে যেমন আমরা ঘরে আলোক-রশ্মি আসিতে না দিবার জন্য গৃহের দুয়ার রুদ্ধ করি, সেইরূপ যাহা অনিত্য, যাহা অচেতন, যাহা আমাদের দুঃখে লইয়া যায় তাহার জন্য আমরা সচ্চিদানন্দের আগমনে বাধার ন্যায় হৃদয়-দুয়ার রুদ্ধ করি। আবার দেখ, ঝরণার জল কেমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। এই ঝরণার জল যে সকল পুষ্করণী পূর্ণ করিয়া ধাবিত হয় সেই সকল পুষ্করণীর জলও স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। এক্ষণে ঐ ঝরণার জল কোনরূপে বাধা প্রাপ্ত হইয়া যদি ঐ পুষ্করণী দিয়া না যায় তাহা হইলে সেই পুষ্করণীর জল যেরূপ শুকাইয়া যায় ও দুর্গন্ধ হয়, সেইরূপ সর্ব্ব-জীবের অন্তর বহিয়া যে অসীম অকলঙ্ক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যে সকল প্রাণী সেই স্রোতে অবগাহন করে, তাহারা ঐ আনন্দের স্বরূপ উপভোগ করে এবং যাহারা আপনাদিগের অন্তর রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহারা

সে আনন্দের আস্বাদ না পাইয়া নানারূপ দুঃখ ভোগ করে। এই অসীম কারণ যেমন কখনও অনাবিল বা অপরিষ্কার হয় না, সেইরূপ জীবাত্মা আপনাকে মলিন না করিলে কখনও মলিনত্ব প্রাপ্ত হয় না। আসক্তি-শূন্যতাই যখন ভগবানের স্বরূপ—তখন আসক্তি পোষণ করিলে হৃদয়-দুয়ার রুদ্ধ করা হয় না কি? বিজ্ঞানে এক্ষণে এইরূপ প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রত্যেক আসক্তিই শরীরে একটা না একটা রোগ আনয়ন করে। রাগ, হিংসা, ঘৃণা হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহার কারণ পরীক্ষা করিতে গিয়া একজন বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছেন, বিভিন্ন আসক্তি কিরূপে শরীরের পুষ্টিকারী রসগুলিকে বিভিন্নরূপে বিকৃত করে। তিনি একটী উত্তপ্ত গৃহে নানাপ্রকৃতির লোক সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে বলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যেকের শরীরে যে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা যায় তাহার এক এক ফোটা লইয়া, কে কিরূপ প্রকৃতির লোক বলিয়া দিলে, আগন্তুকেরা অতীব আশ্চর্য্য হইয়া যান। * যে সকল রস আমাদের শরীর পুষ্টি করে, রাগ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসক্তি সকল ঐ রসগুলিকে বিষাক্ত করিয়া দেয় এবং তাহাতে রসগুলি শরীরের পুষ্টি সাধন না করিয়া ক্ষয় সাধন করিতে থাকে। এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে জননী তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতে করাইতে রাগে উত্তেজিত হইয়া উঠিলে ঐ শিশু একঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, রাগে জননীর দুগ্ধ এতই বিষাক্ত হইয়া যায়। আবার দুঃখ ও দীর্ঘকালস্থায়ী হিংসা মানুষকে অনেক সময় পাগল করিয়াছে। নীচাসক্তি যেরূপ শরীরের রস বিকৃত করিয়া শরীরে রোগ আনয়ন করে, ভালবাসা, সন্তোষ প্রভৃতি উচ্চাসক্তি সেইরূপ দূষিত রসগুলির দোষ কাটাইয়া দেয় এবং শরীর পুষ্ট করে।

---

*In tune with the Infinite.

ভয় ও দুশ্চিন্তা যেরূপ শরীরের অপকার করে, আশা ও সন্তোষ সেইরূপ শরীর হইতে রোগ দূর করে ও শরীর পুষ্ট করে। অনেক সময় দেখা যায়, চিকিৎসক রোগীকে দেখিতে গেলেন, অসুখ সারিবে বা সারিয়া গিয়াছে বলিয়া কোন ঔষধ না দিয়াই চলিয়া গেলেন, রোগীও সঙ্গে সঙ্গে নীরোগ হইয়া উঠে। আশা এইরূপ অনেক সময় রোগ দূর করিতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের পথে ঘাটে সাধুপুরুষেরা অনেক সময় রোগীর গায়ে হাত বুলাইয়া রোগ দূর করেন, তাহা কি আশা বা বিশ্বাসের গুণে নহে? যীশুখৃষ্টও অনেক লোকের ব্যাধি দূর করিয়াছিলেন কিন্তু প্রায়ই তিনি রোগীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুমি বিশ্বাস কর কি?" রোগী বিশ্বাস করিলে তিনি রোগীর শরীরে যে সকল পুষ্টিকারী রস আছে তাহা জাগাইবার চেষ্টা করিতেন মাত্র, ইহাতে রোগীর সাহায্যের আবশ্যক। রোগী বিশ্বাস করিলে সহজেই রোগমুক্ত হয়। তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়াতে ভূরি ভূরি ব্যাধিমুক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। রোগী অহোরাত্র ভগবানকে ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে ভগবান তাহার রোগ দূর করিবেন। এই বিশ্বাসে ও ভগবানের করুণায় সে শীঘ্র রোগমুক্ত হয়।

ভয় যে কেবল শরীরের অপকার করে তাহা নহে, ভয় ভয়ের বস্তুকে ডাকিয়া আনে। শাস্ত্রকারেরা বলেন—স্বজাতীয় বস্তু স্বজাতীয়ের উত্তেজক, উদ্দীপক ও পরিপূরক।* ভয় যেমন ভয়কে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভালবাসা ভালবাসাকে আকর্ষণ করে, রোগ রোগকে আকর্ষণ করে, স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যকে আকর্ষণ করে। শান্তলোকের কাছে যাও, শান্তি পাইবে, দুঃখ-চিন্তা-ভারাক্রান্ত লোকের কাছে যাও, দুঃখ-চিন্তার ভাগী হইবে। একই

*Like attracts Like.

বস্তু আবার বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী লোককে সুখী ও দুঃখী করে। মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"রূপযৌবনসম্পন্না একই স্ত্রী স্বামীকে সুখী করে এবং সেই সময় সপত্নীকে দুঃখিনী করে এবং অন্যকে মুগ্ধ করে, কারণ তাহাদের মন ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন।" ইহা হইতে বুঝা যায়, কোন বস্তু নির্গুণ হইলেও, আমাদের মন যে ভাব পোষণ করে তাহাই ডাকিয়া আনে। আমরা যাহা ভয় করি তাহাই আমাদের শরীরে নিমন্ত্রণ করি; আমরা যে রোগকে ভয় করিব তাহাই আমাদের শরীরে উপস্থিত হইবে। ভয় যেমন ভয়ের বস্তুকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ চিন্তা আপনার রূপানুযায়ী চিন্তাকে আকর্ষণ করে। ভয়েই ভাবনা কর বা স্বেচ্ছায় ভাবনা কর, যেমন ভাবিবে তেমনই হইবে। আরশুলা কাঁচ-পোকাকে ভয়ানক ভয় করে; যাহারা কাঁচপোকাকে অনবরত ভাবে, তাহারা ঐ বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাঁচপোকা হইয়া যায়। মানুষ যে ব্যাধির ভয়ে ব্যাধি-চিন্তায় ঐ ব্যাধি আকর্ষণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ বিষয়ে প্লেগের একটি গল্প আছে। একদা প্লেগের সহিত একটি সাধুর দেখা হইলে সাধু জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি কোথায় যাইতেছ?" প্লেগ উত্তর করিল, –"৫০০০ লোকের আবশ্যক বলিয়া বোম্বাই যাইতেছি।" প্লেগ প্রত্যাগমন করিবার সময় ঐ সাধুর সহিত পুনরায় দেখা হইলে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ৫০০০ লোক লইবে বলিয়াছিলে, ৫০০০০ সঙ্গে কেন?" প্লেগ উত্তর করিল,—"আমি ৫০০০ লোকই লইয়াছি, অবশিষ্ট লোক ভয়ে আমার সহিত আসিয়াছে।" রোগের কথা ভাবিয়া আমরা কখনও নীরোগ হইতে পারি না। কুচিন্তা কুচিন্তার জন্মদাতা, সুচিন্তা সুচিন্তার জন্মদাতা। তুমি যাহার সঙ্গী, শরীর ও মন তাহার সঙ্গী হইবে। তবে কেন ভাবনা—তুমি ঈশ্বরের স্বরূপ; ভগবান যেরূপ মঙ্গলময় তুমিও সেইরূপ মঙ্গলময়; ভগবানের ইচ্ছায় যেরূপ সকলি সম্ভব, তোমার ইচ্ছায়ও

তেমনি সকলি সম্ভব। মনকে নিশ্চিন্ত কর এবং নির্জ্জনে এই চিন্তা কর যে, আমিও ভগবানের স্বরূপ, সচ্চিদানন্দ আমার স্বভাব, সচ্চিদানন্দ আত্মার কোন অসুখ থাকিতে পারে না। এইরূপ বার বার চিন্তা করিলেই রোগী অচিরে নীরোগ হইবে। ঔষধ বাধা দূর করিতে পারে, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু মন বরাবরের জন্য রোগমুক্ত করে। মনই শরীরকে উন্নত করে, মন সুস্থ হইলেই শরীর সুস্থ হয়।

সুখ।

সুখ কাহাকে বলে? যে যাহা চায় তাহাই পাইলে কি সে সুখী হইবে? তাহা হইলে যে ধনপ্রার্থী সে ধন পাইলে সুখী হয় না কেন? যে যশঃপ্রার্থী সে যশ পাইলে সুখী হয় না কেন? যে পুত্র চায়, সে পুত্র পাইলে সুখী হয় না কেন? যাহার যাহা নাই, সে ভাবে সে সেই বস্তু পাইলে সুখী হইবে। সকলেই সুখের অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কিন্তু দুঃখও সকলের পিছু পিছু ছুটিতেছে। সুখ যে কোন্‌টা, সুখ যে কত রকমের তাহা কেহ ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। কেহ ভাবে অর্থই সুখের আকর, কেহ ভাবে ধর্ম্ম,—আবার কেহ ভাবে সুন্দরী রমণী পাইলেই সুখী হইবে। সুখ যতই আপাতমনোরম হউক, দুঃখের হাত এড়াইতে না পারিলে প্রকৃত সুখ নাই। দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি অর্থাৎ যখন দুঃখ আর আদৌ আসিবে না, তাহাই পুরুষার্থ—তাহাই সুখ।

সাধারণে যাহাকে সুখ বলে তাহার সীমা কোথায়? আমাদের স্বভাব—আমরা যাহা না পারি, তাহা করিতে কেহ সক্ষম হইলে, তাহাদের দেবতা মনে করি। তাহারা যে প্রাকৃতিক নিয়ম সাহায্যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখি না। আমরা জলের উপর দাঁড়াইয়া ডুবিয়া যাইব বুঝিয়া, যদি কেহ জলের উপর হাঁটিয়া যাইতেছি বলে, তাহা বিশ্বাস করি না বা তাহাকে দেবতা আখ্যা দেই। সেইরূপ যদি কাহাকেও শূন্যে অবস্থান করিতে দেখি, তাহাও আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। ভানুমতীর ভোজবাজী বোধ করি অনেকে দেখিয়া থাকিবেন।

একজন লোক শরীরের মধ্যে বায়ু পুরিয়া শরীর লঘু করিল এবং একটি বংশদণ্ডের উপর বসিলে, তাহার চেলা আস্তে আস্তে ঐ বংশদণ্ডটী সরাইয়া লইল, তখন বাজীকর শূন্যে অবস্থান করিতে লাগিল। একই উপায়ে চারিজন লোক একটী কাপড়ের চারিটী খুঁট ধরিলে, বাজীকর অনায়াসে ঐ কাপড়ের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। ইহারা যে জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলেন, সকল বিষয়েই যত্নের আতিশয্য থাকিলে সর্ব্বদা—সর্ব্বত্র—সকল প্রকার অভিলষিতই সফল হইয়া থাকে।* মানুষ ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে করিতে কঠোর অধ্যবসায়ে এককালে ভগবানের অসীম ক্ষমতা লাভ করিতে পারে।

সাধারণ লোকের মতে যে সুখ তাহার বাধা কোথায়? প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, বাহ্য-প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ থাকাতে প্রকৃতি অনুসারে মানুষের স্বভাব গঠিত হয়। আপনার ছেলে খারাপ হইলে অনেকে পাড়া-পড়শীর দোষ দেয়, ইহা একেবারেই ভুল। প্রকৃতির সহিত বাহ্যসম্বন্ধ মানুষের দর্পণস্বরূপ। † আপনি খারাপ হইলে মানুষ বাহ্য-প্রকৃতি হইতে খারাপ জিনিষ বাছিয়া লয়, ভাল হইলে ভালই বাছিয়া লইবে। কারণ প্রকৃতি ভাল মন্দ উভয় লইয়াই গঠিত। মানুষ আপনি উন্নত হইলে বাহ্য প্রকৃতিকে সহজেই আয়ত্ত করিতে পারে। আপন গুণে প্রাকৃতিক অবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন করা যায় যে, সেই প্রকৃতি তাহার ভৃত্যস্বরূপ যখন যে কাজ বলিবে তাহাই করিবে। আরও একরূপ বাধার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। বাপ-ঠাকুরদাদার

* যোগবাশিষ্ঠ—৪৩২।

† Environments are but his looking glass.

দোষ যেন বংশপরম্পরায় বিদ্যমান থাকে। আমরা যদি চিন্তা করি এসকল দোষ শোধরাইবার নয় তাহা হইলে উহা কখনও শোধরাইবে না। আবার যদি চিন্তা করি আমাদের স্বরূপ কি এবং আমরা ইচ্ছা করিলে অসীম ক্ষমতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে ধীরে ধীরে বংশানুগত দোষগুলি কাটিয়া যায়। আমরা যেমন বাপ-ঠাকুরদাদার দোষের উত্তরাধিকারী, সেইরূপ বাপ-ঠাকুরদাদা যে সর্ব্বগুণবান্ ভগবান হইতে উৎপন্ন তাঁহারও গুণের উত্তরাধিকারী।* তবে আমরা সেই ভগবানের ক্ষমতা লাভ করিতে পারিব না কেন?

কেহ কেহ বলেন, মানুষের চেষ্টা বিফল, যাহা হইবার তাহা হইবেই—দৈব কখনও বিফল হয় না। এই দলের মধ্যেও নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ন্যায় গুটিকতক লোক আছেন, যাঁহারা এই বিশ্বাসে নির্ভয়হৃদয়ে অসমসাহসিক কার্য্য করেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতীব বিরল। অধিকাংশ লোক আলস্য ভালবাসে বলিয়া ইহা ভাণ করে মাত্র। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলেন, "দৈব মন্দমতি মূঢ়গণের কল্পিত,—প্রকৃতপক্ষে তাহা অলীক,...... যে দুর্ম্মতি মূঢ়ব্যক্তি অনুমানসিদ্ধ দৈব মানিয়া থাকে তাহার, অগ্নিতেও দৈবাৎ দগ্ধ হইবে না, এই স্থির করিয়া, অগ্নিতে পড়া উচিত।" আমরা যদি দৈববলে দিনকতক বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে ঐ দিনকতক না খাইলেও চলে, উপার্জ্জন না করিলেও চলে। দৈববাদীরা যখনই কার্য্যের কোন কারণ দেখিতে পায় না তখনিই বলিয়া উঠে—'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'।

---

*Back of thy parents, and grandparents lies,
The Great Eternal Will! That too is thine Inheritance
Strong beautiful, divine'—Trine.

আবার যাঁহারা পুরুষকার মানেন তাঁহারা বলেন, সকলেই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল; সুতরাং মানুষ যেমন কর্ম্ম করিবে তেমনি ফলভোগ করিবে। নিয়তি বলিয়া কিছুই নাই। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ মানিলে দৈব ও পুরুষকারের বিবাদ সহজে মীমাংসা হইয়া যায় এবং উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত। মানুষ কারণ বাছিয়া লয় এবং যেরূপ ইচ্ছা কারণ বাছিতে পারে। ইহাই পুরুষকার। কিন্তু মানুষ যে কর্ম্ম করে সেই কারণের ফল যে কার্য্যফল হয় তাহা বদলাইতে পারে না, তাহা ভোগ করিতে হইবেই. এ জন্মে না হয় জন্মজন্মান্তরে ভোগ করিতে হইবে। ইহাই দৈব—ইহাই নিয়তি। যে পর্য্যন্ত মানুষ ইচ্ছানুযায়ী কারণ মনোনীত করে ততক্ষণ সে পুরুষকার অবলম্বন করে এবং কারণ কার্য্যে পরিণত হইলেই মানুষ দৈবের অধীন হইয়া যায়, কারণ, ইচ্ছাসত্ত্বেও সে ফলভোগ বা নিয়তির হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। এই মহাসত্য স্বীকার করিলে মানুষের আর কোন খেদ থাকে না; মানুষ শত্রুকেও ভালবাসিতে পারে, অসহনীয় দুঃখও সহ্য করিতে পারে। সে তখন বোঝে, তাহার কর্ম্মফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে, তাহার শত্রু তাহার আপন কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সে যে বাজারে ধার করিয়াছে, তাহা যতক্ষণ না শোধ হয় ততক্ষণ তাহাকে ফলভোগ করিতে হইবে।

এক্ষণে সুখের উপায় কি? সুখভোগেও বিষয়-বাসনা তৃপ্ত না হইয়া ঐ বাসনা দিন দিন বর্দ্ধিত হয়।

> ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

(মহাভারত, আ ৭৫),

অর্থাৎ সুখের উপভোগে বিষয়-বাসনার তৃপ্তি না হইয়া হবন-দ্রব্যের দ্বারা অগ্নির ন্যায় বিষয়ের উপভোগে বিষয়-বাসনা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সুখের

পূর্ণতা কখনও হয় না, সুতরাং জগতের প্রত্যেক লোক মনে করে 'আমি দুঃখী'। এজন্য তৃষ্ণা বা বাসনার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ব্যতীত সত্য ও নিত্য সুখ লাভ হইতে পারে না। ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত।

বাসনা মানসিক ধর্ম্ম। আমরা চক্ষে যাহা দেখি বা কর্ণে যাহা শুনি তাহার সুখানুভূতি শেষে মনের উপর নির্ভর করে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, 'চক্ষুঃ পশ্যতি রূপানি মনসা ন তু চক্ষুষা'* অর্থাৎ দেখিবার কাজ কেবল চোখের দ্বারা হয় না, তাহাতে মনের সাহায্য আবশ্যক হয়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের সম্মুখ দিয়া একজন পরিচিত লোক চলিয়া গেল, কিন্তু আমরা অন্যমনস্ক থাকাতে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ অন্যমনস্ক থাকাতে সময় সময় ঘরের মধ্যে ঢং ঢং করিয়া ঘড়ী বাজিয়া গেল অথচ আমরা শুনিতে পাই না। শ্রুতি বলেন :—

অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শনং
অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষং।

(বৃহদারণ্যক ১-৫-৩)

অর্থাৎ আমার মন অন্যমনস্ক হওয়াতে দেখিতে পাই নাই, আমার মন অন্যমনস্ক বলিয়া শুনিতে পাই নাই। সুতরাং মনকে সংযত করিলে সুখ দুঃখের অনুভবও সংযত করা যায়। তাই মনু সুখদুঃখের এইরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন :—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

(মনু ৪—১৬০)

অর্থাৎ যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা কিছু আপনার আয়ত্ত

---

* মহাভারত শা ৩১১।

তাহাই সুখ—ইহাই সুখদুঃখের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। মনোজয় করিতে পারিলেই সকল সুখ আয়ত্ত করা যায়, ইহার জন্য সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিবার কোন কারণ নাই। বশিষ্ঠদেব ভগবান রামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন :—'যাঁহারা চিত্ত বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র স্বীয় নগরীর অধিপতি হইয়া যাদৃশ সুখ প্রাপ্ত হন, মৃণ্ময় বিশাল পুরীস্থিত রাজাগণ তাদৃশ সুখী হইতে পারেন না।......মনোজয় ত আর কিছুই নহে, কেবল স্ব স্ব ভাবে অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি মাত্র।' আমাদের আর্য্য ঋষিগণ কিরূপে মন জয় করা যায় এবিষয়ে যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটী পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বিবৃত করিব।

জ্ঞান।

জ্ঞানের মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় আত্মজ্ঞান। আত্মা বা ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বলে। আমি কে, কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় যাইব, ভগবান্ কে, কি করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, কিরূপে দুঃখকষ্টের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, এই সকল প্রশ্নের জবাব একই পথে লইয়া যায়। যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে ঐ প্রশ্ন যখন মানুষকে চঞ্চল করে, তখন তাঁহারা উহার মীমাংসার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, আপনাদিগের মনকে শান্ত করিয়া সেই জবাবের প্রতীক্ষা করেন। তখন যে সকল অশরীরী বাণী ধ্বনিত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বসংশয় ছেদন করে তাহাই হিন্দুশাস্ত্রের শ্রুতি নামে খ্যাত এবং গুরু শিষ্য সম্বন্ধ দিয়া এখনও পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান্‌কে বা তাঁহার ক্রিয়া-কলাপের শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম যতই জানিতে পারা যায়, ততই তাঁহার প্রতি আসক্তি আসে। মানুষ জন্মিতেছে, মরিতেছে, দিনের পর রাত্রি হইতেছে, ইহাও তাঁহারই নিয়ম। সূর্য্য আলোক দান করিতেছে, যাবতীয় বস্তুকে নানাবিধ রঙ্গে চিত্রিত করিতেছে, আবার সেই সূর্য্যই পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহাদি লইয়া অনন্তব্যোমে নিয়মিত পথে ঘুরিতেছে, ইহাও তাঁহার নিয়ম। সূর্য্যের ন্যায় কত নক্ষত্র, কেহ বড়, কেহ ছোট, সূর্য্যের ন্যায় গ্রহ-উপগ্রহ লইয়া নিয়মিত পথে ঘুরিতেছে অথচ কাহারও সহিত কাহারও সংঘর্ষ হয় না, ইহাও তাঁহার নিয়ম। দুইখানি রেলগাড়ী যাহাতে কলিসন্ না হয়, তাহার জন্য মানুষকে কত মাথা ঘামাইতে হয়, কত লোক রাখিতে হয়, কত অর্থব্যয় করিতে হয়, কিন্তু এই অনন্ত ব্যোমে যে কোটী কোটী

গ্রহ-নক্ষত্র বিদ্যুদ্বেগে আপন আপন পথে ঘুরিতেছে, ইহাদের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই কি? ভগবান আছেন তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। জানিবার আবশ্যক—কি করিয়া দুঃখের হাত হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়—কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায় অর্থাৎ ভগবানের নিয়ম ও ভগবান-লাভের উপায়। তাহাও তিনি মুনি-ঋষিদিগের মুখ দিয়া বহুকাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে দুই একটী নিয়ম একে একে আলোচনা করা যাক।

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—একথা আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেহ এ নিয়ম মানিয়া চলে না। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় প্রত্যক্ষ দেখে বলিয়া আগুনে কেহ হাত দেয় না। যে কার্য্য প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার জন্য কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না। এ জীবন দু'দিনের বৈত নয় বলিয়া যে কামনা পূরণের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় সে, তাহার আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিতেই, ইহলোক ত্যাগ করে। ভগবানকে বা ভগবানের নিয়ম মানিলে কেহই এরূপ ব্যভিচারী জীবন লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। কার্য্য করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। কারণ বিনা কার্য্য থাকিতে পারে না। ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, 'কারণেন বিনা কার্য্যং ন কদাচন বিদ্যতে'। * আলোকের ছায়ার ন্যায় কার্য্য কারণের সাথে সাথে ঘুরিতে থাকে। কার্য্য করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহা আজ না হয় দুদিন পরে প্রকাশ হয়। অনাদি ভগবানের সহিত তুলনায় আমাদের জীবন কতটুকু—ক্ষণিক

* যোগশিখ উপনিষৎ।

জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া লোপ পায়। আমরা এ জীবনে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাই না বলিয়া কি কারণের ফল অস্বীকার করিতে পারি? কেহ ত সকল লোককে মরিতে দেখেনি, তবে কি করিয়া বলে সকল মানুষ মরিবে? আমরা যখন দেখি রাম মরিল, শ্যাম মরিল, যাহাকেই মরিতে দেখি, উহা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় সকলকেই একদিন মরিতে হইবে। সেইরূপ আমরা অধিকাংশ স্থলে দেখি কারণের ফল কার্য্য ফলিতেছে, তবে বলিব না কেন, কারণের ফল কার্য্য অবশ্যম্ভাবী। এ নিয়ম দৃশ্য-জগতে যেরূপ কার্য্য করে, অদৃশ্য জগতেও সেইরূপ কার্য্য করে। যে মুহূর্ত্তে আমরা মন্দ চিন্তা করি, সেই মুহূর্ত্তে আমরা নিজের অনিষ্ট করি, পরেরও অনিষ্ট করি। যে যেমন ভাবে এবং কার্য্য করে, ঠিক সেইরূপেই তাহার স্বভাব গঠিত হয়। যখন এ জীবনে কোন কার্য্যের ফলভোগ করিতে না দেখি, তখন জন্মান্তর মানিতে হয়। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ মানিলেই জন্মান্তরবাদ বাধ্য হইয়া মানিতে হয়। অনেকে সচ্চরিত্র লোককে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়া ঠিক করেন এ জগতে ধর্ম্ম নাই, আবার মন্দমতি লোকে অসচ্চরিত্র লোককে সুখে জীবন যাপন করিতে দেখিয়া মন্দকার্য্যের শুভফল বলিয়া ঠিক করে। তাহারা একটুও ভাবিয়া দেখে না ভগবানের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ইহাদের জীবনেও কি সূক্ষ্ম হিসাবে কার্য্য করে। মানুষের জীবন সদাই পরিবর্ত্তনশীল, সৎলোক বরাবর সচ্চরিত্র ছিল না এবং মন্দলোকও বরাবর মন্দ ছিল না। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় দুর্দ্দান্ত বালক বৃদ্ধাবস্থায় পরম ধার্ম্মিক হইয়াছে, যখন সে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেয়, তখন তাহার বাল্যাবস্থার বা যুবাবস্থার কার্য্যের ফল কি অন্য লোকে ভোগ করিবে? আবার অতি সচ্চরিত্র লোকও কালে অধার্ম্মিক হইয়া যায়। অধার্ম্মিক লোক যে সুখভোগ করে, তাহা সে যে বাল্যাবস্থায় বা যুবাবস্থায় সুকর্ম্ম করে তাহারই ফল। এ নিয়ম শুধু

এজন্মে নয় জন্মজন্মান্তরেও সূক্ষ্ম হিসাবে কার্য্য করে। একজন জন্মান্ধ বা পঙ্গু শিশুকে দেখিলে মনে হয় কি সে এ জীবনে মন্দ কাজ করিয়াছে, ইহাই স্থির করি না কি পূর্ব্বজন্মে সে যেরূপ অসৎকার্য্য করিয়াছে এই জন্মে তাহার ফলভোগ করিতেছে।

চিন্তাশক্তি।

কার্য্য কারণ নিয়ম ব্যতীত চিন্তার অলৌকিক শক্তি বা নিয়ম আছে, তাহাই এক্ষণে বর্ণনা করিয়া ভগবানের সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিব। চিন্তা একটি মনের ধর্ম্মবিশেষ; ইহার রূপ আছে, পদার্থ আছে, সৃজন-শক্তি আছে। পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলি চিন্তা হইতে উৎপন্ন। বাড়ী তৈয়ার করিতে গেলে মনে মনে বাড়ীর নক্সা তৈয়ার করিয়া কাগজে আঁকিতে হয়; ছবি আঁকিতে গেলে প্রথম মনে ছবি আঁকিয়া লইতে হয়; কোন জিনিষ তৈয়ার করিতে গেলে জিনিষের রূপ, আকৃতি মনে ভাবিয়া লইতে হয়। যিনি প্রথম কলের গাড়ী তৈয়ার করেন, তাঁহাকে ঐ বিষয় মনে মনে কত চিন্তা করিতে হইয়াছে। যিনি প্রথম মোটর গাড়ী তৈয়ার করেন, তিনিও মনে মনে ঠিক করিয়া তবে গাড়ী তৈয়ার করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, সৃষ্টির যাবতীয় তৈয়ারী বস্তু মানুষের মন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আবার বিশ্ব-জগতের যাবতীয় দৃশ্য বস্তু প্রথম ভগবানের মনে কল্পিত হওয়ার পর সৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যদি সত্য হয় যে আসলে ভগবান্ ও জীব এক, তাহা হইলে জীব যত অধিক স্ব স্ব রূপে অবস্থিত হইয়া ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইবে, তত অধিক জীব ভগবানের ন্যায় নানাবস্তু সৃজন করিতে পারিবে।

প্রাচীন ঋষিগণ সূর্য্যকান্ত মণি দ্বারা সূর্য্যের রশ্মিগুলি একত্রিত করিয়া কাগজে ফেলিয়া দেখেন কাগজ পুড়িয়া যায়, তাহা হইতে তাঁহারা এই স্থির

করেন যে মানুষও বিভিন্নমুখী চিন্তাস্রোতকে একীভূত করিয়া কার্য্য করিলে অসম্ভব সাধন করিতে পারে। নদীকে যেরূপ চারিদিকে বন্ধ করিয়া একটী স্থানে ছিদ্র করিয়া জল বহির্গত করিলে, সেই স্থানে ভয়ঙ্কর বেগে জল ধাবিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধির সমস্ত মুখ আঁটিয়া একটী মুখ খুলিয়া রাখিলে মানুষের অসাধারণ ক্ষমতা জন্মে।* এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিতেছেন, মানসিক ইচ্ছাশক্তি তড়িৎ বা বিদ্যুৎ ক্রিয়া উৎপাদন করিতে সমর্থ এবং তদ্দ্বারা একজন অপরের উপর অদ্ভুত কার্য্য করেন। ইহাই পাশ্চাত্যে Mesmerism, Hypnotism, প্রভৃতি নামে খ্যাত। তাঁহারা আরও অনুমান করেন যে বিদ্যুৎ হইতে অপর ভূত সকল উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে মানসিক ইচ্ছাশক্তি অনায়াসে ভূত সৃষ্টি করিতে পারে। প্রাচীন ঋষিগণও নিশ্চিতরূপে উপদেশ দিয়াছেন যে মনও জড় প্রকৃতির বিকার মাত্র সুতরাং অপর জড় বস্তুর সমশ্রেণীর বস্তু ও তদ্রূপ নিয়মাধীন।†

ঋষিগণ আরও বলিয়া গিয়াছেন 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' অর্থাৎ যে যেমন ভাবনা করে, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি হয়। মানুষ বাসনা লইয়া গঠিত, তাহার যেরূপ বাসনা সেইরূপই ইচ্ছা হইবে, যেমন ইচ্ছা করিবে সেইরূপ কার্য্য করিবে, যেমন কার্য্য করিবে সেইরূপই ফল পাইবে। ভগবান্ বুদ্ধদেবও বলিয়া গিয়াছেন 'যাহা ভাবিবে তাহাই হইবে'। যে যাহা চায় সে যদি তাহার বিষয় চিন্তা করে এবং ঐ চিন্তা বার বার পোষণ করে বা অভ্যাস করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তাহা পাইবে। যদি সত্য চায় সত্য পাইবে, অসত্য চাহিলে অসত্য পাইবে। সুখ চাহিলে সুখ পাইবে, অসুখ চাহিলে অসুখ ভোগ করিবে। এমন কি মানুষ যদি প্রকৃত ভগবান্ চায়,

---

* ব্রহ্মবিদ্যা—তারাকিশোর রায় চৌধুরী ২৩৭।

† বৃহদারণ্যক—৪ (৫) ৫, ছান্দোগ্য ৩ (১৪) ১।

তাঁহার বিষয় ভাবনা করে এবং পাইবার জন্য আন্তরিক সাধনা করে তবে মানুষ ভগবান্ পাইবে। মনের অদ্ভুত আকর্ষণ শক্তি আছে। স্বজাতীয় বস্তু স্বজাতীয়ের উত্তেজক; এই নিয়মে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতে আপন চিন্তানুরূপ যে সকল বস্তু আছে, তাহা আমরা অনবরত আকর্ষণ করি। আমাদের স্বাভাবিক চিন্তা হইতে যেরূপ ইচ্ছা আবির্ভূত হয়, ঐ ইচ্ছানুযায়ী বস্তু আমরা আকর্ষণ করি। চিন্তা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি, চিন্তাকে ইচ্ছানুযায়ী পথে চালিত করিতে পারিলে অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত রিচার বলেন, 'তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই হইবে, কারণ আমাদের ইচ্ছাশক্তি ভগবানের শক্তির সহিত মিলিত হইলে, আমরা যাহা বিশ্বাসের সহিত চিন্তা করিব তাহাই হইবে'। বিশ্বাস আর কিছুই নহে, ইচ্ছা ফলবতী হইবার আশার সহিত, চিন্তাস্রোত ঐদিকে চালিতে করাকে বিশ্বাস বলে।

চিন্তা ও বিশ্বাসের সহিত আশা পোষণ করিলে ইচ্ছা শীঘ্রই ফলবতী হয়। আমরা যাহা ইচ্ছা করি, উহা যতক্ষণ না লাভ হয় ততক্ষণ যদি চিন্তাস্রোতকে ঐদিকে চালিত করি এবং আশারূপ বারি ঐ ইচ্ছায় নিয়ত সেচন করি তাহা হইলে চিন্তা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে।

ব্রহ্ম।

এক্ষণে আমরা ভগবান্ বা ব্রহ্মের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।* ব্রহ্ম যে কি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না—কারণ তিনি অব্যক্ত। বুদ্ধদেবকে ব্রহ্ম বা মূল কারণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, 'আমাকে উহা জিজ্ঞাসা করিও না', কারণ তিনি সম্যক্‌রূপে জানিতেন যে ঐ গম্ভীর

* মৎপ্রণীত "God and His Visions" দ্রষ্টব্য।

তত্ত্ব বাক্যের দ্বারা বর্ণনার বিষয় নহে, বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করিলে অসম্যক্ ও ভ্রান্তিযুক্ত বর্ণনা করাই হয়। যে উপায়ে ব্রহ্মলাভ হয়, তিনি সকলের জন্য সেই উপায়গুলি দেখাইয়া গিয়াছেন। কেবল তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যক্ত করেন নাই নচেৎ অন্যান্য সকল দেশের, সকল জাতির মনীষিগণ তাঁহাকে নানারূপে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। অব্যক্তকে পূর্ণরূপে কেহই ব্যক্ত করিতে পারেন না, তবে যাঁহারা তাঁহার অনুগ্রহ বা আস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণের উন্নতিকল্পে, ভাষায় যতদূর ব্যক্ত করা যায় ততদূর তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনাদি; কাল বা সময়ের দ্বারা তাঁহাকে ধরা যায় না। তিনি অতীতে ছিলেন, বর্ত্তমানে আছেন ও ভবিষ্যতে থাকিবেন। একটি মানুষকে জানিতে হইলে যেমন আমরা ঠিক করি, সে অমুক সময়ে জন্মিয়াছিল বা জগতের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, ভগবান্‌কে সেরূপ জানা যায় না। তিনি অনন্ত; কোন স্থানে তাঁহাকে কেহ খুঁজিয়া পায় না, কারণ তিনি কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন কেহ জানে না বা বলিতে পারে না। সকল স্থানেই তিনি আছেন, তিনি আমাদের হৃদয়ে, বাহিরে, জগতের মধ্যে ও বাহিরে যতদূর আমাদের চিন্তা যায় তাহারও ভিতরে এবং বাহিরে ব্যাপিয়া আছেন। এইজন্য একজন ঋষি তাঁহাকে বর্ণনা করিয়া এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন—'হে প্রভো, আমার দোষ মার্জ্জনা কর কারণ তুমি অব্যক্ত অথচ আমি বর্ণনা করিয়াছি, তুমি অনাদি অথচ আমি বর্ণনা করিতে গিয়া তোমাকে কালে বদ্ধ করিয়াছি, তুমি অনন্ত অথচ আমি বর্ণনা করিতে গিয়া তোমাকে সীমাতে বদ্ধ করিয়াছি।' তাঁহাকে যেরূপেই বর্ণনা করা যাউক —তিনি তাহা এবং তাহার উল্টা। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া কত দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মকে বুঝাইবার কত চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের মতে এক ব্রহ্ম সং

আর যাহা কিছু প্রতীয়মান হয় তাহা অসৎ বা মিথ্যা। ব্রহ্ম স্বয়ং অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ, জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে বিচিত্র জগত প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহারা মায়াকে অনাদি ও ব্রহ্মজ্ঞান নাশ্য বলিয়া থাকেন। রামানুজস্বামী কিন্তু ব্রহ্মের স্বগতভেদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন 'ব্রহ্ম অনন্ত, কিন্তু তাঁহার আশ্রিত, অবস্থিত, সসীম জড়জগৎ ও জীবের ভেদ আছে। ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন।' এইজন্য এই সম্প্রদায়কে পরিণামবাদী বলে। পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল বিরুদ্ধ সমীকরণ মতের দ্বারা ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্ব্বত্রই ভেদের মধ্যে অভেদ, বিরোধের মধ্যে সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—যেমন বিষয় ও বিষয়ী। যাহা জানা যায় তাহা বিষয়, যে জানে তাহাকে বিষয়ী বলে। ইহাদের যেমন ভেদ তেমনি সম্বন্ধ আছে। বিষয় জ্ঞাত হইতে হইলে বিষয়ীর আবশ্যক হয়, বিষয়ী ব্যতীত বিষয়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। এই ভেদ অভেদের সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব? বিষয়ী শুধু বিষয়কে জানে তাহা নয়, আপনাকে বিষয় হইতে ভিন্ন এবং বিষয়ের জ্ঞাতা বলিয়া জানে। বিষয়ী—বিষয় বিষয়ী ভেদের একদিক্ মাত্র নহে, ইহা অসীম অথচ সীমার হেতু ও আশ্রয়, এইজন্য ভেদ ও সম্বন্ধ সম্ভব হইয়াছে। বিষয়ীর ভিতর যে বস্তু থাকাতে বিষয়ীর ভেদ ও সম্বন্ধ জানিতে পারে, তাহা ভেদের অতীত, সীমার অতীত অথচ সমুদয় ভেদ ও সীমার হেতু ও আশ্রয়—ইহাই ব্রহ্ম। নিম্বার্ক প্রভৃতি আর্য্য মনীষিগণও ব্রহ্মের এইরূপে ভেদাভেদ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যা হাত দুইটী বিপরীত বস্তু একবস্তু বুঝায়, তাহা ব্রহ্মেই সম্ভব, এইজন্য একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাঁহার নাম দিয়াছেন Unity of Contradictions. তাঁহাকে যেমন আমরা অব্যক্ত বলি, তিনিই আবার ব্যক্ত, যেমন অসীম তেমনি সসীম। তিনি সগুণ আবার

নির্গুণ, সাকার অথচ নিরাকার। তিনি সৎ আবার অসৎ; গীতায় নবম অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, 'সদসচ্চাহমর্জ্জুন' হে অর্জ্জুন, সৎও আমি, অসৎও আমি। দুইটা বিপরীত বস্তু একটী মুদ্রার দুইপিঠ স্বরূপ তাঁহার গুণই প্রকাশ করে কিন্তু তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যাহাতে দুইটা বিপরীত বস্তু সমভাবে বিদ্যমান থাকিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে তিনি তাহাই। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া আছেন, অথচ আপন শক্তিপ্রভাবে নানারূপে ব্যক্ত হইতেছেন। মাকড়শা যেমন আপন দেহ হইতে জাল বাহির করিয়া, আবার আপন-শরীরে গুটাইয়া লয়, সেইরূপ ব্রহ্ম অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইতেছেন আবার ব্যক্ত হইয়া অব্যক্ত হইতেছেন। সূত্রে মণিহারের ন্যায় সমস্ত বস্তুই তাঁহাতে গাঁথা আছে, কোন বস্তুই তাঁহাকে বাদ দিয়া থাকিতে পারে না। শ্রুতি বলেন, 'তস্মিল্লোঁকাশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।* অর্থাৎ সমুদয় তাঁহাতে আশ্রিত কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ক্ষুদ্র কীট হইতে সুবৃহৎ প্রাণী সকলেই সেই একের দেহাংশবিশেষ, কিন্তু প্রাণ বা আত্মা এক। সকলের মুখ দিয়া তিনি খান, সকলের চক্ষু দিয়া তিনি দেখেন, সকলের কর্ণ দিয়া তিনি শ্রবণ করেন, সকলের হাত দিয়া তিনি কাজ করেন। তিনি সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপে সদাই বিরাজমান, যেমন একটা জিনিষের সগুণ ও নির্গুণ দুইটা দিকমাত্র। সকল ভাবেই তিনি পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাদ দিলেও তিনি পূর্ণই থাকেন। তিনি অখণ্ড ভূমা, পূর্ণকাম ও পূর্ণানন্দ স্বরূপ। তিনি যেমন অনাদি ও অনন্ত তাঁহার গুণাগুণও অনাদি এবং অনন্ত, তাঁহা হইতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই লয় হয়।

* কঠ-উপনিষৎ ৫।৮।

জগৎ।

জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ কিরূপ বস্তু? ইহা কি মরীচিকাবৎ মিথ্যা অথবা ব্রহ্মের অংশ এবং অনুভবযোগ্য বলিয়া সত্য। জগৎ সত্য না মিথ্যা এই লইয়া মুনি-ঋষিদিগের নানামত শুনা যায়। জগৎকে ব্রহ্মের অতিরিক্ত অপর কোন সত্য বস্তু বলা চলে না, এই হিসাবে জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও অনুভবযোগ্য এই হিসাবে জগৎকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না বলিয়া জগৎ সত্য। সূর্য্যের তেজের ন্যায় জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বটে, কিন্তু তেজকে যেমন সূর্য্য বলা চলে না, জগৎকেও সেইরূপ ব্রহ্ম বা সৎ বলা চলে না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে জগৎ ব্রহ্মের ভূরি ভূরি উপমা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার দু'একটি এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ কিরূপ? যেমন অনলের উষ্ণতা,—শঙ্খের শুক্লতা,—সলিলের দ্রবভাব,—ইক্ষুরসের মধুরতা,—তুষারের শীতলতা,—অনলশিখার উজ্জ্বলতা বা দাহিকাশক্তি,—সমুদ্রের তরঙ্গ,—সুবর্ণের অলঙ্কারাদি। উপমার এইটুকু দেখান উদ্দেশ্য যে জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। মাটী হইতে যেরূপ নানারূপ সৈন্য ও মূর্ত্তি প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু মাটী জ্ঞান থাকিলে যেমন সৈন্য বা মূর্ত্তিগুলিকে মাটী ব্যতীত আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না,—জলের জ্ঞান থাকিলে যেমন তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ্, ফেন্ প্রভৃতিকে জল ব্যতীত আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে জগৎকে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না। এক্ষণে বিজ্ঞানসম্মত ঐ বিষয়ে আরও একটী উপমা দিব। সকলেই দেখিয়াছেন, পুষ্করিণীতে ঢিল নিক্ষেপ করিলে ঢিলের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার তরঙ্গগুলি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া দূরে চলিয়া যায়। মনে হয় যেন জলরাশি তরঙ্গরূপে ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছে। বাস্তবপক্ষে ঢিল

নিক্ষেপ করিলে উহা জলকে চঞ্চল করে এবং জলকণাগুলি একস্থানেই নাচিতে থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী জলকণাগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী জলকণার সহিত সমস্বরে এরূপ নৃত্য করিতে থাকে, যেন মনে হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী জলকণা ক্রমশ: দূরে চলিয়া যায়; বাস্তবিক জলরাশি দূরে যায় না। জলকণার নৃত্য এত অপূর্ব্ব যেন মনে হয় ঢেউগুলি ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। জলকণা জলকণাই থাকে—ঢেউগুলি বাজীকরের বাজীর ন্যায় মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে তাহা ব্রহ্মই থাকে, কিন্তু জগৎ যেন বাজীকরের বাজীর ন্যায় মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ও পরে সকল অবস্থায় ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। যেমন একটী পাথর খুদিয়া ইচ্ছামত শিব, দুর্গা প্রভৃতি ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি গড়া যায় এবং খুদিবার পূর্ব্বেও ঐ ঐ মূর্ত্তি পাথরের ভিতর ছিল এবং পরেও পাথরে থাকে সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগৎ সকল অবস্থায় অভিন্ন। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি ব্রহ্মেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মেই জগৎ লয় হয়।

জীব।

অদ্বৈতবাদীগণের মতে জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে, অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম, অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। যেমন ঘটমধ্যস্থিত আকাশ মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ জীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। উপাধির ভেদবশত: জীব অনেক। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 'একম্ সাদ্বিপ্রা বহুধা ভবন্তি' * অর্থাৎ এক ঈশ্বর আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের এই শক্তির নাম মায়া,

* ঋগ্বেদ—১ (১১৪) ৪৬।

ইহা হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে প্রকৃতি বলে। ব্রহ্ম যেমন অনাদি ও অনন্ত, এই শক্তিও সেইরূপ অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান নাশ্য। এই শক্তিপ্রকাশে ভগবানের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। শ্রুতি বলেন—

এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।

অর্থাৎ এক চন্দ্র যেমন বিভিন্ন জলকণায় প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা চন্দ্র দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এক ব্রহ্মও প্রতিজীবে অবস্থান করিয়া নানা ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। জলে যে চন্দ্র দৃষ্ট হয় তাহা সত্য নয়, তবে কি জীবে যাহাকে ব্রহ্ম বলি তাহা ভুল? ব্রহ্ম সত্য কিন্তু ব্রহ্মের নানাত্বই ভুল। এখানে আরও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—জীবে যখন ব্রহ্ম প্রতিফলিত হন, জীব কি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তু? সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই ছিল না, সুতরাং ব্রহ্ম যখন জীব সৃষ্টি করিলেন, তখন জীব ব্রহ্মস্বরূপ ব্যতীত কিছু হইতে পারে না। জীব যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন ইহা কিছু নয় বলা চলে না, অথচ জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যাইতেছে। বাস্তবিকপক্ষে উপাধির উৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি ও উপাধির বিনাশে জীবেরও নাশ ব্যবহার হইয়া থাকে। একব্রহ্মই জীবমধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, যেমন কোন ব্যক্তি রঙ্গালয়ে নানা ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নানারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভূত যাহা হইতে সমাগত হইতেছে আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে, অর্থাৎ উপাধির নাশে তাহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'।*

---

* তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মে যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় শক্তি আছে এবং ব্রহ্ম যে সর্ব্বশক্তিমান্ ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ। আবার ব্রহ্ম যে নিগু‍র্ণ বা গুণাতীত তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাশ্রিত, স্বরূপত ব্রহ্ম হইতে তাহাদের পৃথক্ সত্তা নাই। কিন্তু ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয় সদ্বস্তু, তিনি সকল প্রকার গুণ ও গুণকার্য্যের অতীত বা গুণাতীত—সেই পরমাশ্রয় বস্তুই ব্রহ্ম। শ্রুতি বলিতেছেন—

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।*

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণী যাঁহাতে জীবিত আছে, সকল যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সেই ব্রহ্মেই জীব (হংস) চক্র সংলগ্ন বস্তুর ন্যায় নিয়ত ভ্রাম্যমান হইতেছে। ব্রহ্মকে এইরূপ সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বাশ্রয় জানিতে পারিলে, যদি ভাবিয়া দেখা যায় এমন কি বস্তু আছে যাহা সর্ব্বপ্রাণীতে সমান বা একই বস্তু (ইংরাজীতে যাহাকে Common Factor বলে), তাহা হইলে ব্রহ্মকে শব্দাতীত, স্পর্শাতীত, রূপাতীত, রসাতীত, গন্ধাতীত, অক্ষয় বা নিগু‍র্ণ বলিয়া বোধ হইবে। ব্রহ্মের সগুণ ও নিগু‍র্ণ দ্বিরূপ স্বভাবানুযায়ী জীবেরও দ্বিরূপ ভাব আছে। জীবের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থার নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে। যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয় তখন সে আপনাকে বালক, যুবা বা বৃদ্ধ বলিয়া মনে করে। কিন্তু অবস্থা-পরিবর্ত্তন হইলেও বুঝা যায় আমি একই মানুষ, বাল্যাবস্থায় যে আমি ছিলাম—যুবাবস্থায় যে আমি ছিলাম—বৃদ্ধাবস্থায়ও আমি সেই আমি। আমি অবস্থাবিশেষে বালক, যুবা, বৃদ্ধ বা সুখী, দুঃখী হই, অথচ তাহার

---

* শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

অতীতরূপে সাক্ষীস্বরূপে ও অবস্থান করি। এই যে জীবে সাক্ষী স্বরূপ চিদ্রূপ, যাহা সকল অবস্থায় এমন কি জনমে মরণে এক ও অবিনাশী, তাহাই ব্রহ্মের চিৎস্বরূপ। ব্রহ্ম যে জীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পৃথক্ হইয়া রহিয়াছেন তাহা নহে, তিনি সকলের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে নিয়মিত করিতেছেন। জড় বস্তুর সংসর্গেই ব্রহ্মের জীবভাবপ্রাপ্তি এবং সংসার হইয়া থাকে; সেই সংসর্গ দূর হইলেই স্বীয় সমস্বরূপ লাভ হইয়া থাকে। সমষ্টি জীবের সংকল্পমাত্রেই বা ইচ্ছায় কার্য্যসিদ্ধি হয়, ব্যষ্টি জীবের যত্ন ও ব্যাপার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়। মানুষ কেবল ইচ্ছা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না, চেষ্টা ও যত্ন আবশ্যক। মুনি-ঋষিগণের ইচ্ছা মাত্রেই যে সঙ্কল্পসিদ্ধি হয় তাহা সেই সমষ্টি জীবের শক্তি।* ইহা হইতে সহজেই অনুভব হয়, মানুষও এক কালে সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারে।

মোক্ষ।

ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। শ্রুতি বলিতেছেন—

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি। †

অর্থাৎ জীবাত্মা এবং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরকে পৃথক বোধ করাতেই জীব সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পরে যখন ঈশ্বরের সহিত একাত্ম-বোধে উপাসনাপর হয়েন, তখনই জীব জন্ম-মৃত্যু-রহিত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগকে যোগ বলে। ইহা একবার ভাবিলে বা অনুভব করিলে যে মুক্তি হয় তাহা নহে। ব্রহ্ম স্বরূপে

* যোগবাশিষ্ঠ ১৩৪।

† শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ১—৬

যথাযথ অবস্থিতি করিলে মুক্তি লাভ করা বলে। যিনি যে পরিমাণে আপনাকে খুলিয়া রাখেন এবং আপনার আত্মা বা ভগবানের স্বরূপ এক অনুভব করেন, তিনি সেই পরিমাণে মুক্তিলাভে অগ্রসর হন। ইহার জন্য যে সাধনার আবশ্যক, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিব। শাস্ত্রে আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-দর্শনই মুক্তির পথ বলিয়া ব্যাখ্যাত আছে।

অহং ব্রহ্মেতি নিয়তং মোক্ষ হেতুর্মহাত্মনাম্

মহা উপনিষদ্ ৪ (৭২)

অর্থাৎ মহাপুরুষগণ 'আমিই ব্রহ্ম' এই নিয়ত চিন্তা করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। মুনি ঋষিগণ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করিতে করিতে স্বয়ম্ ব্রহ্ম স্বরূপ হন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

সর্ব্বসাক্ষিণমাত্মানং বর্ণাশ্রম বিবর্জ্জিতম্

ব্রহ্মরূপতয়া পশ্যন্ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্।

বরাহ—১৪

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম বিবর্জ্জিত সর্ব্বসাক্ষী আত্মাকে ব্রহ্মের স্বরূপ দেখিতে দেখিতে স্বয়ম্ ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন। এই অভেদ দর্শনেই সকল অবিদ্যা ও বাসনা ক্ষয় হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তি বা বিনাশকে ও কেহ কেহ মোক্ষ বলিয়া থাকেন। 'মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্ণপরঃ' অর্থাৎ মুক্তি অজ্ঞান বা অবিদ্যার নিবৃত্তি বা বিনাশ ব্যতীত কিছু নহে। † জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেবল জড় বস্তুর সংসর্গে জীবের চিত্তে বাসনা হইতে সংস্কার রূপ দাগ লাগে, তাহাই জীবকে জন্ম জন্মান্তর ঘুরাইয়া বেড়ায়। আমার বলিয়া জগতের উপর কর্ত্তৃভাব এবং আপনার প্রতি মমতা বা অহঙ্কার শীঘ্র যায় না। যতদিন আমি বা আমার এইরূপ অবিদ্যা থাকিবে, ততদিন জন্ম-জন্মান্তর শোক-দুঃখের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। কেহ

† সাংখ্য ৬ (২০)

কেহ অবিদ্যাকে নামরূপ বা মায়া নামে আখ্যাত করেন। বিদ্বদ্‌গণ এই নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করেন। শ্রুতি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়া এইরূপ বলিতেছেন :—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

মুণ্ডক ৩ (২) ৮

একই নদী যেরূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করে এবং সমুদ্রের সহিত মিলিত হইলে তাহার সেই নাম ও রূপগুলি লুপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্বদ্‌গণ নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। নামরূপ উপাধি বিলয়প্রাপ্ত হইলে জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ থাকে না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন :—

উপাধিবৈশিষ্ট্যকৃতো বিশেষো
ব্রহ্মাত্মনোরেকতয়াধিগত্যা
উপাধিবৈশিষ্ট্য উদস্যমানে
ন কশ্চিদপ্যাস্তু বিরোধ এতয়োঃ।

সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ—৭৬৩

অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের উপাধিকৃত ভেদ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও আত্মার একতা জ্ঞান দ্বারা উপাধি বিলয় প্রাপ্ত হইলে উভয়ের কোনরূপ ভেদ থাকে না। তখন জীবও পরমাত্মার সহিত এক হইয়া কেবল সাক্ষিরূপে জগতের লীলা অবলোকন করেন।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণও প্রায় এইরূপ। জীবের বাসনা বা সংস্কার জীবকে দুঃখময় অনিত্য ও অনাত্ম সংসারে লইয়া যায়। বাসনার বিনাশ হইলেই দুঃখ আর জীবকে বিচলিত করিতে পারে না, তখন সকল দুঃখের অবসান বা নির্ব্বাণ হয়। পুষ্করিণীর জল নাড়িলে যেরূপ চঞ্চল ও ঘোলা হয় এবং স্থির হইলে যেরূপ ময়লা বসিয়া গিয়া জল স্বচ্ছভাব ধারণ করে, সেইরূপ বাসনা ক্ষয় হইলে চিত্ত এইরূপ পরিষ্কার হয় যে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান নখদর্পণের ন্যায় দেখা যায়। এই অবস্থায়, বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, জীবের বোধিজ্ঞান লাভ হয়। জীব তখন জন্ম-জন্মান্তর ও তাহার হেতু, বন্ধনের কারণ ও তাহার বিনাশ এবং মুক্তির উপায় সম্যক্‌রূপে বিদিত হয় এবং বন্ধনের যে কারণ বাসনা (সংস্কার) ও তৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিয়া জন্ম-জন্মান্তর ও সংসার হইতে চিরমুক্তি লাভ করে। এই অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, মোহরূপ অগ্নি চিরকালের জন্য বিনাশ বা নির্ব্বাপিত হয় বলিয়া ইহাকে নির্ব্বাণ বলে। তখনই সে এই শান্তিময় অবিনাশী অবস্থায় চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আমি' ও 'আমার' এই অস্মিতা বা অহম্ভাবই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। প্রকৃতিরাজ্যের কোন পদার্থই 'আমার নয়' বা আমি নই। প্রকৃতিরাজ্যের সমস্ত পদার্থ অনাত্ম (আমি নই বা আমার নহে)। এই দুঃখময় 'আমি' 'আমার' ভাব পরিত্যাগের নামই নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণই অবিনাশী সুখ বা চিরশান্তিময় অবস্থা। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ উভয়ের ফল একই। বুদ্ধদেব যাহাকে অনিত্য দুঃখময় অনাত্মের বিনাশ বলেন, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সেই অবস্থাকেই সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ বলেন।

কৰ্ম্ম ।

সুকর্ম্ম না করিলে সত্য লাভ করা যায় না। সকল ধৰ্ম্মেই কতকগুলি রীতি নীতি পালন করিবার উপদেশ আছে—উহা নিয়ম মত পালন করিবার অভ্যাসকে সাধনা বলে। বাঙ্গালা ভাষায় কোন বিষয় জানিতে হইলে যেমন প্রথমে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, পড়িতে হয়, সেইরূপ সত্যলাভ করিতে হইলে আপনার চরিত্র নির্দ্দোষ করা আবশ্যক। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন—যাহার সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটি অসম্পূর্ণ থাকে তাহার সত্যলাভ হয় না। সাধন-চতুষ্টয় অর্থে সত্যলিপ্সু ব্যক্তির কোন্‌টি নিত্য, কোন্‌টি অনিত্য, এইরূপ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়—ভোগ্য বস্তুর প্রতি বিরক্তি হওয়া আবশ্যক। তৃতীয়তঃ—শম, দম, তিতিক্ষা, সন্ন্যাস, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টী গুণ থাকা আবশ্যক। চতুর্থতঃ—মুক্তিলাভের জন্য ইচ্ছা থাকা আবশ্যক। সৎকর্ম্ম না করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয় না—চিত্ত নির্ম্মল না হইলে ভগবানের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না—এজন্য সদাচরণই সত্যলাভের প্রথম ও প্রধান উপায়। ভগবান বুদ্ধদেব এজন্য এই পথ দিয়া মানুষকে আপনার উদ্ধার-সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন—'শীল অর্থাৎ শুদ্ধচরিত্র দ্বারা সুপরিশুদ্ধ সমাধিতে মহাফল ও মহালাভ হয়, সমাধি দ্বারা সুপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞানে মহাফল ও মহালাভ হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। দুঃখ অর্থে 'কাম, অস্মিতা, মিথ্যা দৃষ্টি ও অবিদ্যা বুঝায়'। শীল অর্থে কায়মনোবাক্যে পরের হিংসা না করা বা পরপীড়ন না করা এবং সাধু-জীবিকা অবলম্বন করা বলে। তাঁহার কথায় ইহাদের সম্যক্ সঙ্কল্প,

সম্যক্ বাচা, সম্যক্ কর্ম্মান্ত ও সম্যক্ আজীব বলে। সমাধি অর্থে সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি বুঝায়। মন অন্য পথে চলিলে তাহাকে ঘুরাইয়া আনা এবং যাহাতে অন্য পথে না ধাবিত হয় তাহার চেষ্টা করাকে ব্যায়াম বলে। মনকে একটি বস্তুতে আবদ্ধ করা বা ধারণা ঠিক রাখাকে স্মৃতি বলে ; এবং ধ্যানে ডুবিয়া যাওয়া বা আপনার অস্তিত্বে জ্ঞানশূন্য হওয়াকে সমাধি বলে। প্রজ্ঞা অর্থে সম্যক্ দৃষ্টি বা অনিত্যম্, দুঃখ, অনাত্মম্ বলিয়া সমুদয় বস্তুর ত্রিবিধ গুণ উপলব্ধি করা বুঝায়। তাঁহার উপদেশ এই বুঝায় যে যে ব্যক্তি সম্যক্ দৃষ্টি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মার্গ দ্বারা আপনার চরিত্র নির্দ্দোষ করেন—তিনি কাম, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা প্রভৃতি সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত হন। এই অবস্থায় জীবের বোধিজ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ জীব তখন নখদর্পণের ন্যায় ঘটনা-পরম্পরার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ জানিতে পারেন এবং সত্যলাভ করিয়া মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করেন।

মোটামুটী আমাদের জানা আবশ্যক, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিতে হইবে। যাহাতে বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষণ না করিতে পারে তাহারও চেষ্টা দেখিতে হইবে। দুর্গরক্ষা করিতে হইলে যেমন দুর্গের ছিদ্রগুলি রোধ করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেনাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে এক দিকে যোগ অভ্যাস ও উপাসনার আবশ্যক, অন্যদিকে শাস্ত্র অধ্যয়ন, বিচার ও সাধুসঙ্গ অবলম্বন করিতে হয়। কিরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়, বশিষ্ঠদেব ভগবান রামচন্দ্রকে তৎসম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন :— "শান্তি, বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ এই চারিটী মোক্ষদ্বারের দ্বারপাল। সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক এই চারিজনের এবং অশক্ত হইলে তিন দুই অথবা একজনের সেবা করিবে। কেন না ইহাদের একজন বশ হইলে অবশিষ্টেরা

বশ হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান নাই সে জড়, যাহার বিবেক নাই সে অবস্তু, যাহার বিদ্যা নাই সে পশু এবং যাহার বিচার নাই সে নামে মাত্র মানুষ। যাহাতে বিনাশ নাই, তুমি বৈরাগ্য ও যোগাভ্যাস সহায়ে সেই শান্তিলাভে ও সৌজন্যরূপ পরমসম্পৎ সঞ্চয়ে কৃতযত্ন হও এবং সর্ব্বদা সৎ-শাস্ত্রালোচনা, ইন্দ্রিয়-সংযম ও তপস্যা দ্বারা স্বীয় প্রভা বর্দ্ধিত কর, সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।" যতদিন না বুদ্ধির জড়তা ঘুচে বা চিত্তের মলিনতা না দূরীভূত হয় ততদিন শুভকর্ম্ম ও উপাসনার আবশ্যক।

শুভকর্ম্ম করিতে হইলে কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা থাকা চাই। এজন্য স্বাস্থ্য ও ধন থাকা আবশ্যক। ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হইলে শরীর অবলম্বন করিতে হয়। শরীর অসুস্থ হইলে কিছুই ভাল লাগে না। এজন্য শাস্ত্র-কারেরা বলেন, 'শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্'—আগে শরীর পরে ধর্ম্ম। ইহার অর্থ এরূপ নহে—শরীর সুস্থ থাকিলেই হইল, ধর্ম্মের কোন আবশ্যক নাই। শরীর সুস্থ না থাকিলে ধর্ম্মে মতি হয় না, এইজন্যই শরীরের প্রাধান্য। এই দেহ হেলায় হারাইবার নয়; আমরা বহুপুণ্যবলে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি, কারণ মুক্তিলাভ আমাদের সাধ্যায়ত্ত। পশুপক্ষী বা অন্যান্য প্রাণীদিগের মুক্তির পথ এত সোজা নয়। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে ধন উপার্জ্জন করিয়া স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর আহার ও বিশুদ্ধ পানীয় এবং বায়ু সেবন করা আবশ্যক। শরীর নীরোগ হইলে মন সচরাচর প্রফুল্ল থাকে এবং মনকে যে কাজে লাগান যায় শীঘ্রই উহা সম্পাদন করে। বহুদিকে এবং বহুবিষয়ে ছড়ানো মনকে গুটাইয়া লক্ষ্যমুখে চলানোকে উপাসনা বলে। মা যেমন ছেলেদের ঘুম পাড়াইয়া সংসারের কাজ সারিয়া লন, সেইরূপ বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করিয়া লক্ষ্যপথে চলিতে হইবে। মনকে শান্ত করিতে হইলে মনকে একটি বিষয়ে আবদ্ধ করিতে হইবে। এইজন্য জনসাধারণের নিমিত্ত মুনিঋষিগণ মূর্ত্তিপূজা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু

মানুষ এত ভ্রান্ত, যাঁহাকে তাঁহারা পূজা করিতে বলেন তাঁহাকে হারাইয়া পুত্তলিকাকেই ভগবান্ মনে করিয়া থাকে। আমরা যে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া আনন্দ পাই তাহা সেই স্থূলমূর্ত্তি হইতে নহে। তাঁহাদের চক্ষুঃকর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া যিনি প্রকাশ পাইতেছেন প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াই সুখী হই। ভগবানে মন বাঁধিতে শিখিলে তখন আর মূর্ত্তিপূজার আবশ্যক হয় না। যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের অতীত, যিনি অনাদি, অবিনাশী ও সর্ব্বব্যাপী তাঁহাকে কি দিয়া তুলনা করিবে, তাঁহাকে কিরূপে বর্ণনা করিবে? বাহিরে অনুসন্ধান করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, কারণ কোন দৃশ্য বস্তুই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না; তাঁহাকে হৃদয়ে অনুভব করিতে হইবে।*

শ্রুতি বলেন :—

অন্তঃস্থং মাং পরিত্যজ্য বহিস্থং যস্তু সেবতে।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহেৎ কূর্পরমাত্মানঃ। †

অর্থাৎ অন্তরে নিহিত আমাকে ত্যাগ করিয়া যে বাহিরে আমার অনুসন্ধান করে, সে তাহার হস্তস্থিত অন্নপিণ্ড ত্যাগ করিয়া নিজের কনুই লেহন করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলিতেছেন, "আমি সকল ভূতেই আত্মরূপে অবস্থিত; যে ব্যক্তি সেই ভূতের অবজ্ঞা করে অথচ আমাকে বাহিরে অর্চ্চনা

* Then go not thou in search of Him
But to thyself repair,
Wait thou within the silence dim
And thou shall find him there—God's Image 72.

† জাবালদর্শন ৫৮।

করে, তাহার অর্চ্চনা বৃথা বিড়ম্বনা। সর্ব্বভূতে আত্মরূপে অবস্থিত আমাকে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার অর্চ্চনা করে, সে কেবল মাত্র ভস্মে ঘি ঢালে"।

শ্রুতি বলেন :—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাসা জন্তোনিহিতো গুহায়াম্
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

অর্থাৎ তিনি অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর, তিনি জীবের গুহায়াম্ অর্থাৎ বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত। কামনারহিত বা দুঃখাদিরহিত এমন কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি শান্ত হইলে সেই নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ চৈতন্য আত্মাকে সাক্ষাৎ করেন। যদিও ভগবান্ প্রাণীমাত্রেরই হৃদয়-গুহায় বর্ত্তমান এবং স্থূলসূক্ষ্মাদিরূপে এই লোক-চরাচরে ব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তথাপি মায়ার কি প্রভাব, যিনি আমাদের অতি নিকটে, যিনি আমাদের সকলের অপেক্ষা আপনার, তাঁহাকেই আমরা সদাসর্ব্বদা ভুলিয়া রহিয়াছি। উপাসনার ফলে চিত্তে সত্বগুণের আবির্ভাব হয় এবং এই সত্বগুণের আলোকে মায়ার প্রভাব কাটিয়া গেলে আত্মার স্বরূপ প্রকটিত হয়। ভগবানের প্রতি আমাদের মন যায় না কেন? কারণ, আমাদের মন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট। যে স্ত্রীর পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণ আছে, তাহার নিজপতির প্রতি আকর্ষণ থাকে না। আমাদের মনও বিষয়রূপ উপপতিকে বরণ করিয়াছে বলিয়া ভগবানে আকর্ষণ নাই। আমরা বিষয় ভালবাসি বলিয়া দুঃখভোগ করি, কারণ বিষয় নশ্বর; উহা এককালে হারাইবেই হারাইবে—কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিব না; কিন্তু ভগবান নিত্য ও সত্য—তাহা হারাইবার কোন ভয় নাই; সুতরাং ভগবানকে

ভালবাসিলে কখনই দুঃখভোগ করিতে হয় না। অবিবাহিতা কন্যা বাপ-মায়ের আকর্ষণে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহ হইলে ধীরে ধীরে যেরূপ স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিষয়াসক্ত মনকে ভগবানের গুণগানে বা উপাসনায় ধীরে ধীরে লইয়া যাইতে হয়। বিষয় হইতে মন বিমুখ হইলেই উপাসনার ফলে শীঘ্রই আত্মসাক্ষাৎকার হয় এবং অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—'ভগবান্ যখন আমাদের অন্তরেই রহিয়াছেন, তখন আর উপাসনার আবশ্যক কি? আমরা দুঃখ কষ্টে পড়িলে তিনিত দেখিতে পান, তবে আমাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করেন না কেন?' শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর সহজবোধ্য, কারণ আমরা যত ইচ্ছা পাপকার্য্য করিব, আর ভগবান আসিয়া আমাদের ফলভোগ করিতে দিবেন না—এমন হইতে পারে না। প্রথম প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রকারেরা অতি সুন্দর উপমা-সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'ঘৃত দুগ্ধের মধ্যে থাকিয়া গাভীর দেহেই বর্ত্তমান থাকে, তথাপি তাহাতে তাহাদের শরীর পুষ্ট হয় না; কিন্তু ঐ দুগ্ধই যখন তাহাদের শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া পরে উপায়বিশেষ দ্বারা ঘৃতাকারে পরিণত হয়, তখন তাহাই আবার গাভীর ঔষধরূপে উপকার করিয়া থাকে; তদ্রূপ পরমেশ্বর সমস্ত দেহীর দেহে বিদ্যমান থাকিলেও উপাসনারূপ উপায় ব্যতিরেকে মনুষ্যের হিতসাধন করেন।

উপাসনার জন্য কাহাকেও বিষয়-সম্পত্তি বা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন পরিত্যাগ করিতে হইবে না। চিত্তকে শান্ত করাই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। নির্জ্জন ঘরে নিয়মিত সময়ে, বিশেষতঃ সকালে ও সন্ধ্যাবেলা এক ঘণ্টা কি আধঘণ্টা, যে যেমন পারে, নির্দ্দিষ্ট আসনে স্থির হইয়া বসিয়া, মনকে বিষয় হইতে গুটাইয়া লইয়া ভগবানে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে। হাজার চেষ্টা

সত্ত্বেও প্রথম প্রথম মন ইতস্ততঃ ছুটিয়া যাইবে, অমনি তাহাকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া একলক্ষ্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহাকেই সাধনার অভ্যাস-যোগ বলে। বাহ্য কতকগুলি নিয়ম আছে, তাহা মানিয়া চলিলে শীঘ্র চিত্ত শান্ত হয়; যেমন কুশাসনে বসা, ঘরে ধূপধূনা জ্বালান, কুৎসিত ছবির পরিবর্ত্তে আনন্দবর্দ্ধক ভগবানের বা সজ্জনের মূর্ত্তি রাখা, ঘরে আলো এবং বাতাসের পথ খুলিয়া দেওয়া, স্নান করা বা পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করা ইত্যাদি। শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ, সেজন্য প্রথমতঃ শরীরের গ্লানি যাহাতে না থাকে বা না আসে, সেই বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বাহ্য নিয়ম ব্যতীত শাস্ত্রের কতকগুলি মন্ত্র আছে যাহা উচ্চারণ করিলে মন শীঘ্রই শান্তভাব ধারণ করে। যাঁহারা মুক্তি-অভিলাষী তাঁহারা গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে মুক্তিলাভের আপন আপন অবস্থানুযায়ী মন্ত্রলাভ করেন। যত মুনিঋষি দেখা যায় সকলেরই প্রায় এক একজন গুরু দেখা যায়। ভগবান্ রামচন্দ্র সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত, তথাপি বশিষ্ঠদেব পথ না দেখাইয়া দিলে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন না। গুরুর সাহায্য পাইলে গন্তব্যপথ ঠিক করিয়া লওয়া যায় এবং শীঘ্র লক্ষ্যে পৌঁছান যায়।

সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

অর্থাৎ সত্যজ্ঞান লাভের জন্য শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া গুরুর নিকট গমন করিবে। গুরু যোগ্য শিষ্য পাইলে নিশ্চয়ই সত্যলাভের উপায় দেখাইয়া দিবেন। গুরুদত্ত সকল মন্ত্রেই ওঁকার উচ্চারণের বিধি আছে, এই শব্দকে প্রণব বলে।

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ—

'ও'ম মহাক্ষর ব্রহ্ম জানে যেই জন
সকল বাসনা তার হয় সম্পূরণ
ওম্ ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান
ওম্ ব্রহ্ম কর ধ্যান
যেই জন বোঝে এই ওম্ মহাক্ষর,
ব্রহ্মলোকে লভে সেই মহা-সমাদর।*

ওঙ্কার ব্রহ্মের আকারস্বরূপ, সুতরাং ওম্ উচ্চারণ করাও সাকার উপাসনা বলা যাইতে পারে। মুনিঋষিগণ এই শব্দকে ধনুকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ব্রহ্মই আমাদের লক্ষ্য, ধনুকের শর আমাদের আত্মা। যেমন শর ধনুকে আরোপিত করিয়া লক্ষ্যে ঐ শরকে মিশাইতে হয়, সেইরূপ ভগবানের ওঁকাররূপ শব্দ আশ্রয় করিয়া আমাদের আত্মাকে ভগবানে মিশাইয়া ফেলিতে হয়। † প্রত্যহ নিয়মিতরূপে উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই সময়ে চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং আপনাতে ও ভগবানে অভেদভাব দর্শন করিলে সময়ে সকল সংশয় ছেদন হইবে।

যিনি আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া মনোগত সমুদয় কামনা ত্যাগ করেন, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। এখানে স্থিতপ্রজ্ঞ মানে যিনি সত্যকে নিশ্চিৎরূপে জানিয়া আপনাতে আপনি থাকেন; কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতিরেকে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না, কারণ ইন্দ্রিয়গণ মুমুক্ষুদিগেরও মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। ‡ আত্মজ্ঞান লাভ হইলেও কেহ কর্ম্ম না করিয়া

---

* কঠোপনিষৎ ১ (১৬-১৭)
† রুদ্রহৃদয় উপনিষৎ—৩৮
‡ শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা—২ (৫৫,৬০)।

থাকিতে পারে না, এজন্য সত্য ও ধর্ম্মানুসারে আচরণ করিবার স্বভাব বা শীলের প্রয়োজন। এ বিষয়ে মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে একটী সুন্দর গল্প আছে। দেবরাজ ইন্দ্র আপন রাজ্য হারাইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন 'গুরোঃ! শ্রেয়ঃ কি আমাকে বলুন।' বৃহস্পতি তখন ইন্দ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া বলেন, 'ইহাই শ্রেয়ঃ'। কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে আশ্বস্ত না হইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন—'ইহার অপেক্ষা অধিক কিছু শ্রেয়ঃ আছে কিনা।' বৃহস্পতি তাঁহাকে শুক্রাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেন। শুক্রাচার্য্যের নিকট ইন্দ্র ঐরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি তাঁহাকে প্রহ্লাদের নিকট পাঠাইলেন। ইন্দ্র জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে প্রহ্লাদের নিকট গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া একদিন বলিলেন, 'শীলই ত্রৈলোক্যলাভের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং উহাই শ্রেয়ঃ।' পরে প্রহ্লাদ তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, ইন্দ্র বলিলেন, 'আপনার শীল আমাকে দান করুন।' প্রহ্লাদ তথাস্তু বলিলে, তাঁহার শীল ও সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত, ঐশর্য্য প্রভৃতি গুণে ইন্দ্র ভূষিত হইলেন এবং উহার ফলে তিনি আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তাই বলি, উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে সত্য ও ধর্ম্মানুসারে আচরণ করিবার স্বভাব গঠিত করিতে হইবে।

উপাসনার সহিত কর্ম্ম করিতে হইবে সত্য, কিন্তু কোনটি কর্ম্ম, কোনটি অকর্ম্ম এই লইয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরাও প্রমাদে পড়েন। তাই শ্রীভগবান গীতায় বলিতেছেন :—

তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।

অর্থাৎ যাহা জানিলে তুমি অশুভ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্তি হইতে মুক্ত হইবে, তাহাই তোমাকে বলিব।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।*

অর্থাৎ যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বকর্ম্মকারী হইলেও তিনিই ব্রহ্মে যুক্ত। আসক্তি না থাকায় কর্ম্ম ও অকর্ম্ম তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য এবং এরূপ অবস্থায় কর্ম্ম করিলেও তাঁহার কিছুই করা হয় না। যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পবিহীন—তিনিই পণ্ডিত। অতএব

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।†

তুমি ফলাসক্তিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্যকার্য্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

---

* গীতা, ৪—১৮।

† গীতা, ৩—১৯।

ভক্তি।

ঈশ্বরের প্রতি পরা অর্থাৎ নিরতিশয় যে প্রীতি তাহাকেই ভক্তি বলে।* দুঃখ কষ্টে পড়িয়া যে আমরা ভগবান বলিয়া অশ্রুপাত করি তাহা ভক্তির ফল নহে, তাহা দুঃখেরই ফল, বা মুখে হরি হরি বলিলেই তাহাকে ভক্ত বলে না। ভগবানে শ্রদ্ধা ও দৃঢ়বিশ্বাস থাকা চাই, এই বিশ্বাসের সহিত ভগবানকে ভালবাসাকে ভক্তি বলে।† আবার এই প্রীতি শুধু নিরতিশয় নহে, উহা অহেতুক, নিষ্কাম ও নিরন্তর হওয়া চাই। ভালবাসার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে নিষ্কাম ভালবাসা তাহাকে ভক্তি বা প্রেম বলে। সচরাচর আমরা যাহাকে ভালবাসা বলি তাহাও স্বার্থে কলুসিত। ঘরে ঘরে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, একজন অপরকে ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ কোন দ্রব্য দিতেছে, কিন্তু সেও ইহার পরিবর্ত্তে কিছু পাওয়ার আশা মনে মনে পোষণ করে; ইহাই নিকৃষ্ট ভালবাসা। গীতায় চারিপ্রকার ভক্তের কথা আছে; আর্ত্ত বা রোগাদিতে অভিভূত, জিজ্ঞাসু বা আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী বা ইহলোক ও পরলোকে ভোগ-সাধনভূত অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছু ও আত্মজ্ঞানী এই চারি প্রকার ভক্তেরা ভগবানকে ভজনা করেন।‡ কেহ দুঃখে কষ্টে পড়িয়া ভগবানকে ডাকিতে থাকে, কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ভগবানকে ডাকে, কেহ অর্থপ্রাপ্তির জন্য ভগবানকে ডাকে, আর কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে ডাকে, সকলের মধ্যে এই ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ।

---

* সা (ভক্তি) পরানুরক্তিরীশ্বরে—শাণ্ডিল্য।

† ভাগবৎ ৩—২৯—১২

‡ গীতা ৭—১৬

এখানে ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েরই আবশ্যক। শুধু ভক্তি এক প্রকার অন্ধ। কোন্ বিষয়ে ভক্তি করিবে, কাহাকে ভক্তি করিবে—ইহাও অন্ততঃ জানিয়া লইতে হইবে। কেন ভক্তি করিবে, ভক্তির ফল কি, ইহাও না বুঝিলে কাহারও ভক্তি আসে না। ইহাই বুদ্ধির কার্য্য। আবার শ্রদ্ধারহিত বুদ্ধিতে ভগবান লাভ হয় না। জ্ঞান হইলে একজন অপরকে চিনিতে পারে সত্য, কিন্তু শত্রুও অনেক সময় শত্রুর সমস্ত গুণ জানিতে পারে, তাহাতে ভালবাসা আসে না। সেই জন্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন :—

জ্ঞানমিতি চেন্ন দ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ।

শাণ্ডিল্য—১৭

অর্থাৎ ব্রহ্মদ্বেষীরও ব্রহ্ম-পরিজ্ঞান আছে কিন্তু তাহার ব্রহ্ম-ভক্তি ব্যবহার হয় না—সুতরাং যাহারা ব্রহ্মভক্ত তাহাদিগকেই ব্রহ্মসংস্থ বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটী গল্প আছে। শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন, বটগাছের একটী ফল আনিয়া দেখ তাহার মধ্যে কি আছে। শ্বেতকেতু উত্তরে বলিলেন, 'অনেক বীজ বা দানা আছে।' তাঁহার পিতা বলিলেন—'একটী বীজ লইয়া উহা ভাঙ্গিয়া দেখ উহাতে কি আছে'। শ্বেতকেতু বীজ ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইলে বলিলেন—'এখন কিছুই দেখিতেছি না।' তখন তাঁহার পিতা বলিলেন, 'দেখ, এই যে তুমি যাহাকে কিছুই না বলিতেছ তাহা হইতে এক একটী প্রকাণ্ড বটগাছ হয়।' এই কথা দ্বারা তিনি শ্বেতকেতুকে ইহাই বুঝাইলেন যে, সমস্ত দৃশ্য জগতের মূল কারণ অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম। এই উপদেশ দিয়া শ্বেতকেতুকে বলিলেন—'শ্রদ্ধৎস্ব', অর্থাৎ ইহার উপর বিশ্বাস রাখ বা এই তত্ত্বকে আপনার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া স্বভাবে ও আচরণে পরিণত কর। যিনি অব্যক্ত, মন বা বাক্য যেখানে পৌঁছায় না, সেখানে দৃঢ়বিশ্বাস ও ভক্তি ভিন্ন উপায় কি আছে?

যাহাদের ভগবানের প্রতি প্রীতিও নাই, দ্বেষও নাই, তাহাদের তটস্থ কহে, যেমন সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইলে ঘরেও থাকে না জলেও থাকে না, তটে থাকে। এই সকল লোক অপেক্ষা ভগবানের প্রতি দ্বেষী লোকও ভাল, কারণ সে ভগবানে যুক্ত থাকে। পথে কোন লোক কতিপয় দুষ্ট বালককে ঢিল নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াও কিছু বলেন না, কিন্তু ঘরে আসিলে তাঁহার পুত্র যদি সামান্য দোষ করে তাহা হইলে তাহাকে তিরস্কার করেন, কারণ পিতা পুত্রে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাই ভক্তেরা যখন ভগবানের সাড়া পান না তখন ভগবানের নিগ্রহ প্রার্থনা করেন এবং এই বলিয়া ডাকেন—

ভুলে থাকি যদি জাগায়ো আঘাতে,
নয়নের ঘুম হরণে,
বেদন দিয়ো গো নিয়োগো প্রিয়গো,
শরণ দিয়ো গো চরণে।

আবার একরূপ ভালবাসা আছে, তাহা ভয় হইতে উৎপন্ন। অনেকে ভগবানকে পূজা করে ও ভক্তি করে, কারণ কুকর্ম্ম করিলেই তিনি সাজা দেন; ভয়ের বস্তুকে কি কখনও ভালবাসা যায়? যে প্রকৃত ভালবাসে সে কখনও ভয় করে না, ভয় কাহাকে বলে জানে না। মা যে সন্তানকে ভালবাসে তাহা অতি উচ্চদরের। আগুনে বাড়ী পুড়িয়া গেল তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই—আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জননী পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য অনায়াসে অগ্নিবক্ষে ঝম্প প্রদান করে। ইহারই নাম নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম ভালবাসা। যে ভালবাসায় ভয় নাই, কোন কামনা নাই, যে ভালবাসায় একজন অপরকে আপনার স্বরূপ বলিয়া মনে করে, সেই প্রকৃত ভালবাসা। যতদিন আমরা মনে করি আমরা ভগবান্ হইতে পৃথক্, ততদিন আমাদের দুঃখ কষ্ট থাকিবে, ততদিন আমাদের সাজা দিবার লোক থাকিবে।

একজন অপরের অনিষ্ট করে কেন? কারণ সে মনে করে, অপর লোক থাকাতে তাহার সুখের বা স্বার্থের হানি হইবে। যদি অপর লোকের অস্তিত্ব না থাকে তাহা হইলে সে কাহাকে ভয় করিবে? দুইজনের পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভব হইলেই ভয়ের সঞ্চার হয়, আবার দুইয়ের একত্বাদর্শনে ভয় দূরীভূত হইয়া ভালবাসার সঞ্চার হয়।

তাঁহার সত্তার জ্ঞান লভে যেই মতিমান্
আত্ম-সংগোপনে তার বাসনা না হয়,
এই তার হয় মনে অভিন্ন ত দুই জনে,
কারে লুকাইব আর কারেই বা ভয়।

ভগবানকে ভালবাসিতে পারিলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে এবং আপনাকে ভগবানের অংশস্বরূপ দেখিবে। অপরকে ভালবাসিলে আপনাকেই ভালবাসা হইবে। অপরের ক্ষতি করিলে আপনারই ক্ষতি করা হইবে। তখন হিংসা, দ্বেষ সমস্ত বিদূরিত হইয়া কেবল ভালবাসাই থাকিয়া যাইবে। যাহার হৃদয়ে ভালবাসা ব্যতীত আর কোন আসক্তি থাকিবে না সে ভগবানের স্বরূপ হইয়া যাইবে। ভগবান ভালবাসার স্বরূপ; যে যত অপরকে ভালবাসিতে পারিবে অর্থাৎ যাহার ভালবাসার গণ্ডী যতই বৃদ্ধি হইবে, সে ততই ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইবে। পুকুরে একটি ঢিল নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, ঢিলের চতুর্দ্দিকের চাকাগুলি ক্রমশঃ বড় হইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়; সেইরূপ ভালবাসার সীমা বৃদ্ধি পাইলে মানুষও ক্রমে ভগবানে মিশিয়া যায়। শ্রুতি বলিতেছেন, 'স্ত্রী স্বামীর জন্য স্বামীকে ভালবসে না বা স্বামী স্ত্রীর জন্য স্ত্রীকে ভালবাসে না, স্ত্রী স্বামীর ভিতর যে আপনাকে দেখিতে পায় তাহার জন্য স্বামীকে ভালবাসে'। নিকৃষ্ট ভালবাসার কথা আলাদা, ইহার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। এখানে স্ত্রী বা স্বামী আপনার আত্মাকে

বাড়াইয়া দুই শরীরে প্রতিষ্ঠিত করে, ইহাই ভালবাসা বাড়াইবার রীতি। ক্রমে এই ভালবাসা পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু ও পরিজনে বিস্তৃত হইলে ক্রমশঃই আপনার আত্মাকে বৃদ্ধি করা হয় এবং অসীম হইলে ভগবানে মিশিয়া যায়।

আমাদের পুত্র কন্যা দোষ করিলে অনায়াসে তাহা মার্জ্জনা করিয়া তাহাদের আদর করি, কারণ তখন মনে করি যে তাহারা ভুল ক্রমে বা অজ্ঞানবশে অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে। যখন আমরা বুঝিব, মানুষের সকল দুঃখ কষ্ট অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন, এবং মুনিদিগেরও মতিভ্রম হয়, তখন অপরকে ক্ষমা করিব না কেন? এই সহানুভূতি হইতে ভালবাসা আসে এবং ভালবাসা হইতে মানুষ মানুষের সাহায্য করে। শ্রুতি বলেন, ব্রহ্মদানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান। অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞানদানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান। মানুষকে আপনার স্বরূপ দেখাইয়া দেওয়া এবং মানুষের ভিতর যে সকল গুপ্ত শক্তি আছে তাহাদের জাগাইয়া দিলে মানুষকে যেরূপ উন্নত করা হয়, সেইরূপ আর কিছুতেই হয় না। ভিখারীকে দুমুঠা চাল দিলে অন্ততঃ সেই দিনের দুঃখ কষ্ট নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু দিনের পর দিন তাহার জন্য যে দুঃখ কষ্ট অপেক্ষা করিয়া আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান ব্যতীত কিরূপে নিবারিত হইবে?

মানুষের ভালবাসা হইতে মানুষের উন্নতির পরিমাণ পাওয়া যায়। মন্দলোক জগৎকে মন্দই দেখে, ভাললোক জগৎকে ভাল দেখে। বাহিরের বস্তু নিমিত্ত মাত্র; আমাদের ভিতর যে ভালবাসা আছে তাহা দিয়া আমরা বাহিরের বস্তুকে সাজাইয়া দেখি। আমরা নিজে ভালবাসাপূর্ণ হইলে ঐ ভালবাসা দিয়া বাহিরের লোককে মণ্ডিত করিলে লোকটাকে ভালই দেখিব। যে পরিমাণে ভালবাসার অভাব হইবে সেই পরিমাণে লোকটাকে নীচু বলিয়া দেখিব। প্রায় দেখা যায়, একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক একটী

কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসে, ইহারও ঐ কারণ। সুন্দরী স্ত্রী আপনার সদ্‌গুণ দিয়া কুৎসিত পুরুষকে ঢাকিয়া সৎলোক বলিয়া জানে। শামুকের ভিতর বালির কণা ঢুকিলে যেমন শামুকের রস বহির্গত হইয়া বালিকে আচ্ছাদন করে এবং মুক্তায় পরিণত করে, মানুষের ভালবাসাও আপনার সদ্‌গুণ লইয়া অপরকে বিভূষিত করে। যে মানুষ মুক্ত হইয়াছে সে সর্ব্বত্রই ভগবানকে দেখে এবং উহা জানিয়া ভগবানের কার্য্য করে। সে আপনার জন্য শুধু জন্মধারণ করে না, তাঁহার কাজ করিতে করিতে আপনার বলিয়া যা কিছু আছে সমস্ত বলিদান দেয়। সে তখন তুঁহু তুঁহু ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারে না এবং তাহাতেই মগ্ন থাকে। ভগবানের হাতের লেখনীর মত তাহার ভিতর দিয়া তখন ভগবান প্রকাশিত হন এবং সেই স্বর্গীয় ভাব ও ভালবাসার সম্মুখে জগৎ নতমস্তকে দণ্ডায়মান হয়।

———

উপসংহার।

শাস্ত্রকথিত দুঃখনিবৃত্তি বা সুখের উপায় তিনটী, যথা—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। সকলেরই উদ্দেশ্য এক,—মন জয় করা। বিভিন্ন মার্গগুলি যে একেবারে স্বতন্ত্র তাহা নহে, একে অপরের সাহায্য করে। কর্ম্ম যেরূপ জ্ঞানের সাহায্য করে, জ্ঞানও সেইরূপ কর্ম্মের সাহায্য করে। কর্ম্ম হইতে ভক্তি আসে, আবার জ্ঞান হইতেও ভক্তি আসে এবং ভক্তি হইতে জ্ঞান আসে। শেষে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি একপথে মিলিত হয়, তখন তাহাদের চিনিবার উপায় থাকে না। যে প্রকৃত সাধক তাহাকে জ্ঞানী বলা যায়, কর্ম্মী বলা যায়, আবার ভক্ত বলা যায়। যে ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত তাহাকেই ভক্তি বলে, তাহা অসাধারণ ও অটুট। সাধারণ লোকে যাহাকে ভক্তি বা ভগবানে বিশ্বাস বলে তাহা অতি ক্ষণভঙ্গুর। দুঃখে, কষ্টে বা লোভে পড়িলে তাহাদের ভগবানে বিশ্বাস বা তাঁহার নাম পর্য্যন্ত মনে থাকে না।

যাঁহারা ভগবানকে চান বা যাঁহারা দুঃখের কবল হইতে চিরমুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি ঐ পথেই লইয়া যায়। যাঁহারা পূর্ণরূপে মনোজয় করেন অর্থাৎ বশিষ্ঠ মুনির কথায় পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের আর কোনও কর্ম্ম থাকে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাঁহাদের যে সকল আচার ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে তাহার কতকগুলি সাধারণের পক্ষে খাটে না। যেমন অহিংসা বলিতে সিদ্ধব্যক্তি যেরূপ সর্ব্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত, গৃহস্থ সেরূপ ত্যাগ করিতে পারে না। সাধক যেরূপ প্রাণীবিনাশ না করিয়া বা কোন প্রাণীর মনে কষ্ট না দিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, গৃহস্থ তাহা পারে না। ভাল লোকে সব ভাল দেখে, ইহার অর্থ এরূপ নয় যে গৃহস্থ চোরকে প্রশ্রয় দিবে বা

দস্যুকে ভালবাসিবে। যাঁহারা মুক্ত পুরুষ তাঁহাদের পক্ষে ভাল লোক মন্দ লোক একই কথা—তাঁহারা নির্যাতিত হইলেও শত্রুর মঙ্গল-কামনা করেন। তাঁহাদের পক্ষে লোকাচার ও ধর্ম্মের অনুশাসন খাটে না, কারণ তাঁহারা যে সত্যলাভ করেন তাহা ধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক বড়। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সংসারে থাকিতে হইলে লোকাচার ও ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়।

সৎকর্ম্ম যেমন আমাদের চরিত্র গঠন করে, ধর্ম্মও সেইরূপ চরিত্র-গঠনের সহায়তা করে। একটি চারাগাছ রক্ষা করিতে হইলে যেমন বেড়া দিয়া উহা বেষ্টন করিয়া রাখিতে হয়, সেইরূপ চরিত্র গঠন করিতে হইলে প্রথমে আমাদের ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। ইহাতে কেবল তাহার নহে, যাহারা ঐ ধর্ম্ম মানিয়া চলে তাহাদেরও উপকার করা হয় এবং সকলে মিলিয়া এক ধর্ম্ম এবং একরূপ আচার ব্যবহার মানিয়া চলিলে সমাজ ও ক্রমে জাতি গঠিত হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি যেরূপ মনোজয়ের পথ দেখাইয়া দেয়, ধর্ম্মও বিভিন্ন অনুশাসন বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা ঐ পথই দেখাইয়া দেয়। যে যেরূপ কর্ম্মের অধিকারী সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী লোকের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা আছে।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কি কি দ্রব্য ভোজন করা আবশ্যক মাত্র তাহাই বলিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিথি ও বার হিসাবে প্রতিদিন কিরূপ আহার করিলে শরীর সুস্থ থাকে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সহজ-প্রাপ্য পুষ্টিকর খাদ্যে যেরূপ মন জয় করা যায়, সেরূপ লালসা-অনুযায়ী নানারূপ দ্রব্য ভোজনে মন জয় করা যায় না; লালসার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যেরূপ রুচিকর দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছি, সেইরূপ পরের অনুকরণ করিয়া আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদও বাড়াইয়াছি।

ধর্ম্মবিহীন অন্যায় অভাব সৃষ্টি করিয়া তাহা পূরণের নিমিত্ত আমরা পদে পদে দুঃখ কষ্ট অনুভব করি। এই অন্যায় অভাব পূরণের নিমিত্ত আমরা আয়বৃদ্ধির জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াই, কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না—এই সকল অভাব সৃষ্টি না করিলে এবং তাহার জন্য অন্যায় খরচ না করিলে আমাদের আয় কত বাড়িয়া যায়। একজন গ্রীকদেশীয় ঋষি এইরূপ বলিয়াছেন,—'যে পরিমাণে লোক যে পরিমাণ বস্তু ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করে সেই পরিমাণে তাহার ধনের পরিমাণ বুঝায়।' ইহা অতি সত্য কথা; মানুষ যত উন্নত হয় ততই তাহার কামনা ও সাজসজ্জা কমিয়া যায়।

হিন্দুশাস্ত্রে মনোজয়ের জন্য বা সর্ব্বভূতে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিবার জন্য সাকার নিরাকার সকলরূপ পূজার ব্যবস্থা আছে। সাকার পূজা নিরাকার পূজার সহায়তা করে, এজন্য নানারূপ দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা সর্ব্বভূতে ভগবানের উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদেরও দেবদেবীর প্রতিমায় ভগবান্ নাই একথা বলা সাজে না। পুত্তলিকা পূজা লইয়া কেবল হিন্দু নহে, নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকে দ্বন্দ্ব বিবাদ সৃষ্টি করে, কিন্তু তাহারা জানে না, তাহারা সাধারণ লোককে কিরূপ ধর্ম্মবিহীন করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এই বিষয়ে জেলালুদ্দিন একটি গল্প লিপিবদ্ধ করেন, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা এক কৃষক এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছিল "হে ভগবান তুমি কোথায় আছ আমাকে দেখা দাও, আমি তোমার সেবা করিব, আমি তোমার জুতা পরিষ্কার করিব, আমি তোমার চুল আঁচড়াইয়া দিব, বস্ত্র সীবণ করিব ও তোমার জন্য দুগ্ধ যোগাড় করিব।" মোসেস্ নামক এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-ব্যক্তি পথে চলিতে চলিতে ঐ প্রার্থনা শুনিয়া কৃষককে গালি দিলেন—"রে নির্ব্বোধ, তোর পিতা মুসলমান, তুই কাফের হইয়াছিস্, ঈশ্বর

নিরাকার, তাঁহার ওসকল কাজের আবশ্যক নাই"। এই বলিতে কৃষক ভগ্নোদ্যম হইয়া পলাইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে মোসেস্ আকাশ হইতে একটী অশরীরী বাণী শ্রবণ করিলেন, "রে মূঢ়—মোসেস্! তুমি আমার চাকরকে তাড়াইলে কেন? লোকসমূহকে আমার নিকট লইয়া আসাই তোমার কর্ত্তব্য, তাহাদের আমার নিকট হইতে তাড়ান তোমার উচিত হয় নাই। আমার পূজার নিমিত্ত প্রত্যেক জাতিকে আমি বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতি দিয়াছি। তাহাদের সুখ্যাতি বা পূজাদ্রব্যের আমার কোন প্রয়োজন নাই; আমি তাহাদের অন্তঃকরণ দেখি। আমাকে ভক্তি-প্রদর্শনের নানারূপ উপায় আছে, কিন্তু ভক্তি যথার্থ হইলে আমি তাহা গ্রহণ করি।" এই শুনিয়া মোসেস্ বিগলিত অশ্রুপূর্ব্বক ভগবানের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। সাধু তুকারাম বলেন, "দেব ভাবাচা ভুকেলা" অর্থাৎ দেবতা ভাবের জন্য ক্ষুধিত প্রতীকের জন্য নহে; যাহার প্রতীক বা নিমিত্ত বস্তু যাহাই হউক না কেন তদ্দ্বারা পরমেশ্বরকে যে ভজনা করে, সে পরমেশ্বরেতেই উপনীত হয়। শ্রীভগবান্ বলেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং

(গীতা ৪—১১)

অর্থাৎ আমাকে যে যেরূপে ভজনা করে, সেইরূপই আমি তাহাদিগকে ভজনা করি। তিনি আরও বলিতেছেন, হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রী বৈশ্য ও শূদ্র কিংবা অন্ত্যজাদি যে সকল পাপযোনি তাহারাও পরমসিদ্ধি লাভ করে। (৯ম অধ্যায় ৩২) ভগবান্ কাহারও জাতি দেখেন না বা ব্যবসা দেখেন না। সকল ধর্ম্ম জাতি বা ব্যবসায়ে লোভ আছে, পাপ আছে, আবার চিত্তশুদ্ধি করিবার পথ আছে। মহাভারতে একজন মাংসবিক্রেতা ব্যাধ কোন ব্রাহ্মণকে এবং এক বণিক কোন

তপস্বীকে স্বধর্ম্মানুসারে নিষ্কামভাবে আপনাপন কর্ম্ম করিয়া কিরূ
মোক্ষলাভ হয় ইহাই উপদেশ দেন।* শুভ কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হ
বুদ্ধি ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, ভগবানে ভক্তি আসে। কোন মনুষ্যের যোগ্য
তাহার জাতি ধর্ম্ম বা ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে না, তাহার অন্তঃকর
শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে, ভগবানে ভক্তিও
বিশ্বাস রাখিয়া উপাসনা ও স্বধর্ম্মানুসারে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করি
সহজেই মন জয় করা যায় তখন আর কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগ
মানুষকে চঞ্চল করিতে পারে না। এখানে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনের
আবশ্যকতা আছে এবং ইহারা সকলেই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় লই
যায়। ইহাই পরম-পুরুষার্থ ইহাই সুখ।

সমাপ্ত।

---

* মহাভারত, বন ২০৬—২১৪, শান্তি ২৬০—২৬৩

সত্যের সন্ধান

ও

অন্যান্য প্রবন্ধ।

"There lives more faith in honest doubt,
Believe me, than in half the creeds."
—Tennyson

ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসনের সহকারী শিক্ষক
শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

মূল্য—এক টাকা।

উৎসর্গ।

দিদি!

তুমি জীবনে বড় দুঃখ কষ্ট পাইয়া অকালে আমাদের মায়া কাটাইয়া চিরতরে নিরুদ্দেশ হইয়াছ। কত দিন আমাদের মধ্যে কথা হইয়াছিল,—যে আগে মরিবে সে আসিয়া যে প্রকারেই হউক অপরকে দেখা দিবে। তুমি, দাদা, ক্ষেন্তু—তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে; তারপর কতকাল চলিয়া গেল, এক মুহূর্ত্তের তরেও তো দিদি, একবার আসিয়া দেখা দিলে না, তোমার কথা রাখিলে না! দিদি, তুমি তো কখনো আমার কাছে মিথ্যা কথা বল নাই, তবে কি তুমি বিলীন হইয়াছ? অগ্নির ন্যায় নিবিয়া গিয়াছ? মৃত্যু কি তবে চিরনিদ্রা? তাহাতো ভাবিতে ইচ্ছা হয় না, ভাবিতে যে বড় কষ্ট হয়! তা হউক। দিদি, বুঝিয়াছি আমার সুখ দুঃখে এখন তোমার কিছু আসে যায় না। তুমি এখন সুখ দুঃখের অতীত, তুমি মৃত্যুর কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছ। তবে তো দিদি, আমার আর কোনো দুঃখ নাই। তোমার যে সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, ইহাই আমার শান্তি।

তোমারই পুণ্য-স্মৃতিতে, তোমারই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে উৎসর্গ করিলাম।

তোমার স্নেহের ভাই—

শ্রীযোগেশ।

…man Sudhi Bhushan Bhattacharya, with b compliments.
Suresh Chakraberty
Uttara-Office
Benares City

ভূমিকা ।

বন্ধুবর যোগেশবাবু কিছুতেই ছাড়িবেন না ; তাই "সত্যের সন্ধান" আমারও মত নগণ্য লোকের লেখা ভূমিকা-সংযুক্ত হইয়া বাহির হইতেছে।

ছোট বই—মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটী প্রবন্ধের সমষ্টিমাত্র কিন্তু উপেক্ষার জিনিষ নয়। কবিতা ও উপন্যাসসর্ব্বস্ব বাঙ্গলাসাহিত্যে এই শ্রেণীর স্বাধীনচিন্তামূলক গ্রন্থের দর্শনলাভ আশ্চর্য্য ব্যাপার বিশেষ। সে কারণেও লেখক ধন্যবাদার্হ।

বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে, বাপ পিতামহের ধর্ম্মে আগের মত আস্থা রাখা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বাসই ছিল সে ধর্ম্মের ভিত্তি। সেই বিশ্বাসের মূল দিন দিনই ছিন্ন হইতেছে এবং পূর্ব্বকালের ধর্ম্ম ও দর্শন বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে আর যেন খাপ খাইতেছে না; মূলজীবনের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। সংসারের অধিকাংশ লোকই "গতানুগতিকতারই" পক্ষপাতী ; যা আছে তাই তাদের কাছে সুন্দর, শ্রেষ্ঠ ; পরিবর্ত্তনের তারা কোনও দরকার মনে করে না। প্রাচীন ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া তাহারা চলিয়াছে। কিন্তু মাঝে মাঝে দুচারিটী লোক এমনও দেখা যায়—সুখের বিষয় এঁদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে—যাঁরা নিজ ভাবে জ্ঞানের সাহায্যে জীবনরূপ ব্যাপারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া চলিতে চান। গ্রন্থকার এই শ্রেণীর লোক। আজীবন তিনি এই চেষ্টা করিয়াছেন, নানাগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন—এখন "প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছেন" ; বিবাহ করেন নাই, [illegible]

বোধ হয় অবসর ঘটিয়া উঠে নাই বা তাহার সাপক্ষে তিনি তেমন সম্যক্ কারণ খুঁজিয়া পান নাই। বাংলার মত জায়গায় যেখানে বিবাহ না করা একটা অলৌকিক ব্যাপার, এভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় শুধু গ্রন্থচর্চ্চায় মগ্ন থাকিয়া জীবন কাটান—ইহাও একটী নিতান্ত আশ্চর্য্য আনন্দদায়ক বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে। "সত্যের সন্ধান" নামক এই ক্ষুদ্র বইখানিতে গ্রন্থকার সেই আদি সত্যেরই সন্ধানে বাহির হইয়াছেন—যাকে উপলব্ধি করিবার জন্য লোকে যুগে যুগে অস্থিরচিত্ত হইয়া ঘুরিতেছে।

আত্মা একটা কল্পনার বিষয়, ইহার সন্ধান কেহ পাইয়াছে কি? আমার দেহ মধ্যে নাকি ইহার স্থান, কিন্তু কৈ এ পর্য্যন্তত তাহার দেখা মিলিল না! ভগবানও এইরূপ—খুঁজিলে দূরেই সরিয়া যান। বিশ্বাস যে দিন গিয়াছে, সে দিন হইতে তিনিও গা-ঢাকা দিয়াছেন। মানুষ দুর্ব্বলচিত্ত—খোলা সত্যের মুখোমুখী—যেখানে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নাই—দাঁড়াইতে অনেকেরই সাহসে কুলায় না; ভগবানরূপ একটী আশ্রয়কে পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গিয়াছে। আদি-অন্তহীন আঁধারে ঢাকা ঘটনাশ্রেণীর মধ্যে নিরবলম্ব অবস্থায় দাঁড়াইতে তার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। তাই ভগবানরূপ কোটরের ভিতর চোখ বুজিয়া মাথা গুঁজিয়া বিনাবাক্য-ব্যয়ে সে কোন প্রকারে জীবনকাটাইয়া যায়। এই জন্যই দেখা যায়, তেমন বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক—তিনিও ধর্ম্ম ব্যাপারে নিতান্ত বালকের ন্যায় গোবর-গণেশটী। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্কের সময় তাঁরও যুক্তির আশা করা বৃথা।

এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বাপরই এই সার সত্য খুঁজিয়া বাহির করিবার মহৎ প্রয়াস চলিয়া আসিয়াছে। বেদের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত কতভাবে না তত্ত্বটীকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দর্শন ও ধর্ম্মের এতদিন ধরিয়া এমন একাদিক্রমে আলোচনা পূর্ব্বাপর জগতে আর

কোথায়ও হয় নাই। এমন সর্ব্বধর্ম্মের সম্মিলনও আর কোথাও দেখা যায় নাই। এই ভারতবর্ষেই চার্ব্বাক নামে এক মহাপণ্ডিত দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি "আত্মা" ও "ব্রহ্মের" অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইয়া নাস্তিকতাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই সাধু তত্ত্বান্বেষীর দর্শনরাজ্যে স্থান হইল না। সত্য কিন্তু মরিবার নয়। এতদিন পরে সেই নাস্তিকতাবাদই জড়বাদ (materialism), সংশয়বাদ (agnosticism) প্রভৃতি নানামূর্ত্তিতে কি এদেশে কি ইউরোপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে এবং ক্রমে তাহার প্রতিপত্তিও বাড়িয়া চলিয়াছে। এক সময় ছিল, যখন ধর্ম্ম লোকের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ ছিল—এখন ? ফরাসীদেশে ধর্ম্ম রাজ্যশাসন হইতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ; রুশিয়াতে তাহার সম্পূর্ণরূপে মূলচ্ছেদ হইয়া নির্জলা নাস্তিকতাবাদ প্রচার হইতেছে। ধর্ম্ম যে একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কারের বোচ্‌কা, ওটাকে মাথার উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া হাল্‌কা হইয়া চলাই যে বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য, ইহা অনেকেই বুঝিতেছেন।

জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বাসলোপের সঙ্গে সঙ্গে, সর্ব্বত্রই সংশয় দেখা দিয়াছে – কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য সর্ব্বত্রই মনীষিগণ যুগপীড়ায় কাতর।

এখন কথা হইতেছে "কঃ পন্থাঃ ?" সোজা কথায় প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মই অন্তঃসার শূন্য, সকলটিকেই না ত্যাগ করিয়া উপায় নাই। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে বিজ্ঞান ভাঙ্গিতেছে যথেষ্ট কিন্তু তার জায়গায় নূতন কিছু মনোমত ধর্ম্মের আভাস দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়াও তো চলা যায় না—সে যে আরো বিড়ম্বনা। বালকের মত হা ভগবান্! হা ভগবান্! করিয়া প্রার্থনা করা—সে অন্ধের অভিনয় শেষ হইয়াছে।

মানুষের শক্তি এ পর্য্যন্ত কি সব বৃথা প্রয়াসে না ব্যয়িত হইয়াছে, আর কি সব লোক এবং লেখাই এ যাবৎ লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে! তারা নিজেরাও কিছু বোঝে নাই, অথচ পরকেও বিপথে নিতে ত্রুটী করে নাই। অথবা, এ যেন অন্ধের অন্ধকে চালাইবার চেষ্টা — দুজনেই ভ্রান্ত। এখনো কিন্তু তাহাদের প্রভাবই চলিয়াছে—এখনো ভগবান ও আত্মা বলিয়া কত কি বলা হইতেছে; কত ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইতেছে, ভগবানের প্রতি কাকুতি-মিনতিভরা কত সব কবিতা রচিত হইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

"সত্যের সন্ধান" গ্রন্থে লেখক উপরোক্ত বিষয় সকল এবং বৈষম্যপূর্ণ যে সকল আচার নীতি সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার সম্বন্ধে নানাকথার অবতারণা করিয়াছেন এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। 'নেতি, নেতি,' করিয়া তিনি সবই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "ভগবানকে" খুঁজিয়া তিনি পান নাই; 'আত্মার'ও দর্শনলাভ ঘটিয়া উঠিল না। তাই তিনি হতাশ হইয়া পরসেবারূপ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহার নিজের কথায়, "মনে করিলাম, আর সত্যের সন্ধানে বৃথা শক্তি নষ্ট করিব না, যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব পরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিব। এই আদর্শ মনে রাখিয়া কার্য্য করিলে কিছু শান্তি পাওয়া যায়, ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম স্থির করিলাম।" কিন্তু কথা হইতেছে এমন জল মিশানো দুধে কোন কাজ হইবে কি? যাঁর চক্ষে জগতের আদি কারণ বলিয়া কোন নির্দ্দেশ ধরা দিলনা—কোথা হ'তে, কেন, কোথা যাব—এ সকল প্রশ্নের উত্তর সারা জীবন যিনি চেষ্টা করিয়াও পাইলেন না - পরসেবাতেই তাঁর প্রাণ পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিবে কি? এ-যে শতছিদ্র পাত্রে অমৃত সঞ্চয়ের চেষ্টা।

সাধারণ পাঠকের জন্য এ বই নয়। যাঁরা চিন্তাশীল—জীবনরূপ-ব্যাপার যাঁরা বুঝিতে ইচ্ছুক—তাঁদের অনুরোধ করিতেছি এই বইখানা পড়ুন; ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ভিতর যে রত্নকণা ছড়াইয়া আছে তাহার সঙ্গে পরিচিত হইয়া নিশ্চয়ই অশেষ আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

নিবেদন।

অবসর সময়ে যাহা চিন্তা করিতাম তাহা লিখিয়া রাখিতাম। সেই লেখাগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি উহা স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইলাম। আমার লেখাগুলি সর্ব্বসাধারণে কিরূপভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা জানি না। আমার জীবনে যে সমস্যাগুলি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমার নিজের দিক দিয়া যেভাবে দেখিয়াছি ও সমাধানের চেষ্টা করিয়াছি আজ তাহা লইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। সকলে যে, আমার সহিত একমত হইবেন তাহা সম্ভবপর নহে, কেননা বৈচিত্র্যই জগৎ। প্রকৃত সত্য কি, তাহা জানি না, কোনো নূতন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সরল প্রাণে উপস্থিত করিলাম। যদি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কাহারও চিন্তার ধারা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় তাহা হইলেই আমি আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, কলিকাতা ইউনিভারসিটি কমিশন কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত, "প্রহেলিকা," "জঞ্জাল" ও "জীবন" ইত্যাদি গ্রন্থপ্রণেতা মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম্ এ; বি, এল্ মহাশয় তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া আমার পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

নানা কারণে স্থানে স্থানে মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়া গেল তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছি।

ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসন, ঢাকা।
২৫শে চৈত্র, ১৩৩০ সন।

গ্রন্থকার।

সূচী।

সত্যের সন্ধান।

নাস্তিকের প্রেম।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে শশাঙ্কশেখরের দেশ-হিতৈষণা প্রবৃত্তি বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিল। সে গ্রামে ডিবেটীং ক্লাব খুলিয়া, সভা জমাইয়া, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, জাতিবিচারের অনিষ্টকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিত। যদি কেহ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিত, তাহা হইলে শশাঙ্কশেখর হার্বার্ট স্পেন্সার, মিল, হাক্সলি প্রভৃতি পণ্ডিতদের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিত।

শশাঙ্কশেখর কলেজে পড়া অবধি ধর্ম্মবিশ্বাসের ও কবিত্বের নিতান্ত বিরুদ্ধে ছিল। তাহার মতে অজ্ঞ ও দুর্ব্বল লোকেরাই ধর্ম্মবিশ্বাসী হয় এবং পিত্তপ্রধান হইলে ও যকৃতের ক্রিয়ার দোষ ঘটিলেই মানব-হৃদয়ে প্রেমরোগের আবির্ভাব হয় এবং যন্ত্রণায় হা-হুতাশ করে। এইসব রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে মধ্যে মধ্যে জোলাপ দিলেই মনের বিকার অবস্থা সারিয়া যায়।

শশাঙ্কশেখর কোনও দুঃখ প্রকাশের সময় হঠাৎ 'হা ঈশ্বর!' বলিয়া ফেলিলে যদি কেহ তাহাকে কপট নাস্তিক বলিয়া উপহাস

করিত, তখন সে বুঝাইয়া দিত যে, উহা মাত্র অভ্যাসদোষ এবং 'হা ঈশ্বর!' কথাটি সম্পূর্ণ অর্থবিহীন,—খেদপ্রকাশ মাত্র। শশাঙ্কশেখর বলিত চাকরী করাটা নিতান্তই গোলামী; উহাতে মনুষ্যত্ব লোপ পায়। শশাঙ্কশেখরের জ্যেষ্ঠ ভাই হেম বাবু বারাশতে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার। তিনি শশাঙ্কশেখরের জন্য অনেকবার চাকরী যোগাড় করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক চাকরী করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না; অবশেষে জ্যেষ্ঠ ভাই বিরক্ত হইয়া শশাঙ্ককে পত্র লেখা একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। শশাঙ্ক ইহাতে বড় মর্ম্মাহত হইল। এডুকেশন গেজেট দেখিয়া ত্রিপুরা জেলায় হরিপুর গ্রামে একটি মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদের জন্য শশাঙ্ক আবেদন করিল এবং ঐ পদ প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার সময় শশাঙ্কশেখরের বৃদ্ধা মাতা কত কাঁদিলেন! মাকে প্রবোধ দিয়া শশাঙ্কশেখর কার্য্যস্থানে যাত্রা করিল। শশাঙ্কশেখর, যদি বিবাহ করে, তবে কিরূপ বিবাহ করিবে, এবিষয়ে কল্পনায় তাহার ভবিষ্যৎ পত্নী সম্বন্ধে একটা আদর্শ স্থির করিয়াছিল। তাহার পত্নীটি রূপসী হউক বা না হউক, বিদুষী (বিশেষতঃ লজিকে) এবং নাস্তিকভাবাপন্ন অবশ্য হওয়া চাই।

কুসংস্কারাপন্ন অল্পবয়স্কা মূর্খ গ্রাম্য বালিকা বিবাহ করিবার ভয়েই, বৃদ্ধা মাকে বিবাহ করিবে না বলিয়া, সে অনেকবার বলিয়াছিল। মাতা মনে করিলেন ছেলেরা প্রথম

ঐরূপ করিবেই, কোনও সুন্দরী মেয়ের সহিত ভাল করিয়া প্রস্তাব করিলেই ছেলে সন্তুষ্ট হইয়া বিবাহ করিবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া, বৃদ্ধা মাতা নিজেই অনেকটা উদ্যোগী হইয়া ন-পাড়ার হরিনাথ বসুর কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং শশাঙ্কশেখরকে শীঘ্র বাড়ী আসিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করিতে, মাথার দিব্য দিয়া পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়াই শশাঙ্কশেখরের হৃদয়ে পূর্ব্বের ভীতিপ্রদ বিবাহকল্পনা বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিল। শশাঙ্ক মাতার নিকট পত্র লিখিল,—"বিবাহ সাধারণতঃ দারিদ্র্য আনয়ন করে, পারিবারিক অশান্তি ঘটায় এবং বিবাহের পর পুত্র মাতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়। দারিদ্র্যই যত দোষের আকর। উহাতে নীচাশয় করে, নৈতিক সাহস হ্রাস পায়, উচ্চ চিন্তা মনে স্থান পায় না; সুতরাং বিবাহ আমার পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। পত্র পাইয়া বৃদ্ধা, পুত্রের বিবাহে অরুচি দেখিয়া মনে বড় কষ্ট পাইলেন এবং পুত্রের মাতৃভক্তির কথা মনে করিয়া আনন্দিতও হইলেন।

বৃদ্ধা জীবনের বাকি কএকটা দিন কাশীবাস করিবেন মনস্থ করিলেন। মাতা যাইবার সময়, জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া, মাতার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। মাতা অশ্রুসিক্তনয়নে বলিলেন,—"বাবা হেম, তোর পিতার মৃত্যুর পর অতি কষ্টে আমি তোদেরে মানুষ করিয়াছি। আজ তুই বড় হইয়াছিস্, আমার শশাঙ্কের ভার তোর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিতেছি, দেখিও বাবা, আমার শশাঙ্কের

যেন কোনও কষ্ট না হয়। ও যখন ইচ্ছাকরিয়া বিবাহ করিতে চাহিবে, তখনই করাইও।” হেমচন্দ্র বলিলেন, “আচ্ছা মা, আমি উহাকে দেখিব, উহার কোনও কষ্ট হইবে না। আমাদের জন্য কোনও চিন্তা করিও না।” মাতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া, পবিত্র কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

শশাঙ্কশেখর একদিন প্রত্যূষে দেখিতে পাইল, একটী বিধবা-বেশধারিণী সুশ্রী নববিকসিতযৌবনা বালা সাজি ভরিয়া সম্মুখস্থ উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছে; দেখিয়াই শশাঙ্কশেখরের মনে একটা গুরুতর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এতদিন পর যুক্তির কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া ভাবের স্রোত ছুটিল। শশাঙ্কশেখরের মাথা ঘুরিয়া গেল। ধমনীতে বেগে রক্তপ্রবাহ বহিতে লাগিল। বালিকা ফুল তুলিতে তুলিতে সহসা শশাঙ্কশেখরের দিকে চাহিল। অমনি চারি চক্ষুর মিলন হইল। বালিকা লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটাইয়া বেগে শশাঙ্কশেখরের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। শশাঙ্কশেখর মুগ্ধনেত্রে নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া একভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শশাঙ্কশেখরের জীবনে এইবার প্রথম সৌন্দর্য-বোধ ও ভাবরাজ্যে পদার্পণ হইল। শশাঙ্কশেখর অনেক বার অনেক বালিকা দেখিয়াছে, কিন্তু এবার এরূপ হইল কেন?

শশাঙ্কশেখরের প্রত্যেক বিষয়েই যুক্তিকরা একটা অভ্যাস ছিল। তাহার হঠাৎ এই ভাবান্তর হইবার কারণ কি এ বিষয়ে অনেক যুক্তি উদ্ঘাটন করিয়াও, কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

সে একটা গভীর আকুলতা অনুভব করিতে লাগিল। শশাঙ্কশেখর ভাবিতে লাগিল "হে আমার হৃদয়ের দেবতা! আমার জীবনের আলো, আমার সর্ব্বস্ব, আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার নিকট আর কিছু চাহি না। শুধু তোমায় আর একটি বার দেখিবার বাসনা। তুমি সুখী হও, কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।" যে ভালবাসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই ভালবাসা সে কার্য্যে কিরূপে প্রকাশ করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। উচ্চ দেবদারু-বৃক্ষে কোকিল করুণস্বরে গাইতে লাগিল। শশাঙ্কশেখরের হৃদয়েও একটা কোমল অব্যক্ত বেদনা জাগরিত হইয়া উঠিল।

শশাঙ্কশেখরের আজ রাত্রিতে ভাল ঘুম হইল না। সে তন্দ্রায় কেবলই ঐ মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিল। প্রত্যূষে উঠিয়া শশাঙ্কশেখর এক খণ্ড কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখিল—তুমি সত্য, তুমি শিব, তুমি সুন্দর। তুমি আমার সুখ-শান্তি, আশা-তৃষ্ণা। তুমি আমার বিদ্যা—-আমার ঈশ্বর। আমি অন্য ঈশ্বর জানি না।

শশাঙ্কশেখরের মনে অন্য চিন্তা নাই। আজি সে উদ্ভ্রান্ত—উন্মত্ত। বিদেশে অনন্যোপায় হইয়া নিজেরই রন্ধন করিতে হইত। আজ তাহার কিছুই মনে নাই, কেবলই সেই চিন্তা। স্কুলে যাইতে হইবে, বারটার সময় হঠাৎ একথা মনে পড়িল। অমনি অভুক্ত অবস্থায় সে স্কুলে চলিয়া গেল। হতাশে, উদ্বেগে তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

রমণী পরশমণি। প্রথম দর্শনেই শশাঙ্কশেখর আত্মহারা হইল—তাহার শুষ্কহৃদয়ে অমৃতসিঞ্চন হইল। প্রেম অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করে, কঠিনকে দ্রবীভূত করে, নীরসকে মধুর করে। বালিকাকে দেখিয়া অবধি শশাঙ্কশেখরের অন্তরে একটা আনন্দ, একটা বেদনা, একটা বিস্ময়, একটা ব্যাকুলতা, যুগপৎ জাগিয়া উঠিল। বালিকাকে দেখিলেই শশাঙ্কশেখরের উন্নত মস্তক ভক্তিভরে তাহার নিকট অবনত হইত। শশাঙ্ক-শেখরের প্রেমে, লালসা নাই, ভক্তি আছে; আকাঙ্ক্ষা নাই, শ্রদ্ধা আছে; তাঁহাকে কেবল দূর হইতে দেখিয়াই তৃপ্ত হয়।

একদিন শশাঙ্কশেখর মনে করিল "কাল সাহস করিয়া বালিকাকে আমার মনের কথা জানাইব; শুধু বলিব যে, তোমাকে আমি বড় ভালবাসি।" "ইহাতে ত আমি নৈতিক দোষে দোষী নই?" বালিকা নিত্য যেরূপ প্রত্যুষে পুষ্পচয়ন করিতে আইসে, আজও সেইরূপ আসিল। বালিকা একটি গোলাপ তুলিবার জন্য উচ্চে হাত বাড়াইয়াছে, এমন সময় সহসা শশাঙ্কশেখরকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালিকা অপ্রতিভভাবে হাতটা তাড়াতাড়ি টানিয়া লইল। শশাঙ্কশেখর আসিয়াই কাতরস্বরে বলিতে লাগিল,—"সরলা, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। তুমি সুন্দর, তুমি পবিত্র।" বালিকা কাঁপিয়া উঠিল; সরলা আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরিল।

শশাঙ্কশেখরের সেই কাতর প্রার্থনা মনে পড়ায়, দুঃখে ও লজ্জায়, সরলার অধর ওষ্ঠ কম্পিত হইল। ওদিকে

শশাঙ্কশেখর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ মুহূর্ত্তের তরে ঢালিয়া অত্যন্ত শান্তি অনুভব করিল।

পৃথিবীতে একপ্রকার ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বার্থ-বিজড়িত, আর এক প্রকার ভালবাসা আছে তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থ-শূন্য। প্রেমিক প্রেমপাত্রের জন্য যত অধিক আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে, ততই সুখী হয়।

স্বপাকভোজী আত্মীয়পরিজনহীন প্রবাসী শিক্ষকের দুঃখ ও অসুবিধার কথা মনে করিয়া, সরলা শশাঙ্কশেখরের জন্য বড় ব্যথিত হইত। সরলার ইচ্ছা হইত এই বিদেশী যুবকটিকে, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, দু'বেলা পরিতৃপ্তির সহিত আহার করায়—তাঁহার সমস্ত অসুবিধা নিজ হাতে দূর করিয়া আত্মাকে সুখী করে।

শশাঙ্কশেখর একদিন অপরাহ্নে শুনিতে পাইল, সরলার ওলাউঠা হইয়াছে। শুনিয়াই শশাঙ্কশেখরের সমস্ত হৃদয় বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সরলার বেদনাক্লিস্ট মুখখানি এবং জ্যোতিহীন ম্লান চক্ষুদুটি তাহার কল্পনায় উদিত হইল। নিজের শারীরিক মানসিক সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াও, সরলার পরিচর্য্যার জন্য শশাঙ্কশেখর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল দুঃখে শশাঙ্কশেখরের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিল। শশাঙ্কশেখর উন্মত্তের ন্যায় সরলাদের বাড়ার দিকে ছুটিল! কিছুক্ষণ বাড়ীর চারিদিকে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া, প্রবেশাধিকারের কোনরূপ সঙ্গত কারণ না

পাইয়া, অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে স্বগৃহে আসিয়া বসিল। তখন শশাঙ্কশেখরের ইচ্ছাশক্তির (willforce) কথা মনে পড়িল। সে একাগ্রচিত্তে ভগবানের নিকট সরলার আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিল! কিন্তু কাহারও অনুরোধ বা দীর্ঘনিঃশ্বাসে প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় না। তাহার কঠোর নির্ম্মম নিয়মচক্র, অন্ধবেগে, আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ, অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া, নিয়মিতরূপে আবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। যাহা হইবার, তাহাই হইল। আত্মীয়-স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, শশাঙ্ক-শেখরের হৃদয় বিদার্ণ করিয়া, রাত্রিতেই সরলা ইহলোক পরিত্যাগ করিল। সরলাদের বাড়ীর রোদনধ্বনি শশাঙ্কশেখরের কানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চারিদিকে পরিদৃশ্যমান জগৎ ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিল,—"সরলা ত চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, কেহ বলিতে পার কি? সে এখন কোথায়? কি অবস্থায় আছে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন্ স্থানে তাহার অবস্থিতি?—আর কোন কালেও ফিরিয়া আসিবে না, কত দিন আসিবে,—যাইবে, প্রকৃতি তেমনই অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে চলিবে। সবই আছে, কেবল সরলা নাই—আর আসিবে না!" প্রেমাস্পদের বিয়োগে, সকলের যেরূপ হয়, শশাঙ্কশেখরেরও তাহাই হইল। সরলার মৃত্যুতে সে অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই হইতে শশাঙ্কশেখর নিরামিষভোজী।

বৎসরের পর বৎসর নিয়মিতরূপে চলিয়া গেল। শশাঙ্ক-শেখর এখন স্কুলের কার্য্য সমাধা করিয়া, বাকি সময়, প্রতিদিন

নিয়মিত রূপে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, বেদ-বেদান্ত ভাগবত প্রভৃতি পড়িত। আত্মার অবিনশ্বরত্ব বিশ্বাস করিয়া, মানবজীবন ভ্রান্তিময় বুঝিতে পারিয়া অন্তরে বড় শান্তি পাইল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, শান্ত ও উদার কবিতা পড়িয়া তাহার মনোমোহন ভাবে বিমুগ্ধ হইত। শশাঙ্কশেখর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, সরলার অস্তিত্ব অনুভব করিত। শশাঙ্ক, প্রতিদিন প্রাতে, গভীর ভক্তি-ভরে ভগবানের নিকট হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, সমস্ত আবেগ ঢালিয়া সরলার আত্মার মঙ্গল কামনা করিত।

সরলার একটি ছোট ভাই শশাঙ্কশেখরের ছাত্র ছিল। তাহাকে শশাঙ্কশেখর বিশেষ স্নেহ করিত ও যত্ন সহকারে শিক্ষা দিত। তাহার অর্দ্ধ উপার্জ্জন দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ব্যয়িত হইত।

শশাঙ্কশেখর মধ্যে মধ্যে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিত,—

"Alas for love ! if thou wert all,
And naught, beyond, O earth !"—

যাহাকে ভালবাসি তাহার মৃত্যু হইলে, যদি মনে এ বিশ্বাস না থাকিত যে, পর জগতে তাহাকে পাইব তাহা হইলে কত দুঃখের বিষয় হইত !

আস্তিক ও নাস্তিক।

আস্তিক। আচ্ছা মাষ্টার মহাশয়, আপনি বলেন ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর যে নাই তাহার প্রমাণ কি?

নাস্তিক। ঈশ্বর নাই আমি বলি না, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, ন্যায়বান্, প্রেমময় পরমপুরুষ এই অর্থে যে কোন ঈশ্বর (Personal God) আছেন তাহা প্রমাণভাবে বিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বর আছেন যদি বলেন, তবে সেই প্রমাণের ভার আপনার উপর। যাহা যাহা আছে তাহার প্রমাণ থাকে, যাহা নাই তাহা প্রমাণ করা যায় না, "The negative cannot be proved."

আস্তিক। কি? আপনি বলেন ঈশ্বর যে আছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই? এই পৃথিবী কেমন নিয়মে ও শৃঙ্খলায় চলিতেছে, চুলপ্রমাণ ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, চারিদিকে কেমন সৌন্দর্য্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা। তবু আপনি বলেন, ঈশ্বর নাই?

না। কোথায় নিয়ম শৃঙ্খলা? এক সময় চন্দ্রলোকে জীবের বাসস্থান ছিল এখন জীবের চিহ্নও নাই, এক সময় পৃথিবী ছিল ভীষণ উত্তপ্ত বাষ্প-পিণ্ড, কোথায় ছিল তখন সৌন্দর্য্য আর নিয়ম-শৃঙ্খলা? এক সময় আসিবে যখন সূর্য্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া একটী প্রদীপে পরিণত হইবে "reduced to a lamp." বিসুবিয়সের অগ্নির উদগমে যে দুইটী নগর ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের অধি-

বাসীরাও নিয়ম শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। প্রকৃতিতে অনিয়ম নাই, যাহা ঘটে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়ম অব্যর্থ, এই বিশ্বাসহেতু রূপকভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হয়, প্রকৃত পক্ষে ইহার কোন law-maker নাই। আমিত দেখিতে পাই সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, উৎপীড়ন, খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ।

আ। তিনি ধীরে ধীরে সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টিকে সৌন্দর্য্যের ও পূর্ণতার দিকে বিকশিত করিতেছেন।

না। তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না, তিনি এক পন্থা (process) অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায় না, আর এই চিত্রটী তাঁহার না ফুটাইলেই ভাল হইত। কত বিনাশের পরে এই evolution—ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, "Survival of the fittest" যোগ্যতমের উদ্বর্তন আর অযোগ্যের বিনাশ, এই ত বিকাশের নিয়ম! ছলে, বলে, কৌশলে টেকাই যোগ্যতা। "Nature, red in tooth and claw."

তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বমঙ্গলময় অথচ তাঁহার সৃষ্ট কোটি কোটি নর-নারী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, রোগে, শোকে, জর্জ্জরিত। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কী ভীষণ দৃশ্য! দুঃখ-পূর্ণ এই ক্ষণস্থায়ী জীবন, ইহার জন্য কি কঠোর সংগ্রাম! তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আমাদের পরীক্ষা? তিনি সর্ব্বজ্ঞ, পরীক্ষার প্রয়োজন কি? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে সর্ব্বমঙ্গলময় নহেন, অথবা,

সর্ব্বমঙ্গলময় হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। সন্তান প্রসবকালে মাতার কি প্রাণান্ত যাতনা! প্রসব-কালে কত প্রসূতির প্রাণ নষ্ট হয়; মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী অথচ মৃত্যু-যাতনা কী ভীষণ! কেন ভগবান জীবকে বৃথা এই কষ্ট দেন? এই দেহ-যন্ত্রটা সামান্য কারণেই বিকল হইয়া যায়, ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলের জন্য ভগবানকে প্রশংসা করিতে পারি না, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Helmholtz আমাদের চক্ষুর নির্ম্মাণ-কৌশলের ত্রুটি দেখাইয়া বলিয়াছেন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কৌশলে চক্ষু নির্ম্মিত হইলে ইহার দৃষ্টিশক্তি অনেক গুণ বাড়িয়া যাইত। কোন দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের তিনগুণ, কোথায় বা পুরুষের সংখ্যা নারীর তিনগুণ, ইহাতে কত বীভৎস পাপের সৃষ্টি হয়। ইহাতে কি সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে আপনারা কি প্রকারে দয়াময় ভগবানে বিশ্বাস করেন, ভাবিলে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হই। বোধ হয় গতানুগতিক ভাবেই বিশ্বাস করাটা একটা temperament (স্বভাবগত) হইয়া গিয়াছে। ইহাই ত Slave-mentality (দাসমনোভাব)। ক্ষণকালের দুর্ব্বলতা জনিত পাপের ফল—অনন্ত নরক, অনন্ত জন্ম-মৃত্যু, রৌরবানল, এই সকল ভয়াবহ চিত্র ভাবিলে কাহার না আতঙ্ক জন্মে? অন্ধ বিশ্বাসে কত সরলপ্রাণ নরনারী দুঃখে পড়িয়া দয়াময় ভগবানকে ডাকে, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ব্যাকুলভাবে কত কাতর প্রার্থনা করে কিন্তু তিনি সাড়া দেন কি? মস্‌জিদে প্রার্থনা করিবার সময় ভূমিকম্পে চাপা পড়িয়া

প্রার্থনাকারীর মৃত্যু ঘটে, ইহা দেখিয়াও কি আর দয়াময় ভগবানে আস্থা থাকিতে পারে?

আ। আমরা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, নগণ্য কৃমিকীট, তাঁহার অনন্তজ্ঞানে যাহা প্রকৃত মঙ্গল তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে দোষ দিই। আমাদের জ্ঞান কতটুকু? কতটুকু আমরা দেখিতে পাই? কতটুকু বুঝিতে পারি? হয়ত পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে কোন প্রসূতি প্রসব-কালে মারা গিয়াছে। একজন অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, আর একজন সুস্থ ও সুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে এই পার্থক্যের কারণ কি? পূর্ব্বজন্মের পাপ ছাড়া এই পার্থক্যের আর কোন কারণ থাকিতে পারে না। ঈশ্বর ন্যায়বান, পাপীর দণ্ড তিনি দিবেনই। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ফল এত ক্ষুদ্র দেখিয়া আপনি কি বলিতে চান—ইহা ভগবানের অবিচার? বটের ফল যদি বৃক্ষের অনুরূপ প্রকাণ্ড হইত, তাহা হইলে পথশ্রান্ত পথিক কি বটের স্নিগ্ধ, শীতল ছায়ায় নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারিত? তাহার ভয় হইত,—পাছে ফল মাথায় পড়ে! তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্যে সন্দেহ করাও পাপ—In evil is His grandeur.

না। আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য, সত্য, তবে আমরা না বুঝিয়াই বা কেন তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, দয়াময় ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করি? আমরা সমাজবদ্ধ মানুষের গুণ কল্পনায় যথাসাধ্য বাড়াইয়া কাল্পনিক ভগবানে যুক্ত করি।

অমঙ্গল না থাকিলে মঙ্গল ও মঙ্গল না থাকিলে অমঙ্গল

it His intention ?" তিনি মজা দেখিতেছেন, তাঁহার লীলা ? বটের ফল ক্ষুদ্র, ইহাতে ভগবানের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় না। তাঁহার ঐরূপ মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলে দুর্ভিক্ষে এত মানুষ মরে কেন ?' আপনি সুখে আছেন, সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আপনি তাঁহার অসীম দয়ায় বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু যিনি হতভাগ্য, চিরদুঃখী, তিনি কি জন্য তাঁহাকে অসীম দয়াময় বলিবেন ? এমন কি পাপ আছে যাহার জন্য মানুষকে অনাহারে মারিবার ব্যবস্থা হইতে পারে ? যুদ্ধে কোনো গভর্ণমেণ্ট ত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদিগকে বন্দী করিয়া অনাহারে মারেন নাই, বরং আহত বন্দীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। কত শিশু জন্মিয়া মার বুকের দুধটুকুও খাইতে না পাইয়া মারা যায়,—প্রসূতির স্তনের দুধ হয় শুকাইয়া যায় বা বিষাক্ত হইয়া উঠে, উহা দুগ্ধপোষ্য শিশুরপক্ষে মারাত্মক। আমাদের একটা কুকুরী একবারে এতগুলো ছানা প্রসব করিয়াছিল যে সবগুলো ছানার দুধ সে যোগাইতে পারিত না, শেষে কয়েকটা ছানা না খাইয়া না খাইয়াই মরিয়া গেল। মানব সমাজেও কি এইরূপ হৃদয় বিদারক দৃশ্য, প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই না ? এসব কি পরমকারুণিক পরমেশ্বরের সৃষ্টি বলিতে চান ? এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? কি grandeur (মহত্ত্ব) ইহাতে আছে ? যদি কোনো গভর্ণমেণ্ট এইরূপ দায়িত্বজ্ঞান শূন্য হয় তবে তাহাতে grandeur দেখিতে পাইবেন কি ? হয় বলুন,—তিনি নিষ্ক্রিয় ও

নির্গুণ, (Impersonal) ভাল-মন্দের অতীত; না হয় বলুন,— ভগবান কাহারও পক্ষে সদয় কাহারও বা পক্ষে নির্দ্দয়। আপনি বলিতেছেন, সন্দেহ করাও পাপ। বুদ্ধি বৃত্তির চালনা করিলে যদি পাপ হয় তবে পুণ্য হইবে কিসে? নিজের সত্য নিজে খুঁজিয়া বাছিয়া লইতে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, ইহাই ত কর্ত্তব্য, ইহাতেই মানব জীবনের সার্থকতা। আপনার যদি বিশ্বাস করিবার অধিকার থাকে আমারও তবে সন্দেহ করিবার অধিকার আছে। আপনি যে অধিকার পাইয়াছেন অপরকে সেই অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হন কেন?

আ। যদি মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে তবে লোকে পাপকার্য্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না, সমাজ ধ্বংস হইবে।

না। যে প্রকারের ঈশ্বর বিশ্বাস দেখিতে পাই তাহাতে বোধ হয় না যে ঈশ্বরের ভয়ে, ধর্ম্মজ্ঞানে মানুষ, পাপ হইতে বিরত হইয়াছে। প্রকৃত পাপ কি তাহা কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দেশ করে নাই। Imperialism, Capitalism. Industrialism, বিলাসিতা, অলসতা, পররাজ্যলোভে যুদ্ধ, অযোগ্যের সন্তান-উৎপাদন, এই সকল পাপ ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। Heathen, Pagan, কাফের, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শব্দ পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিচায়ক। কত অমানুষিক অত্যাচার ধর্ম্মের নামে হইয়াছে ও হইতেছে। untouchability (অস্পৃশ্যতা) ও নাকি আপনাদের ধর্ম্মের একটা অঙ্গ? সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, ধনের ও

শক্তির পূজা। নির্ধনের পক্ষে ধার্ম্মিক হওয়া সহজ নহে। এই সব ভাবিলে সত্যই মনে হয় ইহা যেন শয়তানের সৃষ্টি (Devil's creation) "We can forgive God only because He does not exist" আপনি বলিতেছেন ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে অকাতরে পাপ করিবে, সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার মনে হয়, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অভাব পাপের মূল কারণ। দুর্ব্বল জাতি ও দুর্ব্বল ব্যক্তি একটা আশ্রয়, একটা সান্ত্বনা পাইবার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। লোকে সাধারণতঃ সমাজের নিন্দার ভয়ে, শাসনের ভয়ে, আইনের ভয়ে পাপ হইতে বিরত থাকে, বিবেকের ভয়ে নহে। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষায় বিবেক ও বিভিন্ন হয়, সকলের বিবেক এক নহে।

পরকালের ভয়ে, ঈশ্বরের ভয়ে কয়জন পাপ হইতে বিরত থাকে? কয়জন মনে প্রাণে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বর নিরপেক্ষ, ইহাতে কোন অবিনাশী আত্মার স্থান নাই, কুবাসনার বিনাশ ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ইহ-জীবনেই "নির্ব্বাণ" লাভ হয়। "Self is but a heap of composite qualities, there is no Personal Creator, neither the Personal God nor the Absolute. According to Buddha's view, Nirvan can be attained and enjoyed in this life and in this life only"—Buddhism by T. W. Rhys Davids.

বৌদ্ধের লক্ষ্য "নির্ব্বাণ।" "নির্ব্বাণ" লাভ হইলে পুনর্জন্ম হয় না। বৌদ্ধমতে মৃত্যুর পর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়,

ইহাই বুদ্ধের শূন্যবাদ। বৌদ্ধধর্ম্ম স্বর্গের লোভ বা নরকের ভয় দেখায় না। বুদ্ধদেব যে নীতি-ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায়? পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধ, মৃত্যুর পর বিলুপ্ত হইয়া যাইবে সেই জন্য বৌদ্ধের মনে আতঙ্কের উদ্রেক হয় না। বৌদ্ধজাতি কি ধ্বংসের দিকে গিয়াছে? বর্ত্তমানে বলশেভিক রুশিয়া ঈশ্বরকে বাদ দিয়া উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। Religion (ধর্ম্মমত) সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। যাঁহারা স্বর্গলাভের আশায় বা নরকের ভয়ে পাপ হইতে বিরত থাকে, তাঁহাদের ধর্ম্মের ও নীতির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না, কোন ন্যায়বান ভগবান থাকিলে তাঁহাদিগকে স্বর্গে স্থান দিয়া সরল বিশ্বাসের জন্য কোন চরিত্রবান নাস্তিককে নরকে পাঠাইবেন না, ইহা নিশ্চয়,—

"There lives more faith in honest doubt,
Believe me, than in half the creeds."—Tenny-son.

আ। সরল বিশ্বাসে যে শান্তি পাওয়া যায় তাহার পরিবর্ত্তে আপনি কি দিবেন?

না। অন্ধ বিশ্বাসের শান্তি অপেক্ষা জ্ঞানের মুক্তি কি অধিক লোভনীয় নহে?

"A discontented man is better than an ever-contented ass."

আ। পৃথীবীর এত কোটি-কোটি নরনারী আবহমান কাল হইতে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, সেই বিশ্বাসের মূলে কি কোন সত্য নাই? পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ এই সকল জ্ঞান ঈশ্বর না থাকিলে কোথা হইতে আসিল? যদি কোনো পূর্ণ ঈশ্বর না থাকেন তবে আমাদের মনে পূর্ণতার (perfection) ধারণা আসে কি প্রকারে? ঈশ্বর পূর্ণ বলিয়াই আমাদের মনে পূর্ণতার ধারণা আসিয়াছে। আপনি ত পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলিতেছে, কোনো কিছুরই ধ্বংস নাই, কেবল এক পদার্থ অন্য পদার্থে পরিণত হয় মাত্র। বিজ্ঞান 'নাশ' স্বীকার করে না, রূপান্তর স্বীকার করে মাত্র। জড় শক্তির (physical energy) যদি বিনাশ না হয় জীবের জীবত্বই বা নষ্ট হইবে কেন? তাহার মানসিক শক্তিরই বা (intellectual energy) বিনাশ হইবে কেন? আর বিশেষতঃ মানুষের আত্মীয় স্বজনের, যাহাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, মৃত্যুর পরে তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ হইয়া যাইবে, ইহা মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে কি? মৃত্যুর পরে প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া যাইবে, এমন কল্পনাও যে ভয়ানক।

না। "This is just, that is unkind, are merely the ethical creations of the human mind. There is no good or bad but thinking makes it so." Huxley.—পাপ-পুণ্য বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নাই, ইহা মনের

একটা ধারণা মাত্র "Homo men-Sura"—Man is the measure of all things—সমস্তই মানবের মনের কল্পনা। বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেও মানব পাপের জন্য ভগবানের নিকট দায়ী নহে। মানুষ ব্যক্তিগত চরিত্র-অনুযায়ী কার্য্য করে, "every action is the product of two conditions viz. heredity and environment." চরিত্র গঠনে তাহার কোন হাত নাই, জন্মগত প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়। "No person is responsible for his being and the nature and nurture over which he has no control has made him the being he is, good or evil—Karl pearson. ঈশ্বরের নিকট মানুষ পাপের জন্য দায়ী নহে, পুণ্যের জন্যও প্রশংসনীয় নহে। যে Causalityর নিয়মে মানবদেহ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ পারে না, সেই নিয়মেই মানুষ পাপপ্রলোভন জয় করিতে পারে না। গীতায় রহিয়াছে—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"—ভগবান যাহা করান তাহাই করি।

> প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
> অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে।"
> —"প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম্ম চলে
> অহঙ্কারে মুগ্ধ আত্মা আমি কর্ত্তা বলে।"

জীবন সংগ্রামে, natural Selection এর প্রাকৃতিক

নির্ব্বাচন) ফলে যে প্রকারে গরুর মাথায় সিং গজাইয়াছে, জিরাফের গলা লম্বা হইয়াছে, সেই প্রকারে মানুষেরও নীতিজ্ঞান জন্মিয়াছে; নীতিজ্ঞান জীবন সংগ্রামে সহায়তা করে। "Morality is enlightened self-interest." সমাজ রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। পৃথিবীতে একাকী বাস করিলে নীতির কোন প্রয়োজন হইত না। সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের সংখ্যার উপর নির্ভর না করিয়া খাঁটি যুক্তির উপরই নির্ভর করিতে হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিরা খৃষ্টান, অতএব খৃষ্টান ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এইরূপ যুক্তি পাদরীর মুখেই শোভা পায়। ভাল-মন্দের অর্থই বা কি? যাহা এক জনের পক্ষে ভাল তাহা অপরের পক্ষে মন্দ, যাহা এক সময়ে ভাল তাহা অপর সময়ে মন্দ। ভাল হইতে মন্দ ও মন্দ হইতে ভাল ফল উৎপন্ন হয় "Excessive prudence becomes cowardice and excessive thrift leads to miserliness" অতিরিক্ত বুদ্ধি-বিবেচনা কাপুরুষতায় ও অতিরিক্ত মাত্রায় মিতব্যয়িতা কার্পণ্যে পরিণত হয়। পরিমিত ও অপরিমিতের মাঝে সীমারেখা টানা কঠিন। কোনো স্থলে এক ব্যক্তি যে পরিমাণ সাহস প্রদর্শন করিয়া লোক সমাজে বীরপুরুষ বলিয়া সমাদর প্রাপ্ত হন, আবার তিনি-ই ভিন্ন স্থলে সেই পরিমাণ সাহস প্রদর্শন করিয়া বিপদগ্রস্ত হইলে, লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। তখন লোকে বলিয়া থাকে "দুঃসাহসে দুঃখ হয়"। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি

(Aesthetic faculty) একটী উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি। ইহার উৎকর্ষ সাধনে মন উন্নত হয়, পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু ইহা হইতে আবার কতই না অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, "রূপের অনলে ট্রয় পুড়িল, সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে বিপুল রাবণ বংশ ভাসিয়া গেল।" জীবনের দুঃখ-কষ্ট হইতেও আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। আমার মনে একটী ধারণা থাকিলেই যে বাহ্য জগতে উহার কোনো অস্তিত্ব আছে, এরূপ স্বীকার করা যায় না। আমি সোণার পাহাড়ের বিষয় চিন্তা করিতে পারি, মানুষের পাখা আছে কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু ইহা দ্বারা ঐ সমস্তের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। অতএব "Ontological Argument" এর যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল জাতির মনের ধারণাও এক প্রকার নহে। ঈশ্বরের ধারণা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয় (The Evolution of the conception of God—Jnanayoga). কোনো কোনো জাতি ঈশ্বরকে প্রতিহিংসাপরায়ণ, রক্তলোলুপ ব্যক্তি বিশেষ মনে করে।

আপনার যুক্তি শুনিয়া এক পণ্ডিতের কথা মনে পড়ে, তিনি বলিয়াছিলেন,—

কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি ভকারোঽস্তি বিভীষণে।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠে কুলশ্রেষ্ঠে ভকারো নাস্তি রাবণে॥

অর্থাৎ কুম্ভকর্ণ বলিতে যখন ভকার আছে, বিভীষণ বলিতে যখন ভকার আছে, আশ্চর্য্যের বিষয় রাবণ (যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও কুলশ্রেষ্ঠ

বলিতে ভকার নাই। অর্থাৎ রাবণ রাভণ হইবে না কেন? physical energyর যদি ধ্বংস না হয় তবে intellectual energyর ই বা ধ্বংস হইবে কেন? এইত আপনাদের যুক্তি! জড় আর চেতন কি এক? জড়ের ধর্ম্ম কি চেতনে আরোপ করা যায়? Consciousness is not a thing in itself; it is a state of brain action. Life is a state or condition found in certain arrangements of matter. Life apart from matter, is as inconceivable as motion apart from matter—Outline of Evolution by Dennis Herd.

আর জীবের ধ্বংস না হইলেও ত তাহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব (individuality) নষ্ট হইয়া যায়। আমি যদি একটী কাষ্ঠ-খণ্ড দগ্ধ করি তাহা হইলে ইহার অনুপরমাণুগুলির ধ্বংস হয় না বটে, কিন্তু ইহার সেই স্বাতন্ত্র্য (identity, uniqueness) নষ্ট হইয়া যায়। আমার পিতৃব্য যদি নক্ষত্ররূপে বিরাজ করেন তবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব (individuality) রহিল কোথায়? স্মৃতির যোগেই (Continuity of memory) ব্যক্তিত্ব। আর আপনি শেষে যাহা বলিলেন তাহা sentiment এর কথা। আমি আমার প্রিয় জনের আত্যন্তিক বিনাশ কামনা করি না অতএব তিনি আছেন, এরূপ কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তৃণ গুল্মাদি মরিয়া গেলে যাহা হয় মানুষের মৃত্যু হইলে তাহাই হয়। জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য "There is no

longer a deep chasm between the inorganic and the organic." "Protoplasm is the physical basis of life."—Huxley. Haeckel continues:—"We have seen that these tiny lumps of jelly (protoplasm) which are living animals (monera) are without any organs or parts, without kernel (nucleus) or covering (cell wall), so that they lie on the borderline of the inorganic." "Animals and plants are alive and growing; their protoplasm is alive and growing; we know protoplasm only as a living substance. Chemical analysis kills it, and dead material is not protoplasm".

"In his presidential address to the British Association, 1870, Huxley expressed his opinion that, if he could have been a witness of the beginning of organic evolution, he would have seen the origin of protoplasm from not-living matter." বিজ্ঞানজগতে বিবর্ত্তনবাদ (Evolution theory) সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতে ইহা বৈজ্ঞানিকগণের অবিসংবাদিত মীমাংসা।

আ। ঘড়ি দেখিলেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে ইহা আপনা হইতেই এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হয় নাই, ইহার

একজন সুনিপুণ নির্ম্মাতা আছে, আর এই জগৎ-যন্ত্রের কি কোন নির্ম্মাতা নাই? আপনা হইতেই হইয়াছে? ইহা অসম্ভব— যতই আপনি বলুন না কেন, কেনর উত্তর দর্শন বা বিজ্ঞান দিতে পারে না, "ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে, ক'টা কেনর জবাব দেয় সে?"

না। প্রথমে আমরা এক ব্যক্তিকে ঘড়ি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়া অন্য সময় অন্যত্র একটী ঘড়ি দেখিলে স্থির করি, ইহারও একজন নির্ম্মাতা রহিয়াছে। ঘড়ি কৃত্রিম পদার্থ। এই পৃথিবী কে নির্ম্মাণ করিয়াছে দেখি নাই; পৃথিবী কৃত্রিম পদার্থও নহে; তবে আমি কি প্রকারে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইব? জড় অনাদি ও অনন্ত, জড় হইতে তৃণ-গুল্মাদির যে প্রকারে উদ্ভব হইয়াছে এই পৃথিবীর ও জীবের সেই প্রকারে উদ্ভব হইয়াছে, ইহা যদি অসম্ভব হয়, তবে ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ, অনাদি, অনন্ত, ইহাও অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, Matter and motion are eternal and infinite"—জড় অনাদি, অনন্ত ও স্বয়ম্ভূ। জড়ের যে দোষ এড়াইবার জন্য ঈশ্বর কল্পিত হইয়াছে "ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত স্বয়ম্ভূ" বলিলে সেই দোষই ঘটে, অতএব এইরূপ অনুমান তর্কশাস্ত্রবিরুদ্ধ। ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে জড়ের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে "Argumentum ad infinitum" (অনবস্থা) এর দোষ ঘটে না, infinitum (অনন্তত্ব) এর হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেক দার্শনিক "Uncaused Cause" (অকারণ কারণ) মানিয়া লইয়াছেন।

"কেনর কেন" জিজ্ঞাসা করা কোন কোন স্থলে নিরর্থক। "ডান হাতটা বাম হাত হইল না কেন?"—এইরূপ প্রশ্ন অর্থহীন, কারণ ডান হাত বাম হাত হইলেও আবার এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারিত। মানুষের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি কিছুতেই তৃপ্ত হইবার নহে।

আ। আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, কি ভয়ঙ্কর!

না। ঈশ্বর বিশ্বাস করিলেই তিনি মুক্ত পুরুষ, আর না করিলেই তিনি ভয়ঙ্কর, এইরূপ মনে করেন কেন? দয়ার সাগর ৺ঈশ্বরচন্দ্র, ৺কবি-দ্বিজেন্দ্রলাল, পূতচরিত্র আচার্য্য ৺রামেন্দ্রসুন্দর, ইঁহারা ত ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিলেন? ঈশ্বরের ভয়ে যাঁহারা সাধু তাঁহাদের সাধুতার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"বেদান্ত বলেন, (শঙ্করাচার্য্যের মতে) জীব এক বই দুই না:—আমিই একমাত্র চেতন পুরুষ, বেদান্তের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বাক্যের আর কোন তাৎপর্য্য নাই, আপনাদের যদি উহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অন্যবিধ ধারণা থাকে তাহা সমূলে উৎপাটন করুন।"—বিচিত্র জগৎ। একমাত্র আমিই আছি; আমারই অনুভূতি—শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—ইহারাই আমার জগৎ। "আমা হইতে ভিন্ন, আমার অতীত কোন স্রষ্টা মনে করা মায়ার কার্য্য"—তার ঈশ্বরবাদ, "The Universe is the self-manifestation of Atman. In truth, there is only one,

thing—the Brahman, the Atman, the Self, the Consciousness"—Outline of Vedanta by Paul Deussan.

দেশ ও কাল (time and space) আমারই মনের কল্পনা (subjective forms of intellect). এই দেশ ও কালের মধ্যে আমার অনুভূতি—শব্দ, রূপ রস গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিকে ছাড়িয়া দিয়া আমিই এই বাহ্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা আমার মায়া-প্রসূত। "অহং ব্রহ্মাঽস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি," "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বেদান্তের এই অদ্বৈতবাদ নাস্তিকবাদ হইতে অধিক দূরে নহে। সাংখ্যকার বলেন, জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রকৃতি হইতে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ", "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্". ইহা ত এক প্রকার নাস্তিকবাদই। "ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জল ব্যতীত অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রসমূহ যথা বেদান্ত বা উত্তর মীমাংসা পূর্ব্ব মীমাংসা, সাংখ্য ইত্যাদি ঈশ্বর স্বীকার করে নাই। ন্যায় ঈশ্বর স্বীকার করিলেও প্রকৃতি হিসাবে করিয়াছে, "কর্ম্মফলদাতা" রূপে নহে। পাতঞ্জল ও বৈশেষিক দর্শন গৌণভাবে ঈশ্বর স্বীকার করে কিন্তু জীবের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের দরকার হয় না বলে।"—গীতায় ঈশ্বরবাদ। বিলাতে এক সময় নাস্তিকের প্রতি সাধারণের অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, বিচারালয়ে নাস্তিকের সাক্ষ্য বা অভিযোগ লওয়া হইত না, কিন্তু উদার হিন্দু সমাজ কাহারও স্বাধীন-চিন্তায় হস্তক্ষেপ করিত না। চিন্তারাজ্যের স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাক্ মুনি নাস্তিক ছিলেন। চার্ব্বাক্

দর্শন এক সময়ে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে উহা "লোকায়ত দর্শন" নামে পরিচিত ছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, সংশয়বাদী, বা অজ্ঞেয়বাদী; যাহারা Idealist (বিজ্ঞান বাদী) তাঁহারাও সকলে ঈশ্বর-বিশ্বাসী নহেন, অনেকেই Personal God এ সগুণ ঈশ্বর অর্থাৎ Thinking, Feeling and Willing Being এ-কোন পরমপুরুষে বিশ্বাস করেন না; কেহ কেহ প্রকৃতি হিসাবে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন। সকলের বিশ্বাসও এক প্রকারের নহে। আপনি বলিতে পারেন যে, বেদান্ত মতে যখন পাপ-পুণ্য সমস্তই মায়া অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে অসত্য তখন morality (নীতিজ্ঞান) ও অসত্য, সুতরাং বেদান্তের ভিত্তির উপর কোনো নীতিশাস্ত্র দাঁড়াইতে পারে না। অন্ধকার যুগে (dark age) গুহাবাসী আদিম মানবের (Primitive man) নীতিজ্ঞান ছিল কি? অভিব্যক্তির (evolution) সঙ্গে সঙ্গে মানবের নীতিজ্ঞান জন্মিয়াছে। আবার নীতির গোড়াতেই স্বার্থ রহিয়াছে "Altruism in most cases is a duly qualified egoism". ৺ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বলিতেছেন, "মনে করিবেন না যে, পরের প্রতি প্রেমের বশীভূত হইয়া মানুষ সমাজ বাঁধিয়াছে, মানুষ দল বাঁধিয়াছে স্বার্থ-রক্ষার জন্য; আপনাকে বাঁচাইবার জন্য; পরকে নাশিবার জন্য। প্রাণবিদ্যা প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।"—বিচিত্র জগৎ।

যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা বিভিন্ন, যাহা অভিব্যক্তির ফলে মানবের মধ্যেই প্রকাশ হইয়াছে, যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরেও

থাকিবে না, তাহা অসৎ। যাহা সত্য তাহা "persistent"; ত্রিকালে,—মাস বৎসর ও যুগে কোনো অবস্থাতেই তাহা পরিবর্ত্তিত হয় না; সুতরাং বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যা ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। পারমার্থিক হিসাবে পাপ-পুণ্য কিছুই নাই। যাহা সৎ, চিৎ এবং আনন্দ বেদান্ত সেই সত্য বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আমি-ই সেই ব্রহ্ম "সোঽহম্"। আমি সৎ অর্থাৎ আমি আছি, আমি চিৎ অর্থাৎ আমি-ই একমাত্র চেতন পুরুষ, আমি আনন্দ—আমি যে আছি ইহাতেই আমার আনন্দ। জগৎ আমারই কল্পনার সৃষ্টি, আমিই স্রষ্টা ও বিধাতা। আমিই জগৎকে নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছি। যিনি বেদান্তের এই সত্য উপলব্ধি করিবেন, তিনি পাপ-পুণ্যের অতীত হইয়া যাইবেন। ইহাই বেদান্তের মুক্তি।

আ। আপনি কি Materialist (জড়বাদী), না Idealist (আত্মবাদী), ঠিক বুঝিতেছি না।

না। আমি এক view-point (দিক) হইতে যখন ভাবি তখন আমি Idealist. জগৎ আমারই Idea, "All existence has truth only in idea, the idea is the only reality"—Hegel আমি আছি বলিয়াই জগৎ আছে "Its essi is percipi—" Its being consists in being perceived, we cannot know that anything exists which we do not know." জ্ঞানে যাহার বিকাশ তাহাই আছে, দ্রষ্টা ব্যতীত দৃষ্ট থাকিতে পারে না

আবার আর এক view-point হইতে ভাবিলে মনে হয় জড় হইতেই চৈতন্যের উদ্ভব, চৈতন্য মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া—"activity of the brain-cell". চৈতন্য হইতে জড়, আবার জড় হইতে চৈতন্য, দুই-ই সত্য দুই ভিন্ন দিক হইতে। কোনটা আগে কোনটা পরে, এ প্রশ্ন চলে না। "A world of pure ideas, pure essence, bodiless mind, is a figment of imagination, an abstraction, as false as materialists' universe of mindless stuff." "It is impossible to think that the Ego should exist without the simultaneous existence of an external world"—Dr. Tagore's Ontology. কড়ার concave (ভিতর) দিক হইতে দেখিলে মনে হয় কড়া একটা গর্ত্ত বিশেষ, আবার convex (পিঠের) দিক হইতে দেখিলে মনে হয় কড়া একটা উঁচু ঢিপি বিশেষ, এই গর্ত্ত আর ঢিপি লইয়াই কড়া, এক দিক concave হইয়াছে বলিয়াই অপর দিক convex. কোনটা আগে কোনটা পরে, এ প্রশ্ন চলে না; হয়ত জড় ও চৈতন্য একই অজ্ঞেয় শক্তির (energy) ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ, 'Utterly beyond not only human knowledge but human conception is the universal power of which nature, life and thought are manifestations"—Herbert Spencer.

আ। আত্মা জড় হইতে ভিন্ন; আমরা বলি 'আমার দেহ', অতএব আমি দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। 'আমি অনুভব করি',—কে

অনুভব করে? আমি; অতএব আমি কর্ত্তা, দেহ হইতে স্বতন্ত্র।

না। কথাটা হইল যেমন,—এক ছেলে তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মুরগী আগে না মুরগীর ডিম আগে?" পিতা কিছুক্ষণ ভাবিয়া পরে বলিলেন, "আমরা যখন কথায় বলি মুরগীর ডিম—তখন বুঝিতে হইবে মুরগী আগে।" আমরা বলি আমি পীড়িত, সে পঙ্গু, ইহা দ্বারা কি আমার আত্মার পীড়া হইয়াছে, তাহারআত্মা পঙ্গু এইরূপ বুঝিয়া থাকি? আমরা কথায় বলি সূর্য্য উঠিয়াছে, অথচ জানি সূর্য উঠে না। এই সকল কথা দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। কে অনুভব করে? এইরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত, প্রশ্ন হওয়া উচিত,—কি প্রকারে অনুভূতি জন্মে?

"It is not a fit question to ask who is it that feels?" This is the right way to ask the question —"conditioned by what is there feeling?"

"Self is a mere bundle of sensations. It is illusory to assume either a spiritual substance or a material substance as the Cause of our sensations" —Hume.

আ। এই সব থিওরি অনেক শুনিয়াছি, ঈশ্বর যে আছেন ও আমি অর্থাৎ আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা আমি আত্মাদ্বারা বুঝিতেছি, আপনার এই সব ধার-করা যুক্তিতর্কে আমার মত ও বিশ্বাসের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। জানেন ত

এক নাস্তিক পিতা লিখিয়াছিলেন "God is nowhere" কিন্তু বালক পুত্র পড়িল "God is now here."

না। আপনি যদি আত্মা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকেন তবে ভালই, আর যুক্তি তর্ক অনাবশ্যক।

আ। না, না, বলুন না, শুনি, এই কথার উপর আপনার কি বলিবার আছে ?

না। "বিজ্ঞাতারমরে! কেন বিজানীয়াৎ?"—"অরে! বিজ্ঞাতাকে আবার কে জানিবে? কারণ যাহাকে বিজ্ঞাতা (Subject) জানিবেন সে আর বিজ্ঞাতা থাকিবে না, সে বিজ্ঞাত (Object) হইবে।" নিজকে নিজে জানিতে পারা যায় না, introspection (অন্তর্দৃষ্টি) অসম্ভব, নিজের চোখ নিজে দেখিতে পাই না, দর্পণে চোখের প্রতিবিম্ব দেখি। আত্মা জ্ঞাতা (subject) ও জ্ঞেয় (object) হইতে পারে না, "আগুণ নিজকে, নিজে পোড়াইতে পারে না, অতি সুদক্ষ নট ও নিজের স্কন্ধে উঠিয়া নিজে নাচিতে পারে না।"—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম্, এ, কৃত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন।

বেদান্ত মতে আত্মা স্বতঃ-প্রকাশিত, প্রদীপ জ্বালাইয়া যেরূপ সূর্য্য দেখিবার প্রয়োজন হয় না সেইরূপ আমি যে আছি তাহা প্রমাণ করিতে অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ (self-evident); কিন্তু যাহা self-evident তাহা কেহ সন্দেহ করিতে পারে কি? Descartes "আমি আছি, কি না" সন্দেহ

করিয়াছিলেন, অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, "Cogito ergo sum"—I doubt, therefore I exist. আমি আছি কি না আমি সন্দেহ করি, কে সন্দেহ করে? আমি, অতএব আমি আছি। এইরূপ সিদ্ধান্ত তর্কশাস্ত্রবিরুদ্ধ, কারণ, প্রামাণ্য বিষয়কেই প্রমাণিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। এখানে Begging the question এর দোষ ঘটিয়াছে, I doubt--"আমি" সন্দেহ করি, এই স্থলে "I" "আমি" স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ "I" প্রামাণ্য বিষয়। Descartes এর Cogito ergo sum সমালোচনা করিয়া প্রশ্নচ্ছলে Hume জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "Why do you not doubt that you doubt."—"আপনি যে সন্দেহ করেন, এই কথাটি আপনি সন্দেহ করেন না কেন?"

বৌদ্ধমতেও There is no real "I" unit—"আমি" বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। বৌদ্ধমতের সহিত Hume এর মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। অবশ্য আপনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই আপনার নিকট সত্য, কারণ আমার মনে হয় সত্য মিথ্যা মনের অবস্থামাত্র, মনের বাহিরে সত্য মিথ্যা কিছুই নাই; রামধনুর ন্যায় অলীক,—ধাঁধা; আমার অনুভূতিগুলিকে বাদ দিলে জগৎ থাকে না, "আমিও" থাকি না। "The ideas are themselves the actors, the stage, the theatre, the spectators and the play."—Hume. "Self" is a bundle of sensations, ইহা যেমন সত্য,

আবার self বিনষ্ট হইলে sensations থাকে না, ইহা তেমনই সত্য। "Its essi is percipi". "God is only a notion of the human mind ever varying and unrealisable." "There is a wide-spread philosophical tendency to wards the view which tells us that man is the measure of all things, that truth is man-made, that space and time and the world of universals are properties of the mind and that, if there be anything not created by the mind, it is unknowable and of no account for us."—History of Philosophy by Clement Webb. সত্য মিথ্যা সব মনের কল্পনা, মনের বাহিরে কিছুই নাই, থাকিলেও উহা অজ্ঞেয়, আমাদের ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই। সমস্তই A riddle, an enigma, an inexplicable mystery—রহস্যপূর্ণ।

"The human conscience revolts against this law of nature, and to satisfy its own instincts of justice, it has imagined two hypotheses, out of which it has made for itself a religion—the idea of an individual providence and the hypothesis of another life."—Amiel's Journal.—ঈশ্বর এবং পরকাল মনের কল্পনা। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক Kant বলেন,—"Thus if materialism was inadequate to explain my exis-

tence, spiritualism is equally inadequate for that purpose, and the conclusion is that in no way whatsoever can we know anything of the nature of our soul, so far as the possibility of its separate existence is concerned.—Critique of Pure Reason.—যদি জড়বাদ আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইয়া না থাকে তবে আত্মবাদও তাহা দিতে সক্ষম হয় নাই এবং আত্মা যে দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। 'God is now here' এসব গল্প বক্তৃতায় চলে, Logic এ ইহার স্থান নাই।

আ। Kant দেশ-কালের অতীত, অতীন্দ্রিয় এক পারমার্থিক সত্তায় "Thing-in-itself" বিশ্বাস করিতেন, ইহাই আমাদের বেদান্তের "নিষ্ক্রিয়-নির্গুণ ব্রহ্ম"। আমাদের ব্রহ্ম আর খৃষ্টানদের God এক নয়। আমাদের ব্রহ্ম impersonal (সগুণ ঈশ্বর নহে)। intuition (সহজ সংস্কার) দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। "Thing-in-itself" is something of which we think but which we do not perceive. This is what would be left if you could strip an object of all the characteristics which are due to our way of perceiving it and which make it a phenomenon, it is something we cannot help thinking is there, and which yet can never be perceived by us as it is

"in-itself".—Kant. "যদি জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণসকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে কেবল বস্তু মাত্র বল, তবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব শব্দে abstract entity বুঝায়। এই প্রকার abstract entity সৎ ও নয় অসৎ ও নয়, কেবল শূন্য ideal মাত্র। বৈদান্তিকেরা তেমনি ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে "সর্ব্ববাধেন কিঞ্চিচ্চেৎ যন্ন তদেব তৎ"। "When all are removed 'Nothing remains' that nothing is that (Brahma)" —মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

না। এই 'Thing-in-itself' (সৎ বস্তু) অসার, অর্থহীন, মন-গড়া কথা "Metaphysical jargon". উপাধি-বর্জ্জিত, নিষ্ক্রিয়-নির্গুণ ব্রহ্ম যদি বা থাকেন তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। "With Shankar even intelligence was not a quality of Brahman, but Brahman was pure thought and pure being."—Maxmuller. এই প্রকার নিষ্ক্রিয়-নির্গুণ ব্রহ্ম থাকার সার্থকতা কি? এই প্রকারে থাকা বা না থাকা আমাদের পক্ষে উভয়ই সমান; এইরূপ ব্রহ্মের কল্পনাও এক প্রকারের পৌত্তলিকতা। "It is not to be wondered at that Kant should have followers who thought his philosophy would be improved by frankly recognising that the "Thing in-itself" was itself, after all, only a creature of the mind, and that to suppose there need be anything in our experience which is

not produced by the mind from its own resources is only an inconsistent relic of that 'dogmatic' way of thinking, of which it had been Kant's great aim to get rid."—History of Philosophy by Clement Webb. Fichte বলিয়াছেন, "This 'Thing-in-itself' is only a creation of the mind, only ideal".

যদি intuition (জন্মগত সংস্কার) দ্বারা সৎ-বস্তু জানিতে পারা যায় তবে দার্শনিকগণের মধ্যে এত মতভেদ ও মত-বৈপরীত্য দেখিতে পাই কেন?

আ। John Stuart Mill নাকি মৃত্যুর পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট সকাতরে এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন—"If there be any God and if there be any soul, oh God, save my soul!" নাস্তিকেরা রোগের যাতনায়, মৃত্যুর গলা-টিপনি খাইয়া শেষে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়।

না। Mill ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন ইহা পাদরিদের স্ব-রচিত কথা, তিনি আত্ম-জীবনীতে এক স্থানে লিখিয়াছেন,—Her memory was made a religion to me."—ধর্ম্ম যেরূপ পবিত্র বিবেচিত হয় তাঁহার মৃত স্ত্রীর স্মৃতিকে তিনি সেইরূপ পবিত্র মনে করিতেন। প্রকৃত ভালবাসার ইহাই নিদর্শন, "Love is Heaven and Heaven is Love" "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

প্রার্থনা করায় বিশেষ কোন মহত্ত্ব নাই, অবশ্য ইহাতে ঈশ্বরে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি মনে শান্তি পাইতে পারেন। প্রার্থনায় তিনটী উদ্দেশ্য থাকে,—gratitude, glorification and request (কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, মহিমাপ্রচার ও অনুরোধ) যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা তাঁহাকে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রের পক্ষে glorify করা ধৃষ্টতা, তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি করিবেনই; বাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কার্য্যে করাই প্রকৃত ভক্তির পরিচায়ক। সাধারণ মানুষ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা নীচতা, এইরূপ প্রার্থনায় তাঁহার সঙ্কল্প কিছুমাত্র টলিবে না, তিনি ইহাতে সন্তুষ্টও হইবেন না। "অদ্বৈত বেদান্ত মতে যখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—যেই জীব সেই ব্রহ্ম,—তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। অদ্বৈতী নিশ্চলদাস বিচারসাগর গ্রন্থে বলিতেছেন—যখন আমিই তিনি 'সোহহং' তখন 'কাকু করু প্রণাম'?—কাহাকে প্রণাম করিব? যদি বল জীব ও ঈশ্বরে তো ব্যাবহারিক ভেদ আছে, সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া না হয় ঈশ্বরকে প্রণাম কর। তাহাও সম্ভবে না, মুনিরা একজন কৃপালু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে চিত্তে ধ্যান করেন বটে, তিনি ত উপাধির উপঘাত মাত্র—অলীক পদার্থ, মিথ্যা জ্ঞানের সৃষ্টি, তাঁহাকে কিরূপে প্রণাম করা যায়? এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চলদাসের আর প্রণাম করা হয় নাই। অদ্বৈত বেদান্ত মতে উপাসনার ব্যবস্থা আছে। তাঁহাদের মতে প্রকৃত উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা, আত্মা হইতে ব্রহ্ম অভিন্ন—"সোহহং"

"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি ভাবসাধনাই আত্মগ্রহ উপাসনা। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন:—আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে, যদি বল, ঈশ্বর ও জীবে বিরুদ্ধগুণ বশতঃ একত্ব সম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধগুণ ভাব মিথ্যা (মায়িক মাত্র)"—গীতায় ঈশ্বরবাদ।

"বিপন্ন, আর্ত্ত, দুর্ব্বল চাহে আশ্রয় অভয়,
তাই করে তোমাকে সৃজন
আছে জীবে দয়া প্রেম শক্তি জ্ঞান বিবেকাদি,
শ্রেষ্ঠতম যত উপাদান
সেই সব উপাদানে মানব কল্পনা বলে,
করে ঈশ তোমাকে নির্ম্মাণ।"—সোঽহং স্বামী।

আপনি বলিতেছেন নাস্তিককে ঈশ্বর গুঁতোর চোটে "বাবা বলান"। আপনাদের মনে ঈশ্বর-বিশ্বাস কি বাস্তবিক এইরূপ?

আ। আপনি কতকগুলি নাস্তিকবাদের বিলাতি পুস্তক পড়িয়াছেন, আস্তিকবাদের পুস্তক বিশেষতঃ হিন্দুদর্শন কিছুই পড়েন নাই, পড়িয়া থাকিলেও তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। সেদিন একজন দর্শনশাস্ত্রের এম, এ, তত্ত্বনিধি কেমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছিলেন—"এই আত্মা অন্নময়, প্রাণময় আদি পঞ্চকোষের মধ্যে অবস্থিত, এই আত্মা কেমন করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করে, ইহাই জীবনের বন্ধন, জীব শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনযুক্ত, কর্ম্মযোগ,

জ্ঞানযোগ দ্বারা সাযুজ্য লাভ করিবে।" কূটস্থ চৈতন্য, ষট্‌চক্রভেদ, অস্পৃশ্যতার বৈজ্ঞানিক কারণ ইত্যাদি অনেক জটিল ও দুর্ব্বোধতত্ত্ব জলের মত বুঝাইয়াছিলেন, তখন আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, এখন আমার মনে নাই। আহা! আপনি যদি একবার শুনিতেন! আপনি নিরামিষাহারী হইয়া একাগ্রচিত্তে, শুদ্ধ, শান্ত মনে এই সকল দুরূহ বিষয় চিন্তা করিলে ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দর্শনে এই সকল তত্ত্ব পাইবেন না। আমি দর্শনশাস্ত্র বিশেষ আলোচনা করি নাই সেই জন্য আপনার সকল কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। একদিন তত্ত্বনিধি মহাশয়কে আপনার নিকট লইয়া আসিব তখন দেখা যাইবে কাহার তর্কের জোর বেশী। মাষ্টার মহাশয়, "ভক্তিতে মিলায় হরি, তর্কে বহু দূর," "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।"

নির্ব্বাণ ও জন্মান্তরবাদ।*

(বৌদ্ধমত)

পুনর্জ্জন্মবাদ ও নির্ব্বাণ:—বৌদ্ধমতে মৃত্যুতে বাসনা ও কর্ম্মফল বিনষ্ট হয় না। আমার বাসনা-বল হইতে একটি নূতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করে;

---

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ ১৩২৮, ফাল্গুন সংখ্যার "প্রবাসীতে" [illegible] হইয়াছিল।

কর্ম্মফল অপরিহার্য্য। আমার বর্ত্তমান জীবন ও আমার মৃত্যুর পর আমার বাসনা-সম্ভূত জীবের জীবন একই জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অবস্থা মাত্র। কি প্রকারে আমার বাসনা হইতে একটি নূতন জীব উৎপন্ন হইয়া আমার কর্ম্মফল ভোগ করিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া পালি-ভাষাবিৎ বৌদ্ধদর্শনে পণ্ডিত Mr. T. W. Rhys Davids, "Hibbert Lectures 1881", গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'It is a mystery known only to the Buddhists'.—এই রহস্য আমাদের অজ্ঞাত। ভিন্ন দিক হইতে দেখিলে ইহার আর একটা অর্থও আছে। পিতা সন্তান-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বপুরুষের সর্ব্ববিধ দোষ ও গুণ লইয়া (শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক) সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বর্ত্তমানে Eugenics (সুপ্রজনন বিদ্যা) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে—"Parents undoubtedly live over again in their offspring." জায়া শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এইরূপ।

কোন চিৎশক্তিসম্পন্ন অবিনাশী আত্মার স্থান বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। "According to the Buddha the knowledge of I as Not-I, the Anatma-idea is therefore the great, the only knowledge—the knowledge Par Excellence, the Buddha knowledge, because at one stroke abolishing both sorrow and life."

"The belief in personal continuity is classed

as one of the three fetters that hold us back from salvation.—Buddhist Essays by Paul Dahlke. pp. 75.196. স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "Civilisation in the Buddhist Age" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আত্মার পরিবর্ত্তে বাসনা দ্বারা পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মফলভোগের মীমাংসার চেষ্টা বৃথা, কথার মার-পাঁচ মাত্র। কোন কোন পাঠক আত্মার অভাবে পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফল-ভোগ সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট আমার উত্তর এই—আত্মার দ্বারাও পুনর্জ্জন্মের মীমাংসা হয় না; কারণ স্মৃতিযোগেই ব্যক্তিত্বের একত্ব। স্মৃতির অভাবে ব্যক্তিত্বের একত্ব ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। রাম পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়া এ জীবনে হরি-রূপে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এস্থলে হরির পূর্ব্বস্মৃতির অভাবে দুই ভিন্ন ব্যক্তির একত্ব অনুমান করা অসম্ভব। রাম করিল পাপ, আর শাস্তি পাইল হরি? ইহা ঘোর অবিচার। এজন্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'জাতিস্মর' কল্পনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধমতে রামের বাসনা-জাত হরি পূর্ব্ব জীবনের অর্থাৎ রামের পাপের ফলে অন্ধ হইয়াছে। হরি রাম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন; যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ বীজ হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। কার্য্য এবং কারণ একই বস্তুর ভিন্ন বিকাশ মাত্র। হরির জীবন রামের বাসনা ও কর্ম্ম দ্বারা যুক্ত হইয়া রামের সহিত এক হইয়াছে। এই অর্থে রামের পুনর্জ্জন্ম বৌদ্ধমতে স্বীকৃত হইয়াছে। (Buddhism—By Mr.

Rhys Davids pp. 91, 99, 124, 135, 144, and Buddhism by Mrs. Rhys Davids pp. 103, 105 and Sacred Books of the East—Vol.—"Questions of King Milinda"—ইত্যাদি গ্রন্থ আলোচ্য)। আমার কর্ম্মফলে এক নির্দ্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাইবে ইহা ভাবিতেও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভয়েই মানব পাপ হইতে বিরত হইবে; নরকের ভয়ে নহে। Mr. Rhys Davids এর মতে ইহাই বৌদ্ধনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব। "নির্ব্বাণ" লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। Rhys Davids ও Max Muller বলেন, নির্ব্বাণ লাভের অর্থ বাসনার বা তৃষ্ণার বিনাশ দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভ এবং স্বীয় অন্তরের বিশুদ্ধি-সাধন ও প্রকৃত জ্ঞানদ্বারা ইহ জীবনেই প্রকৃত শান্তিলাভ। (Buddhism—T. W. Rhys Davids pp. 111, 120, 125, 149 দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "এত অনুসন্ধান করিয়াও আমি কোনো ঈশ্বর দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি, দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি; ঈশ্বর আছেন কি না,—সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে পারি না, এবং সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রয়োজনও নাই।" (The Buddha merely says—"Despite all search I have not found any God, but in this search for God I have found the way to deliverance. Whether there really is a

God or no—of that I cannot say anything, of that I do not need to say anything.)—Buddhist Essays By Paul Dahlke. বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধদেব ঈশ্বর এবং আত্মা স্বীকার না করিয়াও উদারপ্রাণ হিন্দুজাতির নিকট অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। বুদ্ধদেবই জগতে সাম্য ও মৈত্রীর প্রথম ও প্রধান প্রচারক। বৌদ্ধধর্ম্মে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি দেবতাগণের উল্লেখ আছে, তাহার কারণ, নবদীক্ষিত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণের পূর্ব্বের ধর্ম্মবিশ্বাসে যেন আঘাত না লাগে সেই জন্য হিন্দুদিগের পৌরাণিক গল্প হইতে এই সকল দেবতার নাম আনা হইয়াছে। ("All the gods, such as Indra, Brahma, Ishwara were only mythological figures, intentionally taken over from Hinduism, in order that the weak plants among the newly converted might be able to remain undisturbed in their native soil.")—Paul Dahlke. বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই, তজ্জন্য কোন কোন পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। তাহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি,—বেদান্ত বলেন—(শঙ্করাচার্য্যের মতে) আমা হইতে ভিন্ন, আমার অতীত, কোন ঈশ্বর আছে মনে করা মায়ার কার্য্য, (অবশ্য পারমার্থিক ভাবে)। 'অহং ব্রহ্মাঽস্মি," "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—আমিই একমাত্র সত্য বস্তু; জগৎ অধ্যাস, আমারই মায়া-কল্পিত; আমিই জগৎ-স্রষ্টা ও জগৎ-বিধাতা।

সাংখ্যকার "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অজ্ঞেয়বাদেরই সমর্থন করিতেছেন। নৈয়ায়িক ও মীমাংসকের মতে ঈশ্বর থাকিলেও 'তটস্থ,' জীবের কল্যাণ ও অকল্যাণে সম্পূর্ণ উদাসীন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত 'গীতায় ঈশ্বরবাদ,' প্রফেসর শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত কৃত 'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্করদর্শন' (১ম ভাগ) গ্রন্থদ্বয়ে ও স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কৃত 'জিজ্ঞাসার' 'মুক্তি' প্রবন্ধে এই বিষয় বিশদরূপে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নিয়তিবাদ

যিনি ঈশ্বর মানেন তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, মানুষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ, তিনি অনন্তকাল হইতে জানেন আমি কখন্ কিরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিব, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে আমার ব্যক্তিত্ব (individuality) কিরূপ গঠিত হইবে এবং তাহার ফলে আমি কিরূপ কার্য্য করিব। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পারে না। "His knowledge cannot be falsified, it must be verified." যদি ব্যর্থ হয়, তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকিলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ব্যর্থ হইতে পারিত। "His

will is supreme." তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কি কিছু করিতে পারি ? তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহারই ইচ্ছায় আমি ইচ্ছান্বিত হইয়া কার্য্য করি, আমার ইচ্ছা তাঁহারই ইচ্ছার কণামাত্র, সুতরাং আমার ইচ্ছার স্বাধীন সত্ত্বা নাই। পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে স্বাধীন ইচ্ছাজনিত দায়িত্ব থাকিতে পারে না। একটী শিশু আমাদের তুলনায় যেরূপ অজ্ঞ ও অসহায়, ঈশ্বরের নিকট আমরা ততোঽধিক অজ্ঞ ও অসহায় শিশু। নিরীশ্বরবাদী একটা অজ্ঞাত শক্তিকে সমুদয় কার্য্যকারণের মূল বলিয়া স্বীকার করেন। নিরীশ্বরবাদী Herbert Spencer বলেন, "There is an eternal and infinite energy from which everything flows."

নিয়তিবাদ বা নির্ব্বন্ধবাদ (Determinism or necessitarianism) সংক্ষেপে ও সরল করিয়া বুঝাইবার জন্য "প্রবাসী, ১৩২৫, জ্যৈষ্ঠ" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—"এই বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ কার্য্যকারণের সকল সম্বন্ধকে অঙ্কের হিসাবে মিলাইয়া দেখায় যে প্রত্যেক কার্য্য প্রকারে ও পরিমাণে উপযুক্ত কারণ হইতে প্রসূত। প্রত্যেক কারণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কার্য্যফল প্রসব করে। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট cause নির্দ্দিষ্ট effect উৎপন্ন করে, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এই মুহূর্ত্তে জড় জগতের যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই অকাট্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেরই কারণ-সমষ্টি যাহা এই মুহূর্ত্তের

কার্য্য-সমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও তৎপূর্ব্ব সময় হইতেই অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইরূপে এই শৃঙ্খল-পরম্পরা সুদূরতম অতীত হইতে সুদূরতম ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত এক অমোঘ শাসনে আবদ্ধ রহিয়াছে, কোথাও চুল প্রমাণ ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। প্রত্যেক জড় কণায় প্রত্যেক পরমাণু কখন কোন্ পথে কেমন ভাবে চলিবে শাশ্বত কাল হইতে তাহা অকাট্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। বিশ্ব-সংসারের এই মুহূর্ত্তে যাহা-কিছু যেমন ভাবে আছে, তাহার পরিপূর্ণ হিসাব যদি পাওয়া যাইত, তবে অতীত ও ভবিষ্যতের ইতিহাসকে অভ্রান্ত ভাবে তাহারই মধ্যে নিহিত দেখিতাম।" "The actions of a man's will are as mathematically fixed at his birth as are the motions of a planet in its orbit"—পৃথিবী ইহার আপন কক্ষে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঘুরিতেছে সেই প্রকার এক ব্যক্তি তাহার জীবনে কি কার্য্য করিবে বা না করিবে, তাহা তাহার জন্মকালেই অকাট্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বিনা কারণে কিছুই ঘটিতে পারে না—"Ex-nihilo nihil fit." ইহাই সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি, যাহা বীজাকারে গুপ্ত থাকে তাহাই প্রকাশ হয় মাত্র। এইরূপে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা (universal law of causation) জগতের ঘটনাসমূহ (phenomena, physical and mental) নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। নিয়তিবাদ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত—"I see in atom the promise and potency of all terrestrial life."—Tyndal.

নিয়তিবাদমতে অপরাধী ব্যক্তি বলিবে নিয়তির বশে সে অপরাধ করিয়াছে, বিচারকও বলিবেন যে নিয়তির বলেই তিনি বিচারক হইয়া তাহাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন ও নিয়তির বশেই অপরাধীর চরিত্র সংশোধিত হইবে; I am caused to do—যাহা হইবার তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, আমি উপলক্ষ মাত্র; "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা-কিছু কার্য্য-কারণ-রূপে ঘটিতেছে (phenomena) তাহাই নিয়তি। পুরুষকার-প্রভাবে কেহ যদি প্রতিকূল অবস্থায় কৃতকার্য্যতা লাভ করে তাহাও নিয়তি দ্বারাই সাধিত হইবে। এই যে নিয়তি, ইহা কার্য্যকারণ-সম্পর্ক,—causal connection. পুরুষকার নিয়তিরই ফল। একটা অপরাধ সাধিত হইতে বহুবিধ ঘটনার সমাবেশ প্রয়োজন; অপরাধীর মনোগত ভাব, তাহার শক্তি, বুদ্ধি, দক্ষতা, সুযোগ, স্থান, কাল ও যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হইল তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণসমষ্টির (antecedents) সমাবেশে একটা অপরাধ সাধিত হয়। একটী কারণের অভাব হইলেই অপরাধ সাধিত হইতে পারে না। এই সকল কারণ-সমাবেশের জন্য অপরাধী ব্যক্তি দায়ী হইতে পারে না। A man is a product of heredity and environment. জন্মগত আকৃতি ও প্রকৃতি—heredity; আজীবন যে ঘটনাবলী শরীর ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহা environment. শরীর ও মনের কোন অবস্থা বা গুণের বিকাশ বা অ-বিকাশ পারিপার্শ্বিক

অবস্থার (environment) উপর নির্ভর করে। আমি স্বাধীন-ইচ্ছা দ্বারা এই heredity ও environment নির্ব্বাচন করি নাই, ইহা আমি পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। "Man is a physiological and psychological omnibus carrying his ancestors forward on his back"—Holmes. কোনো মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে শিশুর জন্মের এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়।

চিন্তা কার্য্যের বীজ মাত্র। আমার চিন্তা ও ইচ্ছা আমার মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী ও শিক্ষা অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমার মস্তিষ্কের গঠনের জন্য আমি পূর্ব্ব-পুরুষের নিকট ঋণী। মস্তিষ্কের পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন কম্পনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিন্তার উদয় হয়। আমাদের জীবনের গতি আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। কত অসম্ভবনীয়, অচিন্তনীয় ঘটনার প্রভাবে আমরা চালিত হইতেছি। কত সময় মনে হয়, হায়, যদি পূর্ব্বে ইহা জানিতাম! কোথা হইতে কত প্রলোভন ও সুযোগ আপনা হইতে উপস্থিত হয়; মনে হয় যেন সমস্ত ঘটনা পরামর্শ করিয়া আমার অধঃপতনের ও দুরদৃষ্টের জন্য একত্রিত হইয়াছিল; সেই অবস্থায় যথেষ্ট চরিত্রবল থাকিলে আমার অধঃপতন হইত না। কিন্তু এই চরিত্রবল আমার স্বভাব ও শিক্ষার ফল মাত্র (product of heredity and environment)। ব্যক্তি কখনই ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে পারে না। ইচ্ছা (will) থাকিলেই পাপকার্য্য করা যায় না, সুযোগে

আবশ্যক হয়, "Oh, Opportunity ! thy sin is great". আবার সুযোগ উপস্থিত হইলে প্রলোভনও অদম্য হইয়া উঠে। যে প্রাকৃতিক নিয়মে (causality) মানব দেহ রোগবীজাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না, সেই নিয়মেই মানব প্রবল রিপুর প্রলোভন জয় করিতে না পারিয়া পাপে লিপ্ত হয়। সুমতি ও কুমতির মধ্যে যেটী যখন প্রবল হয় সেইটীই তখন জয়ী হয়, ইহাতে কাহারও কোনো কর্তৃত্ব নাই। প্রবলের জয়ই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাধীন-ইচ্ছা (free will) বলিয়া কিছুই নাই। "By moral fatalism is meant that the idea that moral struggle in the presence of temptation is idle and useless because, no matter how earnestly one struggles, it is inevitable from the first that the stronger motive will win the day."

একই প্রলোভন সকলের মনে সমানভাবে ক্রিয়া করে না। "Like causes have like effects." পুরুষকার ভিন্ন যে সফলতা লাভ করা যায় না, নিয়তিবাদী একথা অস্বীকার করেন না; তিনি শুধু বলেন পুরুষকার স্বভাব ও শিক্ষার ফল মাত্র (product of nature and environment)। নিয়তির গতি অতি কুটিল, বর্তমানে যাহা মঙ্গল ও সুখের কারণ, পরিণামে তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে। মধ্যযুগে (medieval age) স্বাধীন-ইচ্ছা মতবাদের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই বিজ্ঞানের যুগে এই মত আর টিকিতে পারিতেছে না।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগে ও দর্শনে নিয়তিবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানবিৎ Prof. Tyndal "Essay on Science and Man" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "My physical and intellectual textures were woven for me, not by me. Processes in the conduct or regulation of which I had no share have made me what I am." জীব-বিজ্ঞানবিৎ Karl Pearson বলেন, "No person is responsible for his being and the nature and nurture over which he has no control has made him the being he is, good or evil."

"Shakespeare or Darwin, Goethe or Napolean, were nothing more than very happy combinations of the traits of their ancestors."--সেক্সপিয়ার বা ডারউইন্, গেটে বা নেপোলিয়ন্—তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের সদ্‌গুণাবলী প্রাপ্ত হওয়াতেই এত বড় হইয়াছেন, ইহা ছাড়া আর কিছুই না। দৈবক্রমেই এই সদ্‌গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল—Heredity By J. Watson. বিখ্যাত দার্শনিক Spinoza, John Stuart Mill ও Herbert Spencer মানবের "স্বাধীন ইচ্ছা" স্বীকার করেন না। ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ এই মতবাদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইহা দ্বারা

নিয়তিবাদই প্রচারিত হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রেও নিয়তিবাদ স্বীকৃত.হইয়াছে। বাইবেল সোজাসুজি ইহা স্বীকার না করিলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করে, "Thy will be done", তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। আদম ও ইভের পাপের ফলে মানব পাপী হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে নিয়তিবাদ মানিতেই হইবে। অনেকে মনে করেন নিয়তিবাদ আলস্যের ও পাপের সহায়তা করে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অবশ্য নিয়তিবাদ পাপীকে ঘৃণা করিতে বা পুণ্যবানকে প্রশংসা করিতে বলে না। নিয়তি (causality) দ্বারা পরিচালিত হইয়াই নিয়তিবাদী পাপের মূল কারণ নির্দ্দেশ করে ও পাপীকে তাহা হইতে রক্ষা করে এবং সমাজ-রক্ষার জন্য পাপীর দণ্ড বিধান করে।

"When a friend complained to Socrates that a man whom he had saluted had not saluted that man in return, the father of philosophy replied—"It is an odd thing that if you had met a man ill-conditioned in body you would not have been angry, but to have met a man rudely disposed in mind provokes you."

"If we pity a man with a weak heart, why not the man with the weak will? If we do not blame a man for one kind of defect, why blame him for another?"

"Men should not be classified as good and bad, but as fortunate and unfortunate, as weak and strong." R. Blatchford.

—"একদিন সক্রেটিসের নিকট তাঁহার কোনো বন্ধু অভিযোগ করিয়া বলিলেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নমস্কার করিলে তিনি তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করেন নাই। তখন দার্শনিক চূড়ামণি সক্রেটিস বলিলেন, "ইহা বড় আশ্চর্য্য যে, তুমি একটা বিকলাঙ্গকে দেখিয়া রাগান্বিত হওনা, কিন্তু একটি কর্কশ প্রকৃতির লোক দেখিলে তুমি ক্রুদ্ধ হও।"

"যদি কাহারও হৃৎ-পিণ্ডের দৌর্ব্বল্যের দরুণ আমরা তাহার প্রতি দয়া অনুভব করি তবে কাহারও চরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখিয়া কেন ঐরূপ দয়া অনুভব করিব না?" "মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ এইরূপ শ্রেণীবিভাগ না করিয়া, সবল ও দুর্ব্বল, ভাগ্যবান ও হতভাগ্য এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা উচিত।"

যে প্রাকৃতিক নিয়মে এক ব্যক্তি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই অপর এক ব্যক্তি গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারায়। অবস্থা বিশেষে গুণ্ডা ব্যাঘ্রের ন্যায়ই হিংস্র ও ভয়ঙ্কর। উভয় স্থলেই সমাজরক্ষার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু কোনো স্থলেই ইহাদিগকে দোষী (morally responsible) করা যাইতে পারেনা।" "These (ruffians and rogues) are victims of an inscrutable and relentless fate. They should be regarded as we

regard base or savage animals ; as creatures of a lower order, dangerous, but not deserving blame nor hatred, because these unhappy creatures are nearer to our brutish ancestors than other men ; the ancient strain of men's bestial origin cropping out in them through no fault of their own."—

"In the light of true morality, a rich landowner or a millionaire money-lender is a greater criminal than a burglar or a foot-pad ; and a politician or a journalist who utters base words is worse than a coiner who utters base coin"—Blatchford.—প্রকৃত নীতিধর্ম্মের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোনো চোর বা ডাকাত দ্বারা সমাজের যত না অনিষ্ট সাধিত হয়, একজন বড় জমীদার বা সুদখোর লক্ষপতি মহাজন দ্বারা সমাজে তার চেয়ে অধিক অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। যদি কোনো রাজনীতিবিৎ বা সংবাদপত্রের সম্পাদক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া নীচমনার ন্যায় উক্তি করেন তবে তিনি জালিয়াৎ অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত কার্য্য করেন।

"In the Bhagavadgita it is written "He sees truly who sees all actions to be done by nature alone, and likewise the self, not the doer." প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে যাবতীয় ঘটনা ঘটিতেছে। আমি যাহা করি তাহা

প্রকৃতির প্রেরণায় চালিত হইয়াই করি, সুতরাং আমি কর্ত্তা নহি। সৃষ্টি ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। পাপ-পুণ্য, দণ্ড-পুরস্কার ইত্যাদি লইয়াই সৃষ্টি, পাপকে একেবারে বাদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের অস্তিত্ব ও লোপ পাইয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মেই মানব পাপী ও পুণ্যাত্ম হইয়া থাকে। প্রভু যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিওনা।"

পুরুষ-সিংহ কর্ম্মবীর নেপোলিয়ন নিয়তিবাদী ছিলেন, তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি নিয়তিবাদী হইয়া সর্ব্বদা এত চেষ্টা-উদ্যোগ করেন কেন?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "নিয়তিই আমাকে ঐরূপ করায়।" He answerd "Because it is still Fate who wills that I should plan." ইহাই নিয়তিবাদীর প্রকৃত উত্তর। একই বিষয় দুই ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্নরূপে ক্রিয়া করে। বীর নিয়তিবাদী হইলে অধিক নির্ভীকতা ও বীরত্ব প্রকাশ করে, অলস ব্যক্তি নিয়তি বিশ্বাস করিয়া অধিক অলস ও ভীরু হইতে পারে। কেহ কেহ Metaphysics সাহায্যে "স্বাধীন-ইচ্ছা" মতবাদের সমর্থন করেন, তাঁহাদের যুক্তির অধিকাংশই দুর্ব্বোধ্য "transcendental nonsense" তাঁহারা শুধু বলেন— "Our will is free and beyond all phenomena." জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশ-কালের অতীত পারমার্থিক সত্তা তাঁহারা উপলব্ধি করেন মাত্র। যাঁহারা phenomena অসত্য বলেন, তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে না, জীব

যখন মায়ামুগ্ধ, মায়ান্ধ, মায়া দ্বারা চালিত, তখন তাহার "স্বাধীন-ইচ্ছা" রহিল কোথায় ?

স্বাধীন-ইচ্ছা-বাদীগণ নিয়তিবাদের যুক্তি খণ্ডণ করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা প্রথমেই Freedom of will স্বীকার করিয়া লইয়া metaphysical reasoning দ্বারা একটা theory খাড়া করেন মাত্র, কিন্তু তাহা দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। তাঁহারা বলেন,—"It cannot be explained. For all explanation is the work of the understanding and that can explain only phenomena."—আমাদের ইচ্ছা (will) স্বাধীন, উহা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন নহে, উহা কারণাতীত। যাঁহারা এইরূপে কল্পনার আশ্রয় লন তাঁহাদের সহিত ব্যাবহারিক জগতের বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে না, "Reason divorced from and with no reference to the world of experience is barren."

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য।

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য, এই তিনের মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতবাসী অন্যান্য জাতির তুলনায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, স্ফূর্ত্তির অভাবে ও দুশ্চিন্তায় এ জাতির

জীবনীশক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কিসে দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে এ বিষয়ে বর্ত্তমানে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারসাধন ও বিদেশে খাদ্য-সামগ্রীর অবাধ-রপ্তানি বন্ধ দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে জাতীয় দারিদ্র্যের অনেক পরিমাণে প্রতিকার হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহার ফল স্থায়ী হইবে না, যদি নিঃসম্বল বিবাহ ও অকাল-মাতৃত্ব চলিতে থাকে। এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের ফলে আমাদের পারিবারিক অশান্তি, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকালমৃত্যু দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক স্থলেই দেখা যায়, বর ও কন্যা উভয় পক্ষই কেবলমাত্র পদ-মর্য্যাদা ও ধনের মোহে আকৃষ্ট হইয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, এবং সেই অবিবেচনার ফলও তাঁহারা অচিরেই হাতে হাতে পাইয়া থাকেন। স্বাস্থ্য এবং চরিত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বস্তু আর কি আছে? শিক্ষার সার্থকতা কি, যদি তাহা মানুষকে সুবিবেচক ও চরিত্রবান্ করিয়া না তোলে? ক্রোধের বশীভূত হইয়া অপরের সামান্য অশান্তির কারণ ঘটাইলে, সমাজে আইনানুযায়ী দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কেহ যদি রিপুর উত্তেজনায় সন্তান-উৎপাদনের নামে স্ত্রী বা সন্তানের প্রাণ-নাশের কারণ হয়, বা ভবিষ্যৎ বংশকে ক্ষীণজীবী, বংশগত-রোগাক্রান্ত, দুর্ব্বল ও দরিদ্র করে, তবে সমাজ কি সে পাপে উদাসীন থাকিবে? একটী সামান্য চাকরীর জন্য কত না যোগ্যতার নিদর্শন উপস্থিত করিতে হয়! কিন্তু পিতৃত্বে ও

মাতৃত্বে কি কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই? কোন দায়িত্ব নাই? স্বার্থপরতা ও দায়িত্ব-বোধহীনতা দাম্পত্যজীবনের পরমশত্রু। প্রাচীনকালে, এক সময়ে হয়ত জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন "জিভ দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি" ; দরিদ্র-দেশে এই দায়িত্বহীন, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সমাজের কত না অনিষ্ট সাধন করিতেছি! "God helps those who help themselves." পণ্ডিত প্রবর John Stuart Mill বলিতেছেন—"Little improvement can be expected in morality until the producing of large families is regarded with the same feeling as drunkenness or any other physical excess."

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আর্থিক অবস্থানুযায়ী বংশবৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত সমাজে নির্দ্দোষ বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা এ বিষয়ে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, জন-সংখ্যার দ্বারাই জাতি জনবলে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অনাহারক্লিষ্ট, রুগ্ন, দুর্ব্বল ও হীনচরিত্র জনসমষ্টি দ্বারা কোন জাতিই কখনো শ্রীমান্ বা শক্তিমান্ হইয়া উঠিতে পারে না, বরং তাহার বিপরীত ফলই অবশ্যম্ভাবী। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন,—তোদের ভোগের ভিতর হোচ্ছে, স্যাঁত স্যাঁতে ঘরে ছেঁড়া ক্যাঁথায় শুয়ে বছর বছর পোয়েল

মত বংশবৃদ্ধি করা, Begetting a band of famished slaves, —একদল ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও দাসকুলের জন্ম দেওয়া

—স্বামী শিষ্যসংবাদ।

মহাত্মা গান্ধি, Tolstoy, Plato, Malthus, Darwin, Aristotle, Mill, Huxley, Annie Besant ও Herbert Spencer প্রভৃতি মনীষিগণ সমাজের কল্যাণের জন্য অবাধ-বংশবৃদ্ধির ও অযোগ্যের বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবকে লজ্জা করিলে ঠকিতে হয়। বীরবল বলিয়াছেন, "আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়"।

তর্ক-সভা।

আজকাল মাসিক পত্রিকায় "নারীর স্থান" "নারীর অধিকার" ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। সে দিন আমাদের তর্ক-সভায় যে বিষয়টীর আলোচনা হইয়াছিল তাহা শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন সভ্য বলিলেন, "ধরুন, আমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে। আমি হিন্দু সন্তান, হিন্দুর আচার, নীতি ও সংস্কারের মধ্যে আমি প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত, সমাজ ও বেষ্টনীর প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। I have received my individuality from society and parents. আমি সাধারণ

মানুষ, ঈর্ষা ও স্বভাবজাত প্রবৃত্তির বশীভূত। হিন্দুর বিশ্বাস যে তাহার স্ত্রীর চরিত্র কলুষিত হইলে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ নরকগামী হইবেন, তাহার বংশ অপবিত্র হইবে এবং ইহাতে কত প্রকার কুৎসিত ব্যাধি আসিতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে তিনি সমাজে অচল হইবেন। নানা প্রকার সন্দেহ বশতঃ তিনি নিজের সন্তানের প্রতিও মমতাহীন হইবেন। হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক দুরদৃষ্ট কি হইতে পারে? সকল সভ্য দেশের ধর্ম্মে ও সমাজে সতীত্বের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশেও সীতা-সাবিত্রী আদর্শ নারীরূপে পূজিত হন। ইহা সত্য যে স্বার্থপর পুরুষেরাই আইন ও সমাজবিধির প্রবর্ত্তক। যে প্রবল সেই জয়ী, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। বৈষম্য ও সাম্য পরস্পর বিপরীত, একত্র থাকিতে পারে না। পুরুষের আশ্রয়ে থাকিলে, নারীর পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। রাজা লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ বিনাশ করিয়াও হত্যাপরাধে অপরাধী হন না, দুর্ব্বলতাই পাপ। যোগ্য ব্যক্তিই পুরস্কৃত হয়, যোগ্যতা আর শক্তি একই কথা। moralityর কথা বলেন? Morality আবার কোথায়? পাশ্চাত্য সমাজে যে নারীর প্রতি এত সমাদর তাহার মূলে রূপের পূজা। উপেন বাবু ত অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতার ও স্বাধীন প্রেমের ভারি পক্ষপাতী, আপনিই বলুন না, হিন্দুর স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইলে তাহার স্বামী কি ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা করিবে?" যদি আমাদের সমাজে, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলিতে থাকে তবে বিলাতের ন্যায় এদেশেও অনেক সক্ষম যুবক

বিবাহ করিতে চাহিবে না। তাহার ফলে অনেক যুবতী জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। তাহাতে কি বিপদ কম? স্বাধীনতার দায়িত্ব অনেক।

উপেন বাবু নব্য-তন্ত্রের লোক, এখনও অবিবাহিত, কিছুক্ষণ ভাবিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আপনারা পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এটা আপনাদের বড়ই narrowness ; তাহাদের মধ্যে কি friendship থাকিতে পারে না? যদি স্বামী নিজে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন তবে তিনি স্ত্রীকে ক্ষমা করিতে না পারিলে, ত্যাগ করিতে পারেন ; আর যদি নিজে পাপী হইয়া থাকেন তবে স্ত্রীকে ঘৃণা বা ত্যাগ করিবার অধিকার তাঁহার নাই, mutual breach of marriage contract." অপর একজন সভ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "একটা ইংরাজী dramaতে পড়িয়াছিলাম একটী মহিলা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা male friends পান না, কারণ 'on the third day he will talk of love.' এ প্রকার friendshipএর অর্থ কি? হিন্দুর বিবাহ contract নহে। আপনি যে নীতি-উপদেশ দিলেন, যদি বাস্তবিক সেই উপদেশানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠিত করিয়া থাকেন তবে তাহা অবশ্য গ্রহণীয়, নচেৎ আমার উপর একটা মহৎ ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খাড়া করিবার অভিলাষী হইয়া থাকিলে আপনার উপদেশ অগ্রাহ্য ; এই উপদেশ দিবার অধিকার আপনার নাই ; নিজে নিষ্পাপ হইয়া পরের পাপের দণ্ড বিধান করিবে, নতুবা নয়, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে

অভিভাবক, শিক্ষক, বিচারক ও প্রচারক কেহই স্বীয় কর্ত্তব্য করিতে পারে না।" অপর একজন সভ্য বলিলেন, "এ-সব বিষয় চেপে যাওয়াই ভাল, নচেৎ নিজেরই বিপদ।" ইহা শুনিয়া একজন নব-বিবাহিত সভ্য উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এরূপ ভ্রষ্টা স্ত্রীর মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, গালে চূণ কালি মাখাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।" ইহার পর সভায় ঠাট্টা-তামসা চলিতে লাগিল, গোলমাল উপস্থিত হইল ও সভা ভঙ্গ হইল।

আমি এ বিষয়ে স্ত্রীর মত জানিতে চাহিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "যদি স্বামীর চরিত্র-দোষে, তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ বা অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে স্ত্রী বিপথ-গামিনী হয় তবে সে পাপের জন্য স্বামীই দায়ী। সমাজ ও ধর্ম্মশাস্ত্র কেহ অমান্য করিতে পারে না ; এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করিতে স্বামী ন্যায়তঃ বাধ্য। অবশ্য এ স্থলে স্ত্রীকে ত্যাগ করাও স্বামীর অন্যায়। কিন্তু যদি কোন হতভাগিনী স্বভাব দোষে, স্বেচ্ছায় বিপথে যায়—প্রায়ই তাহা যায় না—তবে স্বামীর উচিত সে স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা। কে শত্রু ঘরে পুষিবে ? অসতী স্ত্রী কি না করিতে পারে ?"

আমার স্ত্রীর নীতি-জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম সত্য, কিন্তু তিনি যে হিন্দু নারী, পতিকে দেবতা জ্ঞান করেন,—তিনি ত এরূপ বলিবেন-ই। স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী-দল ইহার কি মীমাংসা করিবেন ? পাশ্চাত্য দেশের নাটক-উপন্যাসে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিণতি কি দেখিতে পাই ?

সতীত্ব-আসল ও মেকী।

(প্রতিবাদ)

ফাল্গুন মাসের "মানসী"তে ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত "সতীত্বের কথা" ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ মহাশয়ের লিখিত "প্রতিবাদের উত্তর" আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। ডাঃ সেনের লেখাটী পড়িলে অনেক প্রশ্ন আপনা হইতে মনে উঠে। কয়েকটী প্রশ্ন নিম্নে লিখিতেছি।

তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা আসল সতীত্ব চাই, মেকীটা চাই না।" কি প্রকারে এই আসল সতীত্ব চেনা যাইতে পারে? আসল সতীত্ব অর্থাৎ অন্তরের শুচিতা কি প্রকারে সম্ভবপর হয় ও কি প্রকারে ইহা রক্ষা করা যাইতে পারে? রায়বাহাদুর সতীত্ব —আসল ও নকল,—রক্ষার একটি সহজ ও সর্ব্বজনবিদিত পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন—প্রলোভন হইতে দূরে থাকা। ডাঃ সেন হয়ত, প্রলোভন জয় করিয়া আসল সতীত্বের পরিচয় দিতে বলিবেন। অন্তরের শুচিতা রক্ষা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। মানব কেহই নিষ্পাপ নহে, আজ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচরিত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে কাল সেই ব্যক্তি পাপী হইতে পারে। সময় সময় মনে পাপচিন্তা আপনা হইতেই আসে যায়, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। মনে মনে শত্রুকে হত্যা করিলে ডাঃ সেন কি তাহার বিরুদ্ধে murder এর charge আনিতে পরামর্শ দিবেন? এইরূপ স্থলে মনে মনে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইতে পারে। নরেশবাবুর

মতে মন অপবিত্র হইলেই চরিত্র কলুষিত হইয়া থাকে, "মেকী" সতীত্বের কোন মূল্য নাই, উহা খোলশমাত্র। এইভাবে দেখিলে জগতে কয় জন সাধু ও সাধ্বী পাওয়া যাইবে? কাহার মনে শয়তান মধ্যে মধ্যে উঁকি না মারে? "The old beast is in us." নরেশবাবু আদর্শ সতী চান, তাঁহার আদর্শের চেয়ে ছোট হইলে তাহার কোন মূল্য নাই, মেকী, খোলশমাত্র। যাঁহারা এই বাস্তব জগতে আদর্শ পাইতে চান, তাঁহারা প্রতারিত হন, "Ideal belongs to idea only." আকাশের দিকে চাহিয়া হাঁটিলে হোঁচোট খাইতে হয়। "মেকী" সতীত্ব কি কুসংস্কার? যাঁহারা আদর্শচরিত্র তাঁহাদের জন্য কোন বিধি নিষেধ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যাহারা সাধারণ মানব তাহাদের জন্য নরেশবাবু কি ব্যবস্থা করেন? ইন্দ্রিয়-ভোগলালসা স্বভাবতঃই মানুষের মধ্যে প্রবল, এই প্রবল রিপুকে দমন করিবার জন্যই সমাজে এত বিধি নিষেধ, এত কঠোর শাসন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মন্দ হইলে সর্ব্বপ্রথমে অন্তর কলুষিত হয় অর্থাৎ "আসল" সতীত্ব নষ্ট হইয়া থাকে। "Character is a product of heredity and environment." স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশা কি এই আসল সতীত্বের পক্ষে হানিকর নহে? ডাঃ সেনের "ঠানদিদি" নামক উপন্যাসে দেখিতে পাই, একটী পতিপরায়ণা সতী তাঁহার স্বামীর দূর সম্পর্কে মামাত ভাইয়ের প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া পত্নীপরায়ণ সচ্চরিত্র স্বামী মনঃকষ্টে ও দুশ্চিন্তায় মারা গেলেন। কার্য্যের ফল দেখিয়াই

পাপ পুণ্য স্থির করিতে হয়, যে কার্য্যের ফল দুঃখ, তাহাই পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়। বাস্তব জগতে শুধু মনের দিক দিয়া পাপ বিচার করিলে চলে না, তাহা অবিচার হয়। এই প্রকারের পাপের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা ঝোঁক আছে। সাধারণতঃ মানুষ পাপ হইতে বিরত থাকে সমাজ শাসনের ভয়ে, আইনের ভয়ে, লোকনিন্দার ভয়ে, হয়ত পরকালের ভয়েও। এই সকল পরিণাম চিন্তা কি সুচরিত্রের পরিচায়ক নহে ? পশুচরিত্র মানবই পরিণাম চিন্তা করে না, রিপুর ক্ষণিক উত্তেজনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপ কার্য্য করে। বিবেকের ভয়ে অতি অল্পসংখ্যক লোকই সংযত থাকে, মানুষের বিবেক অতি দুর্ব্বল বলিয়াই এত কঠোর আইনের শাসন প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রকারের পাপ প্রকাশ হইয়া পড়িলেই বিবেকের তাড়না আরম্ভ হয়, পাপকার্য্য করিবার পূর্ব্বে বিবেকের শক্তি বিশেষ অনুভব করা যায় না। বিবেকের ভয়ও ভয়। ডাঃ সেন বলিতেছেন, "সতীত্ব ঠুনকো জিনিষ নহে, সহজে নষ্ট হয় না।" তাঁহার নভেল পড়িলে ত মনে হয় ইহাকে ঠুনকো বলিয়াই তিনি মনে করেন। তাহা না হইলে আমাদের সমাজে "এত গুপ্তা অসতীর" অস্তিত্ব সম্ভবপর হইল কি প্রকারে ? তিনি "পল্লী-সমাজের" ও কাশীর লোকমুখে শোনা কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের সমাজে সতীত্বের পরিমাণ বুঝিয়া লইয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি কিরূপে বলিতে পারেন "বাঙ্গালী নারী দলে দলে ছুটিয়া সতীত্বের খোলশ ফেলিয়া দিবেন এরকম আমি মনে

করিতে পারি না।" অন্ততঃ পুরুষের চরিত্রবল ত তিনি জানেন। কামিনী-কাঞ্চনের প্রবল আকর্ষণের কথা মহাপুরুষেরাও এক বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পতিত হইলে স্ত্রীলোক "গুপ্তা অসতী" হয় তাহা মনস্তত্ত্ববিৎ সর্ব্বজন-পরিচিত ঔপন্যাসিক ডাঃ সেন আমাদের চেয়ে ভালই জানেন। ডাঃ সেন বলিবেন ইহা কড়া শাসনের ফল "বজ্র-আটুনি ফস্কা গেরো"।

যাঁহারা অন্ধভাবে সর্ব্ববিষয়ে বিলাতীর অনুকরণ করিতে ভালবাসেন Lloyd's Magazine (June 1920) হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশগুলি আশা করি তাঁহাদের চিন্তার উদ্রেক করিবে।

THE MODERN-MARRIAGE PROBLEM.

Undoubtedly in nine cases out of ten the mad restlessness of the modern woman, discontent with her home, with her lot, with herself, and with her husband most of all, so that although man's unfaithfulness to woman has made countless women mourn in the past, to-day it is the woman who is bearing off the unworthy palm of infidelity. "Marry in haste and get divorced at pleasure" seems to be the motto that the average modern bride has adopted."

"There is scarcely a single one of man's vices of which she has left him the monopoly. And if to all others she is going to add that last crowning one of infidelity, it will be a poor look out for the race."

"It would be safe to wager that if divorce could only be forbidden altogether for a decade, not only would the standard of morality in both sexes go up with leaps and bounds, but the number of happy marriages would increase, and the number of unhappy marriages decrease in proportion."

"There are at this moment hundreds of unhapppy men and women who would give all they possess to find themselves unyoked again." There are men and women to whom, even given every inducement and opportunity in the world, faithlessness is simply impossible, either owing to the greatness of their love or their personal pride and sense of self-respect and duty. But these are in the minority; and if an aristocracy of love exists in these modern times, it is I fear, a very

limited one. At the same time, it must be conceded that a very great part, if not the greater part, of the breaking of the marriage vow, so far it included faithfulness, by which of course is meant chastity, is due to the wife's neglect, often unintentional no doubt, but still neglect." "She lives for social duties, or for some hobby or other. And the other woman or girl—it is mostly a girl—comes along. Remember that in every marriage there is always the Other woman waiting, just round the corner; sometimes the Other man, but always, always, always, "The other woman." And this is a fact which most wives would do well to bear in mind. Actually nine-tenths of them either forget or ignore her existence until she materialises, and then it is usually too late."

"And we have to remember we must not lose sight of the terrible temptations to which all our men, young and old, married and unmarried, have been and are being subjected on all sides. Women young and old, plain and pretty are now-a-days, alas, continually flinging themselves

it men's heads asking only to be allowed to sacrifice themselves."

"I want to be happy. Never mind whether my husband (or wife) is happy or not, so long as I am happy, that is all that matters. I must and I will have happiness, or what at the present moment seems happiness to me. I claim the right to live my own life." "What is the remedy here? That one side or the other shall give in? That again is unthinkable. The man cannot give up his independence, the woman will not give up hers. Her soul has grown and expanded. She is brighter, happier, more alert, more alive to the meaning of life." "The absolute callousness with which the modern woman has come to regard her marriage vows and her marital obligations, are largely due to the lax moral tone, not only of the last few years, but of the last twenty years."

Mrs Alfred Praga.

ভাবার্থ—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শতকরা নব্বই জন চঞ্চলপ্রকৃতি নব্যা নারী তাহাদের সংসারের প্রতি,

অদৃষ্টের প্রতি, সব চেয়ে বেশী তাহাদের স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বে অসংখ্য স্ত্রী, স্বামীর চরিত্রহীনতায় মনঃকষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে স্ত্রীগণই সে বিষয়ে স্বামীদের পরাজিত করিতেছে। "তাড়াতাড়ি বিবাহ কর আর যখন খুশি বিবাহ-বন্ধন ছেদন কর," নব্যা নারীর পক্ষে উহা যেন একটা আদর্শ নিয়ম হইয়াছে। পুরুষেরা যত রকম পাপে লিপ্ত হয়, সেগুলি সমস্তই এখন নারীদেরও আচরণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোনটাই বাদ নাই। তাহার উপর যদি আবার স্ত্রী ব্যভিচার পাপটিও যোগ করিয়া বসেন তবে এই জাতির পরিণাম শোচনীয় হইবে। নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়, দীর্ঘকাল যদি বিবাহ-বন্ধন ছেদন একেবারে নিষিদ্ধ থাকে তবে স্ত্রী ও স্বামী উভয় পক্ষেরই যে অশেষ নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে তাহা নহে, ইহাতে প্রীতিপদ বিবাহ-সংখ্যারি অনেক বৃদ্ধি হইবে এবং অপ্রীতিকর বিবাহ সেই তুলনায় কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে শত শত অসুখী স্বামী স্ত্রী আছে যাহারা বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। পৃথিবীতে এমন নারী ও পুরুষ আছেন, যাহারা শত প্রলোভন ও সুযোগ সত্ত্বেও চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট করিবেন না, পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম, আত্মমর্য্যাদা বা কর্ত্তব্য জ্ঞান ইত্যাদি যে কারণেই হউক। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কম। বর্ত্তমান কালে একনিষ্ঠ প্রেম অত্যল্প লোকেরই ভিতরে আবদ্ধ। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীর অবহেলার দরুণ (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) স্বামী অসচ্চরিত্র হয়। স্ত্রী

হয়ত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বা কোন একটা সখ বা একটা না একটা কিছু লইয়া মত্ত হইয়া দিন কাটায়, সেই সুযোগে অপর একটী স্ত্রীলোক—অধিকাংশ স্থলেই একটী অল্পবয়স্কা যুবতী (girl) স্বামীর কাছে আসিয়া জোটে। মনে রাখা উচিত যে অধিকাংশ স্থলেই অপর একটি স্ত্রীলোক স্বামীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অদূরেই অপেক্ষা করিতেছে, কখনও বা স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অপর একটি পুরুষও ঐরূপে লুকাইয়া থাকে বটে—কিন্তু সর্ব্বদাই "অপর একটী স্ত্রীলোক" থাকিবেই থাকিবে। এই কথাটী প্রত্যেক স্ত্রীর মনে রাখা ভাল। প্রকৃতই শতকরা নব্বই জন স্ত্রী ইহা ভুলিয়া যান বা জানিয়াও ইহা গ্রাহ্য করেন না। অবশেষে যখন বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তখন আর প্রতিকারের সময় থাকে না। যুবক বা বৃদ্ধ, বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলেরই জন্য চারিদিকে ভীষণ প্রলোভন জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা, সুন্দরী বা অসুন্দরী যুবতী সকলেই আজকাল ক্রমাগত পুরুষদের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, সতীত্ব রত্ন বিলাইয়া দিবার জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব।" আমি সুখ চাই, আমার স্বামীর (বা স্ত্রীর) সুখের কথা ভাবিবার দরকার নাই, আমি সুখে থাকিলেই হইল, যাহা আপাত মধুর, আমার নিকট যাহা সুখ, তাহা আমি নিশ্চয়ই চাই। আমি স্বাধীনভাবে আমার জীবন উপভোগ করিব, ইহাতে আমার অধিকার আছে।" এই সবের প্রতিকার কি? দুজনের মধ্যে একজন হার মানিবে? ইহা কল্পনাতীত। পুরুষ তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে পারে না।

নারী তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিবে না। নারীর আত্মা যে জাগিয়াছে,—"এখন নারী ফুটিয়াছে আপন গৌরবে, আপন মহিমায়।" নারী এখন জীবনের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে। নব্যানারী সতীত্ব ও বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে তাহার প্রধান কারণ নৈতিক শিথিলতা। ইহা যে গত কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নহে, গত বিশ বৎসর হইতে এইরূপ হইয়াছে।"

আলোচনা।

(ক) ভৌতিক তত্ত্ব।

গত ২৯শে মে তারিখের ও তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বে "অমৃতবাজার পত্রিকায়" ভাইস্ চ্যান্‌সেলার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনা বসু মহাশয়, মৃত ব্যক্তির আত্মার যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছে তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে সন্দেহও উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মৃত পিতা আত্মা কেন তাঁহার সহিত মাতৃভাষায় কথা না বলিয়া ইংরাজী ভাষায় কথা বলিলেন? যদি কলিকাতায় এই spirit (আত্মা আনীত হইত তবে কি spirit ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিত? শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যদি মৃত পিতার সহিত মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইত, ইহাতে

কোন প্রবঞ্চনা আছে কি না। মৃত পিতা পুত্রকে দুই-একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন—"In the third space and very happy." আত্মা (spirit) তাঁহার নিজের নাম বলিতে পারেন নাই কেন? শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের ভ্রাতা প্রথম দিনে নিজের নামটি শুদ্ধ করিয়া বলিতে পারেন নাই, দ্বিতীয় দিন বলিয়াছিলেন; ইহার কারণ কি? নাদা একটা ভারতবর্ষীয় মৃত বালিকার আত্মা, সে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত ইংরাজিতে কথা বলিল কেন? কয় জন ভারতবর্ষীয় বালিকা ইংরাজীতে কথা বলিতে পারে? Spirit ইংরাজী জানিলে সংস্কৃত, উর্দ্দু ইত্যাদি দেশীয় ভাষা জানাও তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় কি বিশ্বাস করেন, তিনি নাদার সহিত সংস্কৃতে কথা বলিলে spirit সংস্কৃতে তাহার উত্তর দিতে পারিত? সেই অন্ধকার-পূর্ণ গৃহে কোন গুপ্ত দ্বার দিয়া Mrs. Cooperএর নিযুক্ত কোন ব্যক্তি "নাদা" সাজিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করে নাই ত?

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মৃত পুত্রের নাম "গিরীন্দ্রনাথ"; কিন্তু আত্মা নিজের নাম বলিতে পারিল না, শুধু বলিল 'in', বোধ হয় কল্পিত spirit জীবন্ত ইংরেজ হওয়ায় বাংলা নাম মনে রাখিতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় তাঁহার মৃতা ভগিনীর আত্মাকে নাম জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন, "সেজ"। শুধু এই ছোট নামটাই বাংলায় স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল। নাদা শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মৃতা কন্যার নাম বলিতে পারে নাই, কেবল

বলিয়াছে নামে ছয়টী অক্ষর আছে, নামের শেষাংশ L A। তাঁহার কন্যার নাম ছিল "সুশীলা"। ইহাতে অনুমান হয়, "নাদার" মাতৃভাষা ইংরাজী। প্রায় স্থলেই দেখা যাইতেছে spirit এর নাম বলিতে যত গোলযোগ, ইহার কারণ কি? শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের পৌত্র তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে মারা গিয়াছিলেন; কিন্তু নাদা তাহার বিপরীত বলিল,—ভুলিয়া গিয়াছে নাকি? Mrs Cooperএর নিযুক্ত কোন ব্যক্তি গুপ্ত দ্বার দিয়া অন্ধকার পূর্ণ ঘরে আসিয়া (অথবা পূর্ব্ব হইতেই হয়ত তথায় লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল) শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের কপালে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করা অসম্ভব নহে। Mrs Cooper ও Mrs Johnson একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া, musical instrument ও trumpet এর সাহায্যে অন্ধকারপূর্ণ গৃহে spirit আনয়ন করেন,—ইহাই কি তাঁহাদের ব্যবসা নাকি? শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মনেও সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "Mrs Cooper asked me if my son had "passed over." I kept quiet and did not answsr the question to avoid giving any indication."

৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে "নব্যভারতে" কিছু আলোচনা হইয়াছিল। একজন সুদক্ষ হরবোলা (Ventriloquist) Sir Arthur Conan Doyleকে তাঁহার মৃত পুত্রের আত্মার সহিত আলাপ করাইয়া দিবেন, ইহা বলিয়া তাঁহাকে এক অন্ধকার-পূর্ণ গৃহে লইয়া যান, হরবোলা মৃত পুত্রের স্বর অনুকরণ

করিয়া Sir Conan Doyleএর সহিত বাক্যালাপ করেন ও তাঁহাকে এইরূপে প্রতারিত করেন। তিনি হরবোলার প্রতারণা বুঝিতে পারেন নাই। এই সুদক্ষ হরবোলাটী পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের সহিত পরিচিত ছিল।

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের লিখিত বিবরণে কয়েকটী আশ্চর্য্য ঘটনা আছে। আশা করি, সুধীমণ্ডলী এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া সত্য বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন।

(খ) ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব।

যেরূপ কোনো স্থানের জলবায়ু নানাবিধ নৈসর্গিক অবস্থা দ্বারা নিরূপিত হয় সেরূপ অনেক অবস্থার সমাবেশে ও আরও অনেক অবস্থার অভাবহেতু (positive and negative conditions) একটি কার্য্যফল (effect) উৎপন্ন হয়। কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হইতে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি প্রয়োজনীয়।

১। সর্ব্বপ্রথমে বস্তুটি দর্শনীয় হইবে।

২। আলো থাকা।

৩। অল্প আলোক বা অতিরিক্ত আলো না থাকা।

৪। বস্তুটী অতিদূরে বা অতি নিকটে না থাকা।

৫। অন্য বস্তু দ্বারা দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত না হওয়া।

৬। চক্ষুর দোষ না থাকা।

৭। একই জাতীয় দুইটি বস্তু পরস্পর সংমিশ্রিত না হওয়া।

৮। অন্যমনস্ক না হওয়া।

আমরা প্রতিদিনের এত আপদ-বিপদের মধ্যে যে কি প্রকারে বাঁচিয়া আছি, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমার কার্য্যের জন্য আমার ইচ্ছার দায়িত্ব কতটুকু। আমার ইচ্ছা (will) আমার মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া। আমার ইচ্ছাই কি আমার ইচ্ছার কারণ ?

আমার হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের কার্য্য কি আমার ইচ্ছায় চলিতেছে ? কত অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা (forces and counterforces) যে আমাদের জীবনের গতি নিয়মিত হইতেছে, ইহারমূল কোথায় ? ইহা আমাদের কল্পনাতীত। সমুদায় জাগতিক ক্রিয়াই নিয়তির (Causality) অধীন। "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ?"

ভক্তেরা যেখানে দেখেন ভগবানের ইচ্ছা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ ব্যাবহারিক (phenomenal) জগতে, তাহাতে দেখিতে পান নিয়তি (causal connection) বা কার্য্যকারণ-সম্পর্ক অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম।

আমাদের বিবেকজ্ঞান, "moral judgment" আকাশ হইতে পড়ে নাই, ইহাও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন একটী phenomenon মাত্র। বিবেকজ্ঞান শিক্ষারই ফল ; এই শিক্ষাই আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল। যদি মানবের ইচ্ছার (will) স্বাধীনতা থাকিত, যদি উহা কারণাতীত হইত তাহা হইলে সদ্-গ্রন্থ পাঠের ও সৎসঙ্গের কোনই প্রয়োজন থাকিত না, 'সংসর্গজা

দোষাগুণা ভবন্তি' এই উক্তি নিরর্থক হইত। যাহা দেশ-কাল ও নিমিত্তের (time, space and causality) বাহিরে তাহার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, "The phenomenal is real. At any rate it is real for us who know and can know nothing else." Dr. Paul Carus.

(গ) জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি ?

চিকাগো ইউনিভারসিটির জনৈক অধ্যাপক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। উহা লণ্ডনের "The Inquirer" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্ঞানের পরিমাণ :—জ্ঞানের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

(১) "তুমি কি সত্যের ও ন্যায়ের জন্য হৃদয়ে প্রকৃতই আকুলতা অনুভব কর ?

(২) তুমি কি দুর্ব্বলের ও পতিতের সহায় ও বন্ধু ?

(৩) তুমি কি দশের হিতের জন্য ভাব ও কাজ কর ?

(৪) তুমি কি দশজনকে ভালবাসিতে পারিয়াছ ও সে বন্ধুতা কি স্থায়ী হইয়াছে ?

(৫) কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে তুমি কি উদারচিত্ত, স্বাস্থ্যবান্ ও সুখী হইতে পারিয়াছ"?

"এরূপ আরও প্রশ্ন আছে, কিন্তু ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদিতে তোমার বিদ্যা কত সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও করা হয় নাই। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কেহ বিদ্বান হইয়াও প্রকৃত জ্ঞানী "truly educated" নাও হইতে পারে। অনেকেই ইহা ঠিক বোঝেন না।"

নিমন্ত্রণসভা।

(একটী কক্ষের পার্শ্বে ভুবনবাবু ও ধীরেন্দ্রবাবু সমাসীন, উভয়েই গ্রেজুয়েট এবং স্থানীয় উকীল।)

ভুবনবাবু—কিহে ধীরেন, তোমায় যে সেদিন ব্রাহ্মণ সভায় দেখতে পেলুম্ না! আজকাল যে বড় গা ঢাকা দিয়ে থাক।

ধীরেন্দ্রবাবু—আর ভায়া, তোমাদের ব্রাহ্মণ-সভায় উভায় গিয়ে কি হবে? সেখানে একদল conservative (গোঁড়া) লোক যারা বর্ত্তমান জগতের কোনো খোঁজ খবর রাখেন না, তাঁরা যে উঁচু গলায় বক্তৃতা করেন আর মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের দোহাই দ্যান, ওসব শুনতে আর আমার ভাল লাগে না।

ভুবনবাবু—তোমার ভাই, ব্রাহ্মণ-সভার সম্বন্ধে বড় ভুল ধারণা! আমাদের সনাতন ধর্ম্ম নানা জাতির অত্যাচারেও নষ্ট হয় নি। আবার আমাদের সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মাথা উঁচু ক'রে জেগে

উঠ্‌চে। এই দ্যাখ না কেন, আমাদের Universityর graduates, যাঁরা কিছুদিন আগে মনে করতেন হিন্দুধর্ম্মে কেবল গোঁড়ামী আর superstition (কুসংস্কার) তাঁরাই এসে আজ আমাদের সভায় lecture (বক্তৃতা) দিচ্চেন্। তাঁরাই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য দাঁড়াচ্চেন্। তোমার কিন্তু এ পর্য্যন্ত সাহেবিয়ানার নেশা ছোটে নি। তুমি যে একেবারে westernised হোয়ে গেচ হে! Mill, Bentham ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন তন্ত্র পুরাণ আলোচনা কর্‌লে তোমারও নেশা ছুটে যেত।

ধীরেন্দ্রবাবু—তা তো বেশ বুঝ্‌লাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, "সনাতন ধর্ম্ম", "সনাতন ধর্ম্ম" কোরে তোমরা এত গলাবাজি কর কেন? একবার এই ধর্ম্ম জিনিষটার ব্যাখ্যা আমার কাছে কর না দেখি।

ভুবনবাবু—ধর্ম্ম জিনিষটা এত সহজে তোমায় বোঝান যাবে না। আর অনেক দিন ধোরে তুমি Mill, Bentham পড়্‌চ, ইংরেজনবিশদের সঙ্গ কর্‌চ, বামুণের ছেলে হোয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছেড়েচ, সহরে যেখানে সেখানে যার তার হাতে খাচ্ছ, কাজেই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সহজে তোমার মাথায় ঢোকান যাবে না। আগে আমাদের শাস্ত্রগুলো পড়, যার তার হাতে খাওয়া ছাড়, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ হও, তারপর এ সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্‌বে। আশ্রয়দোষে তোমার মাথা গুলিয়ে গেছে।

ধীরেন্দ্রবাবু—বেশ বক্‌তে শিখেচ দেখ্‌চি। আমি Mill, Bentham পড়েচি বোলে, আর যার তার হাতে খাই বোলে, ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্‌ব না, আর যত বুঝ্‌বে গোঁড়ার দল, তোমরা—গতানুগতিকতাই যাদের ধর্ম্ম! জ্ঞানের রাজ্যেও তোমাদের জাতিবিচার! আচ্ছা, আমি তো অস্পৃশ্যতা মানিনে, তাতে তোমার সনাতন ধর্ম্মের কি ক্ষতি হোলো, বল দেখি?

ভুবনবাবু—ঐটে যে সনাতন ধর্ম্মের গোড়া। আগে গোড়া শক্ত কর তাই,—

ধীরেন্দ্রবাবু—কিন্তু পাশ্চাত্যেরা যে বল্‌চেন ঐটেই আমাদের অবনতির কারণ।

ভুবনবাবু—আরে রেখে দাও তোমার পাশ্চাত্য। শাস্ত্র পড়্‌বে না, সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝ্‌বে না, কোন্ সাহেব কি বলেচে তাই তোমার কাছে বেদবাক্য; ওরা যে নেহাৎ জড়বাদী, materialist, ওরা অধ্যাত্ম রাজ্যের কি খবর রাখে? শাস্ত্র পড়, সব সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ধীরেন্দ্রবাবু—আমি কোনো শাস্ত্র পড়ি নি, সত্য, কিন্তু বোধ হয় জগতের কিছু কিছু খবর রাখি। আর বর্ত্তমান জগৎ যাঁকে মহাত্মা বোলে পূজো করচে তিনি তো বল্‌চেন, অস্পৃশ্যতা একেবারে তুলে দিতে। ইহা যে জাতীয়তা গঠনের বিষম অন্তরায়। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এ সবের সংখ্যা

৩০।৪০ লক্ষ, আর বাকী সব অস্পৃশ্য জাতি। এই ৩০।৪০ লক্ষ লোক নিয়েই কি বাঙ্গালীর জাতীয়তা গড়ে উঠ্‌বে? "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না" করলে কি জাতীয়তা গড়ে ওঠে? যে ধর্ম্ম বা যে প্রথা জাতীয়তা গঠনের বাধা জন্মায়, মানুষকে ঘৃণা কর্‌তে শিখায়, তাহাই তো সব চেয়ে বড় পাপ। তোমাদের আধ্যাত্মিকতা কথাটার অর্থ আমি বুঝ্‌তে পারি নে। আচ্ছা, ভাই, তুমি তো Philosophy নিয়ে M. A. পাশ করেচ, বল দেখি এ তোমাদের কেমন ধারা আধ্যাত্মিকতা! ঐ যে স্বামিজী বোলেছেন, তোমাদের ধর্ম্ম ঢুকেচেন ভাতের হাঁড়িতে, ঐ কথাটা আমার প্রাণে বড় মিষ্টি লাগে। আর তাই বা কি অদ্ভুত বিচার! ইঁদুর, ছুঁচো ভাতের হাঁড়ির উপর ছুটাছুটি কর্‌চে, তাতে জাত যাবে না, সে ভাত খেতে পর্য্যন্ত আপত্তি নাই, আর একজন নমঃশূদ্র, তোমারই দেশের লোক, হয়ত তোমার গ্রামবাসী কি প্রতিবেশী, তোমারই ধর্ম্মাবলম্বী,—সে ঘরে ঢুক্‌লেই সব গেল! কি আধ্যাত্মিক যুক্তি এতে থাক্‌তে পারে! মানুষকে মানুষ এত হীন মনে কর্‌লে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না কি? আমরা যে মহাপাপী, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বহুদিন যাবৎ আরম্ভ হোয়েচে। জগতের কাছে আমরা লাঞ্ছিত, অবমানিত, আমরাইত untouchables! British Colony গুলিতে পর্য্যন্ত আমাদের ঢুক্‌বার অধিকার নেই! আমরা "Inter Class Carriage,

Reserved for Europeans" দেখে কত অন্যায় মনে করি, কিন্তু একবার ভেবে দেখি কি,—আমরা যে এর চেয়ে কত বেশী অত্যাচার আমাদের ভাইবোনদের উপর করে আসচি! যাদের তোমরা জড়বাদী বোলে বিদ্রূপ ক'রে থাক, আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সমস্ত বিষয়ে তাদেরই বিজয়-নিশান উড়চে। আর তোমরা আধ্যাত্মিকতার বৃথা গর্ব্ব নিয়ে দিন দিন রসাতলে যাচ্চ। হৃদয়হীনতাই কি তোমাদের আধ্যাত্মিকতা!—বলিতে বলিতে ধীরেন্দ্রবাবু কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহাদের খাবার জায়গা তৈয়ার হইয়াছিল, সকলকেই উঠিতে হইল, কাজেই তর্ক বন্ধ হইল। উঠিবার সময় ভুবনবাবু কিছু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন,—তুমি যে একেবারে westernised হোয়ে গেলে হে, ধীরেন!

দুঃখবাদ।

মানুষের মন প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব সুখের জন্য লালায়িত, কিন্তু কাহারও সুখের ষোলকলা পূর্ণ হয় না। মানুষ সুখের উপাদানসমূহ,—স্বাস্থ্য, প্রয়োজনানুরূপ ধন-সম্পদ ইত্যাদি লাভ করিলেও তাহার মন কিছুতেই সুখ বোধ করে না; মন কতকগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া বসে। সেই অভাবগুলিকে পূর্ণ করিতে গিয়া সুখের উপাদানগুলিকে হারাইয়া ফেলে, অথচ

কিছুতেই কল্পিত অভাবগুলি সে পূর্ণ করিতে পারে না; যিনি কিছুরই অভাব বোধ করেন না, তিনিই বাস্তবিক পক্ষে ধনী। "Want of want is real wealth." সাংখ্যকার বলেন, মানুষ যাহাকে সুখ মনে করে তাহা বাস্তবিক পক্ষে অভাবাত্মক, আহার করিলে আমাদের বাস্তবিক সুখ হয় না, ক্ষুধারূপ যন্ত্রণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় মাত্র; ঔষধ সেবন করিলে বাস্তবিক সুখ হয় না, ব্যাধিরূপ যন্ত্রণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় মাত্র। বৌদ্ধদর্শন মতেও দুঃখই প্রকৃত, "Sorrow and sorrow alone is all that the Buddhist recognises in this world of illusion; of nothing else does he think but the removal of this sorrow"—Buddhist Essays. Schopenhauerও এই মতাবলম্বী ছিলেন। মানুষ কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রে যযাতির উপাখ্যানে সেই তত্ত্বটী সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে,—তিনি যখন পুত্রদের নিকট যৌবন ভিক্ষা চাহিলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহাকে আপন যৌবন ফিরাইয়া দিয়া বৃদ্ধ পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। তখন যযাতি সহস্র বৎসর পুত্রের যৌবন লইয়া বিষয় ভোগ করিলেন কিন্তু তাঁহার বাসনার নিবৃত্তি হইল না, বরং উহা উত্তরোত্তর বলবতী হইতে লাগিল। একটী বাসনার তৃপ্তি হইতে না হইতেই, সহস্র বাসনা মানুষের মনকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। বুদ্ধিমান যযাতি ইহা বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে যৌবন ফিরাইয়া দিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করিলেন। সুখ মায়া-

মরীচিকা; মানুষের জীবনে দুঃখের ভাগ অনেক বেশী, অনেক কষ্টের বিনিময়ে একটু সুখ মিলে, আবার সুখকে পাওয়া মাত্রই আমরা হারাইয়া ফেলি। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই মতকে Pessimism বা দুঃখবাদ আখ্যা দিয়াছেন। যাঁহারা Optimist বা সুখবাদী তাঁহারা দুঃখ জিনিষটার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। Leibnitz এবং Hegel উভয়ই Optimistগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা দুঃখের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া কোনো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। Leibnitz বলিয়াছেন, "The world is the best of all possible worlds." Hegel বলিয়াছেন, "Evil is a necessary phase in the self-evolution of the Absolute". এসব কথার সমষ্টি মাত্র; ইহাতে প্রকৃত জিনিষের কোন ব্যাখ্যাই হয় না। যাঁহারা Intuitionist তাঁহারা যেখানে কিছুই আর খুঁজিয়া পান না, সেখানে কল্পনাবলে একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া লন এবং তাহাকে ব্রহ্ম বা Absolute নাম দিয়া পরম শান্তি অনুভব করেন। যিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠিত, অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, যিনি পূর্ণ (perfect) তিনিই Absolute, "The word 'Absolute' has two meanings. It may mean what is out of relation and it is clear that no object of knowledge can be out of relation to the mind that knows it. It may also mean what is perfect."—History of Philosophy By Thilly.

সমস্ত পদার্থ ই বিজ্ঞতার জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞান নিরপেক্ষ হইয়া কিছুই থাকিতে পারে না,—দ্রষ্টা ব্যতীত দৃষ্ট থাকিতে পারে না "Its essi is percipi." জ্ঞানে যাহার বিকাশ তাহাই আছে। Absoluteও আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত, কিন্তু যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত তাহা সীমাবদ্ধ, অতএব দেশ-কাল ও নিমিত্তকে (time, space and causality) ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত, যাহা সসীম, তাহা কখন Absolute হইতে পারে না। অতএব দ্বৈতবাদের উপর Absolute দাঁড়াইতে পারে না, বরং বেদান্তের অদ্বৈতবাদের দ্বারাই Absoluteএর ব্যাখ্যা হইতে পারে। অদ্বৈতবাদী বলেন, —আমিই সেই Absolute. "The true Self according to the Vedanta is all the time free from all conditions, free from names and forms"—Max Muller. জন্ম-মৃত্যু, আমারই মনঃকল্পিত। আমি অজ ও অমর। আমার জন্ম আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। আমার মৃত্যুও আমি কখন প্রত্যক্ষ করিব না। আমি মায়া প্রভাবে রামশ্যামকে সৃষ্টি করিয়া মায়া প্রভাবেই উহাদের মৃত্যু ঘটাই, উহারা জন্মেও না মরেও না, উহাদের পারমার্থিক (real) কোনো সত্তা নাই, ব্যাবহারিক সত্তা আছে মাত্র। আমি অবিদ্যা বশতঃ সিদ্ধান্ত করি যে, আমিও জন্ম-মৃত্যুর অধীন। দেশকাল আমারই মনের কল্পনা, (forms of perception) উহাদের কোনো বাস্তব (objective) সত্তা

নাই। আমিই একমাত্র সৎ ও নিত্য বস্তু, আর সমস্তই আমার কল্পিত পদার্থ—আমার কল্পনার সৃষ্টি "The world is Maya. All is illusive, with one exception of my own "Self" of my Atman."—Outlines of Indian philosophy—By Dr. Paul Deuessen."আমার বোধ হয় যে, এই রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ—ইহারা যেন আমার বাহির হইতে আসিতেছে কিন্তু যদি আমি বাহ্যজগৎকে বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে এই রূপরসগন্ধাদি অনুভূতির অতিরিক্ত আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না।" আমি ঐন্দ্রজালিক শক্তি (মায়া) প্রভাবে এই রূপরসগন্ধস্পার্শশব্দময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহার সহিত লীলা করিতেছি। আমি দেশকাল ও জন্ম-মৃত্যুর অতীত, আমি অনাদি ও অনন্ত। আমি আছি, ইহা স্বতঃপ্রমানিত। ইহাই অদ্বৈতবাদ। বেদান্তের কোনো কোনো ভাষ্যকার জীবকে (individual soul) ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য একথা স্বীকার করেন না কারণ অংশ দ্বারা দেশে বিস্তীর্ণ ও কালে বিদ্যমান বুঝায়, ছোট আর বড় এই দুই প্রভেদের মূলে Space. অংশ দেশকালব্যাপী,—কিন্তু আবার দেশকালই জীবাত্মার কল্পনা প্রসূত; জীবাত্মা দেশ ও কালের অতীত, সুতরাং জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না। "Time and space are empirically real but transcendentally ideal."—Kant. "We are not in space but space is within us."—Lotze. ব্রহ্ম অনন্ত, কোনো বস্তুর সহিত

ব্রহ্ম তুলনীয় নহে, জড়বস্তুর গুণ ইহাতে আরোপিত হইতে পারে না। ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে ভেদজ্ঞান মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা। The 'Jiva' cannot be a part of Brahman (Ramanuja), because Brahman is without parts (for it is timeless and spaceless, and all parts are either successions in time or Co-ordinations in space,—as we may add),—neither a different thing from Brahman (Madhava), for Brahman is ekam eva advitiyam, as we may experience by anubhava,—nor a metamorphose of Brahman (Vallava), for Brahman is unchangeable (for, as we know now by Kant, it is out of causality.) The conclusion is, that the 'Jiva' being neither a part, nor a different thing, nor a Variation of Brahman, must be the Paramatman fully and totally himself."—Outlines of Indian Philosophy—Dr. Paul Deussen.

ব্রহ্ম বা আত্মা, জীবাত্মা বা পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপে একই বস্তু, সেই বস্তুই "আমি"। আমিই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়; জ্ঞাতা আমি স্রষ্টা (Subject), জ্ঞেয় আমি সৃষ্ট (object)—"It is my Ego that objects itself as phenomena" 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

যিনি Absolute তাঁহার আত্ম-প্রকাশের জন্য evil এর প্রয়োজন হইবে কেন? যদি Absoluteএর পক্ষে evil একান্ত প্রয়োজনীয় হয় তবে evilএর জন্য মানব দায়ী হইতে পারে না। মোটের উপর এসব কথায় প্রাণ সাড়া দেয় না, মন বুঝ মানে না।

কেহ কেহ বলেন,—ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদিও ইহ-কালে কখন কখন কষ্ট ভোগ করেন তাহা ক্ষণস্থায়ী, কেননা তিনি পরলোকে গিয়া অনন্ত কাল স্বর্গ সুখ ভোগ করিবেন, পুণ্যের পুরস্কার পাইবেন। অতএব পুণ্যাত্মার পক্ষে দুঃখের কোনো অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। কয়জন স্বর্গরাজ্যে যাইবার অধিকারী? এই স্বর্গরাজ্যটী কি রকম? স্বর্গরাজ্যের কল্পনা এই মর্ত্ত্য-রাজ্যেরই একটী রঙ্গিন প্রতিমূর্ত্তি নহে কি? পুণ্য কার্য্য করিলেই সুখী হওয়া যায় না, সুতরাং পুণ্য ও সুখের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া হয়ত মনকে প্রবোধ দিবার জন্য Kant, God, Immortality of the soul and Freedom of will প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।—Critique of Practical Reason. দার্শনিক প্রবর Lotz "Problem of Evil" এর সমস্যা লইয়া বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মত আলোচনা করিয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, Pessimism as a theory is equally tenable as optimism. সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিলে, সরকারি হাসপাতালের হৃদয়বিদারক দৃশ্য ভাবিলে কাহার না

প্রাণ কাতর হয়! পরের দুঃখে দুঃখানুভব করাও ত দুঃখ। বস্তুতঃ মানব জীবন এতই দুঃখপূর্ণ যে ইহাকে অস্বীকার করিলে জীবন সমস্যারই সমাধান চলে না, ধ্রুববাস্তবকে বাদ দিয়া চক্ষু, কর্ণ, বুদ্ধি, মন বন্ধ করিয়া যে দর্শনের সৃষ্টি হয় তাহাতে পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহা অসার, ভিত্তিহীন। এত দুঃখের মধ্যেও যে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চাহে তাহা সুখের আশায় নহে; মানুষ মরিতে ভয় পায়,—

"But that the dread of something after death,
The undiscover'd country, from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of ?"—

Hamlet.

সত্যের সন্ধান।

প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি; বাল্য ও যৌবনের আমোদ উল্লাস আর ভাল লাগে না। অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিতে কতই না কষ্ট ভোগ করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি পাইলাম কোথায়? স্নেহ, মমতা, বন্ধুত্ব, ভালবাসা সবই ক্ষণ-ভঙ্গুর, প্রায়ই স্বার্থজড়িত। সাংসারিকতায় যে এত অশান্তি তাহা কি পূর্ব্বে জানিতাম! আত্মীয়-স্বজনের অকাল মৃত্যুতে

হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এই তো ক্ষণস্থায়ী জীবন! অনেক সময় মনে হয় এই দুর্ব্বহ জীবনভার বহিয়া লাভ কি? এ অবস্থায় স্বভাবতঃই মন সৎ বস্তু পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

সত্য লাভের জন্য প্রথমে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সাহায্য লইলাম। কিন্তু দেখিলাম ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যে যথার্থ সাক্ষ্য দিয়া আমাদের স্বরূপ জ্ঞান লাভের সাহায্য করিতেছে তাহার প্রমাণ কি? আমরা অনেক সময় ইহাদের দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকি। চক্ষু রগড়াইবার সময় আমরা হঠাৎ বিদ্যুতের চমকের ন্যায় কি যেন অনুভব করি, যদিও বাহিরে ইহার কোনো অস্তিত্ব নাই। এমন অনেক বস্তু আছে যাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, অনেক শব্দ আছে কাণে শুনিতে পাই না, মাথায় উকুনের ভার আমরা অনুভব করি না, কিন্তু পিপীলিকা দূর হইতেও বোতলে আবদ্ধ চিনির গন্ধ পায়, শকুনি শূন্যে থাকিয়াও কোথায় গরু মরিয়াছে জানিতে পারে। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল যদি ভিন্ন প্রকারে গঠিত হইত তাহা হইলে আমাদের বস্তুজ্ঞানও ভিন্ন প্রকারের হইত। আর একটী অধিক ইন্দ্রিয় থাকিলে হয়ত আমরা একটী নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কোনো দুইজন দ্রষ্টা ঠিক এক রকম দেখেন না। নিম্ন আদালতের নথি-পত্র দেখিয়া হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের অতীত বিষয়ের স্মৃতি যে

সত্য তাহাই বা বুঝিবে কি প্রকারে? উহা প্রমাণ করিতে স্মৃতির উপরই নির্ভর করিতে হয়।

এই যে রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময় পরিদৃশ্যমান জগৎ—ইহা যে সত্যসত্যই আমার বাহিরে তাহার কি প্রমাণ আছে? (Kant has demonstrated, that space, time and causality are not objective realities, but only subjective forms of our intellect and the unavoidable conclusion is this, that the world, as far as it is extended in space, running on in time, ruled throughout by causality, in so far, is merely a representation of my mind and nothing beyond it.—Outlines of Indian Philosophy. "Matter is a form of thought. Space and time are only forms of thought. Space is the form of external perception, and time is the form of internal perception." We know of nothing entitled as substance except individual perception." —The Philosophy of Kant By Lindsay. এই বাহ্য জগৎ আমরা মানিয়া লই, ইহা না মানিলে জীবনযাত্রা চলে না, আদান প্রদানে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ইহা মানিতে আমরা বাধ্য, সেই জন্য আমরা ইহাকে ব্যাবহারিক হিসাবে সত্য (Pragmatic truth) বলিতে পারি, "Pragmatism asserts that the only test of truth is to be found in its

bearing upon human interests and purposes". যাহা আমার পক্ষে সত্য, তাহা আমার নিজস্ব সত্য। পারমার্থিক হিসাবে সত্য,—সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম সত্য (absolute reality) কি, তাহা কে বলিবে? জীবনসংগ্রামে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে, (natural selection) যেমন ব্যাঘ্রের থাবায় ধারাল নখ গজাইয়াছে সেই প্রকার মানুষেরও মাথার খুলিরমধ্যে একরাশি সারবান মগজ জন্মিয়াছে। বুদ্ধি মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া। বুদ্ধি মানুষের আত্মরক্ষার অস্ত্র বিশেষ, ইহা মানুষকে জীবনসংগ্রামে সাহায্য করে মাত্র। ইহা দ্বারা মানব কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে? দার্শনিক প্রবর Kant এই সব বিষয়ের কোনো মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তিনি Critique of Pure Reason নামক গ্রন্থে God, Freedom and Immortality সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচরাচর যে সকল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় তিনি উহার কোনোটার উপরই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধেও কোনো প্রমাণ তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি তাঁহার "Critique of Pure Reason" এ "Transcendental Dialectic" অধ্যায়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মত যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। একবার তিনি প্রমাণ করিতেছেন, "The world has a beginning in time, and is limited also in regard to space." পক্ষান্তরে

তিনিই দেখাইতেছেন, "The world has no beginning and no limits in space, but is infinite, in respect both to time and space." একবার তিনি দেখাইতেছেন "Every compound substance in the world consists of simple parts, and nothing exists anywhere but the simple or what is composed of it." আবার তিনিই ইহার বিরুদ্ধ মতকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। একবার তিনি বলিতেছেন "Causality, according to the laws of nature, is not the only causality from which all the phenomena of the world can be deduced. In order to account for these phenomena it is necessary also to admit another causality, that of freedom." (Thesis)—কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, অনেক ঘটনা নিরূপণ করিবার জন্য ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয়।

পুনরায় তিনিই বলিতেছেন, "There is no freedom, but everything in the world takes place entirely according to the laws of nature." (Antithesis)—স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই, সমস্ত ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়মে, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

এইরূপ বিরুদ্ধ মতবাদের অবতারণা করিয়া অবশেষে Kant

উহার প্রকৃত মীমাংসার (Solution of the antinomies) চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তিনি Pure Reason এর ভিতর দিয়া ঐগুলির কোনো সমাধান করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি ঐগুলির সমাধানের জন্য phenomenaর রাজ্য ছাড়িয়া Noumenon এর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন; God, Freedom and Soul প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু যে আলোকের সন্ধানে তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত সাধনা নিয়োগ করিয়াছেন, সেই আলোকের সন্ধান লাভে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি চরম তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যে পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে তিনি নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। Phenomena ও Noumena—Pure Reason ও Practical Reason এর মধ্যে তিনি হাবুডুবু খাইয়াছেন। তিনি Pure Reason এ যে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, Practical Reason এ সেগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। God, Freedom and Immortality তাঁহার মতে Moral judgment এর Postulates বা স্বাকার্য্য, কেননা, ইহা স্বীকার না করিলে নীতির ভিত্তি উড়িয়া যায়। Kant এর মতে যুক্তির দ্বারা এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। Kant এর ন্যায় চিন্তাশীল মনীষীও কোনো চরম সত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই। Kant এর পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ, (Fichte, Schelling, Hegel প্রভৃতি) তাঁহার মতবাদের সমালোচনা করিয়া আপন আপন মতের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

Kant এর মতে ঈশ্বর, Moral judgment এর Postulate, অতএব তাঁহার মতে ঈশ্বর সগুণ। কিন্তু Fichte বলিতেছেন, "The Absolute-Self is the mind which thinks and wills in me when I think or will aright. This moral order we may call God and beside or outside of it there is no God."—আমাদের বিবেককেই (conscience) ভগবান্ বলা যাইতে পারে, ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো ভগবান নাই। Fichte, "moral judgment" স্বীকার করিয়াও অন্য কোনো God স্বীকার করেন নাই। আবার Schopenhauer, religion স্বীকার করিয়াও কোনো God (সগুণ ঈশ্বর) স্বীকার করেন নাই, তিনি বলেন religion এর সহিত কোনো সগুণ ঈশ্বরের সম্বন্ধ নাই, "Religion in Schopenhauer's view has nothing to do with a personal God." Spinoza প্রকৃতিকেই ঈশ্বর বলেন, তিনিও কোনো সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না, "Spinoza expressly denies personality and consciousness to God. He has neither intelligence, feeling nor will. He does not act according to purpose, but everything follows necessarily from His nature, according to Law, this action is causal not purposive. He is identified with the universe."—History of Philosophy By Thilly.

মনীষী দার্শনিক Hume বলিয়াছেন যে, "সরলপ্রকৃতি

বার্কলি" ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা দ্বারাই আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ খণ্ডন করা যায়, "Hume shows ingeniously that 'The good Berkeley's' argument for the existence of God could be turned round to disprove the existence of the soul, and he concluded that religion was a sphere with which reason had no concern." দার্শনিকগণের ভিতর এইরূপ মতভেদ দেখিয়া আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয় "In philosophy one doctrine is as good as another, and therefore none are worth very much"—দর্শনশাস্ত্রে যে সকল বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকটীই বেশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং কোনো মতেরই বিশেষ কিছু মূল্য নাই। দার্শনিকগণও সমস্ত জীবন অন্ধকারে হাতড়াইয়া গিয়াছেন। কোনো যুগে কোনো ঋষি বা মনীষী এ সমস্ত বিষয়ে কোনোই চরম মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। আমাদের দেশেও ঋষিগণের ভিতর বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, সেই জন্য যুধিষ্ঠির "কঃ পন্থাঃ ?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ,

নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

ধর্ম্মতত্ত্ব গুহানিহিত হইল। পণ্ডিতগণ মহাজনের পথের অনুগামী হইতে বলিলেন। মহাজন কে? ইহার মীমাংসা হইবে কি? মহাজনগণের ভিতরও তো মতবিরোধ দেখিতে পাই। কেহ বলিতেছেন,—জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা; আর কেহ বা বলিতেছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সাংখ্যদর্শন বহুজীববাদী, বেদান্ত একজীববাদী, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। সাংখ্য মতে জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রকৃতি হইতে আর বেদান্ত মতে জগতের সৃষ্টি আত্মা হইতে। বৌদ্ধদর্শন মতে সমস্তই ক্ষণিক জ্ঞান (sensations); আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নাই "Though there is I-consciousness there is no real "I" unit". সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ William James লিখিয়াছেন, "For twenty years past I have mistrusted "consciousness" as an entity; for seven or eight years past I have suggested its non-existence to my students."—বিগত কুড়ি বৎসর যাবৎ আমার একটী ভুল বিশ্বাস ছিল যে, মন একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, কিন্তু গত ৭।৮ বৎসর যাবৎ আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া আমার ছাত্রদিগকে বলিতেছি যে, মনের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

Schopenhauer বলেন, বাসনাই দুঃখের মূল; প্রসিদ্ধ দার্শনিক Nietzche বলেন, ঠিক ইহার বিপরীত—"Will to power."

Nietzche made Schopenhauer's devil 'Will to power' into his God." Nietzcheর মতে দয়ামায়া মনের দুর্ব্বলতা; Religion is for the weak—দুর্ব্বলের বল, "বল হরি বল।" "Superman" তাঁহার লক্ষ্য; তিনি জার্ম্মান জাতিকে "Will to power" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যুদ্ধে মাতাইয়াছিলেন, তাহার ফলে বর্ত্তমানে জার্ম্মান জাতির এই দুর্দ্দশা, "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?"

Kantকে সমালোচনা করিতে গিয়া Fichte প্রমুখ দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, "This 'thing-in-itself' was itself, after all, only a creature of the mind, that to suppose there need be anything in our experience which is not produced by the mind from its own resources, is only an inconsistent relic of that "dogmatic" way of thinking of which it had been Kant's great aim to get rid". আবার Ficheteই বলিতেছেন,—Divisible Ego posits a divisible Non-Ego to realise itself in the Absolute Ego. এসব দার্শনিকের হেঁয়ালি। Kantএর "dogmatism"এ Fichte যে দোষারোপ করিয়াছেন, বিচার করিয়া দেখিলে Fichteর প্রতিও সেই দোষ আরোপিত হয়। Kantএর "Thing-in-itself" যদি মনঃকল্পিত ও অন্ধবিশ্বাস প্রসূত

হয় তবে Fichteর 'Absolute Ego"ই বা কেন ঐরূপ মনঃকল্পিত হইবে না? Fichteর Egoই পরিণামে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাইয়া ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি সমস্ত জার্ম্মাণ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার Self-conscious Egoর দোহাই দিয়াছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যেও মতের পরস্পর এত অনৈক্য দেখিয়া দুই গুলিখোরের গল্প মনে পড়ে,—এক গুলিখোর আর এক গুলিখোরকে দেখিয়া বলিতেছে,—"ভাই, এক স্থানে দেখিলাম জলের ভিতর আগুন লাগিয়াছে ও মাছগুলি গাছে উঠিতেছে। আর এক গুলিখোর ইহার উত্তরে বলিল—দূর গাধা, মাছ কি গরু নাকি যে গাছে উঠ্‌বে?"

কেহ কেহ আছেন যাহা যত দুর্ব্বোধ্য ও জটিল তাহাতে তত শ্রদ্ধাবান্। দার্শনিকদের মধ্যে কেহ Materialist, কেহ Sensationalist, কেহ বা Idealist, (Hume, Mill, Berkeley প্রভৃতি)। "শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য—সগুণ নহেন; এবং রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য—নির্গুণ নহেন"। —গীতায় ঈশ্বরবাদ। কোন মতটী সত্য—সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক সত্য? সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক Comte বলেন, মানব সভ্যতার তিনটী স্তর। প্রথম স্তর—দৈবশক্তিতে বিশ্বাসের যুগ (The Theological Stage), দ্বিতীয় স্তর—দার্শনিকের হেঁয়ালি ও বিভিন্ন মতবাদের ছড়াছড়ির যুগ (The metaphysical Stage), আর তৃতীয় স্তর—বাস্তবতার যুগ,—সহজ,

সরল, সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের যুগ, বিজ্ঞানের অনুকূল মতবাদের যুগ (The positivistic Stage.)

নানা জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু আলোচনা করিলাম; একই ঈশ্বর বিভিন্ন জাতির জন্য পরস্পর বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? কোনো পরমকারুণিক পরমেশ্বর যে আছেন তাহাও তো যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি বুঝিতাম, কোনো ধর্ম্মশাস্ত্র বা কোনো ধর্ম্মপ্রচারক বিশ্বমানবের নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তাহা হইলে না হয় সেই ধর্ম্ম সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ মনে করিয়া তাহারই সাধনায় জীবনপাত করিতাম। কিন্তু কৈ? কোথাও তো নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ দেখিতে পাইলাম না। মঙ্গলামঙ্গল যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Edward Gibbon বলিয়াছেন যে, উদার খৃষ্টধর্ম্ম সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্যের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। কেহ কেহ বলেন, সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মও ভারতের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। বুদ্ধদেবের উদার ধর্ম্মপ্রচারের ফলে ভারতবাসী আত্মরক্ষার শক্তিটুকুও হারাইয়াছে। বৌদ্ধদের সন্ন্যাসবাদ দেশের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, "বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকগুলির বংশ ধ্বংস করিয়াছিল তেমনই উহা আবার সমাজের অপদার্থ লোকগুলির বংশ বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ফৌজদারি আইন অত্যন্ত বর্ব্বরোচিত ছিল, স্বল্প অপরাধেই লোকের প্রাণদণ্ড হইত, কিন্তু এই কঠোর

ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের দুষ্ট ও অলস লোকদিগের বংশ ধ্বংস করিয়া জাতির উন্নতিবিধান করিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ চারিপার্শ্বের অবস্থাকেই জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জাতির উন্নতি ও অবনতি নিয়তির হস্তে, তাই আমার ধারণা জাতির উন্নতি ও অবনতি মানুষের বুদ্ধির অতীত, এক দুর্জ্ঞেয় শক্তির বলে পরিচালিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই শক্তিকে নিয়তি এবং ভক্তগণ এই শক্তিকে ভগবান বলিয়া থাকেন। যখন কোনো পতিত জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার চারিদিকের অবস্থা ও বুদ্ধি এমন নিয়মিত হয় যে, তাহার প্রতিভাশালীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, তাহার উন্নতি কেহই রোধ করিতে পারে না।"—"ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটী বৈজ্ঞানিক কারণ", প্রবাসী— চৈত্র, ১৩২০। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই ভারতে অনেকাংশে বিজ্ঞানের অবনতি ঘটিয়াছে। বৌদ্ধেরা শবব্যবচ্ছেদ (Dissection) প্রথাকে নিষ্ঠুর ও অধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিতেন। মহারাজ অশোক তাঁহার রাজত্বকালে এই প্রথা বন্ধ কয়িয়া দেন। এই প্রথা বন্ধ হওয়াতেই শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) উন্নতি হইতে পারে নাই, অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) লোপ পাইয়াছে। এই প্রথা প্রচলিত থাকিলে ভারতে কায়চিকিৎসার (Medicine) ন্যায় শারীরবিজ্ঞান ও অস্ত্রচিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারিত। বুদ্ধদেবের প্রচারিত যে ধর্ম্মনীতি নিখিল জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল সেই ধর্ম্মের ফলেই আবার

অন্যদিকে বিজ্ঞানের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হরিপ্রেমের বন্যায় সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উদার প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের ফলেই বাংলাদেশে অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য ভাবের দিকটা এতটা ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে জগতের সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। কিন্তু আবার তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের ফলে ও আরও অন্যান্য কারণে দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতি আরও দুর্ব্বল, নির্বীর্য্য, জাতীয়তাহীন ও সর্ব্বপ্রকারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। উদার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার ক্ষমতাটুকুও লোপ পাইয়াছে। মনুর সমাজনীতি হিন্দুর জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে, সত্য, কিন্তু অপরপক্ষে অস্পৃশ্যতামূলক শ্রেণীবিভাগ দ্বারা ও "অষ্ট বর্ষে ভবেৎ গৌরী" ইত্যাদি ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দুজাতির অকল্যাণ সাধন করিয়াছে। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" ইত্যাদি অনুশাসনের ফলে বঙ্গদেশে যে স্ত্রীজাতি অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে, ইহা সত্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কে অস্বীকার করিতে পারেন? আমাদের অধঃপতনের ইহাও অন্যতম কারণ, "Take care of your women and the race will take care of itself." আবার পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার ভিতরেও তো কম গলদ দেখিতে পাই না! সে দেশে ইহারই ফলে পারিবারিক বন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল (absolute good) কিছুই নাই, শুধু ভালটুকু পৃথক করিয়া আনা যায় না, ভালর

সঙ্গে মন্দও অনেকখানি আসিয়া পড়ে। ধর্ম্মমত (religion) এবং দেশহিতের (patriotism) নামে আমাদের দেশেও কতই না পৈশাচিক কার্য্য সাধিত হইয়াছে, "Patriotism is a kind of selfishness which a person feels for his own country". দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ এবং অকল্যাণ উভয়ই সাধিত হইয়াছে কিন্তু কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশী হইয়াছে কিনা কে বলিবে? মহাপুরুষ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি দ্বারাও সময় সময় জাতির অকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক Nietzche প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

কোথাও সত্যের দর্শন লাভ হইল না, প্রাণের পিপাসা মিটিল না, তখন সহজাত সংস্কারের (intuition) উপর নির্ভর করিলাম। নিজের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, সহজাত সংস্কার বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। যদি আমি সমাজের বাহিরে প্রতিপালিত হইতাম তাহা হইলে হয়ত বুঝিতে পারিতাম প্রকৃত intuition কোনটা। কিন্তু শিশুর জন্ম গ্রহণের পরেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার উপর এরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে যে, তাহার সহজসংস্কার অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়ে; বীজ (heredity) ও মৃত্তিকার (environment) সংযোগেই বৃক্ষের (individuality) বিকাশ। বাল্যকালে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতাম তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়া বুঝিতেছি, দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহা সত্য বলিয়া মনে

করিতাম, এখন দেখিতেছি তাহা অন্ধবিশ্বাস মাত্র। পরিবর্ত্তনশীলতাই প্রকৃতির নিয়ম ; দীপশিখার ন্যায় আমিও প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছি,—"No man can bathe twice in the same river." বৌদ্ধদিগের ন্যায় Heraclitus এবং Bergson ও এই মতাবলম্বী ; Hegel এর মত Bergson কোনো অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা (absolute) স্বীকার করেন না।

Ptolemic theory তে বলিত পৃথিবী স্থির কিন্তু এখন বিশ্বাস অন্যরূপ। Intuitionistও সকলে একই সত্যে উপনীত হন নাই।

সহজাত সংস্কার অথবা প্রজ্ঞা (reason) দ্বারাও সত্য পাওয়া গেল না। মনে করিলাম সাধুসঙ্গ দ্বারা শান্তি পাইব ; নানা তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া বহু সাধুসন্ন্যাসীর দর্শন-লাভ করিলাম কিন্তু সেখানেও যথার্থ বস্তুর সন্ধান মিলিল না। দেখিলাম সেখানেও বুজ্‌রুকি ও অর্থলোলুপতা ; অনেকে মোহান্ত সাজিয়া অহঙ্কারের বোঝা লইয়া বকধার্ম্মিক হইয়া বসিয়া আছে, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে সুখ অন্বেষণ করিতেছে। তারপর পৃথিবীর কর্ম্মবীরগণের জীবনী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে করিলাম কর্ম্মদ্বারাই জীবনে শান্তি আনিব কিন্তু সেখানেও দেখিলাম জাতিগত স্বার্থই বীরত্বের ও কর্ম্মের প্ররোচক। উহাদের দ্বারা নিখিল মানব-সমাজের কি প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ? জাতিগত স্বার্থই তাঁহাদের নিকট বড়। দুর্ব্বল জাতিকে পদদলিত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠাই কি বীরত্ব ? সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্ম্মবেত্তা

(theologian) Hegel স্বজাতির প্রতি প্রীতি বশতঃ বলিয়াছেন, "Asia was doomed to be dominated by Europe". কিন্তু আবার মনে হইল "A cosmopolitan loves all countries but his own."

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান কিছুতেই প্রাণে শান্তি দিতে পারিল না। সকল দেশেই রাজনীতিতে দেখিতে পাইলাম,—অভিজাতবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যই আইনের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা; সমাজনীতিতে দেখিতে পাইলাম,—ধনসেবা ও ধনিসেবা; ধনীর পোষণের জন্য শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের রক্ত শোষণ: ধর্ম্মনীতিতে দেখিতে পাইলাম,—শুধু বাহ্যাড়ম্বর, কপটতা, অবিচার, মিথ্যাচার, প্রাণহীন শুষ্ক অনুষ্ঠান। দর্শনশাস্ত্রে দেখিতে পাইলাম,—কথার কাটাকাটি, মতবাদের ছড়াছড়ি। বিজ্ঞানেও দেখিতে পাইলাম,—নিয়ত মতের পরিবর্ত্তন। কোথাও তো সত্য খুঁজিয়া পাইলাম না! সমস্ত জগৎ যেন নেশায় বিভোর হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। মনে হইল সব শূন্য, মায়া,—একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন মাত্র,—একটা প্রহেলিকা মাত্র,—একটা বিস্তীর্ণ উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে মরীচিকার ধাঁধা মাত্র। প্রাণে দারুণ নৈরাশ্য লইয়া বাড়ী ফিরিলাম, "Knoweledge is the fruit of that forbidden tree." তখন হঠাৎ মনে এক নূতন কল্পনা জাগিয়া উঠিল। মনে করিলাম, আর সত্যের সন্ধানে বৃথা শক্তিক্ষয় করিব না। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব পরের সেবায়

আত্মনিয়োগ করিব। স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়িতে পড়িতে সেখানেও এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ দেখিতে পাইলাম। তাহাতে প্রাণে শান্তি আসিল। তিনি বলিতেছেন, "যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুক্‌রা রুটি দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।" "আমি যেন লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করি আর লক্ষ বার যেন দরিদ্ররূপী, দুষ্টরূপী, দুঃখীরূপী নরনারায়ণের সেবা করিতে পারি ; ইহাই আমার সাধনার ভিত্তি, আমি ভক্তি মুক্তির অপেক্ষা রাখি না। আমি লক্ষ নরকে যাব, বসন্তের ন্যায় লোকের হিত আচরণ করিতে করিতে।"

মনে তৃপ্তি পাইলাম বটে, কিন্তু ভাবিলাম কিরূপে আমি এই আদর্শ নিজের জীবনে উপলব্ধি করিব, এই বিশাল বিশ্বে আমি ক্ষুদ্র পরমাণু, আমার দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হইতে পারে ? আর সেই উপকার কি স্থায়ী হইবে ? সংসারে মানবের দুঃখের কি সীমা আছে ? প্রকৃত মঙ্গল যে কিসে হইবে তাহাও তো বুঝিতে পারি না ; মঙ্গল ও অমঙ্গল যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি হাজার চেষ্টা করিয়াও কি অপরের দুঃখ দূর করিতে সক্ষম হইব ? মানবের দুঃখ দূর হউক বা না হউক আত্মতৃপ্তি তো হইবে, ঈশ্বর স্বীকার না করিয়াও বুদ্ধদেব বিশ্ব-মানবের হিতের জন্য যে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন জগতে তাহার তুলনা আছে কি ? "Service of man is the service of God" এই আদর্শ মনে রাখিয়া কার্য্য করিলে যাহা

কিছু শান্তি পাওয়া যায়, ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম স্থির করিলাম।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

বিবেকানন্দ।

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৬	সৌন্দর্য	সৌন্দর্য্য
১০	৪	অর্থে	অর্থে
১০	১৫	চন্দ্রলোকে	চন্দ্রলোকে সম্ভবতঃ
১১	৩	নিয়ব	নিয়ম
১১	৫	বিশৃঙ্খলা	বিশৃঙ্খলা
১৯	১৬	Tennysion	Tennyson
২১	১৩	প্রতিরোধ	প্রতিরোধ করিতে
২১	১৫	গীতায়	শাস্ত্রে
২১	১৫	হৃষিকেশ	হৃষীকেশ
২৩	২২	আশ্চর্যের	আশ্চর্য্যের
৩১	১০	Dr. Tagore's	D. N. Tagore's
৩১	৯	সূর্য	সূর্য্য
৩৩	৭	অরে	অরে !
৪৯	২২	অবস্থা বা	অবস্থা বা গুণের
৫০	১২	সুযোগে	সুযোগের
৫১	১২	হৃষিকেশ	হৃষীকেশ
৫৬	১১	answerd	answered
৫৭	৩	খণ্ডণ	খণ্ডন
৬২	৩	অনেক।	অনেক।"
৭৬	৮	নৈসগিক	নৈসর্গিক
৮৪	১২	মানুয	মানুষ

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৪	১৬	কিরিয়া দিয়া	দিয়া
৮৬	১	বিজ্ঞতার	বিজ্ঞাতার
৮৭	১২	স্বতঃপ্রমানিত	স্বতঃপ্রমাণিত
৮৭	২২	অনন্ত	অখণ্ড
৮৮	১	তুলণীয়	তুলনীয়
৮৮	৬	Co-ordinations	co-ordinations
৮৮	১৪	Variation	variation
৮৯	১৭	Lotz	Lotze

☞ ৮৭ পৃষ্ঠায় নবম ছত্রে "খুঁজিয়া পাই না।" ইহার পর পড়িতে হইবে—"এই যে বাহ্য জগৎ, ইহা দর্পণে প্রতিফলিত আমার প্রতিবিম্বের ন্যায় অলীক।

"সত্যের সন্ধান" সম্বন্ধে

কতিপয় অভিমত।

১। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় বলেন :—আপনার "সত্যের সন্ধান" পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। উহাতে অনেক বড় বড় সমস্যার আলোচনা আছে—দুই পক্ষেরই কথা বলা হইয়াছে। এবং এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মতামতও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বারা অনেকের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিতে পারে--চিন্তার উদ্রেক করিতে পারে। * * *

* * আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, "প্রতিভা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, এম্, এ; পি, আর, এস্; পি এইচ, ডি; মহোদয় বলেন :—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'সত্যের সন্ধান' পুস্তকখানা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। * * *

* * * * *

গ্রন্থকার সুন্দর ও সরল ভাষায় তাঁহার যুক্তিগুলি উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত আলোচনাগুলি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। গ্রন্থকারের সহিত সকলের মতের ঐক্য না হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে ভাবে সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। আশা করি পুস্তকখানি পাঠে অনেকেরই হৃদয়ে স্বাধীন চিন্তার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে।"

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় বলেন :—

"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত "সত্যের সন্ধান" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইলাম। * * * যোগেশ বাবুর সুন্দর ও সরল যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া যদি কেহ মামুলি অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন আবিলতাময় ধারণাগুলিকে স্বীয় স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত যুক্তিস্রোত দ্বারা বিধৌত করিয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া লইতে পারে, তবেই এই শ্রেণীর পুস্তক প্রণয়ন সার্থক হইবে। চিন্তাশক্তি মানুষের একটী পরম সম্পত্তি, কিন্তু সাধারণতঃ ইহার সম্যক ব্যবহারে আমরা কুণ্ঠিত। মামুলি প্রথা ও মতগুলি আমরা সহজেই মানিয়া লই। যোগেশ বাবুর এই নির্ভীক ও স্বাধীন আলোচনাপূর্ণ পুস্তক পাঠে কাহারও মন যদি এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া উঠে তাহা হইলেই লেখকের প্রয়াস সফল হইল মনে করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর পুস্তক আজকাল বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। * *

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ ; বি, এল মহোদয় বলেন :—

"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "সত্যের সন্ধান" নামক গ্রন্থখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

* * * * *

প্রধানতঃ তাঁহার আলোচ্য বিষয় ধর্ম্মনীতি এবং দর্শন। এই সকল গভীর তত্ত্বের আলোচনায় তিনি যথেষ্ট সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন ; তাঁহার প্রচুর অধ্যয়নের যে পরিচয় ইহার ভিতর পাওয়া যায় তাহাও প্রশংসার যোগ্য। গৃহীত অভিমতকেই সত্য বলিয়া

গ্রহণ না করিয়া তিনি সত্যসত্যই সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। এ অনুসন্ধানে অন্যে যতটুকু সাফল্য সাধারণতঃ লাভ করিয়া থাকে, তার চেয়ে বেশী তিনি পাইয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু এ সব অনুসন্ধানের মূল্য ত উপনীত সিদ্ধান্তে নয়, প্রচেষ্টার ভিতরেই তাহাকে খুঁজিতে হয়। যোগেশবাবু যে সত্যকে উপলব্ধি করিতে ভয় পান নাই, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সুখ্যাতি।

মোটের উপর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া খুসী হইয়াছি।"

৫। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসনের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহোদয় বলেন:—

"আপনার স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সাহস আছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। শিক্ষিত সমাজে আপনার পুস্তকখানি গৃহীত হইবে এইরূপ ভরসা করি।"

৬। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী এম্, এ মহোদয় বলেন:—

"আপনার গ্রন্থখানি বাংলার দর্শন সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আপনি চিন্তারাজ্যে এক নূতন ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism) সহিত নিয়তিবাদের (Fatalism, Necessitarianism) যে সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যে এই নূতন। আপনার "আস্তিক ও নাস্তিক" এর তর্কের ভিতরে উভয় পক্ষের যুক্তিই সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আপনার সহিত আমার সম্পূর্ণ ঐকমত্য না থাকিলেও, আপনি যেরূপ স্বাধীনভাবে জটিল সমস্যা সমূহের সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আপনার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

৭। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি এল, মহোদয় বলেন :—

"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সত্যের সন্ধান" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এ শ্রেণীর পুস্তক বর্ত্তমান যুগে একান্ত বিরল। গ্রন্থকার গভীর দার্শনিক তত্ত্বগুলি অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে পড়িবার ও ভাবিবার অনেক কথাই আছে।"

৮। মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত মহোদয় বলেন :—আপনার গভীর চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিয়া আমি আপনাকে আপনার অধ্যবসায় ও গবেষণার জন্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনার গ্রন্থ অধ্যয়নে বহুলোক উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

পুত্রের প্রতি উপদেশ
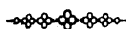
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়

প্রণীত

কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল

শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত

 [মূল্য ।৷০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য

৫ নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন,

(মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের নিকট)

বহুবাজার পোঃ আঃ

কলিকাতা।

কলিকাতা, ৬৩নং সার্পেণ্টাইন লেন,

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে,

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

সন ১৩১৮ সালের পূজাবকাশে আমি সপরিবারে পুরুলিয়া সহরে বাস করিতে ছিলাম। সঙ্গে আমার প্রাণাধিক প্রিয় এক্ষণে পরলোকগত পুত্র চণ্ডী দাস ছিলেন। তিনি তখন বি, এ, পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতে ছিলেন এবং সেজন্য অনেক সময় আমার নিকট থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে সর্ব্বদাই নিকটে রাখিয়া উপদেশ ও আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতাম। তখন তাহাতে সুবিধার অভাব বুঝিয়া উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়। তদনুসারে এই কয়েক পৃষ্ঠা রচনা করি। ইহা পাঠ করিয়া আমার উক্ত পুত্র অতীব আনন্দানুভব করেন, বিশেষতঃ ইহাতে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল তদনুসারে তিনি চিরদিনই চলিয়া আসিতেছিলেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ আনন্দের কারণ। তৎপরে আমার কয়েক জন শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাকার্য্যে অভিজ্ঞ বন্ধু ইহা পাঠ করিয়া সাধারণতঃ বিদ্যার্থিগণ যাহাতে ইহার উপকারিতা উপভোগ করিতে পারেন, তজ্জন্য আমাকে অনুরোধ করেন তাঁহাদের অনুরোধে ও আমার উক্ত পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া ইহা কলিকাতাস্থ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে পঠিত হয়। যে সভায় ইহা পঠিত হয় তাহাতে স্বর্গীয় পরমপূজ্যপাদ সার

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সভা ভঙ্গের পর আমার এই সামান্য প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তিনি আমাকে ইহা প্রতিশ্রুত করান। ইহার অব্যবহিত পরেই, অদ্য হইতে ঠিক্ আটবৎসর পূর্ব্বে, আমার উক্ত প্রাণাধিক অশেষ সদ্‌গুণাধার পুত্র আমাকে অসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া এবং সংসার অন্ধকার করিয়া পরলোক গত হন। ইহাতে এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করার কথা কিছুদিন ভুলিয়া যাই। কিন্তু আমি পরমপূজাপাদ উক্ত বন্দ্যো-পধ্যায় মহাশয়ের নিকট যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে, যদিও বিলম্বে, ইহা প্রকাশিত করি-তেছি। ইহা অবশ্য সাধারণতঃ সকল শ্রেণীর সকল ধর্ম্মীর ভাল লাগিবেনা। যাঁহাদের প্রকৃতি ওপ্রবৃত্তি আমার মত তাঁহাদের ইহা প্রীতিকর হইতে পারে। তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারস্থ শিক্ষার্থী বালকগণের উপদেশ পক্ষে এই সামান্য প্রবন্ধটীর উপকারিতা অনুধাবন করিলেই আমার আশা ও আকাঙ্খা চরিতার্থতা লাভ করিবে। ইতি

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

৫নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন।

কলিকাতা

সন ১৩২৭ সাল ২রা আষাঢ়।

নিবেদন।

পরমরাধ্য পিতৃদেব এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিবেন বলিয়া দেশপূজ্য স্বর্গীয় মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন। প্রকাশ করিবার সময় নানারূপ সাংসারিক ঘটনার জন্য তিনি উহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। গত ১৩৩০ সনের চৈত্রমাসের প্রথমে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীমৎ শঙ্কর পরমানন্দ নাম ধারণ পূর্ব্বক ৺কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসে তিনি আমার উপর এই কার্য্যভার দিয়া যান। তাঁহার আদেশ পালনার্থে আমি ইহা প্রকাশ করিতেছি ইহাতে তিনি ও তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের বন্ধুবর্গ সন্তুষ্ট হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। ইতি

৫নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন।
চাঁপাতলা কলিকাতা
শ্রাবণ—১৩৩২

শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র।

পুত্রের প্রতি উপদেশ।

প্রাতরুত্থান।—অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবে। সূর্য্যোদয়ের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা চাই। যে সময়ে পূর্ব্ব দিক একটু একটু আলোকিত হইতে আরম্ভ হইতেছে অথচ আকাশে নক্ষত্র দৃশ্যমান থাকে, সেই সময়ই শয্যাত্যাগের প্রকৃষ্ট সময়। শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার উপর নিদ্রা-ভঙ্গের পর একটু বসিয়া দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে ও দেবমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। যে পরিবারে যে দেবতার নাম বেশী, সে পরিবারের লোকের সেই নাম উচ্চারণ করা ও মূর্ত্তি-চিন্তা কর্ত্তব্য। তোমার কি কর্ত্তব্য তাহা তুমি স্বয়ং বিবেচনা করিয়া লইবে। তৎপরে গুরু লোককে স্মরণ করিবে। যাঁহাকে যাঁহাকে তোমার আন্তরিক ভক্তি হয়, যাঁহাদের নিকট তুমি কিছুমাত্রও সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছ, যাঁহারা তোমাকে ভালবাসেন—যত্ন করেন, যাঁহাদের নিকট তুমি কোনও রূপ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছ, এ প্রকার সকলকেই স্মরণ করিবে ও তাঁহাদের উদ্দেশে প্রণাম করিবে। যদি এইরূপ লোকের সংখ্যা বড় বেশী হয় তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চরিত্রবান,

সদ্‌গুণবত্তারও বিদ্যাবুদ্ধির আধার বলিয়া তোমার নিকট সমধিক আদৃত এরূপ কয়েকটি আদর্শ বাছিয়া স্থির করিবে; এবং তাঁহাদিগকে স্মরণ ও প্রণাম করিবে। তৎপরে শয্যাত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল ছাদের উপর বা গৃহ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া সেই সুনীল, অসীম তারকান্বিত গগনের দিকে একবার নিবিষ্ট চিত্তে দৃষ্টিপাত করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবে আকাশ কি অসীম! ইহার কূল কিনারা নাই। আমরা কতটুকুই বা দেখিতে পাই। আকাশ ব্যতীত অপর কোন অসীম বস্তু আর দেখ নাই; পৃথিবীর সীমা আছে, সমুদ্রের সীমা আছে; নিকটে হউক, দূরে হউক সীমা আছে তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু ঐ সুনীল আকাশের কোনদিকের সীমা নাই। এই অসীম আকাশের মধ্যে এই নক্ষত্র গুলি রহিয়াছে। তুমি বহুকাল হইতে পুস্তকে পড়িয়াছ, এই সকল নক্ষত্র এক একটি সূর্য্যের মত। বহুদূরে যে সকল নক্ষত্র আছে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন এমন নক্ষত্র অনেক আছে যাহারা এ পর্য্যন্ত মানবের নয়ন গোচর হয় নাই, অর্থাৎ আলোক এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল অগ্রসর হইয়াও দূরত্বের জন্য ঐ সকল নক্ষত্রের আলোক আজও পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই। এই সকল নক্ষত্র ও আরও অগণ্য নক্ষত্ররাজী অসীম আকাশের মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে। আকাশেরও শেষ নাই, নক্ষত্রেরও শেষ নাই। আবার এই সকল নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের মত গ্রহগণে বেষ্টিত। সে সকল গ্রহ উপগ্রহ দূরবীক্ষণ সহকারেও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদের

অস্তিত্ব কেবল আনুমানিক, বিচারসাপেক্ষ মাত্র। এই সকল গ্রহ উপগ্রহ পরিবেষ্টিত অসংখ্য নক্ষত্ররাশির মধ্যে সূর্য্য একটি, তাহার চারিদিকে আরও কত গ্রহ উপগ্রহ নিত্য পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সকল সূর্য্যাশ্রিত গ্রহের মধ্যে আমাদের পৃথিবী ও একটি গ্রহ মাত্র। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বহু গুণ বড় ও বহু দূরে অবস্থিত। আমরা এই পৃথিবীর উপর বাস করিতেছি। এই গ্রহনক্ষত্র বিভূষিত সমস্ত আকাশের সহিত তুলনায় আমরা কি অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তু, এই বিষয়টা বেশ নিবিষ্টচিত্তে একটু বিবেচনা করিবে। আমি এমনই অনন্ত, অসীম আকাশের কথা বলিতেছিলাম। আর কোন অনন্ত, অসীম জিনিষ জান কি? যে জিনিষ যত বেশী সে জিনিষ সেই পরিমাণে সকলেরই অনায়াস লভ্য ও অক্লেশ প্রাপ্য। অপর যে সমস্ত পদার্থের কথা বলিতেছিলাম তাহা আর কিছু নয় অনন্ত কালের কথা। কাল, পদার্থ কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিচার করুন। কিন্তু তুমি দুইটি অনন্ত বস্তু ভাবিবার জন্য পাইলে। ঐ উপরের, উপরেরই বা বলি কেন ঐ চারিদিকের উপরের—নীচের—পার্শ্বের অনন্ত আকাশ, আর এই অসীম সময়। সময় কবে সৃষ্ট হইল, তাহার কোথাও উল্লেখ নাই, অনন্ত কালের সৃষ্টি তত্ত্বের বিষয় কোন শাস্ত্রে আছে কি না জানি না। তবে এই সৃষ্টি কথাটাই অসঙ্গত। এই অনন্ত বা মহা কাল eternal time নিশ্চেষ্ট ভাবে চির দিন পড়িয়া আছে এবং তদুপরি অনন্ত

মহাকাশে কি এক মহাশক্তির প্রভাবে কত গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক এই অনন্তকাল ও অসীম আকাশের বিষয় একবার নিবি চিত্তে চিন্তা করিবে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দিবালোক আসিয়া পড়িবে কাকাদি পক্ষী ডাকিতে থাকিবে এমন সময়, তুমিও জীবদেহের দাস্তব ক্রিয়া সমাপন করণান্তর শুচি হইবে এবং পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। পরিষ্কৃত বস্ত্র বলিতে আমি মূল্যবান চাক-চিক্যশালী বস্ত্রের কথা বলিতেছি না। যাহাকে আমাদের আচারানুসারে পরিচ্ছন্ন বলে সেইরূপ ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। তৎপরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা আবশ্যক।

প্রাতঃকৃত্য।—প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা প্রাতেই সমাপন করিবে। উহা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কাল নহে, কিন্তু কি করিবে, উপযুক্ত সময়ে করিবার অবকাশ পাইবেনা। তোমাকে দশটার মধ্যে আহারাদি সমাপন করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে। অগত্যা একেবারে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা বর্জ্জন না করিয়া বরং সময়ের পূর্ব্বে করা ভাল। একেবারে কোন সন্ধ্যা বাদ দেওয়া ভাল নহে। সন্ধ্যার ও তৎপরে পূজার জন্য যে সকল উপকরণ আবশ্যক তাহা স্বয়ং সংগ্রহ করিবে। গঙ্গা বা নিকটস্থ নদী, অভাবে পুষ্করিণী বা কূপ হইতে নিজে জল আনিবে। ফুল, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র প্রভৃতি যাহা যাহা দরকার স্বয়ং আহরণ করিবে। এই সকল একস্থানে পাইবে না, নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। একটী কথা স্মরণ

রাখিবে, পর্য্যুষিত পুষ্প, বিল্বপত্র বা তুলসীপত্র এবং পূর্ব্ব দিনের আহৃত জল ব্যবহার করা অনুচিত। নিতান্ত ঠেকিয়া করিতে হয় তাহা আপদ্ধর্ম্মরূপে মনে করিবে। কিন্তু তাহা না করাই শ্রেয়ঃ। ইহা রীতিমত করিলে ইহকাল পরকালের মঙ্গল হইবে। এই পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতে যে পথ ভ্রমণ হয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তাহাতে শরীর সুস্থ থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রাতে ভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল না; এটা বিদেশী লোকের সংস্পর্শে আমরা শিখিয়াছি। ধর্ম্মভাব কমিয়াছে, সন্ধ্যাপূজা বর্জ্জন হইতেছে বলিয়াই দরকার হইয়াছে। অনেকে এইরূপ ভ্রমণকে "বৃথাটন" বলেন। ইহা পাপজনক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ স্বাস্থ্যের জন্য প্রাতর্ভ্রমণ জানিতেন না। তাঁহারা প্রাতে ভ্রমণ করিতেন না এমত মনে করিও না, খুবই বেড়াইতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্যোন্নতি নহে সন্ধ্যা পূজার উপকরণ আহরণ করা। বল দেখি শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ঘুরিয়া বেড়ান এবং ভগবদর্চ্চনার জন্য পুষ্পাদি সংগ্রহ জন্য ভ্রমণ, দুইটি এক জিনিষ হইলেও কোন উদ্দেশ্যটি অধিকতর প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে, আমাদের শাস্ত্রে কেবল শরীররক্ষার জন্য কোন প্রয়াস করিবার কোন ব্যবস্থা বা উপদেশ নাই। শরীর, ধর্ম্ম সাধনের আদ্য কারণ হইলেও নিজের শরীর লইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। শরীরি অর্থাৎ শরীরস্থ আত্মার ভাবনাই তাঁহারা ভাবিতেন। আত্মার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেন তাহাতে

শরীর আপনা হইতেই ভাল থাকিত। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। মনে কর তুমি কোন লোকের সুখসাচ্ছন্দের জন্য বড়ই যত্ন কর, আন্তরিক চেষ্টা কর। তিনি কিসে ভাল খাইবেন, ভাল বস্ত্র পরিধান করিবেন, ভাল স্থানে শয়ন করিবেন তদ্বিষয় অনুক্ষণ চেষ্টা কর, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবাস-গৃহের কথা কি তুমি ভাবিবে না? তিনি যে গৃহে বাস করেন তাহা যদি বাসোপযোগী না থাকে তাহা হইলে তাঁহার কষ্ট হইবে সুতরাং তাঁহার স্থানটি সর্ব্বাগ্রে ভাল অবস্থায় রাখিবার জন্যই স্বতঃই তোমার চেষ্টা হইবে। বর্ষার পূর্ব্বেই তোমার ভাবনা, ছাদে কোথাও জল পড়ে কিনা, হিম পড়িবার পুর্ব্বেই তোমার চেষ্টা, দরজা জানালা ঠিক আছে কিনা দেখা। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শরীরস্থ আত্মার মঙ্গলকারী, মানব শরীরের কুশল সাধনে অবশ্যই যত্ন করিবে। সুতরাং তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার নাই। আত্মার কিসে প্রকৃত হিতসাধন হইবে তৎপ্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে।

এই পূজোপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে আমার দুইটি মহাপুরুষের কথা স্মরণ হইতেছে, তাহা তোমার শিক্ষার জন্য সংক্ষেপভাবে বলা আবশ্যক। একজন তোমার অপবর্গ প্রাপ্ত পিতামহদেব। তুমি যখন এক বৎসরের শিশু সেই সময় তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং সে দেবদেহের বিষয় তোমার স্মরণ থাকিবার কথা নয়। তাঁহার কোন কথা এখানে বলিবার স্থান নহে, উহা

অপ্রাসঙ্গিক হইবে, সময় পাইলে স্থানান্তরে বলিব। বলিবার অনেক কথা আছে, কারণ তিনি সাক্ষাৎ মঙ্গলময় দেবতা ছিলেন।

এই লীলাক্ষেত্রে দেহধারণ করিয়া কত কি যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ধারণা করিবার আমাদের ক্ষমতা কোথায়? সে যাহা হউক যে সম্বন্ধে তাঁহার কথা এখানে উল্লেখ করিলাম এক্ষণে তাহাই বলি। তিনি অনেক রাত্রি থাকিতে উঠিতেন, অতি প্রত্যূষে ফুলের সাজি হস্তে কত ধনী লোকের সুরক্ষিত, নির্ধনের অরক্ষিত পুষ্পোদ্যানে গিয়া ফুলপত্রাদি চয়ন করিতেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে প্রথম কিছুদিন তাঁহার একটু অসুবিধা বোধ হইয়াছিল, কিন্তু ভক্তের মনের কষ্ট ভগবানই বুঝেন, শীঘ্রই তাঁহার সে অসুবিধার অপনোদন হইয়াছিল। এক দিন তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট তিনি উক্ত অসুবিধার কথা বলায় তাঁহার সেই বন্ধু কাশিমবাজারের স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর তদানীন্তন কলিকাতার কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট বলিয়া মহারাণী মহাশয়ার কলিকাতাস্থ উদ্যানে অবাধে পুষ্পাদি সংগ্রহের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় গিয়া প্রতিদিন পিতৃদেব নানাবিধ পুষ্প ও বিল্বপত্রাদি প্রচুর আহরণ করিতেন। আবার কখন কখন পিতৃদেবের পরম বন্ধু সর্ব্বদেশ-পূজিত মহামান্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীস্থ বাগান হইতে পুষ্প চয়ন করিতেন। ক্রমশঃ অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ায় তাঁহার পুষ্পচয়ন-ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে তিনি প্রত্যূষে কত ভ্রমণ করিয়া কত ফুল, বিল্বপত্রাদি

আনিতেন। কঠোর শীতের দিনে যখন অনেক লোক জুত মোজায় পদদ্বয় আবৃত করিয়াও শীতে ক্লিষ্ট বোধ করেন, সেই সময় তিনি শূন্যপদে শিশিরসিক্ত ও ধুলিবালুকা সংলগ্ন চরণে যখন প্রচুর ফুলভার লইয়া প্রহৃষ্ট মনে বাটী ফিরিতেন, তখন কি মনে হইত? রাজমুকুটধারী নরপতি হইতে দীনদুঃখী পর্য্যন্ত সেই চরণরেণুর ভিখারী হইত। সে যাহা হউক ইহাতে তাঁহার শরীর ভাল থাকিত, মনও খুব প্রফুল্ল থাকিত অপর যে মহাত্মার কথা বলিতেছিলাম, তিনি আমার স্বর্গগত পিসা মহাশয় ৺কালীকুমার বাচস্পতি। ইনি চিরদিন কাশী-ধামে বাস করিতেন। ৺বিশ্বেশ্বরের সংসর্গে থাকিয়া, কর্ম্মফলে চরিত্রবলে ইনিও জীয়ন্তেই শিবত্বলাভ করিয়াছিলেন। ইঁনি প্রায় ৯৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বোধ হয় এক বৎসর কাল মাত্র শয্যাগত হন। শয্যাগত হইবার পূর্ব্বে চিরদিনই তিনি পূজার জন্য মাঠ হইতে কুশ, উদ্যান হইতে পুষ্প, বিল্বপত্রাদি এবং গঙ্গা হইতে স্বহস্তে জল আনিতেন। যখন ৯০।৯৫ বৎসরের বৃদ্ধ হাতে ঝুলাইয়া ঘড়া করিয়া গঙ্গা হইতে জল আনিতেন তখন তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন। শুধু তাহাই নহে, পূজোপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে ইঁহার এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, তাঁহার ইষ্টদেবের ভোগ্য আহার্য্য বস্তু প্রস্তুতও তিনি স্বয়ং করিতেন। এইরূপে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া স্বধর্ম্ম পালনের ফল হইয়াছিল তাঁহার দীর্ঘজীবন এবং নীরোগ শরীর। তিনি প্রাতে ও

সন্ধ্যার সময় ভ্রমণ করিতেন বটে কিন্তু সেটা শরীরের জন্য নহে, তাহা পূজোপকরণ সংগ্রহ জন্য। ধন্য তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ধন্য তাঁহাদের কর্ম্ম ও চেষ্টা। সেইরূপ সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে দীর্ঘজীবী হইবে এবং শরীর নীরোগ হইবে। কথা প্রসঙ্গে অপর এক কথা ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও সংশ্লিষ্ট বিবেচনায় বলিতেছি। কেবল স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টায়, শরীর ভাল রাখিবার জন্য যেরূপ প্রাতে ভ্রমণ করিবার কথা বলিলাম তদনুরূপ আর একটী ব্যবহার আজকাল খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, উহা বায়ু সেবন জন্য স্থান পরিবর্ত্তন। আমরা সকলেই কর্ম্মের দাস। জপাদি সৎকর্ম্মের কথা বলিতেছি না। আমরা কেহবা উদরান্নের জন্য কেহবা বিলাসিতার দায়ে পড়িয়া প্রচুর অর্থসংগ্রহের জন্য প্রতিনিয়ত কর্ম্মস্থলে, সহরে বা পল্লীগ্রামে বাস করি। কেহ কিন্তু একস্থানে চিরদিন থাকিতে সুখবোধ করেন না। না করিবার কথা বটে। একস্থানে, সেই একরূপ পথঘাট, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, নরনারী, খাদ্য, পেয়, আচার ব্যবহার কতদিন ভাল লাগিবে? তাহাতে মন ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং শরীরও অসুস্থ হয়। এটা আজ বলিয়া নয়, চিরদিনই হইতেছে। পূর্ব্বেও লোক একস্থানে চিরদিন থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেন, এখনও করেন। নিতান্ত যোগী না হইলে এক স্থানে চিরদিন ভাল লাগিবে কেন? এই জন্যই বোধ হয় "স্থাণু" কথাটার ব্যর্থ হইয়াছে। যিনি যোগীশ্রেষ্ঠ, তিনিই কেবল একস্থানে চিরদিন থাকিতে পারেন।

কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা কষ্টকর, সেই জন্য পূর্ব্বকাল হইতে তাহার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এক্ষণে সেই ব্যবহার রকমফের হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে আমার বক্তব্য বিষয়। পূর্ব্বে তীর্থদর্শন বলিয়া একটা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল। তীর্থস্থান গুলি সকলই খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। কিন্তু স্বাস্থ্যের চেষ্টায় কেহ তীর্থ যাইতেন না, তাঁহারা যাইতেন ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য। সেকালে যখন রেল ষ্টিমার ছিল না, যাঁহারা যানবাহন সংগ্রহ করিতে পারিতেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম ছিল, অধিকাংশ লোকেই পদব্রজে বহুদূরে স্থিত ভারতের নানা স্থানে তীর্থে যাইতেন। কোথায় চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ, আর কোথায় সমুদ্রকূলস্থ দ্বারকাপুরী, কোথায় সেই হিমাচল-শিখরস্থ বদরিকাশ্রম আর কোথায় সেই ভারত মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বেষ্টিত রামেশ্বর ? এই সকল সুদূরস্থ স্থান সমূহে অবলীলাক্রমে সকলে যাইতেন, যাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, পুণ্য সঞ্চয় করিতেন, দৈহিক সুখসাচ্ছন্দ অবহেলা করিয়া আত্মার যাহাতে তৃপ্তি হয় তাহাই করিতেন; ইহকাল ভুলিয়া পরকালের ভাবনা ভাবিতেন। তীর্থবাসের আবার অনেকগুলি নিয়ম ছিল। সংযতভাবে, ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতে হইত; শ্রাদ্ধতর্পণ, পূজা-অর্চ্চনা, জপহোমাদিতে তথায় কালাতিপাত করিতে হইত। এই সকল তীর্থস্থানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করিতেন, এখনও যে কোথাও করেন না তাহা নহে। তীর্থে যাইলে এই সকল মহাপুরুষগণকে দর্শন করা, তাঁহাদের উপদেশ

গ্রহণ করা, কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। তীর্থে যাইয়া অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস করিতেন, তাহাতে পথশ্রম দূর হইত, শরীর সুস্থ হইত, দুশ্চিন্তা স্থানে ধর্ম্মচিন্তা আসিয়া মনকে প্রফুল্ল করিত, আত্মা তৃপ্তিলাভ করিত। এই সকল ছাড়া ইহা একটি বড় সামাজিকতা শিক্ষারও উপায় ছিল। যে কোন তীর্থে যাইলে দেখিবে, ভারতের কত শত নরনারী আসিয়া সমবেত। বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্ত সীমাস্থ লোক, উত্তর পশ্চিমের অধিবাসী, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়ী, ঔড্রদেশবাসী, সকল স্থানের নানা প্রকার লোক এক উদ্দেশ্যে এক স্থানে সমবেত। সকলেই সকলকে ভক্তি বিনম্রনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বল দেখি এমন সার্ব্বজনিক মহাসভা (congress) অন্য স্থানে হইতে পারে কি? যদি বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুমণ্ডলীর একত্র সমাবেশ দেখিতে চাও, তীর্থে যাইবে। সকলের সহিত মিশিলে সকলের মনের ভাব, সামাজিক আচার ব্যবহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়াদি পাইলে তোমারও অভিজ্ঞতা বাড়িয়া যাইবে, হৃদয় প্রসারিত হইবে, প্রাদেশিক ভাব দূর হইবে। তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীকে দেখিয়া ভয় করিবে না, ঔড্রদেশবাসীকে উড়িয়া বলিয়া ঘৃণা করিবে না, পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীকে বাঙ্গাল বলিয়া ব্যঙ্গ করিবে না, এবং উত্তর-পশ্চিমের লোককে খোট্টা বলিয়া অভিহিত করিয়া নিজের মনের ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিতে হইবে না। মনে হইবে আমরা সকলেই এক। এত প্রকার উপকার সাধক তীর্থ যাত্রার স্থানে আজকাল ঘটিয়াছে কি? একেবারে

ধর্ম্মকর্ম্মবিহীন সমাজ হইতে দূরস্থিত প্রান্তর বা জঙ্গলমধ্যে অবস্থান। •যেখানে গিয়া কেবল শারীরিক স্বাচ্ছন্দ চেষ্টা, তাহা বৈধ উপায়েও বটে, অবৈধ উপায়েও বটে। সমাজের ভয়ে যে সকল আচার বাটিতে সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না, এই সকল নিভৃত স্থানে গিয়া কেহ কেহ তাহাই করিয়া থাকেন। কোন সামাজিক শিক্ষা হয় না, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ হয় না। এ সকল ভাল আচার নহে; ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পুষ্পাদি চয়ন করিয়া আসিয়া, পদ ধৌত করিয়া পূজা গৃহে প্রবেশ করিবে এবং পূজার অপর যে কিছু আয়োজন করিতে হয় নিজেই করিয়া লইবে। অর্থাৎ চন্দনপেশন, নৈবেদ্য প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কার্য্যও নিজেই করিয়া লইবে। তৎপরে পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে। তদনন্তর পূজা। তোমার এখনও দীক্ষা হয় নাই, দীক্ষা হইলে পর গুরুপদেশ মত পূজা করিবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাই করিবে, শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা করিবে, পূজার আড়ম্বর করিবে না, সামান্যভাবে ভক্তির সহিত শিব ও বিষ্ণুর পূজা করিবে। সাধারণ কথা মনে রাখিবে, ভক্তের ভগবান। ভক্তির ন্যায় পূজার উপকরণ আর কিছুই নাই। আর শিবের প্রণাম মন্ত্রের একটী সার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তাহাই প্রকৃত কথা; "নিবেদয়ামি-চাত্মানং," বলিয়া যখন প্রণাম করিবে, তখন প্রকৃত পক্ষেই

সেই দেবাদিদেব মঙ্গলময় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পূজায় আড়ম্বর করিবে না, যত সংক্ষেপে হয় হয় সারিবে। স্তব স্তোত্রাদির বাহুল্যে অনেক সময়ক্ষেপ করা তোমার এক্ষণে উচিত নয়। এ সম্বন্ধে একটী কথা তোমার মনে আছে কিনা জানি না। একবার পূজার অবকাশে তুমি ও আমি ৺ কাশীধামে ৺দুর্গাবাড়ীর দক্ষিণে শঙ্কটমোচনের নিকট আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন দত্তের বাগানবাটীতে বাস করিয়াছিলাম। সে সময় উক্ত বাগানের নিকটস্থ আর একটী বাগানে একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। ব্রহ্মচারী বাঙ্গালীর ছেলে. কিন্তু বহুদিন সংসার ত্যাগ করিয়া তখন হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট আসিতেন। তাঁহার সহিত অনেক সময়ে অনেক ভাল কথা হইত। তাহার মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টী মাত্র বলিতেছি। একদিন তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি. "আপনি দৈবকার্য্য প্রত্যহ কি করেন?" তাহাতে তিনি যে উত্তর দেন, তাহা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, "আমি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা. শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা ব্যতীত অপর কিছুই করি না।" এমন কি সময়াভাবে তাঁহার প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শনও ঘটিয়া উঠিত না। তিনি তখন দর্শনশাস্ত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ভগবান বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সদগুরু লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার নিকট ষড়দর্শন অধ্যয়ন করিতেছেন। অপরের দয়ায় উপজীবিকা

চলিতেছে, তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি বলিলেন "এক্ষণে দর্শনশাস্ত্র আয়ত্বাধীন করাই তাঁহার লক্ষ্য, বিদ্যাভ্যাসই তাঁহার তপস্যা।" আমি বলি "তোমারও এখন তাহাই। বিদ্যাভ্যাসই তোমার তপস্যা, নিতান্ত ব্রাহ্মণ্য রক্ষার জন্য যাহা দরকার, তাহা ব্যতীত আর কিছুতেই মনোনিবেশ করিবে না, করিলে উপকার না হইয়া অপকার হইবারই সম্ভাবনা।" বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য চৈতন্যদেবও শিক্ষা শেষ না করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন নাই।

পাঠাভ্যাস—এই রূপে প্রাতঃকৃত্য সমাপনন্তর পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দিবে; কিন্তু নিজের পড়াশুনা করিবার পূর্ব্বে তোমার কনিষ্ঠ সহোদরের লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি করিবে। যদিও আমি তাহার লেখাপড়া দেখিতেছি এবং যাহাতে তাহার পড়াশুনা ভাল করিয়া হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী আছি, কিন্তু এ কথা তোমার সর্ব্বদা মনে রাখা চাই যে, তাহার লেখাপড়া যাহাতে ভালরূপে হয় তাহার তত্ত্বাবধান করা এবং তাহার প্রয়োজনানুসারে তাহাকে সাহায্য করা তোমারও কর্ত্তব্য। ইহাতে তাহার পড়াশুনা ভাল হইবে এবং ইহার আর একটী—অবান্তর সুফল আছে। ইহাতে সৌভ্রাত্র যেন আরও ঘনিষ্ঠ হয়। এ সম্বন্ধে একটী বিষয় তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। যদি তোমার কনিষ্ঠ তোমার শিক্ষার অর্থগ্রহণ শীঘ্র করিতে না পারে, তাহা হইলে,

তুমি তাহার উপর রাগ করিবে না, বা কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিবে না। তাহাকে শাসন করিতে নিষেধ করি না, তবে শাসন যেন এমত না হয় যে, ভবিষ্যতে সে তোমার নিকট পড়িতে বা শিক্ষার জন্য যাইতে সঙ্কোচ বোধ করে। বিদ্যাভ্যাস পক্ষে ইহা অপেক্ষা ক্ষতিকর আর কিছুই নাই। তাহাকে নিঃসঙ্কোচে ও অবাধে তোমার নিকট পড়া বলিয়া লইতে দিবার সুযোগ দেওয়া চাই। তবে তোমারও পড়াশুনা আছে, সুতরাং একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, ঠিক সেই সময়ে তোমার নিকট শিক্ষা লাভ করিবে। যদি তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রকার ত্রুটি বা অভাব বোধ কর তাহা আমাকে জানাইবে। তৎপরে তুমি যতক্ষণ সময় পাও, নিজের লেখাপড়া করিবে। কতক্ষণ কোন বিষয় পড়িবে বা কি ভাবে পড়িবে, তাহা এখন আর তোমাকে বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাধীনে লেখাপড়া করিতে হইবে। যে কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ, সকল বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনায় সময়ক্ষেপ করিবে। তবে একটী কথা মনে রাখিবে, যাহা আজ করিতে পার, কাল করিবে বলিয়া রাখিয়া দিবে না। যখন যাহা পড়িবে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিবে। যখন দেখিবে কোন বিষয় অধ্যয়ন করিতেছ, অথচ তাহাতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ হইতেছে না, তখন তাহা অধ্যয়ন হইতে ক্ষান্ত হইবে।

আহার—পড়াশুনা শেষ করিয়া আহার করিবে।

কোনরূপ দুশ্চিন্তা না করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত আহার করিতে যাইবে। * আহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তাড়াতাড়ি আহার করিবে না, আস্তে আস্তে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। আস্তে আস্তে খাইলে ক্ষুধার পরিমাণের সহিত সামঞ্জস্য হইতেছে কি না তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে এবং তাহা হইলে যখনই খাদ্য ভাল লাগিবে না মনে করিবে অমনই আহার বন্ধ করিবে। তদভাবে উদরাময় হইবার সম্ভাবনা। কি খাইবে, কি না খাইবে সে ভাবনা তোমার জননীর, তোমার সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। তিনি যাহা দিবেন তাহাই আহার করিবে। আহার সম্বন্ধে একটী মোটা কথা আছে, "কেহ কেহ আহারের জন্য জীবন ধারণ করেন, অপর কেহ জীবন ধারণ জন্য আহার করেন।" বলা বাহুল্য প্রথমোক্ত লোককে সকলে ঘৃণা করেন। এই সকল উদর-পরায়ণ চিরদিনই সকলের নিকট ঘৃণিত। সমাজে ঘৃণিত, পরিবার মধ্যে কেহ কিছু বলুন বা না বলুন, ঘৃণিত। আহার জন্তু-ধর্ম্ম। ইহা পশুদের সহিত আমাদের সাধারণ কর্ম্ম। তাহারা সমস্ত দিন আহারান্বেষণ করে। মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে? পশুরা যাহা করে, মানুষ তাহা যতদূর না করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিবে। তাহার সাফল্যের নামই মনুষ্যত্ব, আর তাহা হইতে যতদূরে থাকিবে, তাহা করিতে

---

* আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শিক্ষা কার্য্যে সুদক্ষ ৺বিশ্বেশ্বর মিত্র মহাশয় এই কথাটী লিখিতে বলিয়া দিয়াছিলেন।

যতটা অকৃতকার্য্য হইবে ততটাই পশুত্ব। জীবন ধারণ করা আবশ্যক এবং তজ্জন্য যতটুকু আহার না হইলে চলিবে না ততটুকু মাত্র আহার করা চাই; আহার্য্য বস্তু অস্বাস্থ্যকর না হইলেই হইল। সুমিষ্ট আহার্য্য জিনিস খাইয়া সুখবোধ করিবার চেষ্টা করা মনুষ্যত্বের লক্ষণ নহে। ভাল জিনিষ অবশ্য সকলেরই ভাল লাগিবে, তোমারও ভাল লাগিবে, তাহা খাইতে নিষেধ করি না। তবে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে না, আকাঙ্খা করিবে না। তাহার জন্য স্পৃহা থাকিবে না, লালসা থাকিবে না। অযাচিত ভাবে সম্মুখে উপস্থিত হইলে অবশ্য ত্যাগ করিবে না। এই জিনিসটী খাইতে ভালবাস, এই জিনিসটী না হইলে আহার হয় না, অথবা এই জিনিসটী খাইতে পার না, বা চাহ না, এরূপ কথা লজ্জার বিষয়। যাহা কেহ খাইতে পারে তাহাই তোমার আহার্য্য; তবে পানাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য, দেশাচার, লোকাচার, পারিবারিক আচার মানিয়া চলিবে। খাইতে বসিয়া বিচার করিবে না। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ অথবা আপৎ কালে বা নাচারে পড়িয়া খাইবার বিধি আছে, তাহা বর্জ্জন করিবে। এমন অনেক জিনিস আছে যাহা শাস্ত্রে নিষেধ নাই, অথচ দেশাচার বা লোকাচার অনুসারে আহারে নিষিদ্ধ, এরূপ বস্তু কদাচ খাইবে না। আবার অনেক পরিবারে অনেক বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে। বাটীর গৃহিণীরা এ বিষয়ের শাস্ত্রকর্ত্রী। তাঁহাদের কথা মান্য করিয়া চলিবে, তাঁহাদের নিষেধ বাক্য অবশ্য প্রতিপাল্য। মোট

কথা পানাহার সম্বন্ধে যে কেহ যাহা কিছু নিষেধ করেন, তাহা ত্যাগ করিবে। তাহা ব্যতীত যে যাহা দেন, তাহাই গ্রাহ্য।

একত্র খাইতে বসিয়া একত্র ভোজন শেষ করিবে। ভোজনে হয়ত একজনের কিছু বেশী বিলম্ব হয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া উঠা উচিত নয়। যদি তোমার বিশেষ তাড়াতাড়ি থাকে, পৃথক স্থানে আহার করিতে বসিবে। কিন্তু ভাই ভগিনীরা সকলে একত্র ভোজনে বসা বড় ভাল; যতটা পার তাহা করিবার চেষ্টা করিবে। খাইতে বসিয়া কোন জিনিস ভাল লাগিল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করা পেটুকের লক্ষণ, অথবা কোন জিনিস খারাপ হইয়াছে বলিয়া বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করাও পেটুকের অপর লক্ষণ। কোন ব্যঞ্জন ভাল পাক হইয়াছে কি কোন আহার্য্য তোমার খুব ভাল লাগিয়াছে বলিয়া আর তাহা চাহিবে না, বা এমত ভাব প্রকাশ করিবে না যে, সেই বস্তু আর একটু পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও। আহারে সংযম শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সংসারে অনেক বিষয়ে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। তন্মধ্যে আহারে সংযম শিক্ষা প্রধান। আহারের পরিমাণও ঠিক রাখিবে। কোন দিন কম, কোন দিন বেশী খাইবে না। একত্র খাইতে বসিয়া কাহারও সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কখনও বেশী খাইবে না, অথবা অপরিচিত লোকের সাক্ষাতে কখনও লজ্জা করিয়া কম খাইবে না। আহারের পরিমাণ খুব বেশী হইলেই যে লোক দীর্ঘজীবী হয়, তাহা কখন মনে করিবে না। পরিমাণ অভ্যাস সাপেক্ষ,

ইহার বিশেষ কোন নিয়ম বা বিধি নাই। একজনের যাহা প্রচুর, অপরের হয়ত তাহা কিছুই নয়। সুতরাং তাহার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম কিছুই করা যাইতে পারে না। আহার করা একটা ভোগ বা আমোদের বিষয়, কখন মনে করিবে না। ইহা জীবন রক্ষার জন্য একটা কর্ত্তব্য পালন মাত্র। এই ধারণায় কার্য্য করিবে। তাহা হইলে বুঝিবে যে ইহাতে মনের সুখ বা ইহার অভাবে মনের দুঃখ কিছুই নাই।

প্রসঙ্গক্রমে আহার সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া রাখি। তোমাকে সমাজ মধ্যে বাস করিতে হইতেছে। অনেক সময়ে অপরের গৃহে আহার করিতে বাধ্য হইবে; কিন্তু সেখানে একটু নিয়ম শিথিল করিতে হইবে, নিতান্ত যাহা ধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ, তাহা ছাড়া অপর কোন জিনিস ত্যাগ করিবে না।

ভাল না লাগে খাইবে না, কিন্তু তাহাতে তোমার আপত্তি আছে, এ কথা ভ্রমক্রমেও জানিতে দিবে না। গৃহস্বামী যাহা কিছু আয়োজন করিয়া দিবেন, তাহাই হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিবে। দুষ্পাচ্যাহার অল্প মাত্রায় আহার করিবে। সমাজে বাস করিতে অনেক অনভ্যস্ত ব্যবহার সহ্য করিতে হইবে। ইহা তাহার মধ্যে একটা। কোন জিনিস খাও না, বা খাইতে পার বলিয়া, কখনও বাহাদুরি করিও না। এটা নিতান্ত বালকত্ব। একটা গল্প বলি। একজন অত্যন্ত গরম আহার করিতে পারেন বলিয়া এক স্থানে বাহাদুরি করিতেছিলেন, সেই স্থানে কোন কার্য্যোপলক্ষে লোকজন খাওয়ান হইবে, কচুরি

ভাজা হইতেছিল। একজন উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আ
তুমি যে বড় বাহাদুরি করিতেছ, ঐ যে কচুরি ভাজা হইতে
খোলা হইতে তোলা মাত্র খাইতে পার? তাহাতে সে ব্যা
পাগলের মত রাজি হইল, এবং অগ্রসর হইয়া খোলা হই
তৎক্ষণাৎ উত্তোলিত একখণ্ড কচুরি লইয়া যেমন কামড় মারি
অমনি কচুরি-মধ্যস্থ উত্তপ্ত ঘৃত তাহার মুখবিবর দ
করিয়া ফেলিল। ফলে তিনি বাহাদুরি দেখাইতে গিয়া প্র
সপ্তাহ কাল কষ্ট পাইয়া অনেক কষ্টে ও চিকিৎসায় আরো
লাভ করিলেন। এরূপ পাগলামির গল্প অনেক আছে
এরূপ বাহাদুরি যাহারা করে, তাহারা নিতান্ত পাগল। অপ
কথা যাহা বলিলাম, কোন জিনিষ খাও না বলিয়া স্পর্দ্ধ
করিবে না। অনেক লোক মৎস্য মাংস খান এবং অনেে
খান না। খান না বলিয়া তাঁহাদের বাহাদুরি কিছুই নাই
গবাদি পশুরাও মৎস্য মাংস খায় না। তাহাতে তাহাদে
বাহাদুরি কি? ত্যাগে বাহাদুরি করা উচিত নয়। তাহাতে
এক দিকে যেমন বস্তুগত ত্যাগ করিলে, তেমনি অপর দিকে
মানসিক দৌর্ব্বল্যও দেখাইয়া নিজের মনুষ্যত্বের অভাবের
পরিচয় দিলে। এরূপ বিপরীত ব্যবহার সদাচার বহির্ভূত।
খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অপর এক কথা বলিয়াছি—অস্বাস্থ্যকর জিনিষ
খাইবে না। কোনটি স্বাস্থ্যকর আর কোনটি নহে, ইহা
আমাদের পক্ষে জানা কঠিন নয়। যাহারা শাস্ত্রশাসন মানে,
লোকাচার, দেশাচার মানে, তাহাদের পক্ষে খাদ্যাখাদ্য বিচার

করা সহজ কথা। আমাদের দেশীয় লোকে সাধারণতঃ যাহা অস্বাস্থ্যকর বলেন, বা যাহা তোমার অভ্যাসানুসারে গ্রহণ করিতে কষ্ট হয় তাহা না খাওয়াই ভাল। এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা এক জনের কাছে সুখাদ্য, কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা ত্যজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী জিনিষের উল্লেখ করিতেছি। ইংরাজেরা অয়েষ্টার বলিয়া এক প্রকার শম্বুক, পনীর প্রভৃতি কয়েকটী জিনিষ বড় সুখসেব্য বলিয়া ব্যবহার করেন, কিন্তু অনভ্যস্ত লোকের নিকট এই সকল বস্তুর গন্ধ অতি পূতিগন্ধ বলিয়া মনে হয়। পরের কথা কেন আমাদের দেশেরই উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের অনেক ভদ্রপরিবার মধ্যে শুষ্ক মৎস্যের খুব ব্যবহার আছে, কিন্তু উহা আমাদের কাছে কিরূপ দুর্গন্ধময় বোধ হয়? আমাদেরই ভিতর হিঙ্ এর গন্ধ, পূতিনাশাকের গন্ধ, কেহ কেহ সুগন্ধ মনে করেন, আবার কেহ কেহ সে গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং গন্ধ দ্বারা কোন্ বস্তু অস্বাস্থ্যকর কোন্ বস্তু স্বাস্থ্যকর, তাহা বুঝা কঠিন। পর্য্যুষিত বস্তু মাত্রেই পরিত্যজ্য। বাসিপক্ক অন্ন, ব্যঞ্জন আহার করিবে না। তাহা যে একেবারে সকল সময় অস্বাস্থ্যকর তাহা বলি না। পাকাল-ভোগ খাইয়া উড়িষ্যার কত শত লোক বাঁচিয়া আছে। আর জিনিস পচিলেই যদি অস্বাস্থ্যকর হইত, তাহা হইলে পচা মৎস্যপ্রিয় চীন ও ব্রহ্মবাসীগণকে আর কেহ দেখিতে পাইতেন না। সুতরাং বিচার করিয়া স্বাস্থ্যকর কি, আর অস্বাস্থ্যকর কি, তাহা জানা কঠিন। আবার এমন অনেক বস্তু আছে, যাহারা

স্বতন্ত্রভাবে বড় ভাল জিনিস, উপাদেয়ও বটে, স্বাস্থ্যকরও বটে; কিন্তু সংযোগে বিষময় ফল প্রসব করে। এই সকল বিষযোগ কিসে কিসে হয় জানা আবশ্যক। ইহা কবিরাজী সুশ্রুতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের দেশীয় ভাবে চালিত পরিবার মধ্যে অনেকেই অনেকটা অবগত আছেন। "মধুসর্পী" একটা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় সকলেই জানেন। দুইটিই অমৃতবৎ উত্তম পদার্থ অথচ উভয়ের যোগে দারুণ বিষ উৎপন্ন হয়। দুগ্ধের সহিত লবণ সংযোগ, কুলের সহিত মিষ্ট, তাম্র পাত্রে দুগ্ধ, কাংসপাত্রে নারিকেল জল, ইত্যাদি অনেক অনেক অনিষ্টকর যোগের কথা অনেক স্ত্রীলোকও জানেন। এ সকল নিষেধ বাক্য যাহার নিকট শুনিবে অগ্রাহ্য করিবে না। অবিশ্বাস করিয়া ব্যবহার পূর্ব্বক তাহার বিষময় ফল ভোগ করার আশঙ্কা অপেক্ষা বিশ্বাস করিয়া ব্যবহার না করিয়া নির্ভাবনায় থাকা ভাল নয় কি?

এখন সর্ব্বদাই খাদ্যবিষ নামক (Ptomain) এক প্রকার ভয়ানক বিষের কথা শুনা যায়। খাদ্যের সহিত এই বিষ উদরস্থ করিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল জিনিষের যোগের ফল জানা নাই, তাহার যোগসাধন করিয়া অনেক সময় এইরূপ ফল ঘটিয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম, পরিচিত বিষযোগ ত্যাগ করিবে এবং অপরিচিত বিষযোগও পরিত্যাগ করিবে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, শাস্ত্র-শাসন, লোকাচার ও দেশাচার মানিয়া চলিলেই সুখী হইবে।

আহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, এই খানে তাহা বলা ভাল। যেখানে সেখানে খাইবে না। অনেকে মনে করেন একত্র ভোজন না করিলে বন্ধুত্ব গাঢ় হয় না। ভালবাসাটা ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। ইহা বড় ভুল কথা। আমার অনেকগুলি খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান বন্ধু আছেন। তাঁহাদের সহিত আমার বন্ধুত্ব যেরূপ বহুদিন ব্যাপী ও হৃদয়-স্পর্শী, এরূপ স্বধর্ম্মীর ভিতরও বড় কম। তাঁহারাও জানেন আমিও জানি যে, একত্র ভোজনক্রিয়া হইবার নহে। উহা একটা অসাধ্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং তাঁহারাও তজ্জন্য দুঃখিত হন না, আমিও কখন কষ্ট বোধ করি না। ভিন্নধর্ম্মীর সহিত যেমন একত্র আহার নিষিদ্ধ, ভিন্নজাতীয় ও ভ্রষ্টাচারী লোকের সহিত আহারও তদ্রূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এ সকল নিষেধ মানিতে হইবে। যদিই কোন ক্ষেত্রে তাহাতে বন্ধুত্বের হানি হয়, ধর্ম্মহানি অপেক্ষা সে বন্ধুত্ব হানি কিছু বেশী নয়, তাহা অকাতরে ত্যাগ করিবে। আমাদের একটা প্রবাদ বাক্য আছে "দুর্জ্জনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশত্যাগ করিবে; এবং আত্মার যেখানে অনিষ্টাশঙ্কা আছে সে অবস্থায় পৃথিবী ত্যাগ করিবে।" আমাদের খাদ্যাখাদ্যের উপর ধর্ম্মনির্ভর করে এবং ধর্ম্ম আত্মার উন্নতিমূলক। আমাদের ধর্ম্মের এই সকল সূত্র বেশ মনে রা আমাদের কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ যে, আমরা যাহা আহার করি, উহা আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থিত আত্মার তর্পণ সাধন মাত্র। ইহা

পরম জ্ঞানের কথা; বয়োবৃদ্ধি সহকারে বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইলে, এ সকল কথা বুঝিতে পারিবে। আহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল, এখন এই পর্য্যন্তই ভাল।

আচমন—আহারের পর উত্তমরূপে পরিষ্কৃত জলে আচমন করিবে। আচমন অর্থে কেবল হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন নহে। মুখ ত ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতেই হইবে তৎসঙ্গে দুই হস্ত এবং পদদ্বয়ও ধৌত করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজন বোধ করিলে দন্তকাষ্ঠ অর্থাৎ খড়িকা ব্যবহার করিবে। হস্ত পদ ও মুখ, প্রক্ষালনান্তর শুষ্ক বস্ত্রে মুছিয়া ফেলিবে। পরিধেয় বস্ত্রে হাত মুখ মুছা ভাল নয়; বস্ত্রান্তরে তাহা করা কর্ত্তব্য।

মুখশুদ্ধি—আহারান্তে এ দেশে মুখশুদ্ধি গ্রহণের নিয়ম আছে। ইহা ভারতের সর্ব্বত্র আছে কি না জানি না; কিন্তু এ রীতি আমাদের প্রদেশে বহুদিবসাবধি প্রচলিত আছে। এমন কি দেবতা ও পিতৃলোকদিগকেও তাম্বুল দিবার ব্যবস্থা আছে। তাম্বুল ব্যবহারের অনেক উপকারিতা আছে বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহারা তাম্বুলের উপকারিতা বুঝিয়া ব্যবহার করেন কি বিলাসের উপাদান বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। মুখশুদ্ধির অর্থ বুঝি না। জল দ্বারা আচমন করিলে যে মুখ শুদ্ধ হয় না তাহা আমি বুঝি না। জলে প্রক্ষালন করিলে সকল জিনিষই শুদ্ধ হয়। হস্তপদাদি উচ্ছিষ্ট সংযুক্ত হইলে

কেবল জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ করা হয়। বস্ত্রাদি অশুচি হইলে জলে প্রক্ষালনই বিধি। জলের ন্যায় সহজ-শোধক দ্রব্য থাকিতে আবার অপর শোধনোপায়ের প্রয়োজন কি? তবে যদি নিতান্তই তাহাতে মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে, আমার এক পূজনীয় আত্মীয় ছিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণ করিতে পার। তিনি উত্তমরূপে মুখপ্রক্ষালনের পর, মন্ত্রোচ্চারণ ও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ লোকের ইহা বড় প্রশস্ত উপায়। মন্ত্রস্নান আছে, আর মুখশুদ্ধি মন্ত্রে হয় না কি? তোমার ইষ্টমন্ত্র হয় নাই, তবে গায়ত্রীদীক্ষা হইয়াছে, নিতান্ত মুখশুদ্ধির আবশ্যক বোধ করিলে এতদুদ্দেশে একবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এত গেল মানসিক তৃপ্তির কথা, কিন্তু মুখশুদ্ধির ভান করিয়া নানা প্রকার সুগন্ধমশলাবিশিষ্ট খদিরচূর্ণকসম্বলিত পর্ণপত্রচর্ব্বণে সুখোপলব্ধিই অধিকাংশ স্থলে ঘটিয়া থাকে।

যাঁহারা তাম্বুল ব্যবহার করেন, তাঁহারা মানুন বা না মানুন ইহা যে বিলাসিতার উপকরণ তাহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। বিলাস, বিদ্যার্থীর জন্য নহে; ধর্ম্মার্থীর জন্যও নহে, জ্ঞানার্থীর জন্যও নহে। আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া পানাহারাদি তদনুরূপ ও তৎসাহায্যকারী করা চাই। বিলাসিতা—বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধী জিনিষ। যিনি বিলাসিতায় মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহার বিদ্যা স্থলে অবিদ্যা আসিয়া পড়ে, ধর্ম্ম লাভ হয় না। আর বিদ্যালাভ ও ধর্ম্মসাধন

না হইলে জ্ঞান কোথা হইতে হইবে? তাম্বুল সেবন বড় একটা ব্যয়সাধ্য নহে, সেই জন্যই ইহাতে আমরা বেশী আশঙ্কা। যে সকল জিনিষ ব্যক্তিবিশেষের আপত্তিজনক অথচ অনায়াস না হউক স্বল্পায়াসলভ্য, সেই সকল জিনিষে আমি বড় ভয় পাই। তরলমতি যুবকের নিকট তাহারা কেমন আস্তে আস্তে প্রবেশ করে। অপকারিতা সহসা উপলব্ধি হয় না; ইহা আরও ভয়ের কথা। উৎকট দ্রব্য ব্যবহারের কুফল তৎক্ষণাৎ জানিতে পারা যায় সুতরাং সকলেই তাহাকে ভয় করে, কিন্তু যাহাদের অপকারিতা অল্পে অল্পে জন্মায় তাহাদের জন্য কেহ আশঙ্কিত নহে সুতরাং সেইগুলি বড় ভয়ানক। ইহারা মিষ্টভাষী শত্রু। বুদ্ধিমান লোকে ইহাদিগকে প্রবল শত্রু অপেক্ষা অধিক ভয় করেন। বলিতে পার তাম্বুল যদি এত অপকারী জিনিষ এবং ত্যজ্য তবে দেবতাদের ও পিতৃলোককে দেওয়া হয় কেন? এটা বড় শক্ত কথা। আমরা দেবলোককে, পিতৃলোককে এমন অনেক জিনিষ দিয়া থাকি যাহা আমরা নিজে ব্যবহার করিতে অসমর্থ। উপরে যে কথা বলিয়াছি তাহা যদি স্মরণ রাখ এবং বুঝিতে পারিয়া থাক তাহা হইলে উপস্থিত কথার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন হইবে না। তোমার এখন চাই কি? সকলই চাই, চাই বিদ্যা, ধর্ম্ম—জ্ঞান; তুমি যাহার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছ কত দিন করিবে তাহারও স্থিরতা নাই। তুমি যদি কর্ম্মফলে, চেষ্টার গুণে, সাধনার সাহায্যে বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হও তাহা হইলে তাম্বুল কেন, যাহা

কিছু বিলাসিতার উপকরণ সমস্তই অবাধে ব্যবহার করিতে পারিবে। তখন বিলাসিতা তোমার অন্তরায় হইবে না, তাহাতে স্পৃহাও থাকিবেনা। এমন প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসী দুইএক জন দেখিয়াছি, যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান বলে তাঁহাদের কাছে এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য মাত্র নাই। সকলই তাঁহারা ব্রহ্মময় দেখেন। তখন তাঁহারা যাহা কিছু পান বা ভোজন করেন তাহাতেও সেই ব্রহ্মদর্শন করেন আপনাকে ব্রহ্ম বলিযা মনে করেন, এবং পান বা ভোজন করা কেবল ব্রহ্মার্পণ মাত্র বোধ করেন। তাঁহারা নিজে কোন জিনিষের দোষগুণের বিষয় উপলব্ধি করেন না। আমরা এমন গল্প শুনিয়াছি, যে, এইরূপ কোন ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীকে নাকি কোন লোক উৎকট সুরাপান করাইয়া দেখিয়াছেন, যে সুরার অল্প পরিমাণ পান মাত্রে মানুষ উন্মত্ত হইয়া উঠে ও অল্পকাল পরে মৃতপ্রায়, হয়, তাহাই নাকি প্রচুর পরিমাণে পান করান সত্ত্বেও তাঁহার কোন প্রকার মানসিক বা দৈহিক বিকার লক্ষিত হয় নাই। একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তুমি পুরাণে পরমজ্ঞানী প্রহ্লাদের কথা পড়িয়াছ। তাঁহার পিতা অসুররাজ হিরণ্যকশিপু বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের অপরাধ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভগবান ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না, মানিতেন না। দুষ্টচিত্ত ভগবদ্দেষ্টা অসুররাজের তাহা অসহ্য কাজেই নিজ পুত্র হইলে কি হয়, প্রহ্লাদকে নিধনের

জন্য তিনি কত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সকল উপায়ের মধ্যে একটী উপায় করিয়াছিলেন বিষ প্রয়োগ। প্রহ্লাদ অম্লান বদনে ভগবানে তাহা অর্পণ করিয়া নিজ বদনে তাহাকে আহুতি দিলেন। কোথায় সে কালকূট? কিছুই করিতে পারিল না। অপকার করিবে কাহার—যাহার কাছে ভালমন্দের বিলক্ষণ পার্থক্য। আর যাহার কাছে সমস্তই সমান তাঁহার কাছে আর প্রভেদ কি? তবে এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে দেবলোককে, পিতৃলোককে আমরা যে বিলাসিতার উপকরণ নিবেদন করি তাহা যদি মন্দ জিনিষ তবে দিব কেন? না দেওয়াই ত ভাল ইহার উত্তরে এক কথা স্মরণ রাখিবে, এই সকল দ্রব্য দেব ও পিতৃলোককে উৎসর্গ করা আমাদের ন্যায় সামাজিক লোকের জন্য ব্যবস্থা; পূর্ণ জ্ঞানীর জন্য নহে. অপর কথা. বয়োবৃদ্ধ পিতা যাহা যাহা করেন শিশুপুত্র তাহা করিতে সমর্থ নহে। অধিকারভেদে ভোগাদির তারতম্য অবশ্যই হইবে। আমরা মনে মনে বুঝি যে ভাল শয্যায় শয়ন করা বড় সুখপ্রদ. ভাল বস্ত্র পরিধান করা বড় প্রিয়, সুমিষ্ট পানাহার কত তৃপ্তিকর। কিন্তু নিজে আমরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহা করি না। সে উদ্দেশ্য বিদ্যা, ধর্ম্ম, জ্ঞান লাভ। পাছে তাহাতে অন্তরায় হয় সেই জন্য আমরা বিলাসিতা চাই না। যাহারা তাহা চায় না তাহারা বিলাসিতায় মজিয়া থাকে। তাহার ফলে হয়ত তাহারা কখনও বিদ্যা, ধর্ম্ম, জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। এমনও হইতে

পারে তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া বিলাসভোগ করিতেছেন, তখন ভোগ, অভোগ সুখ, দুঃখ তাঁহাদের কাছে সকলই সমান সুতরাং তাঁহাদের তাহাতে ক্ষতি নাই। এইরূপ নানারূপ যুক্তিদ্বারা উক্ত প্রথার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। মোট কথা যতদিন তুমি বিদ্যাভ্যাস শেষ না কর এবং ধর্ম্মচর্য্যা করিয়া জ্ঞানলাভ না কর, ততদিন তাম্বুল সেবন কেন, কোনরূপ বিলাসিতার প্রশ্রয় দিবে না।

অনেকস্থলে মুখশুদ্ধির জন্য যাঁহারা তাম্বুল ব্যবহারে অনিচ্ছুক, তাঁহারা তাহার অনুকল্প স্বরূপ সুপারি কি অন্য প্রকার মশলা, বা কেহ হরিতকী ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদি মুখশুদ্ধির প্রয়োজনই না থাকে তাহা হইলে কিছুই দরকার নাই। মুখশুদ্ধি বলিয়া এই সকল জিনিষ ব্যবহার করিয়া মুখবিবরকে অপরিষ্কৃত করা হয়। কতকগুলি আবর্জ্জনা যুক্ত করা হয়। আমার মতে আহারান্তে ভাল করিয়া পরিষ্কৃত জলে মুখ প্রক্ষালনান্তে কোন প্রকার মুখশুদ্ধিরই আবশ্যক নাই। তবে যদি কোন চিকিৎসক আহারান্তে কোন প্রকার বস্তু ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন তাহা রোগের ঔষধ জ্ঞানে ব্যবহার করিবে। কিন্তু সাবধান, যেন কোন একটা জিনিষ প্রত্যহ ব্যবহার করায় তাহাতে এমন অভ্যাস না হয় যে তাহা না পাইলে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা বা কষ্ট হয়।

———

পরিচ্ছদ—তাহার পর বিদ্যালয়ে যাইবার পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলিবার আছে। তুমি কখন শয্যাত্যাগ কর, অতি প্রত্যূষে কর, কি বিলম্বে কর, সন্ধ্যাপূজাদি কর কি না, আহারাদি কি কর, কি না কর, তাহার সহিত অপরের বড় একটা সম্পর্ক নাই। সমাজের যদিও এখানে দেখা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষভাবে তাহা দেখিয়া থাকেন, কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সমাজ প্রত্যক্ষ সমালোচক। সেই জন্য সেক্ষপিয়রের জ্ঞানী বৃদ্ধ পলেনিয়স্ ঠিকই বলিয়াছেন "পোষাকেই মানুষ বুঝা যায়।" যখন সমাজ পোষাক দেখিয়াই তোমাকে বুঝিবেন, তখন তৎসম্বন্ধে তোমার খুব বিবেচনা করিয়া চলা আবশ্যক। এখনও তুমি বিদ্যালয়ের ছাত্র, এখন পোষাক সম্বন্ধে বড় একটা কিছু ধর্ত্তব্য নহে, তবে এখন হইতে যেরূপ অভ্যাস করিবে, এখন লোক পোষাক দ্বারা তোমাকে যেরূপ ধারণা করিবে চিরদিনই তোমাকে সেই ভাবে দেখিবে। সুতরাং এখন হইতে পোষাক সম্বন্ধে একটু সাবধান হওয়া দরকার। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা মোটা কথা বলিয়া রাখি, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এমন পরিচ্ছদ পরিধান করিবে যে লোকে কোন প্রকার সমালোচনা করিবার অবসর না পায়। বিশেষ ভাল মন্দ কিছুই বলিবার না থাকে, পোষাক সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল বলিয়া প্রশংসাটাও অপবাদ! যে পোষাক লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিল, লোকে অন্ততঃ ভাল বলিয়াও সমালোচনা করিল, তাহার আর সরলতা কোথায়?

কখন কখন সরলতার ভাণ করিয়া অনেকে আত্মাভিমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সেটা বড় ঘৃণার ও লজ্জার কথা। সাবধান, যেন সরলতার দেবীমূর্ত্তির অন্তরালে অভিমানের পিশাচমূর্ত্তি অবস্থান না করে। যাঁহার যেমন অবস্থা, তাঁহার সেইরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যাঁহার যে কার্য্য করিতে হয় তিনি তদনুরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যাইতেছেন, তুমিও তাহাই করিবে। সমাজে পাঁচজনের একজন হওয়া চাই। লোকাতীত গুণ ও চরিত্র বড় প্রশংসনীয়। কিন্তু লোকাতীত সাজ সরঞ্জাম বড় ঘৃণিত জিনিষ। মনে কর কোন সভায় বা কার্য্যস্থলে সকলকে কোন এক বিশেষ পরিধেয় ধারণ করিয়া যাইতে হইবে, যদি কেহ নিজের বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব বা ধনাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ পদমর্য্যাদা দেখাইবার জন্য তদপেক্ষা আড়ম্বর পূর্ণপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যান তাহা হইলে সকলের নিকট তাঁহার আত্মাভিমান প্রকাশ করা হয় না কি? তিনি যেন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন যে তোমরা সকলে যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পোষাক পরিয়া আসিয়াছ আমি নিজগুণে বা গৌরবে তাহার বশবর্ত্তী নহি, আমি তোমাদের হইতে পৃথক উচ্চতর লোক। এ ভাবটা মনে আসে না কি? সমাজকে প্রভূত মান্য করিয়া চলিতে হইবে। সমাজকে তাচ্ছিল্য করা একটা সামাজিক মহাপাপ। পরিধেয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক কিন্তু তাহাতে কোনরূপ জাঁক জমক থাকিবে না এবং

সাধারণ হইতে হীনও হইবে না। উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে অবশ্য বুঝিয়াছ যে পরিচ্ছদের হীনতাও স্থান বিশেষে পরিচ্ছদের না হউক মানুষের জাকজমক প্রকাশ করে। পাঁচ জনে যেমন পোষাক পরেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যেমন ভালবাসেন বা বিদ্যালয়ের যদি কিছু নিয়ম থাকে, তোমার পোষাক ঠিক তদনুরূপ হওয়া চাই। ছাত্রজীবনের অনেক আচার ব্যবহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কার্য্যকরী হয়। পোষাক সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া চলা চাই। যদি বল এখন লেখাপড়া করিবার সময়, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এত চিন্তা করিবার অবকাশ কোথায়? তাহার উত্তর, বিশেষ কিছু চিন্তা না করিলেই সাধারণ আচারের সহিত তোমার পার্থক্য থাকিবে না, সকলে যাহা করে অন্ততঃ অধিকাংশ লোক যাহা করে, তাহা করিলেই নিশ্চিন্তভাবে কার্য্য করিতে পার। চিন্তা করিয়াই লোকে বিভ্রাট ঘটায়, এ বিষয়ে যত ভাবনা কমে থাকিবে ততই সুবিধা।

এক শ্রেণীর যুবক আছেন তাঁহারা যাহার কিছু সৌখিন দেখেন যাহা কিছু জাঁক জমক, বা চাল চটক দেখেন, তাহাই নিজে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, বোধ হয় তাঁহাদের সেই বিষয়েই সর্ব্বদা চিন্তা আছে। যাহার যে বিষয়ে চিন্তা যেরূপ, তাহার তাহাতে সিদ্ধিও তদ্রূপই হইয়া থাকে। পোষাকটা অনুকরণসাপেক্ষ। কিন্তু কাহার অনুকরণ করিবে? সমাজের সাধারণ লোকের অনুকরণ করিবে। পাঁচজনের অনুকরণ

করিবে। দশজনের ভিতর দুই একজন যাহা করে তাহা অনুকরণীয় নহে, তবে যখন দেখিবে দশজনের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক সংখ্যক লোক অর্থাৎ ছয় সাত জন লোক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা কিছু নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বা করিতেছেন তখন তুমিও তাঁহাদের অনুগামী হইবে। কখন পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অগ্রগামী হইবে না। "মুখরস্তস্ত্রহন্যতে" কথাটা পোষাকে যতদুর প্রয়োজ্য এত আর কোথাও নহে। পূর্ব্বে সাধারণতঃ আমাদের দেশে কামিজের এত ব্যবহার ছিল না। যাঁহারা কোট বা চাপকান পরির্তেন তাঁহারাই কেবল তাহার নীচে কামিজ ব্যবহার করিতেন। তাহাও সকলে নহে। অপর সাধারণ লোকে ধুতি চাদরের সহিত কামিজ ব্যবহাব না করিয়া হস্তে বোতামবিহীন এক রকম জামা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গত ২০।২৫ বৎসরের ভিতর এই শেষোক্ত প্রকার জামা এক প্রকার বিরল প্রচার হইয়াছে। পোষাকের দোকানে সচরাচর এখন আর তাহা পাওয়া যায় না, কাজেই তাহার ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে যখন সাধারণ লোকে ধুতি চাদরের সহিত কামিজ ব্যবহার করিতেছেন তখন সাবেক "পিরাণ" ব্যবহার করিলে অসামাজিক ব্যবহার বলিতে হইবে। একটা নূতন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ভদ্রলোকের ভিতর রেশমের চাদর ব্যবহার। ১৮৮৪ সালে আমি একজন ভদ্রলোককে প্রথম সূতার ধুতি ও জামার সহিত

করাইবার আদেশ হইত। এই করিয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন এবং যদিও তাঁহার হঠাৎ অকাল মৃত্যু হইল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি যে দেনা রাখিয়া যান, তাহাতে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকাংশ দায়গ্রস্ত করিয়া শোধ ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ইহাতে দাঁড়কাক ও ময়ুর-পুচ্ছের গল্প মনে পড়ে না কি? যে যেমন তাহার তেমন চলা চাই। তাঁহার সমঅবস্থাপন্ন, সমভাবাপন্ন লোকের ন্যায় চাল চলন, পোষাক পরিচ্ছদ করাই বিধেয়।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে স্বাধীনতা কিছু মাত্র নাই। অবস্থাভেদে পোষাক সম্বন্ধে সকলেই বিধি ব্যবস্থার দাস। কোন বিধি ব্যবস্থার দাসত্ব ঘৃনার জিনিষ নয়, বরং তাহা না মানা অন্যায় ও ঘৃণার্হ। মধ্যে মেডিকেল কলেজের একজন অধ্যক্ষ নিয়ম করেন যে তাঁহার বিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার্থীকে মোজা ও কোট পরিতে হইবে। তিনি প্রধান শিক্ষক, তাঁহার আদেশ সকলেরই অবশ্য প্রতিপাল্য এবং পালিত হইয়াও আসিতেছে। ছাত্র জীবনে বরং এ সম্বন্ধে স্বাধীনতার কথা উঠিতে পারে কিন্তু যাহাদের বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পাঁচজনের সহিত একত্র মিলিয়া মিশিয়া কার্য্যকরিতে হইবে, তাঁহাদের স্বাধীনতা চলেনা। তাহা স্বাধীনতাই নহে, বরং স্বেচ্ছাচারিতা বলিলেই ভাল হয়। বাস্তবিকই অনেক সময়ে অনেক অপরিণত-বুদ্ধি যুবক কোনটা স্বাধীনতাও কোনটা স্বেচ্ছাচারিতা প্রভেদ

করিতে সমর্থ হন না, অনেক সময়েই স্বাধীনতার দেবীমূর্ত্তির স্থলে ভ্রম ক্রমে স্বেচ্ছাচারিতার রাক্ষসী মুর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন। সে বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বদা সাবধান হওয়া উচিত। নিয়ম বা বিধি ব্যবস্থার অধীনতা দাসত্ব নহে, বিশৃঙ্খল ভাবই বরং দাসত্বের লক্ষণ, ঠিক দাসত্বের লক্ষণ না হইলেও স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণত বটেই। নিয়মও বিধির অধীন হইয়া কত শত বড় লোককে, বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, পদস্থ, গৌরবান্বিত লোককে কত সময়ে কত সাজে সাজিতে হইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের লজ্জার কথা কিছুনাই বরং সে বিধি মানা করিয়া চলা তাঁহাদের শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে শেষ কথা পরিচ্ছদের উপর কোন একটা স্পৃহা থাকিবে না। পরিচ্ছদ সামাজিক নিয়মানুসারে করিতে হয় বলিয়া করা। ইহা একটা নৈসর্গিক অভাব দূর করিবার জন্য নহে, কেবল সামাজিক নিয়ম পালনের জন্য মাত্র, তাহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। যাঁহারা সামজিক নহেন সমাজে বাস করেন না, তাঁহাদিগের কোন পরিচ্ছদেরই আবশ্যকতা নাই। জ্ঞানীরও নাই। জ্ঞানহীনেরও নাই অসভ্য বর্ব্বর যাহারা এখনও ভাল করিয়া সমাজ-বদ্ধ হইতে শিখে নাই, যাহাদের ভিতর সামাজিক কোন নিয়ম এখনও বিধি বদ্ধ হয় নাই, তাহারা হয়ত অনেক বিষয়ে উন্নত সমাজের লোক অপেক্ষাও উন্নত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা পরিচ্ছদের আবশ্যকতা বুঝে নাই। আবার এমন জ্ঞানী লোক অনেক

আছেন, যাঁহাদের বসন থাকা না থাকা সমান। আমরা এমন দুই এক জনকেও দেখিয়াছি। ইঁহাদের আমরা সামাজিক নিয়মনুসারে যাহাকে লজ্জানিবারণ করা বলি, ইঁহারা সে ভাবের ধার ধারেন না ইঁহারা সমাজের ভিতর বাস করেন না, সমাজের নিয়মও মানেন না। তবে সামাজিক লোকের সংঘর্ষে আসিলে অগত্যা অন্যের জন্য নিজের আবশ্যক না থাকিলেও বসনে অন্ততঃ দেহের কিয়দংশও আবৃত করিতে হয়। এটুকুও তাঁহাদের সামাজিক লোকের সংস্পর্শে আসা রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। এতদ্বারা যতদূর বুঝা যায় একবারে অজ্ঞান ও পূর্ণ-জ্ঞানী পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উভয়েরই অবস্থা প্রায় একরূপ। উভয়েই সমাজ জানেন না, বা মানেন না বলিয়া সামাজিক লোকের ন্যায় পরিচ্ছদের আবশ্যকতা অনুধাবন করেন না। পোষাক পরিচ্ছদ যখন সমাজের জন্য, সমাজ শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া যতটুকু না করিলে নয় ততটুকুই আবশ্যক জ্ঞান করিতে হইবে। ভোজন যেমন একটা নৈসর্গিক অভাব দূর করিবার জন্য, বসনও সেইরূপ একটা সামাজিক নিয়ম পালন জন্য। আহার বিষয়ে যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি মাত্রই ভোজনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তেমনি সামাজিক নিয়ম পালন করিতে যতটুকু দরকার ততটুকু করা চাই। আহার সম্বন্ধে অভাবের উপর যাহা, তাহাকে যেমন লোলুপতা বা পেটুকতা বলে, পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তেমনি সামাজিক

নিয়মাধীনে যাহা করা আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক করার নাম বিলাসিতা বা বাবুগিরি বলা যায়। ভাল লোকের পক্ষে আহারে লোলুপতা ও পরিচ্ছদে বিলাসিতা সমানই ঘৃণার্হ ও ত্যজ্য।

বিদ্যালয়—এই ভাবে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিদ্যালয়ে যাইবে। সর্ব্বদাই একটু সময় থাকিতে যাইবে। অধ্যাপক আসিবার অন্ততঃ পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে গিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিয়া, পথশ্রান্তি দূর করিবে। পরে অধ্যাপক আসিলে তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিবে। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই, সে বিষয়ে যথাযথ উপদেশ দিবার ভার অধ্যাপক মহাশয়গণের উপর। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা দয়া করিয়া আমার সে ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। সে জন্য তোমার অধ্যাপক মহাশয়গণের নিকট আমি যে কত কৃতজ্ঞ তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। আমার বোধ হয় ছাত্রগণের অভিভাবকগণ সকলেই এইরূপ পুত্রগণের অধ্যাপকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বিদ্যালয়ে গিয়া যেরূপ আচরণ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথম কথা শিক্ষকগণের প্রতি ব্যবহার। শিক্ষকগণের প্রতি সর্ব্বদা খুব ভক্তি প্রদর্শন করিবে। তাঁহারা বৃদ্ধই হউন আর যুবাই হউন, সকলেই পিতৃস্থানীয়। সকলেরই প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমাদের সমাজে গুরুভক্তি

চিরপ্রসিদ্ধ; যাঁহার নিকট কখন কোন একটা ভাল জিনিস শিখিয়াছ বা কোনরূপ সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছ, তিনিই তোমার গুরু। তাঁহার প্রতি কি বিদ্যালয়ে, কি বাহিরে সর্ব্বদা গুরুভক্তি প্রদর্শন করিবে। তাহাতে তাঁহার প্রীতি জন্মিবে, তোমারও মঙ্গল হইবে। গুরুশিষ্যে ভক্তি ও স্নেহ না থাকিলে শিক্ষা ফলবতী হয় না। গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়, তাঁহারা যাহা যাহা বলিবেন, তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। যদি কখন তাঁহার কোন আদেশ অযথা বলিয়া তোমার বোধ হয়, প্রথমতঃ সে ধারণা ভ্রমাত্মক, শিক্ষক যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক বলিয়া মান্য করিবে। তবুও যদি শিক্ষকের কোনবাক্যের যাথার্থ্যাবধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে, তাহার অবকাশ কালে, অতি বিনীতভাবে গিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া যথাবিহীত সম্মান জ্ঞাপনান্তে সে কথা নিবেদন করিবে। তাহা হইলে তোমার ভ্রম হইয়া থাকে তাহার অপনোদন হইবে, আর যদি দৈবক্রমে তাঁহারই কোন প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনিও তাহা সংশোধনের অবসর পাইবেন। কখনও তাঁহাদের কোন কথার প্রতিবাদ করিবে না, ভ্রম করিতেছেন দেখিলেও তাহাতে তৎক্ষণাৎ কোন কথা কহিবে না। গুরুলোকের দোষ দেখান উচিত নহে। "দোষা বাচ্যা গুরোরপি" কথাটার প্রকৃত অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া অনেক সময় বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ইহা

কেবল সত্যের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য। সত্য এমনই অভীপ্সিত জিনিস যে শত্রুর গুণ থাকিলেও বলিতে হইবে এবং গুরুর যদি কিছু দোষ থাকে তাহাও গোপন করিয়া সত্যের অপলাপ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ইহাতে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে গুরুর দোষোদ্ঘাটন কর্ত্তব্য নহে তবে যেখানে না বলিলে সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় সেইখানে সত্য পালন জন্য গুরুর দোষ বলা চলে, অন্যত্র নহে। অনেক সময় এমন ঘটে যে গুরুলোকের কোন একটি কথা বা আচরণ অন্যায় বা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে পরে বুঝা যায় যে সেটা তাঁহাদের দোষ বা ভ্রম নয়। আমার নিজ জীবনেই এমন ঘটিয়াছে। আমার পিতৃদেব যিনি পূর্ণজ্ঞানী ছিলেন, তাঁহার দুই একটি ব্যবহারে আমার কেমন একটু খটকা লাগিত, মনে হইত হয় ত তিনি ভ্রম করিতেছেন। তখন তিনি পরিণত বয়স্ক, জ্ঞানবান, আর আমি অপরিণত বয়স্ক ও জ্ঞানহীন। আমি কোন কথা বলিতে বা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতাম না, কিন্তু মনে মনে একটু একটু সন্দেহ থাকিত। পরে যখন আমার বয়োবৃদ্ধিসহকারে ও অপর নানা কারণে জ্ঞান না হউক একটু অভিজ্ঞতা জন্মিল, তখন বুঝিতে পারিলাম তিনি যাহা করিতেন তাহাই অভ্রান্ত, আমি পূর্ব্বে যাহা বুঝিতাম তাহা নিতান্ত

ভ্রমাত্মক। সেই জন্য বলিতেছি যে সহসা গুরুলোকের কার্য্যে বা ব্যবহারে দোষ দর্শন করা বা তাঁহাদের কার্য্য ভ্রম বলিয়া মনে করা যুবকের পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতা। তাহাতে অনেক সময় নানারূপ অপকার ঘটিয়া থাকে। সে জন্য সে বিষয়ে তোমাকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল। নিজের অপরিণত বুদ্ধির উপর বড় একটা বেশী নির্ভর বা বিশ্বাস করিবে না।

গুরুর সহিত যখনই সাক্ষাৎ হইবে তখনই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। যাঁহাকে আমাদের সামাজিক নিয়মানুসারে প্রণাম করা চলে তাঁহাকে প্রণাম করিবে আর যাহার প্রতি তাহা না চলে, তাঁহার সহিত তিনি যাহাতে সম্মানিত জ্ঞান করিবেন সেই মত ব্যবহার করিতে হইবে। অনেক সময় এমন ঘটে তুমি হয়ত কোন অধ্যাপককে সম্মানাভিবাদন করিলে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন না! তাহাতে বিরক্ত বা দুঃখিত হইবে না। তুমি প্রত্যভিবাদন জন্য তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে না, তুমি তোমার কর্ত্তব্য বোধে তাহা করিবে এবং তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়াছ ইহাতেই তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে। তিনি প্রত্যভিবাদন না করাতে তোমার অসন্তোষের কারণ নাই। আর এক কথা মানুষ মানুষের হৃদয় দেখিতে পায় না। হয়ত তোমার সম্মান দেখানকালে তোমার শিক্ষক তোমাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন,

প্রকাশ্যে কোন ভাব প্রকাশ করা হয়ত তাঁহার অভ্যস্ত নহে। তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। তাঁহারও তোমার প্রতি ভালবাসা বাড়িবে। গুরুশিষ্যে সমকক্ষভাব যেন কখন কোনকালে মনে হয় না। গুরু চিরকালই উচ্চস্থান অধিকার করিবেন, সম্মানিত হইবেন। কখন এক আসনে অথবা সম আসনে বসিবে না। এক পংক্তিতে কোন কারণে থাকিবে না। সর্ব্বদাই পশ্চাতে আসন গ্রহন করিবে তবে যদি তিনি নিতান্ত অনুরোধ করেন তাহা হইলে তাঁহার আদিষ্ট স্থানে বসিবে। এস্থলে একটি প্রবাদবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আমরা ব্রহ্মা অপেক্ষা বেদের সম্মান বেশি করি। ব্রহ্মার মুখে নিঃসৃত বেদ, ব্রহ্মা অপেক্ষা আমাদের সম্মানের জিনিষ। সেইরূপ অনেক স্থলে গুরুর অপেক্ষা গুরুর আদেশ গুরুতর অর্থাৎ তাঁহার আদেশ সর্ব্বাগ্রে প্রতিপাল্য তাহাতেই তাঁহাদের প্রীতি। সুতরাং তাহাই করা চাই। গুরর সম্মুখে কখন প্রগল্‌ভতা বা বাক্‌-চাতুর্য্য দেখাইবে না। বেশি বাক্যপ্রয়োগ করা নম্রতাসূচক নহে। কোন কথা স্পৃষ্ট হইলে তাহারই উত্তর দিবে, সে উত্তরটা খুব বিনয়ের সহিত দেওয়া উচিত। তাহাতে যেম ঔদ্ধত্যের লেশমাত্রও না থাকে। আর অস্পৃষ্ট হইয়া কোন কথাই কহিবে না। যদি গুরু ও শিষ্য কোন সভাস্থলে আহূত হন, গুরুর বিনা আদেশে শিষ্যের কোন কথা বলা উচিত নহে। নিনান্ত বাধ্য হইয়া বলিতে

হয় সে কথা পৃথক। গুরু শিক্ষক অধ্যাপক প্রভৃতি একপর্য্যায় ভুক্ত। যিনি কখনও শিক্ষা দিয়াছেন বা যাঁহার নিকট কখনও কোন উপদেশ পাইয়াছ তিনি চিরদিনই তোমার গুরু। এ সম্বন্ধে আমার একজন পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তাশীল ব্যক্তির একটি বড় উপদেশপ্রদ কথা স্মরণ পড়িতেছে। তিনি একদিন, একটি দোকানে বসিয়া আছেন এমন সময় একজন ভদ্রবংশের অসৎ লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সসম্মানে "প্রভু, প্রণাম হই" বলিয়া প্রণাম করিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য। পরিণত বয়স্ক জ্ঞানবান শিক্ষক মহাশয় সেই অপরিণত বয়স্ক বিপথগামী যুবককে এত সম্মান দেখাইলেন কেন? এই যুবক এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। শিক্ষকমহাশয় সকলকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, উনি যদি প্রভু না হন তবে প্রভু কে, উনি আমাদিগের শিক্ষাগুরু; মহাপ্রভু, উঁহার নিকট আমরা কি কার্য্যের কি ফল ইহা শিক্ষালাভ করিলাম, সুতরাং ইনি আমার তোমার ও প্রতিবাসীবর্গের সকলেরই উপদেষ্টা গুরু। উঁহাকে প্রভু বলিয়া প্রণাম, না করিলে চলিবে কেন? অপর ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি এক কথা বলিয়াছিলেন তাহা উপস্থিত বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কথাটা ভাল বলিয়া বলিতেছি। তিনি বলিলেন উহাকে তোমরা

ঘৃণা কর কেন? উনি যে অপরাধে অপরাধী সেরূপ অপরাধ কি আর কেহ করে না। আপনার ভিতর অন্বেষণ করিলে অনেকেই জানিতে পারিবেন অনেকেই ঐরূপ দোষে দোষী। তবে ঐ ব্যক্তির দোষ প্রকাশ হইয়াছে, প্রমাণ হইয়াছে, সকলে জানিতে পারিয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। ফলে কিন্তু অনেক প্রভেদ, ঐ ব্যক্তি তাহার কৃত দোষের জন্য রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছে। উহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। উনি নিষ্পাপ। কিন্তু যাহাদের দোষ প্রকাশ হয় নাই, তাহাদের পাপ রহিয়াছে তাহাদের দণ্ড হইবে বলা যায় না। ক্রমে তাহাদের পাপের ভার বাড়িতে চলিয়াছে, তাহাদের উপর তাঁহারা সমাজকে, আপনারা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রকাশ করায়, একরূপ প্রতারণাও করিতেছেন, সুতরাং তাঁহারা বিবিধ রকমে সমাজের নিকট দোষী তাঁহাদের পাপের সীমা নাই। তাঁহাদের সহিত তুলনায় ঐ কারামুক্ত ভদ্রলোকের ছেলে সহস্রগুণে বিশুদ্ধ নিষ্পাপ নয় কি? যে কথার জন্য এই গল্পের অবতারণা' তাহা, আমার প্রাচীন শিক্ষক মহাশয়ের গুরুভক্তি প্রকাশক। তিনি বড়ই চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী লোক ছিলেন। এ প্রকার সাধারণ লোকে হইবে বলিয়া প্রাত্যাশা করা যায় না। অন্ততঃ যাহাকে আমরা সাধারণতঃ শিক্ষা বলি, সেই শিক্ষা যাঁহার যাঁহার নিকট পাইয়াছ পাইতেছ বা পাইবে, সকলকেই তোমার শিক্ষক বা গুরু জ্ঞান করিবে। তাঁহার নিকট চির দিনই সসম্মান ব্যবহার

করিবে। যদি কখন তুমি তাঁহাদের ভিতর কাহারও অপেক্ষা শিক্ষিত বা জ্ঞানী হইতে পার, তাহা তাঁহারই প্রাথমিক সৎশিক্ষার গুণে ও আশীর্ব্বাদে একদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

আজ কয়দিন হইল এক শোক সভায় একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকের প্রগল্‌ভতা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। সভাস্থলে যুবকের পিতা মাতুল, শিক্ষক এবং বহুতর পিতৃবন্ধু ও পিতারও সম্মানিত বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন। যুবক স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া মৃত মহাত্মার জীবন ও চরিত্র হইতে আমরা কত সৎ শিক্ষা পাইতে পারি তাহা বর্ণনা করিয়া সকলকে তাহা অনুকরণ করিতে উপদেশ দিলেন। কথা যে কিছু মন্দ বলিলেন তাহা নহে। তবে যে স্থলে তাঁহার বহুসংখ্যক গুরুলোক সমুপস্থিত যাঁহাদের নিকট তিনি উক্তরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং এখন ইচ্ছা করিলে বহু কাল করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া, এমন কি তাঁহাদের সাক্ষাতে বক্তা অপেক্ষা অল্প বয়স্ক বালক দিগকে উপদেশ দেওয়া একটা বাচালতা ও প্রগল্‌ভতা বলিয়া মনে হইল। এইরূপ গুরুলোকের সাক্ষাতে কখন কাহারও শিক্ষকের স্থান অধিকার করিবে না।

এই যে শিক্ষক বা অধ্যাপকগণকে এত সম্মান ও ভক্তি করিতে বলিতেছি, মনে করিও না ইহার কোন ভাবী উপকারিতা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হওয়া ও উপাধি গ্রহণ করা এ জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নহে এইসকল শিক্ষকের নিকট ভাসাতত্ব, পদার্থ তত্ব, নীতি তত্ব প্রভৃতি যে সকল পার্থিব বিষয়ে শিক্ষা লাভ কর তাহা শিক্ষার প্রথম ও অধস্তন স্তর মাত্র। এই সকল শিক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করিয়া সকলেরই উৎকৃষ্ট বিত্তা অর্থাৎ যে বিত্তা বলে আমরা ভগবানের তত্ব জানিতে পারিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারি সেই ব্রহ্মবিত্তা লাভ করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। চিরদিনই আমাদের দেশে তাহাই রীতি ছিল! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সেইরূপ করিয়া ব্রহ্মবিত্তা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা আপনা হইতে হয় না, তাহাতে গুরু চাই। বিনা শিক্ষকের সাহায্যে সহজে সে বিত্তা লাভ করা যায় না। এই পরা বা ব্রহ্মবিত্তাদাতা গুরুকে আমরা প্রকৃত গুরুপদ বাচ্য বলিয়া মনে করি! এই গুরুকে ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তিরূপে ভাবিতে হইবে। গুরুর বাক্যই সত্য আর সমস্তই জগতে অসত্য। এতটা গুরুর উপর নির্ভর না করিলে ব্রহ্মবিত্তা লাভ হয় না। কিন্তু হঠাৎ গুরুর প্রতি এ প্রকার একান্ত ভক্তি ও নির্ভরতা কি প্রকারে জন্মিতে পারে? সেই জন্য এই জড় জগতের সামান্য বিষয়ের যাঁহারা শিক্ষা দেন সেই সকল গুরুর প্রতি ভক্তি ও নির্ভরভাব অগ্রে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। সুতরাং এই সকল গুরু শিক্ষক বা অধ্যাপকগণকে ভক্তি, ও তাঁহাদের

উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করা ব্রহ্মবিদ্যালাভের অর্থাৎ সামান্য কথায় আমাদের জীবনের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্যের উত্তর সাধক।

অতএব এই সকল শিক্ষক ও উপদেষ্টাগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করায় তোমার ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ উপকারের সম্ভাবনা। এমন উপায়কে উপেক্ষা করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে একটা প্রবাদ বাক্য ছিল, যে তিন প্রকারে বিদ্যালাভ হয়, তাহার প্রথম ও প্রধান উপায় গুরু শুশ্রূষা, দ্বিতীয় উপায় গুরুকে প্রচুর অর্থ দান করা। তৃতীয় বা শেষ উপায় বিদ্যার বিনিময় সাধন করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করা। গুরু শুশ্রূষা আজকাল, একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে; এখন শুশ্রূষার স্থানে যথাযোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রচুর অর্থদান কয়জন করিতে পারেন। সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঁচজনের সঙ্গে বিদ্যাভ্যাসই এখনকার রীতি হইয়াছে। সুতরাং দুই এক স্থলে পুষ্কল ধন দ্বারা বিদ্যাভ্যাসের চেষ্টা থাকিলেও সাধারণতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে না। বিনিময় লব্ধ বিদ্যাতে উভয়ে উভয়ের গুরু। যেখানে বিনিময়ের ভাব সেখানেই যেন ভক্তিশ্রদ্ধার কথা উঠে না। সেখানে ব্যবসাদারের ভাব, গুরু-শিষ্যের ভাব নহে। আমাদের দুইজন বন্ধু আছেন, একজন হিন্দু ও অপর মুসলমান। যিনি হিন্দু তিনি মুসলমানকে সংস্কৃত পড়াইতেন এবং মৌলবী সাহেব হিন্দুকে পারশি

পড়াইতেন। এইরূপে তাঁহারা বিদ্যার বিনিময় করিতেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদিগের ভিতর গুরু শিষ্যের ভাব আদৌ জন্মে নাই, তবে বন্ধুত্ব বেশ জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ বিনিময়ে যে ভাবের উন্মেষ হয় তাহা সাম্য ভাব, তাহাতে উভয়ে উভয়ের সহিত সদ্ভাব স্থাপন হয়। এই তিন উপায়ে বিদ্যালাভ এক্ষণে সাধারণতঃ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কিঞ্চিৎ ধনদান ও বাকিটুকু ভক্তি ও সম্মান দ্বারা পূরণ করিয়া গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করাই এখনকার দিনে সম্ভবপর ও প্রকৃষ্ট উপায়।

সমপাঠিগণের সহিত ব্যবহার। বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষক ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোকের সহিত তোমাদিগকে মিশিতে হয়। ইহাদের সহিত তোমাদের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। ইহারা তোমার সমপাঠি। ইহারা সকলেই ভ্রাতৃস্থানীয়। ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবে। যাহারা তোমার অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় সম্মান করিবে ও ভাল বাসিবে। যাহারা একত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহাদিগকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বোধ করিবে। ইহাদের সহিত সহৃদয়তা সহকারে ব্যবহার করিবে। খুব নিজের লোক বোধ করিবে। লেখা পড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা সত্বেও সর্ব্বদা ইহাদের মঙ্গল কামনা করিবে। ইহাদের আত্মীয়-গণকেও আত্মীয় বোধ করিবে। আর যাহারা তোমার অপেক্ষা কম পড়ে তাহাদিগকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভাল

বাসিবে, তাহাদের যাহাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করিবে গোপনে তাহাদিগকে সদুপদেশ দিবে। কখনও মনে করিও না যে, যে কয়দিন তোমরা বিদ্যালয়ে আছ, ইহাদিগের সহিত তোমার সেই কয়দিনের সম্পর্ক মাত্র। এই সম্পর্ক বহুদূর ব্যাপী ও বহুকাল স্থায়ী। বিদ্যালয়ের সমপাঠীদের সহিত শিক্ষাকালে যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহা অনেক সময় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, কখন পুরুষ পরম্পরা ক্রমে চলিয়া থাকে। এই সকল সহাধ্যায়ীগণের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এই যে সকল বিদ্যার্থী তোমরা একত্র একস্থানে অধ্যয়ন করিতেছ কালে সকলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদবীতে উপনীত হইবে। এখন যাহার সহিত, এবং সকলের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, প্রত্যেকে চিরদিন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবে। যদি কাহারও সহিত কোন মন্দ ব্যবহার কর তাহা হইলে আজীবন তিনি তোমাকে সেই মন্দ ভাবে স্মরণ করিয়া রাখেন। পরে তুমি তাঁহার সহিত সমাজের সহিত যতই কেন সদ্ব্যবহার কর না, সেই যে কবে তুমি বিদ্যালয়ে তাঁহার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলে তাহাই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। তিনি চিরদিনই সেই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবেন। হয়ত তোমার কথা পড়িলে তিনি লোকের কাছে সেই কথা গল্প করিবেন। কোন দূরভিসন্ধি না থাকিলেও তোমার সেই অসদ্ব্যবহারের কথা তিনি কথা উপস্থিত হইলেই বলিবেন। এইরূপে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যখন

দশজন দশদিকে যাইবে, তখন সেই ধারণা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। তোমার ভবিষ্যতের ব্যবহার যতই ভাল হউক না কেন সেই বিদ্যালয়ের ব্যবহারানুসারেই তাঁহাদিগের নিকট, তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট, তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদির নিকট পরিচিত হইবে। অতএব এক্ষণে খুব সাবধান, যেন কোন প্রকার কুব্যবহার কাহারও সহিত না করা হয়। এই সদ্ব্যবহার কেবল ব্যক্তিগত নহে, সাধারণতঃ সকলের নিকট বিনীত, নম্র, সহৃদয় হওয়া চাই।

কাহারও কোন প্রকার তোমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার না থাকে। স্বভাব চরিত্র গঠণের সময়ে বিদ্যালয়ে যেরূপ দেখাইবে, তুমি সেইরূপ স্বভাব চরিত্রের লোক বলিয়া সমাজে পরিচিত হইবে। বিদ্যালয়ের যাহারা তোমা অপেক্ষা অধিক পড়েন তাঁহাদের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সুবিধা মত পাঠাভ্যাস সম্বন্ধে সাহায্য গ্রহণ করিবে। এবং যাহারা তোমা অপেক্ষা কম পড়েন বা কম বুঝেন তাঁহারা তোমার নিকট বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে যখন যে ভাবে সাহায্য প্রার্থী হইবেন সেই ভাবে সাহায্য করিবে। তাহাতে নিজের একটু ক্ষতি-স্বীকার করিতে হয় সে ক্ষতিকে ক্ষতি বোধ করিবে না, ফলে তাহাতে তোমার মহান্ লাভ হইবে। এমন অনেক সময় ঘটে যে তোমার পার্শ্বস্থ ছাত্র হয়ত স্বল্প-দৃষ্টিমান, অধ্যাপক কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ ফলকে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া কোন একটা সূত্র বুঝাইতেছেন, তিনি সে চিত্র দেখিতে না পাওয়ায় ভাল করিয়া বুঝিতেছেন না,

সেরূপ অবস্থায় তুমি তাঁহার খাতায় তাঁহাকে সেই চিত্রটি আঁকিয়া দিলে তাঁহার বুঝিবার সুবিধা হইবে, প্রত্যক্ষে তাঁহার একটি উপকার করিলে, আবার পরোক্ষে তুমি তোমার অধ্যাপকের চিত্রের অনুকরণে তৎক্ষণাৎ আর একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া তোমার শিক্ষার পক্ষেও সুবিধা হইল। হয়ত নূতন একজন অধ্যাপক আসিয়াছেন, তাঁহার উচ্চারণ তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ কিন্তু তোমার সহাধ্যায়ী কেহ কেহ ভাল বুঝিতে পারিতেছেন না অথচ শীলতা রক্ষার জন্য সে কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, সে ক্ষেত্রে অবসর কালে তুমি তোমার বন্ধু সমক্ষে অধ্যাপক মহাশয় যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা আবৃত্তি করিলে তাহাদের সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও বিদ্যাভ্যাসের উৎকর্ষ হইবে। এরূপভাবে সহাধ্যায়ীগণের সাহায্যকারী হইতে কখন কুণ্ঠিত হইবে না। তোমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, তীব্র-মেধা ছাত্রের প্রতি কখন ঈর্ষা করিবে না। সতীর্থদের ভিতর এই ঈর্ষা ভাবটা বড়ই ঘৃণিত। ইহা কিন্তু নূতন নহে। উত্তরচরিতে বাসন্তী ও আত্রেয়ী নাম্নী মহর্ষি বাল্মীকির দুই ছাত্রীর মুখে কবি ভবভূতি ও লব কুশের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তাঁহাদের উভয়ের প্রতি গুরুর পক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সেটা নাটককারের লব কুশের চরিত্রোন্মেষ জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, ভবভূতি সৃষ্টি করিয়া ছাত্রীদ্বয়কে একটু খাট করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহাদের পীড়া হইলে সাধ্যমত সেবা করিবে,

কোন বিষয়ের অভাব হইলে, তোমার যতদূর সাধ্যায়ত্ত সে অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিবে। পূর্ব্বে সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ এত অধিক ছিল, যে সকলেই সকলকে নিজ পরিবার ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠসোদরপ্রতিম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারা-কুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহাদের পাঠদ্দশায় গ্রীষ্মাবকাশে দূর দেশবাসী যে সকল ছাত্র বাটী না গিয়া কলিকাতায় থাকি-তেন, তাঁহারা সকলে কিরূপ আনন্দ সহকারে তাঁহাদের কোদালিয়ার বাটীতে গিয়া অবকাশ কাটাইতেন তাহার গল্প করেন ও পূর্ব্বস্মৃতিজনিত আনন্দ অনুভব করেন। সকলেই তাঁহার জননীকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং অকৃত্রিম মাতৃ-স্নেহানুভব করিতেন। এরূপ পবিত্র আনন্দ ভোগ করা ছাত্র-জীবনেই সম্ভবপর। ইহা বড় আনন্দপ্রদ পবিত্রভাব। ইহাতে হৃদয়ে হৃদয়ে যে পবিত্র প্রণয়ে আবদ্ধ হয়, ভাবী জীবনের দুরূহ সংগ্রামেও তাহা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। পরে হয়ত বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে বিরোধী ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়া উভয়ের মধ্যে অশান্তি আনয়ন করিতে পারে, অন্ততঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেইরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু ছাত্র-জীবনে যদি প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ঘোর সাংসারিক সংঘর্ষের অন্তস্তলে প্রণয়ের শান্তিময় প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া জীবনকে,—সংসারকে আনন্দময় করিয়া তুলিবে। এইরূপ সুখ শান্তির বীজ কিন্তু রোপণ

করিবার সময় এই ছাত্র-জীবন। এখন না করিলে ইহার পর আর হইবে না। সতীর্থগণের ভিতর কেহ কখন তোমার অসন্তোষজনক কার্য্য করিলে তোমার তাহা সহ্য করিতে হইবে, তজ্জন্য তাহার উপর ক্রোধ করিবে না, প্রতিহিংসার কথা কখনও মনে আনিবে না। কেহ তোমার প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিলে, তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে তিনি সেরূপ আর না করেন, তাহাতে ও তিনি প্রতি নিবৃত্ত না হন, সাধারণ বন্ধু অর্থাৎ তোমার ও তাঁহার উভয়েরই যিনি বন্ধু এমত লোকের নিকট সে কথা বলিবে, যে তাঁহার মধ্যস্থতায় তোমার মনো-মালিন্য অপনীত হয়, তাহাতেও কৃতকার্য্য না হও তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু কোনও কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে শিক্ষক বা অধ্যক্ষকে কিছু বলিবে না। এইরূপ অভিযোগ করাটা বড় দোষের কথা, ইহাকে আমি বড় ঘৃণা করি। বিদ্যালয়ের এই সামান্য অভিযোগ সংসারের ঘোরতর গোলযোগের অগ্রসূচী মাত্র। সহ্য করিতে, উপেক্ষা করিতে, নত হইতে, অবশেষে ত্যাগ স্বীকার করিতে এখন হইত শিক্ষা করা উচিত। এখন তোমাদের হৃদয় কমল, অন্তর পবিত্র আছে, এখন যদি ইহা শিক্ষা না কর সংসারের ঘোর স্বার্থপর আবর্ত্তনে পড়িয়া কোথায় ডুবিয়া যাইবে, তোমার স্বভাব চরিত্র, আচার ব্যবহার, বিদ্যাবুদ্ধি অতল জলে ডুবিয়া যাইবে অতএব এই ছাত্রজীবনে বাল্যজীবনের খেলাঘরের মত এই সকল সৎপ্রবৃত্তি যাহাতে উন্মেষ হয় তাহা করা চাই।

সময়ে সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিবাদ হইয়া থাকে তোমাদের বিদ্যালয়ে যে কখন হয় নাই বা হইবে না তাহা সম্ভব নহে। সে ক্ষেত্রে কি করিবে? এরূপ ঘটনা ও শিক্ষার একটি আদর্শ স্থল। পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি, শিক্ষক গুরু অভ্রান্ত, তিনি কিছু অন্যায় করিতে পারেন না, ছাত্রগণ তাঁহার অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেক সময় হিতে বিপরীত করিয়া ফেলে। উভয় পক্ষের অভিপ্রায় উভয়কে শান্তভাবে অবকাশ মত বুঝাইয়া দিলে, অনায়াসে শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে। এইরূপ অবস্থায় ধীর ভাবে মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিবে, অথচ তুমি দশের এক জনই থাকিবে, সহাধ্যায়ীগণ হইতে আপনাকে পৃথক বিবেচনা করিবে না। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষক মহাশয়ের সদভিপ্রায় বুঝাইয়া দিবে। এরূপ ব্যবহারে উভয়ের সৌহার্দ্দ অবিচলিত থাকে এবং শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি ছাত্রগণের ভক্তি ও তাহাদের প্রতি শিক্ষক মহাশয়ের প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহা হইলে তোমার আনন্দানুভূতি হইবে। এই ভাব লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হইলে সমাজের যে কত দূর উপকার সাধন করিতে পারিবে, পরে দেখিতে পাইবে। যাঁহারা সংসারে শান্তির আশা করেন, ভগবান তাঁহাদিগের মঙ্গল করেন।

বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী। বিদ্যালয়ের অপর এক শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে তোমাদিগের সর্ব্বদাই আসিতে হয়।

ইহাঁরা শিক্ষক ও নহেন, সহাধ্যায়ী ও নহেন। ইহার বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী। ইহাঁদিগকেও যথেষ্ট ভক্তি করিবে ইহাঁরাও তোমার শ্রদ্ধার পাত্র। বিদ্যালয়কে যদি পিতার ন্যায় ভক্তি করিতে শিখিয়া থাক তাহা হইলে বিদ্যালয়ের যাঁহারা পরিচর্য্যায় নিরত তাঁহাদিগকে অবশ্যই পিতার পুরাতন কর্ম্মচারিদের যে ভাবে ব্যবহার করিতে হয় সেই ভাবে মান্যের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ভালবাসার সহিত ব্যবহার করা উচিত নয় কি? বাটীতে কি করিয়া থাক, আমার পুরাতন কর্ম্মচারিগণকে চিরদিনই তোমরা জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্বোধন করিয়া থাক, ভয় কর, ভক্তি কর, ভালবাস। বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিগণকেও সেইরূপ ব্যবহার করিবে। এখনও করিবে চিরদিনই করিবে। এ সম্বন্ধে আমার একটি বাল্যের স্মৃতি মনে আসিতেছে। আমার পিতৃদেবের সহিত সময়ে সময়ে আমি হালিসহরে বেড়াইতে যাইতাম। মধ্যে মধ্যে হালিসহরের একজন তৎকালের প্রাচীন অধিবাসী [illegible] গাঙ্গুলি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইত। পিতা ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিতেন আমাকেও প্রণাম করিতে বলিতেন। প্রথমতঃ আমার ধারণা ছিল, গাঙ্গুলি মহাশয় পিতা মহাশয়ের অন্যতম অধ্যাপক, কিন্তু গাঙ্গুলি মহাশয়কে অধ্যাপকের মত কিছুই দেখাইত না। মনে বড় খটকা হইত, কিন্তু সে খটকা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই; পরে শুনিলাম তিনি সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব

কেরাণী ছিলেন। * কেরাণীর প্রতি এ ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম, তখন হইতে কিন্তু সেই ভাবে আমিও বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীগণের সহিত ব্যবহার করিতে শিখিলাম। কথা প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে উক্ত গাঙ্গুলি মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক বড় বড় পণ্ডিত হালিসহরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রবর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, যদুনাথ তর্করত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি কয়েকটি মহোদয় আমাদের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া আমাদের কুটীর পবিত্র করিয়াছিলেন। এত বড় বড় পণ্ডিত কেবল স্বর্গীয় গাঙ্গুলি মহাশয়ের প্রতি ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই শ্রাদ্ধোপলক্ষে হালিসহরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের বিষয় আলোচ্য নহে।

যে কথা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি ও এইরূপ ব্যবহার করা চাই। অধ্যয়ন কালে অর্থাৎ যতদিন বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিবে, একাগ্রভাবে তাহাতে মনোযোগী হইবে। অনন্যমনা হইয়া কোন কার্য্য না করিলে সে কার্য্যে কখন সফল-মনস্কাম হওয়া যায় না। এই যে শত যুবক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন, সেই

* ৺রামধন গাঙ্গুলি মহাশয় অবসর গ্রহণ করার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কালীচরণ গাঙ্গুলি মহাশয় বহুদিন উক্ত কার্য্য করেন এবং পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ননিলাল গাঙ্গুলি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজে কেরাণীগিরি করিতেছেন।

একই অধ্যাপক একই ভাবে সকলকে শিক্ষা দিতেছেন কেবল চিত্তের একাগ্রতা না থাকায় অনেকে সে শিক্ষার ফল লাভ করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বিদ্যাভ্যাস কালে, অন্য কোন বিষয়ে কোন মতে মনোযোগ দিবে না। পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এমন কি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কোন বিষয়ে মনোযোগ দিবে না শিক্ষিতব্য বিষয়ই তোমার একমাত্র পাঠ্য এবং চিন্তার বিষয় হওয়া চাই, তাহার সাহায্যার্থ যে সকল পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে হয় শিক্ষকের উপদেশানুসারে তৎসমুদায় যতদুর সাধ্য অধ্যয়ন ও আয়ত্তাধীন করিবে।

সংবাদ পত্র পাঠ। আজকাল অনেক যুবাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইবার অগ্রেই, খবরের কাগজ পড়িতে দেখিতে পাই। উহাতে আমার আপত্তি আছে। সংবাদ পত্র পাঠ করিলে উপস্থিত সময়ের অনেক সংবাদ সংগ্রহ হয় মাত্র, তাহাতে বিদ্যাচর্চ্চা বাড়ে না, শিক্ষিতব্য বিষয়ের কিছুই সহায়তা করে না। বরং তাহার পরিবর্ত্তে যে সকল সাময়িক পত্রিকায় সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ থাকে তাহা পড়িলে উপকার হয়। সংবাদ পত্রে যে সকল বিষয় লিখিত ও আলোচিত হয় তাহা ছাত্র জীবনে না জানিলে কোন ক্ষতি নাই বরং না জানাই ভাল। মনে কর পৃথিবীর কোন একটি স্থানে বড়ই অন্নকষ্ট হইয়াছে, দলে দলে লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তুমি

এখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, তোমার এমন কিছু আর্থিক সামর্থ নাই যে তুমি তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে পার অথবা তোমার এমন সময় নাই যে তুমি তাহাদের অন্নকষ্ট ও অকাল মৃত্যু নিবারণ জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন ও তৎপক্ষে চেষ্টা করিতে পার, যদি তাহা করিতে চাও তাহা হইলে তোমার বিদ্যাশিক্ষার বিষম বিঘ্ন ঘটিবে। লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এরূপ ঘটনা অনেক ঘটীয়াছে। সেই জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সংবাদ পত্র পাঠ যেন না করেন। যদি বল নিজের জন্য সাময়িক সংবাদ রাখা আবশ্যক; সে ভারটা অভিভাবকের উপর ন্যস্ত করিলে ভাল হয়। ছাত্রগণের কিসে ভাল হইবে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়গণ এবং বাটীতে অভিভাবকগণ দিবানিশি ভাবিতেছেন। তোমাদের অপরিণত বুদ্ধিতে ভাবিয়া তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু হইবে না। শিক্ষকগণের উপর এবং অভিভাবক বর্গের উপর এইরূপে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। উপস্থিত সংবাদ লইয়া তোমার দরকার কি? বিলাতের মহাসভায় স্থিতিশীল বা উন্নতিশীল কোন দল প্রধান, এখানকার শাসনকর্ত্তাগণ কি প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতেছেন, সে বিষয়ে এক্ষণে তোমাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত না করাই ভাল। সংবাদ পত্রে এই সকল রাজনৈতিক বিষয়ে যে ভাবে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিয়া

অনেক সময় মন অস্থির হইয়া উঠে, অথচ তাহার কোন উপায় করিতে পারিবে না।

রাজনৈতিক আন্দোলন—অনর্থক মন চঞ্চল করিয়া নিজ কর্ত্তব্যের হানি করার আবশ্যক কি ? রাজনৈতিক বিষয়ে কি সংবাদ পত্র পাঠে, কি সভা সমিতিতে যোগদান কোন দিকে কোন সংস্পর্শ রাখিবে না। অনর্থক সময় নষ্ট ও মন চঞ্চল করা মাত্র। তাহাতে তোমার পাঠের সমূহ ব্যাঘাত ঘটিবে উহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। রাজা আছেন রাজ প্রতিনিধি আছেন, প্রধান শাসন কর্ত্তাগণ আছেন, প্রধান বিচারালয় আছে, শান্তিরক্ষক বন্দোবস্ত আছে, তাহার উপর আমাদের দেশের চিন্তাশীল শিক্ষিত মহানুভব দেশভক্ত ব্যক্তিগণ আছেন ইহাঁরা সকলে তোমাদের মঙ্গল জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত আছেন, তাহাতে তুমি এখন কিছুদিনের জন্য সে ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা করিলে, বিদ্যাভ্যাসের সুবিধা হইবে। নচেৎ দুইদিকই নষ্ট হইবে। অনেক অপরিণত বয়স্ক যুবক অর্দ্ধ শিক্ষিত অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহাদের নিজের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন ও তদ্বিষয় পাঠ হইতে দূরে থাকিবে। রাজনীতি পাঠে কোন দোষ আছে আমি তাহা বলি না। বিদ্যালয়ে, সমাজ নীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা অধ্যয়ন করিয়া তৎসম্বন্ধে যে জ্ঞান

হইবে তাহা ভাবিকালে কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া অনেক সুফল প্রসব করিবে। রাজনীতি অপরাপর নীতির ন্যায় শিক্ষা সম্বন্ধে বিরোধী নহে। তবে আমার ইচ্ছা যতদিন বিদ্যার্থী থাকিবে দেশের উপস্থিত রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না, আন্দোলন করিবে না। রাজনৈতিক আন্দোলন ভাল কি মন্দ তাহা সাধারণ ভাবে কিছু বলিতেছি না। কেবল ছাত্রদের সম্বন্ধে নিষেধ করিতেছি মাত্র। যখন বিদ্যাভ্যাস শেষ হইলে, নিজে সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, নিজ বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিতে শিখিবে, তখন নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিবে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ভাল বলিয়া মনে হয় করিবে। সময় ও অবস্থার উপর সকলই নির্ভর করে। এক সময়ে যাহা নিসিদ্ধ হয় সময়ান্তরে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। এক অবস্থায় যে নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, অবস্থান্তরে তাহা হয়ত প্রতিপাল্য না হইতে পারে। সংসারের নিয়মই এই।

সামাজিক আন্দোলন—রাজনৈতিক অপেক্ষা সামাজিক বিষয়ে মনোযোগ দিলে বিদ্যাভ্যাসের পক্ষে আরও ব্যাঘাত ঘটে। এখনও তোমরা সমাজের লোক নহ। সমাজের সহিত তোমাদের এক্ষণে সাক্ষাৎ পক্ষে কোন সম্বন্ধ হয় নাই। বিদ্যাভ্যাসরত লোক চিরদিনই অসামাজিক হইয়া থাকেন। "অসামাজিক" আমি কোন মন্দ অর্থে বলিতেছি না। সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিতে গেলে লেখাপড়া হইয়া উঠা কঠিন।

কর ইংরাজ জাতি, যাহারা জাতিভেদ মানে না, একটু ভাল করিয়া তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা পর্য্যাবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে তাহাদের ভিতর গুণ-কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের ছাঁচ বাঁধিতেছে। আবার সম্প্রদায়ের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় জন্মিতেছে। সেখানে বণিক (merchant) ও ব্যবসাদার (trader) বিভিন্ন সম্প্রদায়। তবে সামাজিক নিয়মানুসারে বিভিন্নতা রক্ষার ভিন্ন প্রথা মাত্র, যাহা হউক, পরের কথায় দরকার নাই। পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম, সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনার কার্য্য কর, যখনকার যে কার্য্য তখন সেই কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা কর, তোমার কর্ত্তব্য সাধনে তোমার উপকার হইবে, তুমি যে পরিবারের অন্তর্গত তাহার উপকার হইবে, তোমার দেশের উপকার হইবে, সকল কার্য্যই স্থান ও কাল সাপেক্ষ এক স্থানে বা এক সময়ে এক কথায় যে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, অকালে বা স্থান বিচার না করিলে সহস্র কথায় তাহা হইবে না, সুতরাং এক্ষণে অনর্থক সামাজিক কথার আন্দোলনে যোগ দিয়া তোমার কর্ত্তব্য হানি করিবে না।

ধর্ম্মনীতি—রাজনীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, সামাজিক বিষয়ে যাহা বলিলাম, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে ও ঠিক তাহাই বক্তব্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমার জীবনের তিনটি লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রথম হইতে তাহারই জন্য তোমাদের সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞান। তুমি এক্ষণে কর্ত্তব্য সাধনের প্রথম স্তরে

আছে। অগ্রে এই স্তরের কার্য্য শেষ কর, পরে যখন ধর্ম্মস্তরে উঠিবে, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিবে, কার্য্য করিবে। এক্ষণে বংশগত জাতিগত নিয়ম রক্ষা করিয়া, তাহাকে ধর্ম্ম বলিতে হয় বল, ততটুকু ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য একাগ্রভাবে চেষ্টা করিবে।

উপরে বলিয়াছি বিদ্যা দুই প্রকার, এক বিদ্যা যাহা তুমি এক্ষণে অভ্যাস করিতেছ, সাহিত্য, নীতি, বস্তুতত্ত্বাদি বিষয় পার্থিব বিদ্যা অপর বিদ্যা আধ্যাত্মিক বিদ্যা, যাহা দ্বারা অপার্থিব বিষয়ের জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ ভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়। এতদুভয় বিদ্যা শিক্ষার পারম্পর্য্য আছে। প্রথমে তোমরা এক্ষণে যে বিদ্যাভ্যাস করিতেছ এই পার্থিব অপরা বিদ্যা অর্জ্জন কর। তাহাতে কৃতবিদ্য হইলে অপার্থিব অর্থাৎ পরা বিদ্যাভ্যাস করিবে এবং তখন দেখিতে পাইবে কেমন করিয়া বিদ্যাস্তর হইতে অতর্কিত ভাবে মানুষ ধর্ম্মস্তরে উঠে। এখন হইতে ধর্ম্মের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবে না। নিজের কর্ত্তব্য সাধনই ধর্ম্ম। এক্ষণে তুমি যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ অনন্যমনা হইয়া অভ্যাস করাই তোমার কর্ত্তব্য, সাধনা, তপস্যা। পূর্ব্বে তোমাকে সেই কাশীতে আমাদের যে "ব্রহ্মানন্দ" নামক ব্রহ্মচারীর সহিত আলাপ হয় তাঁহার বিষয় কিছু বলিয়াছি তিনি যে সময়ে ঐ সকল কথা বলেন, সে সময় তুমি তথায় উপস্থিত ছিলে, কিন্তু তখন তুমি অত্যন্ত শিশু তাঁহার বাক্যের অর্থাবগত হইতে

পার নাই। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য যে বিনা বিদ্যায় ধর্ম্ম লাভ হয় না। তাঁহার বিদ্যা ছিল না তিনি ধর্ম্ম সাধনার জন্য কত দেশ ভ্রমন করিলেন, কত সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিলেন কত প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে তিনি ৺কাশীধামে আসিয়া বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এতদিনে বোধ হয় তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে, ধর্ম্ম চর্চ্চায় রত হইয়াছেন। আর একদিনের কথা তোমার বোধ হয় মনে থাকিতে পারে, আমরা যেবার পূজার অবকাশে ৺পুরীধামে সপরিবারে বাস করিতেছিলাম, পরম পবিত্র গোবর্দ্ধন মঠের বর্ত্তমান কর্ত্তা পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ মধুসূদন তীর্থ স্বামী, যিনি এখন ৺শঙ্করাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত, তাঁহার কৃপায় আমরা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতাম। একদিন অপরাহ্ণে আমরা অনেকে বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে ডাকযোগে তাঁহার একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যের নামে একখানি সংবাদপত্র আসিল, স্বামীজী উহা উন্মোচন করিবা মাত্র তদভ্যন্তর হইতে একটী ক্ষুদ্র অস্ত্র বাহির হইল। অস্ত্রখানি দেখিয়াই স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া শিষ্যকে আহ্বান করিলেন। ইত্যবসরে আমাদের বুঝাইয়াছিলেন যে হটযোগীরা উক্ত অস্ত্র সাহায্যে জিহ্বার নিম্নের শিরা ছেদন করিয়া থাকে তাহাতে জিহ্বা উল্টাইয়া গলদেশে দিলে যোগ অভ্যাস সহজে হয়। শিষ্য আসিবামাত্র বলিলেন, তোমার এই

যন্ত্র এই পত্র মধ্যে আসিয়াছে গ্রহণ কর, কিন্তু আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর ইহা কখন ব্যবহার করিবে না। প্রথমে বিদ্যাভ্যাস কর (যোগ শাস্ত্র অধ্যায়ন কর) পরে ধীরে ধীরে যোগভ্যাস করিবে। আমি তোমার গুরু, আমার আদেশ যে তুমি এ প্রকার প্রক্রিয়া করিবে না, ইহাতে ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্ম হয়, যোগভ্যাস এত তাড়াতাড়ির জিনিষ নয়, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, কালে প্রকৃত সময়ে অবশ্যই অভ্যাস হইবে। ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিলেন। তাহা হইতে বুঝা গেল পরম পণ্ডিত ও পরম যোগশীল স্বামীজীর মতে বিদ্যাভ্যাস অগ্রে প্রয়োজন, পরে যোগভ্যাস করিতে হয়। ইহাকেই আমি বলিতে ছিলাম স্তরে স্তরে উঠা। লম্ফদিয়া উঠিতে গেলে পদস্খলন হইবার খুব সম্ভাবনা এবং পদস্খলন হইলে হস্ত পদাদি ভগ্ন হইবার ও খুব সম্ভাবনা। অতএব আস্তে আস্তে যেমন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতেছ তাহাই কর ধর্ম্মের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবে না, তাড়াতাড়ি করিবে না। ধর্ম্ম জিনিষটা ভাল কিন্তু সকল ভাল জিনিষ সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় ভাল হয় না। সময় ও অবস্থা ক্রমে ভাল জিনিষ ও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদেয় এদেশে আমাদের পরম পবিত্র ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ও আচার ব্যবহারের এত খারাপ অবস্থা হইয়াছে কেন? প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে আমরা এত দূরে পড়িয়াছি কেন? যথার্থ ধর্ম্ম তত্ত্ব ছাড়িয়া ভগবৎতত্ত্ব ত্যাগ করিয়া আমরা বৃথা

বাজে জিনিস লইয়া এত ব্যস্ত রহিয়াছি কেন? ইহার একমাত্র উত্তর আমাদের হস্তে ধর্ম্মকর্ম্মের ভার ন্যস্ত হওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য ছিল অধ্যয়ন পরে অধ্যাপনা এবং তৎপরে যজন ও যাজন। ব্রাহ্মণ যেদিন তাহার ব্যতিক্রম করিলেন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া যজন ও যাজনে মন দিলেন; সেই দিন হইতেই আমাদের অধঃপতন। যাজন ত পরের কথা যজন করিবে কে? তাহার তত্ত্বস্থির, বিনা-অধ্যয়নে কিরূপে হইবে গোটাকতক মোটামুটি কথা লিখিয়া লইয়া যজন যজনা চলে না, চলিলে তাহার যে ফল হইবার তাহাই হইয়াছে। শাস্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করা চাই। দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা চাই, তাহার পর ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়া অবশেষে যজন ও যাজন। তাহা না করিয়া "সহর্ঘে" পাঠ করিয়া ভট্টির কয়েকটি শ্লোক, একটু অভিধান বড়জোর অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের একাংশ পড়িয়া তিনি যাজ্য ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ফলে তাহার নিজের কিছু জ্ঞান জন্মিল না, পরকে কি জ্ঞান দিবেন। নিজেই যজন কাহাকে করিতে হয়, কিরূপে করিতে হয় তাহা শিখিলেন না যাজন করিবেন কি করিয়া? সেইজন্যই এখন কার দিনে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সংঘর্ষে আসিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিরা ব্রহ্মণদিগকে আর মানিতে চাহেন না। মান্য পাইবার বস্তু না থাকিলে, কেবল অভিজাত্যাভিমানে কয় দিন আর মান্য পাইতে পারা যায়? ব্রাহ্মণ যে জন্য ভারতে এত

ানা, সকলের পূজ্যছিলেন, ব্রাহ্মণের সে জ্ঞান এখন কোথায়? ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কি ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেই ত ব্রাহ্মণ হয় না। উপনয়ন হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না। তিলক যজ্ঞসূত্রাদি ব্রাহ্মণের বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র কিন্তু অন্তরের সে সার বস্তুটুকু সে ব্রহ্মজ্ঞানটুকু এখন কোথায়? প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য হইতে হইলে সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্রহ্মজ্ঞান আপনা হইতে হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিদ্যা-শিক্ষা করিতে হয়, ব্রহ্মবিদ্যা দর্শন-শাস্ত্র সম্যক পর্য্যালোচনা না করিলে হয় না। আবার দর্শনশাস্ত্র সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ জ্ঞানজনক বস্তুতত্ত্ব ভাষা তত্ত্বাদি শিক্ষা করা চাই। সুতরাং এক্ষণে যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ ইহা ব্রহ্ম বিদ্যা শিক্ষার প্রথম সোপান, ইহা উপেক্ষা করিয়া একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা বৃথা। একদিন ৺ বারনসী ধামে মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীজীর মুখে একটা বড় পরিহাসের কথা শুনিয়াছিলাম :—

একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ তোমাদের কলিকাতার অনেক বাবু এখানে আসিয়াই আমার নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরের গাড়ীতে কলিকাতায় ফেরত যাইতে চাহেন।" কথাটা এত পরিহাস ব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন, যে তাহাতে আমার একটু লজ্জা হইল। কথাটা ঠিক, ব্রহ্মজ্ঞান এত সহজ প্রাপ্য জিনিষ নয়, ইহার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে হয়, অনেক শিক্ষা করিতে হয়, আবার এই দর্শন

শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্বন্ধে একদিন পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ যোগীবিশুদ্ধানন্দ স্বামীজী বলিয়াছলেন, যে আজকাল সকলেই বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং অনেকেই বেদান্ত অধ্যাপনা করেন। দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহা আয়ত্ব করিবার জন্য জমী তৈয়ার করিতে হয়, মস্তিষ্ক সে সকল দুরূহ ভাব গ্রহণোপযুক্ত করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। পড়িলেই হয় না, বা পড়ানও বড় সহজ নহে। এই সকল মহাজন বাক্য স্মরণ করিয়াই আমার ধারণা, সহসা এই কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাহাতে সে সকল কঠিন বিষয় আয়াত্বাধীন হয় না বৃথা শ্রম ও সময় ক্ষেপ মাত্র। তাহা অপেক্ষা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি যদি স্তরে ২ উঠিবার চেষ্টা কর সে সকল কঠিন বিষয় সহজ বোধ্য হইবে, ঠিক ভাবগ্রহ হইবে, অধ্যয়ন সফল হইবে এবং পরিণামে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে। পৌরাণিক ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, সনাতনাদি মহাত্মাগণের কথা পৃথক। যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিশেষ সুকৃতি ফলে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, সে প্রকার মহাত্মাগণ আমাদের হিসাবের বাহিরে। তাঁহাদের সহিত সাধারণ মানবের তুলনা ও চলে না, তাঁহাদের অদৃষ্ট লইয়া কয়জন জন্মিয়াছেন। ভগবান যাঁহাকে বিশেষ কৃপা কটাক্ষ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। আমরা সাধারণ মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথা আলোচনা করিব মাত্র। ঐ সকল মহাত্মাদের কিসে কি হইল তাহা নির্ণয় করা আমার কর্ম্ম নহে তাহাতে আমার সামর্থ্যও নাই।

অনেক সময়ে দেখিয়াছি বিদ্যাভ্যাস কালে অনেক ছাত্র কোন একটা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া সেই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আদরনীয় ধর্ম্মপালনে তৎপর হইয়া বিদ্যাশিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি লাভ হইয়াছে জানিনা। সাক্ষাৎ পক্ষে লেখাপড়ার পথে কণ্টক হইয়াছে, তাঁহাদের নিজের সাংসারিক উন্নতির অবরোধ হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা না নিজের উপকার করিয়াছেন; না তাঁহাদের হইতে সমাজের বা দেশের উপকার সাধিত হইয়াছে। অনেকে চৈতন্যাদি মহাত্মাগণের উদাহরণ দিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে চৈতন্য কিরূপ বিদ্যা-শিক্ষার পর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি যে পথে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা বলিতেছিলাম চৈতন্যদেবের ঠিক সেই পথে স্তরে স্তরে শিক্ষালাভ হইয়াছিল। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যেরও তাহাই, তবে এই সকল মহানুভবগণের সাধারণ জনগণ অপেক্ষা অল্পদিনে বিদ্যালাভ হইয়াছিল। সেটা তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মাত্র, সকলেই কি সেইরূপ অসাধারণ মেধাবী। একের উদাহরণ অপরে প্রয়োগ করিতে হইলে সব উপকরণ গুলি ঠিক থাকা চাই। তাহা না বুঝিয়া হঠাৎ কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে ঢুকিয়া ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা দ্বারা, না ধর্ম্মের উন্নতি হয়, না সমাজের উপকার হয়। হইবার মধ্যে যাহা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি সংসারে অনন্ত কষ্ট ও অপরিসীম লাঞ্ছনা।

এইরূপে কেহ বা বৈষ্ণব দলে কেহ বা থিওসফিষ্ট দলে কেহ বা ব্রাহ্ম সমাজে, কেহ বা রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইয়াছেন। আমি কোন সম্প্রদায় বিশেষ ভাল কি মন্দ তাহা বলিতেছিনা। ধর্ম্মসম্প্রদায় কোনটিই মন্দ নহে। সকল সম্প্রদায়ই ভাল। তবে ভাল মন্দ বিচার করিবার তোমার এখন সময় কোথায়? তুমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহার যে ধর্ম্ম, তাহারই তত্ত্ব কতটুকু জান, কেবল ভাসা ভাসা গোটাকত মোটামুটী কথা দেখিয়া শুনিয়া জানিয়াছ মাত্র। যখন তুমি তাহার ভিতর প্রবেশ কর নাই, তাহার ভাল মন্দ জানিতে পার নাই তখন তাহার সহিত অন্য ধর্ম্মের তারতম্য বিচার কেমন করিয়া করিতে পার? এ সকল বিচার করিতে অনেক পড়িতে হয়, অনেক জানিতে হয়। তাহা তুমি এখন পারিয়া উঠিবে না, কাজে কাজেই তাহাতে তোমার এক্ষণে নিরস্ত থাকাই ভাল। যুবক লেখাপড়ার সময় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়াশুনা ত্যাগ করার জন্য অনেক পিতামাতাকে আক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। সাক্ষাৎ দেবতা পিতামাতা, তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে, তাঁহাদের দুঃখের কারণস্বরূপ পুত্রের ধর্ম্ম চেষ্টায় যে কি ফল হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ইহাতে ধর্ম্ম হয় কি অধর্ম্ম হয় জানি না। ইহা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহাই, ধর্ম্মের ন্যায় ভাল জিনিসের অপব্যবহার।

স্বল্প বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত স্থায়ী হয় না। কয়েক দিন বা কয়েক বৎসর পরে আবার মত

পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একবার যে ধর্ম্মে একজন বিশেষ আস্থা দেখাইলেন, কিছুদিন পরে জ্ঞানবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে বীতরাগ হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বা প্রথমে বংশ পরম্পরা ক্রমে যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন তাহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের বন্ধুবর্গের ভিতর এমত লোক আছেন, তবে সুখের বিষয় ও সৌভাগ্যের কথা যে তাঁহাদের সংখ্যা বড় অধিক নহে। এটা কেবল অল্প শিক্ষার ফল, তারপর যাঁহারা অধিক শিক্ষা লাভ করেন, নিজের ভুল হয়ত নিজেই বুঝিতে পারেন, আর যাঁহারা তাহার পর আর শিক্ষা লাভ করিতে না পারেন, তাঁহারা কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি কর্ম্ম সম্বন্ধে চিরদিনই সকল সমাজের অধোদেশে পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া, সহানুভূতি হয় বটে, শিক্ষালাভ করাও চাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, বোধ হয় আর কিছু বলা আবশ্যক নাই। মোট কথা এখন যাহাতে পাঠে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়, যাহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে, যাহাতে তোমাকে নিজের বিচার বিবেচনা করিতে হইবে, এমন কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে না। সংসার, পরিবার, সমাজ, দেশ সমস্তই যেমন চলিতেছে যতদিন শিক্ষা শেষ না হয়, ততদিন তেমনই চলিতে থাকুক, তুমি যে একজন সংসার মধ্যে, পরিবার মধ্যে বা দেশ মধ্যে আছ ইহা কেহ জানিতে না পারে এমন ভাবে সমাজ চক্ষুর অন্তরালে, নিজ

সময়োচিত কার্য্য অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাস লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক, তাহাতে তোমাকে কেহ নির্ব্বোধ বলে, অসামাজিক বলে, এমন, কি অধার্ম্মিক বলে তাহাতে দুঃখিত হইবে না শাস্ত্রগত প্রাণ মনিষীগণ চিরদিনই এই ভাবে দিন যাপন করিয়াছেন। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের সম্বন্ধে কত কি নির্ব্বুদ্ধিতার গল্প শুনিবে, সেটা তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় নহে, তাঁহার শাস্ত্রে একান্ত নিবিষ্টচিত্ততারই চিহ্ন, ইহা লজ্জার কথা নহে, শ্লাঘার কথা। কেবল এ দেশে কেন সকল দেশেই এমন অনেক মনিষীর কথা শুনা যায়। কিছু দিন হইল সংবাদ পত্রে একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিতের একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি জার্ম্মণির কোনও বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। তাঁহার এক ভগ্নী ভিন্ন আর সংসারে কেহ ছিল না। ভাই ভগ্নী একত্র বাস করিতেন। বহুকাল একটি বাটীতে বাস করিতেন, কিন্তু সে বাটীর সংখ্যা জানিতেন না। একদিন অধ্যাপনার পর বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছেন এমন সময়ে অত্যন্ত বৃষ্টি আসিল, সম্মুখে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী যাইতেছিল তাহার চালক আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে গাড়ী লইয়া কোন রাস্তায় কত সংখ্যক ভবনে লইয়া যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহা বলিতে পারিলেন না। তাহাতে গাড়োয়ান মহাগোলে পড়িল, কোথায় লইয়া যায়, কিছুতেই যখন তিনি নিজ বাটীর ঠিকানা বলিতে পারিলেন না, তখন শকট চালক তাহাকে পাগল স্থির করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে অনুরোধ করিল।

তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ সেখানে তাঁহার একজন পল্লীবাসী ছাত্র তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া শকট চালককে ঠিকানা বলিয়া দিলেন এবং পাছে পথে আরও কোন গোলযোগ হয় তাই সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বাটীতে পৌঁছিয়া দিলেন। উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের সম্বন্ধে আরও একটী গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ভগ্নী তাঁহার বেশি পথ চলিতে হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য যে স্থানে তিনি অধ্যাপনা করিতেন, তাহার নিকটে আবাস গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অধ্যাপক এমনি অন্যমনস্ক যে প্রতিদিন তিনি সেই দূরস্থ পুরাতন বাটীতে গিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আবার নূতন আবাসে আসিতেন। যখন তাঁহার ভগ্নী একদিন নয়, দুইদিন নয়,, এরূপ প্রত্যহই হইতেছে দেখিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতার সাহায্যার্থে সেই দূরস্থ পুরাতন বাটীতে আবার প্রত্যাগমন করিলেন। সেই জর্ম্মাণ অধ্যাপকই বল, আর আমাদের দেশের চলিত গল্পের নৈয়ায়িকদের কথাই বল, একই কথা, যিনি দিবানিশি শাস্ত্রগতপ্রাণ তিনি এ সকল সামান্য কথা কখনও মনে করিতে পারেন না। একটা মন নানা দিকে যায় না। মন এক জিনিষের উপর স্থাপন করিতে না পারিলে তাহাতে কখনও সিদ্ধি লাভ হইবার নহে। এ সম্বন্ধে মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডবদের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার গল্পটি বড় শিক্ষাপ্রদ। দ্রোণাচার্য্য কৌরব ও পাণ্ডবদের সকলকেই অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া-

ছিলেন, পরে কিছুকাল শিক্ষার পর ভীষ্ম মনে করিলেন ইঁহাদের কাহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছে একবার দেখা যাউক। সভা হইল পরীক্ষার্থী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা এবং দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা একত্রিত হইলেন, মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য। পরীক্ষার জন্য দূরস্থ একটি বৃক্ষে একটি কৃত্রিম পক্ষী স্থাপিত হইল। উহার কণ্ঠচ্ছেদ করাই পরীক্ষা। প্রথম যুধিষ্ঠির আহূত হইলেন। যুধিষ্ঠির ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া পক্ষীকে মারিতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময় দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমি সকলই দেখিতেছি, আমি সভাস্থ পার্শ্বস্থ সকলকে বৃক্ষ ও বৃক্ষস্থ পক্ষীকে ও আপনাকে ও ধনুর্ব্বান সকলই দেখিতেছি। ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, তোমার কিছুই শিক্ষা হয় নাই। এইরূপ কেহ বলিলেন, কেবল বৃক্ষই দেখিতেছেন, কেহ বলিলেন, কেবল পক্ষী দেখিতেছেন, তাহাদিগকে ঐরূপ তিরস্কার করার পর অর্জ্জুনকে আহ্বান করিলেন এবং ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায় অর্জ্জুন বলিলেন আমি ছেদ্য পক্ষী-কণ্ঠ ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। তখন দ্রোণাচার্য্য পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমারই শিক্ষা ঠিক হইয়াছে। যে ব্যক্তি লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু দেখে তাহার শিক্ষা হইল কৈ? সুতরাং শিক্ষার একমাত্র উপায় একাগ্রতা অন্য কোন দিকে মন দিলে বিদ্যাভ্যাসের বিষম ত্রুটী হয়। আজ কাল কিন্তু শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ

ও আমাদের মধ্যে অনেক গণ্য মান্য শিক্ষিত বিজ্ঞ মহোদয়গণ ছাত্রদিগের মন তাহাদের শিক্ষণীয় ব্যতীত অপর অনেক দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভাল। ক্রমাগত পাঠ দ্বারা ছাত্রগণের শরীর দুর্ব্বল ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার নিরীহ আমোদ প্রমোদে তাহদিগকে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাহাদের শরীর ও মন ভাল থাকিবে লেখা পড়া ও ভাল হইবে। সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য খুব সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু এ প্রকার ছাত্রদিগের মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করায় তাহাদের পড়াশুনার ক্ষতি হয় কি না, ইহা ভাল করিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক। যুবক-দিগকে উচ্চ শিক্ষার সহায়তা জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহোদয় ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট নামক এক সমিতি করিয়াছেন, তাহাতে সুশিক্ষিত বয়োধিক প্রবীণ লোকের সহিত যুবক ছাত্রবৃন্দ একত্র আসীন হইয়া তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া, তাঁহাদের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কতরূপে উপকৃত হইতেছেন। যুবকগণের আনন্দ-বৰ্দ্ধন জন্য সেখানে নানাবিধ আয়োজন নানা সময়ে হইয়া থাকে! সময়ে সময়ে আবৃত্তিকে সেকালের টোলের অধ্যাপকগণ বড় আদর করিতেন। তাঁহারা এমন কি আবৃত্তি, বোধ অপেক্ষা গরিয়সী বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তত্তদূর ঠিক না হউক আবৃত্তি যে বিদ্যাভ্যাসের পক্ষে সহায়তা করে

তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাহার উপর উচ্চারণ শিক্ষা। ইহাও বড় উপকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমস্তই লিখিয়া হইয়া থাকে। উচ্চারণ পরীক্ষার কোন উপায় নাই। শিক্ষকগণের উচ্চারণাদি পরীক্ষা হইবার নিয়ম হইয়াছে কিন্তু বিদ্যার্থীদের উচ্চারণ শিক্ষা বা পরীক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। ফলে বড় বিষম হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এমন অনেক কৃতবিদ্য যুবক প্রতিষ্ঠাপত্র গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হন যাহাদের উচ্চারণ বড় কদর্য্য অনেক সময়ে ইংরাজেরা তাঁহাদের ইংরাজী উচ্চারণ বুঝিতে পারেন না অপর প্রদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের সংস্কৃত উচ্চারণ বুঝিতে পারেন না। উচ্চারণ যে শিক্ষার একটা অঙ্গ ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, বিশেষ আমাদের দেশে যেখানে মন্ত্র শক্তির প্রভাব সর্ব্বত্র সুপরিজ্ঞাত, এখানে উচ্চারণ বিকার জন্য যে আমাদের কি ক্ষতি হয় তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সেই জন্য আমি চিরদিনই আমাদের প্রদেশে প্রচলিত সংস্কৃত উচ্চারণের বিরোধী। কাশী অঞ্চলে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে ও দ্রাবিড়ে সংস্কৃত যে ভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাতে স্থানে স্থানে একটু একটু বিকৃত হইলে ও আমাদের বঙ্গদেশের সংস্কৃত উচ্চারণ যে প্রকার বিকৃত ও দুষ্ট হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। ইহা বাঙ্গালা-দেশের একটা বড় অখ্যাতির কথা। এখানে হ্রস্ব দীর্ঘ

তেমন স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না, "ন" ও "ণ" দুইটীর উচ্চারণ স্থান বিভিন্ন হইলেও এবং তাহা জানা সত্ত্বেও একরূপই উচ্চারিত হইয়া থাকে। তবে ভারতের অনেক স্থানে "ণ" যে "ড়" রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহাও ঠিক নহে। আমাদের কাছে "য" ও "জ" বিভিন্ন হইলেও একরূপে উচ্চারিত হয়। "শ", "ষ" "স" তিনটির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করি বটে, কিন্তু কার্য্য কালে আমরা তিনটির একরূপই ব্যবস্থা বা অপব্যবহার করিয়া থাকি। বাঙ্গালার বাহিরে আবার অনেক স্থলে "ষ" কোথাও "খ" কোথাও "ছ" রূপে উচ্চারিত হয়, তাহার ও আমি পক্ষপাতী নহি। এইরূপ সংস্কৃতের উচ্চারণ বিভ্রাট যে কত ঘটিয়াছে তাহা বর্ণণাতীত। আক্ষেপের বিষয় এই অশুদ্ধ উচ্চারণ ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া অনেকে আবার উহার পক্ষপাতী। আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু মধ্যে মধ্যে উত্তমরূপে অসংস্কৃত উচ্চারণ জন্য পারিতোষিক দিয়া থাকেন। এরূপ উচ্চারণ দোষ যাহাতে শীঘ্র বিলয় প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য খুব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিত মণ্ডলীর এ বিষয়ে একটু উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক, এবং তোমরা যাহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছ তোমাদের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সদুচ্চারণ শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা দ্বারা অনেক সাহায্য হইতেছে।

বিদ্যার্থীর সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মত বড় বিরুদ্ধ। সঙ্গীত ও একটী বিদ্যা। সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি শাস্ত্র প্রভৃতি অপেক্ষা সঙ্গীত কিছুতেই কম মূল্যবান বা আদরনীয় বিদ্যা নহে, ইহাতে ব্যক্তিগত ও সমাজগত যে উপকার হয় বা হইতে পারে তাহা অপর কোন বিদ্যা দ্বারা তত সহজরূপে হইতে পাবে কিনা সন্দেহ। এত বড় সঙ্গীত বিদ্যাকে একটা অপর বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে, ক্রীড়ার জিনিসরূপে ব্যবহার করা সঙ্গীতবিদ্যার অবমাননা। ইহাতে যে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তোমরা চেষ্টা করিতেছ তাহাতে বিঘ্ন হয় এবং সঙ্গীত ও শিক্ষা হয় না। এক ত বাঙ্গলা দেশে আসিয়া সঙ্গীতটা প্রায়ই আমাদের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া, এখানে সঙ্গীতের অধঃপতন হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে ছাত্রদের ক্রীড়ার পদার্থ করিয়া দিয়া হেয় করা কেন? যদি কোনও ছাত্রের সঙ্গীতের জন্য আগ্রহ থাকে, তিনি উপস্থিত যে বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছেন তাহার সমাপ্তি করিয়া সঙ্গীত শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারেন। ইহাতে মন পবিত্র হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। সাধনার এমন উপায় আর নাই। সেই জন্যই পশ্চিমাঞ্চলে ইহার এত আদর। আমাদের এখানেও স্বর্গীয় রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, দাওয়ানজী মহাশয় প্রভৃতি সাধক মণ্ডলী সঙ্গীত বিদ্যার যথেষ্ট সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। আর সাধারণতঃ আমরা যে সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দানুভব করি

তাহা সঙ্গীতই নহে। তাহা একরূপ শব্দ বিদ্যামাত্র। এ কথা আমি নিজে কিছুই বুঝি না। একদিন ইউনিভার্সিটী ইনস্টিটিউটে একজন মান্দ্রাজী সঙ্গীতাধ্যপক ইহা আমাদের এখানকার সমবেত সঙ্গীতজ্ঞ অনেক মহোদয়ের সাক্ষাতে বিবৃত করেন। সঙ্গীতের ন্যায় গভীর পদার্থকে সামান্য আনন্দ উপভোগের উপকরণ করিয়া তুলিয়া বঙ্গদেশের এই দুরবস্থা হইয়াছে। সেই জন্য আমার ইচ্ছা নয় যে ব্যক্তি সঙ্গীতে সম্যক্ মনোনিবেশ করিতে না পারিবেন তিনি ইহাকে এরূপ হেয় আনন্দকর পদার্থরূপে ব্যবহার না করেন। আরও একটু বিবেচ্য কথা যে যাহারা একটা বিদ্যাভাস করিতেছে, তাহাদের এত আনন্দানুভবের চেষ্টা কেন? তাহাদের নিজের আরাধ্য বিদ্যাই তাহাদিগকে যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিবে। এই সঙ্গে অপর একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। ইংরাজী বিদ্যালয়ের অনুকরণে আজ কাল অনেক সময় ছাত্রগণ আমোদ উপভোগ করিবার জন্য নাটকাভিনয় করিয়া আপনারা আনন্দিত হন অপরকেও আনন্দিত করেন। ইহারও আমি পক্ষপাতী নহি। ইহা চিত্ত সংযমের পক্ষে ঘোর অন্তরায়। আপনি' আনন্দিত হইতে হইলে নাটক পাঠ করিরা তাহার চমৎকারিত্ব সম্যক্ অনুধাধন করিয়াই যথেষ্ট আনন্দানুভব হয়। তাহা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনয় করাটা কেমন মানসিক দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন তিনি একখানি যুদ্ধ সম্বন্ধে পুস্তক (Southey's

life of Nelson) পড়াইতে ছিলেন। ভাষার ঠিক অবস্থা ও ভাব প্রকাশ হইল কিনা সন্দেহ করিয়া তিনি প্রত্যেক যুদ্ধের একটি করিয়া মানচিত্র আঁকিয়া ছাত্র গণকে বুঝাইয়া দিতেন। ভাষায় যাহা চিত্রিত হইয়া সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আবার মানচিত্র কেন? ভাষাদ্বারাই যথেষ্ট ভাব গ্রহণ করিয়াই বুদ্ধিমান পাঠক আমোদ লাভ করেন। কবিরও তাহাতে বেশী কৃতিত্ব। অভিনয় করিয়া বা দেখিয়া আনন্দানুভ করা তাহা অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর আনন্দ, অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান, অশিক্ষিত লোকের জন্য। তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বিদ্যার্থীর কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে চিত্তচাঞ্চল্য হয়, বিদ্যাভ্যাসের একাগ্রতা কমিয়া যায়। অন্ততঃ সাময়িক রূপে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যায়াম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ব্যায়াম অভ্যাস করিতে এখন সকলেই উৎসাহ দিতেছেন। এ সময়ে তাহার প্রতিকূলে বলিতে সাহস হয় না। কেবল যে হাস্যাস্পদ হইব বলিয়া সাহস হয় না, তাহা নহে। পাঁচ জন শিক্ষিত লোকে যাহা ভাল বলেন, তাহা যে আমার মন্দ বোধ হয় সেটা সম্ভবতঃ আমার বুঝিবার ভুল। আমার নিজের মত যে অভ্রান্ত আর সকলে ভ্রান্ত এ কথা বলিলেই বড় নির্ব্বোধের ন্যায় বলা হইবে। তবে এ বিষয় আমার মত অপর পাঁচ জন হইতে কেন ভিন্ন তাহা প্রকাশ করিতেছি। ব্যায়ামের উপকারিতা কি? শরীরের বলাধান করা, পেশি

সকলের উন্নতি সাধন করা এবং বিবিধ প্রকারে দৈহিক বল সঞ্চয় করা। ইহা যে ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাহার পক্ষে ইহা দরকার? যাহারা দৈহিক বলের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে নহে। সেকালের ক্ষত্রিয়গণ মল্লযুদ্ধাদিতে দক্ষ হইবার জন্য ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন। এখনও সিপাহী ও পালোয়া-নেরা রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষা করেন। তাহা ছাড়া শ্রমজীবী লোকে নিজের জীবিকা অর্জ্জন জন্য বাল্যাবধি অঙ্গচালনা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ রাখে। না করিলে চলে না সেইজন্য তাহাদের উহা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের তাহাতে প্রয়োজন কি? আমাদের যাহাতে দীর্ঘজীবন হয় ও শরীর নিরোগ থাকে তাহা করিলেই যথেষ্ট। শরীরে বল থাকা ও দীর্ঘজীবন বা নীরোগ থাকা একই কথা নহে। বলিষ্ঠ লোককেও স্বল্পায়ু হইতে দেখা যায়, আবার বলিষ্ঠ নয় অথচ সুস্থ শরীর লইয়া মানুষ দীর্ঘজীবী হয় তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। অশীতিপর বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় এবং শতাধিক বৎসর বয়স্ক ঘোষাল মহাশয়কে তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। ইঁহারা কেহই বলিষ্ঠ নন্, ইহাঁদের শরীর যে কখন বলবান্ ছিল তাহা বোধ হয় না, অথচ ইহাঁদের শরীরে কোনও রোগ নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় ইহাঁরা এইভাবে আর ও দীর্ঘজীবী হউন, ইহাঁরা আজও নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন।

ঘোষাল মহাশয় ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে প্রতিনিয়ত বাস করেন অথচ তিনি বলেন তাঁহার কখন জ্বর হয় নাই। শরীর সুস্থ রাখিতে পারিলেই ভাল থাকে তাহাতে বড় বেশী কিছু করিতে হয় না। নিয়মিতভাবে চলিলেই শরীর ভাল থাকে। এই প্রবন্ধে যে ভাবে চলিবার উপদেশ দিতেছি বোধ হয় এই ভাবেই চলিলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে। দীর্ঘ জীবন লাভ-করা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তবে মানুষের চেষ্টায় এতটুকু হইতে পারে যে আকস্মিক বিপৎপাতে জীবন নষ্ট না হইলে সুস্থ শরীর থাকিলেই জীবন দীর্ঘ হইতে পারে। সেকালে ব্যায়াম বলিয়া ব্রাহ্মণেরা কিছু জানিতেন না, করিতেন না, অথচ শতায়ু লোকের সংখ্যার ও কম ছিল না। এখন বিবেচ্য, শরীর বলবান্ করা দরকার না কেবল সুস্থ থাকিলেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে, ধনী বা যশস্বী হইতে হইবে, যাহাদের ধন মান মস্তিষ্ক পরিচালনার দ্বায়া উপার্জ্জন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে, দৈহিক বলের দ্বারা নহে, তাহাদের কি কেবল সুস্থ শরীর থাকিলেই চলিবে না। তাঁহাদের দৈহিক যাহা পাশব বা আসুরিক বল বলিলে অন্যায় হয় না সে বলের প্রয়োজন কি?

কোন ব্যক্তি ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, কেহ বা অশ্বদ্বয় যোজিত শকট টানিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, কেহ বা একাকী দশজন আততায়ীর সহিত যুদ্ধ

করিয়া পদক্ষিপ্ত বর্ত্তুলক্রীড়া বা মল্লযুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন, ইত্যাদি কথা অনেক সময় শুনা যায় এবং শুনিয়া সকলে বড় আনন্দিত হইয়া থাকেন। সমাজে সে শ্রেণীর লোক থাকাও দরকার। কিন্তু তাহা বলিয়া কি সকলকেই সেই শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে? সকলকেই কি দৈহিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। চিন্তাশীললোকের যাহাতে বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হয়, মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকে, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমাদের সমাজের মধ্যে অধুনাতন কালে অনেক অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মনিষী আছেন যাঁহারা বাল্যে বা যৌবনে ব্যায়াম করেন নাই। তাঁহাদের বাল্যকালে বা যৌবনে ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন কথাই বোধ হয় উঠে নাই। অথচ তাঁহারা এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, স্বীকার করিতেই হইবে তাঁহারা চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রতিনিয়তই দিতেছেন তাহাই আমার পক্ষে উপস্থিত কথার যথেষ্ট প্রমাণ। এ সকল জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া আমি কোথায় বলবান্ চিন্তাশীল বৃদ্ধ খুঁজিয়া বেড়াইব। আমার স্বর্গীয় পিতামহাশয়ের কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি তিনি ৯৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি একজন স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি তিনি কোন গ্রন্থ না দেখিয়া স্মৃতি শাস্ত্রের কোথায় কি আছে, নখদর্পণের ন্যায় বলিতে পারিতেন, কেবল তাহাই নহে কোন্ গ্রন্থের কোন্

টীকায় কে কি বলিয়াছেন তাহা পুস্তকাদির বিনা সাহায্যে বলিতে পারিতেন, আর তাঁহার পুরাণাবৃত্তির ক্ষমতা অপরিসীম ছিল। এ সকল লোক কখন ব্যায়াম অভ্যাস করিয়াছিলেন কি? আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—না। শারীরিক বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তির হ্রাস হয় কি না? বুদ্ধি ও শারীরিক বলের ভিতর কেমন যেন একটা বিপরীত অনুপাত (inverse ratio) আছে বলিয়া মনে হয়। শারীরিক বল না থাকিলেও মানুষ বুদ্ধিমান হইতে পারে, কিন্তু ইহার বিপরীতটা সত্য নহে যে শারীরিক বল না থাকিলেই বুদ্ধিমান হইতে পারে অথবা বুদ্ধিমান হইলেই তাহাকে হীন বল হইতে হইবে। সুস্থ শরীরে যাহার যতটুক বল থাকা সম্ভব ততটুকু বল থাকা চাই, তাহার কম হইলে তাহাকে দুর্ব্বল বলিতে হইবে, ইহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। ব্যায়াম সম্বন্ধে এত কথা বলিতাম না, তবে যখন একদিকে দেখিতেছি যে ব্যায়াম করিতে গিয়া অনেকের অনেক বিপৎ-পাত ও অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, যখন দেখিতেছি ব্যায়ামকারী যুবক প্রৌঢ়ে ব্যায়াম ছাড়িয়া দিয়া নানারূপে রোগাক্লিষ্ট হইতেছেন, অথচ বিনা ব্যায়ামে নিয়মিত রূপে চলিলে শরীর বেশ সুস্থ থাকে, তবে ব্যায়ামের পক্ষপাতী কেমন করিয়া হইতে পারি। আমরা যখন বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পড়িতাম ১৮৭২ কি ১৮৭৩ সালে, তখন সার জর্জ্জ কেম্বল সাহেব বাঙ্গালার ছোটলাট, তিনি হুগলি কলেজে ডেপুটী ও সব-

ডেপুটী গিরির উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করিবার জন্য "শিবিল সার্ব্বিস ক্লাস" নাম দিয়া কয়েকজন ছাত্রকে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিত করান। সেই শিক্ষার নানা অঙ্গ ছিল, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম শিক্ষণীয় ও পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল, যাঁহারা মফঃস্বলে এই সকল কার্য্যের প্রয়াসী হইতেন তাঁহাদিগকে উক্ত সমস্ত কার্য্যে পটুতা দেখান প্রয়োজন বলিয়াই তদনীন্তন ছোটলাট বাহাদুর ব্যায়াম ও তাহার অপরাপর অঙ্গের সৃষ্টি করেন। এখনও যাঁহারা ঐরূপ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল কার্য্য দরকার হইতে পারে। শুনিয়াছি বেশ বলিষ্ঠ শরীর না হইলে শান্তি রক্ষা (Police) বিভাগে নাকি চাকরী মিলে না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যাহাদের জীবিকা অর্জ্জন জন্য শারীরিক বল আবশ্যক তাঁহারা তাহার চেষ্টা করুন, ব্যায়াম করুন, ঘোড়ায় চড়ুন, আর ও কত কি করিতে হয় করুন। কিন্তু তাহা সকলের জন্য নহে। ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণের উপযুক্ত উপজীবিকা অর্থাৎ কেবল বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা যাহাদিগকে জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে তাহাদের শরীরে বলের ও আবশ্যক নাই, ব্যায়ামের ও দরকার নাই। আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে জীবিকার্জ্জন জীবনের উদ্দেশ্য নহে, ইহা সামান্য সাময়িক প্রয়োজন মাত্র। পূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি আবার বলি ব্রাহ্মণ চান কি? ব্রাহ্মণ চান বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞান এবং জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল মোক্ষ।

ক্রমে ছোট হইতে বড় কথা হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য বোধ হয় স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে; ব্যায়াম তোমার পক্ষে আবশ্যক নহে সুতরাং তাহা কর্ত্তব্য নহে, তবে যদি বিদ্যালয়ের শাসনাধীনে কিছু করিতে হয় তাহা অবশ্য করিবে, কারণ নিয়ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য, নিয়ম লঙ্ঘনটা মহা দোষ।

গৃহ প্রত্যাগমন। বিদ্যালয় হইতে বাটী ফিরিয়া আসিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া তোমার জননী যাহা কিছু খাইতে দেন তাহা আহার করিয়া অল্প-কিছুকাল বিশ্রাম স্বরূপ তোমার ছোট ছোট ভাই ভগ্নী বা ভাগিনেয় প্রভৃতি যাহারা বাটীতে আছে, তাহাদের লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে। সমস্ত দিন নিজের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে যাহারা স্নেহ ও যত্নের পাত্র, যাহারা তোমার নিকট স্নেহ ও যত্ন পাইলে সুখ বোধ করিবে, তাহারা মনোক্ষুণ্ণ হইতে পারে এবং এইরূপ ক্রমাগত বেশী দিন ধরিয়া হইলে পর, তোমার স্নেহ ও যত্নের সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিপরীত ভাবের উদ্রেক হইতে পারে, তাহাতে ক্রমশঃ আত্মীয়গণের মনের ভাব বা সাময়িক অবস্থা না বুঝিয়া ভালবাসা কমিয়া যাইতে পারে। এই এক কথা, সর্ব্বদা পড়াশুনা করিয়া মনে সময়ে সময়ে যাহাতে একটু আনন্দ হয় অথচ মন বেশী আকৃষ্ট বা যুক্ত না থাকে এমন একটা কার্য্য অন্বেষণ করিয়া সেই সময়ে এই সকল সরলতার মূর্ত্তিস্বরূপ ছোট ছোট

বালক বালিকাগণ লইয়া তাহাদের মত হইয়া, সেইরূপ সরল শৈশব ভাবে কিছু সময় কাটান বড় ভাল। খেলার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অকপট ব্যবহার দেখিয়া যে সরলতা পরে সংসারে প্রবেশ করিয়া বড় বেশী খুঁজিয়া পাইবে না তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পার। সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া উচিত নহে। আরও এক কথা, যে ব্যায়াম সম্বন্ধে উপরে এত কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্যও কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। তুমি মধ্যে মধ্যে আমোদ করিয়া ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদের যেরূপ স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে করিয়া দৌড়াদৌড়ি কর তাহাতে তোমার ও তাহাদের যথেষ্ট অঙ্গ চালনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমোদও হয়। তাহারা তোমার সঙ্গ ও আদর পাইয়া আহ্লাদে গলিয়া যায়, তুমি তাহাদের আমোদে খুব আমন্দিত হও। এইরূপে তুমি যখন তাহাদের লইয়া খেলা কর এবং তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আনন্দ ধ্বনি করে, শুনিলে সকলেরই আনন্দ হয়। এইরূপ ক্রীড়া সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। এইরূপ ক্ষণকাল ক্রীড়া কৌতুক উপভোগ করিয়া যদি সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব থাকে সে সময়টা কিছু কিছু পড়াশুনা করিবে।—

সায়ংকৃত্য। পরে সন্ধ্যার সময় সায়ং সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। সায়ংসন্ধ্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। আমাদের গ্রাম হালিসহর ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। আমরা বাল্যে দেখিতাম, গ্রামের যত ব্রাহ্মণ

বাঁধা ঘাটের ধারে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক বাঁধা ঘাটে অনেক ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যা করিতে দেখা যাইত। ৺কাশীধামে দশাশ্বমেধ ও তৎ পার্শ্বস্থ অহল্যা-বাইয়ের ঘাটের ও মুন্সীঘাটের সান্ধ্যদৃশ্যও তদ্রূপ। প্রত্যেক ঘাটে কত ব্রাহ্মণ একত্র বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতেছেন। এইরূপ গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা করার প্রথা পূর্ব্বে ছিল। প্রথাটি বড় ভাল। সমস্ত দিনের নানারূপ কার্য্য করিয়া সন্ধ্যাকালে পবিত্র মনে গঙ্গার নির্ম্মল বায়ু সেবন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার পবিত্র জলে সন্ধ্যা ক্রিয়া সমাপন করাতে দেহ মন উভয়ই পবিত্র হয়, কেমন একটা শান্তি, শরীর ও মনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া একত্র অনেক বর্ষীয়ান্, প্রৌঢ়, যুবা ও বালকের এক সাধু উদ্দেশ্যে একত্র সমাবেশ একটা বড় মঙ্গলকর অনুষ্ঠান। ইহাতে পরস্পর এক মতাবলম্বী অনেক লোকের ভিতর বেশ একটু সহানুভূতি হয়, স্নেহ ভালবাসা জন্মে। বিভিন্ন বয়সের লোকের ভিতর ঐরূপ সদ্ভাব উভয়ের পক্ষেই হিতকর। এই সকল ভাবিয়া মনে হয় যদি প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গাতীরে গিয়া গঙ্গার তীরে সন্ধ্যা করিয়া আসিতে পার ভাল হয়। ইহাতে গঙ্গাতীরে যাতায়ত জনিত একটু পরিশ্রম হয়, তাহাতে এখনকার কালের নিরুদ্দেশ্যে বা সান্ধ্যোদ্দেশ্যে সান্ধ্য ভ্রমণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে, অথচ তোমার একটী প্রাত্যহিক কার্য্য নিয়মিত ভাবে নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে।

অনেক ব্রাহ্মণ আজকাল সন্ধ্যার সময় মাঠে ও পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সায়ং-সন্ধ্যার কাল অতিক্রম করিয়া বাটীতে আসিয়া সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি সন্ধ্যাকালে গঙ্গার ঘাটে গিয়া সন্ধ্যা করিয়া আসেন তাঁহাদের বেড়ানও হয় যথাকালে গঙ্গার পবিত্র জলে, গঙ্গার সুবিমল, সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে সন্ধ্যাও করিতে পারেন। এরূপ ভাবে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলে সকল দিকই রক্ষা হইতে পারে।—

সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে পাঠাভ্যাস করিবে। অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠাভ্যাস করা স্বাস্থ্যহানিকর, তাহা কখন করিবে না। ঠিক নিয়মিত একসময়ে সন্ধ্যার পর আহার করিবে। আহার সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তৎসমস্ত স্মরণ রাখিবে। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত কম খাওয়া কর্ত্তব্য এবং গুরুপাক জিনিস যত কম আহার হয় ততই ভাল। আহারান্তে যদি পড়াশুনা করার অভ্যাস থাকে তাহা করিবে, তবে কখন রাত্রি দশটার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িবে না। দশটার সময় শয়ন করিবার চেষ্টা করিবে। তবে এক কথা মনে রাখিবে, নিদ্রার চেষ্টা না হইলে, শয্যা গ্রহণ করিবে না। যেমন আহারের পূর্ব্বে ক্ষুধা হওয়া চাই, পানের পূর্ব্বে তৃষ্ণা হওয়া চাই, সেইরূপ শয়নের পূর্ব্বেই নিদ্রালু হওয়া চাই। নিদ্রা হইতেছে না, অথচ শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করার মত স্বাস্থ্যহানিতার

লক্ষণ আর কিছুই নাই। নিদ্রা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে শয্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। শয্যার পরিপাট্য বিলাসের লক্ষণ। শয্যা যত কম হইবে, যত সামান্য হইবে ততই ভাল। বিদ্যার্থীর পক্ষে পরিষ্কার শুষ্ক ভূমির উপর যাহা কিছু হয় একটা আস্তরণ ও একটা বালিশ হইলেই যথেষ্ট শয্যা মনে করা চাই। যদি ভূমি বেশ পরিষ্কার ও শুষ্ক না হয় তাহা হইলে খাট কি তক্তাপোষের উপরে শয্যা করা কর্ত্তব্য। ভূমি পরিষ্কার ও শুষ্ক কিনা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। অপরিষ্কৃত বা সজল বা সরস ভূমিতে শয্যা করিলে শীঘ্রই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। শয্যার পারিপাট্য বিলাসের লক্ষণ বলিয়াছি। কিন্তু পরিষ্কার শয্যা পারিপাট্যের লক্ষণ নয়। নিতান্ত কোমল শয্যায় প্রতিনিয়ত শয়ন করা উচিত নহে, বিশেষতঃ তোমাদের পক্ষে। আহারের যেমন স্থালীর বিষয় কম বিবেচ্য। স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রেই খাও আর কাংস বা পিত্তল পাত্রেই খাও অথবা কলাপাতায় বা শাল পাতাতেই খাও, ক্ষুধা না থাকিলে যাহাতে আহার কর মিষ্টলাগে না, আর ক্ষুধিতাবস্থায় যে কোন পাত্রে খাও সমান মিষ্টই লাগে, শয্যা সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। যদি নিদ্রালু হইয়া থাক যে কোন শয্যায় শুইলেই সুনিদ্রা হইবে, নচেৎ যেমন অনেক নিষ্কর্ম্মা বিলাসীলোকের হইয়া থাকে, দুগ্ধফেন-নিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়।

চিকিৎসকদের নিকট শুনিয়াছি নাকি শক্ত শয্যায় শয়ন অভ্যাস থাকিলে অনেক পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। তাহা হউক বা নাই হউক শক্ত শয্যায় শয়ন অভ্যাস বড় উপকারী এ সম্বন্ধে এই সময়ে জীবনের এক দিনের একটি গল্প বলিতেছি। আমি কয়েকজন বন্ধুসহ একবার শীতকালে মফঃস্বলের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিতে গিয়াছিলাম। আমরা অনেকে গিয়াছিলাম তন্মধ্যে একজন কেবল জীবিত নাই, তিনি সুবিখ্যাত লেখক ৺পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, অপর যে কয়জন গিয়া ছিলেন সকলেই জীবিত আছেন। আমাদের সকলেরই উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়ের প্রশস্ত বৈঠকখানায় রাত্রি যাপন করিবার আয়োজন হইয়াছিল। বৈঠকখানায় আগা-গোড়া তক্তপোষ পাতা তাহার উপর শতরঞ্চ এবং তদুপরে পরিষ্কার চাদর বিস্তৃত। শয়নের জন্য গৃহস্বামী আমাদের দশ বার জনকে এক একটি করিয়া বালিশ ও লেপ দিয়াছিলেন। আমি কিছু কাল নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া দেখি আমার পার্শ্বে আমার একজন বন্ধু ছট্‌ফট্ করিতেছেন ও জাগিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলাম তিনি মোটেই নিদ্রা যান নাই কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, যে কোন বিছানা পাতা না থাকায় শক্ত শয্যায় তাঁহার নিদ্রা হয় না। আমার লেপটি তাঁহাকে পাতিবার জন্য দিতে চাহিলাম। কারণ বাকি যে টুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল, গাত্রবস্ত্র

যাহা ছিল তাহাতেই যথেষ্ট শীত নিবারণ হইত। তিনি কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে তাহা লইলেন না, কিন্তু তাঁহার মোটেই নিদ্রা হইল না। তাঁহার কষ্ট দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অভ্যাসের জন্য মানুষের একই অবস্থায় কিরূপে সুখ ও দুঃখের তারতম্য হয় দেখিলাম। যাঁহারা শক্ত শয্যায় শয়ন অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহাদের কোমল শয্যায় শয়নে কখনও কষ্ট বোধ হয় না, কিন্তু বিপরীত অভ্যাসাপন্ন লোকের অবস্থান্তর হইলে কি বিষম কষ্ট। সেই জন্য সংসারিক ভাবে দেখিলে ও শক্ত শয্যায় শয়নাভ্যাস করা ভাল। নিদ্রা হেয় জিনিস নয়! ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি মানুষের নৈসর্গিক বৃত্তি। ইহা অপকৃষ্ট বস্তু নহে। কিন্তু এই সকল বৃত্তিকে চিরদিনই সাবধানে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও লোভ লালসার প্রভেদ বুঝিতে পারা চাই। যতটুকু পানাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ জন্য ঠিক তাহাই ব্যবহার করা চাই। তদতিরিক্ত যাহা আহার বা পানকরা যায় তাহা লোভ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া করিতে হয়, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধিক সুমিষ্ট উপকরণের উপরোধে অধিক আহার করা বা সুমিষ্ট ও সুঘ্রানযুক্ত পেয় বলিয়া অধিক পরিমাণে পান করা তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য নহে, ইহা লোভ লালসার পরিচয় মাত্র। আমার একজন বন্ধু আছেন, তিনি যৌবনে একটি নিয়ম করিয়া আহার করিতে বলিতেন। ভোজনের সময় তাঁহাকে যাহা কিছু দেয় সমস্ত এককালে দিতে হইত।

তিনি অগ্রে সমস্ত ব্যঞ্জনাদি আহার করিতেন, পরে কেবল মাত্র লবণোপকরণে ভাত খাইতেন। তিনি বলিতেন ইহাতে ঠিক ক্ষুধার পরিমাণ মত আহার করা হয়। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ আচরণের জন্য অনেকে অনেকরূপ ব্যঙ্গ করিতেন কেহ কেহ পাগল বলিয়া শ্লেষ করিতেও ত্রুটী করিতেন না। আমি এরূপ করিতে কাহাকেও বলি না, তবে ক্ষুধা তৃষ্ণার অতিরিক্ত পানাহার যে দোষযুক্ত তাহাই বলিতেছি। ক্ষুধা তৃষ্ণানুযায়ী পানাহার যেমন প্রয়োজন, নিদ্রার পরিমাণানুসারে শয়ন ও তদ্রূপ আবশ্যক, চেষ্টা করিয়া অধিকক্ষণ নিদ্রা যাইবার প্রয়াসকে জাড্য বা আলস্য বলা যাইতে পারে, ইহা ব্যসন মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু তাহা নিদ্রা নহে। শয্যাগ্রহণ কালে ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিদ্রা যাইবে। নিদ্রার কাল ছয় ঘণ্টা হইলেই চলিবে। ইহা আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত। রীতিমত সকল কালেই রাত্রি দশটার সময় হইতে ৪টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইলেই যথেষ্ট শ্রান্তি দূর হয়। ইহা অপেক্ষা কম করা উচিত নয়। অনেক ছাত্র পরীক্ষার সময় অধিক রাত্রি জাগরণ করেন। সেটা তাঁহাদের বড় অন্যায় তাহাতে স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে। যদি প্রত্যহ নিয়ত ছয় ঘণ্টা করিয়া নিদ্রা যাওয়া হয় এবং অবশিষ্ট সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে অধিক রাত্রি জাগিয়া স্বাস্থ্যহানি করিতে হয় না। অধিক রাত্রিতে পাঠ করিয়া বিশেষ যে কিছু ফল হয়, তাহা বোধ

হয় না। যখন পৃথিবী বাহিরে তমসাচ্ছন্ন থাকে, তখন মানুষের বুদ্ধি ও কেমন যেন এক রকম তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, ভাল ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না, বরং অনেক অসৎ ভাবের উদ্রেক হয়। সূর্য্যের সহিত আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির কি যেন একটা সম্বন্ধ আছে। সেই জন্যই বোধ হয় আমরা সূর্য্যোদয় হইতেই সূর্য্যের উপাসনা আরম্ভ করি। সূর্য্যের সহিত শরীরের যে বিশেষ সম্বন্ধ তাহা যিনি যে কোন পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন তিনিই বুঝিবেন, সকল পীড়ার আতিশয্যই রাত্রিতে। যত কিছু যন্ত্রণা রাত্রিতে উপলব্ধি হয়। সাধারণতঃ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দেব দেবীর পূজা বিশেষ উপলক্ষ ভিন্ন রাত্রিতে নিষিদ্ধ। রাত্রিতে আমাদের বুদ্ধি বাহিরের পৃথিবীর ন্যায় তমসাচ্ছন্ন থাকে সদ্‌বৃত্তির উদ্রেকের উপযুক্ত সময় নয় বলিয়াই, বোধ হয় সৎকর্ম্মের নিষেধ হইয়াছে। সেই জন্য বলিতেছি যখন সৎবুদ্ধির উন্মেষ না হইবারই কথা সে সময় বিদ্যা বুদ্ধির কাজ না করাই ভাল। সে সময় নিদ্রা যাইয়া শরীরের সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর করাই কর্ত্তব্য। ইহা নৈসর্গিক নিয়ম। ইহা জানিয়া চলাই ভাল।

সাধারণতঃ শয্যাত্যাগ হইতে পুনঃ শয্যাগ্রহণ কাল পর্য্যন্ত যাহা যাহা কর্ত্তব্য স্থূল ভাবে তাহা বলা হইল; কিন্তু একটা বিষয় এখনও বলিতে বাকি আছে তাহা বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের শেষ করিবার ইচ্ছা। উপরে

যাহা বলিলাম যখন বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে অর্থাৎ যে দিন অবকাশ না থাকিবে সেই সকল দিনের জন্য, রবিবার ও অপরাপর অবকাশের দিনে কি কার্য্য করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যে সময় তোমার অবকাশ থাকিবে কেবল এক গ্রীষ্মাবকাশ ছাড়া প্রায় সেই সময়ে আমারও অবকাশ থাকে। আহারান্তে অবকাশের দিনে বাঙ্গলা সাহিত্যানুশীলন করিবে। নূতন ও প্রাচীন গ্রন্থকারগণের রচনা পাঠ করিবে। তাহা ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ গুলি ও যাহা সাধ্য পাঠ করিবে, ইহাদের অধিকাংশই বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, বাস্তবিক ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ৺হেম চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণ প্রভৃতি অনুবাদ অতি চমৎকার ও সাহিত্য শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল পুরাণাদি পাঠ ব্যতীত বঙ্গ সাহিত্যে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে ও হইতেছে, সময়ে সময়ে যত্ন পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিবে। কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিবে। ইংরাজিতে যে কোন ভাল ভাব সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা আয়ত্বাধীন হইল কিনা বুঝিবার জন্য বাঙ্গালা প্রবন্ধাকারে তাহা লিখিবে। এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়া তোমার অধ্যাপকগণের মধ্যে যাঁহার যখন অবকাশ থাকে, তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া দিবার জন্য বলিবে। আমার বন্ধুবর্গের ভিতর

অনেক গুলি খ্যাতনামা বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ মনিষী আছেন, তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহারা দয়া করিয়া তোমার প্রবন্ধগুলি সংশোধন করিয়া দিতে পারেন। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার জনৈক হিতৈষী সাহেব বন্ধু যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহা স্মরণ করাইতেছি। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড় মান্য করিতেন বলিয়া উপদেশ দেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত যথেষ্ট জানেন অনেক পড়িয়াছেন, এখন "ইংরাজী পড়ুন ও বাঙ্গালা লিখুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাহাই করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি প্রভূত পরিমাণে ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে কি তিনি যেরূপ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন কয় জন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ইংরাজীওয়ালা লব্ধ প্রতিষ্ঠ লোক তাহা পড়িয়াছেন। তিনি কিন্তু লিখিতেন বাঙ্গালা। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই অনুবাদ। সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থের ভাব, সংস্কৃত ছাঁচে ঢালা। বাঙ্গালা ভাষায় কি সুন্দর রূপেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশের মাহাত্ম্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবী হইয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যই তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে। তাঁহার অসাধারণ দানশীলতা, সহৃদয়তা, পরোপকার-স্পৃহা, তাঁহার সে জগৎজোড়া ভালবাসা, তাঁহার সে অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, স্বাধীন চিত্ত, নির্ভীক নির্লোভ হৃদয়

সকলই কালে মানুষ ভুলিয়া যাইবে, তাঁহার জীবন চরিত্র লেখক গণের প্রভূত প্রয়াস সত্ত্বে ও, তৈল চিত্রের ছবি ও প্রস্তরের বিকৃতাকৃতি প্রতিমূর্ত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে লোকে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু যাঁহারা বঙ্গ সাহিত্য পাঠ করিবেন, বঙ্গভাষা যতদিন সজীব থাকিবে, ততদিন, সেই উদার উপদেশের বলে, সেই "ইংরাজী অধ্যয়ন ও বাঙ্গালা রচনার গুণে তিনি চিরজীবী থাকিবেন। আমি ও তোমাকে সেই মহৎ উপদেশের অনুকরণে বলি, সংস্কৃত ও ইংরাজী অধ্যয়ন কর এবং যেটি যেখানে ভাল ভাব দেখিবে, যেমন সুপুত্র দেশ ভ্রমণে গিয়া যেখানে যেটি ভাল জিনিস পায় পিতা মাতার জন্য বাটীতে আনয়ন করে, তুমি সেইরূপ বঙ্গভাষা জননীর হস্তে আনিয়া দিবে। এখন হইতে এই দিকে লক্ষ্য থাকিলে ভবিষ্যতে অনেক কার্য্য করিতে পারিবে। এইরূপ অবকাশকালে বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিবিধ পরিচর্য্যা করিবে। সময় পাইলে অবকাশকালে যখন আমারও অবকাশ থাকিবে, আমার নিকট উপস্থিত থাকিবে, তাহাতে আমার নিকট যাঁহারা সর্ব্বদা আইসেন, আমাকে যাঁহারা দয়া করেন, ভাল বাসেন, তাঁহাদের সহিত তোমার পরিচয় হইতে পারিবে। আমার বন্ধুগণকে তোমার জানা আবশ্যক। আমার বন্ধুগণ সকলেই পিতৃস্থানীয়, পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাঁহারাও তাহা হইলে তোমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিবেন,

তোমার মঙ্গল কামনায় নিরত থাকিবেন। তাঁহাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদই তোমার জীবনে সুখ সচ্ছন্দের প্রধান কারণ জানিবে।

গ্রীষ্মবকাশ অতি দীর্ঘ। এই সময় তুমি হালিসহরের বাটীতে অপরাপর পরিবার বর্গের সহিত বাস করিবে। সেখানে কিন্তু তোমার নিয়মিত ক্রিয়া উপরে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা ঠিক রাখা চাই। অধিকন্তু অপরাহ্নে যে সময় তোমাকে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া ছোট ছোট ভাই ভগিনী প্রভৃতি লইয়া নির্দ্দোষভাবে ক্রীড়া করিতে বলিতেছি, সেইটির একটু অধিক পরিসর করিয়া দিবে। সেখানে গিয়া নিজ পরিবার ছাড়া পল্লীস্থ সকল বালক বালিকা লইয়া ক্রীড়া করিবে। ক্রীড়াটা অবস্থানুসারে যাহাতে সকলের মনোমত হয় সেইরূপ করিবে। পাড়ার আগাছা জঙ্গল কাটা, মাটী খুড়িয়া বাগান করা, বাগান পরিস্কার করা প্রভৃতি সাধারণের উপকার জনক কার্য্যে সকলে আমোদ বোধ করিলে তাহাই করিবে আর মধ্যে মধ্যে বন-ভোজন কখনও ভুলিবে না।

পরিবারটা একটু বিস্তৃত মনে করিয়া তাহাদের সকলকেই সহোদর সহোদরা জ্ঞানে সকলের সঙ্গে হৃদয়ের সহিত মিশিবে ও সকলকে ভাল বাসিবে, সকলকে লইয়া আমোদ করিবে। তোমার সহিত পল্লীবাসী বালক বালিকার যে এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইবে তাহা অনেক সময়ে বড়

সুখপ্রদ। পরস্পর সেই ভাল বাসাটুকু যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তাহা করিবে। ক্রমশঃ এই ভালবাসাটুকু নিজ পল্লী ছাড়াইয়া গ্রামময় বিস্তার করিবে আবার সময়ে উহা স্বগ্রামে আবদ্ধ না রাখিয়া স্বদেশের উপর, স্বজাতির উপর অর্পণ করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিবে।

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১	পর্যুষিত	পর্য্যুষিত
১০	১৩	সুদূরস্থ	সুদূরস্থ
১৬	১৪	omitted	ব্যক্তি
২৬	২	আমরা	আমার
২৯	৫	ধর্ম্মচর্য্যা	ধর্ম্মচর্চ্চা
৪৩	১৯	যেম	যেন
৪৪	১৪	গন্তীর	গম্ভীর
৪৬	৩	একদা	একথা
৫৪	১৭	হৃদয়	হৃদয়
৬৫	১	আছে	আছ
৮৩	১৩	নিরোগ	নীরোগ
৯৩	Heading	সমপাঠীগণের সহিত ব্যবহার	সায়ংকৃত্য
৯৬	১৪	উন্মেয়	উন্মেষ

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

চতুর্দ্দশ অধিবেশন

ইতিহাস শাখার সভাপতি

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা

এম এ, বি এল, পি আর এস, পি এচ ডি, মহাশয়ের

অভিভাষণ

কলিকাতা

বঙ্গাব্দ ১৩৩০, ৮ই আষাঢ়

শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়,

সমবেত সাহিত্যসেবী ও

সাহিত্যানুরাগী ভদ্রমহোদয়গণ,

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত পবিত্র ভূমিতে আজ সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন। বাঙ্গালা ভাষাভাষী প্রত্যেক বাঙ্গালীর,—কি সাহিত্যসেবী, কি সাহিত্যানুরাগী,—সকলেরই আজ পরম আনন্দের দিন! এই আনন্দের দিনে; বর্ত্তমান সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ, আমাকে ইতিহাস শাখার সভাপতির গৌরবময় পদে অভিষিক্ত করিয়া, কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সম্মিলনের পঞ্চম বৎসরে, স্বতন্ত্রভাবে মাত্র বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন হয়। তারপর ১৩২০ সালে, যখন কলিকাতায় সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হয়, সেই সময় সাহিত্য-সম্মিলন,—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন এই চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া, মূল সভা ব্যতীত চারিটি স্বতন্ত্র শাখা-সভার অধিবেশন হয়। এই হিসাবে বর্ত্তমান বৎসরে, ইতিহাস-শাখার অষ্টম অধিবেশন হইতেছে।

আজ যেখানে দণ্ডায়মান হইয়া, আমি আপনাদিগকে সম্বোধন করিতেছি,—জাহ্নবী-সলিল-সিক্ত এই পুণ্য ভূমির অনতিদূরে, রেলওয়ে লাইনের অপর ধারে, বঙ্কিমচন্দ্রের আবাস-ভবন, বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার মহাপীঠ। এই মহাপীঠে উপস্থিত হইয়া একদিন বাঙ্গালার সাহিত্যরথিগণ বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে সাহিত্য-যজ্ঞের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার প্রায় সমস্ত সুযোগ্য সহকর্ম্মিগণের তিরোভাব ঘটিয়াছে; কিন্তু সে যজ্ঞের হোমশিখা, বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশকে এখনও উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। কাঁঠালপাড়ার দক্ষিণে, বাঙ্গালার দ্বিতীয় নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী অবস্থিত,—কত স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, দার্শনিক, নিষ্ঠাবান্

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে অঙ্কে ধারণ করিয়া এই পল্লী বহুকাল হইতে বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করিতেছে। তারপর, এই মণ্ডপের উত্তরভাগে অবস্থিত গরিফা পল্লীতে, বঙ্গের সেই সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, বঙ্গমাতার সুসন্তান, ধর্ম্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। আর ইহারই কিছু উত্তরে, হালি-সহর গ্রাম, বাঙ্গালার সাধক-কবি রামপ্রসাদের পবিত্র জন্মভূমি। এই হালিসহরকে মুখরিত করিয়াই, একদিন তাঁহার অমর সঙ্গীত বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণে শান্তি-সুধা বর্ষণ করিবার জন্য উদ্গীত হইয়াছিল। এই সমস্ত মধুর স্মৃতি-ভরা কাহিনী বর্ত্তমান সভাক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে।

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাস বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই সময়ে কাঁঠালপাড়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" বাহির হয়। এই "বঙ্গদর্শনেই" তিনি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইতিহাস লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। এ প্রবন্ধগুলি প্রত্যেক ঐতিহাসিকের অবশ্যপাঠ্য এবং আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পৎ। এই ইতিহাসের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীগত-প্রাণ, ইতিহাস-প্রিয় বঙ্কিমচন্দ্র, একদিন উদাত্ত কণ্ঠে যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া, আমি আমার অভিভাষণের সূচনা করিতেছি,—

"বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।

• • • • • • •

এই আমাদের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গলা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই?"

বঙ্কিমচন্দ্র আজ জীবিত নাই, কিন্তু তিনি যে লোকাতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে পাইবেন--ইতিহাস আলোচনায় বা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে বাঙ্গালীর আজ কি আনন্দ! বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তথ্য, বাঙ্গালার ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালার ছোট বড় বহু কৃতী লেখক আজ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন, নিজেকে ও নিজের জাতির স্বরূপ জানিতে হইলে, ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে; আপনার দেশকে, জন্মভূমিকে চিনিতে হইলে, তাহার ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য গতি, অন্য পন্থা নাই।

বাঙ্গালীজাতির অতীত ইতিহাস, গৌরবের অপূর্ব্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল, তাহার দীপ্তি হিরণ্ময়রাগে রঞ্জিত। তাই বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর অতীত "ঐতিহাসিক স্মৃতির" উদ্বোধন করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—" যে জাতির পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করে। * * * * * জাতীর গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাস বিহীন জাতির দুঃখ অসীম।" আর এই জন্যই তিনি আবার জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন--"বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া মনুষ্যনামের সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে, অতীত গৌরবের লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধন করিতে হইলে, আমরা কি ছিলাম ও কি হইয়াছি তাহা জানিতে হইলে, আমাদের ইতিহাস চাই, ইতিহাসের চর্চ্চায়, প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধারে, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্যের অনুসন্ধানে আমাদের প্রবৃত্ত হইতেই

হইবে। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের সে দিন আসিয়াছে। বাঙ্গালার বহু জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে, বাঙ্গালায় বহু প্রাচীন পুথি, শিলালিপি, তাম্রফলক, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ, রঙ্গপুর ও মেদিনীপুরের শাখা সাহিত্য পরিষৎ, বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চ্চা ও পুরাতত্ত্বাবিষ্কার কার্য্যের পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গবাসী যেন নব সঞ্জীবন মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্কলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ ভারতবর্ষের কথা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। তাই আমরা প্রথমেই ভারতের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইব; তবে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাস লিখিবার আদর্শ, কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

ইতিহাস রচনার আদর্শের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপের জেনেভা নগরে স্যর ফ্রেডরিক পলকের সভাপতিত্বে নীতিশিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সভায় ইতিহাসের উপদেশ ও আন্তর্জাতিক সদ্ভাব সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার অভিমতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে,—"বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে ভাবে ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অসাধারণ ঘটনাবলীর প্রতি মানবের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায়, যে সমস্ত ঘটনা সমাজকে নানাপ্রকারে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত করে— সেগুলিই ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে বর্ণিত, এবং বিপর্য্যয়-

কারিগণ সমধিক প্রশংসিত হইয়াছে। শান্তি ও সহযোগের মধ্য দিয়া মানবসমাজ যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার বিবরণ তেমন ভাবে বর্ণিত হয় নাই। লক্ষ লক্ষ নরনারীর সহযোগে পৃথিবীর বহু বৃহৎ কার্য্য, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া সুসাধিত হইয়াছে; ঐতিহাসিকগণের মনোযোগ এদিকে আদৃষ্ট হয় নাই কিংবা তাঁহারা এগুলিকে মোটেই আমল দেন নাই। ফলে এই ঘটিয়াছে যে, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনার উপরেই অস্বাভাবিক গুরুত্বের আরোপ করা হয়। পাশ্চাত্য দেশে বর্ত্তমান যুগে ইতিহাস রচনা অনেক সময়ে রাজনীতিজ্ঞ, বা মহাজনগণের স্বার্থ সাধনের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত জাতীয় পক্ষপাতদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লেখনী চালনা করায় প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, নিজ দেশের অধিনায়ক কর্ত্তৃক যুদ্ধাদি ব্যাপার সাধিত হইলে, উহা সভ্যতা বিস্তারের উপায়রূপে কীর্ত্তিত হয়; আর অপর দেশের কোন অধিবাসী ঐ একই কার্য্য করিলে, সে কার্য্য বর্ব্বরতা মূলক বলিয়া আখ্যাত হয়। সমশ্রেণীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা এবং সেগুলিকে ইতিহাসের মধ্যে বিভিন্ন রকমে চিত্রিত করা মানব সমাজের পক্ষে যে অত্যন্ত অনিষ্টজনক ও নীচতামূলক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; এই সমস্ত অহিতকর ও পক্ষপাতমূলক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে পৃথিবীর মধ্যে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগ সংস্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে সমস্ত সামাজিক শক্তি কার্য্যকরী হইয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সমাজের বহু কল্যাণ সাধন ও গুরুতর ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেছে, সেগুলির প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে হইবে এবং বাল্যকাল হইতে যাহাতে ছাত্রগণ এই প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয় ও তাহাদের পাঠ্যপুস্তক এই শিক্ষার অনুযায়ী হয়, তাহারও বিধান করা উচিত।"

উনবিংশ শতাব্দী হইতে ইতিহাস রচনার বর্ত্তমান প্রণালীর প্রচলন।

ইদানীন্তন সময়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লিখিত হয়, তাহা মাত্র উনবিংশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে ইতিহাস লিখনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহের পথ অনেক সুগম হইয়াছে এবং যে সমস্ত কালের ইতিহাস রচনা, একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হইত, তাহা সম্ভবপর হইতেছে। ইহা ব্যতীত কঠোর ভাবে প্রমাণপঞ্জী পরীক্ষার নানাউপায় আমাদের আয়ত্ত হইয়াছে। আমরা এখন একস্থান হইতে প্রাপ্ত প্রমাণাবলী, অপর এক বা বহু স্থানে প্রাপ্ত প্রমাণের সহিত মিলাইয়া, সে গুলির দোষগুণ বিচার ও সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারি। সাহিত্য বা দলিলাদি হইতে প্রাপ্ত প্রমাণ, ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত মুদ্রা, লিপিফলক বা অন্য কোন নবাবিষ্কৃত প্রমাণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। এক জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণ সত্য ও সঠিক কিনা তাহা অপর কোন জাতির স্বাধীন প্রমাণের সহিত তুলনা করিয়া সত্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হইতে পারি। বাষ্প ও তড়িতের বহুল পরিমাণে উন্নতি হওয়ায়, দেশ বিদেশ ভ্রমণের বহু সুবিধা হইয়াছে, এবং এই সুবিধার ফলে দূরবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত জাতিসমূহ সম্বন্ধে আমাদের যে সমস্ত অমূলক ধারণা বদ্ধমূল ছিল, সেগুলি অপসারিত হইবার সুবিধা হইয়াছে। মানবতত্ত্ব ও লোকাচারতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ঐতিহাসিক তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে আলোক সম্পাৎ লক্ষ্য করিয়াছেন।

প্রত্নবিদ্যার ফলে ইতিহাসে যুগান্তর।

বহু লিপিফলকের আবিষ্কার ও সেগুলির পাঠোদ্ধারের ফলে, মানবের অনেক ভিত্তিহীন সংস্কার একেবারে অপনোদিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান, বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইয়া ইতিহাস রচনার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহে যে কি অভাবনীয় সুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে,

তাহা বর্ণনা করা যায় না। নেপোলীয়ানের মিশর অভিযানের সময় যে প্রসিদ্ধ রোসেটা প্রস্তরফলক পাওয়া যায়, তাহারই সাহায্যে মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হয়। বহুবর্ষের বহু পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে Thomas Young ও J. F. Champollion এই প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের প্রত্নতত্ত্বালোচনার ইহা একটি বিরাট কীর্ত্তি। ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহের সাহায্যকারী নূতন উপায়গুলির সহায়তায় মিশরের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব, এই সময় হইতে যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এসিয়া মাইনরে বিভিন্ন জাতীয় যে সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের নূতন উপায়গুলির সহায়তায় তাহাদের চিত্র আজ অঙ্কিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা সম্ভপর হইয়াছে। [History of Egypt by Maspero & others, Vol. XII (by S. Rappoport chs. vi, vii]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব প্রভৃতি ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। দিল্লীর অশোকস্তম্ভ ও অশোকঅনুশাসন সম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা ছিল, তাহা J. A. S. B. (III. pp. 105, 105) এবং Asiatic Researches (V. 136) পাঠে জানিতে পারা যায়। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পাণ্ডবগণ যখন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, তখন অপর কাহারও সহিত তাঁহাদের পরিচিত হওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহাদের হিতকামী বন্ধু বিদুর ও ব্যাস, তাঁহাদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ জ্ঞাপন করা আবশ্যক মনে করিতেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা পর্ব্বতগাত্রে এবং অরণ্য মধ্যস্থ প্রস্তরের উপর অন্যের অবোধ্য সাঙ্কেতিক অক্ষরে তাঁহাদের বক্তব্য লিখিয়া রাখিতেন। দিল্লীর

স্তম্ভটিকে জনসাধারণ মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সিদ্ধি ঘুঁটিবার দণ্ড বলিয়া মনে করিত। মেজর উইলফোর্ড সাহেবকে একবার একজন পণ্ডিত, একখানি পুথি দিয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিয়াছিলেন। তিনি উইলফোর্ড সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—এই পুথির সাহায্যে লিপিফলক পাঠ করা সহজ হইবে। পণ্ডিত মহাশয়ের কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া, তিনি ঐ পুথির সাহায্যে এলোরা ও সাল্‌সেটে প্রাপ্ত লিপিফলকের একাংশের পাঠোদ্ধার করিয়া যাহা Asiatic Researches পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাহাও পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং উইলফোর্ড সাহেবও ভ্রমে পতিত হইয়া পূর্ব্ব প্রচলিত সাধারণ ভ্রান্ত ধারণারই পোষকতা করিয়াছিলেন। সাধারণ প্রচলিত এই প্রকার ভ্রমান্ধকার ভেদ করিয়া, লিপিসমূহের প্রকৃত পাঠোদ্ধারে যে কয়জন মনীষী কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে James Prinsepএর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

মুদ্রাতত্ত্বের গুরুত্ব।

প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রাপ্ত প্রমাণ ইতিহাস-রচনা কার্য্যে ও ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ে বহুল পরিমাণে সাহায্য করে। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাঠকালে আমরা সকল সময়ে ইহা উপলব্ধি করিতে পারি না; কারণ অনেক সময় ঐতিহাসিক ঘটনার পোষকতা ও সমর্থন করে অন্য নানাপ্রমাণের সহিত মুদ্রার প্রমাণ একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় আমরা তাহার গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম হই না। যথাযথভাবে মুদ্রার গুরুত্ব বুঝিতে হইলে, প্রাথমিক উপকরণ হইতে কিভাবে ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার দিকে একবার লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিব। এমন অনেক অজ্ঞাত রাজার নাম ও তাঁহার রাজত্বকালের তারিখ, মুদ্রার সাহায্যে পাওয়া যায়, যাহা অন্য কোন প্রমা-ণের সাহায্যে বাহির করা সুকঠিন। সুপ্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ E. Thomas

সাহেবের একখানি পুস্তক (Memoir) পাঠে জানা যায় যে পারি, ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন গাজি শাহ্ নামক একজন বাঙ্গালার সুলতানের নাম তিনি মুদ্রার সাহায্যে প্রাপ্ত হন। ঐ মুদ্রার সাহায্যে তিনি আরও জানিতে পারেন যে, ১৩৫০ হইতে ১৩৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত তাঁহার রাজত্বকাল; কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই সুলতানের নাম মুদ্রাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে উল্লিখিত হয় নাই এবং হার্ণলে সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, সুলতানের নামাঙ্কিত এই মুদ্রা পাওয়া না গেলে, তিনি অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেন। টমাস সাহেব ১৮৬৭ এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যে দুইখানি গ্রন্থ (Memoirs) প্রকাশ করেন, তাহা পাঠে জানা যায় যে কুচবিহারে প্রাপ্ত ১৩৫০০ রৌপ্য মুদ্রার সাহায্যেই তিনি বাঙ্গালার মুসলমান আমলের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেন। সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণের নাম কোনও ইতিহাসে পাওয়া যায় নাই। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া না গেলে, কতকাল যে তাঁহাদের নাম অজ্ঞাত থাকিত তাহা বলা যায় না। (Centenary Review Pt. II, pp. 100. 131)

ঐতিহাসিক প্রমাণ ও উপকরণ সংগ্রহ কার্য্যে, প্রাচীন পুঁথি বড় কম সাহায্য করে না। বহু অজ্ঞাত ঘটনা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় ইতিহাস প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার ও তাহার পাঠোদ্ধারের ফলে জানা সম্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে এ পর্যান্ত বহু পুঁথি আবিষ্কৃত ও সেগুলি সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। য়ুরোপীয়গণ পুঁথি-সম্পাদনের জন্য যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা অতীব শ্রমসাপেক্ষ। এই প্রণালী উত্তরোত্তর কঠোর হইতেছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌মান্ (Lefmann) সম্পাদিত ললিতবিস্তর গ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে [illegible]

প্রাচীন পুঁথির সম্পাদন প্রমাণ সংগ্রহের একটি প্রধান উপায়

পৃষ্ঠায় মূল এবং অতিরিক্ত ২২৬ পৃষ্ঠায় পাঠান্তর সমাপ্ত হইয়াছে। ই সেনারের (E. Senart) 'মহাবস্তু অবদান' ও পালি টেক্‌সট সোসাইটির দুই একখানি গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা যায় যে, য়ুরোপে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে প্রাচীন পুথি-সম্পাদন কিরূপ ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য কার্য্য। অধুনা এই প্রণালী অবলম্বনে পুনা নগরে ভাণ্ডারকর ওরিয়াণ্টাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট্ মহাভারতের যে একটি সংস্করণ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার কথা আপনারা অনেকেই শুনিয়াছেন। কিভাবে ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করা হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য ঐ সভা একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশে যত ভাষায় মহাভারত সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ ও আলোচনা বাহির হইয়াছে, মহাভারতের যতগুলি সংস্করণ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বিভিন্নদেশের গ্রন্থাগারে বা অন্যান্য স্থানে মহাভারতের যত পুথি পাওয়া যায়, বর্ত্তমান গ্রন্থ সম্পাদনে এই সমস্ত উপকরণেরই সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সমগ্র মহাভারত বা ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের পুথিগুলির সংখ্যা প্রায় ১৩০০। সম্পূর্ণ মহাভারতখানি কোয়ার্টো আকারের প্রায় দশ হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে প্রাকৃত সূচী প্রায় ৩০০০ হাজার পৃষ্ঠা এবং যবদ্বীপের পুথির সহিত ইহার সম্পর্ক ও অন্য বহু বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কিত ভূমিকা প্রায় ১০০০ হাজার পৃষ্ঠা অধিকার করিবে। এই সম্পাদন কার্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্য্যের জন্য প্রায় ২৭০০০০ দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। এইভাবে পুথি সম্পাদন এবং তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে যদি ইতিহাস লিখিত হয়, তবে আমরা অনেক অন্তর্নিহিত সত্য ঠিকভাবে পাইতে পারি। কিন্তু ইহার

জন্য বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাব ও ফল ইতিহাস-ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত ও অনুভূত হইয়াছে এবং ইহা ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ ও ইতিহাস লিখিবার ধারাকে পরিবর্ত্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ডারউইনের ক্রমোন্নতিবাদ সমাজ-সম্পর্কিত যাবতীয় বিজ্ঞানেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্যানুসন্ধান কার্য্য, যে কঠোর নিয়মে পরিচালিত হয় এবং অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত সেই সমস্ত সংগৃহীত প্রমাণ যেরূপ কঠিন নিয়মে পরীক্ষা করিয়া সেগুলিকে ব্যবহার করা হয়, আমাদের সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও প্রমাণ যতদূর সম্ভব সেইরূপ কঠোর নিয়মেই পরিচালিত হইতেছে। এবং এইগুলি আবার তুলনামূলক প্রণালীর সাহায্যে পরীক্ষিত হয়। যে প্রণালীতে উহাদের মধ্যে পারম্পর্য্য বা ক্রমোন্নতি সংঘটিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান কার্য্যে সেই প্রণালীর অনুসরণ করিতে আমরা যত্নবান হই। প্রাচীনকালে য়ুরোপে দুই একজন লেখক যে পারম্পর্য্য দর্শাইয়া ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই তাহা নহে; তবে বর্ত্তমান সময়ে বিস্তৃতভাবে এই প্রণালীর ব্যবহার দেখা যায়।

প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষে বা পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক প্রণালী অনুসারে ইতিহাস লেখা যে অসম্ভব ছিল, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া হেরোডোটাস, থিউসিডিডিস ডিওডোরাস প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এবং রোমে লিভি ও ট্যাসিটাস প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনায় যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, ঐ সময়ে আমাদের দেশে সেরূপ প্রতিভার পরিচয় পাই না। অনেক সময়ে মনে হয় যে প্রাচীন ভারতীয়গণ ধর্ম্ম, দর্শন অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতিতে যেরূপ মনোযোগ দিয়াছেন, ব্যবহারিক

বিদ্যা বা কর্ম্মে তাঁহারা তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করেন নাই; এবং ইহজগৎ যাঁহাদের অনেকেরই কাছে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত, জাগতিক যাবতীয় বস্তু যাঁহারা নশ্বর ও হেয় বলিয়া মনে করিতেন, আধ্যাত্মিক চরম উন্নতিলাভই একমাত্র কাম্য ও অভীষ্ট হওয়া উচিত বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, তাঁহাদের কাছ হইতে ইতিহাস আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিষ্ণু পুরাণে (৪।২৪।৫৮—৭৫) ঐহিক ধনসম্পত্তির ক্ষণিকত্ব ও অসারত্ব বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে, পার্থিব ধনসম্পত্তিকে অধিকাংশ হিন্দু কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। "মান্ধাতা, সগর, অবিক্ষিত, রঘু, যযাতি ও নহুষ প্রভৃতি রাজগণ মহাবল ও বীর্য্যশালী এবং অনন্ত ধনাধিকারী ছিলেন। তাঁহারা বলবান হইয়াও কালের প্রভাবে ইদানীং কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। * * * * * * * রামচন্দ্র, দশানন, অবিক্ষিত প্রভৃতির ঐশ্বর্য্যও অন্তকের কটাক্ষে ক্ষণিকের মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়াছে। অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্।" The Interpretation of History নামক গ্রন্থের রচয়িতা Max Nordau তাঁহার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। * তিনি বলেন,—"মানবজাতিকে অনন্তের দিক হইতে দেখা আমাদের বন্ধ করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টিতে উহা পরমাণুবৎ

* We must cease to regard humanity from the point of view of eternity. It dwindles else before our eyes to an almost invisible speck, without permanence, significance, or aim, the contemplation of which leaves us utterly humiliated, broken and dispirited (৩৬৯, ৩৭০ পৃঃ)।

হইয়া প্রায় দৃষ্টির আগোচর হইয়া পড়ে। উহার স্থায়িত্ব, অর্থ, বা উদ্দেশ্য থাকে না, এবং ইহা ভাবিলে আমাদিগকে একেবারে আত্মমর্য্যাদা-হীন নিরুৎসাহ হইতে হয়। অনন্তের তুলনায় দেখিতে গেলে আমরা আমাদের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না।" অতএব ইহ-জীবনের ইতিহাসের যে একটা গুরুত্ব আছে, তাহা বুঝিতে হইলে, অনন্তের দিকে তাকাইলে চলিবে না; আমাদের দৃষ্টিকে ইহ-জগতের দিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। লৌকিকতা বা মানবতার হিসাবে যদি ইহজীবনের বা ইহজগতের কোন গুরুত্ব বা প্রয়োজন থাকে, যদি ইহজীবন আমাদের পারলৌকিক মঙ্গলের সোপান হয়, তাহা হইলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত দৃঢ়-নিবদ্ধ জাতীয় জীবনের উন্নতি একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং ইহাকে ভালরূপে গঠিত করিতে হইলে, অতীত আলোকের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন।

পার্থিব বিষয়ে ঔদাসীন্য যে প্রাচীন ভারতের সকল যুগেই বর্ত্তমান ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন কালে ভারতে লৌকিক বিদ্যা ও কলাসমূহের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রাচীনকাল হইতে বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই দুইটি বিষয় বিদ্যার অন্যতম শাখারূপে পরিগণিত ছিল। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, সে সময়ে সকলেই সংসারবিরাগী ছিলেন এবং সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ই জীবনকে ভারাক্রান্ত করে এরূপ ধারণার পোষকতা করিতেন, তাহা হইলে গণিতাদি বিদ্যা ও শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতি বিধায়ক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত হইতেই পারিত না। এবং তৎকালে সেগুলির সমধিক উৎকর্ষও সাধিত হওয়া সম্ভব হইত না। দ্বিতীয়তঃ সে সময়ে সংসার বিরাগী একদল লোক বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহজগৎই আমাদের ভবিষ্যৎ সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের আকর এবং [illegible]

অন্য তিনটির ভিত্তি এই মত প্রাচীন কালেও যে সুপ্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ সংসারের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক নিয়ম, এই স্বাভাবিক নিয়মকে প্রতিরোধ করিয়া সমস্ত বা অধিকাংশ লোকই যে ব্যাবহারিক বিষয়ে উদাসীন থাকিবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব। প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাসের উপযোগিতা বুঝিতেন না, এই অপবাদ প্রচলিত থাকিলেও ক্রমেই আমরা ইহার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের বহুস্থানে ইতিহাস একটি শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (১)

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা বোধ।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও মনুসংহিতায় বহুবচনান্ত 'ইতিহাস শব্দের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, তৎকালে অনেক গুলি ইতিহাস প্রচলিত ছিল। বোধ হয়, গ্রন্থ সংখ্যা লক্ষ্য করিয়াই বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের বহুস্থানে ইতিহাসের উল্লেখ আছে।

সংস্কৃত-সাহিত্যে ইতিহাসের উল্লেখ।

কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে রাজার জন্য ইতিহাস শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন (১, ৫) এবং রাজাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য মন্ত্রীকেও ইতিহাসাভিজ্ঞ হইতে বলিয়াছেন (৫, ৬) ইহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ভারতীয়গণ ইতিহাসের রাজনৈতিক মূল্যও বুঝিতেন।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বোধ।

---

(১) অথর্ব্ব সংহিতা ১১, ৬৪ ; শতপথব্রাহ্মণ ১৩৪, ৩, ১২, ১৬ ; জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ ১, ৫৩ ; গোপথব্রাহ্মণ ১, ১০ ; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২, ৯ , ছান্দোগ্য ৭, ১, ২, ৪ ; শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১৬, ২০, ২১, ২৭ ; আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৪, ৬, ৬ ; মনুসংহিতা ৩, ২৩২ ; নিরুক্ত ২, ১০ ; ২৪ ; ৪, ৬ প্রভৃতি ; মহাভাষ্যের ভূমিকা ; কাদম্বরী (পূর্ব্বভাগ, চন্দ্রাপীড়ের বিদ্যা শিক্ষা বর্ণনা,

যাস্কের নিরুক্ত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং পুরাণের বহু প্রমাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে কেবল ইতিহাস চর্চ্চার জন্য একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ঐ সম্প্রদায় কর্তৃক শিষ্যপরম্পরায় আলোচিত হওয়ায় ইতিহাস-বিদ্যা বিশেষ ভাবেই পরিপুষ্টি লাভ করে, যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে (২, ১৬,২। ১২, ১, ৮। ১২, ১০, ১) এই ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের মত বারংবার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। Anc. Ind. Historical Tradition নামক গ্রন্থে (২৬ পৃঃ) পার্জিটার সাহেব বলেন—পুরাণের বহুস্থলে উল্লিখিত 'পুরাবিদ্,' 'পুরাণবিদ্,' 'পুরাণজ্ঞ', 'পৌরাণিক জন' প্রভৃতি শব্দও ঐরূপ বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তারপর, পুরাণেই সূত ও মাগধ নামক দুইটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। "দেবতা, ঋষি, রাজা ও বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের বংশাবলী রক্ষা করা সূতের স্বধর্ম্ম ছিল (বায়ু পুরাণ ১, ৩১-৩২; পদ্ম ৫, ১, ২৭-২৮)। গর্গ সংহিতার গোলোক খণ্ডে (১২, ৩৬) এবং রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের (৬, ৬) টীকায় এই সূতগণ পৌরাণিক নামে এবং মাগধগণ বংশাবলী রক্ষক নামে উল্লেখিত দেখা যায়।

ইতিহাসআলোচনার জন্য পৃথক্ সম্প্রদায়।

অর্থশাস্ত্রে (৩, ৭) কৌটিল্য বলিয়াছেন যে,—পৌরাণিক সূত ও মাগধগণ প্রতিলোমজ সূত ও মাগধ জাতি হইতে ভিন্ন। পার্জিটার সাহেব ১৭ পৃঃ মহাভারত হইতে শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরবর্ত্তী কালে এই প্রতিলোমজ জাতি প্রাচীন পৌরাণিক সূতগণের জীবিকা অবলম্বন করায় সূত নাম লাভ করিয়াছিল (১)।

পুরাণে এই প্রাচীন সূতগণের উদ্দেশে 'বংশাধিস্তম,' 'বংশ কুশল'

(১) যশ্চ ক্ষত্রাৎ সমভবদ্ ব্রাহ্মণ্যাং হীনযোনিতঃ।
সূতঃ পূর্ব্বেণ সাধর্ম্ম্যাৎ তুল্যধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া বুঝা যায় যে, ইঁহারা বিশেষ ভাবে বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া ইতিহাসের এক শ্রেণীর উপকরণ রক্ষা করিতেন।

কেবল বংশতালিকা যে ইতিহাস নহে তাহা এদেশের ঐতিহাসিকগণ বহুকাল পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। ইঁহারা জানিতেন "ইতিহাসে ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষের উপদেশ থাকে," অতীত ঘটনা পরম্পরা দ্বারা সমাজের ভাল-মন্দ শিক্ষা হয়। সম্ভবতঃ ইতিহাসকে ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ করার দিকে একটু অধিক দৃষ্টি পড়ায় বহু স্থলে পুরাণগুলির ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল। ইতিহাসের ঐরূপ উপদেশাত্মক উদ্দেশ্য মনে রাখিয়াই বোধ হয়, মহাভারতকে প্রকৃষ্টতম ইতিহাস বলা হইয়াছে (মহাভারত, আদি ১, ২৬৯) এবং কল্পনাকেও ইতিহাসের পাশে স্থানে দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে; কারণ

ইতিহাসের ব্যাপক সংজ্ঞা।

আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১,৫) দেখিতে পাই যে, তখন ইতিহাস বলিতে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এই সমস্তই বুঝাইত। ইতিহাসের এই ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি—কেন কোন কোন স্থলে (পদ্ম ২, ৮৫, ১৫; বায়ু ৫৭, ২) নিতান্ত কল্পিত ঘটনাকেও ইতিহাস নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ছয়টি নামই ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্যে পড়িলেও ভারতীয়গণ ইহাদের মধ্যে সত্য ঘটনা-পূর্ণ ইতিহাসের বিশেষত্ব কিরূপ তাহা জানিতেন।

পুরাণে যে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা আছে, সেগুলি ইহার পাঁচটি লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। সেগুলি হইতেছে:—সর্গ, বিসর্গ, বংশ, বংশানুচরিত ও মন্বন্তর। এইগুলির মধ্যে বংশ, ও বংশানুচরিতে রাজগণের নাম, রাজত্ব সময় ও বিশিষ্ট রাজগণের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ হইত। ইতিহাসের অন্তর্গত 'উদাহরণ' কিরূপ ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১।৩) ও বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (১।২) উদ্ধৃত আছে

বলিয়া মনে হয়। রাজার ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করা উচিত। এই কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণ যে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়াও ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হওয়ায় বিনষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা 'উদাহরণ' প্রয়োগে দেখান হইয়াছে। 'উদাহরণে'র উদ্ধৃতাংশ এইরূপ :—"দাণ্ডক্য ভোজ কামের বশবর্ত্তী হইয়া এক ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়ায় রাজ্য ও বন্ধুগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছিলেন। বৈদেহ করালেরও পরিণাম ঐরূপ হইয়াছিল। জনমেজয় ব্রাহ্মণগণের প্রতি ও তালজঙ্ঘ ভৃগুগণের প্রতি ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়ায় ও সৌবীর অজবিন্দু চতুর্ব্বর্ণের নিকট হইতে লোভে পড়িয়া অতিরিক্ত অর্থ শোষণ করায়; রাবণ অহঙ্কারের আধিক্যে পরদার প্রত্যর্পণ করিতে ও দুর্য্যোধন রাজ্যের অংশ ছাড়িতে অস্বীকৃত হওয়ায় বিনষ্ট হইয়াছিলেন। মদান্ধ হইয়া দম্ভোদ্ভব ও হৈহয় অর্জ্জুন লোকের অবমাননা করায়, ও অতিরিক্ত হর্ষে বাতাপি অগস্ত্যকে, ও বৃষ্ণিসঙ্ঘ দ্বৈপায়নকে আক্রমণ করায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ইহার পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা ব্যতীত অনেক রাজা ছিলেন যাঁহাদের নাম ঐ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে; পক্ষান্তরে জামদগ্ন্য, অম্বরীষ, নাভাগ প্রভৃতি নরপতি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমগ্র পৃথিবী সুখে ভোগ করিয়াছিলেন। এই উদাহরণ সত্য ঘটনা মূলক,—কল্পনা প্রসূত নহে বলিয়াই মনে হয়। তারপর যে ইতিহাসের অন্তর্গত ইতিবৃত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে উহাতে আরও বিশদভাবে অতীত ঘটনার যথাযথ বর্ণনা থাকিত বলিয়াই অনুমান হয় (মহাভারত ১, ১, ১৬)।

একই শ্লোকে 'ধর্ম্মার্থসংশ্রিত পবিত্র পুরাণ সংহিতার' পাশেই 'নরেন্দ্র ও ঋষিদিগের ইতিবৃত্তের' উল্লেখ দেখিয়াও এইরূপই মনে হয়। বায়ু (১০৩।৪৮।৫১, ৫৫-৫৮) ও ব্রহ্মাণ্ড (৪।৪, ৪৭, ৫০) উভয় পুরাণেই

দেখা যায় যে, উহারা একাধারে পুরাণ ও ইতিহাস; অর্থাৎ উহাতে পুরাণোচিত উপদেশও আছে, ইতিহাসোচিত যথার্থ বৃত্তান্তও আছে। এখানে ইতিহাস শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাসের আবশ্যকতা বুঝিতেন, তবে কোন ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আমাদের হস্তগত হয় নাই কেন? মহম্মদীয় শাসনকালে বিহার ও ওদন্তপুরীর বিপুল গ্রন্থাগার ধ্বংসের মত ঘটনা হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এইরূপ ঘটনা ভারতের ভাগ্যে বিরল নহে, সুতরাং বহু ইতিহাসের সত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাইলেও অদ্যাপি তাহা আমাদের হস্তগত না হওয়ার কারণ ঐতিহাসিকগণ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন।

অধুনা-লুপ্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অস্তিত্বের প্রমাণ।

ভবিষ্যপুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে গুপ্ত বংশের রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাজগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায়। ইহার পরে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে য়ুয়ান্ চুয়াং (Watters, Vol I, p. 154) লিখিয়াছেন, "তৎকালে ঘটনা লিপিবদ্ধ করার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল; এই সকল ঘটনালিপির নাম ছিল 'নীলপিট'। ইহাতে জাতির ভাল, মন্দ, বিপদ, সম্পদ সকল বৃত্তান্তেরই উল্লেখ থাকিত।"

য়ুয়ান্ চুয়াং বর্ণিত 'নীলপিট'।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে কলহণ বলিয়াছেন—'নীলমত পুরাণ' ব্যতীত আরও এগারজন পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে উপকরণ লইয়া তিনি রাজতরঙ্গিণী রচনা করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগের মধ্যে 'নৃপাবলী'কার ক্ষেমেন্দ্র, 'পার্থিবাবলীর' কর্ত্তা হেলারাজ এবং

কল্হণোক্ত ইতিহাস গ্রন্থ ও ঐতিহাসিকগণ।

পদ্মমিহির, ছবিল্লাকর, জোনরাজ, শ্রীব্র ও প্রাশাভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কল্হণ তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে (১১৯) ভূমিকাস্বরূপ যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বে বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ও তাঁহার সময়ে সেগুলি বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। এবং মনে রাখিবার সুবিধার জন্য সুব্রত কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ রচিত হওয়ায় প্রাচীন বৃহৎ গ্রন্থগুলি রক্ষার প্রতি লোকের দৃষ্টি ছিল না। কল্হণের এই সকল উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎকালে ইতিহাস এরূপ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল যে, ঐজন্য সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ গ্রন্থও রচনা করিতে হইয়াছিল।

ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার।

ইতিহাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে টড্ সাহেবের উক্তি।

রাজস্থানের ভূমিকায় (৮১৯ পৃঃ) টড্ সাহেব বলিয়াছেন—চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ রাসো দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহার সময়ে ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের বহু ইতিহাস গ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির একখানিও পাওয়া যায় না।

শ্রীহর্ষের নবসাহসাঙ্কচরিত ও গৌড়োর্ব্বীশ-কুলপ্রশস্তি।

নৈষধীয় চরিতে শ্রীহর্ষ (১১৮০ খৃঃ অঃ) তাঁহার রচিত 'নবসাহসাঙ্কচরিত' ও 'গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি' নামক দুইখানি ঐতিহাসিক কাব্যের নাম করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত ইহার একখানিরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রবন্ধচিন্তামণিতে গৃহীত আখ্যান ভাগের বহু আদর্শ গ্রন্থ।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে প্রবন্ধচিন্তামণিকার মেরুতুঙ্গ (১,৩) বলিয়াছেন যে বহু সংগ্রহ গ্রন্থের আখ্যানভাগ লইয়া তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল সংগ্রহ-গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ও বিক্ষোভের কথা ভাবিয়া দেখিলেই দেশে জাতীয় ইতিহাসের দুর্লভতার কারণ বুঝা যায় এবং ভারতীয়গণের ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়া যায়।

ধ্বংসাবশিষ্ট গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্য।

নানাবিপদের মধ্য দিয়া আসিয়া যেসকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমাদের হাত পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিয়াছে, তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, তাহাই আমরা এখন আলোচনা করিব। প্রথমেই পুরাণের কথা ধরিতে হয়—

পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য।

পুরাণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার পর পার্জ্জিটার সাহেব (Ancient Ind. Hist. Trad. ২৪ পৃঃ) পদ্মপুরাণ হইতে (৬, ২৯,৩৭) পুরাণের উৎপত্তিবিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঋষিরা প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে আবশ্যক বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। সকল পুরাণেই বারংবার উল্লিখিত 'অনুশুশ্রুমঃ' 'ইতি নঃ শ্রুতম্,' 'ইতি শ্রুতিঃ' প্রভৃতি প্রয়োগগুলি দেখিলেও বুঝা যায় যে, ঐতিহাসিকগণের নিকট শ্রুত ঘটনাই পুরাণের অবলম্বন। পুরাতন ঘটনা আছে বলিয়াই ইহার নাম পুরাণ। এখন আমরা যে আকারে পুরাণ পাইতেছি, তাহাকে আর ঠিক ইতিহাস বলা চলে না। বিষ্ণুপুরাণে (৩,৬,১৬) লিখিত আছে, 'পুরাণার্থ বিশারদ মুনি আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পজোক্তি দ্বারা পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছেন'। এইরূপ পুরাণই এখন আমরা পাইতেছি। লিঙ্গপুরাণ (১,৩৯,৬১) হইতে জানা যায় যে, কালক্রমে ইতিহাস ও পুরাণ পৃথক্ হইয়া গিয়াছিল। এই পুরাণকে ইতিহাসের গণ্ডীতে ফেলিবার জন্যই বিষ্ণুপুরাণের (৩,৪,১০) টীকায় শ্রীধর স্বামী ইতিহাসের লক্ষণ দিয়াছেন—

"আর্ষাদিবহুব্যাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ম্
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুতধর্ম্মযুক্ ॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইতিহাসকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ পূর্ণ করায় দিকে বড়ই ঝোঁক পড়িয়াছিল, তাহার সহিত এই "ভবিষ্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম" মিশিয়া পূর্ব্বের ইতিহাসপুরাণকে অন্য আকারে পরিণত করে।

পুরাণের প্রথম অবস্থা হইতে আধুনিক অবস্থার পার্থক্য।

বোধ হয়, প্রথমে পুরাণে 'বংশ' ও 'বংশানুচরিত' মাত্র ছিল, পরে 'সর্গ' (প্রধান সৃষ্টি), 'প্রতিসর্গ' (অবান্তর সৃষ্টি) এবং 'মন্বন্তরের' কথাও পুরাণের বিষয় হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে এই 'পঞ্চলক্ষণ' পুরাণ আবার ভাগবতোক্ত 'দশ লক্ষণের'ও বিষয়ীভূত হইল। কিন্তু এই পুরাণ দ্বারাও আমরা বহুস্থলে প্রাচীনকালের যথার্থ ইতিহাস জানিতে পারি। পার্জিটার সাহেব (২৪ পৃঃ) বলেন—এই পুরাণের মধ্যেই (বায়ু ৯৫, ১৫) 'ইচ্ছন্তি' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, কোন বংশ-বর্ণনার সময় কোন নামের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া আলোচনা দ্বারা যথার্থ মতটিই গ্রহণ করা হইত। নবাবিষ্কৃত লিপিফলক দেখিয়া অনেকস্থলে পুরাণোক্ত বংশাবলী বিশুদ্ধ বলিয়া জানা গিয়াছে।

পুরাণ ব্যতীত আমরা কয়েকখানি চরিত গ্রন্থ পাইয়াছি। ইহাতে

চরিত ও প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য।

কাব্যোচিত বর্ণনার আধিক্য থাকিলেও অনেক-স্থলে ইহা দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস জানা যায়; ইহাতে সাধারণতঃ কবিগণ তাঁহাদের আশ্রয়দাতা রাজাদের বংশ, বিক্রম, সমসাময়িক রাজা ও রাজ্যের বর্ণনা করিয়াছেন।

বূলার বলিয়াছেন—এই সকল চরিত ও প্রবন্ধে সংস্কৃত কাব্যোচিত বহু অতিশয়োক্তি আছে, ইহা সত্য; তথাপি কবিরা কেবল কল্পনা বলে কোন নাম উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছেন, এমন কোন দৃষ্টান্ত আমরা আজ পর্য্যন্ত এই সকল গ্রন্থে পাই নাই; বরং নূতন নূতন আবিষ্কার

শিলালিপিগুলি হইতে ক্রমেই আমরা উহাদের বহু নামের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব জানিতে পারিতেছি। সুতরাং এই সকল চরিত ও প্রবন্ধের দিকে ঐতিহাসিকগণের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত (Bühler, Uber das leben des Jaina menches Hemachandra p. 6.)

বাণভট্টের হর্ষচরিত (খৃঃ ৭ম শতক), বাক্‌পতিরাজের (অষ্টম শতকের প্রথম ভাগ) গউড়বহো, পদ্মগুপ্তের (১১ শতকের শেষ ভাগ) নবসাহসাঙ্ক চরিত, বিল্হনের (১১শ শতক) বিক্রমাঙ্ক চরিত, হেমচন্দ্রের দ্ব্যাশ্রয় কাব্য (কুমার পাল চরিত), সন্ধ্যাকর নন্দীর (১১শ শতক) রামপাল চরিত (দ্ব্যাশ্রয়), বুলারের চালুক্য রাজ বংশ সম্বন্ধীয় পুস্তিকার উল্লিখিত হর্ষগণির বস্তুপালচরিত, সোমেশ্বরের কীর্ত্তিকৌমুদী, রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ, এবং মেরুতুঙ্গের (১৪শ শতক) প্রবন্ধ চিন্তামণি,—এই কয়খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পৃথ্বীরাজ চরিত নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

এইগুলির মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই উহাদিগের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝা যাইবে।

হর্ষচরিত।

থানেশ্বরের সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের জীবনীই হর্ষচরিতের বিষয়। বুলার বিক্রমাঙ্ক চরিতের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে,—"য়ুয়ান্ চুয়াং হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সবই প্রায় হর্ষচরিতে পাওয়া যায় ; অধিকন্তু চৈনিক পরিব্রাজকের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি টান থাকায় তাঁহার বর্ণনায় যে সকল ভ্রম-প্রমাদ আছে, হর্ষ চরিত দেখিয়া অনেক স্থলেই তাহা সংশোধন করা যাইতে পারে। চালুক্য বংশ সম্বন্ধে বহু শিলা-লেখ পাওয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া অনেক স্থলে বিক্রমাঙ্ক চরিতের বর্ণনার

বিক্রমাঙ্কচরিত

সত্যতা জানা যায়।

নবসাহসাঙ্কচরিত।

নবসাহসাঙ্কচরিতে মালবের রাজা পরমার বংশীয় সিন্ধুরাজের বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা আছে। বুলার বলেন—'ইহাতে কাব্যাংশই বেশী। তাহা হইলেও শিলালিপি প্রভৃতির সহিত মিলাইয়া লইলে ইহা হইতেও পরমার বংশের অনেক কথা জানা যায়'। প্রাকৃত গউড়বহো কাব্যে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মার গৌরব বর্ণনা আছে। গউড়বহো নাম হইলেও ইহাতে গৌড়ের রাজার কথা বড়

গউড়বহো।

বেশী নাই। রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত কাশ্মীরের ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক যশোবর্ম্মার উচ্ছেদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘটনার কিছু বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়।

দ্ব্যাশ্রয় কাব্য।

হেমচন্দ্র দ্ব্যাশ্রয় কাব্যে তাঁহার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলির জন্য উদাহরণ রচনার সঙ্গে সঙ্গে অনহিল্লপুরের রাজাদের, বিশেষতঃ প্রাকৃত অংশে, কুমারপালের বর্ণন করিয়াছেন।

প্রবন্ধচিন্তামণি।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে লিখিত মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণিতেও গুজরাটে ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়।

রাজতরঙ্গিণী।

কল্হণের রাজতরঙ্গিণীর কিয়দংশের ঐতিহাসিক মূল্য আরও অধিক। এখানিও কাব্য; কিন্তু কোন রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার গৌরব বর্ণনা করার জন্য এই খানি লিখিত হয় নাই। কাশ্মীরের রাজগণের এই ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম অংশে পুরাণের মত কল্পনা এবং অনেক ভ্রমপ্রমাদ দেখা যায়, কিন্তু শেষ অংশে খৃষ্টীয় ৭ম শতকের রাজাদের সময় হইতে ইহা ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। কল্হণ তাঁহার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালের রাজাদের দোষগুণ প্রকৃত ঐতিহাসিকের ন্যায় সমালোচনা, এবং রাজ্যের উত্থান [illegible] পতনের কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। কল্হণ স্বয়ং বলিয়াছেন, [illegible]

পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা গ্রহণ করিবার সময়ে যতদুর পারিয়াছেন প্রতিষ্ঠা-শাসন, বস্ত্র-শাসন, প্রশস্তি পট্ট এবং শাস্ত্রদ্বারা তাহার সত্যতা নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন (রাজতরঙ্গিণী ১, ১৫)।

যিনি রাগ দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া অতীত ঘটনা বর্ণনা করিতে পারেন, কলহণ তাঁহাকেই প্রশংসা করিয়াছেন (রাজত: ১,৭); ইহাতেই বুঝা যায় যে, ভারতে ইতিহাস রচনার আদর্শ বেশ উচ্চই ছিল।

কলহণ কথিত ঐতিহাসিকের আদর্শ।

পৌরাণিক সূত ও মাগধগণের বংশ ও বংশাবলী আলোচনার প্রথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। মহারাষ্ট্রের 'বখর্' আসামের 'বুরঞ্জী' এবং উড়িষ্যার মাদ্‌লাপাঞ্জীর মূলেও ঘটনা লিপিবদ্ধ করার প্রথাই পরিদৃষ্ট হয়। রাজপুতানার ভাটগণ আপনাদিগকে মাগধ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। পৃথ্বীরাজ রাসো প্রণেতা চাঁদকবি ভাট ছিলেন; তাঁহার বংশধরেরা এখনও বর্ত্তমান আছেন। রাজপুতানার 'বরোত্র' গণের নিকট ১৫০০ বৎসরের প্রাচীন বংশাবলীরও সংবাদ পাওয়া যায়। চারণ নামে আর এক জাতি আছে; ইহারা পৌরাণিক সিদ্ধচারণদের নামে আত্মপরিচয় দেয়। বংশাবলী রক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধের কীর্ত্তি রক্ষাতেই ইহাদের বেশী আগ্রহ। ইহারা যুদ্ধের বিবরণ লইয়া রাজাদের জীবন চরিত লিখিয়া থাকে। সূরয্ প্রকাশ ইহাদের লিখিত একখানি পুস্তক। ইহাতে সূর্য্যবংশের অর্থাৎ রাঠোরদিগের বিবরণ আছে। বীরবিনোদ নামক আর একখানি বই ছাপা হইয়াছে, কিন্তু উদয়পুরের রাণা প্রকাশ করিতে দেন নাই। টড্ সাহেবের রাজস্থান বাহির হইলে বুঁদির প্রধান চারণগণ রাগ করিয়া 'বংশভাস্কর' নামে একখানি বই লিখে; ইহাতে প্রধানতঃ বুঁদির 'হাড়া চৌহান' রাজাদের

ভাট, বরোত্র ও চারণগণ বংশ-পরিচয় রক্ষা করে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতানার অন্য রাজাদের বৃত্তান্ত আছে। রাজপুতানায় খেত, বাত, গপ্‌ ও দস্তকথা এই চারিপ্রকার ইতিহাস লেখা হয়। ইহার মধ্যে খেতই প্রকৃত ইতিহাস, অন্য সবগুলিতেই অল্প-বিস্তর বাজে কথা আছে। বাঙ্গালাদেশেও ভাট সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল, এখন ইহার নাম মাত্র আছে।

এতদিন পণ্ডিতগণ পুরাণবর্ণিত কাল-গণনার কোনই মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু পুরাণের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই এই কাল-গণনার অর্থ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পার্জিটার সাহেব তাঁহার Ancient Indian Historical Tradition নামক গ্রন্থের ১৭৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে সম্ভবতঃ বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত যুগ পরিবর্ত্তনের ধারণা পুরাণে স্থান পাইয়াছে। রাম জামদগ্ন্য রাজন্যকে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া দেশে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহার পর হইতেই দ্বিতীয় যুগ ত্রেতার আরম্ভ হয়; সম্ভবতঃ রাম-রাবণের যুদ্ধের পরেই ভারতবর্ষে দ্বাপরের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের সহিত কলিযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইতে যুগ-বিভাগের উৎপত্তি

শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সবাল (J. B. O. R. S. Vol. III) সংপ্রতি ভারতযুদ্ধ ও কলিযুগের প্রারম্ভকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পুরাণে বহুস্থলে সপ্তর্ষিচক্র অনুসারে কালনির্দ্দেশ দেখা যায়। সপ্তবিংশতী নক্ষত্রের প্রতিনক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থিতি কাল এক শত বৎসর সুতরাং সপ্তবিংশ শত বৎসরে একটি সপ্তর্ষিচক্র পূর্ণ হয়। জয়সবাল মহাশয় অনুমান করেন যে কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে সপ্তর্ষিচক্রের আরম্ভ হয়। পুরাণ হইতেই জানা যায় যে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের সপ্তম

অবস্থান কালে অর্থাৎ অষ্টম শতকে পরীক্ষিত সিংহাসন লাভ করেন

পৌরাণিক নৃপতিগণের ঐতিহাসিকতা ও তাহাদের কালনির্ণয় সম্বন্ধে গবেষণা।

এবং কলিযুগ আরম্ভ হয়। তৎপরে পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন কালে অর্থাৎ হাজার বৎসর পরে অষ্টাদশ শতকে নন্দরাজ রাজত্ব করেন। আরও ছয় শত বৎসর পরে সপ্তর্ষিচক্রের চতুর্ব্বিংশ শতকে অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদে অন্ধ্র রাজত্ব শেষ এবং সপ্তবিংশ শতকে অর্থাৎ ভরণীতে অন্ধ্রের পরবর্ত্তী রাজ্যেরও পতন হয়। পুরাণেই উল্লিখিত দেখা যায় যে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইতে মহাপদ্মের ব্যবধান একহাজার পঞ্চাশ বৎসর এবং মহাপদ্ম হইতে অন্ধ্রান্ত অর্থাৎ অন্ধ্রের পরবর্ত্তী রাজত্ব কালের ব্যবধান আটশত ছত্রিশ বৎসর। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উভয় গণনা দ্বারা একরূপই ফল পাওয়া যায়।

এখন অন্য প্রমাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহাপদ্ম খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন; এই সময় হইতে হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতকে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক এবং কলির আরম্ভ হয়।

জয়স্বাল মহাশয় ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে বারশত বৎসর পরে যবন (গ্রীক) রাজ্যের পতনের সহিত কলির শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে এই সময় অতি অল্প মনে হওয়ায় উহাকে মানব বৎসরের পরিবর্ত্তে দৈব বৎসর করা হয় সুতরাং ১২০০ শত বৎসর (১২০০ × ৩৬০) ৪২০০০০ বৎসরে পরিণত হইল। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, মহাপদ্ম হইতে অন্ধ্রভৃত্য রাজগণের শেষ রাজার ব্যবধান আট শত ছত্রিশ বৎসর অর্থাৎ [illegible] খৃষ্টাব্দ। ইহা সপ্তর্ষিচক্রের সপ্তবিংশ শতক। জয়স্বাল মহাশয়

বলেন যে, বোধ হয় পরবর্ত্তী গণিতবিদ্‌গণ ইহা জানিতেন এবং মহাপদ্ম যে সপ্তর্ষিচক্রের অষ্টাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাও জানিতেন। এক্ষণে তাঁহারা ৪১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯০০ শত বৎসর পশ্চাতে যাইয়া খৃঃ পূঃ ৪০২ অব্দ পাইলেন এবং উহা হইতে আরও এক সপ্তর্ষিচক্র অর্থাৎ ২৭০০ বৎসর পশ্চাতে যাইয়া অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দে কলির আরম্ভ-কাল নির্ণয় করিলেন। এই আলোচনা দ্বারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত যে কাল-গণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যাইতেছে অন্ততঃ ঐ সময় পর্য্যন্ত পুরাণের বর্ণনায় অসঙ্গতি নাই।

পার্জিটার সাহেব বলেন (১৮০ পৃঃ) পুরাণের বর্ণনায় পরীক্ষিতের পর মহাপদ্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অল্প কয়জন রাজার নাম আছে, তাঁহারা ১০৫০ বৎসর ধরিয়া এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন না—সুতরাং পরীক্ষিত হইতে মহাপদ্মের ব্যবধান কালের গণনায় পুরাণের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তিনি ঐ রাজাদের প্রত্যেকের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৮ বৎসর ধরিয়া (২৬×১৮) ৪৬৮ বৎসর স্থির করিয়াছেন। এবং তাহার আরও ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব তাঁহার মতে মহাপদ্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে খৃঃ পূঃ নবম শতক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এস্থলে জয়স্বাল মহাশয়ের মতই অধিক যুক্তিযুক্ত। তিনি পুরাণপ্রাপ্ত সপ্তর্ষিচক্রের গণনা এবং ব্যবধান কালের উল্লেখের আলোচনা করিয়া দুই উপায়েই একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা পুরাণে যে কয়জন রাজার নাম পাই, তাঁহাদের পক্ষে অত দীর্ঘকাল রাজত্বভোগ অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু পার্জিটার সাহেবই (৮৩ পৃঃ) বলিয়াছেন যে, পুরাণের কোন কোন স্থলে কেবল প্রধান প্রধান রাজগণের নামই উল্লিখিত হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র রাজাদের নাম বাদ পড়িয়াছে।

গত কয়েক বৎসরে পণ্ডিতগণের চেষ্টায় নূতন নূতন অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের সম্মুখে বহু আলোচ্য বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় রীতিমত আলোচিত হইলে কতকগুলি অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত তথ্য সম্বন্ধে নূতন আলোক পাওয়ার আশা করা যায়। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান ছিল, তাহার যথার্থতা কোন কোন স্থলে এখন আর অবিসংবাদিত নহে। কোন স্থলে পুরাতন মতের বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কোন স্থলে বা প্রচলিত ধারণায় সংশয় উপস্থিত হইতেছে। প্রাচীন যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা লইয়াই এই বিষয়গুলি জড়িত।

নূতন নূতন গ্রন্থপ্রকাশের ফলে নূতন আলোচ্যবিষয়ের উদ্ভব।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ কুরুপঞ্চাল দেশই বৈদিক সভ্যতাও প্রাচীন বিদ্যালোচনার কেন্দ্রস্থল বলিয়া ধারণা আছে; কিন্তু এখন এমন সব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যাহাতে মনে হয়, পূর্ব্বভারতও অতি প্রাচীনকালেই বৈদিক সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে আলোকিত হইয়াছিল; সুতরাং এ বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ আবশ্যক। আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে এবং আর্য্যগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ ও আপেক্ষিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে চর্চ্চা আবশ্যক এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রভাবে অনার্য্যগণ কি উপায়ে এবং কি পরিমাণে অভিভূত হইয়াছিল—তাহাও নির্ণয় করা প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বেদশাখার 'চরণ'-গুলি সেই সকল প্রদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সংরক্ষণ, পরিপুষ্টি ও বিস্তার কার্য্যে কি উপায়ে, কতটা সহায়তা করিয়াছিল এবং আরুণি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বৈদিক যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতবাদের প্রত্যেকটির কিরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তাঁহাদিগের মতের প্রভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী এবং

সমকালীন মতের ও সমাজের উপর কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল এই সকল এবং এইরূপ আরও অনেক বিষয় নির্ণয়ের জন্য পণ্ডিতগণের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মের ইতিহাস কিভাবে লিখিত হওয়া উচিত।

যে প্রণালী অবলম্বনে আমাদের ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হইতেছে, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ঐতিহাসিকগণ যে ভাবে ধর্ম্মের ইতিহাস বা বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে কেবল ধর্ম্মের বহিরঙ্গের দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে, উহার প্রাণ যে সাধনা, তাহার দিকে তাঁহারা লক্ষ্য রাখেন না। ফলে ইহা দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের সহজ বুদ্ধিতে বা প্রকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলি দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া যেগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না, সেগুলিকেই আমরা অবিশ্বাস করি। ইহার দ্বারা ধর্ম্মের প্রাণ ও উহার বহিরঙ্গ, এই উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে এবং যে প্রাণের উপর বহিরঙ্গের গুরুত্ব নির্ভর করে ও যাহার সাহায্যে ঐ বহিরঙ্গকে বুঝা যায়, সেই প্রাণকেই তুচ্ছ জ্ঞান করায় ধর্ম্মের বহিরঙ্গও আমাদের চক্ষে মূল্যহীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। সাধারণতঃ প্রাচীন ভারতে অধ্যাত্ম-বিদ্যার আলোচনা যেরূপ হইয়াছিল, এখন আর সেরূপ হইতেছে না। তারপর য়ুরোপীয়গণ এই অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রান্তে রহিয়াছেন ; কিন্তু ইতিহাস রচনায় তাঁহারা যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রচলন করিয়াছেন, সকলেই তাহার অনুসরণ করিতেছেন। সুতরাং অধ্যাত্ম-বিদ্যা না বুঝিয়া, হিন্দু ধর্ম্মের যে সামান্য অংশ বুঝা [illegible] এবং না বুঝার জন্য যে বেশী অংশটার উপর অনাস্থা জন্মে, এই উভয়ের সমবায়ে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে আর তাঁহাদের প্রদত্ত এই শিক্ষা দেশ বিদেশে [illegible] হইতেছে। কোন বিশেষ বিজ্ঞানের ইতিহাসবিষয়ে কিছু জানি[illegible]

হইলে, ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন বৈজ্ঞানিকের বা তাঁহার রচিত গ্রন্থের সাহায্যে উহা জানিতে না পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হই না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিতে হইলে, ইহার সূক্ষ্ম বিষয়গুলি যিনি না জানেন এবং যিনি নিজের জীবনে সেগুলি উপলব্ধি করেন নাই, এরূপ লোকের নিকট হইতে এই বিষয়গুলি জানিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হই। আমাদের বেদ পুরাণাদিতে এমন অনেক বিষয় আছে যে, অধ্যাত্ম-বিদ্যার জ্ঞান না থাকিলে সেগুলি সম্যক্‌রূপে বুঝা যায় না; আর ইহারই অভাবে য়ুরোপীয়গণ ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গের নিকট সেগুলি মাত্র কুসংস্কারের সমষ্টিস্বরূপে প্রতিভাত হয়। ধর্ম্মের এই প্রকার ইতিহাস দ্বারা আমাদের দেশের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মের বহিরঙ্গ, ও সাধকগণের নিকট হইতে সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যগুলির মধ্যে যাহাতে কোন ব্যবধান না থাকে এবং এই দুইয়ের সমন্বয় দ্বারা ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষের উপর প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসেও ইহা বহু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের সময় হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে ধর্ম্ম ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজের পুষ্টিসাধনে আপনার অসামান্য পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ভারতেতিহাসের প্রসঙ্গে তাহার কথা বিশেষভাবে বলা আবশ্যক। না বলিলে, ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। সেই জন্য এইখানে আমি ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস বলিতে গেলে আমরা সাধারণতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে অশোকের সময় পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক

ইতিহাস এবং কনিষ্কের পর হইতে মহাযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতির সামান্য সামান্য অসংলগ্ন ইতিহাস বুঝিয়া থাকি। ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রায় দেড় সহস্র বৎসর কাল বিদ্যমান ছিল এবং এই সময়ে এই ধর্ম্ম কত-প্রকারের আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনেক সময়ে 'বৌদ্ধ-ধর্ম্ম' এই নাম ব্যতীত বুদ্ধের সেই প্রাচীন ধর্ম্মের সহিত পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন সামঞ্জস্যই নাই সুতরাং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাস বলিতে গেলে উহা কোন্ শতকের বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাস তাহা আমাদের বিশেষভাবে বলিয়া দেওয়া উচিত; নতুবা বিশেষ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু প্রতি শতকেও যে একই প্রকারের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ছিল তাহা নহে, একই সময়ে একই স্থানে কত সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল তাহা আপনারা য়ুয়ান্ চুয়াং হইতে দেখিতে পাইবেন; সে জন্য পৃথক্‌ভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির ইতিহাস লেখাই কর্ত্তব্য। এ কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পর এই সমস্ত খণ্ডিত ইতিহাস সম্মিলিত করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পূর্ণ ইতিহাস লেখা সম্ভব হইবে। সেরূপ ইতিহাস হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে; সে জন্য খণ্ডিত ইতিহাস কিরূপভাবে লিখিতে হইবে সে সম্বন্ধে কিছু আভাস দেওয়া যাইতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও অসমগ্রদর্শী।

নানাপ্রকারের বৌদ্ধ ধর্ম্মমত।

হীনযান বৌদ্ধ মত সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়েছে তাহা প্রধানতঃ হীনযানের আঠারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; সেই সম্প্রদায়ের নাম স্থবিরবাদ বা থেরবাদ। স্বীকার করি যে, স্থবিরবাদিগণ সংখ্যায় অল্প ছিল না, এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের প্রথম কয় শতকে উহারা সম্রাট অশোকের

হীনযান বৌদ্ধ মতের সম্পূর্ণ আলোচনা হয় নাই; যাহা হইয়াছে তাহা স্থবিরবাদীয়।

পোষকতায় স্বীয় প্রাধান্ত রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অন্ততম সম্প্রদায় সর্ব্বাস্তিবাদ, কনিষ্কের রাজত্বের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রায় তিনচারি শতক ধরিয়া প্রাধান্ত ও সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল; য়ুয়ান্ চুয়াংএর গণনানুসারে সাংমিতীয়গণ সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল এবং মহাসাংঘিকগণ সংখ্যায় তাদৃশ অধিক না থাকিলেও পরবর্ত্তী কালের মহাযানের পূর্ব্বপুরুষরূপে বিরাজ করিতেছিল।

স্থবিরবাদী ব্যতীত অন্তান্ত তিনটি প্রধান সম্প্রদায়।

আজ যে আমরা স্থবিরবাদিগণের গ্রন্থরাজি বহুল পরিমাণে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহার কারণ এই যে তাহাদের গ্রন্থ সমূহ সিংহলে এবং ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ভাষাতেই নিরাপদে রক্ষিত হওয়ায় ভারতে বৌদ্ধ সাহিত্যের ধ্বংসের সময় রক্ষা পাইয়াছিল। ইহার উপর বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ (রিস ডেভিড্স্) প্রমুখ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের উদ্যমে স্থবিরবাদীয় পালি গ্রন্থসমূহের বহুল পরিমাণে মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছে। এই কারণে অদ্যাবধি যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছে তাহা হীনযানীয় স্থবিরবাদসম্প্রদায়ের, সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্মের নহে। এই আংশিক এবং অসমগ্রদর্শী আলোচনাকেই আমরা অনেক সময়ে সমগ্র বৌদ্ধ সমাজের মতালোচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা বেশ দেখা যায় যে পূর্ব্বোল্লিখিত অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থবিরবাদ ব্যতীত অন্য তিনটী সম্প্রদায় কয়েক শতক ব্যাপিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রভূত শক্তি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহারা সকলেই হীনযানভুক্ত হইলেও ইহাদের দার্শনিক মত ও ধর্ম্মবিশ্বাস বিভিন্ন ছিল এবং ইহাদের ধর্ম্মসাহিত্যও যে

স্থবিরবাদীয় বৌদ্ধ মতের আলোচনা হইবার দুই কারণ;
১। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে পালি ভাষায় রক্ষিত গ্রন্থাবলী।
২। পালি টেক্সট্ সোসাইটীর উদ্যম।

বিভিন্ন ছিল তাহারও প্রমাণ ও আভাস পাইয়া থাকি। অধুনা এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ইতিহাসের দিকে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। খোটান্, মধ্যএসিয়া প্রভৃতি স্থানের ভূগর্ভ হইতে যে সমস্ত পুঁথির অংশ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের বহু সাহিত্য ভারতে লিখিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত চীনা পরিব্রাজকদিগের পুঁথি-সংগ্রহ হইতে দেখা যায়, যে তাঁহারা প্রত্যেক প্রধান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সাহিত্য পাইয়াছিলেন এবং তাহা স্বদেশে লইয়া গিয়া স্বীয় ভাষায় অনূদিত করিয়া রাখিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, অভিধর্ম্মপিটকের অন্তর্গত স্থবিরবাদিগণের যে কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, সে গুলির নাম এবং উপাদান, সর্ব্বাস্তিবাদিগণের ঐ শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থের সহিত একেবারেই মিলে না। স্থবিরবাদিগণের অভিধর্ম্মের গ্রন্থগুলির নাম হইতেছে (১) ধম্মসঙ্গনী (২) বিভঙ্গ (৩) ধাতুকথা (৪) পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি (৫) কথাবথু (৬) যমক (৭) পট্ঠন; আর সর্ব্বাস্তিবাদিগণের অভিধর্ম্মগ্রন্থাবলীর নাম ১। জ্ঞানপ্রস্থানসূত্র এবং তৎসহ ছয়টী পাদ' (১) সঙ্গীতপর্য্যায়, ২। প্রকরণপাদ ৩। বিজ্ঞানকায় ৪। ধাতুকায় ৫। ধর্ম্মস্কন্ধ ৬। প্রজ্ঞাপ্তিসার। এইরূপ সাংমিতীয় ও মহাসাংঘিকদিগেরও যে অভিধর্ম্ম সাহিত্যের পার্থক্য ছিল, চৈনিক পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণকাহিনী হইতে আমরা তাহার আভাস পাই; তবে শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম-গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। ইহা ব্যতীত বিনয় ও সূত্র পিটক সম্বন্ধে এই চারিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যও ছিল। ন্যান্‌জিয়োর (Nanjio) চৈনিক [illegible]

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ।

এই চারিটী সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটির সাহিত্য ছিল, এবং তাহা বিভিন্ন: দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম সাহিত্যের উল্লেখ।

তালিকায় আমরা এই চারিটী সম্প্রদায়ের চারিটী পৃথক্ পৃথক্ বিনয় গ্রন্থের অস্তিত্ব জানিতে পারি। এ সম্বন্ধে ওলডেন্‌বার্গ (Oldenberg) লিখিত বিনয়পিটকের ভূমিকায় এবং সোমা কোরোসি (Csoma Korosi) কৃত দুল্‌ভের (অর্থাৎ তিব্বতীয় বিনয়ের) বিশ্লেষণ হইতে (Asiatic Researches,xx) কিছু জানিতে পারা যায়। এই সকল সম্প্রদায়ের মতভেদ বিষয়ে ভব্য, বিনীতদেব ও বসুমিত্রের অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থ হইতে, এবং পালি গ্রন্থ কথাবথু ও সিংহলীগ্রন্থ নিকায়সংগ্রহ হইতে কিছু কিছু জানা যায়। দার্শনিক মত লইয়া ইহাদের মধ্যে বিশেষ অনৈক্য ছিল; সাংমিতীয় সম্প্রদায়ের মত অতিশয় প্রভিন্ন ছিল। তাহারা পুগ্‌গল বা আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিত। কিন্তু বৌদ্ধগণ 'আত্মার' অস্তিত্ব মানিতেন না, ইহাই প্রচলিত ধারণা। এখন চীনাভাষায় ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া এই সমস্ত সম্প্রদায়ের যে গ্রন্থাবলী রহিয়াছে তাহার উদ্ধার সাধন করিতে না পারিলে, বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন চিত্র অঙ্কিত করা সম্ভব হইবে না।

> কোথা হইতে আমরা সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে পার্থক্য বা তাহাদের ইতিহাস জানিতে পারি।

ভারত-বহির্ভূত কোন কোন দেশ, উক্ত অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোনও এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে ইহার কারণ এই যে ভারতীয় বৌদ্ধগণ যখন ধর্ম্মপ্রচার কল্পে ভারতের বাহিরে যাইতে আরম্ভ করেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের যে সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিল, সেই সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম বিদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন; বিদেশীয়েরাও সেই ধর্ম্মকেই আদিম বৌদ্ধ ধর্ম

> ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত দেশগুলি সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় ইতিহাস সঙ্কলনে কতদূর সাহায্য করিতে পারে।

বোধে অতি যত্নসহকারে ঐ সম্প্রদায়িক ধর্ম এবং উহার সাহিত্য রক্ষা করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি প্রথমেই সিংহলীদের কথা উল্লেখ করিতেছি। যে সময়ে স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল সেই সময়ে সিংহল বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়; তাহার ফলে এই সম্প্রদায়ের সমগ্র সাহিত্য ঐস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। সেইরূপ কনিষ্কের সহায়তায় যখন সর্ব্বাস্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করে, তখন খোটান, মধ্য এসিয়া প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়; সেই জন্য অধুনা যে সমস্ত পুথির অংশ ঐস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে তাহা প্রায়ই সর্ব্বাস্তিবাদিগণের। সাংমিতীয়দিগের সম্বন্ধেও এরূপ বলা যাইতে পারে। যদিও এই সম্প্রদায়ের কোন পুথি বা পুথির অংশ পাওয়া যায় নাই, তথাপি চম্পার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস যেরূপ জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সাংমিতীয় সম্প্রদায় এইস্থানটি প্রথমে অধিকার করিয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন, তাঁহার ভ্রাতা, ও ভগিনী এই সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সাংমিতীয় সম্প্রদায়।

চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চুয়াংএর ভ্রমণকাহিনী পাঠে জানিতে পারি যে পশ্চিম ভারতে এই সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বর্ত্তমান ছিল এবং বলভি ইহার কেন্দ্র ছিল। উক্ত পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে চম্পার বৌদ্ধেরা প্রায় সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তবে কোন্ সময়ে এবং কোন্ দেশ হইতে চম্পায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, ইহার সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; উহার ফলেই এই সম্প্রদায় পুগ্‌গলের (আত্মার) অস্তিত্ব স্বীকার করিত। য়ুয়ান্ চুয়াং বলেন, যে সমস্ত স্থানে সাংমিতীয় সম্প্রদায় দেখা যায়, সেইখানেই শৈব এবং পাশুপত ধর্ম্মাবলম্বিগণের আধিক্য লক্ষিত হয়। চম্পায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিশেষতঃ শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। চম্পার বৌদ্ধের

লিপিসমূহ হইতে জানা যায় যে, ঐ স্থানের বৌদ্ধধর্ম্ম, মহাযান ও শৈব ধর্ম্মের সংমিশ্রনের ফল। চৈনিক ইতিবৃত্ত (Chinese Annals) হইতে জানিতে পারা যায় যে ৬০৫ খৃষ্টাব্দে, ১৩৫০ খানি বৌদ্ধ পুস্তক চীনারা চম্পা হইতে লইয়া যায় (Eliot's Hinduism and Buddhism Vol. III, p. 148)। এসমস্ত তথ্য হইতে ধারণা হয় যে চম্পার বৌদ্ধধর্ম্মের বিবরণ বিশেষ ভাবে জানিতে পারিলে আমরা সাংমিতীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাইব। ঐ সম্প্রদায়ের অনেক পুথি য়ুয়ান্ চুয়াং ভারত হইতে চীন দেশে লইয়া গিয়া অনুবাদ করান; কিন্তু ন্যান্‌জিয়োর তালিকায় বিনয়পিটক ব্যতীত অন্য কোন পুথি ইহাদের স্বকীয় বলিয়া উল্লেখ নাই। এই সম্প্রদায় হইতে মহাযানধর্ম্ম অনেক তথ্য গ্রহণ করিয়াছে। য়ুয়ান্ চুয়াং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে এই সম্প্রদায়ের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বাঙ্গলা দেশে বাস করিত।

মহাসাংঘিক সম্প্রদায়।

মহাসাংঘিক সম্প্রদায় কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে মনে হয় যে দক্ষিণ ভারতেই ইহারা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, কারণ এই সম্প্রদায় হইতে যে সমস্ত উপসম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছিল তাহাদের পৃষ্ঠ পোষকগণ যে দক্ষিণ ভারতেই অবস্থান করিতেছিলেন তাহা অমরাবতী কার্লে প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ পুরাবস্তু হইতে জানিতে পারা যায়। এ সম্প্রদায়ের ইতিহাস যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কারণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণই প্রথমে বুদ্ধকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন ও ধারণীগুলিকে পিটকে স্থান প্রদান করেন। ইহাদ্বারা বেশ বুঝা যায় যে ইহারাই পরবর্ত্তী মহাযানধর্ম্মের পথ উন্মুক্ত করেন; সেই জন্য মহাযানের উৎপত্তি জানিতে হইলে, কি ভাবে মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের ক্রমবিকাশ হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্য বা অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভাব ইহার উপর কি পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া-

ছিল, তাহা জানা আবশ্যক। চীনদেশে রক্ষিত পুথিসমূহের মধ্যে মহাসাংঘিকদিগের 'বিনয়' ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থ ইহাদের স্বকীয় বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই; তবে য়ুয়ান্ চুয়াং এই সম্প্রদায়ের পনর খানি গ্রন্থ ভারত হইতে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত পুথি এখনও চীনদেশে আছে, তবে কোনগুলি মহাসাংঘিকদিগের তাহা নির্ণীত হয় নাই। ঐ সমস্ত পুথি নির্ণয় করা এবং চীন ভাষা হইতে উহাদের অনুবাদ বা সারসংগ্রহ করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য। যতদিন না এই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, ততদিন মহাসাংঘিকদিগের ইতিহাস উদ্ধার করিবার আশা নাই।

সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়।

সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার বিশেষ বলিবার কিছু নাই, কারণ পণ্ডিতগণ ইহার ধারাবাহিক বিবরণের আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন; দুই একজন এ সম্বন্ধে গ্রন্থাদিও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে লা ভ্যালি পুসাঁও (La Vallee Poussin), য়ামাকামি সোগেন (Yamakami Sogen) তাকাকুসু (Takakusu)র নাম উল্লেখ-যোগ্য।

স্থবিরবাদ সম্প্রদায়।

ইহার পর স্থবিরবাদের কথা। এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য মনে করি, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পালি-সাহিত্য পাঠে যে সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে তাহার উপকরণ প্রধানতঃ এই সম্প্রদায় হইতে গৃহীত।

পালিসাহিত্যের কাল হিসাবে পারম্পর্য্যের অভাব।

তবে পালি-সাহিত্যের আলোচনা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। প্রথমতঃ, কাল হিসাবে পালি-সাহিত্যের পারম্পর্য্য আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই। ভিনটারনিটস্ (Winternitz) এ সম্বন্ধে কিছু চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু অনুসন্ধান করিবার এখনও অনেক বিষয় অবশিষ্ট রহিয়াছে।

বোধ হয় অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাহিত্য কিছু কিছু পাওয়া না গেলে এবং সেগুলির সহিত পালি সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা না করিলে সময়ের পারম্পর্য্য অবধারণ করা সম্ভব হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সর্ব্বাস্তিবাদীয় ও স্থবিরবাদীয় অভিধর্ম্মের কথা বলা যাইতে পারে। এই দুই সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম দেখিলে কিরূপে অভিধর্ম্মসাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা কতকটা স্থির করা যাইতে পারে। (১)

পালি অভিধর্ম্ম-পিটকের আলোচনার অভাব।

অদ্যাবধি পালি-অভিধর্ম্ম সাহিত্যের ভালরূপ আলোচনা হয় নাই। এই সাহিত্যের সম্পাদন কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং কোন কোন পুস্তকের অট্‌ঠকথা অর্থাৎ টীকাও প্রকাশিত হইয়াছে। মিসেস্ রিজ ডেভিড্‌স্ (Rhys Davids) প্রমুখ দুই একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত এই সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে কেহ এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন নাই। আজকাল ব্রহ্মদেশের পণ্ডিত মং সোয়ে জান্ আউঙ্ (Maung Shwe Zan Aung) ও মং টিঙ্ (Maung Tin) এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। ইহার আলোচনায় দুইটি প্রতিবন্ধক আছে:—প্রথমতঃ অভিধর্ম্মের আলোচনা ভারত হইতে লোপ পাইয়াছে, আছে কেবল ব্রহ্মদেশে; এবং দ্বিতীয়তঃ পালিভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থগুলি ও তাহার অট্‌ঠকথা এই সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বহুকাল হইতে ত্রিপিটকের মধ্যে অভিধর্ম্ম পিটকেই বিশেষজ্ঞ। এখনও তাঁহারা বহুকাল প্রচলিত প্রথানুসারে, রাত্রে এ বিষয়ের শিক্ষা দিয়া থাকেন। এ বিষয়টি আয়ত্ত করিতে হইলে ইঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

---

(১) অধ্যাপক তাকাকুস্থ সর্ব্বাস্তিবাদীর অভিধর্ম্মের বিবরণ করিয়াছেন। Journal of the Pali Text Society, (১৯০৫ পৃঃ ৬৭—১৪৬)

সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক, কারণ ঐদেশের পণ্ডিতগণ এই সাহিত্যের উপর ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় অনেক টীকা টিপ্পনী,—

'লেথান' (Lethan বা Little-finger Manuals)

ব্রহ্মদেশে অভিধর্ম্মের আলোচনা।

'নিস্‌সয়' (Nissayas বা Burmese translations) লিখিয়া গিয়াছেন। মং সোয়ে জান্ আউঙ্ বলেন যে, ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় ধম্মসঙ্গনীর ২২ খানি অনুবাদ আছে। আভা (Ava) ও সাগাইং Sagaing জেলায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫০ এর মধ্যে অনেক বিখ্যাত টীকাকার অভিধর্ম্ম পিটকের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত জিনিস ব্রহ্মদেশ হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে আমাদের পক্ষে অভিধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ সম্ভব হইবে না। ভারতের বৌদ্ধগণ মনোবিজ্ঞানে যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা এ পুস্তকগুলি পড়িলেই বুঝা যায়। অভিধর্ম্ম পরিহার করিলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সামান্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। বৌদ্ধ-প্রণালীতে যোগাভ্যাস করিলে মানসিক বৃত্তিগুলি কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা অভিধর্ম্ম না বুঝিলে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

এই অভিধর্ম্ম ব্যতীত পালি-সাহিত্যের এমন অনেক পুস্তক আছে যাহার সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ। সিংহল ও

পিটক ব্যতীত অন্যান্য অনেক পালিগ্রন্থ আছে যাহার আলোচনা হয় নাই।

ব্রহ্মদেশে পরবর্ত্তী কালে বহু পালিগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ইহা আপনারা Gandhavamsa (অর্থাৎ গ্রন্থবংশ) এবং মেবেল বোডের (Mabel Bode) Pali Literature in Burma পাঠে অবগত হইতে পারেন। এই সমস্ত গ্রন্থ পিটকের অন্তর্ভুক্ত নহে; সেইজন্য ঐগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারি।

অশোকের সময় হইতে নাগার্জ্জুনের সময় (খৃঃ ২য় শতক) পর্য্যন্ত অর্থাৎ চারি শত বৎসর, হীনযানের সমৃদ্ধির সময় বলা যাইতে পারে। ইহার পর মহাযানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ক্রমশঃ এই মহাযান হীনযানকে হীনবীর্য্য করিয়া প্রায় সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রায় এক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এই মহাযানের প্রাধান্য, ভারত, তিব্বত, চীন প্রভৃতি স্থানে অক্ষুণ্ণ ছিল।

মহাযান সম্বন্ধে গবেষণা অপেক্ষাকৃত অল্প হইবার কারণ।

মহাযানের গুরুত্বের অনুপাতে বর্ত্তমান সময়ে এই সম্বন্ধে যে গবেষণা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য। বরং হীনযান সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক গবেষণা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পালি টেক্‌স্‌ট সোসাইটীর (Pali Text Society) উদ্যমে হীনযানীয় বহু পালি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার তুলনায় মহাযানীয় গ্রন্থ অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। মহাযানের অভ্যুদয় কিরূপে হইয়াছিল, তাহা অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন। মহাসাংঘিক সম্প্রদায় হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না। মহাসাংঘিক-দিগের পরবর্ত্তী চৈত্যবাদী, লোকোত্তরবাদী, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতগুলির মধ্য দিয়া মহাযানের পরিণতির ক্রম জানা আবশ্যক।

মহাযানীয় মহাবৈপুল্যসূত্রের প্রকাশ ও আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

তাহার পর, মহাবৈপুল্যসূত্রের অন্তর্গত মাত্র দুই তিন খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি এখনও পুথির আকারে আছে। এগুলিকে এখনও সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা হয় নাই। মহাযানের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল, এই পুথিগুলি হইতে তাহা বোধ হয় আরও স্পষ্টভাবে জানা যাইতে পারে।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম কানিষ্কের পর প্রচলিত হয়। অশ্বঘোষই প্রথমে

এই মহাযান ধর্ম্ম তাঁহার 'শ্রদ্ধোৎপাদ সূত্র' (*The Awakening of Faith* translated from Chinese by T. Suzuki) ও অন্যান্য গ্রন্থে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার কিছুদিন পরে ইহা এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়। নাগার্জ্জুন এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মাধ্যমিক শাখার, এবং অসঙ্গ যোগাচার শাখার উদ্ভাবন করেন। এই দুই শাখার দার্শনিক অংশের মধ্যে কিছু মতভেদ থাকিলেও, উভয়েই মহাযান ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও প্রচারকল্পে বহু পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের পরে অন্যান্য অনেক প্রথিতনামা বৌদ্ধ-পণ্ডিত এই দুই শাখভুক্ত ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়াছেন। মহাব্যুৎপত্তি, মাধ্যমিকবৃত্তি, ষ্টান্-জিয়োর তালিকা প্রভৃতিতে তাঁহাদের রচিত বহু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং অনেক পুস্তক চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, এবং কোন কোন গ্রন্থের মূল সংস্কৃতও আছে। এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে মহাযান ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গীন অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে।

মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের যুগ। ঐ সময়ে ভারতের মনীষিগণ এই ধর্ম্ম ও ইহার দর্শনের আলোচনায় তাহাদের মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন ; ইহার ফলে চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশের দৃষ্টি ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়। চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার পূর্ব্ব হইতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেও, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই চীনাদের, ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের জন্য আগ্রহ অতিশয় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহারই ফলে, চীনারা ঐ সময়ের যতগুলি বৌদ্ধপুস্তক মূল্যবান বলিয়া

মহাযান ধর্ম্মের ইতিহাস ও মহাযান-গ্রন্থের অনুবাদ সমূহের জন্য চীনাদের নিকট ভারত কতপ্রকারে ঋণী।

জানিতে পারে, সেগুলি আপনাদের দেশে লইয়া গিয়া এই দেশের পণ্ডিতের সাহায্যেই তাহাদের দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া সংরক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। ঐ সময়ে ভারতে মহাযান ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের যুগ সেই জন্য তাহাদের দেশ এই মহাযান ধর্ম্মে প্লাবিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধর্ম্মের পুস্তকাদি বহুল পরিমাণে তথায় সংগৃহীত হইতে থাকে। তাহারা অন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ যে লইয়া যায় নাই তাহা নহে, তবে মহাযান ধর্ম্মের দিকে তাহাদের বেশী দৃষ্টি থাকায় তাহারা মহাযান গ্রন্থই বেশী সংখ্যায় লইয়া গিয়াছিল। সুজুকি (Suzuki) তাঁহার Outlines of Mahayana Buddhism এর পরিশিষ্টে বলেন,—যে সমস্ত চীনা ভাষায় অনুদিত গ্রন্থ আছে, সেগুলির বিশ্লেষণ বিশেষ আবশ্যক; কারণ এগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস ব্যতীত হিন্দু সভ্যতার অনেক আভাস পাওয়া যায়।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হীনযান লোপ পায় নাই। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটি ধারা প্রবাহিত হয়, একটি মহাযান ও তৎসহ দুই দার্শনিক মত মাধ্যমিক ও যোগাচার, এবং অপরটি পুরাতন হীনযান ধর্ম্মের রূপান্তর। এই হীনযান ধর্ম্মের দুইটি দার্শনিক মত ছিল, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক। যে অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি এ সময়ে জীবিত ছিল, তবে তাহাদিগেরই মধ্যে সর্ব্বাস্তিবাদ বৈভাষিক নামে, ও অন্য কয়েকটি মতের সমষ্টি সৌত্রান্তিক নামে পরিচিত হয়। এই চারিটি দার্শনিক মত লইয়া তদানীন্তন পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক চলিত, ও তাহার ফলে প্রত্যেকটিরই নূতন নূতন সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। বৈভাষিক ও মাধ্যমিক সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা হইয়াছে কিন্তু সৌত্রান্তিক এবং যোগাচার সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই। সেই জন্য এই

দুই শাখার দার্শনিক মত সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্ম্মে যোগের স্থান।

বৌদ্ধধর্ম্মে যোগ যে একটি প্রধান অঙ্গ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত পালি গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া বলেন যে, উহাতে নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নাই। দীর্ঘনিকায়ে 'সতিপট্‌ঠনসুত্ত' মাত্র দেখিলে বোধগম্য হয় যে, বৌদ্ধদের যোগাভ্যাস ব্যাপারটি খুব বেশী পরিমাণে ছিল। ধ্যান ও সমাধির কথা যে কোন বৌদ্ধগ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টাইলেই দেখা যায়। বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির দুইটি মার্গ ছিল; একটির নাম 'গ্রন্থধুর' অর্থাৎ গ্রন্থ বা পিটক অনুশীলন ও ধর্ম্মোদেশনা প্রভৃতি কার্য্য; অপরটি "বিপস্সনাধুর" অর্থাৎ কেবল (গ্রন্থাভ্যাস না করিয়া) 'বিপস্সনা' (ধ্যান) দ্বারা মুক্তি-লাভ। এই শেষোক্ত পন্থাবলম্বীকে প্রথম হইতে ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়। হীনযানীয়দিগের 'অট্‌ঠসমাপত্তি' বা মহাযানীয়দিগের 'দশভূমি', এ সমস্তই বৌদ্ধ যোগের কথা। বৌদ্ধধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ই বিষয়টিকে অতি ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকে; ইহা বুঝাইবার জন্ম বহু গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছিল। বুদ্ধঘোষ 'বিসুদ্ধিমগ্‌গ' এই যোগের ব্যাপারটি বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা ব্যতীত ব্রহ্মদেশে ও সিংহলে এই বিষয় লইয়া অনেক গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছে, মং শোয়ে জান আউঙ (Maung Shwe Zan Aung) এর অভিধম্মত্থসঙ্গহের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা এবং রিংহলের Yogavacara's Manual হইতে এই হীনযানীয় যোগ সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়। মহাযান বৌদ্ধেরা যে যোগ ব্যাপারটি খুব বেশী পরিমাণে চর্চ্চা করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

মহাযানীয় প্রায় সকল পুস্তকেই 'যোগ' সম্বন্ধে কিছু না কিছু কথা আছে; তাহা ছাড়া তাহাদের 'নবধর্ম্মের' মধ্যেই "দশভূমীশ্বর" নামক একখানি বিপুল গ্রন্থ রহিয়াছে। তাহা ভিন্ন 'সমাধিরাজ' বলিয়া আরও একখানি গ্রন্থ হজ্‌সন্‌ গ্রন্থ-সংগ্রহে (Hodgson Collectionএ) রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী কালের মহাযানীয় এক সম্প্রদায় 'যোগাচার' নামেই অভিহিত হয়; এই সম্প্রদায় যোগাভ্যাসের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিল। এ সম্প্রদায়ের প্রধান মনীষী অসঙ্গ 'যোগাচার ভূমিশাস্ত্র' লিখিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। চীনা ভাষায় অনূদিত যোগ সম্বন্ধীয় দুইখানি পুথি ন্যান্‌জিয়োর তালিকায় (পুথি নং ১৫১০, ১৫১৫) দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধদিগের যোগ সম্বন্ধীয় নিয়মাদি, নানা স্তরের মানসিক অবস্থা, যোগের অন্যান্য আভ্যন্তরীণ বিষয় ও পরিভাষার সহিত হিন্দু যোগশাস্ত্রের বিশেষ ঐক্য রহিয়াছে। ভারতবর্ষে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ই যোগসাধন করিয়া থাকে। বৌদ্ধগণের যোগসম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব নাই; তবে বিষয়টি লইয়া ভালরূপ চর্চ্চা হয় নাই। কেবল পুস্তক হইতে এই ব্যাপারের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা যায় না, উহার অনেক জিনিষ গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে এবং সেগুলি সাধারণের অগোচরে রহিয়াছে। তথাপি যতদূর সম্ভব যোগসম্বন্ধে বৌদ্ধ উক্তি ও গ্রন্থ একত্র করিয়া তাহার মর্ম্মগ্রহণ করা উচিত, কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা বা তাহার ক্রমবিকাশ জানিবার জন্য উহা বিশেষ সাহায্য করিবে।

এই প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী কালের মহাযানীয় এক সম্প্রদায়ের কথা বলা আবশ্যক। দক্ষিণ ভারতে খুব সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায় গঠিত হয়; ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইঁহাদের নিকট নির্ব্বাণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া

ধ্যানী সম্প্রদায়

গৃহীত হয়। এই সম্প্রদায়ের সংস্কৃত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, এবং ইঁহাদের সম্বন্ধে ভারতবর্ষ হইতেও কিছু জানা যায় না। এই সম্প্রদায়ের অষ্টাবিংশতিতম ধর্ম্মাধিনায়ক বোধিধর্ম্ম দক্ষিণ ভারত হইতে জলযানে চীনদেশে গমন করেন এবং তথায় Tien tai (ধ্যানী) নামক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। প্রথমে অতি-শয় বাধা বিঘ্ন পাইলেও তিনি এই সম্প্রদায়কে চীনে স্থায়ী করিতে সমর্থ হন। কালে চীনদেশে এবং তৎপরে জাপানে এই সম্প্রদায় বিস্তৃতি লাভ করে; ইহার ইতিহাস হইতে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের আচার্য্যগণের

চীনা ভাষায় এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস

পরম্পরা প্রাপ্ত হই। এই আচার্য্যপরম্পরার ইতিহাস চীনা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ক্লানজিয়োর তালি-কায় ১৩৪০, ১৫২৪,১৫২৬, ১৫২৯, ১৬৫৮, ১৬১৯, সংখ্যার পুথিগুলিতে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। এই গুলিতে 'ধ্যানী সম্প্রদায়ের আচার্য্য পরম্পরার প্রয়োজনীয় বিবরণ আছে। ১৩৪০ সংখ্যার পুথিতে মহাকশ্যপ হইতে ভিক্ষুসিংহ পর্য্যন্ত তেইশজন ধর্ম্মাধিনায়কগণের অনুক্রমের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এইরূপ আচার্য্য পরম্পরার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকায় মনে হয় যে যোগ সম্বন্ধীয় অনেক জিনিষ গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিত। বৌদ্ধযুগের এই ইতিহাস আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মেও যোগই প্রধান স্থান অধিকার করে। তবে তাহাতে অনেক স্থলে প্রাচীন যোগাভ্যাসের পবিত্রতা রক্ষিত হয় নাই।

ভারতবাসীরা যে কখন ভারতের বাহিরে রাজ্যজয়ের জন্য বহির্গত হয় নাই, ইহা ঐতিহাসিক সত্য; কিন্তু তাঁহারা বিনা রক্তপাতে যে দেশ জয় করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভারতের বাহিরে বহুদূরস্থিত স্থানে ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে [illegible]

বাসীর গৌরব অন্ত জাতির গৌরব অপেক্ষা যে কত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। অশোক ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপন করিবার মহতী ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেশে যে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন তদ্দ্বারাই বিদেশীয়দিগের নিকট ভারতবর্ষ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি এই প্রকার ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া যান এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ভারতবাসীরা তাঁহার এই সদুদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সেজন্য এখন ভারতের ইতিহাস বলিতে গেলে আমাদের ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। আমাদের দেখিতে হইবে যে তৎকালীন ভারতবাসিগণ কোন্ কোন্ দেশে এবং কিরূপভাবে ভারতের ধর্ম্ম, শিক্ষা, ও সভ্যতা বিদেশীদিগের মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বিদেশীয়দিগকে হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া হিন্দু-রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা ভারতের ইতিহাসে কুষাণদের কীর্ত্তিকলাপ জানিতে চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতবাসীরা কুষাণদের রাজ্যে গিয়া কি স্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা জানা আবশ্যক। শুধু কুষাণদের রাজ্য কেন, Central Asia, China, Java, Cambodia, Siam, Ceylon, Burma, Tibet প্রভৃতি দেশে গিয়া তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপ করিয়াছিলেন, এবং কোন কোন স্থানে ধর্ম্মরাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাজত্বও স্থাপিত হয়। এই সমস্ত দেশের প্রত্যেকটিতে ভারতবাসী কোন্ সময়ে গিয়াছিল এবং তথায় কি করিয়াছিল ইহা একটি জ্ঞাতব্য বিষয়। তৎপরে ভারতের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের জন্য, বিশেষতঃ বৌদ্ধ ইতিহাসের জন্য, এ সমস্ত উপনিবেশের সংবাদ লওয়া আবশ্যক। কারণ ভারতের যে প্রদেশের লোক দ্বারা বহির্ভারতে উপনিবেশ স্থাপিত

ভারতের ইতিহাস ভারতের উপনিবেশের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে জড়িত।

হইয়াছিল, সেই উপনিবেশে তাহারা যে ধর্ম্মশিক্ষা বা সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম, সেই শিক্ষা ও সেই সভ্যতা যে তাঁহাদের আপনাদের দেশে প্রবর্ত্তিত ছিল তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। সেই জন্য যদি ভারতের উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস পাই, তাহা হইলে ভারতের বিভিন্ন সময়ের শিক্ষা ও সভ্যতার কিছু কিছু ইতিহাস পাইব। এইরূপ ইতিহাস সম্বন্ধে Eliot সাহেব তাঁহার Hinduism and Buddhism এর তৃতীয় খণ্ডে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় দিয়াছেন এবং অনেক German, French, Dutch, Russian ভাষায় লিখিত এই প্রকার ইতিহাসের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ ঐ সমস্ত উপনিবেশের ইতিহাস হইতে আমরা পাইতে পারি।

মধ্য এসিয়ায় ভারতের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন।

অশোকের সময় হইতে গান্ধার ও মধ্য-এসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছিল। তবে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ঐস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণ আকার ধারণ করে। কাশ্মীরে বা উত্তর পশ্চিম ভারত-প্রান্তে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ই এ সময়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; তাই দেখা যায় যে মধ্যএসিয়ায় এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ঐ উপনিবেশ নীত হয়। খোটানে মহাযান ধর্ম্মও ছিল। ঐতিহাসিকগণ সেজন্য মনে করেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটি ধারা মধ্যএসিয়ায় প্রবেশ লাভ করে। প্রাচীনটি সর্ব্বাস্তিবাদ, এবং দ্বিতীয়টি মহাযান ধর্ম্ম। আজ Hoernle, Le Coq, Sylvain Levi, Grunwedel, Stein প্রভৃতি য়ুরোপীয়দিগের উদ্যমে মধ্য এসিয়ার ভূ-গর্ভ হইতে অনেক পুঁথি ও পুঁথির ছিন্নাংশ, বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি, স্তূপ প্রভৃতি নানা পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সর্ব্বাস্তিবাদ তথায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। অন্যান্য হীনযান বা মহাযান সম্প্র-

দায়ও তথায় কিছু কিছু থাকিতেও পারে। আজ সেথানে যে সমস্ত পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, পিটক কেবল পালি ভাষায় লিখিত হয় নাই; সংস্কৃত ভাষাতেও পালি ভাষার ন্যায় আর একখানি পিটক ছিল এবং চীনারা এই পিটকের অধিক সংবাদ রাখিত এবং এগুলিকে অনুবাদ করিত। পালিগ্রন্থ তাহাদের যৎসামান্য করায়ত্ত হইয়াছিল। মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারিলে আমরা সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের এবং খৃষ্টীয় প্রথম তিন চারি শতাব্দীতে উত্তর পশ্চিম ভারতে কি ধর্ম্মবিশ্বাস, কি পূজাপদ্ধতি, কি ভাষা, কি সভ্যতা, কি স্থাপত্য শিল্প, কি গ্রন্থ বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা জানিতে পারিব।

সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় পিটক।

চীনাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম জানিতে হইলে চীনদেশের আশ্রয় লইতে হইবে, কারণ মহাযান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময়ে, চীন ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ও বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে চীনারা সাদরে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সম্মান করে ও তাহাদের বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ অনুবাদ করাইয়া লয়। চীনের রাজগণ এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন; তাই অর্থেরও বন্দোবস্তের অভাব হয় নাই। চীনারা ভারতীয় পণ্ডিতদিগকে যে কতদূর সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা তাহাদের কতকগুলি পুঁথি হইতে বেশ বুঝা যায়।

চীনারা ভারত ইতিহাস উদ্ধারকার্য্যে কি সাহায্য করিতে পারেন।

ন্যানজিয়োর তালিকায় পরে পরে তিনখানি পুথি পাওয়া যায়। ইহার প্রথমখানির নম্বর ১৪৯০, ইহা ৫১৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত। ইহাতে ২৫৭ জন ভিক্ষুর জীবনচরিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাতে আনুষঙ্গিক ভাবে ২৩৯ জন ভিক্ষুর নামও পাওয়া যায়। ইঁহারা ৬৭ হইতে ৫১৯

খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনদেশে বসবাস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুথিখানির নম্বর ১৪৯৩; ইহাতে ৩৩১ জন ভিক্ষুর জীবনবৃত্তান্ত এবং আনুষঙ্গিকভাবে ১৬০ জন ভিক্ষুর নাম উল্লেখ আছে। ইঁহারাও ৫১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনদেশে বসবাস করিয়াছিলেন। তৃতীয় পুথিখানির নম্বর ১৪৯৫; ইহাতে আরও ভিক্ষুর নাম সংযোজিত করা হইয়াছে। চীনবাসিগণ ভারতবর্ষ হইতে যেমন অনেক পণ্ডিত লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা তেমনি নিজেদের দেশ হইতেও ভারতবর্ষে অনেক পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। ৬৯২ খৃষ্টাব্দে ইচিং ভারতবর্ষ হইতে একখানি (ন্যান্‌জিয়োর তালিকায় ১৪৯১ সংখ্যক পুথি) পুথি চীন দেশে পাঠান। ঐ চীনদেশ হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতে ও ভারতবর্ষের সান্নিকটস্থ দেশে আগমন করিয়াছিলেন, ঐ পুথিতে তাঁহাদের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অন্য বহুগ্রন্থ চীনা ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস-সংক্রান্ত দুই একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিতে পারি যথা—শাক্যবংশের ঐতিহাসিক বিবরণ (ন্যান্‌জিয়ো ১৪৬৮ নং), বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কীয় বিবরণসংগ্রহ (ন্যান্‌জিয়ো ১৪৩৯ ও ১৪৮১ নং)

কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

কম্বোজ, চম্পা, এবং যবদ্বীপে, হিন্দু ও বৌদ্ধ উপনিবেশ কোন্ সময়ে স্থাপিত করিয়াছিল, তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন, ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপীড়িত হওয়ায় ঐ সমস্ত দেশে বৌদ্ধভিক্ষুগণ আশ্রয় লইয়াছিলেন; কাহারও বা ধারণা যে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ একসঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে ঐ সমস্ত দেশে গিয়াছিলেন; কেহ কেহ মনে করেন, রাজ্য [illegible] করিবার মানসে বা ব্যবসায় উপলক্ষে ভারতবাসীদিগের উক্ত দেশসমূহে যাতায়াত ছিল এবং কালক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ তথায় স্থায়ীভাবে [illegible]

করে। এগুলির কোন একটি বা সবগুলি কারণই যে ঠিক, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে দেখা যাইতেছে যে, কম্বোজ, চম্পা এবং যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দুই প্রকার ধর্ম্মই খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেছিল এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ বৈরীভাব ছিল না। কারণ যে সময় আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার অনুমান করিতেছি, সে সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল; তখন মহাযানের পূর্ণশক্তি বর্ত্তমান এবং মহাযানীয় ধর্ম্ম সেই শুষ্ক প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম নহে। তাহার মধ্যে পূজা, ভক্তি প্রভৃতি অনেক জিনিস প্রবেশ করিয়াছে, এবং সেগুলি প্রায়ই সমসাময়িক হিন্দু ধর্ম্মের দান। এ সময়ে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরিণতির যুগ এবং এই দুই ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিতেছিল। বিশেষতঃ উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে এই দুই ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম।

দক্ষিণ ভারতে এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম কতদূর কি করিয়াছিল তাহার ইতিহাস আমরা পাই না। অমরাবতী ও কার্লে স্তূপের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ কারুকার্য্যময় এই স্তূপসমূহ দেখিয়া মনে হয় যে, দক্ষিণ ভারতেরও কোন কোন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মও বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কথাবত্থুর অট্ঠ কথা এবং অন্যান্য পালি গ্রন্থ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি সম্প্রদায়কে "অন্ধক" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। আমরা অমরাবতী স্তূপে 'পূর্ব্বশৈল' ও 'অপরশৈল' সম্প্রদায়ের নাম পাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথিতনামা ভিক্ষু আর্য্যদেব, দিঙ্নাগ, ধর্ম্মপাল প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের লোক। এই প্রমাণ হইতে বুঝা যায় দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। মণিমেখলৈ, শিলপ্পধিকারম্, কুণ্ডল কেশী, নীলকেশীতেকচ্চু নামক তামিল

গ্রন্থে (Indian Antiquary Vol. 37) বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানিবারও আছে। এইরূপ তামিল গ্রন্থ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। মহাবংশে সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের রাজাদের মধ্যে রাজ্য ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত যে বিবাদ বিসংবাদ চলিয়াছিল, তাহার বিবরণ হইতেও দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তাহার ইতিহাস বিশেষ মূল্যবান; ইহা দ্বারা ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস ও উহার আভ্যন্তরীণ তথ্যগুলি বুঝিতে পারা যাইবে। একখানিও মহাযানীয় বৌদ্ধশাস্ত্র আমরা ভারতে পাই নাই, এই বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্র ও এরূপ বিস্তৃত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে এমন ভাবে অপসারিত হইল যে, তাহার একখানি গ্রন্থও পাওয়া যায় নাই। গবেষণাকারিগণ অনুমান করেন যে, বৌদ্ধশাস্ত্র মুসলমান কর্ত্তৃক সমস্তই ভস্মীভূত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ যাহা নেপালে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই রক্ষা পাইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম কতকটা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের অত্যাচারে এবং কতকটা হিন্দু ধর্ম্মের পেষণে লোপ পাইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের আচার, ব্যবহার ও পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি অনেক জিনিস প্রচ্ছন্নভাবে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। এক্ষণ আমার বক্তব্য এই যে নেপাল ও তিব্বতের সাহায্য না পাইলে আমরা বৌদ্ধ ইতিহাস সম্বন্ধে এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। নেপালে খুব সম্ভব অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তবে একাধিপত্য কোন কালেই করিতে [illegible] নাই; নেপালে দেশীয় ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিল; তারপর ব্রা[illegible] কতকটা সেখানে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক [illegible]

আশ্রয়প্রার্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে এবং বৌদ্ধ পুথিগুলিকে স্থান দান করিয়া ভারতবর্ষকে চিরদিনের জন্য ঋণী করিয়া রাখিয়াছে। নেপাল হইতে যে কত পুথি পাওয়া গিয়াছে এবং সে গুলির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর আমার বলিবার কিছু নাই।

তারপর তিব্বতের কথা। তিব্বতের কাছে ভারতবর্ষ আর এক কারণে ঋণী। ভারতের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থান হইলেও, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক পরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ৬৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা Srong btsan Gam Poর নেপালী ও চীনা রাণীদের আনুকূল্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নেপালে স্থান পায়। কিন্তু এ সময়ের বৌদ্ধধর্ম্ম অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন ও অসঙ্গের সেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল না। এ সময়ে উহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি ধর্ম্ম মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম নাম দিয়া প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেজন্য তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম যে প্রধানতঃ মহাযানের এই রূপান্তরিত অবস্থা তাহা বেশ বুঝা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম ৭ম শতাব্দীতে কি ভাবে ভারতে অবস্থান করিতেছিল, তাহা জানিবার উপায় তিব্বতের ইতিহাসে রহিয়াছে। তিব্বতীয়েরাও চীনাদের মত বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল। তাহারা স্বদেশের শিক্ষার্থীদিগকে ভারতে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষার জন্য পাঠাইত এবং ভারত হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতও লইয়া যাইত। চীনাদের অপেক্ষা তাহাদের অনুবাদে বিশেষত্ব আছে। তাহাদের অনুবাদগুলি এতই আক্ষরিক যে তাহাদের অনুবাদ হইতে মূল সংস্কৃতও অনেকটা উদ্ধার করা যাইতে পারে। [illegible] তাহারা অনুবাদগুলি মূলের অনুরূপ রাখিয়াছে, এবং ভারতীয় [illegible] যথাযথ ভাবে রক্ষা করিবার জন্য তিব্বতীয় সংস্কৃত শব্দকোষের

সৃষ্টি করিয়াছে। এই শব্দকোষ এখন সেই অনুবাদগুলির মর্ম উদ্‌ঘাটন করিতে বিশেষ কার্য্যকরী হইতেছে। পদ্মসম্ভব বা পদ্মকরের মঠাধিকারিত্বের সময়ে ৭৪৭ খৃঃ তিব্বতের এই সাহিত্যের চর্চ্চা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। পদ্মসম্ভব একজন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিব্বতীয়দিগের বৌদ্ধ পুথি-সংগ্রহ চীনাদের অপেক্ষা কম ছিল না। তবে মহাযান এবং পরবর্ত্তী কালের মহাযানীয় তন্ত্রশাস্ত্রের উপর ইঁহাদের অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। হীনযানীয় গ্রন্থ তাঁহারা অনুবাদ করিয়াছেন বটে, তবে মহাযানীয় ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক তিব্বতে তান্ত্রিক গ্রন্থের সংখ্যার তুলনায় সেগুলি নিতান্ত অল্প। বৌদ্ধধর্ম্মের উপকরণ। (Asiatic Researches Vol. xx ; P. Cordier, Catalogue du Fonds Tibetain, 2 Vols).

অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় বাঙ্গালায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের সমৃদ্ধির যুগ। সেই কারণে তিব্বতে এই ধর্ম্মসম্পর্কীয় বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। বৌদ্ধতন্ত্র ও বাঙ্গালায় তৎকালীন বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা বুঝিতে হইলে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এই সময়ে বাঙ্গালাদেশে বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদি নাম দিয়া বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্ম্ম নানাভাবে অবস্থান করিতেছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালায় বৌদ্ধ[illegible] সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" নাম [illegible] বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি [illegible] হইল 'অদ্বয়বজ্রের' ছোট ছোট কুড়ি খানি পুথি পাইয়াছেন। সে[illegible] [illegible] পড়িয়া পর পর সাজান যে তাহা হইতে বাঙ্গালী বৌদ্ধদিগের [illegible]

ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাঁহার দুইখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন।

চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ বাঙ্গালাদেশে হীনযানীয় এবং মহাযানীয় বহু বৌদ্ধভিক্ষু ও বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। য়ুয়ান্ চুয়াংএর বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধ ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের নানাসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরও বাস ছিল। বাঙ্গালাদেশ যে বহু সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠানভূমি ছিল, এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎপত্তি এই নানাসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে উদ্ভূত হইয়াছিল। আপাত-দৃষ্টিতে আমরা এই তন্ত্রধর্ম্মকে যেরূপ চক্ষেই দেখি না কেন, ইহার মধ্যে অনেক ভাল জিনিস নিহিত আছে। Avalon সাহেব তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা তন্ত্রশাস্ত্র বুঝিবার পথকে সরল ও সুগম করিয়া দিবে।

বাঙ্গালাদেশে নানা-সম্প্রদায়ের স্থান। তান্ত্রিক ধর্ম্মে বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বহু বৈশি-ষ্ট্যের সমাবেশ।

ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি সম্বন্ধে বহু কারণের নির্দ্দেশ করেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন ও তাহার অপব্যবহারী তন্মধ্যে অন্যতম। তারপর দেশীয় নরপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের অত্যাচার প্রভৃতি আরও অনেক কারণ আছে। কি কি কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইল, তাহার নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষ গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালা দেশে প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম লোপ পাইলেও, ইহা প্রচ্ছন্নভাবে বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া আছে। বাঙ্গালায় সহজিয়া সম্প্রদায়, ধর্ম্ম সম্প্রদায়, (ধর্ম্মপূজকগণ), ও শৈব সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে লুপ্তাবশিষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ধর্ম্মমঙ্গল, গম্ভীরার গান প্রভৃতি পাঠে আমরা

ইহার প্রমাণ পাই। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের এই সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি পাঠ ও আলোচনা করিলে, বঙ্গীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সঙ্কলনের বহু নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাবস্থার ঐতিহাসিক উপকরণ বাঙ্গালা দেশ হইতেই পাওয়া যাইবে। এবং এগুলি সংগৃহীত হইলে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও লুপ্ত হইবার কারণগুলি বিশদভাবে জানা যাইবে। পালি সাহিত্যে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যযুগের উন্নতাবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়, তেমনি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও বৌদ্ধধর্ম্মে তান্ত্রিক অভ্যুত্থান ও ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের লোক যাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে ইতিহাস লিখিতে সমর্থ হন, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইতে হইবে। বিদেশীয় লেখকগণ সময়ে সময়ে ভারতবাসিগণের ভাব ও উদ্দেশ্য সম্যক্ অনুধাবন করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে যখন য়ুরোপীয়গণ ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ও ইতিহাস লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা যে পরিমাণে ভ্রান্তি করিতেন, পরবর্ত্তী কালে তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় (৭৮ পৃঃ) জে, সি, ম্যাথু এম্ এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "The Sakyas (as shown by Asvaghosha in his Buddha-charita) were also called *Ikshvakus, which means 'sugar-cane'*. It is perhaps no more

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনোযোগ আবশ্যক।

than juggling with words to say that the Calami—the cane people of Josephus—are the same as the Sakyas and that therefore the pious Jew of Aristotle was a Buddhist." ইক্ষ্বাকু বংশের 'ইক্ষ্বাকু' শব্দ দেখিয়াই ম্যাথু সাহেবের 'ইক্ষুর' কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে; তাই তিনি 'ইক্ষ্বাকু' শব্দের অনুবাদ করিতে গিয়া sugar-cane শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিয়া তিনি যে ভ্রম করিয়াছেন, সেই ভ্রমই তাঁহার একটি সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইয়াছে। এইরূপ ভ্রম স্বাভাবিক, ইহা অপরাধ নহে। কিন্তু মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচিত "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থের প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদে Weber প্রভৃতি দুই একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, তাঁহাদের যে সমস্ত দোষ দেখাইয়াছেন, সেগুলি ঐ পণ্ডিতমণ্ডলীর ইচ্ছাপ্রসূত। এরূপ অবস্থায় ইহা যে গুরুতর অপরাধ তাহা সহজেই অনুমেয়। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতাকে সাধ্যমত অপ্রাচীনরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, ভারতের গৌরবময় অতীত সত্যসমূহকে কল্পনা-প্রসূত বা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস, বা ভারতীয় যে কোন গৌরবময় কাহিনীর বিরুদ্ধে অযথা বিরুদ্ধভাব লেখনী সাহায্যে প্রচার করা, বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মাত্র ঐ উদ্দেশ্যের পোষকতার জন্য সত্যের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা সঙ্গত নহে। আমাদের অতীত ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের পথে এগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধক। অনেক সময়ে বৈদেশিক পণ্ডিতগণ স্বাভাবিক ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতেতিহাস লিখিবার সময় বিভিন্ন বিভিন্ন অধ্যায়ের আয়তনের ভিতর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন না। আলেক্জেণ্ডারের ভারত-আক্রমণের বিবরণ ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা অধিকার করে কিন্তু অশোকের ন্যায় লোকপ্রিয় আসমুদ্র ভারত-সম্রাটের রাজত্বের

বিবরণ মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হয়। লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল, এল, এ ওয়াডেল (L. A. Waddell) সাহেব ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক্ রিভিউ পত্রিকায়, সংস্কৃতভাষা, এমন কি বৈদিক সংস্কৃত, খৃষ্ট-পূর্ব্ব দুই শত অব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না, ইহা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল মাত্র এসিয়াটিক্ রিভিউ পত্রিকায় নহে, অন্যত্রও, তিনি এই মর্ম্মে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতের পোষকতাকল্পে তিনি অধ্যাপক সেস্ (Sayce) সাহেবের (Introduction to the Science of Language, p. 172) উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উক্ত অধ্যাপকের মতে ভাষা-গঠনের দিক হইতে পরীক্ষা করিলে গ্রীক্ ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া মনে হয়। ওয়াডেল্ সাহেবের উক্তি উপরি-লিখিত দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে, তাহা বলা কঠিন। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে আমাদের দেশবাসীকে বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অবলম্বনে ইতিহাস রচনায় শিক্ষিত করিতে হইবে। পক্ষান্তরে তাঁহারা যাহাতে স্বদেশবাসীর গৌরববৃদ্ধির মানসে পক্ষপাত না করেন সেদিকেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ব্যক্তি, জাতি, ঘটনা, বা দেশ বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, ও কোন কোন বিষয়ে অতিবিশ্বাস প্রভৃতি দোষ সাধ্যমত তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে। নচেৎ প্রকৃত ইতিহাস লেখা সুদুর পরাহত হইয়া পড়িবে। ইহা সুখের বিষয় যে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বহু দেশবাসী আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালাদেশের বহু স্থানীয়, প্রাদেশিক, এবং জেলার ইতিহাস ও বিবরণ রচিত হইয়াছে। সেগুলির ভিতরে ইংরাজী ভাষায় লিখিত District Gazetteer প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক সময়ে অধিক সংবাদ পাওয়া যায়। এই সমস্ত ইতিহাসের সকলগুলি, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে লিখিত ও আদর্শস্থানীয় না হইলেও, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ

ইতিহাস রচনাকার্য্যে এগুলি যে সাহায্য করিবে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার প্রাদেশিক ইতিহাস যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, ইহার পরিমাণ আরও পরিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে লিখিবার ধারাকেও উন্নত করা চাই। এবিষয়ে য়ুরোপ উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখক ফ্রেড্‌রিক্ হ্যারিসন্ বলেন প্যারিসের ইতিহাস সম্বন্ধেই আশি হাজার পুস্তক ও সত্তর হাজার এন্‌গ্রেভিংস্ (Engravings) আছে (The Meaning of History, p. 386)। জনৈক লেখক বলেন, নেপোলীয়নের উপর লিখিত ইংরাজী গ্রন্থ ও পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার এবং বিভিন্ন ভাষায় ঐসম্বন্ধে লিখিত পুস্তক এত বেশী যে, একজন লোক যদি প্রত্যহ ১খানি হিসাবে গ্রন্থ পড়িয়া শেষ করেন, তাহা হইলেও ঐসমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া শেষ করিতে তাঁহার এক শত বৎসর অতিবাহিত হইবে।

ভূ-গর্ভ খনন দ্বারা ঐতিহাসিক উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য ভারত সরকার, প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগ হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন, বড়ই পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালার জন্য তাহার অতি সামান্য অংশও তাঁহারা ব্যয় করেন না। মনে হয়, যেন এই দেশের জন্য তাঁহাদের মনোযোগ একেবারেই নাই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রতি জেলাতেই এমন অনেক স্থান আছে, যেগুলি খনিত হইলে ইতিহাসের বহু মূল্যবান্ উপকরণ, —বহু রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ, লুপ্ত হিন্দু-মন্দির বা বৌদ্ধ-বিহার, প্রস্তর মূর্ত্তি, তাম্রফলক, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে। অতীত কালের এই সমস্ত লুপ্ত ও অমূল্য স্মৃতিচিহ্নগুলির উদ্ধারের জন্য সরকারী বা বে-সরকারী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যদি চেষ্টা না করে, তাহা হইলে

বাঙ্গালা দেশের প্রতি সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অমনোযোগিতা।

আমাদের দেশের ও জাতির অতীত ইতিহাস চিরতমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে।

দেশ প্রচলিত প্রবাদ, আখ্যায়িকা প্রভৃতির ভিতর হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা, ইতিহাস রচনার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিলেও, এগুলি অতি সাবধানে সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ইহাদের প্রকৃত মর্ম্ম স্থির-ভাবে উপলব্ধি করিয়া তথ্যানুসন্ধানে অগ্রসর হইতে হইবে। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় মালদহের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহু পরিশ্রম স্বীকারে পল্লীবাসী জনগণের নিকট হইতে অতি সাবধানে জনশ্রুতি, আখ্যায়িকা, গ্রাম্যপ্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে এসম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সকলেরই প্রণিধান করা উচিত।

বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত আখ্যায়িকা প্রভৃতি হইতে ইতিহাস লেখার চেষ্টা।

"ভ্রমণ ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য মধ্যে মধ্যে অরণ্য মধ্যস্থ কোচ, পলিয়া প্রভৃতি অসভ্য অথচ সরল, সত্যবাদী জনগণের সহবাসে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। এই সূত্রে গোশালে, তৃণ শয্যায়, বিনা প্রদীপে রাত্রি-বাস করিতে হইয়াছে। কখন কখন অনাহারে বিনা জলপানে দিন কাটাইতে হইয়াছে। বনমধ্যে মশকের উপদ্রব যথেষ্ট; ভীষণ মশার দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘুঁটে ও তুষের ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়া সরল কৃষকগণের সহিত মিশিয়া সুখদুঃখের কথার মধ্য দিয়া, দেশের ইতিহাস সংগ্রহে অগ্রসর হওয়া যায়। তাঁহাদের সহিত মিশিতে না পারিলে, তাঁহারা আগন্তুকের নিকট

এই ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ও তাঁহার মন্তব্য।

মন-প্রাণ খুলিয়া কোন কথাই বলিতে চাহেন না। দিবসে তাঁহাদের সহিত আলাপের সম্ভব নাই, কারণ তাঁহারা আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। রাত্রে তাঁহাদের অবকাশ হয়। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা দেশের বংশপরম্পরাগত প্রবাদ অবলম্বনে যে সমুদায় কথা বলিয়া থাকেন, তাহা ঐতিহাসিক হিসাবে অমূল্য। তাঁহারা দেশের পুরাতন রাজধানীর কথা, শিল্প বাণিজ্যের কথা, নদীর কথা, দেবতার কথা, দেশাচার, কুলাচার প্রভৃতির কথা সরল মনে বলিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষিকর্ম্মোপলক্ষে কোথায় কি পাইয়া থাকেন, কোথায় কি দেখিয়াছেন, কি প্রাচীন দ্রব্যাদি তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সরল ভাবে সরল প্রাণে যাহা বলেন, নবাগত ভ্রমণকারিগণ সহস্র চেষ্টাতেও তাহা অবগত হইতে পারেন না। দেশের লোকে কি ব্রত করে, কি ব্রত কথা বলে, কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করে এবং তাহাদের পূজাপদ্ধতিই বা কি প্রকারের তাহা তাঁহাদের সহিত না মিশিলে, তাঁহাদের সহিত এক না হইলে, কখনই অবগত হওয়া যায় না।" তিনি আরও বলেন যে "আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ কেবল মাত্র রাজদরবারের এবং রাজ-পরিবারের কার্য্যকলাপ ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ইতিহাস উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র সরকারী চিঠি, দলিলপত্র, যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং সৈন্যের গমনাগমনের পথের বিবরণের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সাহিত্য, সভ্যতা, শিক্ষাপদ্ধতি, ধর্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমাজের প্রকৃত অভিব্যক্তির সহিত পরিচিত নহেন। বিশেষতঃ প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থার বিবরণ বিবর্জ্জিত এই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসসমূহ কেবল মাত্র বিজেতৃগণের দ্বারাই রচিত হইয়াছে।" (২)

---

(১) (২) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ, পৃঃ ১২৮ ১৩৩,।

সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপকরণের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় ও কোনটি বর্জ্জনীয় তাহা বিশেষ সাবধানে ও ধীরতার সহিত বিচার করিতে হইবে। উপকরণ গ্রহণ বর্জ্জন-ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেই, ঐতিহাসিকের সাধনা সফল হইবে। ইংরাজী ভাষায় এসম্বন্ধে কয়েকটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে যথা, H. B. George রচিত Historical Evidence, L. E. Rushbrook Williamsএর Four Lectures on the Handling of Historical Material। J. W. Jeudwine রচিত Manufacture of Historical Material নামক গ্রন্থে Great Britain ও Irelandএর ইতিহাস সম্পর্কিত নজীর-গুলির বিশেষ আলোচনা থাকিলেও মাঝে মাঝে সাধারণ মন্তব্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবাদ, আখ্যায়িকা প্রভৃতি হইতে সত্যনির্দ্ধারণ করিবার উপায় জানিতে হইলে, G. L. Gomme রচিত Folklore as an Historical Science নামক গ্রন্থখানি পাঠ করা প্রয়োজন।

প্রমাণপঞ্জী বিচারে সাহায্যের জন্য বিশিষ্ট গ্রন্থ।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রামাণিক ইতিহাস দেখিতে বোধ হয় প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ইচ্ছা হয়; এবং আমাদের মাতৃ-ভাষার ভাণ্ডার যাহাতে ঐতিহাসিক সাহিত্যসম্ভারে পরিপুষ্ট হয়, ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই আন্তরিক কামনা। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। জাতীয় জীবনে যে সমস্ত অভাব ও আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হয়, জাতীয় জীবনের গতি যে খাতে প্রবাহিত হয়, জাতীয় সাহিত্য বহুল পরিমাণে তাহারই অনুসরণ করে। আমাদের দেশে বাঙ্গালায় লিখিত ঐতিহাসিক সাহিত্যের জন্য প্রবল অভাব অনুভূত না হইলে, বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিবে না। ইংরাজী ভাষায় আজকাল

বাঙ্গালা ভাষায় ঐতিহাসিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির উপায়।

পড়িয়া আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টি সাধনের অন্তরায় ঘটিতেছে। ইতিহাস পাঠের যে ইচ্ছা সাধারণতঃ আমাদের হয়, তাহা আমরা ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে মিটাইয়া লই। ইহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ইতিহাসসমূহ তেমন উৎসাহ ও পোষকতা পায় না। ইংরাজী সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় হওয়া উচিত, মনে করি। বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাস শিখাইবার মানসে বাঙ্গালী ছাত্রকে প্রথম হইতেই ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস পড়ান হইতেছে। এ প্রথা সমীচীন নহে। কারণ প্রথমে বিদেশীয় ভাষাকে আয়ত্ত করিতে, তাহার খুঁটিনাটি ও ব্যাকরণের ব্যূহ ভেদ করিয়া মর্ম্মার্থ বুঝিতে বহু সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। ইহারই জন্য ইতিহাস পাঠে বাঙ্গালী ছাত্রদের তেমন অনুরাগ ও আগ্রহ হয় না। পক্ষান্তরে যদি মাতৃভাষায় ইতিহাস পড়ান হয়, তবে অল্প সময়ের মধ্যে সহজেই ছাত্রেরা ইতিহাস বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতে পারে। আর ইহার ফলে, ইতিহাস পাঠে তাহাদের অনুরাগ ও আগ্রহ সমধিক বর্দ্ধিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ইতিহাস পাঠের সম্যক্ আবশ্যকতা অনুভূত না হইলে বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিবার জন্য লোকের আগ্রহ জন্মিবে না। এই জন্যই এদেশে বাঙ্গালা ভাষাকেই ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বাহন করা উচিত।

ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশীয় ভাষায় লিখিত অনুবাদযোগ্য গ্রন্থের অনুবাদ দ্বারাও বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্য ভাণ্ডারকে পুষ্ট করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় "সমসাময়িক ভারতের" ন্যায় অনূদিত ঐতিহাসিক গ্রন্থমালার বিশেষ প্রয়োজন।

অভিভাষণ দীর্ঘ হইয়া গেল, তাই ভারতীয় মুসলমানদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না। মৎপ্রণীত Promotion of Learn-

ing in India by Muhammadans নামক গ্রন্থে তাঁহাদের সম্বন্ধে আমি অনেক কথা বলিয়াছি।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, দুই তিন হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতির মাথার উপর দিয়া, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা, বহু বিপদ-আপদ বহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু তৎসত্বেও তাঁহারা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে, তাঁহাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, এবং ক্রিয়া-কর্ম্ম—সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহারা রাষ্ট্র-নীতি, অর্থ-নীতি, সমাজ-নীতি, শিল্প-কলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবহারিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং জাতি-বিভাগকে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইতে না দিয়া, যেভাবে উহাদিগকে আত্মরক্ষার সহায়করূপে পরিণত করিয়াছিলেন,—তাহা হইতে, তাঁহাদের বংশধরগণের অনেক শিখিবার জিনিস আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। মিশর, এসিরামাইনর ও পারস্য-দেশের বহু প্রাচীন জাতিগুলি, একদিন ধনে-মানে, বলে ও সভ্যতায়, গৌরবের সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন কারণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের জীবন-যাত্রার পথে এমন অনেক জটিল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, যেগুলির সমাধান ও দূরীকরণ করিতে না পারিয়া, পৃথিবীর বক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে চির-বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুজাতির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদেরও মাথার উপর দিয়া বহু ঝঞ্ঝাবাৎ বহিয়া যাওয়া সত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া ধরণীর বক্ষে মস্তকোত্তলন করিয়া আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। প্রবীণ মানবতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে

উপসংহার।

এক অভিনব আশার-বাণী শুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—
"বাঙ্গালী স্নায়ুবিধানে ক্ষীণ হয় নাই; ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমে অবনত
হয় নাই। কতিপয় বৎসর হইল এই জাতির যে উদ্যমশীলতা প্রকাশ
পাইয়াছে, তাহা জগতে অতুলনীয়। এত অল্পদিনে এমন প্রকাণ্ড সাহিত্য
কোন্ জাতি গড়িতে পারিয়াছে? এত অল্পদিনে, শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যে
এত উদ্যমশীলতা কোন্ জাতি দেখাইতে পারিয়াছে? বাঙ্গালীর
প্রতিভার পরিচয় আপনাদের সমক্ষেই সশরীরে বর্ত্তমান; সুতরাং
মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি বাঙ্গালীর (স্নায়ুশক্তি) ও মন অধঃপতিত হয়
নাই। যদি তাহাই হইল তবে যিনি জাতীয় মঙ্গলকামী অর্থাৎ যিনি
প্রকৃত ও স্থায়ী মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহার নিরাশ হইবার কারণ
নাই।" নানাপ্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও, এই যে মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ ও
অব্যাহত রহিয়াছে ইহা সুখের বিষয় হইলেও, যাহাতে ইহা ভবিষ্যতে
উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় এবং ইহার বীজ বহুক্ষেত্রে রোপিত হয়, সে দিকে
আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে
এ শক্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলিকে অপসারিত করিয়া
যাহাতে তাহাদের স্থলে অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হয়, তৎপ্রতি মনোযোগী
হওয়া উচিত। পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের
প্রত্যেকেরই সাধারণতঃ কোন না কোন বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রাচীন
ভারতে হিন্দুগণ যে যে বিষয়ে তাঁহাদের প্রাধান্য ও বিশেষত্ব দেখাইতে
সমর্থ হইয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা হইতেছে প্রধান।
উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ এই দুইটি মহামূল্য
সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে অধ্যাত্ম-বিদ্যার বহুল প্রচার
ও বিস্তৃতি না থাকিলেও, ভারতবর্ষে এখনও এমন অনেক লোক
আছেন, যাঁহারা ঐ বিদ্যাকে করায়ত্ত করিয়াছেন। কেবল অধ্যাত্ম-বিদ্যা

নহে, তাঁহাদের সমাজ-নীতি রাষ্ট্র-নীতি প্রভৃতি ব্যবহারিক অনেক বিষয়, প্রাচীন ও আধুনিক কালের মধ্যে যাহা ছিল ও আছে, তাহা হইতে অনেক হিতকর জিনিস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে উপযুক্তভাবে সেগুলিকে যদি আমরা ব্যবহার করিতে পারি, তবে অনেক বিপদ আপদের হস্ত হইতে আমরা মুক্তি পাইতে পারিব। কোন জাতির ইতিহাস গঠনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, সেই জাতির সর্ব্বাঙ্গীন ও পরিস্ফুট চিত্র দেখিয়া বর্ত্তমানে সেই জাতির নিকট হইতে শিক্ষা করিবার যদি কিছু থাকে,—সেই জাতির পতনের কোন চিত্র দেখিয়া যদি আমাদের কোন বিষয়ে সাবধান হইবার থাকে, তাহা হইলে আমরা তাহাতে শিক্ষিত ও সাবধান হইতে পারি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে অনেক শিখিবার আছে। তাঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া, আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করিতে সমর্থ হই। যে সত্যানুসন্ধানের জন্য ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন, যে সত্যকে আশ্রয় ও অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অধ্যাত্ম-বিদ্যার অধিকারী হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সেই সত্যকে আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে—আর তাহারই সন্ধানে নিযুক্ত হইয়া আমরা নবোৎসাহে ইতিহাস আলোচনায় ও ইতিহাস সেবায় আত্মনিয়োগ করিব। অতীতের সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র,—যে মন্ত্রের দ্রষ্টা হইয়া হিন্দুগণ একদিন জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন, আর যাঁহাদের অযোগ্য বংশধর হইয়া, আমরাও আজ প্রাচ্য ভূমির মুখোজ্জ্বল পূর্ব্বক সমগ্র পাশ্চাত্য জগতকে এখনও সমাজ-নীতি, রাষ্ট্র-নীতি ও ধর্ম্ম-নীতি সম্বন্ধে বহু শিক্ষা দিতে পারি,—সেই মন্ত্রের—সেই অধ্যাত্ম-বিদ্যার সাধনায় আবার আমরা আত্মসমর্পণ করিব। আমাদের এ আত্ম-সমর্পণ যদি সার্থক হয়, এ সাধনা যদি পূর্ণ হয়, তবে আমাদের ইতিহাস সেবা ধন্য, সার্থক, ও কল্যাণপ্রদ হইবে।

বৈদ্যপ্রবোধনী

প্রথম অধ্যায়।

১। বৈদ্য শব্দের অর্থ।

বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে মুখ্য ব্রাহ্মণ, অংশতঃ ব্রাহ্মণ নহেন, এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইহাঁরা "বৈদ্য" নামেই চিরপ্রসিদ্ধ, অতএব বৈদ্য কথাটীর অর্থ কি, উহাই প্রথমে বিবেচ্য।

শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট-বিদ্যাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে "বৈদ্য" বলা হইয়াছে—ইহাঁরা সর্ব্ববর্ণের পিতৃস্বরূপ বলিয়া ইহাঁদিগের "তাত বৈদ্য" (তাত = পিতা), "সর্ব্বতাত" (সকলের পিতা) প্রভৃতি নাম এবং কচিৎ "ভিষক্" ও "ত্রিজ" নাম দেখা যায়। প্রমাণ—

(ক) শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বচন যথা—

"বৈদ্যং সর্ব্বতাতং দিবোদাসম্"

(ঋগ্‌বেদ—৪র্থ মণ্ডল, ২৬ সূক্ত)

"বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্"

(ঋগ্‌বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৯৭ সূক্ত)

"কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৄন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাতবৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে।"

(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০সর্গ)

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥"

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানং তস্মাদ্ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ।"

(চরকসংহিতা, চিকি০ ১ অ০)

"দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।"

(মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ৫ অ০)

"সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
চিকিৎসা কুশলশ্চৈব স বৈদ্য স্ত্বভিধীয়তে।"
"বিপ্রাস্তে বৈদ্যতাং যান্তি রোগদুঃখপ্রণাশকাঃ।"

(উশনঃসংহিতা)

"স্বয়মর্জ্জিতমবৈদ্যেভ্যো বৈদ্যঃ কামং ন দদ্যাৎ।"

(গৌতম সংহিতা)

"নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ।"

(কাত্যায়ন সংহিতা)

(খ) বশিষ্ঠ, ধন্বন্তরি, চন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রশংসায় বলা হইয়াছে যে ইঁহারা "বৈদ্য" ছিলেন। ইঁহারা ইদানীন্তন বৈদ্যগণের কুল ও গোত্র প্রবর্ত্তক ইহা বৈদ্যগণের সুবিদিত। যথা—

"ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ
বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ।"

(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৭৭ সর্গ)

[শক্তি-গোত্র ও বশিষ্ঠ-গোত্র বৈদ্যগণ এই বংশসম্ভূত]

"ক্ষীরোদ মথনে বৈদ্যো দেবো ধন্বন্তরির্হ্যভূৎ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতেন সমুত্থিতঃ॥"

(গরুড় পুরাণ—১৪৬ অ০)

[ধন্বন্তরি-গোত্র বৈদ্যগণের ইনিই আদিপুরুষ।]

বৈদ্যগণের সদাচার

"ওঁ চন্দ্রোঽমৃতময়ঃ শ্বেতো বিধুর্বিমলরূপবান্।"

* * *

যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ।"

(চন্দ্রস্তোত্র—বৃঃ ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরঃ

[বল্লালসেনাদি বৈদ্য মহারাজগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।]

এই জন্য নিজের বিশেষত্ব খ্যাপনার্থে বৈদ্যগণ 'বৈদ্য' বলিয়াই পরিচিত।

২। বৈদ্যগণের সদাচার ও জ্ঞানোৎকর্ষের প্রমাণ।

(১) বৈদ্যগণের গুরুবৃত্তি।

বোপদেব গোস্বামী, কবিরাজ-গোস্বামী, শ্রীখণ্ডের ঠাকুরগণ, ভাজনঘাটের ও বোধখানার গোস্বামিগণ সমগ্র বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহারা ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের গুরু ও অধ্যাপক। ইঁহাদের বহু ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য আছেন।

(২) অধ্যাপনাধিকার।

বৈদ্যগণের টোল ও অধ্যাপনানৈপুণ্য সুপ্রসিদ্ধ। মনু বলেন—

"অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥"

অর্থাৎ "ত্রিবিধ দ্বিজবর্ণই অধ্যয়ন করিতে পারেন, কিন্তু অধ্যাপনা করিতে কেবল ব্রাহ্মণই অধিকারী।" (মনু সংহিতা)

আয়ুর্ব্বেদকে যখন "পুণ্যতম বেদ," বলা হইয়াছে, তখন এই বেদের এবং অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ভিন্ন কি হইতে পারেন?

কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ যখন ইং ১৮২৪ সনে স্থাপিত হয়, তখন হইতে ইং ১৮৫৪ সন পর্য্যন্ত একমাত্র "ব্রাহ্মণ" সেখানে পড়িতে পারিতেন। তখন ব্রাহ্মণ বলিলে বৈদ্যকেও বুঝাইত। টোল বিভাগে তখন বৈদ্য অধ্যাপকও ছিলেন।

(৩) ব্রাহ্মণোচিত উপাধি।

বৈদ্যগণের চিরদিনই ব্রাহ্মণোচিত উপাধি দেখা যায়। যথা—

(ক) পাণ্ডিত্যসূচক উপাধি—যথা মহামহোপাধ্যায়, সার্ব্বভৌম, শিরোমণি, চূড়ামণি, বাচস্পতি প্রভৃতি।

(খ) জাতীয় উপাধি যথা—

বৈদ্যের পাঁড়ে, ওঝা, মিশ্র, দোবে প্রভৃতি উপাধির দৃষ্টান্ত বাঁকুড়া জিলায় তিলুড়ী প্রভৃতি গ্রামে ঢাকার জপসা প্রভৃতি স্থানে এবং অন্যান্য অনেক স্থলে দেখা যায়। বৈদ্য কুলগ্রন্থেও "শ্যামসেনায় মিশ্রায়" প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত মিশ্র উপাধি দেখা যায়।

(৪) প্রসিদ্ধি।

বহুস্থানেই বহু বৈদ্যসন্তান অদ্যাপি "বদ্যিবামুন" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন এবং অন্যান্য জাতিরা অনেক স্থলেই বৈদ্যগণকে "বদ্যিবামুন" বলেন। এই লোকপ্রসিদ্ধি অমূলক হইতে পারে না।

(৫) বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন।

বৈদ্যগণের উপনয়ন রাঢ়দেশে চিরকালই অখণ্ডিত। পূর্ব্ববঙ্গে কচিৎ ২ উপনয়ন সংস্কারলোপের কারণ বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের দারুণ কলহ। পরে রাজবল্লভ যখন পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাত্য বৈদ্যগণের পুনঃ সংস্কার সাধন করেন, তখন ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত ব্যবস্থাতে তৎকালেও শ্রীখণ্ড সমাজের অখণ্ডিত উপনয়নের উল্লেখ দেখা যায়।

(৬) সংস্কৃত-গ্রন্থ-কর্ত্তৃত্ব। যথা,—

বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, শতশ্লোকী, শ্রীমদ্ভাগবত টীকা প্রভৃতি।

ত্রিলোচনদাসের কলাপপঞ্জী। জুমরনন্দীর সংক্ষিপ্তসার। বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ। গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী। পদ্মনাভদত্তের সুপদ্ম ব্যাকরণ। মেদিনীকরের মেদিনীকোষ, মহেশ্বরের বিশ্বপ্রকাশকোষ এবং অন্যান্য বৈদ্য গ্রন্থকারের বহু গ্রন্থ বর্ত্তমান।

(৭) বিশুদ্ধ বৃত্তি।

সে দিন পর্য্যন্ত বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণোচিত ষড়্‌বৃত্তি ছিল। চিকিৎসা করিয়া অর্থ লওয়া বৈদ্যের ধর্ম্ম নহে, এইজন্য প্রাচীন চিকিৎসকেরা স্বয়ং ঔষধ বিক্রয় করিতেন না, ধনবান্ রোগীকে দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করাইতেন এবং স্বয়ং 'ধন্বন্তরি ভাগ' বলিয়া চতুর্থাংশ ঔষধ লইয়া উহা বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন; তাঁহারা রোগী দেখিয়া প্রথমে একটী প্রণামী এবং রোগীর আরোগ্যের পর একটী ব্রাহ্মণোচিত 'সিধা', তৈজস ও দক্ষিণা বিদায় পাইতেন। 'অম্বষ্ঠানাং 'চিকিৎসিতং' এই চিকিৎসাবৃত্তি প্রাচীন বৈদ্যগণের সম্বন্ধে খাটে না। এখনকার কথা স্বতন্ত্র।

বৈদ্যগণের অসাধারণ তেজস্বিতা এবং নীচকর্ম্মে ঘৃণা সমগ্র বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধ। নীচ কর্ম্মকর বৈদ্য অদ্যাপি দেখা যায় না।

(৮) প্রতিগ্রহাধিকার।

২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও বৈদ্য অধ্যাপকগণ শ্রাদ্ধাদিতে আমন্ত্রিত হইতেন ও প্রতিগ্রহ করিতেন। কেহ কেহ অদ্যাপি আমন্ত্রিত হইয়া থাকেন ও প্রতিগ্রহ করেন। অসৎপ্রতিগ্রহ-জনিত পাপের ভয়ে বৈদ্যগণ শেষে কেবল পান-সুপারি ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেন,—এখনও ঐ নিয়ম বহু স্থানেই বর্ত্তমান আছে।

ভূমিদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই ভূমি-প্রতিগ্রহ করিতে অধিকারী নহেন। পূর্ব্বকালের বৈদ্য পণ্ডিতগণকে প্রদত্ত বহু

ব্রহ্মোত্তর (ব্রহ্মত্রা) জমী এখনও বহু স্থলেই বর্ত্তমান আছে। তাম্রশাসনা-দিতেও এইরূপ ভূমি দানের উল্লেখ দেখা যায়।

(৯) কুলাচার ও লোকাচারের অনুবৃত্তি।

(ক) বহু বংশেই দশাহ জননাশৌচ এবং কোন কোন বংশে দশাহ মরণাশৌচও অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

(খ) দৈব ও পিত্র্যকার্য্যে সঙ্কল্পের সময়ে 'সেন শর্ম্মা' 'দাশ শর্ম্মা', প্রভৃতি উল্লেখ এখনও কোন কোন বংশে বর্ত্তমান আছে। সেন-গুপ্তাদি উপাধি অনভিজ্ঞতা বশে অল্পকাল গৃহীত হইয়াছে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও সকল কুলগ্রন্থবিরুদ্ধ।

(গ) রাঢ়ীয় সমাজের অনেক বৈদ্যই স্বয়ং শালগ্রামশিলা পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের এই অধিকার নাই। এইরূপ দুর্গাপূজা ও কালীপূজা অদ্যাপি অনেক বৈদ্য স্বয়ং করিয়া থাকেন। বৈদ্যমহিলাদের পাক করা অন্নভোগও দেওয়া হয়।

(ঘ) অদ্যাপি রাঢ়ীয় সমাজের অনেক পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-দিগকে ভোজন করাইয়া সমানভাবে ভোজন-দক্ষিণা দেওয়া হয়।

(ঙ) বৈদ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশ "যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী" বলিয়া ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করেন, কেহ কেহ "সামবেদান্তর্গত কৌথুমী-শাখাধ্যায়ী" এবং কচিৎ কেহ "ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী" বর্ত্তমান আছেন। সামবেদী বৈদ্যের উদাহরণস্বরূপ নিরোলের স্বর্গীয় চন্দ্রনারায়ণ কবিরাজের বংশ, এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ ও বালীর কিশোরীমোহন সেন শর্ম্মার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(চ) বৈদ্যগণ অদ্যাপি ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের রোগনিমিত্তক প্রায়-শ্চিত্তের স্মার্ত্ত ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

(ছ) বঙ্গদেশের অনেক স্থলে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণগণের অদ্যাপি এক হুঁকাও প্রচলিত আছে। অনেকস্থানে এক পংক্তিতে ভোজনও প্রচলিত।

(১০) অদ্যাপি দেশান্তরে বৈদ্যের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব।

বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য সকল দেশেই বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত, পৃথক্ জাতি নহে। যথা—

(ক) পশ্চিমে গয়ার গয়ালী ব্রাহ্মণ, মথুরার অমৃতসেনী চোবে ও মাথুর ব্রাহ্মণ, গুর্জ্জর বৈদ্য-ব্রাহ্মণ—প্রভৃতি ব্রাহ্মণ। ইঁহারা "সেন শর্ম্মা", "গুপ্ত শর্ম্মা", "দত্ত শর্ম্মা" প্রভৃতি উপাধিধারী এবং বঙ্গীয় বৈদ্যগণের সহিত গোত্র, প্রবর ও বেদশাখায় সমান, অনেকেই আবার ধন্বন্তরি-গোত্র সম্ভূত। (ধন্বন্তরিরই অপর নাম অমৃতাচার্য্য)। এই সকল ব্রাহ্মণ তীর্থগুরু রূপে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের পূজিত।

(খ) মহারাষ্ট্র দেশে "সেনাহ্বী" (সেনাহ্ব) ব্রাহ্মণগণ অনেকেই "বৈদ্য" উপাধিধারী, মৎস্যাশী এবং বঙ্গদেশাগত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর ও কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র। উক্ত প্রথম দুইটী গোত্র বঙ্গের বৈদ্যগণের মধ্যে দেখা যায়, অন্য ব্রাহ্মণের মধ্যে নাই।

(গ) মেদিনীপুরে ও উড়িষ্যায় দাশ, ধর, কর প্রভৃতি উপাধিধারী অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের গোত্র, প্রবর ও বেদশাখা সেই সেই উপাধিবিশিষ্ট বৈদ্যদিগের সহিত সমান। উৎকলের ব্রাহ্মণগণের কুল-গ্রন্থ মধ্যে নিম্নলিখিত তালিকা দেখা যায়,—"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ। মৌদ্গল্যো দাশশর্ম্মা চ গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ॥ ধন্বন্তরিঃ সেনশর্ম্মা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণা ইমে॥" বৈদ্যদিগের কুলজী গ্রন্থেও এই সকল উপাধিধারীর এই সকল গোত্রই সুপ্রসিদ্ধ।

(১১) বৈদ্যের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ নেতৃত্ব।

ইতিহাসে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিপতি বৈদ্যনৃপতি

মহারাজ বল্লাল সেন চাতুর্বর্ণ্যসমাজের কৌলীন্য-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশ্রণ ও ক্রিয়াহীনতার ফলে আচারভ্রষ্ট হইতেছেন দেখিয়া তিনি সদাচারীদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা দান করেন। ব্রাহ্মণেতর কোন রাজারই ব্রাহ্মণসমাজের উপর নেতৃত্ব করা কখনই সম্ভবপর নহে। বল্লালসেন তাঁহার দানসাগর গ্রন্থে সেনবংশকে "শ্রুতিনিয়মগুরু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি শব্দের অর্থ বেদ, শ্রুতিনিয়ম অর্থাৎ বেদবিহিত নিয়ম, তাহার গুরু ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে হইতে পারে? বল্লাল সেন যে বৈদ্য ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তিনি আপনাকে বৈশ্বানর-গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন সমাজে বৈশ্বানর গোত্র দেখা যায় না।

(১২) বিদ্যাবত্তায় বৈদ্যের শীর্ষস্থানীয়তা।

মহাভারত বলেন—"দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ"—অর্থাৎ দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ। এ কথা এখনও জ্ঞানের হিসাবে সত্য। সেন্সাস্ রিপোর্ট দেখিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইং ১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত সংখ্যার অনুপাত দেখুন।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা

	বৈদ্য	ব্রাহ্মণ	কায়স্থ
শিক্ষিত পুরুষ	৫৭	৪৩	৩৭
ঐ স্ত্রী	৩৫	১২	১৩
ইংরাজী শিক্ষিত পুরুষ ...	২০	১১	১২
ঐ স্ত্রী ...	২০	৫	৬
ঐ গ্রাজুয়েট্ ...	২৫	৪	৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১। অম্বষ্ঠ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

(ক) ব্যুৎপত্তি—অম্ব + স্থা + ক = অম্বষ্ঠ। পিতৃবাচক 'অম্ব' শব্দের উত্তর স্থা ধাতুতে 'ক' প্রত্যয় করিয়া পাণিনীয় "অম্ব-আম্ব-গো-ভূমি-সব্যাপ-দ্বি-ত্রি-কুশে-কু-শঙ্কু-অঙ্গু-মঞ্জি-পুঞ্জি-পরমে-বর্হি-দিব্যাগ্নিভ্যঃ স্থঃ" এই সূত্রানুসারে ভূমিষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ ইত্যাদি শব্দের ন্যায় অম্ব শব্দের পর "স্থ" স্থলে 'ষ্ঠ' হয়। এইরূপে কৃদন্ত-সূত্রানুসারে 'অম্বষ্ঠ' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে, নিপাতনে সিদ্ধ হয় নাই।

অম্বা (মাতা) + স্থা + ক—এইরূপে ব্যুৎপত্তি করিলে 'অম্বাস্থ'—এইরূপ পদ হইবে, 'অম্বষ্ঠ' এইরূপ পদ কখনও হইতে পারে না—এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অতএব কেহ কেহ যে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ অম্বাকুলে বা মাতৃকুলে স্থিত—এইরূপ মনগড়া ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, উহা নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক।

(খ) অর্থ—'অম্বষ্ঠ' শব্দটী সংস্কৃত সাহিত্যে ৩টী অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে যথা—

(১) অম্বষ্ঠ = অম্বষ্ঠদেশ এবং তদ্দেশবাসী। প্রমাণ—

"সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা।
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগ হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ॥"

(বিষ্ণু পুরাণ, ৩য় কাণ্ড, ২ অংশ)

(২) অম্বষ্ঠ = লোকসমাজের বা রোগিগণের পিতৃস্বরূপ অর্থাৎ

পূর্ব্বোক্ত "তাত-বৈদ্য", "সর্ব্বতাত" (১ম অধ্যায়, বৈদ্যশব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)। বৈয়াকরণকেশরী ভানুদীক্ষিত অম্ব শব্দের অর্থ পিতা বা বেদ—এইরূপ বলিয়াছেন। 'অম্বা' শব্দ হইতে অম্বষ্ঠ পদ সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

এই 'অম্বষ্ঠ' শব্দটি পূর্ব্বে ধন্বন্তরির উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"পিতৃবৎ চেক্ষতে রুগ্নং তেনাম্বষ্ঠঃ স কীর্ত্তিতঃ।"

প্রকৃতি-বাদ অভিধানেও দেখা যায়—"অম্ব—পিতা+ষ্ঠ [স্থা থাকা+অ (ড)—ক সংজ্ঞার্থে] যিনি রোগসময়ে পিতার ন্যায় থাকেন।" এই অর্থ ধরিয়া চিকিৎসক মাত্রকে 'অম্বষ্ঠ' বলা যায়।

(৩) অম্বষ্ঠ শব্দের ৩য় অর্থ—অম্বষ্ঠ=ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা-বিবাহ-জাত সন্তান। ইঁহারাও ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত। প্রমাণ—

"ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম জায়তে" (মঃ সং, ১০ম অং)

[কন্যাগ্রহণাদ্ উঢ়ায়ামিতি অধ্যাহার্য্যাম্। বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাৎ—মনুটীকা।]

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেৎ সোঽপি তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।" (উশনাঃ)

[অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন সন্তানকে অম্বষ্ঠ বলে—তাঁহার জীবিকা কৃষিকার্য্য প্রভৃতি] ইহাঁরাই বোধ হয় পশ্চিমের "ভূমিহার" ব্রাহ্মণ।

ইহাঁরাও যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ নহেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে। দুই একটি যথা—

"বিপ্রবদ্ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যাবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥"

(ব্যাসসংহিতা)

[অর্থাৎ "ব্রাহ্মণের বিবাহিতা সবর্ণা বা অসবর্ণা (দ্বিজবর্ণের) সকল স্ত্রীতেই জাত সন্তানের ক্রিয়াকর্ম্মের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণানুরূপ হইবে। ক্ষত্রিয়ের বিবাহিত ঐরূপ সকল স্ত্রীতে জাত সন্তানের ক্রিয়াকর্ম্ম ক্ষত্রিয়ানুরূপ হইবে"—ইত্যাদি]

পঞ্চম বেদ মহাভারতেও ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন—

"ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ"

(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৭ অ)

অর্থাৎ "তিন বর্ণের পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণই উৎপন্ন হয়।" ইহা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মমুখে সিদ্ধান্ত বাক্য। মনুসংহিতাতেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে—

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে।"

(মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়)

অর্থাৎ "সকল বর্ণের মধ্যে অক্ষতযোনি ও দ্বিজত্বসামান্যে তুল্য পত্নীতে অনুলোম-বিবাহজ সন্তান জাতিতে পিতৃবর্ণই হইয়া থাকে।"

[অম্বষ্ঠ শব্দের আর প্রকার অসদার্থ কেহ কেহ কল্পনা করেন। তাঁহারা অনূঢ়া বৈশ্যকন্যা বা বৈদ্যপত্নীর গর্ভজাত ব্যভিচারজ বর্ণসঙ্কর সন্তানকে অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। এইরূপ কল্পনা নিতান্ত বিদ্বেষমূলক। নানারূপ জাল* ও নির্ম্মূল বচন এবং মিথ্যা কথা সৃষ্টি করিয়া বৈদ্যবিদ্বেষীরা এই অর্থ করেন। ইহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ।]

২। বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ জাতি নহেন।

বৈদ্যগণ বৈদ্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ, 'অম্বষ্ঠ' বলিয়া নহে। যদি কোথাও

---

* যথা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের শেষের ৭টী অধ্যায় জাল। উক্ত গ্রন্থের আরম্ভে প্রদত্ত বিষয়সূচী অধ্যায়ে উহাদের উল্লেখ নাই, উহাদের রচনাও ভ্রান্তিপূর্ণ।

'অম্বষ্ঠ' নাম থাকেও তবে উহার অর্থ পিতৃসদৃশ "তাতবৈদ্য" বা "সর্ব্বতাত"। ধন্বন্তরি এই হিসাবেই "অম্বষ্ঠ" তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আর যদি ইষ্টাপত্তি (অর্থাৎ তর্কের খাতিরে স্বীকার) করাও যায় যে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ জাতীয়, তাহা হইলেও বৈদ্যগণ অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণের ন্যায় অসবর্ণাবিবাহজাত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যবর্ণ নহেন (অম্বষ্ঠ শব্দের ৩য় অর্থ দেখ)। পুরাণাদিতে অসংখ্য প্রমাণ আছে যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অসবর্ণা বিবাহ জাত। (শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম্-এ প্রণীত "ব্রাহ্মণ জাতির ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।)

যদি কেহ বলেন, বৈদ্যকুলগ্রন্থকার মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ জাতি স্বীকার করিয়াছেন, তাহার উত্তরে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করা যায় যে ভরতমল্লিকের "রত্নপ্রভা" যে বেতনভোগী ব্রাহ্মণের সম্পাদিত, তিনি "বৈদ্যোৎপত্তিকথনম্"—নামক অধ্যায়ের আরম্ভে অদ্ভুত, অসংলগ্ন ও অসম্ভব পাঠ যোজনা করিয়াছেন। যে কেহ প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথির সহিত মুদ্রিত গ্রন্থ মিলাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। বস্তুতঃ ভরতমল্লিকের লেখা "অম্বষ্ঠেমৃতাচার্য্যঃ—ইত্যাদি পাঠ হইতেই ঐ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত পাঠই জাল। [অম্বষ্ঠেষু = অম্বষ্ঠদেশে। ঐস্থানে অম্বষ্ঠশব্দ জনপদ বাচী।]

দুর্জ্জয়কুলপঞ্জী, সঞ্জয়কুলপঞ্জী, কণ্ঠহার প্রভৃতি কোন কুলগ্রন্থেই বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। এ স্থানে ইহাও বক্তব্য, কুলগ্রন্থে কোথাও "সেনগুপ্ত", "দাশগুপ্ত" এরূপ গুপ্তান্ত পদবী দেখা যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈদ্যের কর্ত্তব্য।

বৈদ্য যখন সকল দিক্ দিয়াই ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ নহেন, তখন বৈদ্যের কর্ত্তব্যনির্ণয় অতি সহজ। পূর্ব্বে সদাচার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা দেখিলে—উহা সহজেই নির্ণীত হইতে পারে।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ও যাজক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার অবনতি এবং বিজাতীয় শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির সহিত কয়েকটী অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের অত্যাচার ও অনাচার এজন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। ঐতিহাসিক কথার অবতারণা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় স্থানাভাবে অসম্ভব। তবে ৩।৪টী অনাচারের কথা এ স্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—

১। অনাচার বর্জ্জন।

১ম অনাচার—গুপ্তান্ত উপাধি—যথা সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, গুপ্ত-গুপ্ত—প্রভৃতি। সকল বৈদ্যকুলগ্রন্থেই সেন, দাশ, গুপ্ত, ধর, কর প্রভৃতি—বীজি-পুরুষগণের নাম আছে। 'সেন'কুল, 'দাশ'কুল ও 'গুপ্ত'কুল সম্পূর্ণ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। সেন বা দাশ কখনও গুপ্ত হইতে পারেন না—তবে সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত কেমন করিয়া হয়? ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেন, দাশ, প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ, 'সেনগুপ্ত', 'দাশগুপ্ত' নামে নহে।

ইঁহারা সকলেই যখন ব্রাহ্মণ, তখন নামান্তে 'শর্ম্মা' ব্যবহারই শাস্ত্র সঙ্গত। যথা—সেনশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা প্রভৃতি। সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি দেশান্তরস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে আছে। দাশশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা, প্রভৃতি উপাধি মেদিনীপুরের মৌদ্গল্যগোত্র ব্রাহ্মণ ও বঙ্গের বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যেও দেখা যায়।

বল্লাল সেন প্রভৃতি প্রাচীন বৈশ্যগণ কেহ কেহ 'দেব' উপাধিযুক্ত সেন অর্থাৎ "সেনদেব" এইরূপ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতিতে সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা প্রভৃতির উল্লেখ বর্ত্তমান। শাস্ত্র বলেন—

"দেবঃ শর্ম্মা চ বিপ্রস্য বর্ম্মাস্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।
গুপ্ত-দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ॥"

ভ্রান্তিক্রমে বৈদ্যের উপাধিরূপে 'গুপ্ত' নামের ব্যবহার করিয়া বৈশ্য-ব্রাহ্মণগণ সমাজে অবনত হইতেছেন এবং সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম পণ্ড করিতেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষে বৈশ্য অর্থাৎ "বণিয়ারা"ই গুপ্তান্ত উপাধি লেখেন ও ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহার করেন, বৈশ্যগণ কি সেই বেশে হইতে চাহেন?

২য় অনাচার—ব্রাহ্মণের পক্ষে পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ—ইহা বিশেষ অন্যায়। স্মৃতি বলেন, "ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি" অর্থাৎ অশৌচের দিন বাড়াইতে নাই। যে ভ্রান্তিক্রমে গুপ্তান্ত উপাধি ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, সেই ভ্রান্তিক্রমেই ১৫ দিন অশৌচ হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন কোন বংশে দশাহ অশৌচ বর্ত্তমান।

যদি কেহ বলেন, আমাদের বংশে ১৫ দিন অশৌচই প্রচলিত, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সম্ভবতঃ কয়েক পুরুষেই প্রাচীন রাজকীয় অত্যাচারে এই অনাচার প্রবেশ করিয়াছে, পূর্ব্বে ইহা ছিল না। মুসলমান রাজ্যে বঙ্গের শাসক রাজা গণেশের বা আর কাহারও অত্যাচারেই (চীনাগণের টীকির ন্যায়) এই কদাচার বৈশ্যগণের উপর বলক্রমে আরোপিত হইয়াছে। যখন বৈদ্যগণ নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণ, তখন এই অনাচার কেন রক্ষিত হইবে?

৩য় অনাচার—যথাকালে উপনয়ন গ্রহণে ঔদাসীন্য। ইহা পূর্ব্ববঙ্গেই অধিক, এখন পশ্চিমবঙ্গেও কচিৎ দেখা যায়। "সাবিত্রী" মন্ত্র ও উপনয়ন যে কি পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি ও বুদ্ধিবৈশিষ্ট্য দিয়া থাকে, তাহা

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সাবিত্রীমন্ত্রের উপাসনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন। দুঃখের বিষয়, অপর ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈদ্যব্রাহ্মণের মধ্যেও সাবিত্রীমন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও উহার উপাসনা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে।

২। ব্রাহ্মণোচিত আচার ও নিষ্ঠা।

যথাকালে উপনয়ন ও ব্রাহ্মণোচিত আচারপালন না করিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে যে ঐহিক ও পারলৌকিক কত ক্ষতি হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সামাজিক অবনতি সকলেই বুঝিতে পারেন।

সকল বৈদ্য-ব্রাহ্মণেরই যথাকালে ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। একেবারেই সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান্ না হইতে পারিলেও অনাচার-বর্জ্জন হইতে আত্মসংস্কারের আরম্ভ করা উচিত। "অকরণান্মন্দকরণং শ্রেয়:"। বৈদ্যগণের উচ্চ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ইহা একান্ত কর্ত্তব্য।

৩। বেদ ও অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়ন।

এককালে বৈদ্য মাত্রেই 'বিদ্বান্' ছিলেন। তখন তাঁহারা নিজ গৌরব ও মর্য্যাদা ভুলেন নাই। অনন্ত সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ ভারতের নিজস্ব, সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার জননী। সেই ভাষার কোষ-ব্যাকরণাদি অধিকাংশই বৈদ্যরচিত। সেই সকল কথা ভুলিয়াই বৈদ্যের আজ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আয়ুর্ব্বেদের এখন দিন দিন পুনরভ্যুদয় হইতেছে। 'এই পুণ্যতম বেদ' ও অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নে ঔদাসীন্য আমাদের অবনতির প্রধান হেতু।

উপসংহার।

উপসংহারে নিবেদন এই যে বৈদ্যগণ যে এক-সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ নহেন, একথা স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ, উমেশ বিদ্যারত্ন, গোপীচন্দ্র, প্যারীমোহন প্রভৃতি অনেকেই পূর্ব্বে নিজ নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কিন্তু স্বজাতীয় আচার-সংস্কারের জন্য এপর্য্যন্ত সংঘশক্তি

দ্বারা বিশেষ কোনও চেষ্টা হয় নাই। সেই চেষ্টা "বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি" দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া এক্ষণে করিতেছেন। এজন্য ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারেন।

ইহাও সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে বৈদ্যগণের "সেনশর্ম্মা", "দাশশর্ম্মা" প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাধিই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে—গুপ্তান্ত উপাধি ভবিষ্যতে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবে না। কারণ, গুপ্তান্ত উপাধি বৈশ্য বর্ণের, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বঙ্গদেশেও অনেক বৈশ্যবর্ণ এক্ষণে উহা গ্রহণ করিতেছেন—তাঁহাদিগের উহা ন্যায্য অধিকার।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় অনেক বৈদ্যগৃহে দশাহ অশৌচে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় প্রভৃতি হইয়াছে, কোথাও কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। "সেন-শর্ম্মা" প্রভৃতি উপাধিও এক্ষণে অনেক স্বধর্ম্মনিরত বৈদ্য লিখিতেছেন। যাহা ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্য পথ তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে অনেক সত্যনিষ্ঠ উদার-হৃদয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও এই সৎকার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

পল্লীগ্রামে ধর্ম্মসঙ্গত সদাচার পালনে যদি কোথায়ও কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির নিকট সময়ে সংবাদ জানাইলে—তাহার ত্বরিত প্রতিকার (পুরোহিত প্রেরণাদি) করা হইবে। এজন্যও সমিতি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—অর্থাৎ "করিলে কল্যাণ-কার্য্য না হবে দুর্গতি।" একথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। ভগবদ্বাক্য কখনই বিফল হইবে না।

বৈদ্য।

—৩৪৩—

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালাচরণ সেন

ধর্ম্মভূষণ বি, এল প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩৩ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

যেই

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজনগরাধিপ রাজবল্লভ সেন গুপ্ত

অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, কিরীট কোন

স্বর্গারোহণ প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া

প্রভূত পুণ্য কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন,

তাঁহার পবিত্র নামে তদীয় অকিঞ্চন

অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র কর্ত্তৃক

এই বৈদ্য পুস্তিকা আন্তরিক

শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে আচার অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন তাহা ভ্রষ্টাচার নহে, ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ কোন ভ্রষ্ট পথ অবলম্বন করেন নাই এবং তাঁহাদের স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটে নাই।

পুরুষ পরম্পরাগত পঞ্চ দশাহাশৌচ পরিত্যাগ করিয়া অশুদ্ধ-অবস্থায় একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিলে ক্রিয়া পণ্ড হয়। শ্রাদ্ধের যাহা উদ্দেশ্য—পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব মোচন—তাহা অশৌচকাল মধ্যে সম্পন্ন কার্য্য দ্বারা সংসিদ্ধ হইতে পারে না।

বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ; অম্বষ্ঠ ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন বৈদ্য জাতি নাই। অমর কোষের টীকাকার প্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠ পণ্ডিত ভরত মল্লিকও বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ একার্থ বোধক বলিয়াছেন:—অম্বং চিকিৎসা-বৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ। বৈদ্যগণের জাতীয় ব্যবসায় যে চিকিৎসা, সে বিষয়ে কোন মত ভেদ নাই। আমরা ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। ব্রাহ্মণগণের চিকিৎসা বৃত্তি কোনও শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা ব্রাহ্মণগণ হেয় হইয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়। ভগবান্ মনু চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে দেবল ব্রাহ্মণের এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসা বৃত্তি নিন্দনীয়, কিন্তু অম্বষ্ঠের পক্ষে নহে; কারণ তাহা তাঁহাদিগের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি। আজিও স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ হিন্দু নরনারী অন্তিমে সদ্গতি লাভের বাসনায় মৃত্যু সময় জাত-বৈদ্যের ঔষধ সেবনের জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বৈদ্যগণ মনু কথিত দ্বিজাতি ও দ্বিজ ধর্ম্মী কিন্তু তাঁহারা মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন। অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে পরিণীতা বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, 'ইহাই চির প্রসিদ্ধি ও সর্ব্ব শাস্ত্র

প্রতিপাদিত সত্য। তাহাদের সংস্কার মাতৃবৎ অর্থাৎ বৈশ্যানুরূপ, ইহা শাস্ত্র ও লোকাচারানুমোদিত। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নাই। সমাজে আমাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান রহিয়াছে। শাস্ত্র সমাজে আমাদের স্থান ক্ষত্রিয়ের উপরে ও ব্রাহ্মণের নীচে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্তের পরেই বৈদ্য, তারপর ক্ষত্রিয় এবং তারপর বৈশ্যের প্রাধান্য।

পশ্চিম প্রদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বৈদ্য-ব্রাহ্মণ (চিকিৎসক ব্রাহ্মণ) খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত জাতিত্ব সংস্থাপনের প্রচেষ্টা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। বঙ্গদেশে বৈদ্যগণের সমাজে যে স্থান আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসক ব্রাহ্মণের হেয় পদবী লাভ করা বাঞ্ছনীয় ও গৌরবের বিষয় নহে। স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ বৈদ্যগণ পুরুষ পরম্পরানুগত পথকে পরিত্যাগ করিতে কখনও সাহসী হইতে পারেন না।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

যেখানে কোন প্রকার মতদ্বৈধের কারণ প্রদর্শিত হয় তথায় পিতৃ পিতামহের অনুশীলিত পথই অবলম্বনীয়—ইহাই ধর্ম্ম শাস্ত্রের মত।

গৌহাটী, কামরূপ।
৯ই ভাদ্র, ১৩৩৩।

শ্রীকালীচরণ সেন।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধপাঠ	শুদ্ধ
১	১৭	শিষ্যশ্চত্বারো	শিষ্যাশ্চত্বারো
৩	২০	আত্মাহারা	আত্মহারা
৫	৯	শম্ব	শম্ব
৬	৩	অযুর্ব্বেদং	আয়ুর্ব্বেদং
৬	৩	পুষ্কলম্	পুষ্কলম্
২৯	১৯	যথারিতি	যথারীতি
৩১	৭	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
৩৫	২	তাহাবা	তাঁহারা
৩৬	১৯	আত্রেয়োশ্চ	আত্রেয়শ্চ
৪৯	২০	কুম্ ্ক	কুম্ভক
৫১	৮	শ্লোকে	শ্লোকে
৫৪	১২	কুম্ ্ক	কুম্ভক
৫৮	৫	তিনিষ্ট	তিনষ্ট
৬১	১০	দ্ ্যো	দ্বয়ো
৬১	১০	মাতৃজাতো	মাতৃজাতৌ
ঐ	১৬	বৈশ্যা	বৈশ্যা
৬২	৬	অনুকূল	অনুকূল
৬৩	৩	মহর্ষি	মহর্ষি
৬৩	১৭	ক্ষত্রিয়াসুত	ক্ষত্রিয়াসুত
ঐ	১৮	শূদ্রাসুত	শূদ্রাসুত
৬৫	৩	আমার	আমরা
৭০	১০	উদ্ ্ধৃত	উদ্ধৃত
ঐ	১৬	ত্রিরাত্র	ত্রিরাত্রং
৭১	১৭	গুরুতর ?	গুরুতর !

বৈদ্য।

কিছু দিন হইতে বৈদ্য সমাজে নামান্তে শর্ম্মা লেখার ও দশাহ অশৌচ গ্রহণ করার একটা আন্দোলন চলিতেছে। আমরা অনেকেই এই আন্দোলনে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। রাঢ় দেশীয় বৈদ্যগণ চিরদিনই দ্বিজ ধর্ম্মী ও উপবীত ধারী ছিলেন; তাহাদের মধ্যে অনেকের মন্ত্রশিষ্য ছিল এবং সম্ভবত এখনও আছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামী মহাশয়দিগের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশও বৈদ্য গোস্বামিগণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাজনঘাটের প্রখ্যাতনামা কৃষ্ণ কমল গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় অনেক নব শাখের দীক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রীরামপুর, ও ইসলামপুরের বৈদ্য ঠাকুর মহাশয়গণের ব্রাহ্মণ শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সদাশিব কবিরাজের পৌত্র পুরোষত্তমের চারিজন ব্রাহ্মণ শিষ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে, সেই পুরুষোত্তম কবিরাজের চারিজন উত্তম ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। শ্রীমুখ, মাধবাচার্য্য, পণ্ডিত যাদবাচার্য্য ও দেবকী নন্দন দাস। শেষোক্ত ব্যক্তি গৌড় রাজ্যে অতীব প্রধান লোক বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। ইনিই শ্রীমদ্ বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থের প্রণেতা। (১)

---

(১) তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যো যাদবাচার্য্য-পণ্ডিতঃ।
দেবকীনন্দনদাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে।
যেনৈব রচিতা পুণ্যা শ্রীমদ্বৈষ্ণববন্দনা।

চৈতন্য চরিতামৃত

মহাপ্রভুর পারিষদগণের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য ও ভক্ত বৈদ্যসন্তান ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী, সংস্কৃত চৈতন্য চরিতপ্রণেতা মুরারি গুপ্ত, লোচন দাস, কবিকর্ণপুর শিবানন্দ সেন, রঘু নাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই বৈদ্যসন্তান ছিলেন। বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদ, কাব্য ব্যাকরণ, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবিভূষণ, কবীন্দ্র, কবিরত্ন প্রভৃতি বহু উপাধিধারী পণ্ডিতছিলেন। ৺ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে লিখিয়াছেন, "কাঁচড়াপাড়া গ্রামে রাম চন্দ্র দাস একটী বৈদ্য বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার এক মাত্র পুত্রের নাম রাম গোবিন্দ। রাম গোবিন্দের দুই পুত্র—বিজয় রাম ও নিধিরাম। বিজয় রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটা টোল ছিল। তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।"

প্রসিদ্ধ ডিঃ গুপ্ত (৺ দ্বারকানাথ গুপ্ত) মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষ রাম রাম দাস নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার উপাধি অলঙ্কারবাগীশ ছিল। তিনি শোভা বাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। চক্রদত্ত প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত, সুপদ্ম ব্যাকরণ প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় পদ্ম নাভ দত্ত, কাতন্ত্র পরিশিষ্ট প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত,প্রভৃতি বৈদ্য পণ্ডিতগণ মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। মাধব কর, মেদিনী কর, ভারত বিশ্রুত ভরত মল্লিক প্রভৃতি শত শত পণ্ডিত বৈদ্য জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

একালেও অশেষ শাস্ত্রদর্শী ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন ও বিজয় রত্ন সেন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ মহা মহা পণ্ডিতগণ কেহই কখনও সেন শর্ম্মা বা দাশ শর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন নাই এবং বরাবরই ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতেন।

এক্ষণ আমাদিগকে দেখিতে হইবে (১) বৈদ্য কোন্ বর্ণ, ব্রাহ্মণ কি অম্বষ্ঠ, (২) বৈদ্যগণের কিরূপ আচার শাস্ত্র সঙ্গত এবং তাহাদের স্থান সমাজের কোন্ স্তরে, (৩) বৈদ্যগণের দশাহ অশৌচ গ্রহণ করার অধিকার ও (৪) শর্ম্মা উপাধি গ্রহণের অধিকার আছে কি না।

(১) বৈদ্য কোন্ বর্ণ, ব্রাহ্মণ কি অম্বষ্ঠ।

বঙ্গদেশের বৈদ্য জাতি কখনও অম্বষ্ঠ ভিন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের স্বজাতি হইলে ভরত মল্লিকের ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বরচিত ভট্টি কাব্যের টীকার প্রারম্ভে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিতেন না।

নত্বা শঙ্করমম্বষ্ঠো গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজঃ।
ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্॥

গৌরাঙ্গ মল্লিকের পুত্র অম্বষ্ঠ ভরত শঙ্কর দেবকে প্রণাম করিয়া মুগ্ধবোধিনী নামক (মুগ্ধবোধ ব্যাকরণানুযায়িনী) ভট্টিটীকা রচনা করিতেছেন। তিনি স্বরচিত চন্দ্রপ্রভা নামক কুলপঞ্জিকায় বৈদ্যগণকে পুনঃ পুনঃ অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন। ভরত মল্লিক শাস্ত্র জানিতেন না এবং ব্রাহ্মণগণের কুহকে পড়িয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন এ কথা কাহারও বলিবার উপায় নাই। ভরত মল্লিক অনেক মহা কাব্যের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

প্রাচীন বৈদ্য কুলগ্রন্থাদিতে বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া বর্ণিত আছে। কুলচন্দ্রিকায় বৈদ্যের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে এবং শব্দকল্প দ্রুমেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

তত্র বৈশ্য সুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদ বেদাঙ্গ পারগাঃ।
তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্যস্তস্থাবম্বাকুলেঽহিতৎ।
অম্বষ্ঠ ইত্যসাবুক্তস্ততো জাতিপ্রবর্ত্তনাৎ॥
পরে সর্ব্বেঽপি চাম্বষ্ঠা বৈশ্যাব্রাহ্মণসম্ভবাঃ।
জননীতো জনুর্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠা স্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অথ রুক্ প্রতিকারিত্বাদ্ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বৈদ্য দিগের মধ্যে প্রধান অমৃতাচার্য্য মাতামহকুলে অবস্থিতি করিতেন। এজন্য তিনি অম্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হন এবং তাঁহা হইতে অম্বষ্ঠ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। অম্বষ্ঠদিগের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম হওয়ার পরে, বেদ বিহিত সংস্কার আদি দ্বারা পুনর্ব্বার জন্ম হয় বলিয়া অম্বষ্ঠগণ দ্বিজ ও বৈদ্যশব্দে অভিহিত হইয়াছেন এবং রোগ প্রতিকার হেতু অম্বষ্ঠগণ ভিষক্ বলিয়া খ্যাত।

অথাম্বষ্ঠেষু সর্ব্বেষু বিখ্যাতা অভবন্নমী।
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করোধরঃ॥
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ।
এষাং বংশাঃ সমুৎপন্না এতৎপদ্ধতয়োমতাঃ॥
অন্য পদ্ধতয়ো হ্যপ্যেবং সন্তি বৈদ্যা ন তে শ্রুতাঃ।
বহুবশৈচব নামানো নানাগোত্রসমুদ্ভবাঃ॥
যথাষ্টৌ বিশ্রুতাঃ সেনাইত্যেবমপরেমতাঃ।
যস্য যস্য মুনের্যো যঃ সন্তানঃ সমবিশ্রুতঃ॥
তত্তদ্গোত্রাদিনা বৈদ্যঃ শ্রেষ্ঠাস্তস্থ স্বকর্ম্মণা।

বৈদ্য কুলচন্দ্রিকা, শব্দকল্পদ্রুম, জাতিতত্ত্ববিবেক।

কুলাচার্য্যগণ কেহই স্বকীয় স্বাধীন মতের উপর গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুলাচার্য্যগণের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্ব কুলাচার্য্য গণের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করাই তাহাদের ধর্ম্ম ছিল। মহাত্মা কবিকণ্ঠহারের উক্তি পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় (১)

স্কন্দপুরাণের জাতিতত্ত্ব বিবেক ধৃত বচনে এইরূপ আছে—

বৈদ্যস্ততোঽয়ং জননীকুলেচ, খ্যাতা ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ।

বেদাৎ জাতোহি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্ম পুত্রকঃ।

জাতিতত্ত্ব বিবেক, ধর্ম্ম প্রচার, শব্দ কল্পদ্রুম ধৃত শঙ্খ বচন।

ব্রাহ্মণের অম্বষ্ঠ নামা পুত্রই বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন করিয়া সম্যক জ্ঞান লাভ রূপ জন্ম গ্রহণ করা অর্থে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বৈদ্য প্রবোধনীকার "বেদাৎ জাতোহি বৈদ্যঃ স্যাৎ" এই পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া থামিয়াছেন, বাকি অংশ উদ্ধৃত করিতে কেন বিরত হইয়াছেন তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। বৈদ্য, অম্বষ্ঠ যে এক জাতি নহে তাহা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া "অম্বষ্ঠো ব্রহ্ম পুত্রকঃ" অংশ বাদ দিয়াছেন।—যে অম্বষ্ঠ ব্রহ্ম পুত্রক (ব্রাহ্মণের

---

(১)　বিখ্যাতা সর্ব্ব দেশেষু সংকৃতা কুলপঞ্জিকা।
বংশে তৎ পুণ্যকর্ম্মণঃ মাতুলঃ কবিকঙ্কণঃ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব-কুল গ্রন্থান্ সমীক্ষ্য চ বিচার্য্য চ।
যদমুক্তং মাতুলেন সংগৃহ্য চ তদনন্তরঃ॥
কবিনা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিত বর্ত্মনা।
শকসপ্ততিশে শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা।

রামকান্ত দাস কৃত বৈদ্যকুল পঞ্জিকা কবি কণ্ঠহার (১৫৭৫ শকাব্দে প্রণীত) ভরত মল্লিক ইহার ২২ বৎসর পরে ১৫৯৭ শকাব্দে চন্দ্রপ্রভা প্রণয়ন করেন।

পুত্র) সেই যে বৈদ্য তাহাই এখানে বলা হইতেছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে উত্তর খণ্ডে ৯অঃ আছে।

আয়ুর্ব্বেদং দদৌ তস্মৈ বৈদ্য নাম চ পুষ্কলম্।
তেনাসৌ পাপ শূন্যো ২ভূৎ অম্বষ্ঠ খ্যাতি সংযুক্তঃ॥

ভরত মল্লিক চন্দ্র প্রভা নামক কুল পঞ্জিকা গ্রন্থে নিম্নলিখিত অগ্নিবেশ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই অগ্নিবেশ অত্রি মুনির শিষ্য ছিলেন।

(আত্রেয়স্য মুনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়োঽভবন্—শব্দ কল্পদ্রুম)

এবং সর্ব্বেপি চাম্বষ্ঠা বৈশ্যা ব্রাহ্মণ সম্ভবাঃ।
জননীতো জমু র্দ্ধা যজ্ঞ জাতা বেদ সংস্কৃতৈঃ॥
অম্বষ্ঠা স্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

ভট্টি টীকা প্রারম্ভে ভরত মল্লিক নিজেকে অম্বষ্ঠ বলিয়া সমাপ্তিতে এই ভাবে বিশদ রূপে পরিচয় দিয়াছেন—

কুলবিতরণবিজ্ঞাবৈভবাম্বষ্ঠগোষ্ঠীবরহরিহরখান খ্যাতবংশাম্বুধীন্দোঃ। ভুবনবিদিতকীর্ত্তিঃ সেনগৌরাঙ্গতো যোঽজনি স ভরতসেনো ভট্টি-টীকাঙ্ককার॥ ইতি সদ্বৈদ্য হরিহরখানবংশ সম্ভব গৌরাঙ্গ মল্লিকাত্মজ শ্রীভরতসেনকৃতায়াং মুগ্ধবোধিন্যাং ভট্টিটীকায়াং পুর প্রবেশো নাম দ্বাবিংশতি-তমঃ সর্গঃ।

ভরত, সেন উপাধি ধারী সদ্ বৈদ্য বংশোদ্ভব অম্বষ্ঠ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। এই টীকা এখন হইতে ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে অম্বষ্ঠ শব্দের এই রূপ ব্যাখা আছে।

দেশ বিশেষঃ। বিপ্রাদ্বৈশ্যায়ামুৎপন্নঃ। ইতি মেদিনী॥ অম্বষ্ঠ চিকিৎসাবৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ। ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ। অমর

কোষের টীকায় ভরত মল্লিক অম্বষ্ঠই বৈশ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ। এই কথা মেদিনী অভিধানে আছে। চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা অম্বষ্ঠ, বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

বৈদ্য শব্দের অর্থ শব্দকল্পদ্রুমে এইরূপে লিখিত আছে—

আয়ুর্ব্বেদবেত্তা। স চাম্বষ্ঠ জাতিশ্চিকিৎসাবৃত্তিশ্চ।

বৈদ্য অর্থ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, ইত্যমর ভরতৌ। অম্বষ্ঠ জাতি ও তাহার বৃত্তি চিকিৎসা। এই বচন জাতিতত্ত্ব বিবেক, জাতি মিত্র প্রভৃতি বহু পুস্তকে ধৃত হইয়াছে।

বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নস্ততো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ।

তিষ্ঠত্যম্বাকুলে জাত স্তস্মাদম্বষ্ঠ উচ্যতে॥ ব্রহ্মপুরাণ।

বেদ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ রূপ জন্ম গ্রহণ করা হেতু (বেদং বেত্তি) এই অর্থে বৈদ্য আর অম্বাকুলে অবস্থিত অর্থে অম্বষ্ঠ কহে। মনু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতৃগণ অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। (১) কিন্তু তাহারা অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কালক্রমে

---

(১) সত্যবটে মন্বাদি গ্রন্থে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের অভেদ বিঘোষিত হয় নাই। কিন্তু হইবে কি প্রকারে? তখন ত বৈদ্য শব্দটার বহুল প্রচার বশতঃ উহা জাতি বাচক হইয়া যায় নাই? কিন্তু মনু ত আমাদিগকে চিকিৎসক বলিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তবে এইমাত্র বুঝিতে হইবে শঙ্খ সংহিতা, বৃহদ্ধর্ম্ম ও স্কন্দপুরাণ প্রণীত হইবার পূর্ব্বেই যে অম্বষ্ঠ আমরা বৈদ্য নামে পরিচিত হইয়াছিলাম তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এই সকল গ্রন্থ দুই এক হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ভিন্ন পরবর্ত্তী নহে। সুতরাং আমরা নাচারে পড়িয়া অম্বষ্ঠ নাম লইয়াছি, ইহা জাতি বিচার প্রণেতা প্রভৃতি মুখর ছোকরা দলের মুখরব ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

('জাতিতত্ত্ব বারিধি উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত)
১৩০৯ সালের ১ম সংস্করণ।

বৃত্তি জাতি হইয়া পড়িয়াছে ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

স্তানামশ্বসারথ্য মম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বনিক্ পথঃ॥

মনু ১০ অঃ ৪৭।

সূতদিগের অশ্ব সারথ্য অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা বৈদেহদিগের অন্তঃপুর রক্ষা, মাগধদিগের বাণিজ্য বৃত্তি।

উশনা বলিয়াছেন—

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যা জীবোভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনীজীবিকা চৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ॥

ধর্ম্ম প্রচার, জাতিতত্ত্ব বিবেক, জাতি মিত্র ও অম্বষ্ঠ দীপিকা ধৃত।

ব্রাহ্মণের বৈধ বিবাহিতা বৈশ্যা পত্নীতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ, কৃষি, আগ্নেয়, সেনাপত্য ও চিকিৎসা তাহাদের বৃত্তি।

কাহারও মতে বৈদ্যগণ উশনা কথিত অম্বষ্ঠ নহে কারণ তাহাদের কৃষি, আগ্নেয় ও সেনাপত্য বৃত্তি নাই। কোন জাতির যে কয়টী বৃত্তি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার সব গুলিই যে প্রচলিত থাকিতে হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। আর কোন কালেও যে বৈদ্যগণের দেশ ভেদে এই সকল বৃত্তি ছিল না তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোহম্বষ্ঠো মুনি সত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

পরাশর সংধৃত ও জাতি মালাধৃত পরশুরাম সং।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্য কন্যাতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ। হে মুনি সত্তম, মুনি শ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এখানেও বৈদ্য শব্দ ধরেন নাই। সম্ভবত তখনও বৈদ্য শব্দ জাতি বাচক রূপে ব্যবহৃত হয় নাই।

মৎস্য পুরাণে চিকিৎসকই যে বৈদ্য তাহা লিখিত আছে।

চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু স চিকিৎসক উচ্যতে।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে॥

অমর কোষে বৈদ্য ও চিকিৎসক যে একার্থ বাচক তাহা স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষক্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।

রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক ও বৈদ্য এই চারিটী চিকিৎষকার্থ বাচী।

উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন তাহার জাতিতত্ব বারিধিতে বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ জাতি তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যাজাত হইলেও তাঁহারা আচারাদিতে ব্রাহ্মণ সদৃশ ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। কিন্তু বৈদ্য প্রবোধনীর মতে "বঙ্গীয় বৈদ্যগণ মূল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ নহে; বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতি হওয়া অসম্ভব। অম্বষ্ঠ নামক একটী দেশ ছিল, তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিত তজ্জন্য কুলজী গ্রন্থে কচিৎ বৈদ্যের অম্বষ্ঠ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদ্যগণ বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত নহে তাহারা খাঁটি ব্রাহ্মণ। ইহাই এখন বৈদ্য প্রবোধনীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপসংহারে ৩৮ পৃষ্ঠায় বৈদ্য প্রবোধনীর নিবেদন এই যে "বৈদ্যগণ যে এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ নহেন, একথা স্বর্গীয় মহর্ষি কল্প গঙ্গাধর কবিরাজ, পণ্ডিতবর উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্যারী মোহন, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই পূর্ব্বে নিজ নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন"।

উমেশ বিদ্যারত্ন ও গোপীচন্দ্র বৈদ্য জাতিকে মূল ব্রাহ্মণ ও তাহারা বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত অম্বষ্ঠ বর্ণ নহেন, এরূপ কথা কখনও বলেন নাই। উমেশ বিদ্যারত্ন তাহার জাতি তত্ত্ব বারিধিতে বৈদ্যগণ জারজ নহেন এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ বৈশ্য কন্যা বিবাহ করাতে তাহাতে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহা একটী স্বীকৃত সত্য এবং অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যগণ যে একই বস্তু তাহাও একটী সর্ব্ববাদি পরিজ্ঞাত সত্য, সুতরাং উক্ত কারণে বৈধ বিবাহ প্রভব অম্বষ্ঠগণের জারজত্বাপবাদ কিছুতেই সমূলক হইতে পারে না।"

জাতি তত্ত্ববারিধি ১৩১৮ সনের ২য় সং পৃ ২১১।

২২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "বৈদ্য শব্দ মন্বাদি সংহিতা মতে কোন জাতি বাচক শব্দ নহে উহার অর্থ চিকিৎসক। মন্বাদি অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব একটী জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গোপী চন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ বিগত ১৩১২ সালে বৈদ্য পুরাবৃত্তে ব্রাহ্মণাংশ পূর্ব্ব খণ্ডে প্রমাণ করিয়াছেন যে বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত অম্বষ্ঠ জাতি ও বঙ্গীয় বৈদ্য জাতি অভিন্ন। তিনি লিখিয়াছেন—

"অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যগণ অম্বষ্ঠকেই যে কখন বৈদ্য কখন অম্বষ্ঠ বলিতেন, আর্য্য শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা সেই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে।" সবর্ণা জাত পুত্র হইতে অসবর্ণা জাত পুত্র কিছুতেই হীন হইবে না, ইহাই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

রাজনগরাধিপ মহারাজ রাজবল্লভ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে উপনয়ন প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি কাশী কাঞ্চী, দ্রাবিড় মহারাষ্ট্র উড়ষ্যা, কান্যকুব্জ, মিথিলা, বীরভূম, সেনভূম, বাকলা নবদ্বীপ, ধামুকা প্রভৃতি স্থানের রাজনগরে সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের যে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন, তাহাতে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ বৈশ্যাগর্ভজাত অম্বষ্ঠ এবং উপনীত অম্বষ্ঠ ও তাহার সন্তান সন্ততিগণ বৈশ্যের ন্যায় পঞ্চদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিবেন এইপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হয়। উক্ত ব্যবস্থা পত্র ও অনুবাদ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। মহারাজার সময় রাজনগরে তাঁহার আশ্রিত শাস্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব ছিল না, তাঁহার অর্থেরও কোন অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহাকে সমগ্র ভারতের পণ্ডিতগণ প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন ইহা কল্পনাতীত। ঐ সময় পঞ্চকোট ও রাঢ়ীয় সমাজের সমস্ত বৈদ্য সন্তানই নিয়মিতরূপে উপবীত গ্রহণ করিতেন এবং মহারাজা রাজবল্লভের শ্রীখণ্ডের সমাজের সহিত বিশেষ সংস্রব ছিল। তিনি বর্দ্ধমান জিলায় শ্রীখণ্ড গ্রামে ভূতনাথ দেবের যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই মন্দির সংলগ্ন প্রস্তর ফলকে এইরূপ লিখিত আছে।

প্রাসাদং সমকারয়ং নবমমুং শ্রীভূতনাথস্যৈব ।
যোঽগ্নিষ্টোমমহাধ্বরাদি মযজদ্ যো বাজপেয়ী ক্ষিতৌ ॥
দাতা শ্রীযুক্ত রাজবল্লভনৃপঃ সোঽম্বষ্ঠাববিন্দার্য্যমা
শাকে তর্ক মহীধ্র রাগ রজনীনাথেচ মাসে সিতে ॥

যিনি অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন, যিনি জগতে বাজপেয়ী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, অম্বষ্ঠ কুল পদ্মের বিকাশক

সেই নৃপতি রাজবল্লভ ১৬৭৬ (১৭৫৪ খৃঃ) শাকের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে সোমবার ভূত নাথ দেবের এই রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। (শ্রীযুক্ত রসিক লাল গুপ্তের মহারাজা রাজবল্লভ সেন) ঐ সময় রাঢ় ও বঙ্গদেশে শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্য পাণ্ডিতের অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহারা সকলেই তত বড় হস্তী মূর্খ ছিলেন যে নিজেরা কোন্ জাতি ও তাঁহাদের অশৌচ কত দিন, তাহা জানিতেন না—এইরূপ অনুমান করা উষ্ণ মস্তিষ্কের প্রলাপ বই আর কি বলিব? ইহার বহুকাল পরে ১২৮৪ সনে কলিকাতা ভবানীপুরে যে অম্বষ্ঠ সাম্মিলনী সভা স্থাপিত হয়, ঐ সভা হইতে প্রকাশিত অম্বষ্ঠ দীপিকা গ্রন্থে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ এবং তাহাদের অশৌচ পঞ্চদশ দিন ব্যাপী, ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে। সভা হইতে অনেকানেক পণ্ডিতের ব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ সভার সভ্যগণ মধ্যে অনেক গণ্য মান্য শাস্ত্রজ্ঞ অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম এ এম বি মহাশয়ের পিতা ৺পঞ্চানন রায়, ৺ গৌরী নাথ সেন, মহা-মহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন প্রভৃতি খ্যাত নামা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত সকল এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহারাজা রাজবল্লভের ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন ইহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে! আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অম্বষ্ঠ বলিয়াই আত্ম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং আমরাও এতকাল দ্বিজ ধর্ম্মী অম্বষ্ঠ বলিয়াই পরিচয় দিয়া আসিতেছি। এখন বৈদ্য প্রবোধনীর মতে কতকগুলি নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহাতেই হাজার হাজার বৎসর পরে আমাদের পিতৃ পুরুষগণের ভুল ধরা পড়িয়াছে! আমরা এতকাল যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া আসিতেছিলাম তাহা সমস্তই পণ্ড হইয়াছে এবং অবৈধরূপে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করায় পূর্ব্ব পুরুষগণের এখনও প্রেতত্ব মোচন হয় নাই! যাহা হউক এখন নূতন আবিষ্কৃত তথ্য সকলের আলোচনা করা যাউক।

(১) "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।" মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৬ষ্ঠ অঃ ৮ বৈদ্যপ্রবোধনীর অনুবাদ "দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ।" প্রকৃত পক্ষে এখানে বৈদ্য শব্দ জাতি বাচক নহে। এখানে শ্লোকাংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ সন্দর্ভ ফুট নোটে দেওয়া হইল। (১) উদ্যোগপর্ব্বের প্রারম্ভে কৌরবদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া একজন দূত পাঠান হয়। মহাভারতে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে—

"অনন্তর পাঞ্চালরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরের মতানুসারে প্রজ্ঞাশালী বয়োবৃদ্ধ স্বীয় পুরোহিতকে কৌরব গণের নিকট প্রেরণ করিলেন। (২) রাজা দ্রুপদ নিজ পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রাণি-গণ, প্রাণিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্যাবান্, বিদ্যাবানের মধ্যে সিদ্ধান্তজ্ঞ, সিদ্ধান্তজ্ঞের মধ্যে যাহারা জ্ঞানানুরূপ কর্ম্মকারী ও কর্ম্মকারীর মধ্যে ব্রহ্ম-বেত্তাই শ্রেষ্ঠ। আপনি কৃত বিদ্য ব্যক্তির মধ্যে প্রধান, অতি বিশিষ্ট বংশোৎপন্ন, পরিণত বয়স্ক, বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী এবং শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় ধীশক্তি সম্পন্ন; অতএব আপনাকে কৌরবগণের কোন পরিচয় দিতে হইবে না, আপনি সবিশেষ বিলক্ষণ অবগত আছেন।" এখানে বৈদ্য জাতির কথা কোথা হইতে আসিল? দ্রুপদ নিজ পুরোহিতের দৌত্য কার্য্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করার অভিপ্রায়ে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন

---

(১) দ্রুপদ উবাচ। ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধি জীবিনঃ। বুদ্ধিমৎসু নরাঃশ্রেষ্ঠা নরেষপি দ্বিজাতয়ঃ। দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষুকৃত বুদ্ধয়ঃ। কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।

নীলকণ্ঠ টীকা :—বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ কৃতবুদ্ধয়ঃ সিদ্ধান্তজ্ঞাঃ। মনু ১।৯৬-৯৭ তুলনীয়।

(২) ততঃ প্রজ্ঞাবয়ো বৃদ্ধং পাঞ্চাল্যঃ স্বপুরোহিতম্।

কুরুভ্যঃ প্রেষয়ামাস যুধিষ্ঠির মতে স্থিতঃ। উদ্যোগ্য ৫ অঃ ১৮ শ্লোক।

করিয়াছেন মাত্র। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বৈদ্যাঃ শব্দের অর্থ বিদ্যাবন্তঃ ও কৃত বুদ্ধয়ঃ অর্থ সিদ্ধান্তজ্ঞাঃ করিয়াছেন এবং তাহাই সমীচীন। মনুর ১।৯৭ শ্লোকে স্পষ্টই লিখিত আছে ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃত বুদ্ধয়ঃ। কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥ মনুর এই শ্লোকে বৈদ্যাঃ স্থলে বিদ্বাংসো আছে কাজেই নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা মনুর মতানুযায়ী।

এই পুরোহিত যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। চতুর্থাধ্যায়ে দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "রাজন্ আমার পুরোহিত এই ব্রাহ্মণকে (অয়ঞ্চ ব্রাহ্মণঃ শীঘ্রং মম রাজন্ পুরোহিতঃ) ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট পাঠান হউক। ইহার পরে যখন পুরোহিতকে পাঠান স্থির হইল তখন দ্রুপদ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা সকল বলিয়াছিলেন।

(২) অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ।

বৈদ্য প্রবোধনীর অনুবাদ "যাহারা বৈদ্য নহে, তাহাদিগকে অব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।"

যুদ্ধের আয়োজন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "আপনি কখনও অধর্ম্মে মতি করেন নাই, কখনও পাপ কর্ম্মও করেন নাই। * * * হে ধর্ম্মরাজ আপনি জ্ঞাতিদ্রোহ রূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া কদাচ সজ্জনানুগত পথ পরিত্যাগ করিবেন না।"

ইহার উত্তরে যুধিষ্ঠির অনেক কথার পর নিজের জাতিধর্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের জাত্যুক্ত ধর্ম্ম) পরিত্যাগ করা যে উচিত নহে তাহা প্রদর্শনার্থ বলিলেন, মনীষিগণের তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণার্থে সজ্জন সমীপে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা শাস্ত্র সম্মত কিন্তু যাহারা অব্রাহ্মণ অথচ তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী নহে, তাহাদের স্ব স্ব জাতি ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করাই শ্রেয়ঃ। আমাদিগের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষ সকল, অজ্ঞাত

প্রজ্ঞান্বেষী মহাত্মাগণ এবং কস্ম সন্ন্যাসিসমুদয় পূর্ব্বোক্ত পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, আমি অনাস্তিক, সুতরাং অন্য পথ অবলম্বন করিতে পারি না।"*

সঞ্জয় বলিলেন "আপনি পরম ধাম্মিক হইয়া কিজন্য এরূপ অধর্ম্ম কর্ম্মে (যুদ্ধরূপ কর্ম্মে) প্রবৃত্ত হইতেছেন।" যুধিষ্ঠির তাহার উত্তরে ঐরূপ বলিলেন। ইহার ভবার্থ, আমি ব্রাহ্মণ নহি তদুপরি ব্রহ্মবিদ্যা-নিষ্ঠ নহি, কাজেই ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম পালন করাই কর্ত্তব্য; কাজেই আমি অধর্ম্মাচরণ করিতেছি না। প্রবোধনী মতে যুধিষ্ঠির জবাব দিলেন "বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদ বাচ্য, অপর ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী।" ইহা পাগলের প্রলাপ উক্ত বই কি। তাহার জবাবে বৈদ্যের কথা আসিবার কোন কারণ নাই।

(৩) সর্ব্ব বেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদঃ।

চিকিৎসা কুশল শ্চৈব স বৈদ্যস্ত্বভিধীয়তে॥

(৺প্যারী মোহন ধৃত উশনার বচন)

---

* মনীষিণাঃ সত্ত্ব বিচ্ছেদনায়, বিধীয়তে সৎসু বৃত্তিঃ সদৈব।

অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ সর্ব্বোৎসঙ্গং সাধু মন্যতে তেভ্যঃ।

নীলকণ্ঠ লিখিলেন যেতু অব্রাহ্মণা অপি বৈদ্যাঃ বিদ্যানিষ্ঠা ন ভবন্তি তেষাং ভিক্ষাচর্য্যাবিধানাৎ তেভ্যঃ তেষামর্থে সর্ব্বোৎসঙ্গম্ উৎসঙ্গং সর্ব্বেষাং সমীপং স্বধর্ম্ম-সংযোগং আপদনাপদোরুচিতং সাধু মন্যতে। যাহারা অব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি) অথচ বৈদ্য অর্থাৎ বিদ্যানিষ্ঠ নহে তাহাদের ভিক্ষাচর্য্যার বিধান না থাকায় তদুক্ত স্বধর্ম্ম পালন করাই উচিত।

প্রবোধনীর অনুবাদ "সর্ব্ব বেদজ্ঞ ও সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণ চিকিৎসায় নিপুণ হইলে বৈদ্য নামে অভিহিত হন।" এরূপ কোন বচন উশনা সংহিতায় নাই। আর এই শ্লোক দ্বারা বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ এরূপ অর্থ আসে না। এখানে বৈদ্য শব্দের অর্থ পণ্ডিত। বৈদ্যেন বিদুষা ইতি দায়তত্ত্বম্। (শব্দকল্পদ্রুম)।

(৪) স্বয়মর্জ্জিতমবৈদ্যেভ্যো বৈদ্যঃ কামং ন দদ্যাৎ।

(শঙ্খ বচন)

প্রবোধনীর অনুবাদ বৈদ্য অবৈদ্যকে স্বোপার্জ্জিত ধন দান করিবে না।

(৫) নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্কচিৎ।

(কাত্যায়ন সং)

প্রবোধনীর অনুবাদ বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান করিবেন না।

এই দুইটী বচনের দ্বারা, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ, কোথা হইতে আসিল?

এই বচন দুইটী সংসৃষ্ট ভ্রাতাদিগের মধ্যে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির বিভাগের বিধান। সংসৃষ্ট ভ্রাতা দিগের মধ্যে যদি একজন বৈদ্য হয় এবং অপরে অবৈদ্য হয়, বৈদ্য নিজের উপার্জ্জিত সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। তৎপর্য্য এই, কোন ব্যক্তির স্বয়ং উপার্জ্জিত বিদ্যাহৃত ধনে অপর ভ্রাতার কোন অধিকার থাকিবে না। ইহা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধীয় বিধান। গৌতম সংহিতায় এরূপ লিখিত আছে "সংসৃষ্টবিভাগঃ প্রেতানাং জ্যেষ্ঠস্য সংসৃষ্টিনি প্রেতে অসংসৃষ্টী ঋকৃথ-ভাক্ বিভক্তজঃ পিত্র্যমেব। স্বয়মর্জ্জিতং বৈদ্যো হবৈদ্যেভ্যঃ কামং ভজেরন্॥ গৌতম সং ২৯ অঃ। অর্থাৎ সংসৃষ্টী ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অসংসৃষ্টী জ্যেষ্ঠের ধনভাগী হইবে, বিভাগের পর যে ভ্রাতা উৎপন্ন হইবে, সে কেবল পিতৃধনের অংশ লাভ করিবে। নিজ বিদ্যাবলে স্বোপার্জ্জি...

ধনের অংশ অপর অবিদ্বান্ ভ্রাতা পাইবে না। ভগবান্ মনুর ৯ম অধ্যায়ের ২০৪।২০৫।২০৬ শ্লোক আলোচনা করিলে (৪) ও (৫) সংখ্যক বচনের প্রকৃত অর্থ বুঝা যাইবে।

ভগবান মনু ঐ তিন শ্লোকে বলিয়াছেন :—পিতার মরণোত্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপনার ক্ষমতায় যে ধন উপার্জ্জন করিবে উহাতে বিদ্বান্ কনিষ্ঠের অংশ হইবে। ভ্রাতৃগণ মিলিয়া কেহ কৃষি কেহ বানিজ্য দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করে, তাহার বিভাগ সময় সকলে সমান পাইবে। বিদ্যাধন যাহার তাহারই থাকিবে। প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন করিয়া যে ধন লব্ধ হয় তাহার নাম বিদ্যাধন ; উহা যাহার তাহারই, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। (১) রঘুনন্দন মনু ব্যাস ও কাত্যায়নের বচন উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

বিদ্বান্ ব্যক্তি সমবিদ্য ও অধিকবিদ্য দায়াদকে বিদ্যাধনের ভাগ দিতে পারে ; কিন্তু অবিদ্য ও ন্যূনবিদ্য দায়াদকে দিবে না। (২)

(৬) ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।
বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ ॥ রামায়ণ অযো
পর্ব্ব ৭৭ অঃ।

---

(১) যৎকিঞ্চিৎ পিতরিপ্রেতে ধনং জ্যেষ্ঠোঽধিগচ্ছতি।
ভাগো যবীয়সাং তত্র যদি বিদ্যানুপালিনঃ। মনু ৯ অঃ ২০৪
অবিদ্যানান্তু সর্ব্বেষামীহাতশ্চেদ্ধনং ভবেৎ।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাদপিত্র্য ইতি ধারণা। ২০৫
বিদ্যাধনন্তু যদ্যস্য তৎ তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
মৈত্র্যমৌদ্বাহিকঞ্চৈব মাধুপর্কিকমেব চ। ২০৬

(২) তেন সমবিদ্যাধিকবিদ্যানাং ভাগঃ, নতু ন্যূনবিদ্যাঽবিদ্যয়োঃ বৈদ্যেন বিদুষা। রঘুনন্দন।

প্রবোধনীর অনুবাদ—"তৎপর প্রকৃতিমান্, পিতৃপুরোহিত, বৈদ্য বশিষ্ঠ দেব ভরতকে উঠাইয়া এই বাক্য বলিয়াছিলেন। শক্তি গোত্র ও বশিষ্ট গোত্র বৈদ্যগণ এই বংশসম্ভূত ইহা সুপ্রসিদ্ধ।"

এখানে বৈদ্য শব্দ জাতি বাচক নহে, ইহার অর্থ পণ্ডিত। রামানুজ অর্থ করিয়াছেন—বৈদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ। বশিষ্ঠ দেব ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনি সূর্য্যবংশের পুরোহিত ছিলেন; তিনি যে খাঁটি ব্রাহ্মণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বশিষ্ঠ যখন বিশ্বামিত্রকে কামধেনু দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তখন বিশ্বামিত্র এই ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আপনি তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ প্রশান্ত চিত্ত ব্রাহ্মণের বল বীর্য্য কোথায়! যদি অর্ব্বুদ গো গ্রহণ পূর্ব্বক নন্দিনীকে না দেন তাহা হইলে স্বজাতি সুলভ বল প্রকাশ করিয়া গোধন লইয়া যাইব। (১) তৎপরে বিশ্বামিত্র হরণ করিতে উদ্যত হইলে নন্দিনীকে বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন "ক্ষত্রিয়দের তেজই বল এবং ব্রাহ্মণগণের ক্ষমাই বল।" (২)

যেখানে যেখানে বৈদ্য শব্দের প্রয়োগ আছে তত্তাবদ্দ্বারা যে বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈদ্য জাতিকে বুঝিতে হইবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সংস্কার। তাহা হইলে কুন্তী যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

এতদ্ধর্ম্মমধর্ম্মং বা জন্মনৈবাভ্যজায়থাঃ।
তে তু বৈদ্যাঃ কুলে জাতা অবৃত্ত্যা তাত পীড়িতাঃ।
মহাভারত উদ্ ১৩২ অঃ ২৭ শ্লোক

---

(১) বিশ্বামিত্র উবাচ—ক্ষত্রিয়োঽহং ভবান্ বিপ্রস্তপঃ স্বাধ্যায় সাধনঃ। ১৮
ব্রাহ্মণেষু কুতো বীর্য্যং প্রশান্তেষু ধৃতাত্মসু।
অর্ব্বুদেন গবাং যস্ত্বং ন দদাসি মমেপ্সিতম্। ১৯
স্বধর্ম্মং ন প্রহাস্যামি নেষ্যামি চ বলেন গাম্। ২০

(২) বশিষ্ঠ উবাচ—ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্। ২৯

নীলকণ্ঠ টীকা করিলেন—

এতৎ মদ্বাক্যং ধর্ম্মং ধর্ম্মযুক্তং অধর্ম্মং বা জন্মনৈব স্বভাবত এব অত্যা জায়থাঃ অভিজানীষে হে কৃষ্ণ! তে তু পাণ্ডবাস্ত বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ।

বৎস! আমি যাহা কহিলাম, উহা ধর্ম্মোপেত বা অধর্ম্মযুক্ত, তাহা জানিনা; কিন্তু উহা আমার স্বভাবতঃ সমুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে। দেখ বেদজ্ঞ (বিদ্যাবন্ত) ও সৎকুলজাত হইয়াও জীবিকার অভাবে তাহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট হইতেছে।

(কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)

এইরূপে ভূরি ভূরি স্থানে বৈদ্য শব্দের প্রয়োগ আছে। অনুশাসন পর্ব্বে ১৪৯ অঃ ভীষ্ম বিষ্ণুর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিতেছেন "বেদ্যো বৈদ্যঃ সদাযোগী বীরহা মাধবো মধুঃ। অতীন্দ্রিয়ো মহামায়ো মহোৎসাহো মহাবলঃ।"৩১ তাঁহার নাম বেদ্য বৈদ্য যোগী বীরঘাতী ইত্যাদি—

বৈদ্য প্রবোধনী এখানে বেদ্য ও বৈদ্য শব্দের কি অর্থ করিতে চাহেন!

(৭) ক্ষীরোদ মথনে বৈদ্যো দেবো ধন্বন্তরির্হ্যভূৎ।

বিভ্রৎ কমণ্ডলুংপূর্ণমমৃতেন সমুত্থতঃ॥ গরুড় পুরাণ

বৈদ্য প্রবোধনীর অনুবাদ—"সমুদ্র মন্থনকালে অমৃত পূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে বৈদ্য ধন্বন্তরি দেব প্রাদুর্ভূত হইলেন।"

এই ধন্বন্তরি অযোনিসম্ভব, সমুদ্র গর্ভ হইতে সমুদ্ভূত। ভাগবতে তিনি বিষ্ণুর অংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন—

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।

ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্॥ ৮।৮।২৩ (১)

(১) তিনি সাক্ষাত ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে সমুৎপন্ন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। ধন্বন্তরি নামে খ্যাত ও যজ্ঞের ভাগ হবিঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

গরুড় পুরাণের উদ্ধৃত শ্লোকের "বৈদ্য" শব্দের অর্থ বিদ্বান্ বা চিকিৎসক যাহাই হউক, তদ্দ্বারা বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা কিসে প্রমাণ হইল ? পুরাণ ও সাহিত্যে অনেক ধন্বন্তরির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কোন্ ধন্বন্তরি বৈদ্যদিগের মধ্যে গোত্র প্রবর্ত্তক তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

(৮) বৈদ্য প্রবোধনী চন্দ্রের স্তোত্র হইতে—

"যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ।"

উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন—"চন্দ্র দেব বৈদ্য ব্রাহ্মণ না হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মণ হইলে পুরুষানুক্রমে রাজা হইতে পারিতেন না।" ইহার অর্থ কি বুঝা যায় না। চন্দ্র দেবতাকে স্তব করিতে গিয়া বৈদ্য ও বিদ্যাবিশারদ বলা হইয়াছে—বিষ্ণুকেও ত সহস্র নামে বলা হইয়াছে "বেদ্যো বৈদ্যঃ"। মহাদেবেরও নাম বৈদ্যনাথ। বটুক ভৈরবকেও অষ্টোত্তর শত নামে বলা হইয়াছে "সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্।" তাহা হইলে এই দাড়াইল যে, চন্দ্র, বিষ্ণু, মহাদেব, বটুক ভৈরব ও কুন্তীপুত্রগণ সকলেই "বৈদ্য ব্রাহ্মণ" ছিলেন!

প্রবোধনী লিখিয়াছেন "বল্লাল সেনাদি চন্দ্রবংশীয় বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।" ইহার দ্বারা চন্দ্র দেবতা যে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ তাহা কিসে প্রমাণ হইল ? চন্দ্র বংশীয় রাজগণ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। বল্লাল সেন অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতি হইয়াও যদি কখনও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত বই আর কি বলিব ? প্রবোধনীর মতে বল্লাল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা হইলে "চন্দ্র বংশীয়" কথাটা খাপ খায় না। ধাতুময় ফলক হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যাহার যেরূপ মনের ভাব তিনি তদনুসারে অর্থ ও

ও জলসিক্ত হইয়া থাকায় অক্ষর পড়িয়া অনেক স্থান অবোধ্য ও অপাঠ্য হইয়া থাকে। একই ফলক হইতে বল্লালকে কেহ ক্ষত্রিয় এবং অপর পক্ষ অম্বষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন; কেহ বা সেনশর্ম্মা প্রভৃতি তাঁহার ঘাড়ে চাপাইতেছেন। সেন রাজগণ কখনও কখনও ক্ষাত্রিয়ত্বের ভাণ করিতেন তাহা চট্টোপাধ্যায় মুলো পঞ্চানন ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আপন গোষ্ঠী কথায় লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ, কার্য্যে মাতৃ ব্যবহার॥
রাজপুত ক্ষত্র বলতে বদ্ধ পরিকর।
আজি শুদ্ধ ক্ষত্র নাই বর্ণের শঙ্কর॥

মুলো পঞ্চাননের কারিকাতে প্রকাশ আদিশূর ও বল্লাল সেন বৈদ্য, শাস্ত্রানুসারে দ্বিজাতি, তাহাদিগের আচার মাতৃকুলের বৈশ্যাচার। তবে রাজা বলিয়া ক্ষত্রিয়ের ভাণ করিতেন।

আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈদ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল, ক্ষত্রবৎ ভাতি॥ মুলো পঞ্চানন।

৺উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন বল্লাল মোহমুদ্গরে লিখিয়াছেন "সেন রাজগণ সর্ব্বত্র অম্বষ্ঠ শব্দে পরিচিত, অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা বৈশ্যা, সুতরাং তাহাতে ক্ষত্রিয়ের সংস্রব আদবেই নাই এবং ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়গণ মূর্দ্ধাবসিক্ত ভিন্ন কখন অম্বষ্ঠ বলিয়াও সমাখ্যাত হইতে পারেন না। ফলতঃ সেনরাজগণ বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন না, পরন্তু ষোল আনাই ভাণ করিতেন। তাম্র ফলকে এমন একটি কথাও বলেন নাই যে উঁহারা বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়। আমারা "চন্দ্র বংশীয়" একথা বলিয়াছেন কিন্তু আমরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলেন নাই। তদীয় নাম-সাগরে কুত্রাপি বর্ম্মা শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তাই তাহারা সেন

দেব লিখিতেন, দেব বর্ম্মা নহে। প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইলে "রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়:" "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা" কথা গুলির ব্যবহার করিতেন না।"

আর্য্য শাস্ত্রানুসারে রাজ পদ ক্ষত্রিয়ের ন্যায্য প্রাপ্য ও ন্যায্য অধিকার। অন্য জাতি রাজা হইলে অনেক সময় ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এজন্যই "চন্দ্র বংশীয়" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকিবেন। প্রবোধনী লেখক চন্দ্র বংশীয় কথা দ্বারা বল্লাল সেন যে ব্রাহ্মণ তাহা কিরূপে স্থির করিলেন বরং ক্ষত্রিয় বলিলে কথাটা কথঞ্চিৎ সাধিত হইত।

বল্লাল সেনের উত্তর বংশীয়গণের যে পত্র বল্লাল মোহ মুদ্গর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে—তদ্দারা বল্লাল যে অম্বষ্ঠ বৈদ্য তাহাই প্রমাণিত হয়। পরিশিষ্টে ঐ পত্রখানি দেওয়া হইল। বৈদ্য জাতির যে কুলজী গ্রন্থ আছে এবং যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তদ্দারায়ও ঐ কথা সমর্থিত হইতেছে। পুরা বৈদ্য কুলোদ্ভূত বল্লাল সেন মহীভুজা। কবি কণ্ঠহার—কুল পঞ্জিকা।

The universal belief in Bengal is that the Sens were of the medical caste, and families of Vaidya are not wanting in the present day who trace their lineage from Ballal Sen. Indo Aryan Vol. II. p. 263.

বল্লাল "সেন দেব" বলিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণত্ব বোধক নহে। সকল জাতীয় রাজগণ **দেব** শব্দ ব্যবহার করিতেন। আসামে কোচ বংশীয় রাজগণ অদ্যাপি দেব শব্দ ব্যবহার করিতেছেন।

বল্লাল সেন অম্বষ্ঠবৈদ্য কি ক্ষত্রিয়, ইহা নিয়া বহুকাল বিতর্ক চলিতেছিল। এক পক্ষ তাহাকে অম্বষ্ঠবৈদ্য ও অপর পক্ষ প্রধানত কায়স্থগণ তাহাকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে কত যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বৈদ্য

উমেশ চন্দ্র গুপ্ত—বিদ্যারত্ন বল্লাল মোহ মুদ্গর নামে এক খানি ৫৫২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বল্লাল যে অম্বষ্ঠ বৈদ্য তাহাই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছিলেন "ইহা একটী সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত স্বীকৃত সত্য যে বঙ্গ দেশের সেন রাজগণ বৈদ্য ছিলেন। বঙ্গ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নির্ব্যূঢ় ভাবে জানিতেন যে মহারাজ আদিশূর ও বল্লালসেন অম্বষ্ঠাপর-নাম-বৈদ্য-বংশ-প্রসূতি।" তিনি বহু গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন যে অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত তাহা সমস্ত বৈদ্য কুল পঞ্জিকা, ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জী ও কোন কোন কায়স্থ কুলপঞ্জীও উল্লেখ করিয়াছেন।

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দন। কায়স্থ ঘটক রামানন্দ শর্ম্মকৃত কায়স্থ কুল দীপিকা।

অম্বষ্ঠ বংশেতে জন্ম ব্রহ্মপুত্রজাত। কায়স্থ ঘটক কারিকা।

ধনঞ্জয় কৃত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জী—কুলপ্রদীপ আদিশূরসম্বন্ধে বলিয়াছেন "অম্বষ্ঠানাং কুলেহসৌ"

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ। ব্রাহ্মণ দেবীবর (শব্দকল্পদ্রুম)

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ। কুরুতেঽতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্র-নিরূপণম্॥ (শব্দকল্পদ্রুম)

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" ধৃত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুল পঞ্জী—বল্লাল সেনকে বলিয়াছেন "বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ" ও "সদ্বৈদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভব" এবং আদিশূরকে বলিয়াছেন "শ্রীলশ্রী আদিশূরনামা রাজা সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ পরম ধার্ম্মিক আসীৎ।"

কবি কণ্ঠহার প্রণেতা রামকান্ত দাস ১৫৭৫ শকাব্দে কণ্ঠহারে লিখিয়াছেন—

"পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালেন মহীভূজা।
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং দুহীসেনাদিবংশজে।

এই সকল কুল পঞ্জীতে বৈদ্য কুল অর্থ অম্বষ্ঠ বৈদ্য কুল। কোন কোন পঞ্জীতে অম্বষ্ঠ এবং কোন কোন পঞ্জীতে বৈদ্য শব্দ লেখা আছে। তখনও বৈদ্য অর্থ "শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ" হয় নাই। যাহা হউক বল্লালের সৌভাগ্য কিনা জানিনা, অধুনা সাব্যস্ত হইল যে, তিনি অম্বষ্ঠ বৈদ্য কি ক্ষত্রিয় নহেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! এত কালের জনশ্রুতি ও কুলপঞ্জী মিথ্যা সাব্যস্ত হইল এবং উমেশ বিদ্যারত্নের প্রচেষ্টা পণ্ড হইল। যাহা হউক বল্লাল সেন এখন তিন পক্ষের টানে পড়িলেন।

(৯) বৈদ্য প্রবোধনী বলিতেছেন—

"উৎকৃষ্টবিদ্যাসম্পন্ন সর্ব্ববেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকেই বৈদ্য বলা হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে যে বিপ্রগণ সর্ব্ব বিদ্যা সম্পন্ন হইয়া চিকিৎসা দ্বারা সর্ব্ববর্ণের রক্ষক বা পিতৃ স্বরূপ হইতেন, তাঁহাদিগকেই "বৈদ্য" "তাত বৈদ্য" (তাত—পিতা) "সর্ব্ব তাত" (সকলের পিতৃ স্বরূপ) প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। ইঁহারাই লোকানুগ্রহার্থ চিকিৎসা করিতেন বলিয়া 'ভিষক' এবং আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নার্থ পুনরায় বেদোক্ত আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন বিধি অনুসারে উপনীত হইয়া সর্ব্ব বিদ্যাবান্ হইতেন বলিয়া "ত্রিজ" নামে অভিহিত হইতেন।" এই সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া নিম্ন লিখিত কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(ক) "যত্রৌষধী সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্ রক্ষোহামীবচাতনঃ॥
(ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৯৭ সূক্ত)

ইহার সায়ণ ভাষ্য—বিপ্রঃ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ।

অমীবা ব্যাধিঃ তস্য চাতনঃ চাতয়িতা চিকিৎসকঃ।

যে স্থানে নানাবিধ ওষধি থাকে, সেই স্থানে ওষধি শক্তিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক্ (চিকিৎসক) বলে।

(খ) ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।

যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥ ঋক্ ঐ

সায়ণ ভাষ্য—যস্মৈ রুগ্নায় ব্রাহ্মণঃ ওষধিসামর্থ্যজ্ঞো ব্রাহ্মণো বৈদ্যঃ কৃণোতি করোতি চিকিৎসাম্। অর্থ, যে রুগ্নকে ওষধি শক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ চিকিৎসক চিকিৎসা করেন।

এই দুইটি মন্ত্র দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইল, যে চিকিৎসক (বৈদ্য) সেই ব্রাহ্মণ?

এই অর্থ কোথা হইতে আসিল। এখানে বলা হইল, যে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শী তাহাকে চিকিৎসক বলে। এই মন্ত্রে বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। মানুষ মর্ত্ত্য, সেজন্য যেখানে যত জীব জন্তু মর্ত্ত্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই মানুষ, এইরূপ যুক্তি অসার। ঋষিগণ যুগে যুগে সকল প্রকার শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া আসিয়াছেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণেতাও ঋষিগণই ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণই ঐ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। ক্রমে যখন অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইল তখন ঋষিগণ অম্বষ্ঠ জাতির চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া "আয়ুর্ব্বেদং দত্তস্তস্মৈ" (১) আয়ুর্ব্বেদ

---

(১) আয়ুর্ব্বেদং দত্তস্তস্মৈ বৈদ্যানাম চ পুষ্কলম।
তেনাসৌ পাপমুক্তোঽভূদ্ অম্বষ্ঠখ্যাতিসংযুতঃ। বৃহদ্ধর্ম্ম পুঃ
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতো হ্যম্বষ্ঠো মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থঃ নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ। পরশুরাম সং

খানি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন তদবধি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যক্ত হইল। চরক—সংহিতার বক্তা ভগবান্ মহর্ষি অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু এবং শ্রোতা অগ্নি বেশ প্রভৃতি ঋষি। তিনি গ্রন্থের অবতারণায় বলিলেন, কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায় তাহা জানিবার জন্য মহাতপা ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন, পরে অশ্বিনী কুমারদ্বয় দক্ষের নিকট এবং ইন্দ্র অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ ঋষিদিগের অনুরোধে ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া ছিলেন। রোগ সকল প্রাদুর্ভাব হওয়াতে মানবদিগের তপস্যা ও আয়ুর বিঘ্ন হইল। তখন জীবদিগের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ হিমালয় পার্শ্বে সমবেত হইলেন। এই সভায় অঙ্গিরা, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, গোতম, অগস্ত্য, মার্কণ্ডেয়, আশ্বরথ্য, ভার্গব, চ্যবন, শাণ্ডিল্য, সাঙ্কৃত্য, মরীচি, মৈত্রেয় ও অন্যান্য মহর্ষিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে ইন্দ্রই এ বিপদের উদ্ধার কর্ত্তা, তিনি রোগে শান্তির উপায় স্থির করিয়া দিবেন। কে সুরভবনে গমন করিবেন, এই কথা উপস্থিত হইবামাত্র ভরদ্বাজ ঋষি বলিলেন এজন্য আপনারা আমাকে নিযুক্ত করুন। তখন ঋষিদিগের অনুমতি মতে ভরদ্বাজ ইন্দ্রভবনে গমন করিয়া ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ অভ্যাস করিয়া ঋষিদিগকে যথাজ্ঞান শিক্ষা দিয়া ছিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বসু সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ ছয় জন শিষ্যকে পবিত্র আয়ুর্ব্বেদ দিয়া ছিলেন। তাহাদের নাম অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপানি। তখন দেবতারা অধিষ্ঠাতৃরূপে অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ছিলেন। অগ্নিবেশ প্রভৃতির সংগ্রহসকল, যাবতীয় মহর্ষির অনুমোদিত হইয়া

পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ পূর্ব্বক ভূতগণের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। (কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার কর্ত্তৃক চরক সং অনুবাদ) উল্লিখিত বেদ মন্ত্র দুইটী উদ্ধৃত করিয়াও আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে বৈদ্য শব্দ পাইয়া "বৈদ্য ব্রাহ্মণ" অনুবাদ করিয়াছেন। সেই সূত্রটী এই :—

বৈদ্যং চরিত্র বন্তং ব্রাহ্মণমুপবেশ্য সপনাশমাত্রশাপংযুপং নিধায়।

বৈদ্য প্রবোধনী অর্থ করিয়াছেন যিনি স্বয়ং শূলপব যাগ করিয়াছেন তদ্রূপ বৈদ্য ব্রাহ্মণকে এই কার্য্যে উপবেশন করাইবে ইত্যাদি"। এখানে বৈদ্য অর্থ চিকিৎসক নহে। যাগ সম্পাদন কার্য্যে চিকিৎসকের কোন প্রয়োজন হইতে পারে না, বৈদ্য অর্থ পণ্ডিত ও বেদজ্ঞ—যিনি বেদ পাঠ করিয়া যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং চরিত্রবান্ তাহাকে নিযুক্ত করিতে বলা হইয়াছে।

(১০) বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রদর্শন জন্য বৈদ্য প্রবোধনী চরক সংহিতা হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্য শব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা ॥
বিদ্যা সমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ব মার্যমথাপি বা।
ধ্রবমাবিশতি জ্ঞানং তস্মাদ্ বৈদ্য দ্বিজঃ স্মৃতঃ ॥

চরক সং চিকিৎসিত স্থানম্ ১ অঃ ৮২

জ্ঞানং পাঠ নহে, জ্ঞানাৎ হইবে। প্রবোধনী অর্থ করিতেছেন—বিদ্যা সমাপ্তির পর ভিষক্ অর্থাৎ বৈদ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের তৃতীয় জন্ম হয় তখনই তাঁহারা "বৈদ্য" উপাধি লাভ করেন, জন্মাবধি কাহারও সর্ব্ববিদ্যাবত্তাসূচক বৈদ্য নাম হইতে পারে না। বিদ্যা সমাপ্তি হইলে বৈদ্যের হৃদয়ে ব্রাহ্মসত্ব অথবা আর্ষ জ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে, এই জন্য বৈদ্যকে দ্বিজ বলা হয়।

এই শ্লোকে প্রবোধনীর কথিত বৈশ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কথা বলা হয় নাই। ভিষক্ শব্দের অর্থ বৈশ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কোথায় পাইলেন?

এখানে বলা হইতেছে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইলে চিকিৎসক তৃতীয় জন্ম প্রাপ্ত হন তখন তাহাদিগকে বৈদ্য বলে, জন্ম দ্বারা কেহ বৈদ্য হয় না। বিদ্যা (চিকিৎসা বিদ্যা) সমাপ্ত করিলে তাহাতে জ্ঞানের আবেশ হয় তজ্জন্য বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসকের ত্রিজ নাম হয়। (তৃতীয় বার জন্মিয়াছেন এইরূপ বলা হয়) এই শ্লোকে কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা ইহার পূর্ব্ব শ্লোক আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। ৮০ শ্লোকে বলিয়াছেন।

শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স উচ্যতে ॥৮০

শীলবান্ মতিমান সংযত দ্বিজাতি ও শাস্ত্র (চিকিৎসা শাস্ত্র) পারগ ব্যক্তি সকল প্রাণীর গুরুর ন্যায় পূজ্য, তাহাকে প্রাণাচার্য্য বলে।

এখানে দ্বিজাতি মাত্রেরই কথা। যে দ্বিজাতি চিকিৎসা শাস্ত্র পারদর্শী হয় সে সকলের সম্মানার্হ এবং পরের ৮১ শ্লোকে তাহাকেই ত্রিজ বলিয়াছেন। এখানে "বৈশ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের" কোন কথা নাই। তখনও চিকিৎসক বলিয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি হয় নাই।

সাধারণত ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা বিদ্যা লাভ করিতেন এবং দ্বিজাতিদিগেরও লাভ করিবার বাধা ছিল না। যে কোন দ্বিজ চিকিৎসা শাস্ত্র পারগ হইতেন তাহাকেই ত্রিজ অর্থাৎ তৃতীয়বারজাত বলা হইত। যেমন জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ, উপবীত সংস্কার দ্বারা দ্বিজ ও বেদ বিদ্যা দ্বারা বিপ্র সংজ্ঞা (১) প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ এখানে আয়ুর্ব্বেদে জ্ঞানলাভ করিলে তৃতীয় জন্মবলা হইত।

(১ জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্।

সুশ্রুত সংহিতায় সূত্র স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে আয়ুর্ব্বেদ পাঠের জন্য চিকিৎসক যে শিষ্যকে নির্ব্বাচন করিবেন সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হওয়া আবশ্যক এবং তাহার বংশ, বয়স, শীল, শৌর্য্য, শৌচ, বিনয়, শক্তি, বল, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, মতি ও প্রতিপত্তি প্রশস্ত হওয়া চাই। মোট কথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির উক্ত সকল গুণ সম্পন্ন ছেলে হওয়া চাই। তৎপর ঐ সকল বালককে আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রকরণ মতে উপনয়ন দীক্ষা দিবে, কাষ্ঠ দ্বারা হোম, প্রণব ও মহাব্যাহৃতি সহকারে ঘৃতাহুতি প্রদান করাইবে। দেবতা ও ঋষিদিগের উদ্দেশেও স্বাহা উচ্চারণ করিবে। আর শিষ্যকে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করাইবে। ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যের উপনয়ন (আয়ুর্ব্বেদোক্ত) করিতে পারিবেন। অনন্তর অগ্নিকে তিন বার প্রদক্ষিণ ও সাক্ষী করিয়া শিষ্যকে কহিবেন তুমি কাম ক্রোধ লোভ মোহ অভিমান অহঙ্কার ঈর্ষ্যা কর্কশ বাক্য, মিথ্যা বাক্য ও অযশস্কর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, নখ ও লোম যথা সময়ে কর্ত্তন করিবে। কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবে। সত্যব্রত হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ও অভিবাদন পরায়ণ হইবে। দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, প্রব্রজিত, শরণাগত সাধু, অনাথ ও আগন্তুক দিগকে আপনার জ্ঞাতি কুটুম্বের ন্যায় মনে করিয়া আপনার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে, তাহাতে মঙ্গল হইয়া থাকে। (১)

তাহা হইলে এই দাড়াইল যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালক দীক্ষিত হইয়া যথারিতি আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা লাভ করিলে দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজন্ম প্রাপ্ত হইতেন।

(১১) বৈশ্যগণকে ভাক্ত বৈদ্য বলিত তাহার নিদর্শন স্বরূপ প্রবোধনী রামায়ণ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ দিয়াছেন—

---

(১) দ্বিজ-গুরু-দরিদ্র প্রব্রজিতোপনত-সাধ্বনাথাভ্যুপগতানাং চাত্মবান্ধবানামিব স্বভৈষজৈঃ প্রতি কর্ত্তব্য মেবং সাধু ভবতি।

কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৃন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।

বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভি মন্যসে। রামা অযো ১০০ সর্গ।

শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিয়াছেন। তাত শব্দ ভরতের সম্বোধন। ঐ শব্দের সহিত বৈদ্য শব্দের কোন সংশ্রব নাই।

প্রাচীন টীকাকারগণ "বৈদ্যান্ ব্রাহ্মণান্" ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বৈদ্যাঃ বিদ্যাসু নিপুণাঃ তান্ ব্রাহ্মণান্ অভিমন্যসে বহু মন্যসে" তুমি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিয়াছ ত। অথবা বৈদ্যান্ পৃথক পদ ধরিলে চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণ দিগকে মান্য করিতেছ ত?

তখন ত্রিবর্ণই বৈদ্য (চিকিৎসক) হইতে পারিতেন কাজেই বৈদ্যান্ পদের দ্বারা আমরা বৈদ্য ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না। রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে চিকিৎসকের সংস্থান অতি আবশ্যক বলিয়া চিকিৎসকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এ কথা আসে না। তিনি ভৃত্য গুরু পিতৃ তুল্য বৃদ্ধ সকলের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

(১২) বৈদ্য প্রবোধনী বলিয়াছেন মনুর ১২ অধ্যায়ের ১০০ শ্লোকে "বেদজ্ঞ অর্থাৎ বৈদ্যগণই সৈনাপত্য, রাজ্যপালন, দণ্ডনেতৃত্ব ও সর্ব্ব লোকের আধিপত্য করিবার যোগ্য।" তিনি এখানে বেদজ্ঞ অর্থে বৈদ্য-গণ কোথায় পাইলেন। তাহার মতে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ এ সকল কাজ করিবার যোগ্য নহে! এ সকল অধিকার ক্ষত্রিয়ের বলিয়াই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে, যাহারা বেদজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী তাহারাই এই সকল কার্য্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। মনু বলিয়াছেন (১) "বেদ শাস্ত্রবিৎ" তাহা হইলেই কি প্রবোধনীর শ্রেষ্ঠ বৈদ্য ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে?

(১) সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্ব মেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি।
তাৎপর্য্যার্থ, মূর্খ লোককে এই সকল পদ দিবে না।

(১৩) প্রবোধনীর মতে বৈদ্যের গুরুবৃত্তি ব্রাহ্মণত্বের একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে গুরু গিরির একটা বাধাবাধি নিয়ম নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতি অনেক স্থানে গুরুগিরি করিয়া থাকেন, তা বলিয়া যিনি গুরুগিরি করিবেন তিনিই যে ব্রাহ্মণ একথা খাটে না। সত্য বটে ব্রাহ্মণ গণকেই শাস্ত্র গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"বর্ণাণাং ব্রাহ্মণো গুরু" কিন্তু কলিতে ইহার ব্যাভিচার বিশেষত বৈষ্ণব দিগের মধ্যে যথেষ্ট আছে। আসাম প্রদেশে বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক কায়স্থ ও শূদ্র গুরু আছে। দিহিং, কমলাবাড়ী, বড় দোয়া প্রভৃতি সত্রের সত্রাধিকারগণ কায়স্থ। তাঁহাদের হাজার হাজার শিষ্য আছে। কয়েক পুরুষ পরে এই অজুহাতে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতে পারেন। এই সকল গুরু বৃত্তি ধারী বৈদ্যগণ যদি সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে তাহারা পুরুষানুক্রমে কিজন্ম ১৫ দিন অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন ও নামান্তে গোস্বামী লিখিয়াও শর্ম্মা লিখিতে বিরত আছেন? তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ নহেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

(১) প্রবোধনীর মতে বৈদ্যগণের অধ্যাপনার অধিকার আছে অতএব তাহারা ব্রাহ্মণ। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ভগবান্ মনুর নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
> প্রব্রুয়াদ ব্রাহ্মণ স্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥ ১০। ১ মনু

এখানে ভগবান্ মনু বেদ পাঠের কথা বলিতেছেন। ত্রিবর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বেদ পাঠ করিতে পারিবে কিন্তু বেদের অধ্যাপনা কেবল ব্রাহ্মণই করিবে অন্যে কেহ করিতে পারিবে না। ইহার পরের তিন শ্লোকে

বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা শাস্ত্র সম্মত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়ত থাকিয়া সর্ব্ব বর্ণকে জীবনোপায় বিষয়ে উপদেশ দিবেন। ব্রাহ্মণের বেদে উৎকর্ষ প্রযুক্ত ও ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। উপনয়ন সংস্কার আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দ্বিজাতি।

প্রবোধনীর মতে আয়ুর্ব্বেদ পুণ্যতম বেদ কাজেই বৈদ্যগণ যখন আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা করান, তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণ। মনু এখানে বেদেরই কথা বলিয়াছেন আয়ুর্ব্বেদের কথা বলেন নাই। আয়ুর্ব্বেদ চতুর্ব্বেদের অন্তর্গত নহে।

বিষ্ণু পুরাণে যে, অষ্টাদশ বিদ্যার তালিকা দিয়াছেন তাহা এই :—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্ম শাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গন্ধর্ব্ব শ্চেতিতে ত্রয়ঃ।
অর্থ শাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু॥ বিষ্ণু পুঃ

অঙ্গানি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, চতুর্ব্বেদ—সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব ; মীমাংসা, ন্যায় দর্শন, ধর্ম্ম শাস্ত্র (মন্বাদি স্মৃতি) ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা। তার পর বলিয়াছেন "আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ব বেদ ও অর্থ শাস্ত্র, এই চারিটী সহ অষ্টাদশ বিদ্যা।" বেদ কথাটা থাকিলেই যদি চতুর্ব্বেদ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ধনুর্ব্বেদ যাহা দ্বারা যুদ্ধ বিদ্যা, গন্ধর্ব্ব বেদ যাহা দ্বারা গান বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও চতুর্ব্বেদের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। কথা হইতেছে মনুর বচন নিয়া ; মনু যে বেদ বুঝাইতেছেন তাহাই ধরিতে হইবে। মনু বলিতেছেন চারি বেদের অধ্যাপনা ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ করিতে পারিবে না আমরা বলিব আমরা আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা করাইয়া থাকি অতএব আমরা ব্রাহ্মণ। এরূপ যুক্তি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

আয়ুর্ব্বেদ যে প্রকৃত বেদ তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া চরকের সূত্র স্থানের ১ অঃ ১৭ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ "তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ।" উদ্ধৃত করিয়া অর্থ করিয়াছেন যে, বেদজ্ঞের মতে আয়ুর্ব্বেদই পুণ্যতম বেদ।

তস্য আয়ুষঃ বেদঃ পুণ্যতমঃ অর্থাৎ সেই আয়ুর বেদ (জ্ঞান) অতি পবিত্র। আয়ুর্ব্বেদই পুণ্যতম বেদ এ অর্থ কোথা হইতে আসিল।

সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে, অনেন বা আয়ুর্বিন্দতীতি আয়ুর্ব্বেদ। যাহার দ্বারা আয়ুর জ্ঞান জন্মে তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। চরক ১৬ শ্লোকে বলিলেন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু কহে ও পরের শ্লোকে বলিলেন বেদবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে আয়ুর জ্ঞান (বেদ) অতি পবিত্র সামগ্রী।

এখানে যে "বেদবিদাং মতঃ।" সেই বেদই (ঋক যজু সাম অথর্ব্ব) মনু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিকে অধ্যাপনা করাইতে নিষেধ করিয়াছেন। সুশ্রুত ত্রিবর্ণকেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক বলিয়াছেন; কাজেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনার দ্বারা মনুর উল্লিখিত শ্লোক কথিত ব্রাহ্মণের বেদ অধ্যাপনার অধিকার লাভ হয় না, এবং আমরা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করাই অতএব আমরা ব্রাহ্মণ, একথা খাটে না।

(১৫) বৈদ্য প্রবোধনীর আর একটী যুক্তি,—বৈদ্যগণের চিরদিনই ব্রাহ্মণোচিত ও ব্রাহ্মণ জাতীয় উপাধি দেখা যায়। এই প্রবন্ধে পাড়ে, দোবে, ওঝা, মিশ্র ও ভট্টাচার্য্য এবং মহামহোপাধ্যায়, সার্ব্বভৌম, শিরোমণি, চূড়ামণি, বাচস্পতি প্রভৃতি যে কয়টী উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার একটীও ব্রাহ্মণের জাতীয় উপাধি নহে। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের

শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস জাতীয় উপাধি। (১) বৈদ্যগণ বরাবরই গুপ্ত (বা তত্তুল্য কোন ভূতি বাচক উপপদ) উপাধি লিখিয়া আসিতেছেন। কেহ কখনও শর্ম্মা লেখেন নাই। বৈদ্যের শর্ম্মা উপাধি হালের আমদানি। জাতিতত্ত্ব বারিধি ও বল্লালমোহ-মুদগর প্রণেতা ৺উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৩১২ সন পর্য্যন্ত গুপ্ত ছিলেন। ১৩১৮ সনে জাতিতত্ত্ব বারিধির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় হইতে শর্ম্মা লিখিতে আরম্ভ করেন; পরে ১৩২০ সনে তাঁহার প্রকাশিত মন্দার মালা পত্রিকায় শর্ম্মপদের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধক চূড়ামণি রামপ্রসাদ সেন তাহার ভণিতায় দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়া ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দেন নাই। বৈদ্য যে দ্বিজাতি তাহা শাস্ত্র ও ব্যবহারানুমোদিত। মনুর মতে ৬ জন ও হারীতের মতে ৫ জন দ্বিজাতি, ইহা পরে আলোচিত হইবে। রামপ্রসাদ কখনও নিজেকে শর্ম্মা বলিয়া পরিচয় দেন নাই এবং ১০ দিন অশৌচও গ্রহণ করেন নাই।

মহামহোপাধ্যায়, সার্ব্বভৌম, শিরোমণি ইত্যাদি পাণ্ডিত্যসূচক উপাধি বৈদ্যগণ সময় সময় ধারণ করিলেও তদ্বারা তাহারা যে ব্রাহ্মণ তাহা প্রমাণ হয় না। বৈদ্যগণ দ্বিজাতি এবং শাস্ত্রে অধিকারী ছিলেন, কাজেই পণ্ডিত বৈদ্যের পক্ষে ঐ সকল উপাধি ধারণ করা কিছুই বিচিত্র

---

(১) শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতং।
গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ। বিষ্ণু পুরাণ
শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতং। মনু
৩।৩২

ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মাদি কোন রক্ষা বাচক, বৈশ্যের ভূতি প্রভৃতি পুষ্টি বাচক এবং শূদ্রের দাসাদি কোন প্রৈষ্য বাচক উপপদ রাখিবে।

নহে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য দ্বারিকা নাথ সেন ও বিজয়রত্ন সেন গবর্ণমেণ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন কিন্তু তাহারা কখনও শর্ম্মা লিখিয়া ব্রাহ্মণত্বের ভাণ করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট এখন মহামহোপাধ্যায় উপাধির জন্য একটী বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বৃত্তি ব্রাহ্মণগণেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত; উহার প্রতি আমাদের লোভ সংবরণ করাই শ্রেয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজের ও শাস্ত্রের রক্ষক; হিন্দু রাজগণ তাঁহাদের রক্ষার বিধান করিতেন। সমাজও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় বিদায় ও বৃত্তি আদির দ্বারা এতকাল ব্রাহ্মণ জাতির রক্ষার বিধান করিতেছিলেন। বৈদ্য পণ্ডিতগণ কখনও ঐরূপ বিদায় কি বৃত্তি পান নাই। তখন তাঁহাদের মহামহোপাধ্যায়ের বৃত্তি নিয়া ব্রাহ্মণগণসহ কলহ সৃষ্টি করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

পাঁড়ে, দোবে, ওঝা, প্রভৃতি উপাধি গুলিও জাতি বাচক উপাধি নহে। এগুলি আধুনিক বিশ্ব বিদ্যালয়ে উপাধির স্বরূপ ছিল, ক্রমে বংশগত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রায়শঃ ব্রাহ্মণ বংশেই আবদ্ধ ছিল। কোন বৈদ্য কুলজি গ্রন্থে পাঁড়ে, দোবে ইত্যাদি উপাধি দেখা যায় না। ভরত মল্লিক চন্দ্র প্রভায় বৈদ্যের নিম্ন লিখিত উপাধি লিখিয়াছেন যথা :—

সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করস্তথা।
রাজসোমৌ নন্দিচন্দ্রৌ ধরকুণ্ডৌ চ রক্ষিতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশ।

অর্থাৎ সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, সোম, নন্দী, চন্দ, কুণ্ড ও রক্ষিত এই তের ঘর বৈদ্য রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে বিদ্যমান।

কবি কণ্ঠহারবিরচিত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা যাহা ১২৯২ সনে রাজকুমার সেনগুপ্ত ও চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহাতেও

পাঁড়ে, দোবে প্রভৃতি উপাধি নাই। (১) বৈদ্যপ্রবোধনীর কথিত পাঁড়ে, দোবে, ওঝা, মিশ্র ও ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাচীন কুলজি গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত হয় না। ঐগুলি কাল্পনিক ও আধুনিক বলিয়াই অনুমিত হয়। ঐরূপ ২।৪টী উপাধি কুত্রাপি দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হয় না।

(১৬) বৈদ্যপ্রবোধনী জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তীর চৈতন্য মঙ্গল হইতে আর একটী প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন—

বৈদ্য ব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বসে।
নানা মহোৎসব করে মনের হরিষে॥

---

(১) শক্তি কাশ্যপমৌদ্গল্যধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাঃ।
বৈদ্যাঃ কুলীনাঃ সিদ্ধাঃ স্যুঃ তদন্যে সাধ্য সংজ্ঞিতা।
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ সিদ্ধানাং পদ্ধতিঃ স্মৃতা।
শক্তিধন্বন্তরী সেনৌ মৌদগল্যো দাসপদ্ধতিঃ।
কাশ্যপস্তু ভবেদ্ গুপ্ত ইতি সিদ্ধনিরূপণঃ॥
বৈশ্বানরো ভরদ্বাজঃ কৃষ্ণাত্রেয়োঽঙ্গিরা তথা।
শালঙ্কায়নশাণ্ডিল্যৌ কৌশিকোঽথ বশিষ্ঠকঃ।
বাৎস্যো গৌতম সাবর্ণা বাল মালক এব চ।
আলম্বায়ন ইত্যপি পাঠঃ।
আত্রেয়শ্চ তথাত্মশ্চ তথা বিষ্ণুমহর্ষিকঃ।
মার্কণ্ডেয়ো ধ্রুবশ্চৈব সাধ্যানাং গোত্রসংগ্রহঃ॥
সোমোরাজশ্চন্দ্রনন্দিধরাঃ কুণ্ডশ্চ রক্ষিতঃ।
দত্তদেবকরাঃ সাধ্যে দশ পদ্ধতয়ঃ স্মৃতাঃ।
সাধ্যে কুত্রাপি দৃশ্যন্তে সিদ্ধানাং গোত্রপদ্ধতিঃ।
মহৎ পরিগৃহীতত্বাদ্ গ্রাগাদিত্যাবপি কচিৎ।
তত্রোত্তমৌ দত্তদেবৌ মধ্যমাশ্চ ধরাদয়ঃ।
অধমাঃ কুণ্ড চন্দ্রাদ্যাঃ কষ্টসাধ্যাস্তত্তে মতাঃ॥

ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "এখানে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ এইরূপ অর্থ করিলেও পূর্ব্বে বৈদ্যের উল্লেখ থাকায় বৈদ্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। অদ্যাপি বহু স্থানেই বহু বৈদ্য "বৈদ্য ব্রাহ্মণ" বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকেন এবং অন্যান্য জাতিরা অনেক স্থলেই বৈদ্যগণকে "বদ্যি বামুন" বলেন। এই সকল লোকপ্রসিদ্ধি অমূলক হইতে পারে না"। অবশ্য এ লোকপ্রসিদ্ধি অমূলক হইতে পারে না, কিন্তু বৈদ্যগণ যে আবহমান কাল অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন সে লোকপ্রসিদ্ধি ও উড়ান যায় না।

শব্দের বিন্যাসের দ্বারা বৈদ্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ব্রাহ্মণের উপর দাঁড় করাইতেছেন। "কায়েত বামুন" ধোপা নাপিত প্রভৃতি প্রচলিত কথা দ্বারা কি পূর্ব্ব শব্দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে? তাহা হইলে কায়েতকে ব্রাহ্মণ ও ধোপাকে নাপিত হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে? "শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে" এই সূত্র দ্বারা শব্দ বিন্যাসানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে? (১) শ্বন্ (কুকুর) (২) যুবন্ (যুবা) (৩) মঘবন্ (ইন্দ্র)। কুকুর ইন্দ্র অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম মঙ্গলের "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য" স্থলে প্রবোধনী কি মন্তব্য করিতে চাহেন?

বৈদ্যগণ দ্বিজাতি ও এতকাল আচার নিষ্ঠ ছিল। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন এতকাল আর কোন দ্বিজাতি ছিল না। কাজেই ইতর জাতি কোন স্থানে যদি "বদ্দি বামুন" বলিয়া থাকে তাহা কি ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ? বৈদ্যগণ এতকাল অম্বষ্ঠ বলিয়াই পরিচয় দিতেন এখন যদি বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহ পরিচয় দিয়া থাকেন তাহাও প্রমাণ নহে। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ হইলে সকল স্থানে সকল দেশেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন।

(১৭) বৈদ্য প্রবোধনী মতে বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন, যেহেতু

তাঁহারা কার্পাস নির্ম্মিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন এবং ভবতি ভিক্ষাং দেহি বলিয়া থাকেন।

ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণের কার্পাস সূত্রের, ক্ষত্রিয়ের শণ সূত্রের ও বৈশ্যের মেষ লোমের উপবীতের ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু সকল দেশে সকল দ্বিজাতিগণ কার্পাসোপবীত ধারণ করেন। পশ্চিম দেশের ক্ষত্রিয়গণ এবং মাড়োয়ার দেশের আগরওয়ালা বৈশ্যগণ কার্পাসের যজ্ঞ সূত্র ধারণ করেন; তাহারা কি সকলেই ব্রাহ্মণ? মেখলা সম্বন্ধেও ঐ কথা। কালক্রমে পার্থক্য উঠিয়া গিয়াছে (১)। কলিকাতায় উড়িষ্যা দেশবাসী মুটিয়া মজুরের গলায় কার্পাস নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত দেখা যায়, ইহারা সকলেই কি ব্রাহ্মণ? ভবতি শব্দের অগ্রপশ্চাৎ প্রয়োগ কিছু একটা প্রমাণ নহে। ব্রাহ্মণগণই বৈদ্য জাতির যজ্ঞোপবীত দিয়া থাকেন; তাঁহারা অতটা তলাইয়া দেখেন না এবং এরূপ পার্থক্য যে আছে তাহা অনেকেরই জানা নাই। তাঁহারা নিজে যে ভাবে ভিক্ষা করিতেন তদ্রূপই বলিতে শিক্ষা দেন। আর সর্ব্বত্রই যে এইরূপ প্রয়োগ হয় তাহার প্রমাণ কোথায়? আজকাল ব্রহ্মচর্য্যই নাই তার আবার ভিক্ষা কি? বৈদ্য প্রবোধনী বলেন "উপনয়ন রাঢ় দেশে চিরকালই অপ্রচলিত।" একথা কেহ অস্বীকার করে না। বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ নহে তাহার প্রমাণ, যে দেশে উপ-

---

(১) শাস্ত্রে পৃথক পৃথক জাতির বিভিন্ন বস্ত্র ও উত্তরীয়ের বিধান করিয়া পরে সকলের পক্ষেই কার্পাস বস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা

সর্ব্বেষাঞ্চ কার্পাসমবিকৃতং। কাষায়মপ্যেকে।

বার্ক্ষং ব্রাহ্মণস্য মাঞ্জিষ্ঠহারিদ্রে ইতরয়োঃ। গৌতম ১ম অঃ

দণ্ড সম্বন্ধে মহর্ষি গৌতম পৃথক পৃথক কাষ্ঠের ব্যবস্থা দিয়া পরে বলিয়াছেন সকল জাতিই কোনরূপ যজ্ঞীয় বৃক্ষের সবল্কল কাষ্ঠ দণ্ড ধারণ করিতে পারে। গৌতম ১ম অধ্যায়।

নয়ন অখণ্ডিত সে দেশ হইতেই পাওয়া যায়। বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহারও দশ দিন অশৌচ, এত বড় একটা মোটা কথায় কাহারও ভুল হইত না।

(১৮) বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার আর একটী ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া ২টী বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

(১) দৃষ্ট্বা জ্যোতির্বিদান্ বৈদ্যান্ দদ্যাৎগাং কাঞ্চনং মহীম্।

(২) রিক্তপাণির্ন পশ্যেত্তু রাজানং ভিষজং গুরুং॥

জ্যোতিষিক, রাজা ও চিকিৎসককে রিক্ত হস্তে দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শেষোক্ত বচনের পাঠ শব্দ কল্প দ্রুমে "রিক্ত পাণি" হইলে "রিক্ত হস্ত" আছে।

ইহার দ্বারা বৈদ্যকে কিছু দর্শনী দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র। শব্দ কল্প দ্রুমে ঐ বচনের পূর্ব্বে আছে "দূতো রোগী চ রিক্তহস্তো বৈদ্যং ন পশ্যেৎ।" যে দূত চিকিৎসককে আনিবার জন্য প্রেরিত হইবে সে ও রোগী চিকিৎসককে কিছু দিবে। ডাক্তার কবিরাজের পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা এখনও আছে এবং চিরকালই থাকিবে। কোন চিকিৎসককে রক্ষা করিবার জন্য যদি কেহ কখনও বৃত্তি স্বরূপ ভূমি দান করিয়া থাকেন তাহা কি এই মনু কথিত নিষেধ বাক্য মধ্যে আসে। রাজগণ ভূমিদান করিয়া নানা জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিতেন, ইহার বহুল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে। আসাম দেশে হিন্দু রাজগণ ব্রাহ্মণেতর জাতিকে সদ্‌গুণের পুরস্কার স্বরূপ অনেক ভূমি দান করিয়া ছিলেন। ঐ সকল দান গ্রহীতার উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি ভোগ করিতেছে।

প্রবোধনী চন্দ্রদেবের যে তাম্র শাসন লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা দান গ্রহীতা যে বৈদ্য কি ব্রাহ্মণ ছিলেন,তাহা স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না। "গুপ্ত শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বৈদ্য ধর্ম্মী বলিয়াই অনুমিত হয়। পূর্ব্বের স্থির

পুরুষে গুপ্তের পরে কোন শর্ম্মা শব্দ নাই। পীত বাসের গুপ্ত উপাধির পরে শর্ম্মা সংযোগ কি জন্য হইয়াছিল তাহা স্থির করা সুকঠিন। বৈদ্য প্রবোধনীর মন্তব্য "এখানে গুপ্ত শর্ম্মা উপাধি দ্বারাই প্রতিগ্রহীতার বৈদ্যত্ব সূচিত হইতেছে কারণ রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ দিগের গুপ্ত উপাধি নাই।"

প্রবোধনীর মতে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; কাজেই এ কথার সঙ্গতি কোথায়? (১) আর এই তাম্র শাসন যে জাল নহে এবং পাঠ যে শুদ্ধ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহারই বা প্রমাণ কি? একই শাসন লিপি নানা জনে নানা রূপে পাঠ করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

ভগবান্ মনু ১০ অধ্যায়ের ৭৫—৭৮ শ্লোকে নিম্ন লিখিত মত ব্যবস্থা দিয়াছেন যথা :—

সাঙ্গ বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের এই ষড়্‌বিধ কর্ম্ম। ষট্ কর্ম্ম মধ্যে অধ্যাপন, যাজন এবং সৎপ্রতিগ্রহ এই তিনটী ব্রাহ্মণের উপজীবিকা। যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। দান, অধ্যয়ন এবং যাগ এই তিনটী উহাদের কর্ত্তব্য এবং ক্ষত্রিয়বৎ ঐ কার্য্য বৈশ্যের পক্ষেও নিষিদ্ধ। প্রজা-গণের রক্ষা বিধানার্থ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি; পশু পালন কৃষি বাণিজ্য বৈশ্যের জীবিকা। দান যাগ ও অধ্যয়ন উভয়ের ধর্ম্ম কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাস, ক্ষত্রিয়ের প্রজা পালন, ও বৈশ্যের বণিজ্য ও পশু পালন। মনু ব্রাহ্মণেতর জাতিকে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দান গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন মাত্র। চিকিৎসকের অর্থ গ্রহণ, দান নহে এবং ইহাকে প্রতিগ্রহ বলা যাইতে পারে না।

---

(১) চন্দ্র দেবের উদ্ধৃত তাম্রশাসন—মকর গুপ্ত প্রপৌত্রায় বরাহ গুপ্ত পৌত্রায় সুবর্ণ গুপ্ত পুত্রায় শান্তি বারিক শ্রীপীতবাস গুপ্ত শর্ম্মণে বিধিবদুদক পূর্ব্বকং তাম্র শাসনীকৃত্য প্রদত্তা ইত্যাদি।

(১৮) প্রবোধনীর মতে "রাঢ়ীয় সমাজের বহু বৈদ্য চিরদিনই শালগ্রাম শিলা পূজা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হইতেছে। দুর্গা পূজা ও কালীপূজা এবং চণ্ডীপাঠ অনেক বৈদ্য স্বয়ং করিয়া থাকেন।"

দ্বিজাতি মাত্রেই শালগ্রাম পূজনের অধিকারী, ইহা ব্রাহ্মণত্বের নিদর্শন নহে। (১) পশ্চিম দেশে ক্ষত্রিয়গণ শালগ্রাম পূজা করিয়া থাকেন। বৈদ্যগণের পৌরহিত্য কার্য্য করার কোন নিদর্শন নাই। নিজের বাড়ীর দুর্গা পূজা কি কালী পূজা করিবার কোনও বাধা নাই। চণ্ডী পাঠ সকল দীক্ষিত ব্যক্তিই করিতে পারেন। পুরাণ পাঠে সকল জাতির সমান অধিকার শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্ত্র শাস্ত্রের বিধান মত আগমোক্ত পূজা গুরুর অভাবে যজমান নিজেই করিবে। (২)

প্রবোধিনী বলেন "মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ কৌশিক প্রভৃতি বৈদ্যগণের গোত্র প্রবর্ত্তক মহর্ষিগণও যে বৈদ্য ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (চরক সূত্র ২১—২১ অঃ দ্রষ্টব্য)।" ইহার অর্থ কি ? প্রবোধিনীর মতে বৈদ্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ; সেরূপ স্থানে কেবল এই কয়জন ঋষি কেন, সমস্ত ঋষিগণই বৈদ্য ! আর বৈদ্য অম্বষ্ঠবর্ণ হইলে

---

(১) বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
অধিকারো ন শূদ্রাণাং হরেরর্চ্চাচনে ক্বচিৎ।

এ প্রমাণ বৈদ্য প্রবোধনী নিজেই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ব্রঃ বৈঃ পুঃ

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ত্রয়াণাং দ্বিজন্মিনঃ।
অধিকারঃ স্মৃতঃ সম্যক্ শালগ্রামশিলার্চ্চনে। পদ্ম পুঃ

(২) আগমোক্ত পূজনেতু অধিকারী গুরুঃ স্বয়ং।
গুরোরভাবে দেবর্ষি স্বয়ং পূজাদিকং চরেৎ।

ইহারা কেহই যে অম্বষ্ঠ ছিলেন না ইহা নিশ্চিত। গোত্র বিষয়ে নানা প্রকার বিতর্ক আছে। রঘু নন্দন বলেন—

"প্রত্যেক বংশের আদি পুরুষ ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও বর্ণেরই গোত্র সম্ভবে না। অথচ বিবাহাদি ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্ব জাতিরই গোত্রোল্লেখ শাস্ত্রে আদিষ্ট হওয়ায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্বস্ব গোত্রের অভাব হেতু পূর্ব্ব পুরুষীয় পুরোহিতদিগের গোত্রই তাহাদের গোত্র বুঝিতে হইবে।" এইমত ঠিক হইলেও অম্বষ্ঠ বৈদ্যের প্রতি বর্ত্তিতে পারে না। অম্বষ্ঠগণ যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যা কন্যাজাত তখন যে ব্রাহ্মণ আদি পুরুষ হইতে জন্ম হইয়াছে তাঁহার নাম অনুসারে বৈদ্যের গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জন্যই বৈদ্য কুল চন্দ্রিকা বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ স্বীকার করিয়া গোত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

যস্য যস্য মুনের্যো যঃ সন্তানঃ স স বিশ্রুতঃ।
তত্তদ্‌গোত্রাদিনা বৈদ্যঃ শ্রেষ্ঠাস্তু স্বকর্ম্মণা॥

যে যে মুনির সন্তান তাহার গোত্রও তাহার নামানুসারে হইয়া থাকে এবং নিজের কর্ম্মানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকে। একই গোত্রের বৈদ্য কেহ বা কর্ম্ম দোষে নীচ ও কেহবা সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন। বৈদ্যদিগের মধ্যে সিদ্ধ সাধ্য ও কষ্ট কুল আছে।

সিদ্ধং সাধ্যং তথা কষ্টং ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে।
কবি কণ্ঠহার কুলপঞ্জিকা।

এখন কথা হইতেছে যে, বৈদ্যগণ যদি সত্যই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে বঙ্গদেশে তাঁহারা কিরূপে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব হারাইলেন। কিরূপে উপবীত ধারী বৈদ্যগণ দশাহের পরিবর্ত্তে পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন করিতে লাগিলেন,

নামান্তে শর্ম্মা লেখার পদ্ধতিই বা কেন পরিত্যক্ত হইল এবং কেনই বা শর্ম্মার পরিবর্ত্তে সেন, দাস, দত্ত, ধর, কর লিখিয়া অন্তে শাস্ত্রীয় বৈদ্যোপাধি গুপ্ত লিখিতে লাগিলেন? এই সকল কথার সৎ উত্তর কি? যাঁহারা শর্ম্মা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই একটা জবাব ঠিক করিয়াছেন। এখন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বৈদ্য প্রবোধনী মতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজা গণেশ বৈদ্য দিগকে অম্বষ্ঠ জাতি রূপে পরিচিত এবং বৈশ্যাচারী করিবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া ছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে সেই আজ্ঞা পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্র শেখর স্মৃতিকণ্ঠ এবং গোপাল কবিরাজ মহাশয় কোলব্রুক সাহেবের হিষ্টরি অব দি রিচুয়ালস অব বেঙ্গল নামক হস্ত লিখিত পুস্তক দেখিয়া রাজা গণেশের সেই আজ্ঞা পত্রখানি অবিকল লিখিয়া আনিয়া ছিলেন। তাহা এই :—

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বৈদ্যাস্তপোজ্ঞানযুক্তা বিদ্বাংসশ্চ আসন্। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনা আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্। অতঃ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজগনেশচন্দ্রনৃপতেরনুজ্ঞয়া বিপ্রাণামনুরোধাৎ অদ্য প্রভৃতি অম্বষ্ঠা বৈশ্যাচারিণো ভবিষ্যন্তি মূলব্রাহ্মণাঃ অম্বষ্ঠৈঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেয়ুঃ। যে চ ব্রাহ্মণা অমীভিঃ সহ ভোজনাদি করিষ্যন্তি তে পতিতা ভবিষ্যন্তি ॥ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বৈদ্যগণ তপোজ্ঞানশালী ও বিদ্বান্ ছিলেন, এখন তাঁহারা শক্তিহীন ও আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই জন্য ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধ অনুসারে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ গনেশচন্দ্র নৃপতি আজ্ঞা করিতেছেন যে, অদ্য হইতে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বৈশ্যাচারী হইবেন এবং অপর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন না। যদি অপর কোন ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহিত ভোজনাদি করেন তিনি ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে পতিত হইবেন। (বৈদ্য প্রবোধনী)

মূলে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ শব্দ নাই কেবল অম্বষ্ঠ বলিয়াই আছে। অপর কোন ব্রাহ্মণ স্থলে মূল ব্রাহ্মণ আছে।

অনুবাদ এইরূপ দাঁড়াইবে—সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে বৈদ্যগণ তপোজ্ঞান যুক্ত ও বিদ্বান্ ছিলেন। সম্প্রতি তাহারা শক্তিহীন ও আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই জন্য ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে মহারাজাধিরাজ গণেশ চন্দ্র নৃপতি আজ্ঞা করিতেছেন যে অদ্য হইতে অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যাচারী হইবেন। মূল ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন না। যে সকল ব্রাহ্মণ উহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন তাহারা পতিত হইবেন।

যাহাতক এই আজ্ঞা প্রচারিত তাহাতক বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণাচার ছাড়িয়া বৈশ্যাচার গ্রহণ করিলেন এবং রাতারাতি সকলে পনর দিন অশৌচগ্রহণ ও শর্ম্মা উপাধি পরিত্যাগ করিয়া বৈশ্য হইয়া গেলেন। "এক জন না রহিল বংশে দিতে বাতি।"

এটা অতি রহস্য পূর্ণ কথা বটে ; আর এতকাল কুলজী গ্রন্থকারগণ মধ্যে কেহ কিছুই জানিলেন না। বৈদ্যদিগের মধ্যে কোন কালেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব ছিল না ; কিন্তু সকলেই রাজার মোহাজ্ঞায় পড়িয়া বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন। এই নৃপাজ্ঞার কোনরূপ জনশ্রুতি কি প্রবাদ রহিল না ; হঠাৎ একদিন এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে এই অমূল্যরত্ন আবিষ্কৃত হইল। বৈদ্যগণ বৈশ্য হইলেন বটে এবং শর্ম্মা উপাধিও ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু যাঁহাদের গোস্বামী উপাধি ছিল তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিলেন না এবং শিষ্যকে দীক্ষা দিতে বিরত হইলেন না। বঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের বিবাদের একটা স্মৃতি আজিও রহিয়াছে এবং কুলজী গ্রন্থে ও মহারাজা রাজবল্লভ যে ব্যবস্থা নিয়াছিলেন তাহাতেও লিপিবদ্ধ আছে। রাজা গণেশ বল্লালের অনেক পরের লোক অথচ বল্লালের স্মৃতি রহিয়া গেল কিন্তু গণেশ রাজার কথা ছাপ মুছিয়া গেল। এটা কি

একটা প্রহেলিকা নহে? লক্ষ্মণ ও বল্লালের বিবাদের স্মৃতি কত স্থানে আছে। লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ভট্ট কবি মহাত্মা গোবিন্দ ভট্ট লক্ষ্মণ সেনের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "অনাচারী বৈদ্যকা উপবীত তোড় দিয়া, সাধু সমাজকো সম্মান বাড়ায়া হ্যায়।"

যে সকল বৈদ্য বল্লাল সেনের গৃহে অন্ন ভোজন করিয়া ছিলেন এবং ধন লোভে কি রাজ ভয়ে বল্লাল সেনের সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন লক্ষ্মণ সেন সেই অনাচারী বৈদ্যগণের উপবীত ছিন্ন করিয়াছিলেন। আর যাঁহারা অন্য দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা "পূর্ব্ববৎ ব্যবহার সে দেশে করিলা"। যে সকল বৈদ্য রাঢ় দেশে চলিয়া যায়, তাহাদের পূর্ব্বের আচার অক্ষুণ্ণ রহিল।

পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মুলো পঞ্চানন লিখিয়াছিলেন

বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতি হীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথা ত দেখি না॥
তাই বল্লাল তাকে কুপুত্র বলি কহে।

এই সময় বল্লালের অবৈধ আচরণে কতকগুলি বৈদ্যের পৈতা যায় এবং কতক বৈদ্য ভিন্নদেশে পলাইয়া যায়।

রামজীবন এই কাহিনী এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—

লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥
লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজ ভাব যথা পূর্ব্বরীত॥

যাহারা বল্লালসহ সংসৃষ্ট হইয়াছিলেন সেই সকল অনাচারীর "উপবীত

জোড় দিয়া” আর যাহারা পৈতা ত্যাগ করিয়া সদাচার রক্ষা করিয়াছিলেন তাহারা পুনরায় পৈতা গ্রহণ করিয়া “পুনরায় দ্বিজ ভাব যথা পূর্ব্বরীত” প্রাপ্ত হইলেন, পূর্ব্বরীত ত্যাগ করিলেন না। যাহারা রাঢ় প্রভৃতি দেশে পলাইয়া গিয়া অনাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাহারা “পূর্ব্ববং ব্যবহার সে দেশে করিলা।” এই রামজীবন মহারাজা রাজবল্লভের সম-সাময়িক ছিলেন। তিনি কুল পঞ্জিকাতে লিখিয়াছিলেন—

বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম ॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসেন শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনঃ করে দ্বিজ ভাব যথা পূর্ব্বরীত ॥

এসময়ও কেহ বৈদ্যের পূর্ব্বরীত পরিত্যাগ করিলেন না। যাহারা উপবীত গ্রহণ করিলেন তাহারা পূর্ব্বের মত দ্বিজ ভাব প্রাপ্ত হইলেন। অথচ কেহ রাজা গণেশের অত্যাচারের বিষয় কিছুই জানিলেন না। সকলেই বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়া পনর দিন অশৌচ পালন করিতে লাগিলেন। এত বড় রাজা যে বল্লাল সেন, তাঁহার শাসনেও সকল বৈদ্য পূর্ব্বচার ত্যাগ করেন নাই; আর রাজা গণেশ বলিলেন, আজ অবধি তোমাদের ১৫ দিন অশৌচ হইল, অমনি রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ সমস্ত দেশের বৈদ্য সমাজ এক যোট হইয়া বৈশ্যাচার গ্রহণ করিলেন! রাজা গণেশ ত বাড়ী বাড়ী পাহারা দেন নাই, তাহারা নিজ ঘরে ১০ দিন অশৌচ পালন করিয়া গোপনে পিতৃ পুরুষের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করায় কি বাধা ছিল? ঐ সময় বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে ধর্ম্মভাব লুপ্ত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মভীরু ছিলেন।

তাহারা জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতার শ্রাদ্ধ পতিত করিয়া পতিত হইয়াছিলেন, ইহা কল্পনার অতীত।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পরও কি বৈদ্যগণ নিজ নিজ অশৌচ ও আচার গ্রহণ করিতে পারিলেন না? রাজা গণেশ মাত্র সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪১৪-১৫ খৃঃ পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং তাহার পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জলালউদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ নামে সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। কাজেই সে সময় বৈদ্যগণের পূর্ব্বাচার গ্রহণের কোন বাধা ছিল, একথা বলিতে পারা যায় না।

কথিত রাজাজ্ঞার অস্তিত্ব ও যথার্থতা সম্বন্ধে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব। রাজা গণেশের জাতি পাত করার প্রসঙ্গ অলীক ও অপ্রামাণ্য। উদ্ধৃত আজ্ঞা পত্রে দেখা যায়, সে সময় দুই শ্রেণী ছিল—এক শ্রেণী অম্বষ্ঠ ও অপর শ্রেণী মূল ব্রাহ্মণ। অম্বষ্ঠগণ আচার হারাইলেন কিরূপে তাহার কোন উল্লেখ নাই আর বিপ্রগণই বা হঠাৎ কেন ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া এরূপ অনুরোধ করিলেন তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। প্রবোধনীর মতে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, একটী স্বতন্ত্র জাতি নহেন; বৈদ্যগণ বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অম্বষ্ঠ নহেন। এ কথা সত্য হইলে হঠাৎ রাজাজ্ঞায় অম্বষ্ঠ শব্দ কোথা হইতে আসিল। আর একটী কথা বিবেচ্য, চারি ভায়ের মধ্যে দুইজনে বিদ্যাবলে বৈদ্যত্ব (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব) লাভ করিল, অবশিষ্ট দুইজন মূল ব্রাহ্মণ রহিয়া গেল। রাজাজ্ঞায় বৈদ্য দুই জনই জাত্যন্তরিত হইল। এরূপ অবস্থায় বংশাবলী দ্বারা সম্বন্ধ নির্ণয়ের সম্ভাবনা থাকিত। শ্রীহট্ট প্রদেশে বহু পুরুষ পূর্ব্বে কোন পরিবারের এক শাখা মুসলমান হইয়া গিয়াছে, এক শাখা এখনও হিন্দু আছে। ইহাদের সম্বন্ধ এখনও কেহ বিস্মৃত হয় নাই এবং বংশাবলীর দ্বারা অদ্যাপি সম্বন্ধ নির্ণীত হইতেছে। বল্লালাপ

বিষয়ে যাঁহারা বৈশ্যাচারে অপসারিত হইলেন, তাঁহাদের সহিত বংশাবলী দ্বারা অপর শাখার সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় থাকিত। কত সহস্র বৎসর হইল রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যগণ বিভিন্ন হইয়াছেন; কিন্তু আজিও কুলজি-গ্রন্থ দ্বারা সম্বন্ধ ও বংশ স্থির করার উপায় আছে। এ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলেও ঐ আজ্ঞা পত্র যে অলীক ও অসার তাহাই প্রমাণিত হয়। বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে তাহাদের চিকিৎসা বৃত্তি কোথা হইতে আসিল? ব্রাহ্মণগণের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ এই ষট্ কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। চিকিৎসক ব্রাহ্মণ ত অতি হেয়, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। (১) যে সকল বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কি তবে এই হেয় চিকিৎসক ব্রাহ্মণ হইতে প্রস্তুত আছেন? বৈদ্যগণের বৃত্তি যখন চিকিৎসা, তখন তাহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ না হইয়া অতি নীচ ব্রাহ্মণ হইয়া পড়িবেন!

বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ জাতি সে বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। শাস্ত্র, সদাচার, লোক ব্যবহার, কুলজি-গ্রন্থ সমস্তই সমস্বরে এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ নহে, এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ, এই উক্তির অনুকূলে যে সকল যুক্তি ও হেতু উপস্থাপিত করা হইতেছে তাহার অসারত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, বৈদ্যগণের কিরূপ আচার শাস্ত্রসঙ্গত এবং তাহাদের স্থান সমাজের কোন স্তরে?

---

(১) চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংস বিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥ মনু ৩য় অঃ ১৫২

চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, প্রতিমা পরিচারক দেবল ব্রাহ্মণ, মাংস বিক্রয়ী এবং যে সকল ব্রাহ্মণ নিন্দিত বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে হব্য কব্যে পরিত্যাগ করিবে।

(২) বৈদ্যগণের কিরূপ আচার শাস্ত্রসঙ্গত এবং তাহাদের স্থান সমাজের কোন্ স্তরে।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

১০অঃ ৮ শ্লোক।

কুল্লুক টীকায় লিখিয়াছেন—"কন্যাগ্রহণাদত্র উঢ়ায়ামিত্যধ্যাহার্য্যং।" ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিনীতা বৈশ্যার গর্ভ সমুৎপাদিত সন্তান অম্বষ্ঠ।

এখন এই অম্বষ্ঠ কোন বর্ণ হইবে এবং তাহাদের আচার কিরূপ হইবে?

ভগবান্ মনুর ১০ অঃ ৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন অনুলোম জাত পুত্রগণ পিতৃবর্ণই হইয়া থাকে। শ্লোকটী এই :—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥

মনুঃ ১০।৫।

বৈঃ প্রঃ এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন সকল বর্ণের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অক্ষত যোনি ও দ্বিজত্ব সামান্যে তুল্যা পত্নীতে অনুলোমজ সন্তান (অর্থাৎ উত্তম বর্ণ কর্তৃক নিম্নতর বর্ণে উৎপাদিত সন্তান) জাতিতে পিতৃ বর্ণই হইয়া থাকে।

এইটী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অনুবাদ; এখানে "আনুলোম্যেন" শব্দ দ্বারা উত্তম বর্ণ কর্তৃক নিম্নতর বর্ণে উৎপাদিত সন্তান বুঝাইতেছে না।

মনুর ভাষ্য ও টীকাকার মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ ও কুল্লুক ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এখানে "আনুলোম্যেন" শব্দের অর্থ "যথাক্রমে," "ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং" "ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়ামিত্যানুক্রমেণ"।

এইটী সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত সকল বর্ণের সন্তান বিষয়ক বিধি। এই শ্লোকের প্রকৃত অনুবাদ-ব্রাহ্মণ জাতীয়া (বিবাহের পূর্ব্বে) অক্ষত যোনি বিবাহিতা পত্নীতে ব্রাহ্মণ পতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র ব্রাহ্মণ, ঐরূপ ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় পতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র ক্ষত্রিয়, ঐরূপ বৈশ্যাতে বৈশ্য পতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র বৈশ্য এবং ঐরূপ শূদ্রাতে শূদ্র পতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র শূদ্র হইবে। পরের শ্লোকে ভগবান্ মনু অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন যথা :—

স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্।। মনু ১০।৬

কুল্লুক—আনুলোম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভির উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ, যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং, তান্ মাতৃহীনজাতীয়ত্বদোষেণ গর্হিতান্ পিতৃসদৃশান্ ন তু পিতৃ সজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃ-সদৃশগ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃ জাতিতো নিকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ।

অনন্তরবর্ণজা পত্নীর অর্থাৎ পরের জাতীয় পত্নী, যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় পত্নী, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও বৈশ্যের শূদ্রা পত্নীতে জাত (মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ) সন্তানের বিষয় বলিতেছেন, ইহার পরের শ্লোকে "দ্ব্যেকান্তরাসু" জাত পুত্রের কথা বলিবেন।

৬ শ্লোকের অর্থ এই যে, অসবর্ণা পত্নীতে সমুৎপন্ন সন্তান জনকের সহিত সবর্ণ হয় না। তাহারা নিশ্চয়ই জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্বাদি ঋষিরা বলিয়াছেন যে, দ্বিজবর্ণত্রয় কর্ত্তৃক অনুলোম ক্রমে অনন্তর বর্ণজা পত্নীর গর্ভ সম্ভূত তনয়েরা মাতার হীনজাতীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি

প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশ জাতি অর্থাৎ মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট ও পিতৃ জাতি হইতে হীন হইবে।

অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্মং বিদ্যামিমং বিধিম্। ৭

ভর্ত্তা হইতে অনুলোম ক্রমে অনন্তর বর্ণজা পত্নীর গর্ভ সম্ভূত তনয়ের নিয়ম সকল বলা হইল। অতঃপর ভর্ত্তা হইতে এক বর্ণ ও দ্বিবর্ণান্তরজা পত্নীর গর্ভ সম্ভূত তনয়ের বিষয়ে বক্ষ্যমাণরূপ বুঝিবে। এই বলিয়া পরের ৮।৯ শ্লোকে বলিলেন ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভ সমুৎপাদিত সন্তান অম্বষ্ঠ, পরিণীতা শূদ্রার গর্ভ সম্ভূত সন্তানেরা নিষাদ বা পারশব এবং ক্ষত্রিয়া কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভ সম্ভূত সন্তান উগ্র নাম প্রাপ্ত হয়।

১০ শ্লোকে ভগবান্ মনু বলিলেন—

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃস্মৃতাঃ॥ ১০

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন বর্ণের স্ত্রীতে জাত সন্তান ৩টী এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র ২টী এবং বৈশ্যের শূদ্রাতে উৎপন্ন ১টী মোট ছয় সন্তান সবর্ণ পুত্র হইতে অপকৃষ্ট হয়েন।

কুল্লুক—ষট্‌পুত্রাঃ সবর্ণপুত্রকার্য্যাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ।

এই কয়টী শ্লোক আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে ৫ম শ্লোকে অনুলোম বর্ণ জাত সন্তানের কথা নাই। যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে ঐ শ্লোকে "জাতা জ্ঞেয়াস্তু এব তে" অংশে সে তাহাই হয় বলিয়া ১০ম শ্লোকে "ষড়েতেঽপসদাঃ" এই ছয় জন নিকৃষ্ট এবং ৬ষ্ঠ শ্লোকে মাতৃ দোষ বশতঃ পিতার জাতি হইতে নিকৃষ্ট বলার কোন সার্থকতা থাকে না।

কাজেই এ শ্লোকের অর্থে যে অনুলোম বর্ণ জাত সন্তান পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। অসবর্ণ জাত সন্তান মাতৃ বর্ণ হইতে উপরে ও পিতৃবর্ণ হইতে নীচে হইবে। এজন্য বৃদ্ধ হাঁরীত বলিলেন—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্।

(শব্দ কল্প দ্রুম)

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই পাঁচজন দ্বিজ; ইহাদের প্রত্যেকে পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে নিকৃষ্ট ও পরবর্ত্তী হইতে উৎকৃষ্ট। (দেখা যায় এই সময় বৈদ্য শব্দ জাতি বাচক হইয়া অম্বষ্ঠ জাতিকে বুঝাইতেছে) মাতৃদোষ বশতঃ বৈদ্যের স্থান ব্রাহ্মণ ও মূর্দ্ধাবসিক্ত (ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত) জাতির নিম্নে এবং বীজের উৎকর্ষতা নিবন্ধন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপরে।

যদি ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ত্রীতে জাত পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ হইত তাহা হইলে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ বলিয়া পৃথক সংজ্ঞা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, সকলকেই ব্রাহ্মণ বলা হইত। ক্ষেত্রের দোষ অপরিহার্য্য। ব্রাহ্মণী অপেক্ষা ক্ষত্রিয়া ও তদপেক্ষা বৈশ্যা স্ত্রী হীনা হইবে ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। কাজেই শাস্ত্র ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যায় উপজাত সন্তানকে পৃথক ভাবে নামাঙ্কিত করিয়া আপেক্ষিক হীনতা সূচিত করিতেছেন।

ব্যাস সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ের ৭।৮ শ্লোকে বলিতেছেন—

বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্র বিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মানি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ ॥৭
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ ।।৮

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধি পূর্ব্বক বিবাহিতা ব্রাহ্মণপত্নীজাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয় পত্নী জাত সন্তানের সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্র কন্যাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্য কন্যাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্য জাতির মত করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্র জাতির মত করিবে। অধম জাতীয় পুরুষ হইতে উত্তম জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান শূদ্র অপেক্ষা অধম। (১) গোপী চন্দ্র সেন, ৭৮ শ্লোকের অর্থ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কন্যাতে জাত পুত্রগণের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণবৎ; ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক স্বীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যাতে জাত পুত্রগণের জাত কর্ম্মাদি ক্ষত্রিয়বৎ (বিপ্রবৎ পাঠ ধরিলে বিপ্রবৎ) বৈশ্য কর্ত্তৃক স্বীয় বিবাহিতা বৈশ্য কন্যাতে জাত পুত্রদিগের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যবৎ করিবে, আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে ও শূদ্র কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি শূদ্রবৎ করিবে। এই অর্থ সমীচীন নহে, কারণ তাহা হইলে ব্যাসের নিম্নলিখিত বচনের সহিত বিরোধ হয়।

---

(১) এই শ্লোকের পাঠের কিছু তারতম্য আছে। বঙ্গবাসী হইতে মুদ্রিত ব্যাস সংহিতায় "ক্ষত্র বিন্নাস্থ বিপ্রবৎ" আছে। পুনা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত স্মৃতি সমুচ্চয়েও ঐরূপ পাঠ আছে। আলিগড় হইতে ১৮৮১ খ্রীঃ যে অষ্টাদশ স্মৃতি মুদ্রিত হয় তাহাতে "ক্ষত্র বিন্নাস্থ ক্ষত্রবৎ" পাঠ আছে। ৺গোপী চন্দ্র সেন গুপ্তের ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বৈদ্য পুরাবৃত্তে "ক্ষত্র বিন্নাস্থ ক্ষত্র বৎ" পাঠ আছে।

যে তু জাতাঃ সমানাসু সংস্কার্য্যাঃ স্যুরতোঽন্যথা। (১)

যাহারা সমান জাতীয়া পত্নীতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাদেরই স্বজাত্যুক্ত সংস্কার হইবে। আর, ব্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১২শ শ্লোকে সবর্ণা ভার্য্যার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করারও কোন অর্থ থাকে না। ভগবান মনুও যে ১০ অঃ ১৪ শ্লোকে (২) অনুলোম জাত সন্তানগণ মাতৃজাতীয় সংস্কার যোগ্য এবং ঐ অধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০ শ্লোকে অনুলোম জাত পুত্র "অপসদাঃ" অপকৃষ্ট বলিয়াছেন, তাহার সহিতও বিরোধ হয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন ৬টী অপধ্বংসজা (নিন্দনীয়) পুত্র কোন্ কয়টী? তদুত্তরে ভীষ্ম বলিলেন ব্রাহ্মণের অসবর্ণাজাত ৩টী ক্ষত্রিয়ের ২টী ও বৈশ্যের একটী, এই ছয়টী। অনুলোম জাত সন্তানকে অপধ্বংস ও প্রতিলোম জাত সন্তানকে অপসদ

---

(১) কুল্লূক ব্যাসের এই বচন মনুর ১০ অঃ ৫ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি। সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি স্বজাতয়ঃ ইত্যভিধায় বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি ব্রুবাণঃ স্বপত্ন্যুৎপাদিতস্যৈব ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিত্বং নিশ্চিকায়। অর্থ-যাজ্ঞবাল্ক্যও "সবর্ণ হইতে সবর্ণাতে স্বজাতি উৎপন্ন হয়" বলিয়া পরে বিবাহিত পত্নীতে" এই কথা লিখিলেন—তাহার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে ব্রাহ্মণাদির দ্বারা সবর্ণা পত্নীতে উৎপাদিত পুত্রের ব্রাহ্মণাদির জাতি হইবে।

(২) পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তর নাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে। ॥ মনু ১০।১৪

কুল্লূক—মাতৃজাতিব্যপদেশকথনং মাতৃজাতি সংস্কারাদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থং।

অর্থ দ্বিজাতিগণের অনুলোম ক্রমে (অনন্তর বর্ণজ, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর বর্ণজ) তনয়েরা মাতৃদোষ দুষ্ট বলিয়া মাতৃজাতির সংস্কার যোগ্য।

বলিয়া উহাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহারা কেহই সবর্ণজাত পুত্রের ন্যায় নহে। মহাভারত প্রতিলোমজাত সন্তানকে অতি নীচ ও মনু অনুলোম জাত সন্তান সবর্ণ হইতে হীন, এই অর্থে অপসদ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পর ব্যাসের ২য় অধ্যায়ের ১০।১১।১২ শ্লোক আলোচনা করা আবশ্যক। ঐ শ্লোক কয়টী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥ ১০
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।
স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্॥ ১১
নানা বর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।
ধর্ম্ম্যা ধর্ম্মেষু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তস্য স্বজাতিষু॥ ১২

অনুবাদ-সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কাম বশত যদি অসবর্ণা কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তবে সেই অসবর্ণা স্ত্রী জাত সন্তানগণ কিঞ্চিৎ হীন হইবে প্রকৃষ্ট রূপে হীন নহে।১০ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা এবং বৈশ্য কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু নীচ বর্ণ উত্তম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। ১১ সকল বর্ণা ভার্য্যা থাকিলেও সবর্ণা ভার্য্যা সহধর্ম্মচারিণী। সজাতীয়ার মধ্যে যে পত্নী ধর্ম্মত্যাগ করে না ও ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগবতী, সেই তাহার জ্যেষ্ঠা।১২

ব্যাস ১অঃ ৭।৮ শ্লোকে বলিলেন যে উত্তম বর্ণের পুরুষ কর্ত্তৃক নীচ বর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার মাতার ন্যায়

হইবে। ইহার পরে ২য় অধ্যায়ের ১১।১২ শ্লোকে বলিতেছেন উচ্চ বর্ণ নীচ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু সবর্ণা স্ত্রী বর্ত্তমানে সবর্ণা স্ত্রীরই প্রাধান্য থাকিবে। কাজেই "ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে" সবর্ণ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে ইহাই সমীচীন অর্থ। তাহা না হইলে ১ম অধ্যায়ের ৭।৮ শ্লোকের, ২য় অধ্যায়ের ১১।১২ শ্লোকের সামঞ্জস্য থাকে না। সবর্ণা স্ত্রী ভিন্ন অপর অসবর্ণা স্ত্রী কাম পত্নী বলিয়া ব্যাস ২অঃ ১০ শ্লোকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভগবান্ মনুও অসবর্ণা স্ত্রীকে কামস্ত্রী বলিয়াছেন। সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীও তাহাদের সন্তানগণ যদি এক পর্য্যায় ভুক্ত হইত তাহা হইলে দ্বিজাতি দিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীকে প্রশস্ত নির্দ্দেশ করিয়া অসবর্ণা স্ত্রীকে কামস্ত্রী বলিবার কোন সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। (১)

ভগবান্ মনুর ১০অঃ ২৮ শ্লোক ৬।৭।৮ শ্লোকের বিরোধী নহে। ২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান এবং ব্রাহ্মণের সবর্ণা সম্ভূত সন্তান দ্বিজ বলিয়া যেমন শূদ্র অপেক্ষা মান্য, তদ্রূপ ইতর জাতির মধ্যে বৈশ্যের ক্ষত্রিয় জাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সন্তান শূদ্রের প্রতি লোমজ সন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভ সম্ভূত সন্তানকে দ্বিজ বলিয়াছেন

---

(১) সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ। মনু ৩য় অঃ ১২

দ্বিজাতি গণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্তা, কাম বশত পুনর্ব্বিবাহে নিম্ন লিখিত স্ত্রীলোকই পর পর শ্রেষ্ঠ হয়।

কুল্লুক কামতঃ কাম বশাৎ অর্থ করিয়াছেন। পরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্যও বলিয়াছেন ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়া পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ। ধর্ম্মের জন্য প্রথম সবর্ণ স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ কাম বশত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে।

মাত্র, তাহারা সকলেই যে ব্রাহ্মণের স্বজাতীয় ইহা বলেন নাই। ৪১ শ্লোকে বলিয়াছেন স্বজাতি জানন্তরজাঃ ষট সুতা দ্বিজ ধর্ম্মিণঃ।

ব্রহ্মাদি দ্বিজত্রয়ের (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) স্বজাতি পত্নী গর্ভসম্ভূত সন্তানত্রয় এবং অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের ঔরস জাত তনয় দ্বয় (ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে) ও ক্ষত্রিয়ের ঔরস জাত বৈশ্যার সন্তান এই ষড়্‌বিধ সন্তান দ্বিজ ধর্ম্মাবলম্বী। এখানেও মনু পিতৃ জাতীয় বলেন নাই।

বৃদ্ধ হারীত শেষোক্ত সন্তানের উল্লেখ না করিয়া অপর পাঁচটীকে মাত্র দ্বিজ বলিয়াছেন।

অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের স্বজাতি ইহার প্রমাণ স্বরূপ মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মহাভারতের প্রাধান্য স্মৃতি শাস্ত্রের উপরে নহে। বিশেষ বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন তদ্দ্বারা মনুর মত সমর্থিত হইতেছে।

তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যচ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥

মহাঃ অনুশাসন ৪৭ অঃ।

তাহাদের সন্তানগণ "সমং ভবেৎ" ইহা মনুর "সদৃশ" কথার প্রতিধ্বনি মাত্র।

যুধিষ্ঠির উবাচ—

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়া মপি চৈবহি॥

মহা অনু ৪৭ অঃ ২৮

ব্রাহ্মণীর গর্ভ জাত সন্তানসহ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার সন্তানকে এক

পর্য্যায়-ভুক্ত করেন নাই। "তথৈব স্যাৎ" "চৈব হি" এই রূপ বলিয়াছেন মাত্র। ইহাতে ভগবান মনুর "সদৃশ" কথায় অনুবাদ মাত্র।

এই দুই শ্লোকের অর্থ পরে বিশদীকৃত হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নৃপ! আপনি যখন বলিলেন যে ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ, তখন কেন তাহাদের মধ্যে পিতৃ সম্পত্তি ভাগ বিষয়ে ন্যূনাধিক্য ঘটিল? (১)

এই কথার উত্তরে ভীষ্ম বলিলেন :—

হে যুধিষ্ঠির, যদিও সমুদয় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা নামে অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে (অন্য) তিন বর্ণের স্ত্রী বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া থাকে। (কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) (২)

তৎপর ঐ ৪৭ অধ্যায়ে ৩৭।৩৮।৩৯ শ্লোকে (৩) বলিলেন, "যদিও

---

(১) কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপসত্তম।
যদা সর্ব্বে ত্রয়ো বর্ণা স্তয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি॥
অনু ৪৭ অঃ ২৯ শ্লোক

(২) ভীষ্ম উবাচ—দারা ইত্যুচ্যতে লোকে নাম্নৈকেন পরন্তপ।
প্রোক্তেন চৈব নাম্নায়ং বিশেষঃ সুমহান্ভবেৎ॥
৩০ শ্লোক
তিস্রঃ কৃত্বাপুরা ভার্য্যাঃ পশ্চাদ্বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্।
সা জ্যেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্যাৎ সা চ ভার্য্যা গরীয়সী। ৩১

(৩) ব্রাহ্মণ্যাঃ সদৃশঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়াশ্চ যো ভবেৎ।
রাজন্ বিশেষো যস্ত্বত্র বর্ণয়োরুভয়োরপি॥ ৩৭
নতু জাত্যা সমা লোকে ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাঃ প্রথমঃ পুত্রো ভূয়ান্ স্যাদ্রাজ সত্তম॥ ৩৮
ভূয়ো ভূয়োঽপি সংহার্য্যং পিতৃবিত্তাদ্ যুধিষ্ঠির।
যথা ন সদৃশী জাতু ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া ভবেৎ॥ ৩৯

ক্ষত্রিয়ার গর্ভ সম্ভূত পুত্রকে ব্রাহ্মণী গর্ভ সম্ভূত পুত্রের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠ বর্ণ সম্ভূতা বলিয়া তাহার গর্ভ সম্ভূত পুত্রগণকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণীর গর্ভ সম্ভূত পুত্রই সর্ব্ব প্রধান। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্যা নহে, তদ্রূপ বৈশ্যা কখনই ক্ষত্রিয়ার তুল্য সম্মানাস্পদ হইতে পারে না।

ইহার পরে ৪৪।৪৫ শ্লোকে (১) ভীষ্ম বলিতেছেন লোকের ধন ও স্ত্রী পুত্রাদি দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়ই তৎ সমুদয় রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ কি? অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত পুত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পৈতৃক ধন গ্রহণ করিতে পারে।

ধন বিভাগ সম্বন্ধে অনুশাসন পর্ব্বের ঐ অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিলেন:—

এক্ষণে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃ ধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তু সকল শ্রেষ্ঠাংশ স্বরূপ গ্রহণ করিবে; তৎপর যে ধন থাকিবে তাহা ১০ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ মধ্যে ব্রাহ্মণীর পুত্র ৪ অংশ ক্ষত্রিয়ার পুত্র তিন অংশ ও বৈশ্যার পুত্র ২ অংশ ও শূদ্রার পুত্র ১ অংশ গ্রহণ করিবে।

---

(১) দস্যুভির্হ্রিয়মাণং চ ধনং দারাশ্চ সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ত্রাতা ভবতি পার্থিবঃ ॥ ৪৪
ভূয়ান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো পুত্রো বৈশ্যাপুত্রান্ন সংশয়ঃ।
ভূয়শ্চৈবাপি হর্ত্তব্যং পিতৃবিত্তাদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৪৫

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্রেরা এইরূপে অধিকার করিবে। যে স্থলে সকল পুত্রই সমান বর্ণা হইতে উৎপন্ন সেই স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়। (১)

ইহার পরেই ১৭ শ্লোকে বলিলেন শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র অব্রাহ্মণ আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত (২)

এস্থলে কি অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা ৭ম শ্লোকে বুঝা যাইবে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু বিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির॥ অনুশাসন ৪৭ অঃ ৭

---

(১) লক্ষণং গোবৃষো যানং যৎপ্রধানতমং ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাস্তদ্ধরেৎ পুত্র একাংশ বৈ পিতুর্ধনাৎ॥ ১১
শেষং তু দশধা কার্য্যং ব্রাহ্মণস্বং যুধিষ্ঠির।
তত্র তেনৈব হর্ত্তব্যাশ্চত্বারোংহশাঃ পিতুর্ধনাৎ॥ ১২
ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্য সংশয়ঃ।
স তু মাতুর্ব্বিশেষেণ ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি॥ ১৩
বর্ণে তৃতীয়ে জাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণ স্বাদ্ যুধিষ্ঠির॥ ১৪
* * * * * * * *
দশধা প্রবিভক্তস্য ধনস্যৈষ ভবেৎ ক্রমঃ।
সবর্ণাস্থ তু জাতানাং সমান্ ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ॥ ১৭

(২) অব্রাহ্মণং তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্রমনৈপুণাৎ। ত্রিষুবর্ণেষু জাতো
হি ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ ৪৭ অঃ ১৭
নীলকণ্ঠ টীকায় বলিয়াছেন "এতচ্চ দায়ার্থমবধ্যত্বার্থং চোক্তম্,
বিপ্রাৎ বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াঞ্চ জাতস্য মাতৃজাতীয়ত্বস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ"।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি ইহাদের ধর্ম ব্রাহ্মণের ন্যায়। ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত সন্তান দ্বিজাতি বলিয়া ব্রাহ্মণ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে স্পষ্ট বলিলেন—

এবং জাতিষু সর্ব্বাসু সবর্ণঃ শ্রেষ্ঠতাং গতঃ।
মহর্ষিরপি চৈতদ্বৈ মারীচঃ কাশ্যপো হব্রবীৎ॥ ৬১

সকল বর্ণের স্ত্রী থাকা সত্বেও সবর্ণা স্ত্রীতে জাত পুত্র শ্রেষ্ঠ।

অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে এই কথা আরও স্পষ্ট করিয়াছেন

ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়ো রাত্মা প্রজায়তে।
আনু পূর্ব্ব্যাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাতো প্রসূয়তঃ॥৪

নীলকণ্ঠ—"আত্মা ব্রাহ্মণ এব ক্ষত্রিয়ায়ামপি জায়ত ইত্যর্থঃ। সচ কিঞ্চিন্নীচঃ যদাহ মনুঃ, স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতানিতি। মাতৃজাতৌ বৈশ্যায়াং বৈশ্যোহম্বষ্ঠো নাম, শূদ্রায়াং শূদ্রো নিষাদো নাম পারশবাখ্যো ভবতি।

শ্লোকের অর্থ—ব্রাহ্মণের ৪ ভার্য্যা হইতে পারে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়া জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয়। বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে জাত বৈশ্য ও শূদ্র পুত্র হয়। ক্ষত্রিয়াতে যে ব্রাহ্মণ পুত্র বলা হইল, সে পুত্র ব্রাহ্মণ সদৃশমাত্র। নীলকণ্ঠ টীকায় বলিলেন "স চ কিঞ্চিন্নীচঃ", সে কিছু নীচ; এই বলিয়া মনুর ১০ অঃ ৬ ও ৮ শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইলেন যে ইহারা মাতৃদোষ বশত বিগর্হিত হইবে। মনু ৬।৮।১০ শ্লোকের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

অপর ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত সন্তান প্রায় ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবে, কারণ উভয়ই উচ্চ বর্ণ; কিন্তু তথাপি কিঞ্চিৎ নীচ

হইবে। আর, অপর বৈশ্য ও শূদ্রা স্ত্রীতে জাত সন্তান মাতৃজাতি হইবে। নীলকণ্ঠ টীকায় বলিলেন বৈশ্যায়াং বৈশ্যোঽম্বষ্ঠো নাম বৈশ্যাস্ত্রীতে জাত সন্তান বৈশ্য, নাম অম্বষ্ঠ।

অসবর্ণা স্ত্রী জাত সন্তানের মর্য্যাদা সবর্ণা স্ত্রী জাত সন্তানের ন্যায় হইতে পারে না এবং তাঁহারা পিতৃ সবর্ণতা লাভ করেন না, ইহাই শাস্ত্রকারগণের বিধান এবং সামাজিক ব্যবহারও ইহার অনুকূল বটে।

বিষ্ণু সং ১৬অঃ ১।২ সূত্র

সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি।১

অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ ॥২

সমান বর্ণে উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রগণ সবর্ণ ও অনুলোমা (অসবর্ণে) উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রেরা মাতৃবর্ণ হইয়া থাকে। ৺উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে ইহা কৃত্রিম বচন। কিন্তু কেবল এই বচনকে কৃত্রিম বলিলে চলিবে না।

৺উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন অগ্নি পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা তিনি জাল বলেন নাই। তদনুসারেও—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতিঃ মাতৃসমা স্মৃতা—১৫১ অঃ ১০

যাজ্ঞবল্ক্যসং ১ অঃ ৯০ শ্লোকে এই মতই সমর্থন করিতেছেন

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।

অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ ॥৯০

পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে পরিণেতা সবর্ণ হইতে উৎপন্ন পুত্র পিতা মাতার সবর্ণ হইবে। অনিন্দ্য অর্থাৎ ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভ সম্ভূত পুত্র বংশ বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

ইহার পরে অনুলোমজ সন্তানের কথা বলিয়াছেন "বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্য জাতীয় স্ত্রীতে

উৎপন্ন পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ এবং শূদ্র জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাদ কিংবা পারশব। (১)

ইহার পূর্ব্বে ৮৮ শ্লোকে মহর্ষি সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীর পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন "সবর্ণা স্ত্রী থাকিতে অপর বর্ণীয়া স্ত্রীকে ধর্ম্ম করাইবে না। (২)

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অঃ ৪ শ্লোক পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই আছে "মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়ত"।

ভগবান মনুর ১০ অঃ ১০।১৪ শ্লোক দ্বারা অনুলোম জাত সন্তানের মাতৃজাত্যুক্ত সংস্কারের বিধান সমর্থিত হইতেছে। ঐ দুই শ্লোক পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অনুলোম জাত পুত্রগণের মাতৃধর্ম্ম হইলেও তাহারা দ্বিজাতি এবং বর্ণসঙ্কর নহে। প্রতিলোম জাত সন্তানই বর্ণ-সঙ্কর ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। (৩)

ধনবিভাগ সম্বন্ধে ভগবান্ মনু নবম অধ্যায়ের ১৫০।১৫১।১৫২।১৫৩ শ্লোকে এইরূপ বিধান করিলেন যথা :—

ব্রাহ্মণীর গর্ভজ সন্তান একটী কর্ষক, একটী বৃষ, একটী যান, অলঙ্কার এবং একটী বাস ভবন ও অপর বিষয়ের এক প্রধান অংশ প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্মণ তিন অংশ ক্ষত্রিয়াসুত দুই অংশ, বৈশ্যাপুত্র দেড় অংশ এবং শূদ্রাসুত একাংশ প্রাপ্ত হইবে। অথবা একজন বিভাগধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি

---

(১) বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥ যাজ্ঞ ১অঃ ৯১

(২) সত্যামত্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।
সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ॥ ঐ ৮৮

(৩) আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম সঃ বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥ নারদ

সমস্ত সম্পত্তির দশধা বিভক্ত করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ চারি অংশ ক্ষত্রিয়াসুত তিন অংশ বৈশ্যা সুত দুই অংশ, শূদ্রা সুত এক অংশ প্রাপ্ত হইবে। ১৫৬ শ্লোকে বলিলেন—দ্বিজাতিদিগের সমানবর্ণজাত সন্তানেরা জ্যেষ্ঠকে উদ্ধারাংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ ঐ জ্যেষ্ঠের সহিত সমান ভাগ করিয়া লইবে। যাজ্ঞবল্ক্যও এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন—ব্রাহ্মণের সম্পত্তি দশ অংশে বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণী পুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়া পুত্র তিন, বৈশ্যা পুত্র দুই ও শূদ্রা পুত্র একভাগ পাইবে। যাজ্ঞ ২য়অধ্যায় ১২৮। অসবর্ণা জাত পুত্রগণ সকলেই সমান হইলে পিতৃ সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে এই প্রকার তারতম্য হইত না। ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠ বর্ণসম্ভূতা বলিয়া তাহার গর্ভ সম্ভূত পুত্র অবশ্যই শ্রেষ্ঠ একথা ভীষ্ম স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

আমরা দেখিলাম যে, অসবর্ণা স্ত্রী ও তাহার সন্তান, সবর্ণা স্ত্রী ও তাহার সন্তান অপেক্ষা হীন। দায়ভাগ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য স্মৃতি শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির সংবাদে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের মত অনুমোদিত হইয়াছে। সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীর বিবাহ বিষয়েও স্মৃতিকারগণ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্খ সংহিতায় আছে, "ব্রাহ্মণ সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ কালে পানিগ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ কালে শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্য কন্যা বিবাহ কালে প্রতোদন (পাচন বাড়ী) গ্রহণ করিবে। যে স্ত্রী অগ্নিবহন করে, সেই ভার্য্যা, যে স্ত্রী পতিপ্রাণা সেই ভার্য্যা এবং যে পুত্রবতী সেই ভার্য্যা। এই সকল গুণ সম্পন্না ভার্য্যা প্রকৃষ্ট যত্ন পূর্ব্বক প্রতি পালনীয় এবং সর্ব্বদা তাড়নীয়া। যে ভার্য্যা লালিতা ও পালিতা সেই লক্ষ্মী স্বরূপা ইহার অন্যথা নাই।" শঙ্খ সং ৪র্থ অঃ ১৪।১৫।১৬ শ্লোক। বিষ্ণু সংহিতার ২৪ অধ্যায়ে ৫।৬।৭।৮ শ্লোকে এই প্রকার বিধি আদিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতি শাস্ত্র সবর্ণা কন্যার ন্যায় অসবর্ণা স্ত্রীর বিবাহে হস্ত ধারণের

বিধান করেন নাই। ইহা দ্বারা বিবাহ কার্য্যেও পার্থক্য সূচিত করিয়াছেন। ভগবান মনুও ৩য় অঃ ৪৩ শ্লোকে এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। (১)

উপরি উক্ত আলোচনা দ্বারা আমার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি।

(১) বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) দ্বিজাতি কিন্তু ব্রাহ্মণ নহে।

(২) বৈদ্যের স্থান ব্রাহ্মণ ও মূর্দ্ধাবসিক্তের নীচে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপরে।

(৩) তাহাদের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার মাতৃবৎ হইবে অর্থাৎ বৈশ্যের ন্যায় হইবে।

---

(৩) বৈদ্যগণের দশাহ অশৌচ গ্রহণ করার অধিকার আছে কিনা ?

এই পরিচ্ছেদে আমরা অশৌচ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চ দশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি। মনু ৫।৮৩

ব্রাহ্মণ দশ দিনে ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে ও শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হইবে।

---

(১) পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি। মনু ৩অঃ ৪৩
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে। ৪৪

সমান জাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিলে পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করিবে। আর অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ বিষয়ে বক্ষ্যমাণ বিধি জানিবে। উৎকৃষ্ট বর্ণ কর্ত্তৃক বিবাহের সময় ক্ষত্রিয়া শর, বৈশ্যা গোতাড়ন যষ্টি ও শূদ্রা বস্ত্রের এক দেশ ধারণ করিবে।

পরের ৮৪ শ্লোকে বলিলেন অশৌচের দিন সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত নহে অর্থাৎ সাগ্নিকত্বাদি বশতঃ যাহার পূর্ণ অশৌচ কাল একদিন বা তিনদিন সে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানলাঘব হইবে মনে করিয়া দশ দিন অশৌচ লইবে না ; তাৎপর্য্য এই, যাহার যেরূপ অশৌচ বিহিত সে ধর্ম্ম কার্য্যলাঘব করার অভিপ্রায়ে অশৌচের দিন বৃদ্ধি করিবে না (১)

যাজ্ঞবল্ক্য ৩য় অধ্যায় ২২ শ্লোক—

> ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু।
> ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥

ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন শূদ্রের এক মাস এবং ন্যায়বর্ত্তী (অর্থাৎ পাকযজ্ঞ দ্বিজ শুশ্রূষাদি কর্ম্মে নিরত) শূদ্রের মাসার্দ্ধ।

মিতাক্ষরা এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যে টীকা ও মন্তব্য করিয়াছে তাহাতে অঙ্গিরা সংহিতার বচন উল্লেখে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা।
> দশাহাচ্ছুদ্ধিরেতেষামিতি শাতাতপোঽব্রবীৎ।

বৈদ্য প্রবোধনী এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সকল বর্ণের পক্ষে দশাহ অশৌচ আদিষ্ট হইয়াছে।

---

(১) ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ।
ন চ তৎকর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যশুচির্ভবেৎ।

মনু ৫।৮৪

অশৌচ দিন বৃদ্ধি করিবে না। শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত করিবে না। যদি পুত্রাদি কোন সপিণ্ড প্রতিনিধি হইয়া হোমাদি করেন, তাহাতে তাহারা অশুচি হইবে না।

বঙ্গবাসীর মুদ্রিত অঙ্গিরা সংহিতায় এই বচন নাই।

তিনি ও মনুর ন্যায় বলিয়াছেন—

দশাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
পাক্ষিকং বৈশ্য এবাহ শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥

অঙ্গিরা ৫১ শ্লোক (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

উশনাও বলিয়াছেন

শুধ্যেদ্বিজো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চ দশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥

৬অঃ ৩৪।

কিন্তু উশনা ব্রাহ্মণের সেবকগণের জন্য পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। ৩৪ শ্লোকে ঐ রূপ অশৌচের বিধান করিয়া ৩৫ শ্লোকে বলিলেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বংশীয় যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মনের অশেষ অর্থাৎ একমাত্র সেবক তাহাদিগের ব্রাহ্মণ সেবাতে ব্রাহ্মণবৎ দশাহে শুদ্ধি শাস্ত্রকারগণের মত।

সাধারণ বিধি দশাহ, দ্বাদশাহ, পঞ্চদশাহ ও একমাস তবে যাহারা ব্রাহ্মণের সেবক তাহাদের জন্য পৃথক একটী বিধি দিলেন। ইহা সকলের পক্ষে অবলম্বনীয় নহে।

মিতাক্ষরা প্রথমত যাজ্ঞবল্ক্যের নিম্ন লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন

ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চ দশৈব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায় বর্ত্তিনঃ॥

এই শ্লোকের টীকায় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা দেখা আবশ্যক। "ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রানাং সপিণ্ড জননে তদ্বৎমরণে চ যথাক্রমেণ দ্বাদশ পঞ্চদশ ত্রিংশ দ্দিনান্যাশৌচং ভবতি। ন্যায়বর্ত্তিনঃ পুনঃ শূদ্রস্য পাকযজ্ঞাদিক

শুশ্রূষাদিরতস্য তদর্দ্ধং তস্য মাসস্যার্দ্ধং পঞ্চদশরাত্রমাশৌচম্। এবং চ ত্রিরাত্রং দশ রাত্রং বেত্যেতদ্দশরাত্রামাশৌচং পারিশেষ্যাদ্ব্রাহ্মণবিষয়ে ব্যবতিষ্ঠতে। স্মৃত্যন্তরেষু তু ক্ষত্রিয়াদীনাং দশাহাদয়োঽপ্যাশৌচ কল্পা দর্শিতাঃ। যথাহ পরাশরঃ—ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ। তথৈব দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ শুদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ।" তথাচ শাতাতপঃ একাদশাহাদ্রাজন্যো বৈশ্যো দ্বাদশভিস্তথা। শূদ্রো বিংশতি রাত্রেণ শুধ্যেত মৃত সূতকে॥ বশিষ্ঠস্তু "পঞ্চদশ রাত্রেণ রাজন্যো বিংশতি রাত্রেণ বৈশ্য ইতি॥ অঙ্গিরাস্ত্বাহ 'সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা। দশাহাচ্ছুদ্ধি রেতেষামিতি শাতাতপোঽব্রবীৎ॥' ইত্যেবমনেকোচ্চাবচাশৌচকল্পা দর্শিতাঃ তেষাং লোকে সমাচারাভাবান্নাতীব ব্যবস্থাপ্রদর্শন মুপযোগীতি নাত্র ব্যবস্থা প্রদর্শ্যতে।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের সপিণ্ডজন্মে ও সপিণ্ডমরণে যথাক্রমে দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও ত্রিশ দিন অশৌচ হইবে। কিন্তু ধর্ম্মপথে অবস্থিত অর্থাৎ পাকযজ্ঞ-ব্রাহ্মণসেবাদিরত শূদ্রের অর্দ্ধমাস বা পঞ্চদশদিনমাত্র অশৌচ হইবে। তাহা হইলেই, "ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা" (১৮ শ্লোকে পরে দ্রষ্টব্য) ইত্যাদিতে উল্লিখিত দশরাত্র অশৌচ বিশেষভাবে ব্রাহ্মণেরই বুঝিতে হইবে। অন্যান্য স্মৃতিতে ক্ষত্রিয়াদির দশাহাদি অশৌচের ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা পরাশরস্মৃতিতে—স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় দশদিনে এবং বৈশ্য দ্বাদশ দিনে শুদ্ধিলাভ করিবে। আবার শাতাতপ-স্মৃতিতে—জন্ম ও মরণ নিমিত্তক অশৌচে ক্ষত্রিয় একাদশদিনে বৈশ্য দ্বাদশদিনে এবং শূদ্র বিশদিনে শুদ্ধ হইবে। বশিষ্ঠ বলেন—ক্ষত্রিয় পঞ্চদশ দিনে এবং বৈশ্য বিশদিনে শুদ্ধ হইবে। অঙ্গিরা বলেন— জন্ম ও মরণ নিমিত্তক অশৌচে সকল বর্ণই দশদিনে শুদ্ধ হইবে শাতাতপ এইরূপ

বলিয়াছেন। অশৌচের এইরূপ নানাপ্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়; কিন্তু সমাজে তাহার ব্যবহার নাই বলিয়া ব্যবস্থা দেখাইবার কারণ নাই, সেই-জন্য সেরূপ ব্যবস্থা দেখান হইল না।

বৈদ্যপ্রবোধনী যাজ্ঞবল্ক্যের আর একটী বচন তুলিয়া সর্ব্ববর্ণের দশাহ অশৌচের বিধান দেখাইয়াছেন। সেই বচনটী এই :—

ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচ মিষ্যতে।
ঊনদ্বিবর্ষ উভয়োঃ সূতকং মাতুরেব হি। যাজ্ঞ ৩অঃ ১৮শ্লোক

সপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যু ও জন্মে (ব্রাহ্মণের) দশ রাত্র অশৌচ আর সপ্তমের পর দশম পুরুষের অন্তর্গত জ্ঞাতির জন্ম মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ মন্বাদি ঋষিগণ ইচ্ছা করেন। যেমন পুত্র জন্মে কেবল মাতার স্থায়ী অস্পৃশ্যতা হয় সেইরূপ দুই বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকের মৃত্যুতে কেবল মাতা পিতারই অস্পৃশ্যত্ব হইবে।

এই বচনটী সকল জাতির পক্ষে সাধারণ বিধি নহে, সপিণ্ড ও সমানোদক সম্বন্ধে অশৌচের ব্যবস্থা মাত্র; কোন্‌স্থলে ১০ রাত্র ও কোন্‌ স্থলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে তাহারই ব্যবস্থা। এই শ্লোকটীর বৈদ্য প্রবোধনী যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তদনুসারে ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করাও বৈধ হইবে। কারণ শ্লোকে "ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা" আছে; তাহা হইলে আমরা ত্রিরাত্র অশৌচ পালন না করিয়া দশ রাত্রই বা এত কষ্ট স্বীকার কেন করিব!

মিতাক্ষরা এই শ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ স্থির হইবে। টীকাকার বলিতেছেন শবনিমিত্তং শাবম্‌। সূতক শব্দেন চ জনন বাচিনা তন্নিমিত্তমাশৌচং লক্ষ্যতে। তস্মাজ্জাতস্যৈব জননং মরণং চ নিমিত্তম্‌। তজ্জোভয় নিমিত্তমপ্যা শৌচং

ত্রিরাত্রং দশরাত্রং চেষ্যতে, মন্বাদিভিঃ। মন্বাদিভিরিষ্যত ইতি বচনং তদুক্তসপিণ্ডসমানোদকরূপবিষয়ভেদ প্রদর্শনার্থম্।

তথাহি দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
জননেঽপ্যেব মেব স্যান্নিপুণাং শুদ্ধি মিচ্ছতাম্।
জন্মন্যেকোদকানাং তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে। অতঃ সপিণ্ডাণাং সপ্তম পুরুষাবধিকানামবিশেষেণ দশরাত্রম্। সমানো-দকানাং ত্রিরাত্র মিতি॥

বৈশ্য প্রবোধনী যে দুইটী বচনের উপর নির্ভর করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথমটী মূল গ্রন্থে নাই। মিতক্ষরা যাজ্ঞবল্ক্যের ২২ শ্লোকে টীকায় এই বচন ও অন্যান্য বচন উদ্ধৃত করিয়া নিজেই বলিয়াছেন, সমাজে এই সকলের ব্যবহার নাই বলিয়া ব্যবস্থা দেখান হইল না। অপর, "ত্রিরাত্রং দশরাত্রং" শ্লোকটী সাধারণ বিধি নহে, সপিণ্ড ও সমানোদকের কিরূপ অশৌচ হইবে তাহাই বলিয়াছেন মাত্র। প্রথম বর্ণের দশাহ অশৌচ কাজেই সেই অশৌচ সপিণ্ড পক্ষে ধরিয়া সমানোদকের পক্ষে ত্রিরাত্র বলিয়াছেন। বৈদ্য প্রবোধনীর ব্যাখ্যা ঠিক হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করিলেই ত চলিতে পারে কারণ "ত্রিরাত্র দশরাত্রং বা" ত্রিরাত্র অথবা দশরাত্র এইরূপ বচন রহিয়াছে। অশৌচ কমাইবার যখন ঝোঁক উঠিয়াছে, তখন ৩দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া আপদ শান্তি করা হয় না কেন! এখনই তথাকথিত শিক্ষিত লোক মধ্যে কেহ কেহ অশৌচ পালন করা বর্ব্বরতা মনে করে। ক্রমে সেরূপ একটা আন্দোলন অবশ্যই উঠিবে। শাস্ত্র বচনের ইচ্ছানুরূপ অর্থ করায় লোকের অভাব নাই। এই দুই শ্লোকের যে প্রকার কদর্থ করা হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণ। টীকা পড়িয়া দেখিলেই ও অন্যান্য স্মৃতিবচনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিলেই প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি হইত।

অশৌচ কমাইবার পক্ষে আর একটী যুক্তি এই যে সারা ভারতবর্ষে সকল বর্ণই দশাহ অশৌচ পালন করে। মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে আহবমান কাল হইতে যে কুলাচার চলিয়া আসিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট কারণ নহে। নানা দেশে নানা প্রকার কুলাচার প্রচলিত আছে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে খুড়াত পিসাত ও মামাত ভগ্নীকে বিবাহ করার একটা প্রথা আছে।

In Madras there is a custom prevailing among the Brah'manas, of marriage of a man with his maternal uncle's or paternal aunts' daughter.

Golap Sastri Hindu Law 3rd. edition page 97.

এখন কি আমাদিগকে মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের বিধি উপেক্ষা করিয়া মান্দ্রাজের দৃষ্টান্তে কুলাচার পরিত্যাগ করিতে হইবে?

আমাদের জাত্যুক্ত ১৫দিন অশৌচ পরিত্যাগ করিবার কোনই কারণ নাই। আমাদের বৈশ্যবৎ আচার ও বৈশ্যবৎ অশৌচই পালনীয় এবং স্মরণাতীত কাল হইতে আমরা তাহাই করিয়া আসিয়াছি। শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বিশ্বাসীর পক্ষে কথাটা অতি গুরুতর? পক্ষ দশাহ অশৌচ ছাড়িয়া ইচ্ছামত ১০ দিন অশৌচ পালন করিলেই কি আমাদের একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিবার যোগ্যতা হইবে এবং তাহাতে আমাদের পিতৃলোকের প্রেতত্ব মোচন হইবে? যাঁহারা শ্রাদ্ধাদিতে আস্থাহীন, তাঁহাদের কথা পৃথক; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রে আস্থাবান, তাঁহারা কোন্ সাহসে অশৌচ কালের মধ্যেই শ্রাদ্ধ করিবেন? ইহাতে তাঁহাদের পিতৃপুরুষের গতি লাভ হইবে কি?

বৈদ্য প্রবোধিনী ভগবদ্গীতার ১৷৪২৩ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥

শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্য পণ্ড হয় ইহা আমরাও বলি। এই বাক্য, যাঁহারা শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া চিরকালের কুলাচার পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য, কি, যাঁহারা শাস্ত্র বিধি মানিয়া চলিতেছেন তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

(৪) বৈদ্যগণের শর্ম্মা উপাধি গ্রহণের অধিকার।

মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রে চারি বর্ণের চারিটী উপাধির ব্যবস্থা আছে যথা ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস। এবং দ্বিজাতিগণের স্ত্রীর নামের অন্তে দেবী ও শূদ্র জাতির দাসী প্রযুক্ত করার বিধান আছে।* বৈদ্যগণ এতকাল বৈশ্যের গুপ্ত উপাধিধারী ছিলেন, এখন তাহারা শর্ম্মা লিখিয়া ব্রাহ্মণ হইবার অভিলাষী। বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ ও বৈশ্য ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদের পক্ষে শর্ম্মা উপাধি গ্রহণ করা অশাস্ত্রীয় হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শর্ম্মা উপাধিতে আমাদের ন্যায্য দাবী থাকিলে এতকাল তাহা পরিত্যক্ত হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। অনভিজ্ঞতাই কারণ, ইহা বলা যাইতে পারেনা, কারণ বৈদ্যদিগের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। কাজেই শর্ম্মা উপাধিতে আমাদের ন্যায়তঃ কোন অধিকার নাই। এই উপাধি ব্যবহারের আন্দোলন শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজে আর একটী দলাদলি বাধাইবার প্রচেষ্টা মাত্র। কাল মাহাত্ম্যে কোন বর্ণই এখন স্বাধিকারে সন্তুষ্ট নহে; সকলেরই উচ্চ বর্ণ হইবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা

* দেব্যান্ত স্ত্রিয়ঃ শর্ম্মা দাস্যাঃ শূদ্রযোষিতঃ।

জন্মিয়াছে। বঙ্গদেশে বৈদ্যগণের দ্বিতীয় স্থান ও ব্রাহ্মণোচিত অনেক অধিকার রহিয়াছে। সংস্কৃত কলেজে যখন অন্য জাতির প্রবেশাধিকার ছিল না, তখনও বৈদ্য জাতির অধ্যয়নের কোন বাধা ছিল না। যতদিন বৈদ্যসমাজে সাধন ভজন ছিল ততদিন কেহ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে অন্তরায় মনে করেন নাই। রাম প্রসাদ প্রভৃতি অসংখ্য সাধক বৈদ্য সমাজে ছিলেন। সাধন মার্গে ও মন্ত্র শাস্ত্রে আমাদের যথেষ্ট অধিকার ছিল। এখন ঝগড়া হইতেছে ২টী বিষয় নিয়া। (১) দশাহ অশৌচ (২) শর্ম্মোপাধি। কৈ সেকালে আমাদের পিতৃ পুরুষগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এই দুইটী বিষয়ে ত কোন বাধা হয় নাই। সমস্ত প্রকার সাধন ভজনে আমাদের অধিকার রহিয়াছে। আমাদের সাবিত্রী দীক্ষা প্রচলিত আছে, বেদ অধ্যয়নে আমাদের অধিকার আছে। দ্বিজাতি মাত্রেরই প্রণব ইত্যাদিতে অধিকার রহিয়াছে। তবে এ কলহ কেন? আর পিতৃ পিতামহের আচরিত পথ পরিত্যাগ করার আবশ্যকতা কোথায়?

যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে ॥

বৈদ্য প্রবোধনী অর্থ করিয়াছেন—

পিতা পিতামহ প্রভৃতি যে পথে গমন করিয়াছেন **তাহা যদি সৎ পথ হয় তবে** সে পথে গমন করিলে কোন দোষ হয় না। বৈদ্যের বৈশ্যাচার যখন কদাচার বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে তখন পিতা পিতামহ তাহা পালন করিলেও তাহার পরিবর্ত্তনে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

অসহযোগ প্রবর্ত্তনের সময় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইয়াছিল, ১৬ বৎসর বয়সের পরে পিতা মাতার কথা শুনার কোন প্রয়োজন নাই, বিবেক মত কাজ করিবে। প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ। এই শ্লোকের এইরূপ অর্থই প্রচারিত হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা কত যুবক কুপথে চালিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। এখন আবার ভগবান্ মনুর উক্তরূপ ব্যাখ্যা হইতেছে। টীকাকার কিন্তু ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"বহুবিধশাস্ত্রার্থসম্ভবেপিতৃপিতামহাদ্যনুষ্ঠিত এবশাস্ত্রার্থোঽনুষ্ঠাতব্যঃ। তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে নাধর্ম্মেণ হিংস্যতে॥

শাস্ত্রের বহুবিধ অর্থ সম্ভব হইলে পিতৃ পিতামহগণের অনুষ্ঠিত আচার অনুষ্ঠান করিবে। তাহা করিলে অধর্ম্ম করা হইবে না অর্থাৎ পাপভাগী হইতে হইবে না। ইহার মধ্যে যদি নাই। পিতা পিতামহ যে পথে চলিয়াছেন তাহাই সৎপথ।

উপসংহার।

(১) বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ বর্ণ। "একতর" ব্রাহ্মণ নহে।

(২) বৈদ্যগণ নিকৃষ্ট চিকিৎসক ব্রাহ্মণ নহে।

(৩) বৈদ্যগণের সংস্কার বৈশ্যানুরূপ।

(৪) বৈদ্যগণের প্রকৃত সম্পূর্ণ অশৌচ পঞ্চদশাহ। একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করা শাস্ত্র বিগর্হিত এবং তাহাতে পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব মোচনের ব্যাঘাত ঘটিবে।

(৫) বৈদ্যগণের উপাধি গুপ্ত, শর্ম্মা নহে। ইহা শাস্ত্র ও লোকাচারানুমোদিত।

(৬) সমাজে বৈদ্যের স্থান ব্রাহ্মণের নিম্নে এবং ব্রাহ্মণ বৈদ্যের নমস্য।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজ বল্লভ নিমন্ত্রিত মহারাষ্ট্রাদি নানা দিগ্‌দেশীয় পণ্ডিতৈর্ব্যবস্থা পত্রিকা।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবেতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনান্মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদানাং যজ্ঞোপবীতাদিসংস্কারঃ প্রাপ্তঃ। তথাহু র্কৈক্তদ্বচনব্যাখ্যা মিতাক্ষরায়াং—যত্তু বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, এবং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং জাতো বৈশ্যএব ইত্যাদি শঙ্খস্মরণাৎ তৎক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থং নতু ক্ষত্রিয়াদি জাতিপ্রাপ্ত্যর্থং। অতশ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনাং ক্ষত্রিয়াদেরুক্তৈরেব দণ্ডাজিনোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্য ইতি।

অত্রচ মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনামিত্যাদি পদাৎ পারশবস্য তত্তৎসংস্কারপ্রাপ্তৌ তস্যৈব নিষেধমাহ, মনুঃ—"স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ।" অন্যচ্চ বিপ্রাদিত্যাদি বচনব্যাখ্যানে দীপকলিকায়াং বিপ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়ামূঢ়ায়াং মূর্দ্ধাবসিক্তঃ, বিপ্রাদূঢ়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়ামম্বষ্ঠঃ এবং শূদ্রায়াং নিষাদঃ, অনূঢ়ায়াং তস্যাং পারশবঃ। পারশব ইতি সংজ্ঞান্তরং বিশিষ্টসংস্কারানধিকারার্থং এতেন মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদনামেব সংস্কারঃ। পুনরপি মনুঃ—"সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা। তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বসংস্কার মর্হতি।" কুল্লুকভট্টো যথা—শোভনং বীজং শোভনক্ষেত্রে জাতং সমৃদ্ধং ভবতি এবং দ্বিজাৎ দ্বিজাত্যাস্ত্রিয়াং সবর্ণায়ামানুলোম্যেন চ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্জ্জাতঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যসংস্কারং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ সর্ব্বমর্হতি নচ পারশবচণ্ডালাদিভিঃ; অত্রার্য্যপদং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যপরং। এতেনাম্বষ্ঠানামুপনয়নাদি সংস্কার ইতি মনুনা মুক্তকণ্ঠেনোক্তং

যেষান্তু পিত্রাদয়োহপ্যনুপনীতা স্তেষামাপস্তম্বোক্তং—যস্য পিতাপিতামহৌ অনুপনীতৌ স্যাতাংতস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যং ব্রহ্মচর্য্যং যস্য প্রপিতামহা দের্ণানুস্মরণং তস্য ষড়্ বার্ষিকং ত্রৈবিদ্যং ব্রহ্মচর্য্যমিতি যাজ্ঞবল্ক্য তৃতীয়াধ্যায় মিতাক্ষরাদি প্রমাণানুসারেণ। শ্রীমদ্ভরতমল্লাদ্যম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীত মাসীদিতি লৌকিকাখ্যায়িকা তৎপ্রমাণমপ্যস্তি। পশ্চাৎ তৎপুত্রেণ লক্ষ্মণসেনেন পিত্রা সহ লৌকিকবিরোধাৎ কেষাঞ্চিদ্দূরীকৃতং কেষাঞ্চিদদ্যাপি পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বর্ত্ততে তথা দৃশ্যতে চ। কড়ইধাত্রী গ্রাম নিবাসিনাং অম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতাদিকমিতি লোক দর্শনেন চ। অনুপনীতাম্বষ্ঠ-জাতানামনুপনীতাম্বষ্ঠানাং প্রপিতামহাদীনামুপনয়নাত্মক সংস্কারাস্বয়ংশেন ব্রাত্যাতিপাতক ক্ষয়ার্থিনাং ষড় বার্ষিক ব্রতাদ্যাচরণাশক্তৈর্বতি ধেনুদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং তদশক্তৌ আঢ্যানাং পঞ্চদশাধিক চতুঃশতকার্ষাপণী মধ্যানান্তু সপ্তত্যধিকশতদ্বয়কার্ষাপণী, দরিদ্রানাঞ্চ নবতি কার্ষাপণী দেয়েতি। তদনন্তরং যজ্ঞোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্য ইতি। উপনীতাম্বষ্ঠানাং তৎসন্ততীনাঞ্চ বৈশ্যবদ-শৌচাদ্যাচরণং তেষাঞ্চ সম্পূর্ণাশৌচং পঞ্চ-দশাহ মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ। পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতঞ্চরেদিতি বশিষ্ঠসূত্রাদ্যনুসারেণ পতিতসাবিত্রীকেণ উদ্দালকব্রতাদ্যাচরণাশক্তৌ আঢ্যেন চতুঃপণাধিকাষ্টচত্বারিংশৎকার্ষাপণী মধ্যেন দ্বাদশপণাধিকসপ্তবিংশতিকার্ষাপণী, দরিদ্রেণ চ চতুঃপণাধিক নবকার্ষাপণী দেয়েতি। তেষাং তদনন্তরমুপনয়নাদি সংস্কারঃ কার্য্য ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ। (১)

---

(১) "ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভ-জাত সন্তান অম্বষ্ঠ, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নিষাদ ও পারশব নামে খ্যাত।" এই

এই ব্যবস্থা পত্রে মহারাষ্ট্র, কাশী, কাঞ্চী, কনোজ, দ্রাবিড়, শ্রীক্ষেত্র, বীরভূম, সেনভূমি, নবদ্বীপ, বৰ্দ্ধমান, ত্রিবেণী, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের ১২৬ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর ছিল।

অম্বষ্ঠাচার ধৃত ব্যবস্থা

অথ নবদ্বীপস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতৈর্ব্যবস্থা পত্রিকা।

কৃতোপনয়নামম্বষ্ঠাদীনাং প্রণবাদি স্বাহান্ত মন্ত্রেণাপি বিষ্ণুঃ পূজনীয় ইতি অম্বষ্ঠঃ শূদ্রস্য নমস্যশ্চেতি চ বিদুষাম্পরামর্শঃ।

অশৌচ ব্যবস্থা (অম্বষ্ঠ দীপিকা উদ্ধৃত)

উপনীতোম্বষ্ঠেন সপিণ্ডজনন সম্পূর্ণাশৌচ জনন যোগোপনীতোপনীত সপিণ্ড মরণাশৌচং পঞ্চদশ রাত্র মেব ব্যবহার্য্য ইতি ব্যবস্থা।

অম্বষ্ঠ সাম্মিলনী সভা হইতে নীত পাতি। বহু পুরুষানুক্রমেণ উপনয়-নাদি ক্রিয়া লোপ জনিত পাপ ক্ষয়কামা গঙ্গাভক্তাঃ পাপকর্ম্মরতভিন্না-অম্বষ্ঠাস্তৎ পাপক্ষয়ায় গঙ্গাস্নানং কৃত্বা উপনয়নার্হাভবন্তি উপনয়নান্তরঞ্চ তাদৃশানাং সপিণ্ডাদি জনন-মরণয়োঃ পঞ্চ দশাহাদ্য শৌচ মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

৺ উমেশ চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত বল্লাল-মোহ-মুদ্গর (জাতিতত্ত্ব বারিধি দ্বিতীয় ভাগ) পৃষ্ঠা ৬৩

যাজ্ঞবল্ক্যবচনানুসারে মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও নিষাদপ্রভৃতির যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। মিতাক্ষরায় ঐ বচনের সেইরূপ ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। শঙ্খ লিখিত গ্রন্থে যে লিখিত আছে, "বিপ্রহইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাতে জাত সন্তান বৈশ্য" ইহা কেবল তাহাদের ধর্ম্মপ্রাপ্তি-সূচক, ক্ষত্রিয়াদি জাতিত্বসূচক নহে। অতএব মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতির ক্ষত্রিয়াদি জাতির ন্যায় উপনয়ন, দণ্ড, অজিন, উপবীত ধারণ প্রভৃতি সংস্কার কর্ত্তব্য। এ স্থলে মূর্দ্ধাবসিক্তাদির 'আদি' পদদ্বারা পারশব জাতিরও ঐ সংস্কার সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু মনু তাহা নিষেধ করিয়াছেন। স্মৃতি অনুসারে ঐ জাতি 'পারয়ন' অর্থাৎ শক্তি সত্ত্বেও 'শব' (মৃত)। অন্যত্র দীপকলিকা নামক গ্রন্থে 'বিপ্রাৎ' ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণের বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত ক্ষত্রিয়া পত্নীতে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও বিধি পূর্ব্বক বিবাহিত বৈশ্যা পত্নীতে অম্বষ্ঠ, বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত শূদ্রা পত্নীতে নিষাদ এবং অবিবাহিতা শূদ্রা রমণীতে পারশবের উৎপত্তি হইয়াছে। 'পারশব' এই পৃথক্ সংজ্ঞাদ্বারা বিশিষ্ট সংস্কারের অনধিকারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতদ্বারা মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং নিষাদজাতি-ত্রয়ের সংস্কার প্রমাণিত হইতেছে। মনু পুনরায় বলিয়াছেন, স্বক্ষেত্রে স্ববীজ রোপিত

শ্রীশ্রীহরি-শরণম্

বহু মান্যস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত সমীপেষু

মাননীয় মহাশয় !

আপনি জানিতে চাহিয়াছেন যে আমরা বল্লাল সেনের জ্ঞাতি কিনা ? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে আমাদের বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ বলিতেন যে আমরা তাঁহার বংশধর এবং আমাদের বংশের বর্ত্তমান প্রাচীন মহোদয়গণও এই বাক্যের সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের অনুসন্ধানেও ইহা প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমাদেরও ইহাই বাল্যাভিজ্ঞতা।

ইতি—

আজ্ঞাধীন—

শ্রীদ্বারকানাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

শ্রীমহেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত শিক্ষক।

ইচাপুর হাই স্কুল

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন গুপ্ত, শিক্ষক।

শ্রীকামিনী কুমার সেন গুপ্ত ডাক্তার।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার সেনগুপ্ত, হেডক্লার্ক।

মালপদিয়া ১৩১০ সন
২৭শে জ্যৈষ্ঠ বিক্রমপুর

হইলে যেমন উত্তম ফল প্রসব করে, তেমন আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত সন্তান সমস্ত সংস্কার পাইতে অধিকারী হয়। কুল্লুকভট্ট বলেন, যেমন সুন্দর বীজ উত্তমক্ষেত্রে রোপিত হইলে সমৃদ্ধিশালী হয়, তদ্রূপ দ্বিজ হইতে অনুলোমক্রমে অসবর্ণ দ্বিজাতিস্ত্রীতে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি জাতীয় সর্ব্বপ্রকার সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে লিখিত আছে। কিন্তু চণ্ডাল ও পারশব জাতির ঐরূপ সংস্কার পাওয়ার কথা তথায় লিখিত নাই। এই স্থলে 'আর্য্য' এই পদ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিত্রয়কে বুঝাইতেছে। এতদ্বারা অম্বষ্ঠজাতির উপনয়নাদি সংস্কার মনু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা পিতৃপুরুষ হইতে অনুপনীত, তাঁহাদের সম্বন্ধে আপস্তম্ব বলিয়াছেন—যাঁহাদের পিতৃপিতামহ পর্য্যন্ত অনুপনীত, তাঁহাদের ছয় বৎসর কাল ত্রৈবিদ্য ব্রহ্মচর্য্য করা বিধেয়। যাজ্ঞবল্ক্যের তৃতীয় অধ্যায় এবং মিতাক্ষরাদি প্রমাণানুসারেও ইহা সমর্থিত হইতেছে। শ্রীমদ্বল্লালাদি অম্বষ্ঠদিগের যে যজ্ঞোপবীত ছিল, তাহা লোকে বলিয়া আসিতেছে। ইহা যে প্রকৃত কথা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরে পুত্র লক্ষ্মণের সহিত বল্লালের লৌকিক বিরোধ উপস্থিত হইলে কোনও কোনও অম্বষ্ঠসন্তানের যজ্ঞোপবীত লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক দূরীকৃত হয় এবং

বৈদ্য প্রবোধনীতে যে কয়জন অধ্যাপকের পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "বঙ্গের অতি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শিরোমণি" শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কাশী বাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছেন—* * * * এক সময় আমার অত্যন্ত অসুখ অবস্থায় আমি শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াছিলাম। ঐ সময় আমার কোন বিষয় পর্য্যালোচনা বা প্রণিধান করিবার শক্তি একেবারেই ছিল না। সেই অবসরে ঐ কবিরাজ মহাশয়ের কয়েকটি ছাত্র আমার অবস্থা পরিদর্শন করিতে আসিত এবং প্রত্যেক দিনই আমাকে (১ খানি পত্র লিখিয়া আনিয়া) সহি করিবার জন্য জিদ করিত। এইরূপ করায় আমি তাহাদের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া সহি করিয়াছিলাম। তাহাতে যে কি লেখা ছিল, তাহা আমি দেখি নাই। কারণ আমার সাধারণতঃ দৃষ্টি শক্তির অভাবে দেখিবার শক্তিও আমার ছিল না। ইতি—

১৩৩৩।২৫ বৈশাখ,
৫নং বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার। } শ্রীদক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।

কোনও কোনও অম্বষ্ঠের পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে অদ্যাপি উপনয়ন প্রচলিত আছে। আমরা এখনও দেখিতে পাই যে কড়ই ও ধাত্রী প্রভৃতি গ্রামনিবাসী অম্বষ্ঠদিগের যজ্ঞোপবীতাদি প্রচলিত রহিয়াছে। অনুপনীত অম্বষ্ঠ হইতে উৎপন্ন যে সমস্ত অনুপনীত অম্বষ্ঠের প্রপিতামহের অনুপনয়ন হেতু ব্রাত্যদোষ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ক্ষয় করিবার নিমিত্ত ষড়্‌বার্ষিক ব্রতাদি আচরণ করা কর্ত্তব্য। কেহ তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহাদের নবতিসংখ্য ধেনু দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; যাঁহারা ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে অক্ষম তাঁহারা ধনবান্ হইলে চারিশত পঞ্চাশ কাহন, মধ্যবিত্ত হইলে দুইশত সত্তর কাহন এবং দরিদ্র হইলে নব্বই কাহন কড়ি দান করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইলে যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার করিতে হইবে। উপনীত অম্বষ্ঠ ও তাহার সন্তানসন্ততিগণ বৈশ্যের ন্যায় অশৌচাদি আচরণ করিবেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ অশৌচ পঞ্চদশ দিবস ব্যাপী। ইহাই পণ্ডিতদিগের অভিমত। বশিষ্ঠ বলেন, পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তির উদ্দালকব্রত আচরণীয়। যাঁহারা এই ব্রত আচরণ করিতে অশক্ত, তাঁহারা ধনবান্ হইলে চৌত্রিশ কাহন চারিপণ, মধ্য বিত্ত হইলে সাতাইশ কাহন বার পণ এবং দরিদ্র হইলে নয় কাহন চারি পণ কড়ি দান করিয়া উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ করিবেন। ইহাই পণ্ডিতমণ্ডলীর মত। (রসিক লাল গুপ্ত প্রণীত "রাজবল্লভ")

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে সমালোচনা।

উৎসব—১৩৩২। অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ।

গৌহাটী ধর্ম্ম সভা হইতে যে সমাজ সেবক পুস্তকাবলী বাহির হইতেছে তাহারই অন্যতম এই বিধবা বিবাহ পুস্তকখানি। এই পুস্তকে কালীচরণ বাবু বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ ও পরপক্ষের দোষ গুণ বিচার করিয়া সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা। এই পুস্তকে বিধবা বিবাহের পক্ষে যে পাঁচটি কারণ নির্দ্দেশ করা হয়, তাহারই সমালোচনা করা হইয়াছে। * * * গ্রন্থকার সকল প্রকার যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত নহে। যাঁহারা সমাজ সংস্কারক নাম লইয়া দেশের উন্নতির জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে চান তাঁহারা মূর্খ হইলে চলিবে না—তাঁহাদিগকে যুক্তি বিচার সাহায্যে দেখিতে হইবে বিধবা বিবাহে সমাজের কল্যাণ কি অকল্যাণ হয়। শ্রীযুক্ত কালীচরণ বাবু এই পুস্তক লিখিয়া যথার্থই সমাজের কল্যাণ সাধিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৈদিক আর্য্য হইতে অন্য পথে গিয়াছেন তাঁহারা ত কোন যুক্তি না মানিয়া বিধবা বিবাহ দিবেন কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া এই কর্ম্মে যোগ দিতে চাহেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই পুস্তক পড়িয়া বিধবা বিবাহের পক্ষে মত দিতে পারিবেন না। এইরূপ পুস্তক সকলের পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বীর ভূমি—৭ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা—শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক বি এ, ভাগবতরত্ন লিখিয়াছেন। বিধবা বিবাহ—শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ বি, এল্, প্রণীত। গৌহাটী সনাতন ধর্ম্ম সভা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গৌহাটী সনাতন ধর্ম্ম সভা হইতে "সমাজ সেবক" গ্রন্থমালা নাম দিয়া পূর্ব্বে আরও ছয় খানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। * * * * * আলোচ্য গ্রন্থ খানি সপ্তম। কটন কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। * * * * এই প্রকার

দুর্দ্দিনে গৌহাটী ধর্ম্ম সভা এই সারগর্ভ, সুযুক্তি ও শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ এই সদ্গ্রন্থখানি প্রচার করিয়া হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকার ও ভূমিকা লেখক বিধবা বিবাহের বিরোধী। যাঁহারা বাজার চল্‌তি হুজুগে না মাতিয়া সত্য নির্দ্ধারণে আগ্রহান্বিত তাঁহারা সকলেই এই গ্রন্থখানি পাঠ করুন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের তিনটী মন্ত্র বিধবা বিবাহের পরিপোষক রূপে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। বেদশাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকায় খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন যে ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় এই তিনটী মন্ত্রের প্রথমটীর ভুল অনুবাদ করিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। মহাভারতের নীলকণ্ঠের টীকার এক অংশ যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, ভূমিকায় তাহাও সুনিপুণ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরাশরের বচনের ও প্রকৃত অর্থ মূল গ্রন্থের মধ্যে আছে। যাঁহারা শাস্ত্রীয় মীমাংসা জানিতে চাহেন, এই গ্রন্থখানিকে তাঁহারা চূড়ান্ত (final) গ্রন্থ বলিয়া নির্ভয়ে গ্রহণ করিতে পারেন। এই বুদ্ধিভেদ সংঘটের যুগে, প্রত্যেক শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দু এই সদ্গ্রন্থ একখানি সংগ্রহ করিয়া রাখুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

গোহাটী সনাতন ধর্ম্ম সভা আমাদের দেশের একটী গৌরবের বস্তু। এ প্রকারের সভা বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসামের মধ্যে নাই। আর ধর্ম্ম পরায়ণ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন বি, এল, সরকারী উকিল মহাশয়ই এই সভার প্রাণ। আর পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বেদ শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ তাঁহারা সমগ্র হিন্দু সমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র, মা জগদম্বা তাঁহাদের কল্যাণ করুন, আর তাঁহাদের আদর্শ দেশের সর্ব্বত্র অবলম্বিত হউক।

———

মুখবন্ধ।

বিগত ভাদ্র মাসে "বৈশ্য" গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া আশ্বিন মাস হইতে প্রচারিত হইতেছে। ইতিমধ্যে যাঁহারা শর্ম্মা উপাধি নিয়াছেন তাঁহারা সমালোচনা বাহির করিতেছেন এবং শাস্ত্রের নানা প্রকার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া অভদ্রোচিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের "বৈশ্য প্রতিভা" এইরূপ প্রবন্ধের স্থান দিয়া কিরূপ প্রতিভান্বিত হইয়াছেন তাহার নমুনা এই পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। আমরা এখন শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া গায়ের জোরে ব্রাহ্মণ হইতে চাহিতেছি। সমালোচনার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া একটা উত্তর দেওয়া হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণ কোন্ ব্যাখ্যা প্রকৃত তাহা বিচার করিবেন।

সমালোচক ভগবান্ মনুর ৩ অঃ ১২৯ শ্লোকের "বিদ্বাংসং" শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা যে ভ্রান্ত আমি বর্ত্তমান পরিশিষ্টের ২৩-৩১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। মনুর ৩ অঃ ১৪৫-১৫১ শ্লোকের আলোচনা দ্বারাও আমার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে।

১৪৫ শ্লোকে বলিলেন শ্রাদ্ধে অতি যত্নের সহিত বেদপারগ ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে অথবা সমুদায় শাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে কিংবা সমাপ্তাধ্যায়ন সামবেদী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।

১৪৬ শ্লোকে—এই তিন ব্রাহ্মণের একজনও যাঁহার শ্রাদ্ধে অর্চ্চিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহার পিত্রাদি সপ্তপুরুষের চিরস্থায়িনী তৃপ্তি লাভ হয়।

১৪৭।১৪৮ – হব্য, কব্য প্রদানে পূর্ব্বোক্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণই মুখ্যকল্প জানিবে। তদভাবে সাধুজনানুষ্ঠিত বক্ষ্যমাণ অনুকল্প বিধি এই যে,

মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, মাতৃষ্বস্ পিতৃষ্বস্, পুত্রাদি, বন্ধু, পুরোহিত ও শিষ্য ইহাদিগকে ভোজন করাইবে।

১৪৯—ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈব ক্রিয়ায় ভোজনীয় ব্রাহ্মণগণের তত পরীক্ষা করিবেন না, কিন্তু পিতৃকার্য্যে তাহাদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিবেন।

১৫০—যে সকল ব্রাহ্মণ চুরি করে, যাহারা পতিত, যাহারা ক্লীব, যাহারা নাস্তিক-বৃত্তি-অবলম্বী তাহারা দৈব ও পৈত্র উভয় কার্য্যেই অগ্রাহ্য, একথা মনু বলিয়াছেন।

১৫১—বেদাধ্যয়ন শূন্য, ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়া পরায়ণ এবং বহু যাজনশীল ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না।

১৫২—চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, প্রতিমা পরিচারক, দেবল ব্রাহ্মণ, মাংস-বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্রাহ্মণ নিন্দিত বাণিজ্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদিগকে হব্যে কব্যে পরিত্যাগ করিবে।

মনু আরও কয়েকটী শ্লোকে যাহারা বর্জ্জনীয় তাহাদের তালিকা দিয়াছেন অপ্রাসঙ্গিক বোধে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। ১৪৫।১৪৬ শ্লোকের উল্লিখিত বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্য কল্পে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করায় বিধি দিয়া ১৪৭।১৪৮ শ্লোকে বলিলেন ঐ সকল মুখ্যকল্পের ব্রাহ্মণের অভাব হইলে এই দুই শ্লোকের কথিত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইবে। ইহার পরে ১৫০।১৫১।১৫২ ও পরবর্ত্তী আর কয়েকটী শ্লোকে হব্য কব্যে বর্জ্জনীয় ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা ব্রাহ্মণ হইয়া চিকিৎসক হইলে ১৫২ শ্লোকের বর্জ্জনীয় চিকিৎসক পতিত ব্রাহ্মণ মধ্যে পড়িয়া যাইব এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আজ ২৫ বৎসর হইল ১৯০১ সনে রিজলী সাহেবের তত্বাবধানে

ভারতবর্ষে সেন্‌সাস্ হয়। ঐ সময় বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ কোন জাতি এবং সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়, তাহা নিয়া কায়স্থগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তখন বৈদ্য ও কায়স্থগণ স্ব স্ব পক্ষের পোষকতায় নানা প্রকার প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এটা উভয় পক্ষের স্বীকার্য্য ছিল যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণের নীচে ; তবে বৈদ্য কি কায়স্থ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহাই বিচার্য্য বিষয় ছিল। বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যাচারী ইহা তখনকার কথা ছিল। ব্রাহ্মণত্বের দাবী, কিংবা রাজা গণেশের কোন প্রসঙ্গ সে সময় উপস্থাপিত হয় নাই ; সত্য হইলে অবশ্যই হইত। কি কারণে বল্লালসেনের সময়ে কতক বৈদ্যের পৈতা নষ্ট হয় তাহাও রিজ্‌লী সাহেবের রিপোর্টে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ন্যূনাধিক চারি শত বৎসর পরের রাজা গণেশের ঘটনা কেহ ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই। ১৪১৫ খৃঃ পূর্ব্বে আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলাম ও আমাদের ব্রাহ্মণাচার ছিল ইত্যাদি প্রসঙ্গ যাহা বর্ত্তমানে প্রচারিত হইতেছে তাহা সে সময় উপস্থাপিত হইলে রিপোর্টে তাহার উল্লেখ থাকিত। ব্রাহ্মণগণের সহিত সে সময় আমাদের কোন বিরোধ ছিল না ; প্রত্যুত, ব্রাহ্মণগণ, বৈদ্যগণের সমাজে যে দ্বিতীয় স্থান ছিল, তাহাই সমর্থন করিয়াছিলেন।

রিজ্‌লী সাহেবের রিপোর্টের কিয়দংশ এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত করা হইল। রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে ঐ সময়ে বিচার্য্য বিষয়ের নিম্নলিখিত মত সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

১। বৈদ্যগণ মনু কথিত অম্বষ্ঠ ও তাহারা অনুলোমজাতবর্ণ।

২। দেশভেদে বৈদ্যগণ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত (১) রাঢ় (২) বঙ্গ (৩) বরেন্দ্র ও (৪) পঞ্চকোট এবং তাঁহারা অন্য জাতি সহ যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন না।

৩। বৈদ্য বংশীয় রাজগণ ১০১০-১২০০ খৃঃ মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহা[illegible]মধ্যে সর্ব্বোপরি প্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেন নীচ জাতীয়া কন্যা

পদ্মাবতীকে গ্রহণ করায় তাঁহার পুত্র লক্ষণসেন সহ বিরোধ হয় এবং তদবধি বৈদ্যগণ ২ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন :—(১) যাঁহারা পৈতা ত্যাগ করিয়া মাসাশৌচ গ্রহণ করেন। (২) যাহারা পৈতা রক্ষা করিয়া পূর্ব্ববৎ পনর দিন অশৌচ পালন করিতে থাকেন।

৪। এই বিভাগের পূর্ব্বে সকল বৈদ্যই এক শ্রেণীভুক্ত ছিল; তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হইত কারণ তাঁহারা মর্য্যাদায় সকলেই তুল্য ছিলেন এবং সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ ও বৈশ্যের জাত্যুক্ত অশৌচ পালন করিতেন।

ইহা রিজ্‌লী সাহেবের নিজের কথা নহে। তিনি লিখিয়াছেন—

"Before this time, it is said all Baidys formed a single group, the members of which intermarried with one another, as all were equal in rank. All wore the thread and observed the term of mourning characteristic of the Vaisyas."

তিনি লিখিয়াছেন it is said—তাঁহার নিকট এইরূপ উক্ত হইয়াছিল। বৈদ্যগণের অন্য কোনরূপ প্রসঙ্গ থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই তিনি উল্লেখ করিতেন।

৫। বৈদ্যগণের ক্রিয়াকাণ্ড ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইত।

৬। বৈদ্যগণের জাতীয় ব্যবসা চিকিৎসা ছিল।

৭। সমাজে বৈদ্যগণের স্থান ব্রাহ্মণের নীচে ও কায়স্থের উপরে। আমাদের ব্রাহ্মণত্বের দাবীর সত্যতা থাকিলে সে সময় তাহার উল্লেখ হইত। এতদ্বারাও বর্ত্তমান আন্দোলনের অসারত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

আমরা এখন ব্রাহ্মণদিগকে গালি দিয়া বড় হইতে চাহিতেছি।*

আমরাই এখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া দাঁড়াইয়াছি অপর ব্রাহ্মণগণ "বজন ব্রাহ্মণ" "কেশেল ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি সুমিষ্ট ভাষায় সম্ভাষিত।

নব পর্য্যায়ের শর্ম্মাগণের কেহ বলিতেছেন "রাঢ় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের প্রত্যেক ঘরে যবন শোণিত প্রবহমান। কোচ, কোল, হাড়ী, রজক ও যবন বলাৎকার দোষে ও কৌলীন্যানুষঙ্গী নানা দোষে যে ব্রাহ্মণ সমাজের কিছুই নাই তাহারা ব্রাহ্মণাচার ও শর্ম্মা বলিলে অতি হাস্যাস্পদ হয় না কেন?"

আবার প্রয়োজনমত খোসামোদও করিতেছেন, যথা:—"যে সকল সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহপ্রদ পত্র লিখিয়াছেন তাঁহারা সমিতির ধন্যবাদের পাত্র। যথার্থ সৎ-ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়াই আজও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বর্ত্তমান।"

ব্রাহ্মণনিন্দা উন্নতির সোপান নহে। মহতের অতিক্রমের ফল অমঙ্গলজনক বলিয়া শাস্ত্র বর্ণনা করিতেছেন।

> আয়ুঃশ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
> হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

মহতের অবমাননায় পুরুষের আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক, কল্যাণ এবং সমুদয় ইষ্ট নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের ব্রাহ্মণ নিন্দার ফল মঙ্গল জনক হইবে কি না তাহা বিবেচ্য।

শাস্ত্রার্থের প্রকৃত মর্ম্ম বাদ বিসম্বাদ ও গালাগালি দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। যাহারা প্রকৃত শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছেন এবিষয়ে তাঁহাদের সাক্ষ্যই প্রামাণ্য। এই পরিশিষ্টে বঙ্গদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মত সন্নিবেশিত হইল। তদ্দ্বারা পাঠকগণ প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন

গৌহাটী, কামরূপ।
১লা বৈশাখ, ১৩৩৪।

শ্রীকালীচরণ সেনগুপ্ত।

বৈদ্য-প্রতিভার

৩য় বর্ষ কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ

সংখ্যায় বৈদ্য গ্রন্থের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে

তাহার প্রত্যুত্তর।

সমালোচক—

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন দাশ শর্ম্মা এম এ, চট্টগ্রাম।

১। ফরিদপুর জেলা বাসী গৌহাটী প্রবাসী উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ বি, এল, মহাশয় প্রণীত "বৈদ্য" নামক এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। উৎসর্গ পত্রে জানা যায় গ্রন্থকার রাজা রাজবল্লভের অধস্তন্ ষষ্ঠ পুরুষ হন্। তিনি রাজা রাজবল্লভের নামান্তে "সেন গুপ্ত" লিখিয়া ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা রাজবল্লভ স্বীয় নামান্তে "সেনগুপ্ত" লিখিতেন, এরূপ কোন প্রমাণ্য প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া অন্যায়

উত্তর।

১। বৈদ্যগণ চিরকাল সেনগুপ্ত, দত্তগুপ্ত ও দাশগুপ্ত প্রভৃতি লিখিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা নব পর্য্যায় "শর্ম্মা" হন নাই তাঁহারা আজও লিখিতেছেন। লেখক বৈদ্য হইলে তাঁহার পক্ষে এরূপ অজ্ঞতা অমার্জ্জনীয়। তিনি "দ্বিচারিণী" শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার লেখনীকে কলঙ্কিত করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। গুপ্ত কোন মানুষের নাম নহে, বৃত্তি বাচক বৈশ্যোপাধি। আমরা বৈদ্য বলিয়া বরাবর গুপ্ত লিখিয়া আসিতেছি। বৈদ্য গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। লেখকের ঘরের দুয়ারে স্বনামখ্যাত জে, এন, সেন

কল্পনার ভিত্তি লইয়া ঐতিহাসিক ব্যভিচার করিয়াছেন। সেন যেমন একজন আদি বৈদ্যের নাম,গুপ্তও তদ্রূপ একজন আদি বৈদ্যের নাম দুই আদি পিতার নাম একত্র সংযোগ করিয়া আত্ম পরিচয় দিলে, আদি জননীকে দ্বিচারিনী সাব্যস্ত করা হয়। তাই গ্রন্থকার নিজে গুপ্ত উপপদবী লুপ্ত করিয়া কেবল "সেন" লিখিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন। গুপ্ত বর্ত্তমান থাকিতে তিনি যে ইহা জানেন না, বিশ্বাস করা যায় না। আমরা যেমন অম্বষ্ঠ নাম মুছিয়া ফেলিতেছি, "গুপ্ত" পদবী অস্বীকার করাও সেইরূপ একটা প্রচেষ্টা বোধ হয়।

ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের জাত্যুক্ত শর্ম্মা উপাধি সর্ব্বদা লিখেন না, আমরাও লিখি না—ইহাতে কোন মতলব নাই। যিনি বৈদ্য জাতির এই সর্ব্বলোক বিদিত সত্য পরিজ্ঞাত নহেন বা জানিয়া শুনিয়া অস্বীকার করিতেছেন,তাঁহার বৈদ্য জাতি সম্বন্ধে গবেষণার মূল্য কতটুকু তাহা হিন্দুসমাজ বিচার করিবেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণামতে দ্বিচারিনী মাতার সন্তান হইয়া পড়িলেন।

বঙ্গীয় সমাজে যে সকল বৈদ্যের যজ্ঞোপবীত হয় নাই তাঁহারাও সেনগুপ্ত,দাশগুপ্ত প্রভৃতি উপাধি লিখিতেছেন, মহারাজা রাজবল্লভ "সেনগুপ্ত" লেখা অসার কল্পনা নহে; সমালোচকের উক্তিই বকলোস করিল।

২। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে আচার অবলম্বন করিয়াছেন তাহা **ব্রাহ্মণাচার** নহে।

বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে শূদ্রাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এইক্ষণও সাত শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই ; * * * *

রাজা রাজবল্লভ পর্য্যন্ত শূদ্রাচার ছিল। রাজা রাজবল্লভই শূদ্রাচার পরিহার করিয়া বৈশ্যাচার গ্রহণ করেন।

১৪১৫ খৃঃ কতিপয় যজন ব্রাহ্মণের ক্রূর নীতিতে রাজা—গণেশের আদেশে লক্ষণী থাকের বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ যে বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা কি অস্বীকার করা যায় ?

* * *

১৪১৫ খৃঃ যে বঙ্গীয় বৈদ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণাচার প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

* * * *

যিনি অন্যূন দুইশত বৎসরের

২। আমি লিখিয়াছিলাম "তাহা ভ্রষ্টাচার নহে"।

সমালোচক ভ্রষ্টাচার স্থানে ব্রাহ্মণাচার বসাইয়া গবেষণার উৎস খুলিয়াছেন।

মহারাজা রাজ বল্লভ যখন যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন তখন তিনি মাসাশৌচধারী ছিলেন সত্য ; কিন্তু তখন রাঢ় দেশে বৈদ্যগণের জাত্যুক্ত বৈশ্যাচার অখণ্ডিত ছিল। আধুনিক শর্ম্মাগণও রাঢ় দেশের প্রচলিত ঐ আচার ৫।৭ শত বৎসরের প্রাচীন স্বীকার করিয়াছেন।

এরূপ স্থলে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অম্বষ্ঠাচার (বৈশ্যাচার) যে আবহমান চলিয়া আসিতেছিল তাহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত।

রাজা গণেশের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে মূল গ্রন্থের ৪৩-৪৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা আছে। ঐ কল্পিত রাজাজ্ঞা চকিতের মত দেখা দিয়া চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৪১৫ খৃঃ পূর্ব্বে বঙ্গীয় বৈদ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণাচার প্রচলিত

অবলম্বিত আচারকে সহস্র সহস্র বৎসর লিখিতে পারেন তিনি যে সত্যকে মিথ্যা আবরণে ঢাকিয়া একটা খিচুড়ী বানাইতে পারিবেন না, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। এরূপ একটা ঘটনা পণ্ডিত ভরত মল্লিক ও মহারাজা রাজবল্লভের জানা থাকিত। ভরত মল্লিক ১৬৭৫ খৃঃ স্বরচিত ভট্টির টীকায় নিজকে অম্বষ্ঠ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। গায়ের জোরে আমরা ১৪১৫ খৃঃ পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলাম বলাই ঐ কথার যথেষ্ট প্রমাণ নহে।

সমালোচক লিখিয়াছেন ইহার "প্রমাণের অভাব নাই।"

সম্পূর্ণ অভাব।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে রিজলী সাহেবের অধ্যক্ষতায় যখন সেনসাস হয় সে সময় বঙ্গদেশের সমাজে বৈদ্য কি কায়স্থ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে ইহা নিয়া বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময় ১৪১৫ খৃঃ কি তৎপূর্ব্বে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ ছিল তাহা ঘুণাক্ষরেও কেহ প্রকাশ করেন নাই। ইহার বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের মুখবন্ধে দ্রষ্টব্য। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ২৫ বৎসর

পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণত্বের দাবী আমাদের খেয়ালে আসে নাই।

১৪১৫ খৃঃ বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণাচার প্রচলিত থাকার উক্তি সম্পূর্ণ আধুনিকও অপ্রামাণ্য।

৩। বঙ্গের শতশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কি বঙ্গীয় বৈদ্যদের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করেন না?

৩। তাঁহারা কি কেহ আমাদের শর্ম্মা ভ্রাতৃগণ সহযৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন বা ঐ শর্ম্মাগণের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন? যে পর্য্যন্ত ইহা সপ্রমাণ না হইবে সে পর্য্যন্ত ঐ সকল স্বীকারোক্তির (সত্য হইলে) কোন মূল্য নাই। শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থের পত্রে (বৈদ্য গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠা) আমরা এসকল কথার রহস্য কতক পরিমাণে বুঝিয়াছি।

৪। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী * * গুরুগম্ভীর নাদে বলিয়াছেন— বৈদ্যগণ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।

৪। সমালোচক যদি এই রূপ প্রমাণের উপর ব্রাহ্মণত্ব দাঁড় করাইতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদের এ আন্দোলন অচিরাৎ গণেশের রাজাজ্ঞার মত চিরতরে অন্তর্হিত হইবে। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী কোন্ সময় হইতে বঙ্গের সমাজ শাসক

পণ্ডিতের স্থান অধিকার করিলেন আমরা জ্ঞাত নহি।

৫। মাসাশৌচী পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রেতত্ব যদি রাজা রাজবল্লভ ও তাঁহার বংশধরগণ পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিয়া মোচন করিতে পারেন; তাহাতে যদি রাজা রাজবল্লভের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি পণ্ড না হয় * * * * তবে ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়া একাদশাহে আদ্য শ্রাদ্ধ করিলে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের মোচন হইবে না কেন? রাজবল্লভ ত্রিশ দিন অশৌচের অর্দ্ধেক ১৫দিন অশাস্ত্রীয় জানিয়া যদি রাজবল্লভ ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার বংশধরগণ ১৫ দিন অশৌচ অশাস্ত্রীয় জানিয়া কি ৫ দিন ত্যাগ করিতে পারেন না? ইহা কি জুজু ভয়? না ধর্ম্মভূষণ উপাধি প্রাপ্তির ফল?"

৫। বৈদ্যগণের যখন বৈশ্যাচার তখন মহারাজা রাজবল্লভ যথাশাস্ত্র যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণান্তরনিজ বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে নানা দিগ্ দেশাগত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা বৈদ্যগ্রন্থের পরিশিষ্টে আছে। 'কেন আর ৫ দিন অশৌচ ছাড়িতে পারিবনা' ইহা বুঝিতে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। মহারাজার জাত্যুক্ত সংস্কার গ্রহণ করায় অধিকার ছিল কিন্তু ইচ্ছামত বামুন সাজিয়া আর ৫ দিন অশৌচ কমান যায় না।

অশৌচ কাল মধ্যে কোন দৈব বা পৈত্র ক্রিয়ার কোন অধিকার থাকে না। ইহা জুজুভয় বা ধর্ম্মভূষণ উপাধি প্রাপ্তির ফল নহে। এই সামান্য সত্য যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না তাঁহার বুদ্ধির দৌড় সন্দেহ নাই।

৬। মহর্ষি অঙ্গিরা স্পষ্ট বলিয়াছেন সমস্ত বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণীয় দিগের সূতিকাশৌচ, মৃতাশৌচ দশদিন হইবে, ইহা মহর্ষি শাতাতপ বলিয়াছেন।

৬। ইহার আলোচনা বৈদ্য গ্রন্থের ৬৬—৬৮ পৃষ্ঠায় আছে। আমার আলোচনার কোন জবাব দেন নাই।

৭। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মহর্ষি শাতাতপের ব্যবস্থানুযায়ী সকল বর্ণীয়েরাই দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন।

৭। এসম্বন্ধে মূলগ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

আসামে ব্রাহ্মণের ১০ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন ও শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ প্রচলিত রহিয়াছে। নানা দেশে নানা প্রকার দেশাচার ও কুলাচার আছে। দক্ষিণ ভারতে অনেক ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে পলাণ্ডু ব্যবহার করেন। মাদ্রাজের মিষ্টান্নের দোকানে সব জিনিষ পলাণ্ডু মিশ্রিত; পম্পেশ্বর মহাদেবের বহিঃ প্রাঙ্গনে হিন্দুগণ অকাতরে কুক্কড়া পালে; রামেশ্বরে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুক্কড়া পালে; সমস্ত মাদ্রাজ প্রদেশে কাছা না দিয়া কাপড় পরে এবং এক স্থানে বাহে করিয়া কাপড় পড়িয়া আর একস্থানে আসিয়া জলশৌচ করে;

দেশ ভেদে ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত মামাত, খুড়াত ও পিসাত ভগ্নিকে বিবাহ করে ; ভারতের অনেক স্থানের ব্রাহ্মণ ও উচ্চজাতিগণ মাছ খায় না আমাদিগকে মৎস্যাহারী বলিয়া ঘৃণা করে। এইরূপ দেশ ভেদে কত প্রকার বিভিন্ন বিভিন্ন আচার রহিয়াছে ; অন্য দেশের দৃষ্টান্তে আমাদের নিজ মতলব মত কুলাচার পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না। আমাদের কুলাচার মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ দ্বারা সমর্থিত।

৮। কলিকালের জন্য যে পরাশর মুনির ব্যবস্থা বলবৎ সে মহর্ষি পরাশর পরাশর সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে বলিয়াছেন, বৈদ্যের অশৌচ সন্ত হইবে।

রঘুনন্দনও সন্ত অশৌচ প্রকরণে বৈদ্যের অশৌচ সণ্য হইবে উল্লেখ করিয়াছেন।

৮। পরাশর সংহিতার মত কলিতে সকল বিষয়ে প্রশস্ত নহে ; ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে "কলৌ পরাশরোক্তাং ব্রতানামেব মুখ্যতা"। তিনি ব্রত বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহারই প্রাধান্য।

এখন দেখা যাউক ২৭ শ্লোকে সত্য সত্য কি বলিয়াছেন। ২৭ শ্লোক তৃতীয় অধ্যায়ের, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ রূপ কোন শ্লোক নাই।

শ্লোকটী এই :—শিল্পিনঃ কারুকা বৈদ্যাদাসী দাসাশ্চনাপিতাঃ।
শ্রোত্রিয়াশ্চৈবরাজানঃ সদ্যঃ শৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। পরা ৩।২৭

অর্থঃ—শিল্পকর, কারুকর, বৈদ্য, দাসী, দাস, নাপিত, শ্রোত্রীয় এবং রাজা ইহাদের সদ্যঃ শৌচ।

ইহা অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা। ইহাদিগকে অশৌচ কাল মধ্যে না ছুইলে কাজ চলে না বলিয়া ঐ সকল ব্যক্তির অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকিবে না এই রূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন মাত্র। সমালোচক যে রঘুনন্দনের নাম করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন তাঁহার দ্বারাই অর্থ স্পষ্টীকৃত হইবে।

বৈদ্যা অপি চিকিৎসায়ামেব।
তথাচ স্মৃতিঃ-চিকিৎসকো যৎ কুরুতে তদন্যেন ন শক্যতে।
তস্মাচ্চিকিৎসকঃ স্পর্শে শুদ্ধো ভবতি নিত্যশঃ।
শুদ্ধিতত্বম্ সদ্যঃশৌচ প্রকরণম্।

এখানে বৈদ্য অর্থ চিকিৎসক, জাত বৈদ্য নহে—

চিকিৎসক যে কার্য্য করেন

তাহা অন্যে করিতে পারেনা এজন্য তাহার স্পর্শে দোষ নাই।

এই নীতি পরাশরের শ্লোকের উল্লিখিত অন্যান্য ব্যক্তি সম্পর্কেও বুঝিতে হইবে।

রঘুনন্দন আদিপুরাণহইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন :—

শিল্পিনশ্চিত্র কারাদ্যাঃ কর্ম্ম যৎ সাধয়ন্ত্যত। তৎ কর্ম্ম নান্যো জানাতি তস্মাৎশুদ্ধঃ স্বকর্ম্মনি। দাসা দাস্যশ্চ যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত্যপি চ লীলয়া। তদন্যোন ক্ষমঃ কর্ত্তুং তেন তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ।

শিল্পী, চিত্রকরগণ যে কর্ম্ম করে তাহা অন্যে জানে না বলিয়া নিজ কার্য্যে তাহারা শুদ্ধ। দাস দাসী যে কার্য্য অনায়াসে করিবে সেই কার্য্য অন্যে করিতে পারিবে না বলিয়া তাহারা শুচি অর্থাৎ তাহারা কাজকর্ম্ম করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে ছুঁইতে পারিবে।

শাস্ত্রার্থের এইরূপ অপব্যাখ্যার এই প্রথম দৃষ্টান্ত নহে। বৈদ্য প্রবোধিনীতে আমরা অনেক পাইয়াছি।

৯। বৈদ্যগণ সদ্য অশৌচ পালন না করিয়া দশাহাশৌচ গ্রহণ করিবেন কেন? তদুত্তরে বলা যায়, বৈদ্যগণ স্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছেন। পরাশর ২ অ: ৫ম শ্লোকে বলিয়াছেন:— জন্মকর্ম্ম পরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসন বর্জ্জিতঃ। নাম ধারক বিপ্রস্য দশাহং সূতকং ভবেৎ॥ জন্ম কর্ম্ম পরিভ্রষ্ট, সন্ধ্যা উপাসনা বর্জ্জিত, নামধারী ব্রাহ্মণদের দশ-দিন অশৌচ হইবে।

৯। এবার সমালোচক তাঁহাদের শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে নাম ধারক বিপ্রের মধ্যে ফেলিতে চাহেন। এবং "সূতক" কথাটী চাপা দিয়া অশৌচ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

সমালোচক এখানেও বৈদ্য প্রবোধনীর নীতি অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রের যাহা মর্ম্ম নহে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

সমালোচকের উদ্ধৃত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য ৩টী শ্লোক আলোচনা করিব পাঠক তখন সমালোচকের ব্যাখ্যার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

অত: শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা। দিন ত্রয়েণ শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ প্রেত সূতকে॥ ১

ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চাদশাহকৈঃ। শূদ্রঃ শুধ্যন্তি মাসেন পরাশর বচো যথা।২

উপাসনে তু বিপ্রাণামঙ্গ শুদ্ধিশ্চ জায়তে। ব্রাহ্মণানাং প্রসূতৌ তু দেহস্পর্শো বিধীয়তে॥৩

জাতে বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশা-

হেন ভূমিপঃ। বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন
শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি ।৪

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রোযোহগ্নি-
বেদ সমন্বিতঃ। ত্র্যহাৎকেবল
বেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ ॥৫

জন্মকর্ম্ম পরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসন-
বর্জ্জিতঃ। নামধারক বিপ্রস্য
দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥৬

অর্থঃ—এক্ষণে জন্মের এবং
মরণের অশৌচের কথা বলিতেছি।
মরণাশৌচে ব্রাহ্মণের তিন দিন
অস্পৃশ্য অশৌচ। পরাশরের
মতে এমত স্থলে ক্ষত্রিয়ের বার-
দিন, বৈশ্যের পনর দিন, শূদ্রের
একমাস অশৌচ। উপাসনা দ্বারা
বিপ্রগণের অঙ্গশুদ্ধি হয়। জন্মের
অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণগণের অঙ্গ
স্পর্শ করা যাইতে পারে। জনন
বা মৃত্যু হইলে বিপ্র দশ দিনে,
ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনর দিনে
এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধি লাভ
করেন। সাগ্নিক এবং বেদাধ্যায়ী
বিপ্রের এক দিন অশৌচ। যে
ব্রাহ্মণ কেবল বেদাধ্যয়নে নিরত
তাঁহার তিন দিন অশৌচ। যে

বিপ্র জন্মকর্ম পরিভ্রষ্ট এবং সন্ধ্যোপাসনা বিহীন তিনি কেবল মাত্র নামধারী বিপ্র, তাহার দশ দিবস সূতকাশৌচ।

প্রথম মরণাশৌচে অন্নাস্পৃষ্ঠত্ব ব্রাহ্মণগণের তিন দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের ৩০ দিন বলিয়া ব্রাহ্মণগণের অন্নস্পৃষ্টত্ব কমিয়া যাওয়ার কারণ দিলেন উপাসনা। তারপরে বলিলেন জন্মের অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণগণের অন্নস্পর্শ করা যাইতে পারে, এই গেল অন্নাস্পৃষ্টত্ব সম্বন্ধে বিধি।

জনন ও মরণে অশৌচের কথা বলিলেন ব্রাহ্মণের ১০দিন ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের ৩০ দিন হইবে এই সাধারণ বিধি দিয়া বলিলেন সাগ্নিক ও বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের ১০দিন স্থলে ১দিন অশৌচ হইবে, আর যে সাগ্নিক নহে কেবল বেদাধ্যায়ী তাহার তিন দিন। ইহার পরে বলিলেন যে ব্রাহ্মণ নিত্য কর্ম বিহীন কেবল নাম ধারী বিপ্র (ব্রাহ্মণ) তাহার জননে (মূলে সূতকে) [illegible]

১০ দিনই থাকিবে। কারণ পূর্ব্বে ৩য় শ্লোকে বলিয়া আসিয়াছেন "ব্রাহ্মণানাং প্রসূতৌ তু দেহ স্পর্শো বিধীয়তে" জননা শৌচে ব্রাহ্মণের দেহ স্পর্শ করা যাইতে পারিবে। শেষের ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলিলেন কর্ম্ম বিহীন ব্রাহ্মণের অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব অশৌচ পরিমাণ ১০ দিনই থাকিবে। ইহা মরণাশৌচের কথা নহে। সমালোচক সিদ্ধান্ত করিলেন বৈদ্যগণ স্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে সুতরাং বৈদ্য ব্রাহ্মণ স্বকর্ম্ম ভ্রষ্ট হওয়াতে তাহাদের বংশধরগণ দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ অপসিদ্ধান্ত, তাহা যে কোন ব্যক্তি উদ্ধৃত শ্লোক কয়টী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

১০। গ্রন্থকার যদি শাস্ত্রাদির অনুশীলন করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় জানিতেন যে ব্রাহ্মণের একমাত্র সেবক শূদ্রের অশৌচও একদিন, তিন দিন, দশদিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

১০। সমালোচক কি বৈদ্য বইর ৬৬।৬৭ পৃষ্ঠা দেখেন নাই? বই না পড়িয়া সমালোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সমালোচক কি এখন এই শ্রেণীর মধ্যে আসিতে চাহেন? বৈঃ ব্রাঃ অশৌচ ১০ দিন করিয়া

ছিলেন, আমি সে সময় বলিয়া-
ছিলাম "এখনই তথা কথিত
শিক্ষিত লোক মধ্যে কেহ কেহ
অশৌচ পালন করা বর্ব্বরতা মনে
করে। ক্রমে সেরূপ একটা আন্দো
লন অবশ্যই উঠিবে। শাস্ত্র বচনের
ইচ্ছানুরূপ অর্থ করার লোকের
অভাব হইবে না।

আমার ভবিষ্যদ্বাণী যে এত শীঘ্র
ফলিবে মনে করি নাই। "

১১। ভগবান্ মনু অশৌচকাল
বৃদ্ধি না করিয়া সঙ্কোচ করার সমুচ্চ-
কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,
কোন শাস্ত্রকার মহর্ষি অশৌচ কাল
সঙ্কোচ করিলে ক্রিয়া পণ্ড হইবে
এইরূপ ব্যবস্থা দেন নাই; বরং
তাহারা রাজা, রাজকর্ম্মচারী,
ব্রতী, ছত্রী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতিরা
অশৌচ গ্রহণ ইচ্ছা না করিলে
তাহাদের অশৌচ হইবে না
বলিয়াছেন।

১১। অশৌচ সঙ্কোচ করিতে
সমুচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন নাই।
যাহা বলিয়াছেন ৬৬পৃঃ উদ্ধৃত
করিয়াছি।

এ ব্যবস্থা বেশ! এখন হইতে
আর ইচ্ছা মত অশৌচ কমাইয়া সব
রকম কাজ করা চলিবে! ইহা শাস্ত্র
না ব্যাভিচার! •

ইহার কোন প্রমাণ উদ্ধৃত
করেন নাই। পরাশরের তৃতীয়
অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের মত কিছু
একটা হইবে। তাহা যে অন্য
স্পৃশ্যাব বিষয়ক ইহা প্রদর্শিত
হইয়াছে।

১২। শত শত বৈদ্যকুলতিলকগণ যে একাদশাহে আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন * * * তৎ সমস্তই কি পণ্ড হইয়াছে ? না অশাস্ত্রীয় হইতেছে ? এইরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা গ্রন্থকার কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন ? ইহা কি বারিধির জাতিতত্ত্বের প্রভাব ? না যজন ব্রাহ্মণ প্রীতির নিদর্শন।

১২। সমালোচক একাদশাহে কয়েকটী শ্রাদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। *

পণ্ড হইয়াছে কিনা তাহার বিচার শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ করিবেন আর করিবেন শ্রাদ্ধকারিগণের পিতৃ পুরুষ। এ ক্ষেত্রে নব মার্গ প্রবর্ত্তকগণের উক্তিও মত প্রামাণ্য নহে।

সমালোচক যে কয়জনের নাম করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এক জনের একাদশাহ শ্রাদ্ধের রহস্য অবগত আছি।

একাদশাহে "শত শত বৈদ্য কুলতিলকগণ" শ্রাদ্ধ করেন নাই। যে কয়জন করিয়াছে তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুল্যগ্রে গণনা করা যায়। শাস্ত্র ও কুলপ্রথা মতে ষোড়শ দিনে সকলেই ক্রিয়া করিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের মৃত পুত্র ৺ হেমচন্দ্র সেনের শ্রাদ্ধ ষোড়শাহে সম্পন্ন হইয়াছে। সমালোচক তাহার সংবাদ রাখেন কি ?

১৩। গ্রন্থকার ভরত মল্লিককে প্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠ পণ্ডিত লিখিয়া বড়ই ব্যভিচার করিয়াছেন। ভরত মল্লিক গ্রন্থের কোন স্থানেই নিজকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন নাই।

১৩। সত্যই ত আমি ব্যভিচার করিয়াছি!

সমালোচক ভট্টিকাব্যের টীকা দেখিয়াছেন কি? একবার খুলিয়া দেখিলে কে সত্যের অপলাপ করিতেছে ও কে পুষ্করিণী চুরি করিতে বসিয়াছে বুঝিতে পারি-বেন।

বৈদ্য বইয়ের ৩ ও ৬ পৃষ্ঠা দেখিলে ভরত মল্লিক অম্বষ্ঠ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন কিনা দেখিতে পারিবেন। বই না পড়িয়া সমালোচনা করিয়া সমা-লোচক কাহার খাত সলিলে ডুবিয়াছেন! আমি বারীধির স্বখাত সলিলে ডুবি নাই।

১৪। গ্রন্থকারের বয়স ৪৯ বৎসর গত হইয়াছে কিনা জানি না।

১৪। গালি ও অভদ্রোচিত ভাষা দ্বারা কোন বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ হয় না বরং স্বপক্ষের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পায়।

সমালোচক নিজের মাথায় হাত দিয়া দেখিবেন।

১৫। মনুসংহিতায় যে "অম্ব-ষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" পাদৈক দৃষ্ট হইতেছে, তাহা মনুর প্রণীত নহে, বৈদ্য বিদ্বেষী যজন ব্রাহ্মণদের রচিত তাহা মূল গ্রন্থের সমালোচনায় প্রতি পাদন করিব।

১৫। এই শ্লোক ভগবান্ মনুর ১০ অধ্যায়ের ১০ম।

অসুবিধা ঘটিলে প্রক্ষিপ্ত বলাই শ্রেয়ঃ। সমালোচক সব দোষ যজন ব্রাহ্মণগণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিতেছেন। স্থানান্তরে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের উপরও যথেষ্ট বর্ষণ করিয়াছেন।

এই শ্লোকাংশ বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদের কারিকরি বলিয়া ত অবসর হইলেন।

তিনি বোম্বাইয়ের মনুর কোন সংস্করণ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন কি? বিশ্বনাথ মান্দালিকের একখানি মনু আনিয়া দেখিবেন। দুষ্ট যজন ব্রাহ্মণদের হস্ত সর্ব্বত্রই প্রসারিত। অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তির কথা বহু স্থানে আছে সবগুলিকে প্রক্ষিপ্ত না বলিলে সমালোচক অসুবিধায় পড়িবেন। বৈদ্য বইয়ের ৬—৮ পৃষ্ঠা ও ২৫ পৃঃ ফুট নোট দ্রষ্টব্য।

১৬। বর্ণসঙ্কর না হইলে ব্রাহ্মণের সন্তান বৈশ্য হয় কিরূপে তাহা গ্রন্থকার এই স্থানে উদ্ধৃত করেন নাই। আমরা ব্রাহ্মণ বর্ণীয় না হইলে কোন্ বর্ণীয় হইব? তাহা ত গ্রন্থকার উল্লেখ করেন নাই।

১৬। গ্রন্থ না পড়িয়া সমালোচনা করিতে বসিলে পদে পদে বিভ্রান্ত হইতে হয়। অনুলোম জাত সন্তান—যথা অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর হয় না এবং তাহারা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আমরা বৈশ্যা মাতার বর্ণ। বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থ মধ্যে পাইবেন।

অনুলোম জাত সন্তানগণ যে বর্ণসঙ্কর নহে তাহা আমি ৬৩ পৃষ্ঠার ফুট নোটে দেখাইয়াছি।

শাস্ত্রে দুই প্রকার মিশ্র জাতির কথা আছে। অনুলোম জাত সন্তান (যথা আমরা) বৈধ, তাহাদিগকে বর্ণসঙ্কর বলে না; প্রতিলোম জাত সন্তান (নীচ বর্ণের পিতা ও উচ্চ বর্ণের মাতা) সমাজে হেয়। তাহারা মাতৃকুলাচার প্রাপ্ত হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্যও ১ম অধ্যায়ের ৯৫ শ্লোকে এই কথা বলিয়াছেন যে প্রতিলোম জাত সন্তান অসৎ ও অনুলোম জাত সন্তান সৎ হইয়া থাকে।

ভগবান্ মনু অনুলোম জাত ৬টী সন্তানকে "অপসদাঃ" অর্থাৎ সবর্ণ পুত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া ১৪ শ্লোকে তাহারা যে মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় তাহা বলিয়াছেন। দ্বিজন্মা-দিগের অনুলোম ক্রমে অনন্তর বর্ণজ, একান্তর বর্ণজ ও দ্ব্যন্তর বর্ণজ তনয়েরা মাতৃদোষ দুষ্ট বলিয়া মাতৃজাতির সংস্কার যোগ্য হইবে।

পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্। তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃ-দোষাৎ প্রচক্ষতে॥ মনু ১০।১৪

মনু প্রতিলোম জাত সন্তানের কথা ১১।১২ শ্লোকে বলিলেন যে ক্ষত্রিয় হইতে বিপ্র কন্যাতে জাত সন্তান জাতিতে সূত হইবে। বৈশ্য পিতা হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্রকে মাগধ এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন পুত্র বৈদেহ জাতি বলা যায়। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা গর্ভজ সন্তান অযোগব—ক্ষত্রিয়া গর্ভসম্ভূত সন্তান ক্ষত্তা এবং ব্রাহ্মণী গর্ভ সম্ভূত তনয় নরাধম চণ্ডাল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই সকল সন্তান বর্ণসঙ্কর।

"মাতৃবৎ বর্ণ সঙ্করাঃ" মনুর কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত তাহা সমালোচক বলেন নাই। আমরা যতদূর জানি এইরূপ কোন শ্লোক মনুতে নাই। প্রতি লোম জাত বর্ণসঙ্কর সন্তানগণ মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইলে কি অবস্থা দাঁড়ায় তাহা সমালোচক অনুধাবন করিয়াছেন কি? নীচ বর্ণের জনক কর্তৃক উচ্চ বর্ণের মাতাতে উৎপাদিত সন্তান সব উচ্চ হইয়া যায়। বৈদেহ, সূত ও চণ্ডাল প্রভৃতির জাতি ব্রাহ্মণ হইয়া যায়।

১৭। জারজ সন্তনগণই মাতৃকুলাচার প্রাপ্ত হয়।

যাহারা নিজকে বর্ণসঙ্কর জাতির বংশধর বলিয়া মাতৃকুলাচার গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে চাহেন * * তাহারা প্রতি সুখকর পারিপার্শ্বিক জাতির "অম্বষ্ঠ জারজাঃ বৈশ্যাঃ" সুমধুর সম্ভাষণে জীবনকে ধন্য করিতে পারিবেন।

১৭। মাতৃকুলাচার প্রাপ্ত হইলেই জারজ হইল ইহা কিরূপে সিদ্ধ হয় বুঝিতে পারা যায় না।

সমালোচক বলিয়াছেন জারজ সন্তান মাতৃকুলাচার প্রাপ্ত অতএব যাহারা মাতৃকুলাচার গ্রহণ করে তাহারাই জারজ। এই যুক্তির মূল্য কত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

১৮। অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণের পরিণীতা বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান তাহা কে অস্বীকার করে।

১৮। তাহা হইলে অম্বষ্ঠেরা মাতৃধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহে বলিয়াই যে তিনি তাহাদিগকে জারজ বলিতে চাহেন, এটা তাঁহার বুদ্ধির দৌড়।

১৯। যে সব অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের অপত্নীভূতা বৈশ্যা সন্তান তাহাদের সংস্কার বৈশ্যানুরূপ হইবে।

১৯। ইহার কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। তাঁহার মতে অম্বষ্ঠ দুই প্রকার (১) পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভজাত (২) অপরিণীতা বৈশ্যার গর্ভজাত। তাহার মতে পরিণীতার সন্তানের সংস্কার পিতৃবৎ ও অপরিণীতার সন্তানের সংস্কার মাতৃবৎ হইবে। আমরা দুই প্রকার অম্বষ্ঠের কথা শুনি নাই। পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তানের নামই অম্বষ্ঠ এবং তাহার আচার মাতৃবৎ ইহা সবিস্তারে মূলগ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মাতা নীচ বর্ণা হইলে মাতৃদোষ প্রাপ্ত হইবে ইহা সহজ বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারা যায়। নীচ কুলোদ্ভবা মাতার সন্তান ও উচ্চ কুলোদ্ভবা মাতার সন্তান একরূপ হইতে পারে না। এজন্য ভগবান্ মনু ১০অঃ ১০।১৪ শ্লোকে অনর্দ্ধ

পুত্রাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও "মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে" বলিয়াছেন।

সমালোচক বলিতে চাহেন আমি যখন মাতৃবৎ সংস্কার বলিতেছি তখন আমি জারজ বোধ করি এজন্য তিনি ও তাঁহার দল জাতি বদলাইয়া শুদ্ধ হইতেছেন।

এ সকল প্রলাপের মূল্য কি, তাহা শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

২০। আমরা সর্ব্বদা বলিয়া আসিতেছি দ্বিজোপাধিক ব্রাহ্মণের চিকিৎসা বৃত্তি নিন্দনীয়। কোন শাস্ত্রকারই দ্বিজোপাধিক ব্রাহ্মণের চিকিৎসা বৃত্তি সমর্থন করেন নাই। গ্রন্থকার জানেন না যে মূল ব্রাহ্মণগণ দ্বিবিধ সংজ্ঞায় অভিহিত, এক ত্রিজোপাধিক বৈদ্য ব্রাহ্মণ অপর দ্বিজোপাধিক সাধারণ ব্রাহ্মণ। * *

মনু যে তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫২ শ্লোকে "চিকিৎসকান্ দেবলকান" বলিয়া চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে অপাংক্তেয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

২০। সমালোচক প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে মনু ১৫২ শ্লোকে দ্বিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। বৈদ্যগণ ত্রিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কাজেই মনু তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, মনুতে ত্রিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া কিছু একটা আছে কি? এবং তাঁহাদের চিকিৎসা কি কোন বৃত্তি, বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি? সমালোচকের মতে ১২৪ শ্লোক অনুসারে দ্বিজ শ্রেণীর চিকিৎসক ব্রাহ্মণই নিন্দনীয়

গ্রন্থকার একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ের ১২৪শ্লোক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, মনু দ্বিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেই চিকিৎসায় নিন্দনীয় বলিয়াছেন। *

ভগবান্ মনু কেবল যে ১২৪ শ্লোকে দ্বিজ পদ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, তৎপর তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩৪।১৩৮।১৪০। ১৪১ শ্লোকেও দ্বিজ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে কি বুঝা যায় না? দ্বিজোপাধিক ব্রাহ্মণই চিকিৎসায় গর্হিত। যদি চিকিৎসায় বৈদ্য ব্রাহ্মণ নিন্দনীয় হইতেন, তাহা হইলে মনু নিশ্চয়ই ত্রিজ শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং কখনও ১২৯ শ্লোকে বলিতেন না "একৈক মপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ॥"

আর মেধাতিথিও মনু সং ৪র্থ অঃ ১৭৯ শ্লোকের টীকায় লিখিতেন না, "বৈদ্যোবিদ্বাংশো, ভিষজো বা" বৈদ্য, বিদ্বাংস, ভিষজ একার্থ বাচক শব্দ। যে বৈদ্য, সে বিদ্বান্ এবং সেই ভিষক। সুতরাং মনু বৈদ্য-

এই বলিয়া তিনি তাঁহার শ্রেণীর শর্ম্মাদিগকে ১২৯ শ্লোকের "বিদ্বাং-সং" কথার ভিতর ফেলিয়া তাঁহাদের শ্রেণীর ব্রাহ্মণ চিকিৎসা বৃত্তির দ্বারা হেয় হন না ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন।

এই কথার অসারত্ব প্রতিপাদন জন্য আমাদিগকে ভগবান্ মনুর কয়েকটী শ্লোকের আলোচনা করিতে হইবে। কিরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ১২৮ শ্লোকে বলিলেন।

শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্য
কব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং
মহাফলং॥ মনু ৩।১২৮

দাতৃগণ দেব পিতৃ উদ্দেশ্যে অন্নাদি, শ্রোত্রিয় (বেদাধ্যায়ী) ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন; কেননা বেদাধ্যয়ণ শুদ্ধাচরণাদি দ্বারা পূজনীয় ব্রাহ্মণকে উহা দান করিলে মহা ফল হয়।

কেই শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে ভোজন করাইবার উপদেশ দিয়াছেন। এক জন বৈদ্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে বিশিষ্ট ফল লাভ হয়, অবৈদ্য বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না। তাই মহাভারতে ব্যাসদেব বলিয়া গিয়াছেন "অব্রাহ্মণাসন্তি তু যে ন বৈদ্যঃ," যাহারা বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা অব্রাহ্মণ; অর্থাৎ তাহারা কেবল নামে মাত্র ব্রাহ্মণ। কেবল যে দ্বিজো-পাধিক ব্রাহ্মণকে মনু অপাংক্তেয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নহে; মহর্ষি নারদও স্পষ্টতঃ বলিয়া গিয়াছেন, বৈদ্যেতর জাতিকে পাক কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। বৈদ্যেতর জাতির পাচিত ঔষধ অস্পৃশ্য, ভ্রমবশতঃ ও দ্বিজাতির পাচিত ঔষধ সেবন করিলে শূদ্রও প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। ব্রহ্মঃবৈঃকার ষট্ প্রকার অব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া "তৃতীয়ো বৈদ্য জীবী চ" এবং অপর এক শ্লোকে "বিপ্রোদৈবজ্ঞ জীবি চ বৈদ্য জীবী

এই শ্লোকে শ্রোত্রিয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কথা বলিলেন। ১২৯ শ্লোকে বলিলেন—

একৈকমপি বিদ্বাংসংদৈবে পিত্র্যে চ
ভোজয়েৎ।
পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামমন্ত্রজ্ঞান্
বহূনপি॥

দৈব ও পিতৃকর্ম্মে এক এক জন বিদ্বান্ (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে বিশিষ্ট ফল লাভ হয়, অমন্ত্রজ্ঞ (বেদানভিজ্ঞ) বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

১৩০ শ্লোকে বলিলেন—

দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদ
পারগং।
তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানাং প্রদানে
সোঽতিথিঃ স্মৃতঃ॥

বেদ পারগ ব্রাহ্মণের অতি দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইবে অর্থাৎ তাঁহার পিতা পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণের কিরূপ আভিজাত্যাদি গুণ, তাহা নিরূপণ করিবে। এইরূপ তীর্থ স্বরূপ ব্রাহ্মণকে হব্য কব্য দান করিলে অতিথিকে দানের ন্যায় মহা ফল হয়।

চ চিকিৎসকঃ” বলিয়া যজন ব্রাহ্মণগণের পক্ষে বৈশ্য বৃত্তি গর্হিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * * * *

এই স্থলেও গ্রন্থকার বারিধির পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। ইহাতে কাকে কাণ নেওয়ার গল্পই মনে পড়ে।

১৩১ শ্লোকে বলিলেন—

সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।
একস্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি ধর্ম্মতঃ॥

যে শ্রাদ্ধে বেদানভিজ্ঞ সহস্র সহস্র ভোজন করেন সেই শ্রাদ্ধে যদি এক বেদবেত্তা (মন্ত্রবিৎ) ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান যায় তাহা হইলে ঐ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল ধর্ম্মতঃ নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।

এই কয়টী শ্লোক আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে ১২৯ শ্লোকের “বিদ্বাংসং” অর্থে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

১২৮ শ্লোকে শ্রোত্রিয়, ১২৯ শ্লোকে বিদ্বাংসং ও মন্ত্রজ্ঞান্, ১৩০ শ্লোকে বেদ পারগ ও ১৩১ শ্লোকে মন্ত্রবিৎ সমস্তই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের শ্রেণীর তথাকথিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া নহে।

১২৯ শ্লোকের "বিদ্বাংসং" অর্থ সম্বন্ধে টীকাকারগণ কি বলিতেছেন দেখা যাউক।

গোবিন্দরাজ—বেদার্থবিদ ব্রাহ্মণ।

মেধাতিথি—বেদার্থ বেদনং যস্ত আহ নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি; মন্ত্র গ্রহণং বেদোপলক্ষণার্থং।

সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ—বিদ্বাংসংবেদজ্ঞম্।

কুল্লূক—বেদতত্ত্ববিদং ব্রাহ্মণং। অবশ্য কুল্লূক এখন নূতন শর্ম্মাগণের নিকট উল্লূক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু অন্যান্য টীকাকারের এখনও নামকরণ হয় নাই।

সমালোচক মনুর ৪র্থ অধ্যায়ের ১৭৯ শ্লোক টানিয়া আনিয়া এবার মেধাতিথির শরণাপন্ন হইয়া "বৈদ্যো বিদ্বাংসো ভিষজো বা" উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন বৈদ্য, বিদ্বাংস, ভিষজ একার্থ বাচক শব্দ। যে বৈদ্য, সে বিদ্বান্ এবং সেই ভিষক্। সুতরাং মনু ১২৯ শ্লোকে "বিদ্বাংসং" প্রয়োগ করিয়া বৈদ্যকেই শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে ভোজন করাইবার উপদেশ দিয়াছেন।

এই উক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা ১৭৯ ও ১৮০ শ্লোক এবং মেধাতিথির ভাষ্যের সমালোচকের উদ্ধৃত অংশ আলোচনা করিলেই ধরা পড়িবে।

মনুর ৪র্থ অধ্যায়ে ১৭৯ ও ১৮০ শ্লোক দুইটী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করা যাউক।

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈর্ম্মাতুলা-
তিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধি-
বান্ধবৈঃ ॥ ১৭৯
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা
পুত্রেণভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন
সমাচরেৎ ॥ ১৮০

ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, বৈদ্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্রবধু প্রভৃতি ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা ও ভৃত্য-বর্গ সহ কলহ করিবে না।

এখানে বৈদ্য, জাতিবাচক নহে। মেধাতিথি অর্থ করিলেন "বৈদ্যা বিদ্বাংসো ভিষজো বা"।

বৈদ্য শব্দের অর্থ বিদ্বান্ অথবা চিকিৎসক। মেধাতিথি বিদ্বস্ শব্দকে বৈদ্য জাতি-বাচক বলেন নাই।

বিদ্বস্ শব্দের প্রথমার এক বচনে বিদ্বান্ বহুবচনে বিদ্বাংসঃ নিষ্পন্ন হয়। বিদ (জানা) ধাতু ক্বস্ প্রত্যয়। ইহার অর্থ যে শাস্ত্র জানে, জ্ঞানী, বিদ্যাবান্, শাস্ত্রদর্শী, পণ্ডিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রই ইহার সত্যতার সাক্ষ্য দিবেন। বিদ্বান্ কি বহু বচনান্ত বিদ্বাংসঃ বলিলেই যে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে তাহা কোথায় আছে? ১৭৯ শ্লোকের মেধাতিথির বৈদ্য শব্দের অর্থ সমালোচক পরম যত্নে গ্রহণ করিলেন আর ২য় অধ্যায়ের ১২৯ শ্লোকের বিদ্বাংসের অর্থ মেধাতিথি করিয়াছেন বেদার্থ-বেদনং ইহা সমালোচকের মনঃপুত হইল না কেন? মনু বেদার্থবিৎ পণ্ডিত অর্থেই বিদ্বস্ শব্দ সর্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। বৈদ্য বলিলেই যে বৈদ্য জাতি বুঝিতে হইবে ইহা ঠিক নহে তাহা আমি মূল গ্রন্থে

দেখাইয়াছি। বৈদ্য শব্দ নানার্থ-বোধক—আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ী ; ভিষক্। ব্রাহ্মণ পিতৃক বৈশ্য মাতৃক অম্বষ্ঠ জাতির বৃত্তিগত উপাধি ; বিদ্বান, পণ্ডিত। বেদ সম্বন্ধীয়। চিকিৎসক ব্রাহ্মণ মাত্রই হেয় মনু কোন ব্রাহ্মণকেই বাদ রাখেন নাই তিনি দ্বিজ-শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ মাত্রকেই বুঝাইতেছেন। সমালোচক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া চিকিৎসক প্রভৃতি ষট্ প্রকার ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ দেখাইয়াছেন। আমরাও তাহাই বলি। সমালোচক বলিয়াছেন "বৈশ্যের চিকিৎসা বৃত্তি ধর্ম্মোপার্জ্জনের সহায়, পাতিত্যের কারণ নহে।" যেহেতু আমরা ব্রাহ্মণ নহি ; ব্রাহ্মণ হইলে পাতিত্যের কারণ হইত।

সমালোচকের এই সকল উক্তি দ্বারা বৈদ্য জাতি যে ব্রাহ্মণ নহে তাহা প্রমাণ হইতেছে।

সমালোচক এখানে বেড়াজাল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া পলু

আমাকে বেড়া জালের ভয় দেখাইবেন।

যজন যাজন বৃত্তি ভিন্ন ব্রাহ্মণের শাস্ত্রে চিকিৎসা বৃত্তি নির্দিষ্ট হয় নাই। সমালোচক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বিদ্বাংসঃ ইত্যাদি বলিয়া যজন ব্রাহ্মণ হইতে নিজের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া ১৫২ শ্লোকের হেয় চিকিৎসক ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতে যে আত্মরক্ষা করিতে চাহেন তাহা শাস্ত্রার্থের বিপরীত। আবার বৈদ্য প্রঃ সেই "অব্রাহ্মণা সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ" তুলিয়া অর্থ করিয়াছেন "যাহারা বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা অব্রাহ্মণ।" আমি বৈদ্য বইয়ের ১৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়া ইহার ভ্রান্তি দেখাইয়াছি। সংস্কৃত মহাভারত পাঠ করিয়া ভ্রমাত্মক সংস্কার পরিহার করাই শ্রেয়ঃ। বৈঃ প্রঃ ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া নিজেই হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। কাহার কাণ চিলে নিয়াছে সুধী সমাজ বিচার করিবেন।

২১। বৈদ্যগণ বর্ণসঙ্কর জাতি হইলে ব্রাহ্মণদের মন্ত্রগুরু হন কিরূপে?

২১। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুরু হন কিরূপে? বৈদ্য গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কে বলিল বৈদ্য বর্ণসঙ্কর? এবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে ও মূল গ্রন্থে আলোচনা আছে।

২২। গ্রন্থকার তৎপর লিখিয়াছেন ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্র বিশাবপি। অমী পঞ্চ দ্বিজা এবাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥ জিজ্ঞাসা করি গ্রন্থকার এই বচনটী যেই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের নাম করিলেন না কেন?

• • •

উপপুরাণের বচনটী উদ্ধৃত করিয়া বেড়াজালে আটকাইয়া গিয়াছেন।

২২। বৈদ্য গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গ্রন্থ না পড়িয়া সমালোচনা করার ধৃষ্টতার এটি আর একটী দৃষ্টান্ত।

ইহা উপপুরাণের বচন নহে এবং আমি বেড়াজালে আটকাই নাই।

আমরা বৈশ্যবর্ণ আমাদের সংস্কার বৈশ্যানুরূপ কিন্তু গৌরবে আমরা মূর্দ্ধাবসিক্তের নিম্নে ও ক্ষত্রিয়ের উপরে ইহাই শাস্ত্রকারের বিধান। বঙ্গদেশে মূর্দ্ধাবসিক্ত নাই কাজেই ব্যবহারেও ব্রাহ্মণের পরেই আমাদের দ্বিতীয় স্থান রহিয়াছে। আমরা এখন তাহা নষ্ট করিতে বসিয়াছি। শর্ম্মা লিখিয়া ১০ দিন অশৌচ নিলেই বড় হওয়া যায় না, দৃষ্টান্ত হিন্দুসমাজে রহিয়াছে।

২৩। তৎপর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—"স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ বৈশ্যগণ পুরুষ পরম্পরাগত পথকে পরিত্যাগ করিতে কখনও সাহসী হইতে পারেন না।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

যেখানে কোন প্রকার মত-দ্বৈধের কারণ প্রদর্শিত হয় তথায় পিতৃ-পিতামহের অনুশীলিত পথই অবলম্বনীয়—ইহাই ধর্ম্ম শাস্ত্রের মত।"

গ্রন্থকার বচনটী কোন্ গ্রন্থের তাহা উল্লেখ করেন নাই। এই বচনটী মনুসং ৪র্থ অধ্যায়ের ১৭৮ শ্লোক। কুল্লুক তাহার টীকা করিয়াছেন :—"যেনেতি বহুবিধ শাস্ত্রার্থ সম্ভবে পিতৃপিতামহা-অনুষ্ঠিত এব শাস্ত্রার্থোঽনুষ্ঠাতব্যঃ। তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে না ধর্ম্মেণ হিংস্যতে" বচনের অর্থ হইল "পিতা পিতামহ প্রভৃতি যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহা যদি

২৩। এই শ্লোকের বৈঃ প্রঃ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সমালোচক তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। কুল্লুকের টীকা তুলিয়া ভুল অর্থ করিয়াছেন আমিও কুল্লুকের টীকা তুলিয়া অর্থ করিয়াছিলাম (৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

শাস্ত্রের বহুবিধ অর্থ সম্ভব হইলে পিতৃ পিতামহগণের অনুষ্ঠিত আচার অনুষ্ঠান করিবে। ইহার মধ্যে 'যদি' নাই। পিতা পিতামহ যে পথে চলিয়াছেন তাহাই সৎপথ।

বৈঃ প্রঃ অর্থ করিয়াছিলেন পিতা পিতামহ প্রভৃতি যে পথে গমন করিয়াছেন তাহা যদি সৎপথ হয় তবে সে পথে গমন করিলে কোন দোষ হয় না।

ইহা যে ভ্রান্ত অনুবাদ তাহা আমি টীকা তুলিয়া দেখাইয়াছি, সমালোচক টীকা তুলিয়াছেন কিন্তু ভ্রান্ত মত ছাড়েন নাই। আবার পিতামহের অর্থ করিয়াছেন বিশ্ব-স্রষ্টা, পিতার অর্থ আদিপিতা।

আমার ব্যাখ্যা টীকানুযায়ী কি তিনি যে বৈঃ প্রঃ অনুসরণ

সৎপথ হয়, তবে সেই পথে গমন করিলে তাহা নিন্দনীয় হয় না।

*　　*　　*

বৈশ্যাচার অসদাচার জানিয়া ত্যাগ করিতে পারিবে না কেন?

*　　*　　*

পিতামহ বলিতে কি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে বুঝায় না? পিতা বলিতে কি আদি পিতাকে অববোধ করা যায় না? পিতামহ ব্রহ্মা যে আচারের বিধান করিয়াছেন, আদি পিতা হইতে যে আচার প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে এবং যে আচার সমগ্র ভারতীয় বৈশ্য সংজ্ঞক ব্রাহ্মণগণ প্রতিপালন করিতেছেন, সেই আচারই কি অনুবর্ত্তনীয় নহে।

*　　*　　*

বৈশ্য ব্রাহ্মণসন্তানগণ অহীনকর্ম্মা হইয়াও কি জাতীয় গৌরব কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে না?

ইহা কি আসামী ব্যবস্থা? না কাশীধামের কেশেলগণের সহিত আনাগোণার ফল?

করিয়াছেন তাহা টীকানুযায়ী ইহার বিচার পণ্ডিত সমাজ করিবেন।

গালাগালি করিলেই কোন বিষয় প্রতিপন্ন হয় না।

সমালোচক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বৈশ্যগণের বর্ত্তমান আচার অসদাচার কাজেই তাহা জানিয়া ত্যাগ করিতে পারিবেন না কেন? অবশ্য এই **অসদাচার** কথাটা নব শর্ম্মাগণের বাণী। বৈঃ প্রঃ একাধিক বার প্রয়োগ করিয়াছেন। ৫।৭ জন লোকে একত্র হইয়া অসদাচার বলিলেই অসদাচার হয় না।

বৈশ্যের পক্ষে তথাকথিত ব্রাহ্মণাচারই অসদাচার; যাহার যে ধর্ম্ম ও আচার তাহাতে নিবদ্ধ থাকিয়া চিত্তের উৎকর্ষ ও পবিত্রতা সাধন করাই সনাতন ধর্ম্ম এবং ইহাই গীতোক্ত ভগবদ্বাক্য।

সমালোচক "যজন ব্রাহ্মণ" ও "কেশেল ব্রাহ্মণের" প্রীতিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছি ইত্যাদি কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের

পদানুসরণ করা লজ্জার বিষয় নহে। দেব দ্বিজে ভক্তি ত সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সমালোচকের দল যাহাদিগকে হেয় "যজন" ব্রাহ্মণ বলিতেছেন তাহাদের প্রসাদ পাইবার জন্য এত ব্যাকুল কেন? কোথায় কোন "যজন" ব্রাহ্মণ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির কোন্ সভ্যের ক্রিয়ায় আসিয়াছেন তাহা নিয়া এত ঢাক ঢোল বাজাইয়া এত উৎফুল্ল হইতেছেন কেন?

কেনই বা বৈঃ প্রঃ বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন :—

"যে সকল সত্য প্রিয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয় স্বতঃ প্রবৃত্ত (সর্ব্বত্র নহে) হইয়া আমাদিগকে উৎসাহপ্রদ পত্র লিখিয়াছেন তাঁহারা সমিতির, ধন্যবাদের পাত্র। যথার্থ নিরপেক্ষ সৎ ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়াই আজও সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম বর্ত্তমান।"

এ প্রীতি কেন? এ খোসামোদ কেন?

সত্যাই কি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের

স্বকীয় যাজন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া হেয় হইয়াছেন ?

শ্রেষ্ঠ বৈশ্য ব্রাহ্মণদিগকে যাজন কার্য্যে ব্রতী হইয়া লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা করিতে দেখি কেন ? পৌরোহিত্য কার্য্য নিয়াই বা বড়াই চলিতেছে কেন ? ব্রাহ্মণ জাতির রক্ত অবিশুদ্ধ বলিয়া কত রহস্যই চলিতেছে "রাঢ় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের প্রত্যেক ঘরে যবন শোণিত প্রবহমান" ইত্যাদি কথা বলিয়া তাঁহারা গবেষণার উৎস খুলিয়া দিয়াছেন।

অবশ্য ব্রাহ্মণ জাতি বিশুদ্ধ কিনা, তাহার বিচার তাঁহারা করিবেন। ব্রাহ্মণ জাতিকে গালি দিলেই আমরা বড় হইব না।

শর্ম্মার গোঁড়া দলপতি একজন কি লিখিয়াছেন পাঠ করুন "যে সকল বৈদ্য শূদ্রের সহিত যৌন সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে বৈদ্য সমাজে গ্রহণ করিবার উপায় নাই। 'সেন শর্ম্মা' লিখিলেও তাহাদের সমাজে প্রবেশ সুখ সাধ্য হইবে না।"

বৈদ্য সমাজ এই সকল তথা-কথিত মিত্র হইতে আত্মরক্ষা করুন। মিথ্যা কুহকে পড়িয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না। পরধর্ম্ম স্বনুষ্ঠিত হইলেও তাহা ভয়াবহ। আমাদের বৈশ্যাচার—১৫ দিন অশৌচ ও নামান্তে গুপ্ত লেখাই স্বধর্ম্ম। শর্ম্মা লিখিয়া ১০ দিন অশৌচ পালন করিলেই আমরা একটা "কেউ কেটা" হইব না।

২৪। যজন ব্রাহ্মণগণের ষড়যন্ত্রে ও রাজা গণেশের আদেশে যে দক্ষিণী-থাকের বৈদ্যগণ বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা কি ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না?

২৪। ইহার প্রমাণের অভাব। প্রশ্নই প্রমাণ নহে। গ্রন্থমধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের মুখবন্ধ ও রিজলী সাহেবের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

সমালোচক একাধিক বার "ধর্ম্মভূষণ" ও "আসাম দেশবাসী" বলিয়া কটাক্ষ করিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া তিনি তাঁহার এম, এ উপাধির উপর কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছেন কিনা তাহা বিজ্ঞমণ্ডলী বিচার করিবেন।

২৫। প্রতিভার এই সংখ্যায় 'জাতীয় দুর্ভাগ্য' প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র মিশ্র (দাশ শর্ম্মা) মহাশয়ের উক্তি :—আমাদের এক স্বজাতি সুদূর আসাম মুলুকে। তিনি আমাদের স্বজাতি মাত্র নহেন, রাজা রাজবল্লভের স্বনাম ধন্য বংশধর গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্মান প্রাপ্ত এবং নৈষ্ঠিক হিন্দু বলিয়া ধর্ম্মভূষণ আখ্যায়িত আমরা এহেন যোগ্য ব্যক্তির নিকট বর্ত্তমান জাতীয় জাগরণে পূর্ণ সহায় লাভ করিব ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করিয়াছিলাম।

২৫। জাতীয় জাগরণটা কি মিথ্যা অভিমান নিয়া করিতে হইবে। নিজ অধিকারে থাকিয়া করা চলে না কি? এতকাল ত চলিয়াছিল তাহাতে আমাদের মধ্যে মনীষী ব্যক্তির জন্ম লাভের কোন বাধা হয় নাই।

২৬। তিনি আমাদের কাতর ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত উকীল জনের ন্যায় যেখানে স্বীয় গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা সেখানে আত্মহত্যা করিলেন।

২৬। আমি যাহা ছিলাম তাহাই আছি। যাহারা বাপ পিতামহের উপাধি বদলাইয়া শর্ম্মা হইয়াছেন তাঁহারা আত্মহত্যা করিয়াছেন কি আমি করিয়াছি পাঠকগণ বিচার করিবেন।

২৭। ইহা কি বৈশ্য ধর্ম্ম যাজনের অবশ্যম্ভাবী ফল নহে? ভগবান্ আমাদিগকে এইরূপ ধর্ম্ম যাজনের পথ হইতে রক্ষা করুন।

২৭। লেখক যদিও "মিশ্র," ও "শর্ম্মা" দ্বারা আত্ম গোপন করিয়াছেন তথাপি "দাশ" শব্দ দ্বারা তাঁহাকে বৈশ্য বলিয়াই অনুমিত হয়। এতদিন তাঁহারও ত বৈশ্যাচার ছিল—কৈ অবশ্যম্ভাবী ফল ত তাহার প্রতি প্রভাব বিস্তার করে নাই। ভগবানের কৃপা হইয়াছে।

২৮। তাহার সঙ্গে আমাদের মতভেদ হইতে পারে; এরূপ শত ব্যক্তি আরও আছেন, যাহারা আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই। কিন্তু তাদের কেহই এমন ভাবে আমাদিগকে লগুড়াঘাত করিতে ক্ষিপ্রহস্ত হন নাই। আমরা জানি যে এই লগুড় কোথা হইতে আগত কিন্তু প্রয়োগের সহায়কারী হইয়া তিনি তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের উজ্জ্বল বংশে কলঙ্ক লেপন কারীরূপে চিরস্মরণীয় হইবেন তাহা নিঃসন্দেহ।

২৮। এই লগুড় আগমনের সংবাদ কি তাঁহার তথা কথিত ব্রাহ্মণাচার পালন—লব্ধ সর্ব্বজ্ঞতার ফল! আমি মহারাজা রাজবল্লভের পদানুসরণ করিয়া 'কলঙ্ক লেপন' করিয়াছি! যেহেতু আমি বাপ পিতামহের উপাধি বদলাইয়া সেন গুপ্ত স্থলে সেন শর্ম্মা বলিয়া মৃত ব্যক্তির নাম অন্তরূপে কীর্ত্তন করিয়া পিণ্ড লোপ করি নাই। পিতা পিতামহের যথাযথরূপে নাম উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক। যিনি চিরকাল সেন গুপ্ত ছিলেন তাঁহাকে

সেন শর্ম্মা বলিয়া পিণ্ড দিলে তিনি তাহা পাইবেন বলিয়া কোন শাস্ত্র-বিশ্বাসী, বিশ্বাস করিতে পারেন না।

নাম গোত্রং পিতৃণাং বৈ প্রাপকং হব্য-কব্যয়োঃ।

শ্রাদ্ধস্য মন্ত্রাস্তদ্বৎ তু উপালভ্যাশ্চ ভক্তিতঃ॥ গরুড়-উত্তর ১১।১২

পিতৃলোকের নাম গোত্রই হব্য-কব্যের প্রাপক আর ভক্তিসহকারে পঠিত শ্রাদ্ধের মন্ত্রসকল ও প্রাপক হইয়া থাকে।

যাঁহাদের পারলৌকিক কার্য্যে আস্থা নাই, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া লোক দেখান ব্যাপার, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যথাযথ রূপে নাম ও গোত্র এবং ভক্তিভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। পিতা পিতামহের নাম পরিবর্ত্তন করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই।

শর্ম্মাগণের উপদেশ মত আজ অম্বষ্ঠ, কাল হীন কল্পের ব্রাহ্মণ, পরশ্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তারপর আর কিছু একটা হইয়া বংশের ও জাতির উপর কলঙ্ক আনিতে চাহি

না। আমি অম্বষ্ঠ সংকুল প্রভব, হীন অন্ত্যজ জাতি নহি, আমার ময়ূর সাজিবার কোন প্রয়োজন নাই।

২৯। এখন আমাদের কোন্ রকম আচার গ্রাহ্য তাহাই ভাবনার বিষয় হইয়াছে। মন্ত্রটীতে কিন্তু শূদ্রাচারের উল্লেখ নাই। ইহা কি প্রকারে হইল চিন্তার বিষয় বটে। মন্ত্রটী এই :—

সত্যে বৈশ্যাঃ পিতৃস্তুল্যা
ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ
বৈশ্যোপমাস্মৃতঃ॥

বৈশ্যনামে এক বহি ছাপাইয়া ঘরে ঘরে বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার এই ব্যয় দ্বারা সমাজের অনিষ্ট ভিন্ন উপকারের কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার দ্বারা যদি তিনি তাঁহার দুঃস্থ সমস্ত জাতিবর্গের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন তবে বহু উপকার সাধিত হইত।

২৯। এই মন্ত্রটি কোন্ গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। ঐ মন্ত্রেই ত পথ পরিষ্কার রহিয়াছে "কলৌ বৈশ্যোপমাস্মৃতঃ"।

এ উপদেশ লেখকের প্রতি প্রযোজ্য। মিথ্যা অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া লেখক সম্প্রদায় তথা কথিত ব্রাহ্মণাচার নিয়া টানাটানি করিয়া সমাজে কি বিপ্লব বাধাইতেছেন ও অকারণে শক্তি ক্ষয় করিতেছেন। সমাজের অনেক কাজ আছে তাহাতে লেখকের সম্প্রদায়ের মননিবেশ করিলে মঙ্গল হইত। আমি স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য সত্য কথা প্রচার করিয়াছি।

৩০। বৈদ্য প্রতিভার সম্পা-দকের উক্তি :—

আপনি বৈদ্য বই লিখিয়া যে অপযশ অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা আপনার ধর্ম্মভূষণ উপাধিতে ঢাকা পড়িবে কি না সন্দেহ।

৩০। ভবিষ্যতে কি হইবে কে জানে? বৈদ্য জাতিকে টানিয়া আপনারা কোন খানায় নিয়া যাইতেছেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তনীয়।

আপনারা রং বদলাইয়া উজ্জ্বল হউন। আমি পিতৃ পিতামহের শাস্ত্রোক্ত স্বধর্ম্ম পালন করিয়া কলঙ্কিত হইয়াই থাকিব।

BAIDYA.

(H. H. Risley, C. I. E.)

Baidya, *Vaidya* (form Sanskrit *vid*, to know), *Ambastha*, *Bhisak*, *Chikitsak*, a well-known and highly respected caste, found only in Bengal Proper, whose features and complexion seem to warrant their claim to tolerably pure Aryan descent. There has been much controversy regarding their origin. The name Vaidya does not occur in Manu, but the Ambasthas are there said to be the offspring of a Brahman father and a Vaisya mother , and their professsion to be the practice of medicine. According to this account the Baidyas are *anuloma*, the father being of higher caste than the mother.

*　　*　　*　　*

The Baidyas are now divided into the following four sub-castes :—(1) Rarhi, (2) Banga, (3) Barendra, (4) Panchakoti, according to the parts of Bengal in which their ancestors resided. All of these are endogamous. A fifth endogamous group, which, however, bears no distinctive name, comprises those Baidya families of the districts of Sylhet, Chittagong, and Tipperah who intermarry with Kayasths and Sunris, the children in each case following the caste of the father. This practice

appears to be the only modern instance of intermarriage between members of different castes. It is said to have arisen from the reluctance of the Baidyas farther west to give their daughters to men who had settled in the country east of the Brahmaputra. Failing women of their own caste, the latter were compelled not only to marry the daughters of Khyasths, but to give their own daughters in return. This interchange of women is said to extend even to the comparatively degraded caste of Sunri, and it may be for this reason that the Chittagong, Tipperah, and Sylhet Baidyas are cut off from community of food with the other Sub-castes.

....

....

The evidence of inscriptions show that a dynasty of Baidya kings ruled over at least a portion of Bengal from 1010 to 1200 A.D. To the most famous of these, Ballal Sen, is ascribed the separation of the Baidyas into two divisions, one of which wore the sacred thread and observed fifteen days as the prescribed period of mourning, while with the other investiture with the thread was optional and mourning lasted for a month. Before his time, it is said, all Baidyas formed a single group, the members of which intermarried with one another, as all were equal in rank. All wore the thread and observed the term of

mourning characteristic of the Vaisyas. Ballal Sen, however, insisted on marrying a ferryman's daughter, named Padmavati, of the Patni or Dom-Patni caste. His son, Lakshan Sen, followed by a majority of the caste, protested against the legality of the marriage, and, finding their remonstrances unheeded, tore off the sacred cord which all Baidyas then wore, and retired into a distant part of the country. These were the ancestors of the Banga and Barendra sub-castes of the present day, while the Rarhi Baidyas represent the remnant who condoned Ballal Sen's offence.

....

The religion of the Baidyas is that of the orthodox high caste Hindu. All old Baidya families are Sakti worshippers.........................Brahmins are employed for religious and ceremonial purposes ;..............................
The practice of medicine, according to the traditional Hindu method, was no doubt the original profession of the Baidya caste..
Certain passages of the Shastras regard the taking of medicine from a Baidya as a sort of sacramental act, and forbid resort to any one not of that caste, so that some orthodox Hindus when at the point of death call in a Baidya to prescribe for them in the belief that by swallowing the drugs he orders for them they obtain

absolution for their sins..

....

In point of social standing, Baidyas rank next to Brahmans and above Kayastha....................................

There has been some controversy between Baidyas and Kayasthas regarding their relative rank. Putting aside the manifest futility of the discussion, we may fairly sum it up by saying that in point of general culture there is probably little to choose between the two castes and that the Baidyas have distinctly the best of the technical claim to precedence..

....

Baidyas eat boiled rice and food coming under that category only with members of their own caste. They will drink and smoke with the Nava-Sakha and with castes ranking higher than that group, but will not use the same drinking vessel or the same *huka*. Brahmans will eat sweetmeats in a Baidya's house, and will drink and smoke in their company, subject to the restriction noticed in last sentence as to not using the same vessel or pipe.

নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত।

শ্রীকালী শরণং।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহোদয় প্রণীত "বৈদ্য" নামক পুস্তিকা খানি পাঠ করিয়া এবং সেন মহাশয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। অনেক বৈদ্য সন্তান কতিপয়.........কুহকে অন্ধ হইয়া পুরুষ পরম্পরা অনুষ্ঠিত পথ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেন মহাশয়ের প্রণীত পুস্তিকা দ্বারায় ঐ সকল অন্ধের চক্ষুরুন্মীলিত হইলে তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা হইবে এবং দেশেরও মহোপকার সাধিত হইবে। অতএব সেন মহাশয় অস্মদাদির আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদের পাত্র। সেন মহাশয় যে সকল যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের উদ্ভব করিয়াছেন তাহাতে ভ্রম প্রমাদ নাই। আমরা ইতঃপূর্ব্বে "বৈদ্য প্রবোধনী" পুস্তিকার সমালোচনায় এ বিষয়ে ৭০ যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছি। তদপেক্ষা অধিক প্রমাণ সেন মহাশয়ের পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের মতে বৈদ্য জাতীয় যে ব্রাহ্মণ নহে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈশ্য বর্ণ, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব তাহাদের পঞ্চদশাহাশৌচ পালন, ষোড়শাহে প্রেতীভূত পিত্রাদির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহার বৈপরীত্য হইলে তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন এবং তাহাদের পিতৃগণ চিরকাল প্রেত লোকে বাস করিবেন। অতএব যাহারা.....কুহকে পড়িয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাদের কৃষ্ণৈকাদশীতে ঐ শ্রাদ্ধ পুনরনুষ্ঠেয়। যে সকল অম্বষ্ঠের মনে সংশয় উপস্থিত হইবে যে আমরা ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য? আমরা অনুরোধ করি তাহারা সেন মহাশয় প্রণীত বৈদ্য নামক পুস্তক পাঠ করুন, তাহা হইলে ঐ সংশয়ের অপনোদন হইবে। ইত্যলমধিকেন। ১৩৩৩সন ২৫শে পৌষ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, নবদ্বীপ।
শ্রীরামকণ্ঠ তর্কব্যাকরণ তীর্থ, নবদ্বীপ।
শ্রীক্ষিতিকণ্ঠ স্মৃতিতীর্থ, নবদ্বীপ।
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ তর্করত্ন।
শ্রীত্রিপথ নাথ স্মৃতিতীর্থ।
শ্রীশশাঙ্ক ভূষণ ন্যায় পঞ্চানন তর্ক তর্কতীর্থ (৺সর্ব্ববিদ্যা বংশীয়) নবদ্বীপ।

নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণের অভিমত।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন মহোদয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সাদর সমাবেদনম্—

আপনার প্রণীত বৈদ্য নামক পুস্তকখানি পাঠাস্তে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। বাংলা দেশে বৈদ্য এই শব্দ দ্বারা যাহাদিগকে বুঝিয়া আসিতেছি, তাহারা অম্বষ্ঠ জাতি, তাহা আমাদের স্থির আছে। আপনিও তৎসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সমীচীন হইয়াছে। এবং যাহা প্রকৃত তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে। বৈদ্য প্রবোধনী লিখিত বাংলার বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র ও যুক্তি উল্লেখ করিয়া ঐ সমস্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও যুক্তির যে সকল ভ্রম দেখাইয়াছেন তাহা সর্ব্বথা সমর্থন যোগ্য হইয়াছে। আমরাও ইহা ভাল ভাবেই বুঝিয়াছি যে বৈদ্য প্রবোধনী লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তই অপ-সিদ্ধান্ত। আশা করি ঐ সকল অপসিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া ধার্ম্মিক বৈদ্যগণ আচার বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ পথে প্রধাবিত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম বিনাশ করিবেন না। এবং বংশ পরম্পরা প্রাপ্ত শৌচাশৌচ সংরক্ষণ তৎপর হইবেন। ইতি॥

স্মৃতিতীর্থোপাধিক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাং।
স্মৃতিরত্নোপাধিক—শ্রীঅহিভূষণ শর্ম্মণাম্।
ন্যায়তর্কতীর্থোপাধিক—শ্রীচণ্ডীদাস দেবশর্ম্মণাং।
বিদ্যার্ণব ন্যায়রত্ন কাব্যব্যাকরণ তর্কতীর্থোপাধিক—
শ্রীকৌমুদী কান্ত দেবশর্ম্মণাম্।

শ্রীগুরুঃশরণং।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় প্রণীত "বৈদ্য" নামক গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার ধর্ম্মপ্রাণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ, স্বজাতীয়গণের যথেচ্ছাচার নিবারণার্থ পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি গ্রন্থকার দীর্ঘজীবন লাভ করুন।

* * * * * *

দশাহাশৌচ গ্রহণ ব্রাহ্মণ্যের পরিচায়ক নহে; কারণ চণ্ডালগণও দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু তাই বলিয়া চণ্ডাল ব্রাহ্মণ নহে। দশাহাশৌচ গ্রহণেচ্ছু বৈদ্যগণ দশাহাশৌচ গ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন ইহা তাঁহাদের ভ্রম, মাত্র পিতৃপিতামহাচরিত পথ পরিত্যাগ ও একাদশাহে শ্রাদ্ধ করণ জন্য পূর্ব্ব পুরুষগণকে নিরয়গামী করাইয়া পাপ ভাগী হইবেন।

আশা করি অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্যগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ ও স্বধর্ম্মাচরণে যত্নবান হইবেন। কেবল বৈদ্য কেন ব্রাহ্মণগণের প্রতিও নিবেদন তাঁহারাও উক্ত বৈদ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৈদ্যজাতি

সম্বন্ধে শাস্ত্রমত পরিজ্ঞাত হইয়া যেন সংশয় দূর করেন। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র স্মৃতিরত্ন—নবদ্বীপ।

শ্রীঅমর চন্দ্র তর্কতীর্থ—নবদ্বীপ।

শ্রীদুর্গা শরণং।

দশাহাশৌচ প্রতিপালনকারি শর্ম্মা উপাধিধারি বৈদ্যগণের এবং তাদৃশ বৈদ্য সংসর্গি ব্রাহ্মণগণের সংসর্গ প্রত্যবায় জনক কিনা?

ইতি প্রশ্নে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রদত্ত

উত্তর।

বৈদ্য জাতীয়ানামম্বষ্ঠত্বেন বৈশ্যধর্ম্মিত্বাৎ বৈশ্যধর্ম্মিত্বেন পঞ্চদশাহাশৌচ ভাগিত্বাচ্চ তৈঃ কৃতমেকাদশাহে প্রেতীভূত পিত্রাদিশ্রাদ্ধমসিদ্ধং, শ্রাদ্ধাসিদ্ধৌ তৎ পিত্রাদীনামাকল্পং প্রেতলোকে বাসোভবত্যেব স্বেচ্ছাচারিত্বেন পতিতানামম্বষ্ঠানাং যাজনকারিণাং তদ্‌গৃহে ভোজনকারিণাঞ্চ পাতিত্যেন তদ্‌ব্রাহ্মণ সংসর্গিণোঽপি প্রত্যবায় ভাগিনো ভবিতুমর্হন্ত্যেবেতি বিদুষামপরামর্শঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ শর্ম্মণাম্।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থদেবশর্ম্মণাং।

শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মণাং।

শ্রীযোগেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন দেবশর্ম্মণাং।

রামকণ্ঠ তর্কতীর্থ দেব শর্ম্মণাং।

শ্রীনিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ শর্ম্মণাম্।

সর্ব্ব বিদ্যা শ্রীশশাঙ্ক ভূষণ ন্যায় পঞ্চানন শর্ম্মণাং।

তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীকৌমুদীকান্ত দেবশর্ম্মণাং।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ তর্করত্ন শর্ম্মণাম্।

শ্রীঅহি ভূষণ স্মৃতিরত্ন শর্ম্মণাং।

শ্রীশিতিকণ্ঠ স্মৃতি ব্যাকরণ তীর্থ দেবশর্ম্মণাং।

ন্যায়রত্নোপাধিক শ্রীঅনিরুদ্ধ দেবশর্ম্মণাম্।

শ্রীহরি শরণং।

তর্কতীর্থোপনামক—শ্রীঅমরচন্দ্র শর্ম্মণাম্।

শ্রীকেদার নাথ ব্যাকরণোপাধ্যায় সাহিত্য বিশারদ শর্ম্মণাং।

নবদ্বীপস্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ ন্যায়াচার্য্য

শিরোমণি প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলীর—

অভিমত।

শ্রীশ্রীকালী শরণম্।

জয়ন্তি শ্রীমদ্ গুরুতাত চরণাঃ।

১৩৩৩। ১৪ই মাঘ।

বৈদ্য কুলোচ্ছেদার্থং, সত্যাপি বহুভির্ব্বৃথা কৃতযত্না।

বৈদ্য বিহীনা দীনা নহি ভূতবতী ভূরিয় মধুনাপি॥

ধর্ম্মভূষণ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন বি,এল মহোদয় তাঁহার প্রণীত বৈদ্য নামক গ্রন্থে বৈদ্য জাতীয় সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের মীমাংসা

করিয়াছেন, তাহাতে অনুমোদন করিবার জন্য ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। কারণ, তিনি বৈদ্য জাতি সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েরই যথাশাস্ত্র সুমীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার কৃত বৈদ্য জাতীয় সম্বন্ধীয় মীমাংসা সর্ব্বজনানুমোদিত এবং সর্ব্বলোক সুবিদিত।

আমরা বৈদ্য জাতীয় সম্বন্ধে কোনও কথাই পূর্ব্বে লিখি নাই এবং এখনও লিখিতে ইচ্ছা করিনা। কারণ যখন যাঁহারা কোনও কারণ বশতঃ……শাস্ত্রাচার-বিরুদ্ধ কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে কৃতোদ্যম হয়েন, তখন তাঁহাদিগকে তাহা হইতে বল পূর্ব্বক নিবারণের চেষ্টা করিলে তাঁহাদিগের ঐ বিষয়ের উদ্যম আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই জন্য তাঁহাদের সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই অন্যান্য ভদ্র ও শিক্ষিত জনের কর্ত্তব্য। তাঁহারা যখন আপনা আপনি তদ্বিষয়ের দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া অথবা স্বজনগণ কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া ঐ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন, তখনই প্রকৃতরূপে তাঁহাদের অন্তর হইতে ঐ……ভাব বিদূরিত হয়।

কতিপয় অদূরদর্শী,……প্রকৃত শাস্ত্রার্থাবজ্ঞায়ী, উচ্ছৃঙ্খল ভাবাপন্ন ব্যক্তি বিশেষের অসদুপদেশ ও প্ররোচনায় যে সকল বৈদ্য জাতীয় আপন আপন কর্ত্তব্য বিষয়ের নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়াছেন বা হইতেছেন, তাঁহারা সদুপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত উল্লিখিত সেন মহাশয়ের বিরচিত বৈদ্য নামক গ্রন্থখানিকে সদুপদেশক রূপে সর্ব্বদা সেবা করুন। তাহা হইলেই তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের অবধারণ করিতে পারিয়া স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবেন না।

আমরা বিবেচনা করি, সমস্ত সদ্বৈদ্যদিগের স্বাস্থ্য ও স্বধর্ম্ম সংরক্ষণের সমুদ্দেশে সেন মহাশয়ের সমুদ্ভাবিত বৈদ্য সংজ্ঞক গ্রন্থখানি সদ্‌ বৈদ্য স্বরূপে প্রত্যেক বৈদ্য জাতীয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমবস্থিত হইলে

তাঁহাদের এবং সাধারণের সর্ব্ববিধ সুমঙ্গল সুসাধিত হইবার সম্ভাবনা।

শশ্বৎ স্বধর্ম্ম পরিরক্ষণ রাজ কার্য্য
শ্রীরাজ বল্লভ কুল প্রভবস্য থাক্যাম্।
উচ্ছৃঙ্খলৈ র্জনিত মোহ সুশান্তি কামাঃ,
বৈদ্যাঃ সুচিন্তয়ত শাস্ত্র নিগূঢ় তত্ত্বমিতিশিবম্॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণিশর্ম্মা।
শ্রীযতীন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ তর্ক বাচস্পতি শর্ম্মা।
শ্রীঅনিরুদ্ধ দেবশর্ম্ম—ন্যায়রত্ন।
ভাগবত রত্নোপাধিক শ্রীব্রজ রাজ শর্ম্মা।
কাব্য ব্যাকরণ পুরাণ সাংখ্য দর্শনতীর্থোপাধিক
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ শর্ম্মা।
বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীনিরঞ্জন শর্ম্মা।
কাব্যতীর্থোপাধিক শ্রীআনন্দ গোপাল গোস্বামী শর্ম্মা।
শ্রীকেদারনাথ ব্যাকরণোপাধ্যায় সাহিত্যবিশারদ শর্ম্মণাম্।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অশেষ শাস্ত্রদর্শী
৺ দশমহাবিদ্যাসিদ্ধ ৺ সর্ব্বানন্দ দেব কুলোৎপন্ন
নানাগ্রন্থ প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় মহামহাপাধ্যক
শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়
লিখিয়াছেন—

করি এই 'বৈদ্য' পুস্তকের দ্বারা "বৈদ্য প্রবোধিণীর" ভ্রম বিদূরিত হইবে। বর্ত্তমানে বৈদ্য সন্তানগণ তাহাদের পিতৃপুরুষের আচরিত ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ-করতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিতে ও নামের অন্তে "শর্ম্মা" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার বা নামের অন্তে "শর্ম্মা" লিখিবার অধিকার নাই। পরন্তু অশৌচের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি করায় তাহাদের অম্বষ্ঠ পিতৃপুরুষগণ লুপ্তপিণ্ডোদক হইয়া চিরকাল প্রেতলোকে বাস করিবে। বৈদ্যকুল পরম্পরাগত "গুপ্ত" উপাধি নামের অন্তে লেখাই সঙ্গত। অতএব এই "বৈদ্য" পুস্তক দেখিয়া "বৈদ্য প্রবোধিণী"র ভ্রম সংশোধন করতঃ কোন বৈদ্য সন্তান যেন একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া পিতৃপুরুষগণকে নরকগামী না করে। এবং ঘোরতর সমাজবিপ্লব না ঘটায়। যে সব বৈদ্যেরা "বৈদ্য-প্রবোধিণী" দেখিয়া বা অমূলক হুজুগে মাতিয়া একা-দশাহে শ্রাদ্ধাদি করিয়াছে তাহারা যেন কৃষ্ণ একাদশীতে বা অমাবস্যায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ তাহাদের অম্বষ্ঠ পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব পরিহার করে। অতিবিস্তারেণালমিতিশম্। ১৫ই মাঘ, ১৩৩৩।

সর্ব্ববিদ্যা বংশীয় শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের অভিমত।

ওঁ

ভূগীলহাট।

২৮শে মাঘ।

পরমকল্যাণীয়াস্মং প্রতিপালকবরেষু,

আপনার বৈদ্য গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ন্যায় ও শাস্ত্রসঙ্গত।

বৈদ্যজাতি বৈশ্যবর্ণ, ইহাই আমার মত, এ বিষয়ে কাহারও অন্য মত হওয়া উচিত নহে। বৈদ্যজাতির পঞ্চদশাহ অশৌচ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা কুহকে পড়িয়া বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি করিতেছেন, তাঁহারা প্রেতগণকে নরকস্থ করা ভিন্ন কোন ফল দেখিতেছি না। আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত যোগীনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়দিগকে আপনার বৈদ্য পুস্তক খানি দেখাইয়াছিলাম তাহারাও গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাহারাও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় স্বীকার করেন, বৈদ্য ব্রাহ্মণ স্বীকার করেন না। আপনার লিখিত পুস্তকের দ্বারা বৈদ্য জাতির প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই—বিস্তরেনালং।

যশোহর জিলান্তঃ পাতিভূগীলহাট্ গ্রামবাস্তব্য—শ্রীতারাপদ দেবশর্ম্মা।

অশেষ শাস্ত্রদর্শী ভাটপাড়া নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অভিমত।

শ্রীরাম।

বৈদ্য—রায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাদুরের আর এক খানি পুস্তিকা। এই পুস্তিকায় তিনি তাঁহার বিচার বুদ্ধি ও শাস্ত্রচর্চ্চার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বৈদ্য হইয়া যে ধার্ম্মিকতা ও শাস্ত্রভক্তির উৎকর্ষে সত্যমত প্রচার করিয়া বহু সজাতির বিরাগভাজনতা শঙ্কায় অণুমাত্রও বিচলিত হন নাই, সেই উৎকর্ষ তাঁহাকে ধার্ম্মিক সমাজে প্রশস্য করিয়াছে, ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি। বৈদ্য প্রবোধিনী

করিয়া ভ্রষ্টাচারী হওয়া মনুষ্যত্বের বিরোধী, কারণ শাস্ত্র সংশয় উপস্থিত হইলে ধর্ম্মজ্ঞ পূর্ব্বপুরুষগণের আচারই আর্য্য সন্তানের আশ্রয়। এ আশ্রয় ত্যাগ করা স্বেচ্ছাচারিত্ব, স্বেচ্ছাচারিত্বই পশুত্ব। আরও এক কথা অর্থলোভীর ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন বিড়ম্বনা, অনেক স্থলে অপর পক্ষ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্থ পাইলে লুব্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুনরায় বিপরীত ব্যবস্থা দিয়া থাকেন দেখা যায়।

সম্প্রতি ইহাও ভাবিবার বিষয়—হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন শিক্ষিত বৈদ্য সমাজের কেহ কেহ শাস্ত্রবাক্যের কষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া অথবা অর্থ-লুব্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা করাইয়া তদনুসারে স্মরণাতীত কালের পৈতৃক আচার পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ ব্রাহ্মণ হইলে তাহাদের আদর্শে হিন্দু সমাজের অধস্তন জাতিরা ঐ পথ অবলম্বনে রাতারাতি ব্রাহ্মণ হইবে, অশৌচকাল হ্রাস বোধে অশৌচকাল মধ্যে স্বেচ্ছাচারে শ্রাদ্ধাদি করিয়া ক্রিয়া কাণ্ড পণ্ড করিবে। আদর্শ যাঁহারা তাঁহারাই হইবেন পাপভাক্ সুতরাং ভ্রষ্টাচারা হিন্দুমাত্র আত্মদ্রোহী নন, পরন্তু পিতৃদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী।

হিন্দু সমাজে স্বেচ্ছাচারিত্ব ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িতেছে, আপনার "বৈদ্যের" প্রভাবে ব্যাধি দূর হউক, বিভুপদে ইহাই প্রার্থনা। অল-মতি বিস্তরেণ॥

কলিকাতা ভবানীপুরস্থ ভাগবত চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক বহু শাস্ত্রদর্শী মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ও অন্যান্য অধ্যাপকগণের অভিমত।

শ্রীদুর্গা শরণম্।

ভবানীপুর, ভাগবত চতুষ্পাঠী।
১৮ই মাঘ।

পরম কল্যাণভাজন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ বি, এল মহাশয়ের প্রণীত 'বৈদ্য' নামক পুস্তকখানি পাইয়াছি, এবং মনোযোগের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। ধর্ম্মভূষণ মহাশয় যেরূপ মহনীয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং আজীবন যেরূপ সত্য, সংযম ও সদাশয়তার সেবা করিয়া আসিতেছেন, এ পুস্তক তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য, অকপট ধর্ম্মপ্রাণতা ও অসীম সমাজ হিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে দেশে নানাদিক্ দিয়া সমাজবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, যথেচ্ছাচারিতার তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, কেহই আর পুরাতন আচার ব্যবহারে আস্থাবান থাকিতেছে না, প্রায় সকলেই যেন উচ্ছৃঙ্খলতার আদর পোষণ করিতেছে। দুঃখের বিষয় যে, কতিপয় বৈদ্য সন্তানও সেই গতানুগতিক নিয়মানুসরণ পূর্ব্বক নিজেদের সমাজ মধ্যে বিষম বিক্ষোভের সঞ্চার করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা এখন আর অম্বষ্ঠত্বে তুষ্ট থাকিতেছে না, একেবারে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া বসিয়াছে এবং 'বৈদ্য-প্রবোধিনী' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার দ্বারা আপনাদের সংকল্প সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বলাবাহুল্য যে, ঐ পুস্তিকায় যে সকল বচন প্রমাণ ও জনপ্রবাদ প্রভৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই অপ্রমাণিক অপ্রাকরণিক ও অপব্যাখ্যা কলুষিত, এবং অতিরঞ্জন দোষে দূষিত। ধর্ম্মভূষণ মহাশয় ঐ সকল বচনের প্রকৃত ও সুসঙ্গত অর্থ প্রদর্শন করিয়া 'বৈদ্য প্রবোধিনী' কৃত ব্যাখ্যার ভ্রান্তি ও অসারতা দেখাইয়াছেন এবং বহুতর শাস্ত্রীয় বচনে ও কুলগ্রন্থের সাহায্যে উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, একশ্রেণী

বৈদ্যগণ মূলত: ব্রাহ্মণ নহে, এবং কস্মিন কালেও ব্রাহ্মণোচিত আচার সম্পন্ন বা ব্রাহ্মণ জাতিরূপে পরিগণিত ছিল না। এখনও যে, আমাদের সমাজে এরূপ সত্যনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাত্মা বর্ত্তমান আছেন, ইহা দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্মভূষণ মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া শান্তিভোগ করুন।

আঃ—শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ।
(মহামহোপাধ্যায়)
শ্রীউপেন্দ্রনাথ জ্যোতিঃ শাস্ত্রী।
শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ।
শ্রীনিশিকান্ত সাংখ্যতীর্থ।

বারাণসী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বামাচরণ ভট্টাচার্য্য ন্যায়াচার্য্য ও কটন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব-সরস্বতী মহাশয়ের অভিমত।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথঃ
শরণম্।

সুপ্রসিদ্ধ রাজনগর রাজ বংশ সম্ভূত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের প্রণীত "বৈদ্য" নামক পুস্তকখানা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এই পুস্তক পাঠে সেন মহাশয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় অনায়া-

সেই পাওয়া যায়। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ নহেন—দশাহাশৌচ গ্রহণ করা তাহাদের অকর্ত্তব্য। এই সকল বিষয়ে সেন মহাশয় যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় বলিয়া মনে করি। এই পুস্তক পাঠে বৈদ্যগণের সংশয়াপনোদন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইতি—২০এ মাঘ ১৩৩৩।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবামাচরণ ন্যায়াচার্য্য।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ দেব শর্ম্ম বিদ্যাবিনোদ।

হুগলি কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী এম, এ, পি, এইচ ডি মহোদয়ের অভিমত।

শ্রীহরি

হুগলি কলেজ। ২৬।১।২৭

প্রীতিসম্ভাষণান্তে শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর—

আপনার "বৈদ্য" গ্রন্থখানি আদ্যন্ত বিচার বিশ্লেষণ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া সবিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। আপনার ধর্ম্মভূষণ উপাধি সার্থক—পিতা পিতামহের আচরিত স্বধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এ যুগে বিরল হইলেও আপনাতে তাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়াছে দেখিয়া বুঝিলাম, সনাতন ধর্ম্ম ভবাদৃশ পাত্রে সত্য সত্যই ভূষিত হইয়াছে। পূর্ব্বাচরিত ধর্ম্মের অনুকূলে আপনার বিচার প্রণালী বড়ই হৃদয়াকর্ষিণী। • • • •

আপনার সিদ্ধান্তানুযায়ী জ্ঞান বিশ্বাস আমারও বরাবর ছিল এখনও আছে। এমন কি বহু স্থানে পূর্ব্বে মাসাশৌচের কথাও জানি, এখনও যে স্থানে স্থানে নাই এমন নহে। দশাহাশৌচ পূর্ব্বে কখনও শুনি

নাই। প্রকৃত অবস্থা এই—সুতরাং ইহারা বৈশ্য এবং শূদ্রাচারই জানিতাম।

*　　*　　*　　*　　*

ত্রিপুরা জিলার দেবগ্রাম নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গুরুচরণ তর্ক দর্শন তীর্থ মহোদয়ের অভিমত।

শ্রীশ্রীকালী শরণং।

৪৫ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ৭।২।২৭

আশীর্ব্বিনয় নিবেদনং—

মহাশয়ের প্রেরিত "বৈশ্য" পুস্তকখানি কল্য আমার হস্তগত হইয়াছে।

*　　*　　*　　*　　*　　*

"বৈশ্য" গ্রন্থে আপনি বৈশ্যের বৈশ্যত্ব রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ প্রতিষেধের যে সকল প্রমাণ, যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়াছেন আমার বিবেচনায় ইহা অতীব সমীচীন হইয়াছে। আপনি বৈশ্য জাতিকে আত্মবঞ্চক প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করার চেষ্টা দ্বারা স্বীয় আত্মজ্ঞতা ও স্বজাতি বৎসলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে আপনার ন্যায় আত্মজ্ঞ, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল এইরূপ আমার ধারণা। আপনি কল্পিত আত্মোৎকর্ষের কামনা করেন না ইহা আপনার মহত্ত্বের পরিচায়ক। ইতি—

শুভার্থি—

শ্রীগুরুচরণ শর্ম্মা তর্কদর্শনতীর্থস্য।

জিলা ত্রিপুরা আগরতলা নিবাসী গবর্ণমেণ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ নাথ তর্করত্ন মহাশয়ের অভিমত।

আগরতলা, ২২শে মাঘ।

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

মহাশয়,

আপনার সমালোচিত ও সংগৃহীত "বৈদ্য" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম তাহা পত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব। মন্বাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বৈদ্যজাতির (অম্বষ্ঠ জাতির) সম্বন্ধে যেরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন তাহা অতীব সমীচীন। অতএব তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। এবং আপনার বহু দর্শিতা, সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও মীমাংসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা দর্শন করিয়া জগদীশ্বরের নিকটে আপনার শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

আশীর্ব্বাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ তর্কভূষণ।

বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতি রত্ন মহাশয়ের অভিমত।

বজ্রযোগিনী, ২৫ মাঘ।

কল্যাণবরেষু,

আপনার পত্রসহ প্রেরিত পুস্তিকা পাইয়াছি। আমি নিজে অতি বার্দ্ধক্য হেতু পুস্তকাদি কিছু পড়িতে পারি না। অপরের দ্বারা পড়াইয়া শুনিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্যক আমিও অনুমোদন

করিয়া আপনাকে আপনার সৎসাহস ও স্বধর্ম্মপ্রবণতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ভগবান সমীপে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। ইতি—

আশীঃ

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মণঃ স্মৃতিরত্নস্য।

শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালি চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ এম, এ, মহাশয়ের অভিমত।

আপনার বৈদ্য এবং অন্যান্য কয় খানি গ্রন্থ পড়িয়া আপনার সুচিন্তিত প্রবন্ধের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়া পুষ্টি লাভ করিয়াছে। আপনি হিন্দু ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস করেন। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন সরস্বতী ততটা করেন কি না জানি না। আপনার সিদ্ধান্তগুলি মহামহোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তগুলি অপেক্ষা বেশি শাস্ত্রানুমোদিত, একথা অজ্ঞেও বুঝিবে। বস্তুত বিদ্বান বোধক বৈদ্য কথাটাকে বৈদ্য অর্থাৎ বৈদ্য জাতি বাচক রূপে নির্দ্দেশ করিয়া বিপক্ষ হাস্যাস্পদ হইয়াছেন—এটা বিচারের বিষয় নহে—এটা তামাসার বিষয়। তবে একথাও ঠিক্ যে বৈদ্য কথাটা যে, ইংরেজি ডাক্তার কথাটার মতন ঠিক দুই অর্থ বোধক এবং তজ্জন্য আপনার জাতির পাণ্ডিত্যের দাবী অগ্রাহ্য নহে, তাহা ঠিক্।

* * * *

আপনি প্রচলিত মতের পোষক, কাজেই আমি আপনার মতের সমর্থন করি।

শ্রীবনমালি দেব শর্ম্মা।

গৌহাটী কটন কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রী মহোদয়ের অভিমত।

শ্রীহরিঃ শরণম্।

অশেষ সম্মান ভাজনেষু,

আপনার "বৈদ্য" নামক পুস্তকখানি আমি মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস এই যে, আপনি এ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি আপনার অচলা শ্রদ্ধা ও আপনার স্বজাতীয়গণের প্রতি যথার্থ প্রীতির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনার যুক্তি-তর্ক যিনি ধীরভাবে আলোচনা করিবেন তিনিই আপনার মন্তব্যের সহিত একমত হইবেন বলিয়া মনে করি।

পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যগণকে আমি কোনওদিন পৈতাশূন্য অবস্থায় দেখি নাই; অবশ্য সকলেই যে উপবীতাকারে স্কন্ধদেশে সূত্রধারণ করিতেন তাহা নহে, কিন্তু সকলেরই 'সূত্র' দেখিয়াছি। তাঁহারা সকলেই বেশ সদাচারনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ, এইরূপই দেখিয়াছি। তাঁহারা ১৫ দিনে অশৌচান্ত করিতেন—এইরূপই জানিতাম। অবশ্য, এক্ষণে তাঁহাদের আচারের কোনও ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।

আমি আশা করি, স্বধর্ম্মপরায়ণ আচারনিষ্ঠ বৈদ্যসন্তানগণ আপনার "বৈদ্য" গ্রন্থ পাঠে প্রভূত জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন এবং স্ব স্ব কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠ হইতে পারিবেন। ইতি ৪ঠা মাঘ ১৩৩১।

আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ শর্ম্মা, গৌহাটী, আসাম।

শ্রীদুর্গা জয়তি।

অম্বষ্ঠাপর নামধেয় বৈদ্যজাতীয়ানাং বৈশ্যধর্ম্মিতয়া
পঞ্চদশাহাশৌচ ভাজামেকাদশাহেঽনুষ্ঠিত
প্রেতীভূত পিত্রাদি শ্রাদ্ধমসিদ্ধং, তদসিদ্ধৌ
তাদৃশাম্প্রেতানাং প্রেতত্ববিমুক্তিরপি ন স্যাৎ,
এতাদৃশ যথেষ্টচারিনামম্বষ্ঠানাং পাতিত্যেন
তদ্‌যাজিনস্তদ্‌গেহ ভোজিনোঽপি প্রত্যবায় ভাগিনো
ভবেয়ুরিতি **শ্রীহট্টদেশীয়বিদুষাম্পরামর্শঃ** ॥

অম্বষ্ঠ নামধারী পঞ্চদশদিন অশৌচপালনকারী বৈদ্যগণের বৈশ্যধর্ম্মহেতু একাদশদিনে অনুষ্ঠিত প্রেত পিত্রাদির শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ, এবং শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ হেতু প্রেতপিত্রাদির প্রেতত্ব বিমুক্তি ও হইতে পারে না। এবম্বিধ যথেচ্ছাচারি-বৈদ্যগণের পাতিত্য হওয়ায় তাহাদের যাজনকারী ও তাহাদের গৃহে ভোজনকারী ব্যক্তিগণও প্রত্যবায়ী হইবেন।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের প্রণীত "বৈদ্য" নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বহু আলোচিত হইয়াছে। আমরা আশা করি সমগ্র বৈদ্যকুলের স্বধর্ম্মরক্ষার্থ ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের সুচিন্তা প্রসূত উক্ত গ্রন্থখানি বৈদ্যমহোদয়গণের পূর্ব্বপুরুষাচরিত স্বধর্ম্মরক্ষার বিশেষ সহায় হইবে। ঐ পুস্তকের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত।

১। কাব্যতীর্থ স্মৃতিবাচস্পত্যুপনাম শ্রীপ্রমেশচন্দ্র শর্ম্ম কাব্যসাংখ্যবিনোদানাং।

২। শ্রীতারানন্দ শর্ম্ম কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ বেদান্তবাগীশানাং সম্মতিরত্রাস্তে।

৩। স্মৃতিতীর্থ স্মৃতিবাচস্পত্যুপনাম শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার শর্ম্মণাম্।

৪। বিদ্যাবাচস্পত্যুপাধিক শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মণাং।

। সাংখ্যস্মৃতিরত্নোপনাম শ্রীরোহিণী চন্দ্র শর্ম্মণাম্। ৬। শ্রীতারক চন্দ্র কৃতিরত্ন কাব্য সরস্বতীনাম্।
। শ্রীরামকমল শর্ম্ম শাস্ত্রিণাম্। ৮। শ্রীরমেশচন্দ্র শর্ম্ম স্মৃতিতীর্থাণাং।
৯। শ্রীঅখিল চন্দ্র শর্ম্ম তর্কতীর্থাণাম্। (শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল)। ১০। শ্রীঈশ্বর চন্দ্র শর্ম্ম তর্কতীর্থানাম্।
১১। শ্রীগৌর গোবিন্দ স্মৃতিতীর্থাণাম্। ১২। শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্ম শাস্ত্রিণাম্।
১৩। শ্রীব্রজধন শর্ম্ম কাব্যতীর্থাণাম্। ১৪। শ্রীশিবধন শর্ম্ম বিদ্যার্ণবাণাম্॥

শ্রীরামঃ শরণম্।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহোদয় প্রণীত 'বৈদ্য' নামক পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। যে অভিজাত (বনিয়াদী) বংশে সেন মহাশয়ের জন্ম, এ গ্রন্থ সেই বংশের তপা বিদ্যাবত্তা লোকোপচিকীর্ষা প্রভৃতি গুণে স্বতঃই অভ্যাহিত তাঁহার জাতির গৌরব কোনও রূপে ম্লান করে নাই, পক্ষান্তরে উজ্জ্বলই করিয়াছে। শুধু লোক-পরম্পরাগত ব্যবহারকে সেন মহাশয় ভিত্তি করেন নাই, তাঁহার গ্রন্থে যে যুক্তিপ্রমাণের সমাবেশ আছে তাহা তাঁহার প্রবীণতা ও শাস্ত্রানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিতেছে। বাঙ্গালার বৈদ্যগণ আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনার্থ যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই কুশকাশকল্প তুচ্ছ ও সকল গুলিই শাস্ত্রবচনের এবং শিষ্ট প্রয়োগের কদর্থপ্রসূত ইহা সেন মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেও ভূয়োভূয়ঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় যথার্থই বলিয়াছেন আমরা ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। বর্ত্তমান সময়ে কুশিক্ষার বিষময় ফলের এক আশ্চর্য্য নিদর্শনরূপে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ উপাধি গ্রহণের জন্য ব্যগ্র যাঁহাদের প্রকৃতি ব্রাহ্মণত্বের বিরোধিনী, এবং যাঁহারা ব্রাহ্মণ শিক্ষাদীক্ষার যাহা

কিছু উদার উন্নত ও গৌরবময় তাহা সমূলে ধূলিসাৎ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর।

ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি আমাদের অঞ্চলে যে কয়ঘর বৈদ্য সন্তানকে দেখি ও জানি তাহারা শাস্ত্রোক্ত পঞ্চদশাহ অশৌচই পালন করিয়া থাকেন।

ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি সেন মহাশয়ের মত পরিপক্কবুদ্ধি সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ভক্তিমান্ সদাচার-নিষ্ঠ বৈদ্য সন্তানের দ্বারা বৈদ্যজাতির আত্মগৌরব অব্যাহত থাকুক ও দেশবাসী মোহান্ধ দুরভিসন্ধি পরায়ণ * * * * দুর্নীতিযুক্ত মোহজালে পতিত হইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগকে আকল্পনরকজালে না ফেলেন। এ বিষয়ে ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের প্রণীত পুস্তকখানি পাঠ করিলে কাহারও কোনওরূপ সংশয়ের অবকাশ থাকিবে না। আমরা শাস্ত্রানুসারে বলিতে পারি বৈদ্যগণ কখনই ব্রাহ্মণ নহে, অম্বষ্ঠ মাত্র। যাহারা তাহা না মানিয়া একদশাহে শ্রাদ্ধ করিবেন ও ব্রাহ্মণ বলিতে সাহসী হইবেন তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন এবং পূর্ব্বপুরুষদিগকে আকল্পনরকবাস করাইবেন।

ইত্যলমধিকেন—

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৩।

শ্রীমন্মথনাথ তর্কতীর্থ, ভাটপাড়া।

কলিকাতা, সিমলা দর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রীর অভিমত।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহাশয় প্রণীত "বৈদ্য" নামক পুস্তকখানা পাঠ করিলাম। উহাতে কালীবাবুর ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং

শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় বিশেষরূপ পাওয়া যায়। এই ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে কালীবাবুর পুস্তক খানা যে সমাজের কত উপকার সাধন করিবে তাহা বলা যায় না।

কোন কোন বৈদ্য সন্তান কতিপয়······শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকের মন্ত্রণায় নিজেদের পিতৃপুরুষাচরিত অশৌচাদি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত আচার ও অশৌচাদি প্রতিপালন করিতেছেন। এখন কালীবাবুর এই "বৈদ্য" পুস্তকখানা পাঠ করিয়া যদি সেই সকল বৈদ্যসন্তান নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মরক্ষিত হইবে, সমাজেরও প্রভূত কল্যান সাধিত হইবে। কালীবাবু উক্ত পুস্তকে যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে কোন ভ্রম প্রমাদ আমি দেখিতে পাই নাই।

আশীর্ব্বাদ করি কালীবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের এবং সমাজের মঙ্গল বিধান করুন। ইতি ৯।১১।৩৩

সাংখ্যবেদান্ততীর্থ শাস্ত্রীত্যুপাধিক শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

শ্রীদুর্গা।

শিলচর চতুষ্পাঠীতঃ

সৌরমাঘস্য ত্রয়োদশদিনে

শ্রীযুত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ প্রণীতং বৈদ্যনামধেয়ং গ্রন্থমহং পঠিতবান। শাস্ত্রমর্য্যাদাং সংরক্ষ্য ইদানীন্তনবৈদ্যজাতীনাং মৌলিক পরিচয় প্রদানমপিচশাস্ত্রানুসারিণীযুক্তিরিত্যেতদ্দ্বয়মেবাস্য প্রন্থস্য বিশেষত্বম্। গ্রন্থেঽস্মিংস্তু পনীতবৈদ্যজাতেরশৌচাদি পালন প্রমাণং

গ্রন্থকৃতা সদ্‌যুক্ত্যাসন্নিবিষ্টমতঃ প্রামাণ্যরূপেণায়ং সমাজস্য ভাবি কল্যাণ-মুত্তরোত্তরং সংসাধয়িষ্যতীত্যহমাশংসে।

৺মধুসূদনোজয়তি—
শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ তর্কতীর্থ মহোদয়ের অভিমত।

শ্রীহরঃ শরণম্।

৭২।২ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
১৮ই ফাল্গুন ১৩৩৩ সাল।

শুভাশীর্ভাজনেষু

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর মহোদয়, আপনার অসীম পাণ্ডিত্যপূর্ণ "বৈদ্য" পুস্তক পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। এই বহিতে "বৈদ্য প্রবোধিনীর" অসার বিতণ্ডাগুলি সম্পূর্ণরূপে অতি সরল ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। * * * * এই বৈদ্য পুস্তকে আপনার নানা শাস্ত্রদর্শিতা ও অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইলাম। অতএব আপনাকে শত শত ধন্যবাদ। আপনার দীর্ঘজীবিতার কামনা ৺ভগবানের নিকট করিতেছি। ইত্যলং বিস্তরেণ

নিঃ শ্রীপার্ব্বতী চরণ শর্ম্মণঃ।

পুনশ্চ আপনার এই বৈদ্য পুস্তকে আপনার ধর্ম্মভূষণ উপাধির অন্বর্থতাজ্ঞাপন করিতেছে। বৈদ্যরাজগণের আমল হইতে বৈদ্যগণই আমাদের ধর্ম্মরক্ষক ছিলেন।

আশীঃ শ্রীপার্ব্বতী চরণ শর্ম্মণঃ

ভাটপাড়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ মহাশয়ের অভিমত।

শ্রীরামঃ।   ১৬ই ফাল্গুন।

শুভাশংসনপূর্ব্বক সমাবেদন

কল্যাণীয় কালীচরণ বাবু!

আপনার প্রেরিত "বৈশ্য" গ্রন্থ যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা পাঠাইতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্রটী গ্রহণ করিবেন না। ধর্ম্মভূষণ মহাশয়! আপনার রচিত বৈশ্য পুস্তক খানি অতি উত্তম হইয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থের মত উহা পাঠ সকলেরই কর্ত্তব্য। উপগ্রন্থদ্বারা হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বৈশ্যদের জাতিনির্ণয়ে যাহারা সন্দিগ্ধ, তাঁহাদের সন্দেহ দূরীকরণ বৈশ্যগ্রন্থদ্বারা সুসাধিত হইবেই। বৈশ্যদিগের জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে আপনি যে সকল সদযুক্তি দেখাইয়াছেন ও তদনুকূলে যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা অতি সমীচীন হইয়াছে ইহাই আমার বিশ্বাস। ধর্ম্মতত্ত্বে আপনার প্রকৃষ্ট পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমি অতি মুগ্ধ হইয়াছি। ভগবানের নিকট আপনার দীর্ঘজীবন ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কালাতিপাত কামনা করি।

ইতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং। ভাটপাড়া।

১৯ ফাল্গুন ১৩৩৩।

রায় বাহাদুর!

শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়

আপনার 'বৈদ্য' গ্রন্থ পাঠে সমধিক প্রীত হইলাম। কারণ ইহাতে চিরপ্রচলিত শাস্ত্রীয় সদ্‌ব্যাখ্যাই প্রচারিত হইয়াছে। বৈদ্যজাতি অম্বষ্ঠবর্ণ তবে যাঁহারা উপনয়নাধিকারী তাঁহারাই পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া ষোড়শ দিনে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি সম্পাদনে অধিকারী ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে—আপনার বৈদ্যগ্রন্থে ইহাই সুস্পষ্ট উল্লিখিত না থাকিলেও শাস্ত্রমত রক্ষাই যে আপনার অবিচলিত উদ্দেশ্য তাহা বুঝিয়াছি। আপনার বৈদ্যগ্রন্থের অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা * * * * * * স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদ্যগণের সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া বৈদ্যসমাজের তথা সমগ্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবসর নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার বহুল প্রচার কামনা করি এবং যিনি ইহার রচয়িতা তাহার ও ৺ভগবৎ সমীপে দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইত্যলমতিবিস্তরেণ—

শ্রীবীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং।

কালচক্রের কুটীল আবর্ত্তনের ফলে ভ্রষ্টাচারী কতিপয় ব্যক্তির হৃদয়ে অবৈধ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আবির্ভূত হইয়া যেমন সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটাইতেছে তদ্রূপ ইদানীং কতিপয় * * * * বৈদ্যসন্তান

* * * * শাস্ত্র তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া পুরুষ পরম্পরাগত শৌচাচারাদির পদদলন পূর্ব্বক অবৈধ ভাবে দশাহা-শৌচাদি গ্রহণ করতঃ সমাজে মহান্ অনর্থ ঘটাইতেছেন। এই সময়ে বৈদ্য সন্তান ধাম্মিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় "বৈদ্য" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। * * * * ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া সেন মহাশয়ের শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির এবং সিদ্ধান্ত কুশলত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। উহাতে উনি শাস্ত্র যুক্তি তর্ক দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে বৈদ্যগণ দশাহ অশৌচ গ্রহণে বা শর্ম্মাদি উপাধি ব্যবহারে বা ব্রাহ্মণোচিতানুষ্ঠানাদিতে সম্পূর্ণ অনধিকারী ও ব্রাহ্মণাপেক্ষা নিকৃষ্ট। বস্তুতঃ বৈদ্যগণের একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হইলে বা শর্ম্মান্ত বাক্য প্রযুক্ত হইলে তাহা কদাপি মৃতের প্রেতত্ব পরিহারক হইবেনা। পরন্তু অব্যাহত চির প্রেতত্বের প্রযোজক হইবে, তাদৃশ অবৈধ শ্রাদ্ধকর্ত্তাও চিরকাল অশুচিই থাকিবেন এবং তদনুষ্ঠেয় যাবতীয় কর্ম্ম পণ্ড হইবে। যদি কোন ভ্রান্ত বৈদ্য উক্তরূপে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন তবে পতিত শ্রাদ্ধ বিধানানুসারে ঐ শ্রাদ্ধ পুনঃ করণীয়

অতএব বৈদ্য সন্তানগণের স্ব স্ব পূর্ব্ব পুরুষাচরিত অশৌচাদিই গ্রহণীয় অন্যথা গ্রহণ অবৈধ—ধর্ম্ম শাস্ত্রের ইহাই আদেশ—

"যেনাস্য পিতরো যাতাঃ। যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন দুষ্যতি॥"

এই বচনের টীকাকৃত্কৃত ব্যাখ্যাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত, অন্যবিধ অপব্যাখ্যা সর্ব্বথা হেয়। শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে অসামর্থ্য নিবন্ধন যদৃচ্ছাক্রমে বাক্য প্রয়োগই স্বেচ্ছাচারিত্বের লক্ষণ। ইতি। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ১৫ই মাঘ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শর্ম্মতর্কতীর্থ
অধ্যাপক সারস্বত চতুষ্পাঠী, ঢাকা।

ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের অভিমত—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্।

পরমশুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সাদর সমাবেদনমেতৎ—

মহাশয়!

আপনার বৈদ্যগ্রন্থ পাঠে বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলাম। এই গ্রন্থে আপনি বৈদ্যদিগের উৎপত্তি, আখ্যা, সংস্কার ও আচারাদি সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে অশেষ পাণ্ডিত্য বহুদর্শিতা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা বা প্রাচীন বুধবাক্য দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে, এবং কোন স্থানে শাস্ত্রের অসদব্যাখ্যা বা নিজ মত রক্ষার জন্য অযথা উপায় অবলম্বন করা হয় নাই। এজন্য এই গ্রন্থখানি সত্যজিজ্ঞাসুর নিকট বিশেষ আদরের বস্তু হইবে। কিছুদিন হইতে বৈদ্যসমাজে পূর্ব্বাচার বর্জ্জনরূপ এক বিপত্তির উৎপত্তি হইয়াছে, অনেক আধুনিক শক্তিশালী নির্ভীক কৃতবিদ্য অহিংসশাস্ত্রকে মুচ্ড়াইয়া এই মতের সমর্থন করিতেছেন। আশা করি এই আসন্ন বিপদে অনেক ধর্ম্মভীরু বৈদ্যসন্তান আপনার এই সত্যানুসারে গ্রন্থ পাঠে আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইবেন। কেবল বৈদ্যজাতির নহে, অনেকেরই আজ এই বিপত্তি ঘটিয়াছে, সকলেই আজ আপন ভুজে আপন পঞ্জর ভাঙ্গিতে উদ্যত। সমাজের এই দুর্দ্দিনে সত্য প্রচারের জন্য আপনি যে অধ্যবসায় আয়াস ও অর্থব্যয় স্বীকার করিতেছেন ইহাতে আপনি ৺ভগবদনুগ্রহ ও সকল ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন। ইতি

আঃ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণঃ
২৬ শে ফাল্গুন,
ভাটপাড়া।

ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অভিমত।

৺শ্রীদুর্গা শরণং

ভট্টপল্লী স্বর্ণময়ীচতুষ্পাঠী।
২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৩ সাল।

পরমশুভাশীর্ব্বাদকার শ্রীঅমরনাথ স্মৃতিরত্ন দেবশর্ম্মণঃ—

সমাবেদনমিদং। আয়ুষ্মন্! গতকল্য ডাকযোগে শ্রীযুক্ত বিজয়-কৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ নামে আমার চতুষ্পাঠীর ঠিকানায় ১ খানা বৈদ্যগ্রন্থ আসিয়াছে।

ঐ গ্রন্থ আমূল পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। পরন্তু এই গ্রন্থ প্রচারে স্বসমাজের এবং অন্যান্য সমাজের যে কতদূর উপকার হইয়াছে তাহা শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরই জানেন। এই ধর্ম্মবিপ্লব ও ভ্রষ্টাচার হইতে সমাজ রক্ষা কল্পে যে বহুলায়াস ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা চিরদিন এই গ্রন্থে জাগরূক থাকিবে। এই গ্রন্থে স্বকীয় জাতিধর্ম্ম এবং পূর্ব্বপুরুষীয় আচার, পদ্ধতি সকল, যাহা যাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বহুপ্রাচীন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সে সমস্তই যথাশাস্ত্রীয় জ্ঞানে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলাম। এই সমাজবিপত্তির দিনে শ্রীশ্রী৺পরমদেবতা অবশ্যই আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক পণ্ডিতের অভ্যুত্থান এবং দীর্ঘজীবন দান করিয়া সাধুব্যক্তির পরিত্রাণ এবং পাষণ্ড দমনদ্বারা সমাজ ও জাতিধর্ম্ম পরিরক্ষা করিবেন।

আমার শরীর নিতান্ত অপটু থাকায় অধিক আর লিখিতে পারিলাম না।

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সম্পাদক বিক্রমপুর রাজদিয়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অভিমত।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

স্বধর্ম্মপরায়ণ

শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনার প্রণীত "বৈদ্য" নামক পুস্তিকা পাঠে এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি দর্শনে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। যে সকল বৈদ্যসন্তানগণ অজ্ঞানতা নিবন্ধন শাস্ত্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট ও আচারভ্রষ্ট হইতেছেন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু আপনার পুস্তিকা পাঠে অবশ্যই উন্মীলিত হইবে। আপনি ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন তাহা দ্বারা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। আপনি যে সমুদয় শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণ নহে তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। আমাদের মতেও বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ নহে "অম্বষ্ঠ" তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৈদ্যসন্তানগণের দশাহাশৌচ শাস্ত্রসম্মত নহে, তাহাদের পঞ্চদশাহাশৌচ অথবা পূর্ব্বপুরুষাচরিত অশৌচই প্রতিপাল্য। তাহার অন্যথা করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন। যদি কেহ একাদশাহে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তবে সেই শ্রাদ্ধ পুনরায় কৃষ্ণৈকাদশীতে অবশ্যই কর্ত্তব্য হইবে, অন্যথা তাহাদের পিতৃগণ চিরদিন প্রেতলোকে বাস করিবেন। বৈদ্যগণ, ব্রাহ্মণ কি অম্বষ্ঠ বলিয়া যাহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইবে তাহারা সবত্নে সেন মহাশয়ের প্রণীত "বৈদ্য" নামক

পুস্তকখানা পাঠ করিবেন তবেই সেই সংশয়ের অপনোদন হইবে। ইত্যলমধিকেন। ১৩৩১ সন ২৬শে ফাল্গুন।

শ্রীরাসমোহন বিদ্যারত্ন
সম্পাদক
পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ, বিক্রমপুর,
রাজদিয়া।

সর্ব্ববিদ্যাবংশীয় যশোহর জিলার বেন্দানিবাসী শ্রীযুক্ত হরবিলাস স্মৃতিরত্ন ব্যাকরণতীর্থ ঠাকুরমহাশয়ের অভিমত।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

বেন্দা
১৩৩১২৩শে ফাল্গুন।

স্বস্তি শ্রীহরবিলাস দেবশর্ম্মণঃ—

আপনার প্রেরিত "বৈদ্য" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। আমার মতে বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ নহে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈশ্যধর্ম্মি ইহাতে কোন সন্দেহ নাই সুতরাং তাঁহারা পঞ্চদশাহশৌচ পালন করিয়া ষোড়শাহে শ্রাদ্ধাদি করিবেন, ইহার অন্যথা করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন এবং তাহাদের পিতৃগণের প্রেতত্ব পরিহার হইবে না। যাহারা কতিপয় উদ্ধত বৈদ্যের প্রতারণায় পড়িয়া (প্রবোধিণীতে শাস্ত্রের কদর্থ দেখিয়া) আত্মহারা হইয়া পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মমার্গ ত্যাগকরতঃ দশাহশৌচ পালন করিয়া নামান্তে শর্ম্মাপদ বসাইয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি করিতেছেন, আশাকরি আপনার কৃত "বৈদ্য" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহাদের ভ্রম দূর হইবে এবং কৃষ্ণৈকাদশীতে অথবা অমাবস্যাতে পুনরায় পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করিয়া প্রেতলোক হইতে তাঁহাদের উদ্ধার করিবেন। গ্রন্থখানি বহুপ্রচার আবশ্যক তাহা হইলে উদ্ধত বৈদ্যগণের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে। বিস্তরেণালমিতি।

বাগ্মী-প্রবর অশেষ শাস্ত্রদর্শী ভক্ত শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক বি-এ ভাগবতরত্ন মহাশয়ের অভিমত—

বৈদ্য— [রায় বাহাদুর শ্রীকালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ, বি, এল, প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকারের ৮০ পৃষ্ঠা গ্রন্থ। মূল্য—চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—গৌহাটী।]

হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথা যাঁহারা তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, এখনও চাহেন, বা যাঁহারা জাতিভেদ প্রথা মানেন না, তাঁহারা একরূপ ভাললোক, কারণ তাঁহারা স্পষ্টবাদী। তাঁহারা শাস্ত্র মানেন না, এবং প্রকাশ্যভাবে সে কথা বলিবার সাহস রাখেন। ইঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম যুগের লোক। বর্ত্তমান সময়ে একদল লোকের উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা, হয় নিজের মনের কথা নিজেই জানেন না; অথবা যদি জানেন, তাহা হইলে সে কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলার সাহস তাঁহাদের নাই; তাঁহারা কাপট্যকেই জীবনের ব্যবসায় করিয়াছেন।

বৈদ্য জাতীয় কতকগুলি ভদ্রলোক বলিতেছেন—বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ। তাঁহারা আরও বলেন, সমাজে যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, বৈদ্যেরাই ব্রাহ্মণ! গায়ের জোরে বা কোন ঔষধের দ্বারা, যদি তাঁহারা এই কাজটি করিতে পারিতেন, আপত্তি

থাকিত না। তাঁহারা পুরাতন সংস্কৃত পুঁথির বা শাস্ত্রবাক্যের অন্যায্য, ভ্রান্ত, অস্বাভাবিক এবং অনেকস্থলে হাস্যোদ্দীপক অর্থ করিয়া সেই কদর্থের সাহায্যে এই আন্দোলন চালাইয়া বৈদ্য সমাজের নেতা হইতে চাহেন। জাতীয় চরিত্রের এই অধঃপতন শোচনীয় ও ভয়াবহ। ইংরাজের আইনের ফাঁদে পড়িবার ভয় না থাকিলে, আমরা করিতে পারি না, এমন অপকর্ম্ম নাই—ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

বৈদ্য-সমাজে কি শাস্ত্রজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ এমন কেহ নাই, যিনি এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন? উত্তর—অন্ততঃপক্ষে একজন আছেন। তিনিই এই আলোচ্য গ্রন্থের লেখক। রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন মহাশয় একজন সুপরিচিত ব্যক্তি—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বধর্ম্মরক্ষক। সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, খুব কম লোকেই তাহা করেন, বা করিতে পারেন। ধন্য তাঁহার শাস্ত্রবিশ্বাস, ধন্য তাঁহার সাহস! তিনি নিজে বৈদ্য, রাজা রাজবল্লভের বংশধর। 'হিন্দুর উপাসনা-তত্ত্ব', 'ঈশ্বরের স্বরূপ', "ঈশ্বরের উপাসনা", "বিধবা বিবাহ" প্রভৃতি অনেক সারগর্ভ ও শাস্ত্রীয় সুযুক্তিপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বৈদ্য সংস্কারকগণের ব্রাহ্মণ হইবার যে উন্মত্ত চেষ্টা, সেই চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছেন,—সক্ষম ও সফল প্রতিবাদ। সংস্কারক বৈদ্যমহাশয়গণ শাস্ত্রবাক্যের কিরূপ অস্বাভাবিক ও হাস্যোদ্দীপক অর্থ করিয়াছেন, তাহা তিনি খুব ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অনেক বৈদ্য তাঁহাকে "বিভীষণ" বলিতেছেন। কিন্তু, যাঁহারা শাস্ত্রবাক্য এবং সদাচার স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে—এই গ্রন্থে শাস্ত্রবাক্য ব্যাখ্যার ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তস্থাপনের যে ভঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সত্য, কি না। সংস্কারকগণ শাস্ত্র ও

সদাচারের দোহাই না দিয়া, যদি অন্য উপায়ে ব্রাহ্মণ বা আরও কিছু হইতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানিকে তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারিতেন।

আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আপাততঃ ইহাই বলিতে পারি, যে শ্রদ্ধেয় কালীচরণ বাবু বৈদ্যসংস্কারকগণের ব্যবহৃত শাস্ত্রবাক্যসমূহের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সেই ব্যাখ্যানুযায়ী যে-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এতই অবিসম্বাদিত যে তাহার প্রতিবাদ করার কোনই উপায় নাই। অতএব ব্রাহ্মণত্ব-লোলুপ বৈদ্যমহোদয়গণ শাস্ত্রবাক্যের সাহায্য-প্রার্থী না হইয়া, অন্য উপায়ে অভীষ্টসাধনে অগ্রসর হউন!

আমরা কালীচরণবাবুর সাহস ও শাস্ত্রনিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছি। তিনি শাস্ত্রীয় বাক্যসমূহের যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া যে-মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অবিসম্বাদিত। এই বচনগুলিকে যাঁহারা শাস্ত্রীয় এবং প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা কালীচরণ বাবুর পক্ষই গ্রহণ করিবেন।

কালীচরণ বাবুর সিদ্ধান্ত এইরূপ:—বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ, তাঁহারা মনুকথিত দ্বিজাতি এবং বিপ্রধর্ম্মী, কিন্তু তাঁহারা মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন। ব্রাহ্মণের নিম্নেই বৈদ্যের স্থান; ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈদ্যের স্থান উচ্চ। বৈদ্যগণের সংস্কার মাতৃবৎ অর্থাৎ বৈশ্যানুরূপ। পুরুষপরম্পরাগত পঞ্চদশাহাশৌচ পরিত্যাগ করিয়া অশুদ্ধ অবস্থায় একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিলে ক্রিয়া পণ্ড হয়, প্রেতত্ব মোচন হয় না। পশ্চিম প্রদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্থাপন বাঙ্গালার অতি সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বৈদ্য জাতির পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের নিমন্ত্রণে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া বৈদ্যজাতি-সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে সেই ব্যবস্থাপত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসের বৈদ্য-হিতৈষীনীতে অম্বষ্ঠ শব্দ লোপ করার অভিপ্রায়ে মনু-সংহিতার দশমাধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। ধন্য সাহস! অতঃপরং কিং। অম্বষ্ঠ জাতির কথা যে অন্য স্মৃতিতেও রহিয়াছে।

শ্রীকালীচরণ সেন গুপ্ত।

নিবেদন।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈদ্যব্রাহ্মণ-কুলতিলক আদিশূর দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গদেশ জয় করেন ও বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বঙ্গদেশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের উপযোগী যথেষ্ট ব্রাহ্মণ না থাকায় কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের সন্তান সন্ততিই কালক্রমে সংখ্যায় ছাপ্পান্ন হইয়াছিলেন। তজ্জন্য এক কারিকাতে দেখিতে পাওয়া যায় :—

"পঞ্চগোত্র ছ প্লান্ন গাঁই ইহা ছাড়া বামুন নাই।
যদি থাকে দুই এক ঘর সাতশতী আর পরাশর॥"

এই সকল ব্রাহ্মণের বংশোদ্ভবগণই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বলিয়া বঙ্গদেশে পরিচিত। বৈদ্যকুলোদ্ভব মহারাজ বল্লাল সেনদেব ঐ সকল কান্যকুব্জী ব্রাহ্মণদিগকে সপ্তশতী প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য জাত-ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক রাখিবার মানসে কৌলীন্য প্রথা প্রচলন করেন। আর স্বশ্রেণীর লোক-দিগকে এই সকল যজন ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য একমাত্র "বৈদ্য" অর্থাৎ বেদজ্ঞ, বিদ্বান্ ও ভিষক্ বলিয়া [illegible] করেন। অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরেরা সেই বিদ্বান্ শ্রেণীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কদাচার দেখিয়া ২৫০ শত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। বৈদ্যরাজগণ তাঁহাদের আশ্রিত ও প্রতিপালিত যজন ব্রাহ্মণদিগকে সতত বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু পরশ্রীকাতর অকৃতজ্ঞ যজন ব্রাহ্মণগণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য বঙ্গের সিংহাসন হইতে বৈদ্যরাজের হস্তচ্যুত করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের প্রতিবাদের প্রতিকার।
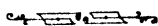
"নবদ্বীপস্থ বিদ্বন্মণ্ডলী" এই নাম দিয়া কে বা কাহারা 'বৈদ্যপ্রবোধনীর সমালোচনা' নামে একখানা হ্যাণ্ডবিল কিছু কাল পূর্ব্বে কাশীধামে বিলি করিতেছিল। কোথা হইতে ইহার উদ্ভব হইল, এই বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে কোন্ কোন্ মহাপ্রভু আছেন বা কোন্ প্রেসে ইহা মুদ্রিত তাহা দেখিতে পাওয়া গেল না। ইহাতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহাশয়কে অভদ্রোচিত ভাষায় গালি দেওয়া ব্যতীত প্রবোধনীর সমালোচনার কিছুই দৃষ্ট হইল না। এরূপ গালি দিয়া কাশীধামের কতিপয় পণ্ডিতমূর্খ নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজয়ের অপমান হইতে বাঁচাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন! এরূপ খেউড় গাওয়া নীচ অন্তঃকরণের ও হীন প্রবৃত্তির পরিচায়ক। এই স্বভাব লইয়াই সংখ্যাধিক্য হেতু ইহারা কাশীধামে রাজত্ব করিতেছে এবং মনে করিতেছে যে, কাশীধাম হইতেই তাহারা বঙ্গদেশ শাসন করিতে পারিবে! তাঁহাদের স্বভাবের পরিচয় কাশীধামের মুদ্রিত ও প্রকাশিত "ঝাঁটা," "চাবুক" ও "জুতায়" কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা পাঠকগণকে তাহা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। হাড়ি, ডোম, মুচি, মুর্দ্দাফরাস প্রভৃতিও এরূপ গালাগালি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ-নাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি কতিপয় মহান্ ব্যক্তি মধ্যে পড়িয়া এক একবার উহা থামাইয়া দিয়াছেন। এতদিন উহারা স্বসমাজের মধ্যেই করি য়াছিতেছিল, এখন আবার বর্ণাশ্রমের অভিনয় করিবে বলিয়া "জুতা"

ও "চাবুক" হজম করিয়াছে ও প্রথমেই নিরীহ বঙ্গীয় বৈদ্যসম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতেছে। উহারা চিরকালই অন্যের পিছনে লাগিয়া আছে এবং কথায় কথায় 'আমি ব্রাহ্মণ" "আমি ব্রাহ্মণ" বলিয়া নিজেরা জাঁক করিয়া থাকে। প্রকৃত কথা এই যে, সাধারণে উহাদের স্বরূপ জানিতে পারিলে কাশীধামে আর উহাদের রাজত্ব থাকিবে না, বুঝি বা অন্নাভাবেই মারা যাইতে হইবে! অন্ততঃ শরীরে ব্রাহ্মণের ছিটা ফোঁটা রক্ত থাকা চাইত! ভরার মেয়ের পেটের সন্তান, যবন-বলাৎকারোৎপন্না মেয়ের সন্তান, হাড়ি মুচি প্রভৃতির বলাৎকৃতা স্ত্রীর সন্তান ও কুলীন কন্যার জারজ সন্তান ও রক্ষিতা নানা জাতীয় বিধবাদের সন্তানগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের রক্ত কতটুকু আছে তাহা সাধারণে জানিতে পারিলে, ছত্রে খাওয়া, অধিষ্ঠান, নিমন্ত্রণ ও পৌরোহিত্য ঘুচিয়া যাইবে। যাহারা দেবীবর, এডু মিশ্র, হুলু পঞ্চাননের ঘটককারিকা, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কুলীনসর্ব্বস্ব, পিয়াসীকাণ্ড প্রভৃতি পুস্তিকা দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে বোধ হয় এ বিষয়ে আর বিশেষ বলিতে হইবে না। ইহা ব্যতীত অপর এক দফ,—বৈদ্যবংশ সম্ভূত রাজা আদিশূর কৃত "সপ্তশতী ব্রাহ্মণ"—তাহাদের ইতিহাস বোধ হয় অনেকেই জানেন। অনার্য্য বিভীষণ "আমি যেন কলির ব্রাহ্মণ হই" এই শপথ ভগবান্ রামচন্দ্রের নিকট করিয়াছিলেন। এতদিনে তাহার অর্থ বোঝা গেল। আজকাল তথা কথিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই এরূপ নিকৃষ্ট জীব যে অনার্য্যেরও ঘৃণার পাত্র। ইহারা **ব্রহ্ম-রাক্ষস** নামে অভিহিত হইবার যোগ্য বটে।

কেশেল পরিচয়

নিম্নে সংক্ষেপে কাশীর কেশেলদিগের পরিচয় দেওয়া হইল :—

কাশীতে যজন ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা বাঙ্গালীদের মধ্যে বোধ হয় শতকরা ৭৫ জনের কম হইবে না। দিন দিনই ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অযোগ্যতা বশতঃ দেশে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে না পারিয়া অধিকাংশই কাশীতে আসিয়া হাজির হইয়াছে। যাহারা জাল, জুয়াচুরি ও বদমায়েসি করিবার জন্য দেশে স্থান পায় নাই তাহারাও মা অন্নপূর্ণার দরজায় উপস্থিত। এরূপ ব্রাহ্মণের রক্ষিতা বিধবাদের সন্তান এবং যে সব বিধবা গর্ভবতী অবস্থায় উপপতির সহিত বাহির হইয়া কাশীতে আসিয়াছে, তাহাদের সন্তান উহাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। উহাদের মধ্যে বণ্ডামর্কগণ আবার স্থানে স্থানে দলপতি সাজিয়া আছে। পুচ্ছধারীদের মধ্যে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়া কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছে এবং তাহাতেই মহাপণ্ডিত হইলাম ভাবিয়া অপরের পশ্চাতে লাগিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশই সামান্য সংস্কৃত জানুক আর নাই জানুক, পৌরোহিত্য করিবার জন্য, অধিষ্ঠান ও নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য, বিদ্যারত্ন-শিরোমণি প্রভৃতি লেজ গায়ের জোরে ধারণ করিয়াছেন। পণ্ডিতদিগের রক্ষিতা বিধবার অভাব নাই, তাহাদের সন্তানেরাও ব্রাহ্মণ হইতেছে। কেহ কেহ বা স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া আসিয়া নীচ জাতীয়া বিধবা লইয়া বাস করিতেছে। তবে কাশীর সকলেই যে এরূপ তাহা নহে। পূজা পাইবার উপযুক্ত লোকও কাশীতে আছেন, কিন্তু সেরূপ লোক দুই চারি জন ব্যতীত বাহির করা দুঃসাধ্য।

ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া কাশীতে দাঁড়াইলে তাহার অন্নের অভাব হয় না। এক বেলার অন্নের জন্য সঙ্গে সঙ্গে উহাদের [illegible]

(তবে সংখ্যাধিক্যের জন্ম, ও ছত্রের নায়েব মহাশয়দিগে অনুগ্রহে খরচের কার্পণ্য হওয়ায়, অধুনা শুঁড়ী প্রভৃতি জাতিদিগে সত্রেও ভর্ত্তি হইতে সই সুপারিশ লাগে)। অন্ন বেলার সংস্থান ভিক্ষা সাধারণ স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য জাতির অধিষ্ঠান ও ভোজন দক্ষিণা। অস্পৃশ্যকে দেশে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইলে নবশাখের ব্রাহ্মণ পায় না কিন্তু কাশীতে তাহার অভাব হওয়া দূরে থাকুক, এইরূপ নিমন্ত্রণ পাইবা জন্ম ব্রাহ্মণেরা দলপতির বা কর্মকর্তার কর্মচারীর খোসামোদ করিয়া বেড়ায়। অন্যথা বাবা বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, মা অন্নপূর্ণার দরজা চাদর পাতিয়া বসে। পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতগণের আগরতলা-ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে অর্থলোভে জলযোগ করায় গোঁপদাড়ী রাখিয়া চতুষ্পাঠী সাজিতে হইয়াছিল, পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া রক্ষা পায়! তাহারা অকাতরে কাশীতে ছোট বড় সকল টীপ্‌রার বাড়ীতে ভোজন ও সোনাদান গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কাশীতে যখন সকল তীর্থই বর্ত্তমান তখন শ্রীক্ষেত্রও আছে; তাই সকলের অন্নই গ্রহণ করা যায়! আর কলিতে সোনাদান গ্রহণ করিবার জন্যও নাকি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্যবস্থা আছে! রাঁধুনীর কার্য্য করিয়া বা অন্যান্য অসদুপায়ে কাহারও কাহারও রক্ষিতা বৈকাল বেলার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ তামাক, টিকে, মেটে হুকা, কল্কে, বিড়ি, ঝাঁটার শলা, পান, তরকারী প্রভৃতির ছোট ছোট দোকান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী টোলার এ দোকান উহাদের একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চাল, ডাল, গুড়, চিনি, লবণ, তৈল, ঘি, কয়লা প্রভৃতির দোকানও বাঙ্গালী টোলায় উহাদের একচেটিয়া বলিতে হইবে। আবার যাহারা কিছু পয়সা করিয়াছে তাহারা যাত্রী-তোলা, এবং সধবা ও কুমারী ভোজনের দালালিও করিয়া থাকে। কখনও কখনও ছোট ছেলেকে ভো

কাপড় পরাইয়া কুমারী বানাইয়াও থাকে। সধবা স্ত্রীলোকেরা রাঁধুনী ও অধবা ভোজনের ব্যবসা করে। যাহারা দালালের মারফতে যায় তাহাদের কেবল খাওয়াটী ও নগদ চারটী কি ছয়টী পয়সা হয়, আর অন্যান্য জিনিষ দালাল গ্রাস করেন। এই সব সধবা অবশ্য কেহ কেহ বাছিয়া লইবার চেষ্টা করে, কারণ যাহারা দেশ হইতে দেবর-ভাসুর অথবা অন্য কাহারও সহিত বাহির হইয়া আসিয়াছে, অথবা যাহারা নীচ জাতীয়া হইয়াও ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে আছে, তাহারাও লাল পেড়ে কাপড় পরিয়া সধবা সাজিয়া থাকে। বিধবাদের রান্নার ব্যবসাই প্রধান। তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা যুবতী ও প্রৌঢ়া, তাহারা প্রায় যুবক মনিব খুঁজিয়া লয়। বৃদ্ধা হইলে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিক্ষাই সম্বল। এত সুবিধা পৃথিবীর কোথাও জুটিবে না, তাই কাশীতে বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত অধিক।

অবশ্য যজন ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রতিগ্রহ করেন না, শিক্ষাগুণে উন্নত হইয়াছেন ও কেবল শান্তিলাভের জন্যই ৺বিশ্বনাথের চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, এমন লোকও যে না আছেন তাহা নহে, তবে তাঁহাদের সংখ্যা বড়ই কম, এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হইতেছে না।

সতী, ব্রহ্মচারী, আনন্দ ও স্বামীদিগের বিবরণ আরও চমৎকার। ইহাদের মোহে পড়িয়া যে কত শত সম্ভ্রান্ত ও ধনী কুলললনা কুলে কালী মাখাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আবশ্যক হইলে তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির প্রতি অযথা আক্রমণ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী একজন ধীর স্থির, শান্ত, বিদ্বান, মিষ্টভাষী, চরিত্রবান্ ও পরোপকারী মহাশয় ব্যক্তি কত রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও বৈদ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার কৃপায় প্রতিপালিত হইতেছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় একজন অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার চিকিৎসার ও বিদ্যার যশ ভারতের দেশ দেশান্তরে বিঘোষিত হইয়াছে। বহু দেশদেশান্তর হইতে স্বাধীন রাজ মহারাজেরা ও ইংরাজেরা পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতেছেন। বহু দূরদেশ হইতেও ব্রাহ্মণেরা আসিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতেছেন ও গুরুজ্ঞানে পূজা করিতেছেন, (কেশেন ব্রাহ্মণ ত কোন ছার)। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত একাধারে এতগুণ কখনই থাকিতে পারে না। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দেখিলে শত্রুর হৃদয়েও স্নেহ প্রীতি ও ভক্তির উদ্রেক না হইয়া পারে না। নবদ্বীপের মূর্খমণ্ডলী নিতান্ত পাষণ্ড ও অজ্ঞ বলিয়াই এইরূপ মহাপুরুষকেও সামান্য "গণনাথ" "গণনাথ" বলিয়া সম্বোধন ও প্রতারক বলিয়া গালি দিয়াছে। নদীতে মূর্খ নাবিকগণ সারি গাহিয়া যায়, তাহাতে নদীর জল নষ্ট হয় না। সামান্য ঝড়ে বটবৃক্ষকে কিছুই করিতে পারে না, কুকুর ঘেউ ঘেউ করিলেও সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। সমালোচকের লেখা হইতে অনুমান হয় যে, সে তাহার নীচ প্রবৃত্তি ও জন্মগত দোষের পরিচয় দিয়াছে মাত্র। জহরী না হইলে জহর চিনিতে পারে না, সেইরূপ বিদ্বান না হইলে বিদ্বানের সম্মান রাখিতে পারে না। সর্ব্বসাধারণে যাহাকে সম্মান করিয়া থাকে তোমাদের ন্যায় নগণ্য মূর্খ তাঁহাকে গালি দিলে সকলেই তাহা পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে করিবে।

না করিলে কোন কোন বামুনের অন্ন যে মারা যায়! এখন বল দেখি, এই জাতিগুলির পিতৃপুরুষগণের কি গতি হইবে? আর ব্যবস্থাপক, তোমাদের গতিই বা কি হইবে? আবার আর এক কথা, বহু পুরুষ পরম্পরায় কতকগুলি সংস্কারবর্জ্জিত বৈদ্যবংশীয়কে পুনরুপনয়নের জন্য ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের বিধি কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশবাসী প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ, (যাঁহারা তোমাদের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ বা তৎস্থানীয়) দিয়া গিয়াছেন। এখন তোমরা বলিতেছ যে, উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কাজে কাজেই হয় তোমাদের পিতা পিতামহাদি মূর্খ অথবা মিথ্যাবাদী ছিলেন, নয় তোমরা মূর্খ বা মিথ্যাবাদী এবং বৈদ্যদিগের নিকট অর্থ পাইবার আশায় এরূপ খেলা খেলিতেছ! বৈদ্যগণ দাতা বটেন কিন্তু এরূপে অর্থ ব্যয় করিতে ঘৃণা বোধ করেন। যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে তোমাদের পিতা ও পিতামহাদির কি গতি হইয়াছে ও তাহাদিগকে নরক হইতে উদ্ধারের কি উপায় করিয়াছ? তোমরা আপনাদের চরকায় তেল দাও, তোমাদের নিজেদের পিতৃপুরুষদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা কর। বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ তোমাদের মতামতে কর্ণপাত করেন না। ক্রোধকরা ত দূরের কথা, তোমাদের উপদেশপূর্ণ পুস্তক পুস্তিকাগুলি আমাদের ছেলেদের মলমূত্র পরিষ্কার করিবার জন্য রক্ষিত হয়। তোমরা স্থির জানিও বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ তোমাদের ব্রাহ্মণ্য একেবারেই অস্বীকার করেন।

আর এক দফা—কর্ম্মকার, ঝাল ও মালদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে সহজে ক্ষত্রিয় বানাইবার প্রলোভন দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছ? কর্ম্মকারদিগকে বলিতেছ, যে কোথায় একটা কামান বাহির হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মকারের নাম লিখা আছে; কামান, যুদ্ধে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই ব্যবহার করে, অতএব তোমরা ক্ষত্রিয়। তোমরা এখন হইতে

...ধি উপাধি লও ও ক্ষত্রিয়াচার পালন কর, আর শূদ্রাচার পালন করিও না। কর্ম্মকারেরাও কেহ কেহ তাহাই করিতেছে ও তোমাদিগকে অকাতরে অর্থ প্রদান করিতেছেন। যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা সহজেই ক্ষত্রিয়ত্ব অর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহারা তোমাদের প্রলোভনে এইরূপে ঠকিতে ছেন। কামানের নির্ম্মাণকারক কর্ম্মকারের নাম বোধ হয় আছে। কর্ম্মকার ক্ষুর, নরুণ, ছুঁচ প্রভৃতি সকল লোহার দ্রব্যই প্রস্তুত করে; ক্ষুর, নরুণ ইত্যাদি করে বলিয়া নাপিত হইবে, না ছুঁচ করে বলিয়া—দর্জ্জি বা জুতা সেলাইকারক মুচি হইবে? কর্ম্মকারদিগের চাসবাস ও ব্যবসায় বৃত্তি, বৈশ্য বলিলে ত কেহই ঠেকাইতে পারে না। তাহাদের সহিত এমন প্রতারণা কেন?

এখন বল দেখি প্রতারক কে?

বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য দেখিয়া ঈর্ষাবশতঃ তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য বহুকাল হইতেই শাস্ত্র হইতে শ্লোক ত্যাগ, শাস্ত্রের পাঠ পরিবর্ত্তন, জাল বচন প্রক্ষেপ ও ব্যাসের নাম দিয়া নানা পুরাণ (যাহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে কখনও ছিল না) সৃষ্টি করিয়াছ ও করিতেছ। টীকাকারেরাও স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্লোকের অপব্যাখ্যা করিয়া মনগড়া টীকার সৃষ্টি করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে তাহা ধরা পড়িতেছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তদানীন্তন অদ্বিতীয় পণ্ডিত রঘুনন্দন পর্য্যন্তও প্রতারণা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাহা তোমরাই স্বীকার করিতেছ ও বলিতেছ যে, তাঁহার মত সকল স্থানে সমীচীন হয় না। তাহার কারণ দেখাইয়াছ যে তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মণই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁহার একটি প্রতারণার উদাহরণ দিয়ে দেওয়া গেল। পাঠকগণ দেখিবেন যে তিনি ব্রাহ্মণ

হারাইয়া একমাত্র প্রাধান্য রাখিবার জন্য, গায়ের জোরে ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত জাতি নির্ম্মূল করিয়া একমাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুই জাতি রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও তাঁহার কথা কেহ গ্রাহ্য করে নাই। কেবল কুটিল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সাহায্যে তাঁহার স্মৃতি একমাত্র বঙ্গদেশে প্রচলিত। এ অবস্থায় ধর্ম্ম কিরূপে থাকিতে পারে, পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। ভারতের ধর্ম্ম একরূপ ও বাঙ্গলার ধর্ম্ম অন্যরূপ। হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা যে অহিন্দু হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

রঘুনন্দন মনুর এই শ্লোক ধরিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকল জাতিকে শূদ্র বলিয়াছেন, অম্বষ্ঠকেও বাদ দেন নাই। পাঠকগণ দেখুন, এই শ্লোকে অম্বষ্ঠের নাম গন্ধ আছে কিনা? বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা করে বলিয়া তাঁহার মতে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ! বৈদ্যগণকে নির্য্যাতন করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় নয় কি? বঙ্গদেশে কি কারণে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি একেবারেই দৃষ্ট হয় না? কিন্তু অন্যান্য দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব নাই। রঘুনন্দনের শাসন একমাত্র বঙ্গদেশেই দেখিতে পাই। কাজেকাজেই বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। তখন ক্ষত্রিয়াদির ব্রাহ্মণ না দেখিবারই বা কারণ কি? তখন কি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ছিল না? রঘুনন্দন কি নিজেও ব্রাহ্মণ নহেন? না ক্ষত্রিয়াদির দৃষ্টি-শক্তির লোপ হইয়াছিল? কিম্বা তাঁহাকে পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে তিনি নিজেকে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ রঘুনন্দন স্বীকার করিতেছেন যে, তদীয় আত্মীয় ব্রাহ্মণগণ (রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র) কেহই ব্রাহ্মণ নহেন, যেহেতু তাঁহারা থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ অ

অদর্শনবশতঃ বাঙ্গালায় অন্যান্য জাতির শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে! তবেই বুঝুন রঘুনন্দের বুদ্ধিটা কেমন সূক্ষ্ম!

'ইমাঃ' শব্দের অর্থ কি ইদানীন্তন, না, এই সকল? পরের দুইটী চরণ (যাহা রঘুনন্দন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন) দেখিলেই রঘুনন্দনের প্রতারণা ধরা পড়িবে—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥

অর্থাৎ পৌণ্ড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোডিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের ক্ষত্রিয়াদি ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাওয়ায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সমস্ত ক্ষত্রিয়াদি নহে। ঐ সকল স্থানে সে সময় ব্রাহ্মণ ছিল না। কিন্তু ঐ বচনে বঙ্গীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা দেখিয়া নিজেরা শূদ্র হওয়ার ভয়ে শ্যামাচরণ তাঁহার আহ্নিককৃত্যেও বলিয়াছেন যে, একথা বলে যাবতীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের শূদ্রত্ব প্রতিপাদন সমীচীন হয় না; তাহা হইলে ইদানীন্তন অধিকাংশ (সমস্ত) ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব সিদ্ধ হয়।" (আহ্নিককৃত্য ৩য় সংস্করণ ৩৩০ পৃঃ)।

বঙ্গদেশ কি ভারতবর্ষের বাহিরে? এখানে কি কখনও ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য ছিল না? রঘুনন্দনের এরূপ অত্যাচারে ক্ষত্রিয়াদি জাতি কায়স্থ বা অন্যান্য নবশাখের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত চকদিঘির বাবুরা ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এইরূপ কত পরিবার কতস্থানে লুকায়িতভাবে আছে তাহা কে বলিতে পারে? এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয় বর্ত্তমান। সদ্ব্রাহ্মণেরাই— রঘুনন্দনের আত্মীয়েরা নহে—তাঁহাদের ক্ষত্রিয়াচারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সুতরাং এই মিথ্যা কথার মূল্য কি? হায়! এখন তাঁহাদের বিশুদ্ধ সংস্কারই বা কোথায়, আচার ব্যবহারই বা কোথায়? এই সকলের

কাহারা দায়ী ও পাপভাগী ? নরকে তাহাদের স্থান কোথায় ? তোমরা ত তাঁহারই শিষ্য ও তাঁহার স্মৃতিই নাড়াচাড়া কর এবং তাহা হইতেই তোমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি। আবার গবাখাদির বুদ্ধিসম্পন্ন মেধাতিথি ও কুল্লূকের টীকাই তোমাদের সম্বল, তাই তোমাদের বুদ্ধিও তদ্রূপ হইয়াছে। এই মুখে আবার তোমরা ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া আস্ফালন কর, ধর্ম্মকে বাজারে আনিয়া কেনাবেচা করিতেছ, এই কি ব্রাহ্মণের লক্ষণ ? ধিক্ তোমাদিগকে! তোমরা লিখিয়াছ—"বৈদ্য প্রবোধনী পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, পুস্তকখানি প্রতারণাজালে আচ্ছন্ন ····· যে অংশে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ইত্যাদি" প্রবোধনী পাঠ পূর্ব্বক কেবলমাত্র "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" এই চরণটীই প্রতিবাদ যোগ্য মনে করিয়া ঢাক টিপিতে আরম্ভ করিয়াছ! রান্নার ব্যবসায়টীই আজকাল তোমাদের প্রধান ব্যবসায় কিনা, তাই ভাত টেপা-টেপির খবর বেশী রাখ। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের পরিচয় রান্নার ব্যবসায় হইতেই হইবে!

প্রবোধনীতে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" লেখায় কি প্রতারণা করা হইয়াছে আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দ্বিজের মধ্যে বৈদ্যগণই (অর্থাৎ বেদজ্ঞগণই) শ্রেষ্ঠ। ইহা কি এই চরণের অর্থ নয় ? কালীসিংহের মহাভারতে তোমাদের প্রধান প্রধান ১৮ জন পণ্ডিত এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। 'বৈদ্য' শব্দের অর্থ—"বেদং বেত্তি অধীতে বা" অথবা "বিদ্যাং জানাতি"। প্রবোধনী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া—বৈদ্য শব্দ কি ছাড়িয়া দিয়াছে বা অন্য অর্থ করিয়াছে ? বৈদ্য, বিদ্বান্ বেদজ্ঞ ইহাতে কিছু প্রভেদ্ আছে কি ?

যে বাক্যের যতটুকু দরকার পণ্ডিতেরা তাহাই দেখাইয়া থাকেন। প্রবোধনীতে মহাভারতের সমস্ত অধ্যায়টী উঠায় নাই,—এই হইল দোষ! [illegible] অধ্যায়টী উঠাইলে [illegible] কি হইত ? প্রবোধনী কি বৈদ্যকে

কৃতবুদ্ধি বা কর্ত্তা, বা ব্রহ্মবেদী হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেই ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণ হয় না। মহাভারতের এই শ্লোকটী নিম্নলিখিত মনুর শ্লোকের ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমরা সমালোচনার ৪ পৃষ্ঠায় "মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ" এই দুটী শব্দ লিখিয়াই কেবল অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর বানাইতে চাহিতেছ, কোথা হইতে এই বাক্য আসিল তাহার উল্লেখও কর নাই, সেটা কি প্রতারণা নহে? আমরা বলিয়া রাখি, এই বচনটী জাল, যেহেতু ইহা মনুবিরুদ্ধ। মনু বলিয়াছেন—শূদ্রাণাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ—বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রধর্ম্মা অতএব শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত, মাতৃবর্ণ নহে। মনু বলিয়াছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥ ১।৯৬—৯৭।

মহাভারতে "ব্রাহ্মণাঃ" এই পদের স্থানে "দ্বিজাঃ" ও "বিদ্বাংসঃ" স্থলে "বৈদ্য" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বকালে অর্থাৎ বর্ণ বিভাগের পূর্ব্বে সকল আর্য্য জাতিই একবর্ণ অর্থাৎ "ব্রহ্ম" বা "ব্রাহ্মণ" ছিলেন। পরে দুই বর্ণ দ্বিজ ও শূদ্র হয় ও তৎপরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণ হয়। এই সকল আর্য্যসন্তান সকলেই বেদোপনয়নে দ্বিজ ছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যাখ্যায় দ্বিজ করা হইয়াছে। এই দ্বিজের বা ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা সর্ব্ব বেদজ্ঞ বা সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ বিদ্বান্ ছিলেন তাঁহাদিগকে "বৈদ্য" বলা হইয়াছে।

উশনা এ সম্বন্ধে বলেন—

"সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যশ্চাভিধীয়তে॥"

এখন দেখ বৈদ্য বিদ্বান্ বা বেদজ্ঞ কিনা। এই অর্থেই ব্যাস 'বিদ্বাংসঃ" পদের ব্যাখ্যা "বৈদ্য" করিয়াছেন। এখন প্রতারণা কি করিয়া করা হইল বল দেখি? প্রবোধনীর প্রদর্শিত অন্যান্য প্রমাণের বিরুদ্ধে যথা—১। বিদ্যাবত্তায় বৈদ্যের শীর্ষস্থানীয়তা, ২। প্রাচীন বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাপক পরিচয়, ৩। বৈদ্যের চাতুর্বর্ণ্য সমাজনেতৃত্ব, ৪। চিরন্তন বেদাধ্যয়ন প্রসিদ্ধি, ৫। সমগ্র ভারতবর্ষে বৈদ্যের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব, ৬। ব্রাহ্মণোচিত কুলাচার, ৭। প্রতিগ্রহাধিকার, ৮। বিশুদ্ধ বৃত্তি, ৯। বৈদ্যগণের স্মার্ত্তত্ব, ১০। সংস্কৃত গ্রন্থ কর্ত্তৃত্ব, ১১। দেশান্তরে সমানোপাধিক ও সমানগোত্রীয় ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব, ১২। ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধি, ১৩। ব্রাহ্মণোচিত উপাধি, ১৪। গুরুবৃত্তি, ১৫। অধ্যাপনাধিকার) কোন কথা বলিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া বুঝি এই ধোকা দিয়াই কিস্তি মাৎ করিতে চাও? ইহার মধ্যে বুঝি আর টেপাটেপি চলে না? ভাল করে ভাতের হাড়ি নাড়িয়া দেখ। উহাই তোমাদের জাতি ব্যবসায়। এখন দেখ প্রতারক কে।

"ধর্ম্মে বিশ্বাস" "ধর্ম্মে বিশ্বাস" বলিয়া চীৎকার করিতে কি তোমাদের একটু লজ্জাও বোধ হয় না! সাধারণের ধর্ম্মে বিশ্বাস নষ্ট কে করিল? তাহার জন্য দায়ী কে? যেমন যবন ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ যবন-দোষে দুষ্ট হইয়া দেবদেবী ধ্বংস করিয়া কালাপাহাড় হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমাদের টীক-কারিকামতে তোমরাও যবন-দোষে দুষ্ট, ও তোমরাই কালাপাহাড় সাজিয়া ছল চাতুরী ও শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ইত্যাদি করিয়া সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মকে রসাতলে দিয়াছ। তোমরা কোন মুখে আবার ধর্ম্মের কথা উল্লেখ কর? যেখানে সন্দেহ থাকে সেখানে কুলাচার দেখিবার দরকার হইতে পারে। বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। তোমরা যদি চতুরতা না খেল ও তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞান থাকে তবে একথা স্বীকার

করিবে। প্রবোধনীতেই দেখান হইয়াছে যে, "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে"॥ পিতা মাতামহ যে পথে গিয়াছেন, সে পথ যদি সৎপথ হয়, বে সেই পথে গমন করিলে কোন দোষ হয় না। বৈদ্যের বৈশ্যাচার খন কাদাচার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তখন পিতা পিতামহ তাহা পালন করিলেও, তাহার পরিবর্ত্তনে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ইহা প্রবোধনী পূর্ব্বেই দেখাইয়াছে। তবে চাতুরী কেন? ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে অসংস্কৃত বৈদ্যগণ ও স্ত্রীলোকেরা বৈশ্যাচার পরিত্যাগ করিতে ভয় পাইবে? তোমাদের ন্যায় যবন ও অন্ত্যজ সন্তানের উপদেশ বৈদ্যগণ কখনই গ্রহণ করিবেন না। তোমাদের দ্বারা যাহারা যাজনিক কার্য্য রায় তাহাদের যে সদ্গতি হইতে পারে না এবং অসদ্গতি যে হইবেই তাহা তোমাদের কুলজিই তারস্বরে বলিয়া দিতেছে। এ সকল কথা জানিলেও সৌজন্যবশতঃ বৈদ্যগণ একথা প্রকাশ করেন নাই। তোমারা যত ইচ্ছা ঘেউ ঘেউ কর। শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচার মত কার্য্য করিলে, সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না এবং কর্ম্মকর্ত্তাও সুখ বা সদ্গতি লাভ করিতে পারে না, ইহা প্রবোধনী দেখাইয়াছে। যে বৈদ্য তোমাদের ধোঁকায় পড়িয়া এখনও বৈশ্যাচার পালন করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় পণ্ড হইবে ও তাহার সদ্গতি হইবে না। আশা করি বৈদ্য মহোদয়গণ এই সকল পাষণ্ডের ধোঁকায় না পড়িয়া আত্মরক্ষার জন্য সাবধান হইবেন। যজন ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার ও ধোঁকায় পড়িয়া কয়েক পুরুষ যাবৎ বৈদ্যগণ বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহা কুলাচার নহে। সেই প্রত্যবায়ের ভাগী উহারাই হইবে। যাহারা অর্থের মোহে পড়িয়া পবিত্র শিখা পর্য্যন্ত স্বর্গীয় কালীসিংহকে বৈঠকখানা সাজাইবার জন্য বিক্রয় করিয়াছে, যাহারা অর্থলোভে মাথামুণ্ডন না করিয়া শিক্ষ

মাতৃশ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা দেয়, যাহারা অর্থলোভে কৌলীন্যের ব্যবসা খুলিয়া ছিল, এমন পাষণ্ডদিগের বাক্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন না।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-সংহিতাতে বৈদ্য শব্দেই ব্রাহ্মণের বিশেষণরূপে আছে, ব্রাহ্মণ শব্দ বৈদ্যর বিশেষণ নাই. ধোঁকা দিলে চলিবে কি? বিপ্র হইতে বৈদ্য হয়, তাহা উশনার বচন হইতেই দেখান হইয়াছে। ব্রাহ্মনির্ঘণ্ট, বৈদ্য কে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "বিপ্রো বৈদ্যক-শাস্ত্রপারগঃ" ইত্যাদি বলিয়া প্রথমেই বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ তাহা বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈদ্যের সহিত তোমাদের তুলনা কিসে? তোমরা অনভিজ্ঞ জাতিগুলির নিকট হইতে মোটা মোটা প্রতিগ্রহ করিয়া ও অন্যান্য দুষ্কর্ম্ম করিয়া পেট চালাইতেছ বলিয়া বৈদ্যগণের লোভের বা হিংসার কারণ নাই। ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে প্রতিগ্রহ ও যাজন সম্মানজনক নয় বলিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণগণ প্রতিগ্রহ পর্য্যন্ত সহজে করিতেন না। দ্বারে দ্বারে যাইয়া চাউল কলা কুড়ান ত দূরের কথা। রাজার জাতি দান করিতেই জানেন, প্রতিগ্রহ করাটা অপমান বোধ করেন। তাই বৈদ্যগণ অধুনা নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িলেও, সহজে অন্য জাতির দ্বারে অর্থ সাহায্যের জন্য যাইতে অপমান বোধ করেন। এমন কি উপবাস করিতেও রাজি, তথাপি সহজে স্বজাতির নিকট হইতেও চাউল গ্রহণ করিতে রাজি হয় না। হায়! কালের কুটিল গতিতে ও ভীষণ দারিদ্র্যে এ প্রথার সামান্য কিছু শিথিলতা হইতেছে দেখিয়া অনেকেই ব্যাহত হইতেছেন। ইহা তোমাদের মধ্যে যদি কেহ একেবারে সত্যের অপলাপ করিতে অনভ্যস্ত থাকে, তবে অবশ্যই স্বীকার করিবে। তোমাদের মত লোকের মুখেই ছোট কথা শোভা পায়। যদি তোমাদের ধমনীতে কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বিন্দুমাত্রও রক্ত থাকিত,

...কখনও এ সব কথা বলিতে পারিতে না। বৈদ্যগণ চিরকালই দান করিতে মুক্তহস্ত এবং তাহাতেই তাঁহাদের দরিদ্রতা আনয়ন করিয়াছে। শাস্ত্র বলে—"কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ"—তোমাদের এখন কি গতি? চক্ষু থাকে ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অবস্থা মনে করে দেখ। কর্ণ থাকে ত যামিনীভূষণের দানের কথাও অবশ্য শুনিয়া থাকিবে। "লক্ষ টাকায় বামুন ভিখারী"—আমরা আশীর্ব্বাদ করি তোমরা চিরকাল পূজা পৌরোহিত্য ওয়ারিশান্ ক্রমে ভিক্ষা করিতে থাক। "লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন", বিশ্বনাথের কৃপায় বৈদ্যসন্তান যেন এই বাক্য চিরকাল প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারে।

মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন শর্ম্মা সরস্বতী মহাশয় বিচার করিয়া যশোলাভ করিতে নবদ্বীপ যান নাই। তিনি একজন বিদ্বান্ ও সুচিকিৎসক বলিয়া ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ সকলের নিকটেই পরিচিত। ফুলের সৌরভ যেমন আপনা আপনি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় ও সমীরণ উপযাচক হইয়া সুগন্ধ বহন করিয়া নেয়, সূর্য্য উদয় হইলে যেমন সকলেই দেখিতে পায়, তাঁহার যশও তেমন দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হিংসা করিয়া বৃথা মূর্খতার পরিচয় দিতেছ মাত্র। তোমাদের ন্যায় কূপমণ্ডূকের কথায় তাঁহার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির গৌরব কখনও খর্ব্ব হইবে না। বৈদ্য যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যতীত একটী পৃথক জাতি নহে, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য তিনি নবদ্বীপ পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট গিয়াছিলেন। তথাকার পণ্ডিতগণ সরস্বতী মহাশয়ের প্রমাণ অকাট্য বুঝিতে পারিয়াই,—প্রমাণের বিরুদ্ধে উত্তর দিতে প্রস্তুত নহেন ও পরে উত্তর দিবেন বলিয়া চাতুরী করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা সরস্বতী মহাশয়ের প্রমাণ খণ্ডন করিতে পারিলে, তিনি অবশ্যই মাথা পাতিয়া তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া নিতেন। সত্য নিত্যই সত্য। ইহাতে জয় পরাজয়ের কোন কথা

নাই। তথাকার সংবাদ দাতাও সেই কথাই ১৮ই মে তারিখে সারভেণ্ট পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। সরস্বতী মহাশয় কখনও সভাভঙ্গ করেন নাই। তথাকার পণ্ডিতেরা প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে না পারিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভট্টপল্লীর প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রমাণ গুলি অকাট্য প্রতিপন্ন করিয়া বৈশ্যদিগকে সদাচার পালন করিবার উপদেশ দিয়া সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন। প্রমাণগুলি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করাতে, তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন বা তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের লাঘব হইয়াছে, বলিতে হইবে কি? তাঁহারা বৈদিক্ ব্রাহ্মণ, কাজে কাজেই সত্যের অপলাপ করিতে পারেন না। এইরূপ বিচারের ২ মাস পরে অনেক ভাবনা চিন্তার পর আজ কাশীর কতিপয় পণ্ডিত মূর্খ আসরে হাজির হইয়া বলিতেছেন যে, সরস্বতী মহাশয়কে বলা হইয়াছিল যে, "কোনও শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় বুৎপত্তির পরিচয় পাই নাই, কিরূপে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেন; তিনি তাহার উত্তর দিতে না পারিয়া সভাভঙ্গ করিলেন ইত্যাদি।" ইহা কি একটা বিচারের কথা, না আধুনিক মনগড়া গালাগালি? পাঠকগণকে এ বিষয়ে বোধ হয় আর অধিক বলিতে হইবে না। ইহা কাশীর ষড়যন্ত্রকারী পণ্ডিতমূর্খগণের সঙ্কীর্ণ চিত্ততার ও অনৃতবাদিতার পরিচয়। মিথ্যা ব্যবহার ও প্রতারণা ইহাদের অঙ্গের ভূষণ। "চাবুক" ও "জুতা" দেখিলেই পাঠক মহোদয়গণ ইহাদের দলাদলির ও পরস্পরের বিরুদ্ধ কথা দেখিতে পাইবেন। অবশ্য একটী নিশ্চয়ই মিথ্যা। ১৩৩১ সনের ১১ই ফাল্গুন তারিখের "প্রবাস জ্যোতি" পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যদি প্রবাস জ্যোতির কথা সত্য হয়, তবে উহারা পয়সা বাঁচাইবার জন্য বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখিতে না পাইয়া কি কাণ্ড করিয়াছিল! অর্থের জন্য ইহারা না করিতে পারে, এমন কাজ এ জগতে নাই। সনাতন ধর্ম্মের অবনতির

ইহারাই প্রধান কারণ। ইহা মনে ভাবিয়াও কি উহাদের মনে একটুও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না? হইবেই বা কেন,—ইহা উহাদের প্রকৃতির দোষ, তাহা না হইলে কি এরূপ পাষণ্ড হইতে পারে? ঝাঁটার প্রহারে, জুতার ঠোকরে ও চাবুকের কষাঘাতেও যাহাদের জ্ঞান জন্মে না, তাহাদিগের জ্ঞান জন্মান সহজ ব্যাপার নহে। উহাদের চর্ম্ম গণ্ডারের চর্ম্ম হইতেও কঠিন।

কলিকাতা বৈশ্যব্রাহ্মণ সমিতি স্থাপিত হইবার প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রাম স্থিত নানা দেশীয় বৈশ্যগণ তথাকার বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন শর্ম্ম কবিরত্ন মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া এইরূপ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন ও বলিয়া আসিতেছেন যে, যদি কেহ, বৈশ্যগণ সদ্‌ব্রাহ্মণ নহেন, ইহা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তবে তাঁহারা তাঁহাকে ৫০০ পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবেন, আর যদি না পারেন, তবে তাঁহাদিগকে ৫০০ পাঁচ শত টাকা দিয়া আসিতে হইবে। ক্ষমতা থাকে কর্ণধার মহাশয় দলবল সহ সেখানে যাইয়া বিচার করিয়া আসুন না। তাঁহারা ত আহ্বান করিতেছেন মনে মনে যখন সম্পূর্ণ জোর আছে যে, বঙ্গীয় বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণ নহে— শূদ্রাপসদ প্রতিলোম জাতি, বড় জোর বৈশ্য, তখন ভয় কি? একেবারে ৫০০৲ শত টাকা পাইয়া যাইবে! এক শত মিছরির চাকতি বা ৵৹ আনা পয়সার অধিষ্ঠানের জন্য যখন নিকৃষ্ট জাতিদের বাড়ী যাতায়াত করিতে পার, তখন আর ইহাতে আপত্তি কি? আবার তোমরা মুনি ঋষিদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণ্য তেজের দোহাই দাও ও মুরব্বি সাজিয়া ধর্ম্মের দোহাই দিতেও লজ্জা বোধ কর না। দেশী ও মিশ্রিত ফিরিঙ্গিরাও ক্রস, চার্লস্, গোমেজ প্রভৃতি নাম লইয়া ক্রস ক্রসের ও অন্যান্য বড় বড় সাহেবের বংশ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না। কুলী ও সামান্য চাষী মুসলমানেরাও মোগল, পাঠান

ৱ সৈয়দের বংশ বলিয়া বক্ষঃ স্ফীত করে। তোমাদের দশাও তাই
মাগে ব্রাহ্মণের রক্ত তোমাদের শরীরে কতটুকু আছে প্রমাণ কর, তারপর
ক্ষঃস্ফীত করিও। বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ করিবার পূর্ব্বে নিজেরা
কান্ জাতি তাহা সপ্রমাণ কর।

আবার "দ্বিজাতির সাধারণ লক্ষণ, তাহাদের কত প্রকার ভেদ ও
মুখ্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি" দেখাইতে গিয়া ও মনুর শ্লোকের অপব্যাখ্যা
করিয়া তোমরা যে প্রতারক, তাহার পরিচয় দিয়াছ। তোমাদের প্রবর ও
গোত্রপ্রবর্ত্তক সকলেই অনুলোমজ, তোমাদের পিতা, পিতামহ ভরার মেয়ে
বিবাহ করিয়া ধোবা, চণ্ডাল, যবন প্রভৃতির কন্যার গর্ভে তোমাদিগকে
উৎপাদিত করিয়াছে। কুলীন সম্প্রদায় এইরূপ ব্যভিচারে নানাজাতি
হইতে উৎপন্ন। ইহার উপরই আবার মুখ্যব্রাহ্মণ বলিয়া বড়াই করিতেছ!
ধন্য তোমাদের সাহস! তোমাদের দেহে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে কি না
প্রথমতঃ বিচার করিয়া দেখ। পরে মুখ্য ব্রাহ্মণ হইবার জন্য আস্ফালন
করিও।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥"

ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছ, "দ্বিজাতির ঔরসে প্রতি-
লোমজ সন্তান শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী, উহারা উপনয়নার্হ নহে। ইহা দ্বারা
'মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ' এই প্রমাণ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।"

পাঠক নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর কেমন টনটনে জ্ঞান দেখিলেন?
তাঁহারাও বোধহয় এইরূপ "ঔরস"পুত্র! আর কি অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত! লেখক
বোধহয় সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি নিয়াছেন। বিদ্যায় বোধহয় ষোল আনারও
উপর। "মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ" প্রমাণটী কোথায় আছে? "বর্ণসঙ্করের মাতা

বর্ণসঙ্কর" তোমাদের কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে বল দেখি ? "প্রতিলোমজ" শব্দটী কি বাতাসে উড়িয়া আসিল ? "মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ" এই শব্দ দুইটী কোথায় পাইলে ? আসল শ্লোকটি কি ? এখানে বুঝি প্রতারণা করা হয় নাই ? তোমরা স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বর্ণসঙ্কর বলিয়া তোমাদের মায়েরাও কি বর্ণসঙ্কর ? আমরা শ্লোকের সরল অর্থ চাই। বৈদ্য বিদ্বেষী স্বার্থপর কুল্লূক বা উল্লুকের ব্যাখ্যা সাধারণে মানিবে কেন ? কুল্লূক যে বৈদ্য বিদ্বেষী তাহা তাহার নিজ উক্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি স্বীয় টীকার ভূমিকাতেই বলিয়াছেন—

"দ্বেষাদিদোষরহিতস্য সতাং হিতায়
মন্বর্থতত্ত্বকথনায় মমোদ্যতস্য।
দৈবাদ্ যদি ক্বচিদিহ স্খলনং তথাপি
নিস্তারকো ভবতু মে জগদন্তরাত্মা॥"

দ্বেষাদি-দোষ রহিত হইয়া আমি সাধুগণের হিতের নিমিত্ত এই মন্বর্থ মুক্তাবলী নামে টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাতে যদি দৈবাৎ আমার কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগতের অন্তরাত্মা আমাকে নিস্তার করুন্।

অর্থাৎ "ঠাকুর ঘরে কে ?"—"আমি ত কলা খাই নাই।" এইরূপ কলাচোরের ন্যায় প্রথমেই স্বকার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার গুরু মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ (যাঁহাদের পথ তিনি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন) তাঁহাদিগকে ততো ধিক্। তিনি আপনাকে সৃষ্টিকর্ত্তা মনে করিয়া নিজ মতের প্রাধান্য দর্শাইবার জন্য স্থানে স্থানে মনু, ব্যাস, নারদ, যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতির মতকেও পদদলিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। সে বিষয় এস্থলে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

উপরোক্ত শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা এই—

সবর্ণজাত ও অনন্তর বর্ণজাত (অর্থাৎ অনুলোমে বিবাহিত দ্বিজগণের দ্বিজকন্যাতে জাত) জাতি দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ উহারা দ্বিজধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ইহাদের মধ্যে যে, যে বর্ণের দ্বিজ, সে, সে বর্ণের সংস্কার পাইবে ও তদীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। কিন্তু অপধ্বংসজেরা অর্থাৎ শূদ্রাতে জাত ও প্রতিলোমজ পুত্রেরা শূদ্রধর্ম্মা অর্থাৎ সংস্কারানর্হ ও কোন দ্বিজ বর্ণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে না। (দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ দ্বিজবর্ণীয় পিতার ধর্ম্মাক্রান্ত অর্থাৎ তদ্বর্ণীয়; 'বর্ণত্বাৎ ধর্ম্মমর্হতি', ইহা ত ব্যাস বলিয়াছেন।)

শূদ্রা হইতে অনুলোমজ সন্তান উৎপাদিত হয় নাই কি? নিষাদ বা পারশব কি শূদ্রার অনুলোমজাত পুত্র নহে? তবে এস্থলে কেবল প্রতিলোমজদিগের উল্লেখ করা হইল কেন? ইহা কি প্রতারণা নয়? ব্রাহ্মণাদিত্রয়ের শূদ্রাতে উৎপাদিত পুত্র অনন্তরজ হইলেও কুল্লূক কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। কুল্লূক ও মেধাতিথি প্রভৃতি 'অনন্তরজ' শব্দে অনুলোমবিবাহ প্রসূত বলিয়াছেন, প্রতিলোমবিবাহ প্রসূত বলেন নাই। তবে এ প্রতারণা কেন? তোমাদের এরূপ প্রতারণা আর কতদিন চলিবে? শূদ্রা বিবাহ—অমন্ত্রক ও নিন্দনীয়, এবং অমন্ত্রক বিবাহ বলিয়াই শূদ্রা পতির গোত্র বা বর্ণ প্রাপ্ত হয় না। কারণ দ্বিজাতীয় কন্যাদিগের বিবাহই বৈদিক সংস্কার।

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥" মনু

স্ত্রীদিগের বৈবাহিক অনুষ্ঠানই তাহাদের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার।

"পাণিগ্রাহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যাস্তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥" বৃহস্পতি

বৈবাহিক মন্ত্র সকল উঢ়া স্ত্রীলোককে পিতৃগোত্র ত্যাগ করাইয়া পতি গোত্র করে, অতএব পতিগোত্র ধরিয়াই তাহার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

শূদ্রা বিবাহ যখন দ্বিজের পক্ষে নিষিদ্ধ ও অমন্ত্রক তখন শূদ্রার বিবাহ দ্বারা সংস্কার হয় না, তাহার পিতৃবর্ণ ও পিতৃধর্ম্মই থাকে। কাজে কাজেই তাহার পুত্রেরও সংস্কার হয় না, সে শূদ্রই থাকে। জন্মমাত্র সকলেই শূদ্র।

তোমরা আবার লিখিয়াছ যে, "ঋষিগণের বা ভারতীয় পুরুষগণের দৃষ্টান্ত অস্মদাদিতে খাটে না ইত্যাদি"—অনুলোম বিবাহ কি এখন প্রচলিত, না, ভারতীয় পুরুষদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল? সত্য করিয়া বল দেখি। উহা অস্মদাদির মধ্যে নাই, ভারতীয় পুরুষদিগের মধ্যেই ছিল। তবে তোমরা যজন-ব্রাহ্মণেরা ভরার মেয়ে বিবাহ করিয়া ও রক্ষিতা বেশ্যার পুত্রকে উপবীত দিয়া অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ বজায় রাখিয়াছ; কিন্তু মুখে বড়াই করিতেছ যে তোমরা মুখ্য ব্রাহ্মণ! ব্যাসের জন্মের নজীর দেখাইয়াই বোধ হয় এরূপ বিধবার ও বেশ্যার গর্ভজাত সন্তান আজও মুখ্য ব্রাহ্মণ হইতেছে? বর্ণসঙ্কর কাহাকে বলে যদি না বুঝিয়া থাক, তবে মনুর ১০।২৪ শ্লোক ভাল করিয়া দেখ। যে সকল জাতি বর্ণসঙ্কর তাহাও মনু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিয় জ্ঞান লাভ কর, পরে দেখিবে অল্প বিদ্যা কাহার? কেবল গলাবাজী করিলে চলিবে কেন? দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কারণ মহাভারতে স্পষ্ট দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে নজির করা চলে না। শাস্ত্রজ্ঞ যুধিষ্ঠির তাহা অশাস্ত্রীয় জানেই মাতার বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তবে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী বিবাহের দৃষ্টান্ত আধুনিক রমণীদিগের অনুকরণীয়, এরূপ বলিয়া মাতৃজাতিকে ঠাট্টা বিদ্রূপ কেন? অনুলোম বিবাহের শাস্ত্র

প্রাচীন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তদ্বারা প্রবোধনীতে প্রাচীন অনুলোম বিবাহেরই বৈধত্ব সপ্রমাণ করা হইয়াছে, আধুনিক অনুলোম বিবাহের বৈধা বৈধত্বের বিচার করা হয় নাই, তবে দম্ভলের দোষ না থাকিলে এরূপ অন্যায় কথা কেন কহিবে? অবৈধ বর্ণসঙ্কর পুত্র পিতৃ-পিণ্ডদানে অনধিকারী। শাস্ত্র অনুলোম বিবাহের অনুমোদন করিয়া সমাজে ঈদৃশ বর্ণসঙ্করোৎপত্তির অনুমোদন করিয়াছে, ইহা কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই কল্পনা করিতে পারে না।

আবার লিখিয়াছ যে "দ্বিজাতির মধ্যে যাহারা মুখ্য ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহাদের জন্ম, তাহাদের লক্ষণ—যজন-যাজনাধ্যয়নাধ্যাপন-দান-প্রতিগ্রহরূপ ষট্‌কর্ম্মশালিত্ব। সুতরাং তাহারা ষট্‌কর্ম্মব্যতীত অন্যকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন?"

ইহাতে তোমাদের অগাধ বিদ্যার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কয়জন ষট্‌কর্ম্ম নিয়া আছেন বল দেখি? বাঙ্গালীটোলার রাস্তার দুই ধার একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি। তোমাদের গোত্র প্রবর্ত্তক মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ, কেহ কেহ বা শূদ্রার গর্ভেও জন্মিয়াছেন। উপরোক্ত ভরায় মেদের সংস্রব ও যবন সংস্রব থাকাতে আদত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের কন্যার গর্ভজাত একটীও বিশুদ্ধ শশশৃঙ্গ তোমাদের মধ্যে বাহির করিতে পার কি? দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই কি? চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি অগণিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ছিলেন না কি? বৈদ্যও ষট্‌কর্ম্মা। ষট্‌কর্ম্মের প্রধান কর্ম্ম বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অদ্যাপি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। প্রতিগ্রহের পরিচয় প্রবোধনীতেই আছে। তবে চিকিৎসা বৃত্তি ইহার উপরে। ভাল করিয়া শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, পূর্ব্বে "ব্রাহ্মণ" হইতেই "দ্বিজ" হইত এবং দ্বিজ হইতেই বিপ্র ও বিপ্র হইতে বৈদ্য হইত। "বিপ্রাত্তে বৈদ্যতাং

ষ্ঠ"। অতএব ব্রাহ্মণ ও বিপ্র বৈদ্য শব্দের বিশেষণ বলিয়া ধোঁকা দেওয়া কেবলমাত্র প্রতারকের লক্ষণ। এখন আর সে দিন নাই. তোমাদের স্বরূপ সকলে চিনিয়াছে। বৈদ্য কখনও ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। বৃত্তি দেখিয়া সকল সময়ে বর্ণ ঠিক্ হইতে পারে না; তাহার আদর্শ পরশুরাম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, দিবোদাস ইত্যাদি। বৈদ্যের কেবল চিকিৎসা বৃত্তি নহে। চিকিৎসা ভরদ্বাজাদি আদি আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞদিগের বংশীয় ভিন্ন অন্যে করিতে পারে না। এটী সাধারণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। এই জন্য চিকিৎসাকে সাধারণ ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে ধরা হয় নাই। ঐ বৈদ্যকুলজ ভিন্ন অন্য কেহ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা অভাবে বৈদ্য উপাধিধারী হইতে পারে না। ইনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ ও সময়ে সময়ে যাজনও করিয়া থাকেন। (যাজন অনেক চিকিৎসারই অঙ্গ যথা, বালচিকিৎসা, ভূতচিকিৎসা ইত্যাদি) তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনই মূর্খ যে প্রতিগ্রহ শব্দের অর্থও জানে না ধোপা,নাপিত প্রভৃতির চাকরান্ ভূমিকেও ব্রহ্মোত্তর ভূমির সহিত সমান করিতে চাও ও তাহা নিয়া রহস্য কর। এরূপ মূর্খ কোন সাহসে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয় বলিতে পারি না। বৈদ্যদিগের গুরুগিরি ব্যবসাও আছে। একমাত্র চিকিৎসাবৃত্তি দেখিয়াই বৈদ্যকে মনুক অম্বষ্ঠ বলা যায় না। তোমাদের মধ্যে যাহারা জুতা বেচে, যাহারা তৈল, ঘি, লবণ বেচে, যাহারা মেটে হুকা, কলিকা বেচে, যাহারা মিষ্টান্ন বেচে ও এইরূপ অন্যান্য ব্যবসা করে, তাহারা কি মুচি, মোদক, কুমার বা তিলি? আর যাহারা বস্ত্র বয়ন করে তাহারা কি জোলা না তাঁতি? তাঁহটা ত কাশীতে তোমরা ভাল করিয়া চেন।

বঙ্গীয় বৈদ্য চিকিৎসা করে বলিয়াই যদি মনুক অম্বষ্ঠ হয়, তবে আসামের বেজবরুয়া, গুর্জ্জরের ও পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ চিকিৎসক (বৈদ্য

পার্থক্য দেখা যায়। ব্যাস কি একখানা মহাভারত লিখিয়াছিলেন, না, তোমাদের এক এক জনের মনের মত এক এক খানা মহাভারত এক এক জনকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, বল দেখি? সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইরূপ শাস্ত্র ও পুরাণ, এমন কি গীতা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; বরং ঐসব শাস্ত্র ও পুরাণে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত বলিয়া ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসজ্ঞ ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় মনুসংহিতাতেও এরূপ দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডালের সংখ্যা অত্যধিক দেখিয়া তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণীদিগের কৃষ্ণকায় শূদ্রের উপর বুঝি প্রীতি অধিক ছিল, তাই শূদ্রেরা কেবল ব্রাহ্মণীতেই সন্তান উৎপাদিত করিয়াছে! অতএব এই সকল পুরাণ আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এই সকল শ্লোক যদি কোন সংহিতা বা শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইত, তাহা হইলে অবশ্য কতকটা গ্রাহ্য বলিয়া মানিতে পারিতাম। "বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতস্তু বিপ্রযোষিতি" বিপ্রকন্যাতে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে বৈদ্যের উৎপত্তি। মনুর মতে—কন্যাকালে জাত সন্তান (সন্তানের মাতা উৎপাদক কর্ত্তৃক গৃহীতা না হইলে) কানীন ও মাতৃবর্ণ হয়, অর্থাৎ মাতার পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আবার পরোঢ়া অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মাতা পিতার মধ্যে হীন বর্ণের বর্ণ প্রাপ্ত হয়। কুন্তীর পুত্র কর্ণ ও নকুল-সহদেব সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমার দ্বারা উৎপাদিত হইয়া ক্ষত্রিয়ই হইয়াছিলেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদ ।১০ মন্ত্রের ভাষ্যে উবট্ লিখিয়াছেন—"অশ্বিনৌ হি দেবানাম্ অধ্বর্য্যু।"— অতএব অশ্বিনীকুমারদ্বয় ব্রাহ্মণ হইলেন। বস্তুতঃ দেবতারা সকলেই সকলের নমস্ত সুতরাং শ্রেষ্ঠ। একজন দেবতারা যে জাতীয় হউন না, উৎপাদিত মানবী-সন্তান, প্রাচীন সামাজিক নিয়মানুসারে মাতৃবর্ণ হই

হইত। তবে এখানে অশ্বিনীকুমারের উৎপাদিত বিপ্রযোষিৎ অর্থাৎ বিপ্র-পত্নীর পুত্র বিপ্রই হইবে। অতএব এই প্রদর্শিত বাক্যের যে কোন মূল্য নাই তাহা ধ্রুব। ইহা জাল পুরাণ লেখকের বৈদ্যবিদ্বেষিতার পরিচায়ক। অশাস্ত্রীয় জাল শ্লোক উঠাইয়া বাহবা নেওয়া ও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দেখান তোমাদের অগাধ বিদ্যার ও প্রকৃতির পরিচয় নয় কি? এই সকল দেখাইয়াই বোধ হয় তোমাদের কুলের দোষ লুকাইতে চাও। ধন্য তোমাদের প্রতারণা! অশ্বিনীকুমার শূদ্র হইলে সমস্ত দেবগণ সহ দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে পূজা করিতেন না। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ চন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্র মতে বৈশ্য। অশ্বিনীকুমারও সেইরূপ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে শূদ্র বটে, অথচ তিনি সর্ব্বদেবপূজ্য। তোমরা নিজেই বলিতেছ যে, মহাভারতীয় পুরুষ ও মুনি-ঋষিদিগের কথা অস্মদাদির মধ্যে খাটে না। তবে দেবতারা কি মুনিঋষিদিগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ও পূজনীয় নহেন? আবার দেবতাদের জাতিবিভাগ এখন কে করিল বল দেখি? তোমাদের প্রকৃতিগত দোষ থাকাতেই এরূপ আবোল-তাবোল বকিতেছ। এই সব প্রলাপ বাক্যও "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" এই শাস্ত্রবাক্য সহ্য করিতে না পারার ফল।

বৈদ্য শব্দের অর্থ যে চিকিৎসক নয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। বৈদ্যের বিশেষণ ব্রাহ্মণ বা বিপ্র কোথাও নাই। ব্রাহ্মণ কি বিপ্র বলিলে কখনও দ্বিজাতিবাচ্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝায় না, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অতএব চিকিৎসক বলিয়া অর্থাৎ বৈদ্যদিগকে মনুক্ত অম্বষ্ঠ বলা পাগলের প্রলাপ বই আর কিছুই নহে। বঙ্গদেশের হাওয়ার গুণে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য স্থানের বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণই রহিয়াছে, ইহা বলিতে চাও কি? আবার 'অম্বষ্ঠ' বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াও তোমাদের নীলকণ্ঠ বৈদ্যদিগকে অম্বষ্ঠ

অনেকটা তৃপ্ত বোধ করিতেছি এবং সেই স্বর্গগত গুরুদেবের চরণোদ্দেশে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।"

এখন দেখ যাঁহারা সদাশয়, স্বার্থপরতা ও দ্বেষ যাঁহাদের অজ্ঞাত তাঁহারা বৈশ্যব্রাহ্মণদিগকে কিরূপ পূজা করিয়া থাকেন। বহু পণ্ডিত বৈদিক ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের ধমনীতে এখনও বিশুদ্ধ ব্রহ্মরক্ত বর্ত্তমান, তাঁহাদের কেহ কেহ বৈশ্যব্রাহ্মণদিগের সম্মান ও মর্য্যাদা জ্ঞাত থাকায়, বৈশ্যব্রাহ্মণগণকে কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগের জাতিগত ব্রাহ্মণাচার পালন করিতে উপদেশ দিয়া সদাশয়তার পরিচয় দিতেছেন। কাশীধামের কতিপয় বিশুদ্ধশোণিত বৈদিক ব্রাহ্মণ যবনাদির বীর্য্যশোণিত-দুষ্ট রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র অব্রাহ্মণদিগের সংশ্রবে আসিয়া আপনাদের জাত্যভিমান ও সদাচার নষ্ট করিতেছেন। কালে অবশ্যই ইঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে ও তাঁহাদের জাতিভাই বৈশ্যব্রাহ্মণকে এরূপ বিষচক্ষে দেখিবেন না। বৈদিকের আচার ব্যবহার এখনও বৈশ্যব্রাহ্মণের আচারের ন্যায় অনেকটা বিদ্যমান আছে। তাঁহাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কেহ অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায়, রাঁধুনি, আরদালী, চাপরাসী, ডাকপিয়ন, বা ডাকবাহক, কনেষ্টবল ইত্যাদির কার্য্য গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন না। তোমরা যখন আরদালী ও চাপরাসী হইয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার বাক্স, ছাতা, ছড়ি স্কন্ধে করিয়া ঘুরিতে থাক, তখন তোমাদিগকে কে সম্মান করিতে পারে? বৈদিকদিগের অধিবাসাদি বিবাহাচারের সহিত বৈশ্যদিগের বিবাহাদির আচার পৃথক নহে। গোত্র প্রবরাদি ও বেদশাখার সাম্য আছে। তাঁহাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্তও কেহ কেহ ধর, কর, দাশ প্রভৃতি বৈশ্যের পদবী ধারণ করেন। যাঁহারা এখন ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পূর্ব্বপুরুষ যে বৈশ্যের পদবী ধারণ করিতেন, তাহার

প্রমাণও পাওয়া যায়। বৈদ্যদিগের কুলপঞ্জিকায় বৈদ্যদিগের বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত যৌন সম্বন্ধের পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে। অতএব বৈদ্য ও বৈদিক যে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রবোধনীতে বৈদ্যের বৈদিকের সহিত যৌন সম্বন্ধের বিষয় লিখিত হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত কিছু বলিতে সাহস হইতেছে না কেন? পুরাণ প্রস্তুত হইতেছে কি?

বৈদ্য চিকিৎসা করে বলিয়া এই একমাত্র কারণে বৈদ্যকে মনুক্ত অম্বষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছ। বৈদ্যের বৃত্তি যে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং তাহাই যে তাঁহার প্রধান বৃত্তি তাহাও দেখান হইয়াছে। শাস্ত্র বাক্য পদদলিত করিয়া তোমাদের ঘেউ ঘেউ কে শুনিবে? রাঁধুনি ব্যবসা যে করে সে সূপকার এবং ভারতীয় কালে গোপাল ও নাপিতের এই বৃত্তি ছিল; অতএব তোমাদের মধ্যে যে এ ব্যবসা করে, সে গোপাল বা নাপিত, আর তোমাদের মধ্যে যে চিকিৎসা করে, সে মনুক্ত অম্বষ্ঠ, তোমাদের মধ্যে যে চাকুরী করে সে শূদ্র ইত্যাদি। বৃত্তি দেখিয়া বহুপূর্ব্বে শ্রেণী বিভাগ হইত এবং ঐ সকল শ্রেণীর সকলেই ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। যেমন একজনের ৪ পুত্র কেহ পুরোহিত, কেহ উকিল, কেহ বা দোকানদার, কেহ বা কেরাণী এইমাত্র। অপিচ কেবল মনুক্ত ব্রাহ্মণ বৈশ্যা কন্যাতে উৎপন্ন ব্যক্তিকে অম্বষ্ঠ বলিত না। প্রাণাচার্য্য ও পিতৃস্থানীয় বলিয়াও মুখ্য ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া অম্বষ্ঠ শব্দ স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অম্বষ্ঠ দেশবাসীকেও কখন কখন অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মনুক্ত অম্বষ্ঠ নহেন। চিকিৎসক বা ভিষক্ শব্দে বৈদ্য ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যাপনাকালে 'ভিষক' তিন বর্ণকে উপনয়ন দেন, ক্ষত্রিয় দুইবর্ণকে ইত্যাদি বলা হইয়াছে (সুশ্রুত)। এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণকেই 'ভিষক্' বলা হইত, বুঝা যাইতেছে। কেহও বলিতেছেন

শব্দটাকে ইহাদের মস্তিষ্কের ভিতরে উড়াইয়া আনিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? সিদ্ধান্তবাগীশের সিদ্ধান্ত বড়ই চমৎকার! মনুর একটী শ্লোকের "সদৃশানেব তানাহুঃ" এই স্থল হইতে "সদৃশ" শব্দটী ধরিয়া আনিয়া মহাভারতের শ্লোকটীর অর্থ করা হইল! তাহাতেও আবার বিপদ; কারণ তাহা হইলে আবার ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানও যে ব্রাহ্মণ হয় না! তখন "ভেদাগর্ভ ও ভেদগর্ভের" আবির্ভাব হইল! গর্ভস্রাব না হইলে এমন কথা কে বলে? তোমাদের সকলের স্কন্ধে নিশ্চয়ই ব্রহ্মদৈত্যের আবির্ভাব হইয়াছে। আমার ন্যায় সাধারণ লোকের চক্ষেই যখন ধূলা দিতে পারিতেছ না, তখন কোন্ সাহসে বৈদ্যপণ্ডিত-দিগকে ঠকাইতে চাও। এই মুখে তাহাদিগকে ফুৎকারে উড়াইতে চাও? অর্ব্বাচীন আর কাহাকে বলে! তোমাদের মহাভারতের ৪৮ অধ্যায়ের প্রক্ষিপ্ত শ্লোকটী টিকিবে না বলিয়া মনু, ব্যাস ও ভীষ্মকে কেহ পায় ঠেলিবে, ইহা কিরূপে ভাবিলে? তোমাদের কথায় মূর্দ্ধাভিষিক্ত যখন ব্রাহ্মণ নয়, কাজে কাজেই তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও ব্রাহ্মণ নয়, তখন আর ঐ শ্লোকটীর জন্য এত অস্থির কেন?

এই শ্লোকটী কালীসিংহের মহাভারতে নাই। প্রাচীন হস্তলিখিত মহাভারতেও অনুরূপ। সেই মহাভারত মনু, ব্যাস, নারদ ও ভীষ্মের মতাবলম্বী, অতএব তাহাই স্বীকার্য্য, তাহা পরে দেখাইতেছি। তোমাদের মেধাতিথি ও কুল্লূকের মনগড়া মহাভারত মতবিপরীত, তাহা কেহ মানিতে পারে না। আর ব্যাস একখানা মহাভারতই লিখিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কুল্লূক যে বৈদ্যবিদ্বেষী ছিলেন তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। স্বার্থপর, বৈদ্যবিদ্বেষী নীলকণ্ঠ কোন ছার, তাহার টীকা কে মানিবে? অসঙ্গত ব্যাখ্যা বাঙ্গালের গলায় দড়ি দিয়া টীকা করিতে গেলে তাহা কেহই

[illegible]তে পারে না। পাণ্ডিতের কথাত বহু দূর। ভীম কি যথাযথতা [illegible]
[illegible]কে যুধিষ্ঠিরকে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন? যুধিষ্ঠির কি
ভীমকে যথাযথতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন? যদি তাহাই নয় তবে
নীলকণ্ঠের এই মূর্খতা কেন? অপ্রামাণিক কথার অবতারণাই বা
কেন? ইহা কি লোক প্রতারণার্থ নহে? এইরূপ জাল জুয়াচুরি
করিয়া দেশে স্থান না পাইয়া কাশীতে যাইয়া ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি
করিয়াছ সত্য বটে, কিন্তু এরূপ প্রতারণা করিয়া বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বানাইতে
পারিবে না, অম্বষ্ঠকেও বৈদ্য বানাইতে পারিবে না। মনু বলিয়াছেন—

"স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান সুতান্।
সদৃশানেব তানাহু র্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥"

এখানে 'স্ত্রীষু' পদে পত্নী অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী বুঝাইতেছে না।
তোমাদের মত ব্রাহ্মণদের ও কেশবদের বর্ণনির্ণয়ের জন্যই ভগবান্
মনু এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। এই জন্যই মনুর পূর্ব্বোক্ত
৫ম শ্লোকে "পত্নী"র উল্লেখ করিয়া বিবাহিতা স্ত্রীকে বুঝাইয়াছে।
এখানে এই স্ত্রী শব্দে বিবাহিতা ব্যতীত অনুলোম বর্ণজাত [illegible]
বুঝাইতেছে। বিশ্বনাথও কতকটা এই অর্থ-ই করিয়াছেন।
ইহাই প্রকৃতার্থ এবং তাহা হইলেই সকল দিকে সকল শাস্ত্রের
সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। এই সকল স্ত্রী দোষবিগর্হিতা অর্থাৎ
পরোঢ়া বা অনূঢ়া। ইহাদের সন্তানই সদৃশ অর্থাৎ অপসদ, কিন্তু
বিবাহিতা স্ত্রী অর্থাৎ পত্নীর সন্তান নহে। মনু, ব্যাস, ভীষ্ম
নারদ প্রভৃতি এই অর্থই করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণে
ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণে ও বৈশ্যের বৈশ্যে এই একবর্ণে
উৎপাদিত এরূপ সন্তান অর্থাৎ অবিবাহিত অনুলোমা স্ত্রী
[illegible] সন্তানই অপসদ; যেহেতু মাতৃদোষবিগর্হিত। বিবাহিতা স্ত্রী

র্থাৎ পত্নীর গর্ভজাত সন্তান যে বর্ণের উৎপাদিত সেই বর্ণ ই প্রাপ্ত হয়, নী পতির সমানবর্ণাই হউক বা অনুলোমবর্ণাই হউক। প্রকৃত র্থ করিলে তোমাদের মনগড়া শ্লোক টিকে না বলিয়া কি কদর্থ করিতে ইবে? এখন দেখ প্রতারক কে?

বিবাহিতা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তানের মাতৃদোষ কি করিয়া হইল? াহ্মণের শূদ্রা বিবাহের ন্যায় বৈশ্যা বিবাহ কি নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে লখিয়াছে? বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তানের মাতৃদোষ থাকিলে ক্ষত্রিয়ার গর্ভ-জাত সন্তানেরও মাতৃদোষ আছে। তবে তোমরা নিষ্কৃতি পাও কিরূপে? বীকার করিতেছ যে, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যকন্যার সন্তান। এই বশ্যকন্যার যে কোন দোষ আছে তাহাও দেখাইতে পার নাই, পারিবেও না। তবে বৈশ্যাগর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তানের মাতৃদোষ কি করিয়া হইল? তোমাদের মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়টী ভাল করিয়া পাঠ করিয়া দেখ; উহাতে এই লেখা আছে যে "ব্রাহ্মণ", "ক্ষত্রিয়" ও "বৈশ্য" এই তিন বর্ণে বিবাহ করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। আবার ইহাও দেখিতে পাইবে যে, তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন। কালী-সিংহের মহাভারতেও এরূপ লেখা আছে। কালীসিংহের মহাভারতের অনুবাদকর্ত্তা পণ্ডিতগণ বুঝি তোমাদের অপেক্ষা মূর্খ ছিলেন বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস। তাই ছত্রে খাইয়া বেড়াও ও সমুদ্র, বারিধি প্রভৃতি লম্ব বা পুচ্ছ তাঁতে বুনিয়া লও। ব্রাহ্মণের বা দ্বিজের পক্ষে শূদ্রা-বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহা তারস্বরে সকল শাস্ত্রকারেরাই বলিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়েও তাহা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। শূদ্রা সম্ভোগ করিলে ও তৎসম্ভোগজনিত সন্তান উৎপন্ন হইলে পাপমোচন করিবার জন্য দ্বিজের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,

তাহারও বিধান তোমার মহাভারতেই আছে। মনুর মতে প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত নাই :—

বৃষলীফেনপীতস্য নিশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥

মনু ৩।১৯

তাই একমাত্র শূদ্রার সন্তানই মাতৃদোষ হেতু ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, শূদ্রই থাকে। মনুর তৃতীয় অধ্যায়ের বচনে ব্যতিরেক ন্যায়ে, ব্রাহ্মণের শূদ্রেতর ভার্য্যারা ব্রাহ্মণীই হইয়া থাকে। মনুর ১০।২৮ শ্লোকেও উহাদিগকে "স্বযোনি" বলা হইয়াছে। প্রতিলোমজ সন্তান শূদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আবোল তাবোল বলিয়া ধর্মভীরু বৈশ্য ও স্ত্রীলোকদিগকে ধোঁকা দিয়া আর কত দিন এরূপ আচারভ্রষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবে ও তাহাদিগকে নরকগামী করিবে? ভগবান্ তোমাদিগকে অবশ্যই ইহার শাস্তি দিবেন। পর জন্মে তোমরা নিশ্চয়ই নরকের কীট হইবে।

"ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাৎ দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ॥

এই শ্লোকটী যে প্রক্ষিপ্ত বা বিকৃত তাহা পাঠকগণ মাসিক পত্রিকা বৈশ্য প্রতিভার ১৩৩৩ সনের বৈশাখের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় ৬৯ পৃষ্ঠায় "স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ বনাম বৈশ্য ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। এই বচনটী যে জাল তাহা এক "প্রসূয়তঃ" ও 'মাতৃজাত্যৌ' পদের ব্যাকরণ গত ভুল দেখিলেই প্রমাণিত হইবে। ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার মধ্যে ক্ষত্রিয়ার দোষ হইল না, কিন্তু বৈশ্যার দোষ হইল! বৈশ্যাবিবাহ যখন ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈধ বলিয়া মহাভারতে দেখিতেছ, তখন বৈশ্যার কিরূপে দোষ হইতে পারে?

এই শ্লোকটী যে ভ্রান্ত ও যজন ব্রাহ্মণদিগের গোত্রপ্রবর্ত্তক দিগকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত না বলিয়া মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিবার কৌশল ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু তাহাতেও তোমরা পার পাইবে না, কারণ অম্বষ্ঠও ত তোমাদের গোত্রপ্রবর্ত্তক। প্রকৃত শ্লোক প্রাচীন পুঁথিতে এরূপ দেখা যায়।—

ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য তিসৃষাত্মাস্য জায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাত্ততো হীনো মাতৃজাতৌ প্রসূয়তে॥
পারঃশবো ব্রাহ্মণস্যৈব পুত্রঃ শূদ্রাপুত্রঃ পারশবং তমাহুঃ।
শুশ্রূষকঃ স্বস্য কুলস্য স স্যাৎ স্বচারিত্রাং নিত্যমথং ন জহ্যাৎ॥
তিস্রঃ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধাদ্ দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
হীন বর্ণ স্তৃতীয়ায়াং শূদ্র উগ্র ইতি স্মৃতঃ॥
দ্বে চাপি ভার্য্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োমাত্মাঽস্য জায়তে।
হীনবর্ণো দ্বিতীয়ায়াং করণো নাম জায়তে॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের স্ত্রীই ভার্য্যা হয়, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিন স্ত্রীতে ইহার পুত্র বিপ্রাত্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়। হীনবর্ণা শূদ্রার পুত্র মাতৃজাতি (অর্থাৎ শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হয়। শূদ্রা বিবাহ অমন্ত্রক বলিয়া শূদ্রা পতির গোত্র বা বর্ণ প্রাপ্ত হয় না। ব্যাস এইরূপে মহাভারতে মনুর ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণ এখন দেখুন অম্বষ্ঠ যে বৈশ্য, ইহা কি করিয়া হইল? এখন দেখুন প্রতারক কে! ইহাই কি উহাদের ফুৎকার! গোলে হরি বোল দিলে চলিবে না। কাক চক্ষু মুদিয়া চালায় পুরিষ গুঁজিয়া রাখে ও মনে করে যে তাহা কেহ দেখিল না। ইহাও তাহাই নয় কি? এখন সুধীগণ বিচার করিয়া দেখুন যে, প্রতারক কে এবং কত দিন হইতে এরূপ প্রতারণা চলিতেছে?

অর্ব্বাচীনদের কথা শুনিয়া হাসি পায়। লিখিয়াছে যে "কতিপয় বৈদ্যসন্তানের কিছু অর্থ হওয়ায় স্পর্দ্ধা হইয়াছে।" আমরা এ স্পর্দ্ধা সহ্য করিলেও ভগবান উহা সহ্য করিবেন না। ইহাই বৈদ্য সম্প্রদায়ের অধঃপাতের সোপান"—তোমাদের ন্যায় ছোটলোকের মুখেই এই কথা শোভা পায়। ভারতীয় মুনিঋষিদিগের শাপে লোক ভীত হইত মনে করিয়াই বোধ হয় তোমরা তোমাদের ব্রাহ্মণ্য তেজের স্পর্দ্ধা দেখাইতেছ! তোমাদের মধ্যে যবনাদির বীর্য্যপ্রাচুর্য্যে ব্রাহ্মণ্য তেজ কতটুক আছে, বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছ কি? বৈদ্যদিগের দারিদ্র্য দেখিয়াও কি তোমাদের হিংসার নিবৃত্তি হয় নাই? যাঁহারা একদিন বঙ্গদেশের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন, যাঁহারা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে একমাত্র লোটা কম্বল সহ বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন, যাঁহারা তোমাদের সং পূর্ব্বপুরুষগণকে অন্নবস্ত্র ও ভূসম্পত্তি দান করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন,, যাঁহাদের প্রদত্ত ভূসম্পত্তি তোমাদের কেহ কেহ এখনও ভোগ করিতেছ, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তোমাদের ন্যায় কুক্কুর ব্যতীত অন্যের পক্ষে এরূপ উক্তি করা কখনও সম্ভবপর নহে। তবে লোকে বলিয়া থাকে যে "কুক্কুর যে পাতে খায় সে পাতেই হাগে।" অকৃতজ্ঞ তোমাদের পুষিতে পালিতেই বৈদ্য ফকির, তথাপি এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কোনরূপে তোমাদের সম্মান নষ্ট করেন নাই।

মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতীর পাণ্ডিত্য দেশ দেশান্তরে বিঘোষিত। হিংসা করিলে কি হইবে? তোমাদের 'গণনাথ' 'গণনাথ' করিয়া অভদ্রোচিত সম্বোধন বা তাঁহার বিদ্যার পরিচয় পাও নাই বলা, তোমাদের ন্যায় পণ্ডিত মূর্খের পক্ষেই শোভা পায়। তিনি কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিকল্পদ্রুমের পুত্র। শিশুকাল হইতে সংস্কৃতকলেজে রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া পরে কলেজেও শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

তৎপরে মেডিকেল কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। কলেজে শিক্ষালাভ করিবার ক্ষমতা তোমাদের হয় নাই বলিয়া গাত্রদাহ কেন? তোমাদের কাহারও কাহারও বিদ্যা ত নর্ম্মালস্কুলে ঋজুপাঠ ও তজ্জাতীয় মহাগ্রন্থের অধ্যাপনাতেই শেষ! কয়েক পুরুষের আচারকে কুলাচার বলা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যখন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মুখ্য ব্রাহ্মণ কেহই নহে,এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে যে ব্রাহ্মণের রক্ত নাই তাহাও দেখান হইয়াছে। কাজে কাজেই এখন ইহাদের দ্বারা দৈব ও পৈত্র কার্য্য করিলে কার্য্য পণ্ড হয় কিনা, তাহাই বিবেচ্য।

সরস্বতী মহাশয় যে কয়টী সহকারী সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ গিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিও অর্ব্বাচীনেরা অভদ্রোচিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে। তাঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য বিদ্যা এবং বুদ্ধির প্রভাবেই অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, ভিক্ষাদ্বারা নহে। বাঙ্গালার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের নামে ভয়ে কম্পমান। উঁহাদের মধ্যে কেহ বা অধ্যাপক, কেহ বা চিকিৎসক কেহ বা স্মার্ত্ত; কেহই তোমাদের মত পরের অনুগ্রহে জীবিকার সংস্থান করেন না। তাঁহারা যথাসাধ্য ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভিক্ষা লইতে কখনই প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বিচারে পরাস্ত করিয়াছ কি? তোমাদের নাবালকেরা যখন সভায় বলিল যে—"আমরা স্মৃতি মানিনা" "আমরা এখন বিচারের জন্য প্রস্তুত নহি," তখন স্মরণ ছিল না, তাহারা কি, এবং সভায় তাহারা কি জন্য আসিয়াছিল? তোমাদের নাবালক তর্কবাগীশ বলিলেন "আমরা স্মৃতি মানি না", আর স্মৃতিবাগীশ বলিলেন "আমরা এখন প্রস্তুত নই", ইহাতেই বিদ্যার বাহার জানা গিয়াছে। এক সময়ে একটী ছাত্র স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয়, [illegible]

রূপ কিরূপ”—বিদ্বান্ পণ্ডিত উত্তর করিয়াছিলেন, “আমি এখন [illegible] নাই, আমি ব্যাকরণ মানি না।” ইহাও তদ্রূপ।

আবার লিখিয়াছ যে,তোমরা তপোবনে কলিযুগে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম[illegible] [illegible]রিয়াছ। এ কথাটা বলিতে একটুও লজ্জা বোধ করিলে না। এরূপ [illegible] [illegible]লে কি জুতা খাইয়া দুই দিন পরেই আবার তাহার বাড়ীতে যা[illegible] [illegible]ণারূপ ভিক্ষা গ্রহণ কর! দেবীভাগবত কি মিথ্যা? দেবী ভাগবতে [illegible]াছে যে “রাক্ষসগণ মরিয়া কলিযুগে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিবেন”। [illegible] তোমাদের চরিত্র ঠিক সেইরূপই হইয়াছে। তপোবনে তোমরা কলিযুগে ব্রাহ্মণ হইয়াছ বলিয়া ঢাক পিটিতেছ, পরজন্মে ঐরূপ তপস্যার ফলে নরকের কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, ইহা নিশ্চয়। পূর্ব্বকালে রাক্ষস ছিলে বলিয়াই তোমরা এজন্মে এরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, হিংসুক, পরশ্রীকাতর, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। তোমরাই পুরাণের প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছ যে, “মথুরার দেবল ব্রাহ্মণ, আয়ুধ-ব্যবসায়ী কিম্বা শাস্ত্রব্যবসায়ী বর্ণসঙ্করেরা বারাণসীপুরে পরজন্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।”—(জুতা)। * বৈদ্যগণ চিরকালই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কেবল রাজা গণেশের সময় হইতেই তাঁহাদিগকে বৈশ্যাচারী করিয়াছ। বৈদ্যগণ অসত্য আন্দোলনে মত্ত হন নাই! কুলাগত প্রাচীন সদাচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তোমাদের ন্যায় যবনদিগের অভিশাপ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না।

তোমরা লিখিয়াছ যে, তপোবনে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বামিত্র কি কলির ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন? বৈদ্যগণও প্রকৃত ব্রাহ্মণেরই সন্তান। ইহারা প্রত্যেকে কৃতবিদ্য [illegible] বেদাধ্যয়নপর, কলির ব্রাহ্মণ অথবা জাতি-ব্রাহ্মণ নহেন।

---

* [illegible]

শ্রীযুত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বোধ হয় বৈদিক ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা হইলে কখনও এরূপ স্বভাবের পরিচয় দিতে পারিতেন না। বৈদিকেরা এতদূর সত্যের অপলাপ করিতে পারেন না। তিনি বোধ হয়, তাহার চিঠির বিনিময়ে অর্থের লোভ করিয়াছিলেন, ও তাহা না পাইয়া এই খেলা খেলিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনশর্ম্মা তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি নিজে বাধ্য করিয়া এই দস্তখত করাইয়া লইয়াছেন বলিলে বোধ হয় আরও ভাল হইত। তবে লোকে উহা বিশ্বাস করিবে না বলিয়াই বোধ হয় উহা লেখা পরামর্শসিদ্ধ হয় নাই। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, খানাতল্লাসির সময় কোন কোন সাক্ষী জিনিষের তালিকা নিজে লিখিয়া ও দস্তখত করিয়াও কোর্টে সাক্ষ্য দিবার কালে বলে যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর ভয়ে তালিকা লিখিয়াছে বা দরখাস্ত করিয়াছে, কিন্তু তালিকার লিখিত জিনিষ দেখে নাই। ইহাও তদ্রূপ নয় কি? পণ্ডিত হইয়া কাগজ না দেখিয়া বা তাহাতে কি আছে অবগত না হইয়া যে দস্তখত করে, সে পণ্ডিত না মূর্খ? বৎসরাধিক হইল তাঁহার চিঠি প্রবোধনীতে স্থান পাইয়াছে, তিনি এ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায়ের স্ত্রীর ও অপরাপর বহু বৈদ্য-ব্রাহ্মণের একাদশাহ শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া উচ্চবাচ্য না করিয়া বিদায় লইয়াছেন। এখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ও তাহার প্রতিকারের জন্য নবদ্বীপের নাবালক পণ্ডিতদিগের সহিত তাহাদের মুরব্বি কাশীর কতিপয় ব্রাহ্মণের নিকট চিঠি পাঠাইয়াছেন। আবার ইহা ছাপিতে কাশীর একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা হইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? বোধ হয় সরস্বতী মহাশয়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও [illegible]

ন শর্ম্মা বিদ্যাভূষণ এম্-এ মহাশয়ের সমান বিদায় না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িবেন এবং তাই এই খেলা খেলিয়াছেন। লেখার ভাব দেখিলেই লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, দক্ষিণাচরণ প্রভৃতি গকটী পাইবার জন্য লোভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রার্থনা মঞ্জুর না হওয়ায় এই কীর্ত্তি করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কতকগুলি কেবল বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের প্রাচীন সদাচার শর্ম্মা পদবী ধারণ ও দশাহাশৌচ গ্রহণ করিতে দেখিয়া, আপনাদের প্রাধান্য নষ্ট হইবার আশঙ্কায়, ও পুরুষানুক্রমিক জাল-জুয়াচুরি ধরা পড়িতেছে ও বৈদ্যব্রাহ্মণদিগকে আর নির্য্যাতন করিয়া রাখিতে পারিবে না দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িয়াছে ও যজন ব্রাহ্মণ দ্বারা চালিত মাসিক বসুমতী পত্রিকায় উহাদের দরের মহাভারতের এক জাল শ্লোক অবলম্বন করতঃ জাতিতত্ত্ব নামক প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে অযথা গালি দিতে আরম্ভ করে। ভয় পাছে, বৈদ্যজাতিকে দাবাইয়া না রাখিতে পারিলে, তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য যে জাতিগুলির জাতিনাশ করিয়াছেন, তাহারা উঠিয়া পড়ে! প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি কাগজগুলি সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে নারাজ। কিন্তু বসুমতীর স্বত্বাধিকারী ঘোর বৈদ্যবিদ্বেষী। তাই তিনি, অকাতরে তাহার আফিসকে বিচার সভা মনে করিয়া বৈদ্যের বিরুদ্ধে 'জাতিতত্ত্ব' প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু উহার প্রতিবাদ ছাপিবার বেলায় তাহার সুবিধা হইল না, এবং একপ্রকার ফিকির দিয়া সাধুপ্রবৃত্তির পরিচয় দিলেন। অনেক লেখা-পড়ার পর ভবতারণ বিদ্যারত্নের যে প্রতিবাদটী প্রকাশ করিলেন, তাহা প্রতিবাদের আবশ্যক অংশগুলি এবং পৃষ্ঠা ছাঁটাই ছাঁটাই করিয়া দিয়া। আবার কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতে বলিয়া বক্তৃতা করিলেন।

পারে না। মূর্খেরাই এরূপ বলে। তবে চিকিৎসা বিক্রয় করা দোষ। নারায়ণ পূজা করিয়া মজুরি নিলেই দোষ, কিন্তু নারায়ণ পূজা করিলে দোষ হয় না। জাতিতত্ত্বের লেখকের মত নবদ্বীপী যবন ব্রাহ্মণেরা কেবল বাজে কথা বলিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে মাত্র। বৈদ্যকুলজ ব্যতীত অপর ব্রাহ্মণের চিকিৎসায় অধিকার নাই, সেইজন্য চিকিৎসা করিলে তাহাদের নিন্দা হয়, শ্রেষ্ঠ বৈদ্য-ব্রাহ্মণের নিন্দা হইবে কেন?

আবার মহাভারতে অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছে দেখিয়া, ব্যাসের উপর মহা আক্রোশ। আবার তাহার কারণ ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করা হইয়াছে "অবধ্যতা" ও "দায়ভাগের অংশ"। তাহার বিবরণ উপরেই দেওয়া হইয়াছে। ব্যাস উহাদের ন্যায় প্রতারক ছিলেন কিনা, তাই বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিচারক ও রাজার নিকট ধোঁকা দিয়াছেন!!!

আবার বলিতেছ যে, বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইলেও উহাদের মধ্যে অম্বষ্ঠও আছে, কিন্তু বাছিয়া বাহির করিবার উপায় নাই! বৈদ্যব্রাহ্মণগণ পক্ষাশৌচ অবলম্বন করিয়া অম্বষ্ঠদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন!! বাঃ! বাঃ যখন একবার ছলে হউক বলে হউক উহাদিগকে পক্ষাশৌচ গ্রহণ করান হইয়াছে তখন উহারা অবশ্যই অম্বষ্ঠ!

তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বোঝা গিয়াছে। এই বিদ্যা লইয়া নবদ্বীপের 'বিদ্বন্মণ্ডলী' সাজিয়া প্রবোধনীর সমালোচনায় অগ্রসর! ঘুঘু দেখিয়াছ, ফাঁদ দেখ নাই? যাহা হউক, বাছাধনদের ক্রমে ক্রমে মুখ বন্ধ হইবে ও তাহারা ক্রমে ক্রমে পথে আসিবে। "পাধায় সেই জলই খায়, তবে ঘোলাইয়া নেয়।"

প্রকৃত কথা এই যে, বঙ্গদেশে বৈদ্যব্রাহ্মণের প্রাধান্য দেখিয়া (এবং ভিন্ন ব্রাহ্মণদিগকে কুপথে যাইতে দেখিয়া) বৈদ্যব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রমধর্ম [illegible] কতকগুলিকে [illegible] [illegible] অনুষ্ঠান ও

[illegible]ক্ষেপ প্রভৃতি করাতে) যখন ব্রাহ্মণগণ বহু কাল হইতে হৃদয়ে বৈদ্য [illegible] পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। বৈদ্য রাজত্বের অবসানে তাহারা সুযোগ পাইয়া বৈদ্যদিগকে নির্য্যাতন করিবার পথ খুঁজিতে থাকে [illegible] সংখ্যাধিক্য হেতু ছলে বলে ও কৌশলে শাস্ত্র পরিবর্ত্তন ও নানারূপ [illegible] সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। পরে রাজা গণেশের সময় সুবর্ণ-সুযোগ [illegible]য়া বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে মনুক্ত অম্বষ্ঠ বলিয়া জোর করিয়া বৈদ্যাচার গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। তদবধিই বৈদ্যব্রাহ্মণগণের অবনতি। [illegible] হওয়া সকল ব্রাহ্মণের পক্ষে সহজ ব্যাপার না হওয়ায় বৈদ্যের সংখ্যা চিরকালই কম ছিল। বৈদ্যব্রাহ্মণগণ স্মৃতিতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াও গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অধঃপতনের পর যখন ব্রাহ্মণদিগের হস্তে স্মৃতি রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণগণ কেবল সাহিত্য, ব্যাকরণ ও আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা করিতে থাকেন। এখন ইংরেজের রাজত্ব, রাজাগণেশও নাই আর কোন জুলুমও চলিবে না; তাই তাঁহারা এখন আবার স্মৃতির আলোচনা করিতেছেন। ইঁহারা বিদ্বানের বংশ,—বিদ্বান্, সহজেই শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ। এখন আর ধোঁকা চলিবেনা। সরস্বতী মহাশয়ের বাড়ীতে ও অন্যান্য বহুস্থলে চিরকাল হইতেই দশাহাশৌচ গ্রহণের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তিনি ব্রাহ্মণাপসদ বা নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ একথা স্বীকার করিবেন কেন? তোমরা ভুলেও সত্য কথা বলিতে পার না। আবার চিকিৎসা করে বলিয়াই বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বানাইতে বদ্ধপরিকর! এবং হারীতের বচনে অম্বষ্ঠ স্থানে "বৈদ্য" শব্দ বসাইতেও ত্রুটী করি নাই—

বিপ্রো মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রিয় এব চ।
মাহিষ্যো বৈশ্য ইত্যেষাং যথাপূর্ব্বং তু গৌরবম্।

[illegible]

(বৈদ্য, যোগী, মাহিষ্য ও কায়স্থের)

পণ্ডিতরত্ন

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি

লিখিত

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"

(গীতা)

৺কাশীধাম

(৮০ নং মিশির পোখরা)

বিশালাক্ষ পাঠশালা হইতে

তৎসম্পাদক

শ্রীসারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীরত্নেশ্বর শর্ম্মা
৮০ নং মিশির পোখরা
কাশী (Benares City)

এই জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিমত প্রভৃতি শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর শর্ম্মা, ৮০নং মিশির পোখরা, বেনারস সিটি—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

প্রিণ্টার——শ্রীভূতনাথ সরকার
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২১এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।

মুখবন্ধ

মাসিক বসুমতীর ১৩৩২ কার্ত্তিকসংখ্যায় ইহার কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াই দেশব্যাপি তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানাভাবে উহাতে সকল মাসে বাহির না হওয়ার জন্য অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিতে থাকায় সাধারণের আগ্রহে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। মাসিক বসুমতীর সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকীয় দায়িত্ব অনুসারে ইহার যে যে অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন, পাণ্ডুলিপি অনুসারে তৎসমস্তই অবিকল রাখা হইয়াছে।

সমাজগঠন দুই-দশ দিনে বা দুই-দশ বৎসরে হয় নাই; মনীষিবৃন্দের বহু যুগের চেষ্টায় হইয়াছে এবং সুশৃঙ্খলায় ও সুনিয়মে চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুর সমাজমন্দির ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত; সুতরাং সুদৃঢ় ও সুপবিত্র। সেইজন্য বহু ঝঞ্ঝাবাতে, বহু জলপ্লাবনে, বহু ভূমিকম্পে ও বহু কঠোরাঘাতেও বহু কাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ও অবিচলিতই রহিয়াছে। পরিণাম না ভাবিয়া, ধর্ম্মের দিকে না চাহিয়া, যথেচ্ছাচারের বশে তাহাকে অপবিত্র ও বিধ্বস্ত করিলে, আপনাদিগকেই নিরাশ্রয় হইতে এবং নিজেই নিজের পদে কুঠারাঘাত করিয়াছি বলিয়া ভবিষ্যতে প্রত্যেককেই অনুতাপ করিতে হইবে। এই অনিষ্ট নিবারণের অভিপ্রায়েই এই পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে।

আশা করি—সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী, সমস্ত ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মণসভা, সমস্ত হিন্দু সামাজিক মহোদয়গণ, এবং যাঁহাদের জাতিত্ব লিখিত হইল তাঁহারাও অবিলম্বে ও একযোগে গ্রামে-গ্রামে ও নগরে-নগরে সভা-সমিতি করিয়া এই পুস্তকের আলোচনায় সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট নিরাকরণার্থ ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণে বদ্ধপরিকর হইবেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের সম্পাদক মহোদয়গণকেও এ বিষয়ে সহায়তা করিতে সবিনয় ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।"

আপনারা সকলে একযোগ, একবাক্য ও একমত হউন।

"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী"

আপনাদের সমিতি ও মন্ত্রণা একরূপ হউক।

"সমানী ব আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সু সহাসতি ॥"

আপনাদের উদ্দেশ্য এক হউক, হৃদয় এক হউক, মন এক হউক, আপনাদের সম্মেলনও যেন একরূপই হয়। (ঋগ্বেদ)

পরিশেষে নিবেদন—অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেক সভাসমিতির অভিমত লিখিয়া পাঠাইলে এই পুস্তকের সহিত সংযোজিত করিব।

পূজনীয় অধ্যাপক মহাশয়গণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন এই যে, এই পুস্তকখানি অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিয়া "সারসংগ্রহে"র উপর যথাশাস্ত্র স্ব স্ব অভিমত লিখিয়া সত্বর পাঠাইবেন।

পরম্পরায় শুনিতেছি "কতিপয় অধ্যাপক বৈদ্য শিষ্য ও যজমানদিগের অপ্রীতি উৎপাদনের আশঙ্কায় এ পুস্তক সম্বন্ধে কোনও অভিমত দিবেন না।" এ কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। শিষ্য-যজমান সম্বন্ধের অনুরোধে যথাশাস্ত্র অভিমত প্রকাশে কোনও অধ্যাপকই সঙ্কুচিত ও পরাঙ্মুখ হইতে পারেন না; তাহা হইলে তাঁহাদের শাস্ত্রব্যবসায়ের গৌরবহানি ঘটে। শিষ্য-যজমানেরা শাস্ত্রীয় আচারই পালন করিতেছেন বুঝিলে তদনুকূল অভিমত, এবং তাঁহাদের আচার অশাস্ত্রীয় বুঝিলে তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তৎপ্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না; উদাসীন থাকিলে বরং তাঁহাদিগকে নিন্দাভাগী হইতে হইবে। "অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী।" (মনু) ইতি—

প্রকাশক।

সার-সংগ্রহ

(প্রথম পরিচ্ছেদ)

১। (বৈদ্যপ্রবোধনীলেখক অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে পৃথক্ জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করায়) জাতিতত্ত্বলেখকের মতে—অম্বষ্ঠেরা বৈশ্যধর্ম্মা, এবং বৈদ্যেরা শূদ্রধর্ম্মা।

২। তাঁহাদিগকে নমস্কার বা অভিবাদন এবং তাঁহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তার্হ হন।

৩। ব্রাহ্মণেতর কোনও দ্বিজাতি [illegible] দ্বারা শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতে, দেবতার হোম দিতে এবং স্পর্শপূর্ব্বক শালগ্রামশিলা ও প্রতিমা পূজা করিতে পারেন না।

৪। যাজনকার্য্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোনও দ্বিজাতিরই অধিকার নাই।

৫। সেনশর্ম্মা ইত্যাদিরূপ নামোল্লেখ অশাস্ত্রীয়।

৬। বৈদ্যপ্রবোধনীধৃত কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণেই বৈদ্যের ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

৭। অভিনব "যোগী" জাতি মূলতঃ যুগী। ইঁহারা বাহ্যতর ও অস্পৃশ্য।

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

(৮) মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত বিভিন্ন জাতি।

(৯) কৈবর্ত্তেরা অন্ত্যজ। তাহাদের মাহিষ্যত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে।

(১০) যে সকল সদ্ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বাটীতে তাঁহাদের পুরোহিত-দিগের সহিত একযোগে কবিকর্ম্ম ও এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন, এবং তাঁহাদের দান গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ।

(চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

১০। কায়স্থেরা প্রকৃত শূদ্র, বর্ণসঙ্করও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন।

(পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

১১। চতুর্থাদি পুরুষ উপনয়নসংস্কার-বর্জ্জিত হইলে, তাহাদের সন্তানদিগের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়াও উপনয়ন হইতে পারে না।

অর্পণ

যিনি বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

এবং যাঁহার কৃপা—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।"

সেই ব্রহ্মণ্যদেবের চরণে

এই প্রবন্ধ অর্পণ করিয়া

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

বলিয়া—প্রণত

দীনহীন লেখক

সূচী

জাতিতত্ত্ব

সূচনা

কয়েকজন বিশিষ্ট বৈদ্য, যোগী, মাহিষ্য ও কায়স্থ তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক আমার নিকট পাঠাইয়া, তৎসমস্ত আলোচনা-পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র তাঁহাদের জাতিতত্ত্ব লিখিবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। একই সময়ে—অর্থাৎ ১৩৩১ সালের ২৯শে ফাল্গুন হইতে ১৩৩২ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আড়াই মাসের মধ্যে—পরস্পর দূরবর্ত্তী ভিন্নভিন্ন স্থান হইতে একই বিষয়ে আমারই উপর এই ভার অর্পিত হওয়ায়, ইহা ভগবৎপ্রেরণাই অনুমিত হইতেছে। তজ্জন্যই আমি এই "জাতিতত্ত্ব" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ করিতে উৎসুক হন, তাহা হইলে সমগ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর করিবেন। সেই সকল প্রতিবাদের সারবত্তা থাকিলে উত্তর দিব, নচেৎ দিব না। এবং তাহাতে আমার বাস্তবিক ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শিত হইলে, অকপট চিত্তে তাহা স্বীকার করিব।

অধুনা হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট নেতা ও শাস্তা না থাকায়, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছে—ব্রাহ্মণ জুতা বেচিতেছে, মুচি বেদ পড়িতেছে, শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতেছে, ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ হইতেছে। এই যথেচ্ছা-চারের যুগে অনেকেই যোগী, স্বামী, পরমহংস, পরিব্রাজক, মহর্ষি, রাজর্ষি হইয়াছেন ও হইতেছেন; ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিও হইতে পারেন। যুগধর্ম্মানুসারে এ সকল আচরণে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। তবে অনেকেই যে স্বেচ্ছাচারের সমর্থনের জন্য শাস্ত্রের বচন তুলিয়া, তাহার কদর্থ করিয়া, শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিদিগের অবমাননা ও সাধারণকে—অধিক কি,

স্বজাতীয়দিগকেও—প্রতারণা করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের আপত্তি, এবং তজ্জন্যই এই আলোচনায় প্রবৃত্তি।

তদুপরি, যাঁহারা যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্রের দোহাই দিয়াই স্বমত সমর্থন করিয়াও, ঈর্ষ্যাবশে সেই ব্রাহ্মণদিগের অবিসংবাদি শ্রেষ্ঠত্ব অসহমান হইয়া তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতেছেন, সভাসমিতি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তাঁহাদের কুৎসা রটনা করিয়া গৌরব নষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহার কারণ, তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রধান অন্তরায় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে নিম্নে নামাইতে না পারিলে, তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহা তাঁহাদের নিতান্তই মতিভ্রম। একধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত মনুষ্যের সমষ্টিকেই সমাজ বলে। তাদৃশ হিন্দুসমাজরূপ বিরাট্ পুরুষের শীর্ষস্থানীয়—ব্রাহ্মণ; অন্যান্য জাতি হস্তপদাদির ন্যায় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ইহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাবিবর্জ্জিত স্বার্থপরতাপরিশূন্য সর্ব্বভূত-হিতৈষী সমুদারচিত্ত ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত চিরন্তন নিয়ম। সেই ব্রাহ্মণ-জাতিকে অবনত করিয়া উন্নত হইবার দুরাশা—আর নিজের মাথা কাটিয়া সেই স্থানে পা বসাইয়া হাঁটিবার চেষ্টা—দুইই সমান।

এখন অনেকেই বলেন—স্বার্থপর ঋষিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। এ কথাটা তাঁহাদের নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আজকাল লোকে জন্মদাতা জীবিত পিতার কথাই প্রায় গ্রাহ্য করে না; এ অবস্থায়, যাঁহারা সামাজিক যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারাও স্বমতসমর্থনের জন্য যেন-তেন-প্রকারেণ মনগড়া অর্থ করিয়া, যুগযুগান্তরমৃত সেই ঋষিগণের বচন প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্বার্থপর প্রতারক লোকের এত সম্মান—এত গৌরব কখনই সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, যে ব্রাহ্মণের সম্মান জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য, তাঁহার

পদাঘাতের চিহ্ন সাদরে ও সগৌরবে স্বীয় বক্ষঃস্থলে চিরতরে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন,—স্বয়ং দ্বারকার অধীশ্বর ও জগৎপূজ্য হইয়াও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে যে ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনের ভার স্বেচ্ছাবশে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ কালধর্ম্মে যতই কদাচারী হউন, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-তেজ মহাপ্রলয়েও বিলুপ্ত হইবার নহে। যদিও বাহিরে ভস্মাবৃত হইলেও তাহার স্বাভাবিক জ্যোতিঃ অন্যের অগোচরে অন্তরে বিরাজমান থাকে। শমীগর্ভস্থ অদৃশ্যমান অগ্নিপরমাণুই কালে কালাগ্নিতে পরিণত হইয়া দিগন্তব্যাপি বিশাল অরণ্য ভস্মীভূত করে। বিষদন্ত ভগ্ন হইলেও কৃষ্ণসর্পের তেজ যায় না, স্বভাব নষ্ট হয় না, বিষদন্ত পুনরুদ্গত হয়। নামটারও এত প্রভাব যে, শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু ডুণ্ডুভ যতই মাথা তুলুক, কস্মিন্ কালেও সে ফণা বিস্তার করিতে পারিবে না; তাহার বিষদন্তও উঠিবে না, নামেও কেহ ভয় পাইবে না; যতই বিচিত্র গতি দেখাউক, সর্পজাতির উচ্চশ্রেণীতে সে কদাপি গণ্য হইবে না; সে ঢোঁড়া হইয়া জন্মিয়াছে, যাবজ্জীবন ঢোঁড়াই থাকিবে।

ব্রাহ্মণের অস্তিত্বেই হিন্দু-সমাজের অস্তিত্ব, ব্রাহ্মণের বিলোপে হিন্দু-সমাজের বিলোপ; ইহা ধ্রুব সত্য। এইজন্যই মহাভারতে "যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ" বলিয়া তাহার "মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ" বলা হইয়াছে। এ সব কথা কেহ ভাবেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়। কথায় বলে "দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না।"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য

আমরা বাল্যে ও যৌবনে দেখিয়াছি, চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ বৈদ্যগণ আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়াই পরিচয় দিতেন, কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখিতেন এবং ১৫ দিন পূর্ণাশৌচ পালন করিতেন। তার পর শতাব্দীর প্রারম্ভে

ইদানীন্তন বৈদ্যগণের প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক দেখিয়াছি; তাহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ১৫ দিন অশৌচ পালনেরও সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তদবধি কটিদেশে যজ্ঞসূত্র না রাখিয়া স্কন্ধে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি, "ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্য-কন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" এই মনুবচনে অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতে আর প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ—এমন কি, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছেন; সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা ইত্যাদি-রূপ উপাধি ব্যবহার করিতেছেন; ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া একাদশাহে পিত্রাদির আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেছেন, এবং অনেক বৈদ্য অধ্যাপক অধ্যাপনার প্রারম্ভে অভিবাদনকালে, ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের প্রতি সাগ্রহে পাদপ্রসারণ করিয়া থাকেন—তাহাতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, এবং তজ্জন্য কুফলের আশঙ্কাকেও মনে স্থান দেন না।

অনেকে আবার আপনাদের ব্রাহ্মণত্বে এখনও সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া, নামের পর সেনশর্ম্মা ইত্যাদি উপাধি বলিয়াও, ১৫ দিন পূর্ণাশৌচ পালনের পর ষোড়শ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া দু'কূলই বজায় রাখিতেছেন। কিন্তু নাম বলিবার সময় ও ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রতি পা বাড়াইবার সময় ব্রাহ্মণ হইব এবং অশৌচপালনে অম্বষ্ঠ থাকিব—এরূপ হইতে পারে না, "ন হি কুক্কুট্যা অণ্ডম্ একতঃ পচ্যতে, অন্যতঃ প্রসবায় কল্পতে" (শাং ভাঃ) মুরগীর ডিম এক দিকে সিদ্ধ হইতেছে, আর এক দিকে প্রসব করিতেছে—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বৈদ্যজাতির আলোচনার জন্য যতগুলি পুস্তক পাইয়াছি, তন্মধ্যে "বৈদ্যপ্রবোধনী"তে সকল পুস্তকের সার সঙ্কলিত, শ্রুতিস্মৃতি হইতে বহু-তর প্রমাণ সংগৃহীত, ও অত্যুৎকট পাণ্ডিত্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া, উহারই আলোচনা সংক্ষেপে করিব। তৎপূর্ব্বে বক্তব্য এই যে,

(ক) যিনি সামাজিক এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—বৈদ্যদিগকে "জাতে তুল্‌তে" বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই প্রবোধনী-লেখক নিজের নামটি প্রকাশ করেন নাই কেন? তিনি মুখপাতেই "সত্যে নাস্তি ভয়ং কচিৎ" এবং "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" লিখিয়াও, কোন্ ভয়ে ও কিসে পরাজয়ের আশঙ্কায় সত্যপ্রচারেও আত্মগোপন করিয়াছেন? এই বিনামী লেখকের মীমাংসার মোহে আত্মহারা হইয়া বৈদ্যের দল যে কক্ষবাদ্য করিয়া নৃত্য করিতেছেন, ইহাও নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়।

(খ) উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে পাঁচ জন অধ্যাপকের পত্র (৪ খানি তাঁহাদের হস্তাক্ষরেই প্রদর্শিত) সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে (১) "বঙ্গদেশের অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তশিরোমণি, গবর্ণমেণ্টের উপাধিপরীক্ষার সম্পাদক" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বৈদ্যপ্রবোধনী-নাম্নী পুস্তিকা পাঠে আমারও বৈদ্যসম্বন্ধীয় অনেক সন্দেহ দূরীভূত হইল। বৈদ্য যে মন্বাদি-প্রোক্ত অম্বষ্ঠজাতীয় নহে, পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, এতদ্বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ, আপনাদের উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী ও যুক্তিসমূহ অখণ্ডনীয় বলিয়াই আমার হৃদ্বোধ হইল।" (২) ভট্টপল্লীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপতি স্মৃতিভূষণ মহাশয় * লিখিয়াছেন—"বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণ বর্ণ, আমরা ইহা চিরদিনই জানি এবং বিশ্বাস করি।" (৩) "সুপ্রসিদ্ধ

* বৈদ্যপ্রবোধনীতে ইঁহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—"ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ সর্ব্বজনমান্য [illegible]বংশধর ৺মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র।" বিলাত-প্রত্যাগত বৈদ্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহার্য্য হইবে কি না—এই ব্যবস্থাপত্রে পূজ্যপাদ [illegible] ন্যায়রত্ন মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, চতুর্বিংশতিবার্ষিক ব্রতের অর্দ্ধেক যখন বৈদ্যদিগের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত হইয়াছে (অর্থাৎ তাহাদিগকে যখন পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না), তখন তাহারা ব্যবহার্য্য হইতে পারিবে। এতাবতা তাঁহাদের মতে বৈদ্যেরা বৈশ্যধর্ম্মা অম্বষ্ঠ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছেন। অতএব "ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র" পরিচয়টা এ ক্ষেত্রে স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের অযোগ্যই মনে হইতেছে।

স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কলিকাতা চোরবাগান স্মৃতির টোল হইতে লিখিয়াছেন—"বৈদ্য ব্রাহ্মণ, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে এবং আমাদেরও সম্পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস আছে।" (৪) "সুপ্রতিষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমি বৈদ্যগণের সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রাদি ও অন্যান্য সমালোচনা দ্বারা নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, বৈদ্যগণ অন্যান্য সদ্ব্রাহ্মণগণের ন্যায় একশ্রেণীর সদ্ব্রাহ্মণ।" (৫) কলিকাতা হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয়কে লিখিয়াছেন—"বৈদ্যপ্রবোধনী পুস্তিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমার ভগিনীদের ব্রাহ্মণোচিত বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকার্য্যাদি করিয়াছি, তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ। যাহা হউক, তোমরা যে 'আমাদেরই' একজন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।...যদি কোনও বৈদ্যব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপে পুরোহিত গিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর না হন, আমাকে জানাইলে আমি আনন্দের সহিত পৌরোহিত্য করিতেও স্বীকৃত আছি।"

উক্ত অধ্যাপক মহাশয়গণকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা যখন বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে নিঃসংশয় হইয়াছেন, তখন বৈদ্যদিগের অন্নভোজন, সমাজে তাঁহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আহার এবং তাঁহাদের কুলে কন্যার আদানপ্রদান করিতে পারেন কি? এবং সমাজবন্ধন থাকিতে কস্মিন্ কালেও পারিবেন কি? তাহা যদি না পারেন, তবে অনুরোধের বশে অথবা অন্য কিছুর খাতিরে ঐরূপ অসার অভিমত ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন কি? সাধারণের নিকট নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্যের পরিচয় দ্বারা অশ্রদ্ধেয় ও উপহাসাস্পদ হওয়া এবং পণ্ডিত নামে কলঙ্ককালিমা লেপন করা ভিন্ন ইহার আর কোনও ফল দেখি না।

শ্রাদ্ধসভায় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বৈদ্যদিগকেও সুপারির সহিত যজ্ঞোপবীত দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ের মীমাংসায় সন ১৩১৮ সালের ৩২শে শ্রাবণ তারিখে বহরমপুরস্থ ব্রাহ্মণ-সভার বিশেষ অধিবেশনে বঙ্গের যাবতীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক এবং যাবতীয় গণ্যমান্য সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক মহোদয়গণ একবাক্যে বৈদ্যদিগকে অব্রাহ্মণ, সুতরাং যজ্ঞোপবীত দানের অপাত্র বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহরমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘটক মহাশয় ঐ সমস্ত অভিমত সংগ্রহ করিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

১। বৈদ্যপ্রবোধনী—বৈদ্য কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ। "ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজূংষি সামানি।" (শতপথ ব্রাহ্মণ) বিদ্যা শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। যাঁহারা সেই বেদাধ্যয়ন করেন এবং বেদজ্ঞ, তাঁহারাই বৈদ্য। "তদধীতে তদ্ বেদ" এই পাণিনীয় সূত্র দ্বারা বিদ্যা + অণ্ = বৈদ্য। মতান্তরে বেদ + ষ্য = বৈদ্য।

বক্তব্য—"বেদ + ষ্য = বৈদ্য" এই ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণসম্মত নহে; যেহেতু, "তদধীতে তদ্ বেদ" (তাহা যে অধ্যয়ন করে বা তাহা যে জানে) এই অর্থে ষ্য প্রত্যয়ের সূত্র নাই। পরন্তু বৈদ্য শব্দ ষ্যপ্রত্যয়ান্ত হইলে "বৈদ্যের পত্নী" অর্থে বৈদ্যীর পরিবর্তে "বৈদী" এই অনিষ্ট পদ হয় (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে সংযুক্ত শব্দের ষ্য প্রত্যয়ের যকারের লোপ হইয়া থাকে)

বেদজ্ঞ বা বেদাধ্যায়ীকে বৈদ্য বলে, এমন কথা কোনও শাস্ত্রেও নাই এবং লোকব্যবহারেও নাই। কাশী, বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত বহু বেদাধ্যায়ী ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে কেহ "বৈদ্য" বলে না।

বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যায়ী হইলেই যদি বৈদ্য হয়, তাহা হইলে যাঁহারা "বৈদ্য" বলিয়া সমাজে পরিচিত (অর্থাৎ যাঁহারা জাতি-বৈদ্য), তাঁহাদের সে জ্ঞানের ও সে অধ্যয়নের পরিচয় বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না কেন?

"ত্রয়ী বৈ বিদ্যা" এই শ্রুতি দেখিয়া কেবল বেদকেই বিদ্যা মনে করা ভ্রমমাত্র। যেহেতু, শাস্ত্রে বিদ্যা অষ্টাদশপ্রকার উক্ত হইয়াছে। যথা—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গন্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু॥"—(বিষ্ণু পুঃ)

ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ), চতুর্ব্বেদ (সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব), মীমাংসাদর্শন, ন্যায়দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র (মন্বাদি-স্মৃতি) ও পুরাণ—এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র (দণ্ডনীতি)—এই চারিপ্রকার লইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা।

বৈদ্যেরা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন বলিয়া, প্রবোধনী-লেখক ঐ শ্রুতি তুলিয়া আয়ুর্ব্বেদের বেদত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদও বেদ হইলে, উক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে "বেদাশ্চত্বারঃ" বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের আবার পৃথক্ উল্লেখ থাকিত না। ভাগবতাদি শাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুশ্রুতও বলিয়াছেন—"আয়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গ-মথর্ব্ববেদস্য।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বেদাধ্যায়ী বা বেদজ্ঞকে বৈদ্য বলে না। বৈদ্য শব্দের শাস্ত্রসম্মত ত্রিবিধ অর্থ আছে; যথা—

(১) "আয়ুর্ব্বেদাত্মিকাং বিদ্যাং বেত্তি অণ্। তন্নতমতে বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যঃ, ঢযে কাদিতি কঃ।"—(অমরটীকা)

"যে বিদ্যা অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদরূপ বিদ্যা জানে বা অধ্যয়ন করে" এই অর্থে বিদ্যা + অণ্ বা ষ্য = বৈদ্য। ইহার অর্থ—চিকিৎসক; যথা—"রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্ বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।"—(অমর)

ইহাতে জাতির বিচার নাই, ব্রাহ্মণাদি যে-কোনও জাতির মনুষ্য চিকিৎসা ব্যবসায় করিলে, তাহাকেই বৈদ্য বলা যায়। এইজন্য অমর ঐ শ্লোকটি ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবর্গে না ধরিয়া মনুষ্যবর্গেই ধরিয়াছেন।

(২) সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে "পুংনাম্নঃ পুংযোগে" সূত্রের বৃত্তিতে "বৈদ্যের পত্নী" এই অর্থে উদাহরণ আছে "বৈদ্যী"। টীকাকার গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বৈদ্যশব্দো বিদ্যাযোগাৎ পুংসো বাচকঃ, তদ্‌যোগাৎ স্ত্রিয়াং বর্ত্ততে, ন তু বিদ্যাযোগাৎ।" অর্থাৎ বিদ্যা জানার জন্য পুরুষ বৈদ্যপদবাচ্য; তাদৃশ পুরুষের সহিত বিবাহসংযোগ হেতুই তাহার পত্নী বৈদ্যী, বিদ্যা জানার জন্য বৈদ্যী নহে। সুতরাং ইহারও ব্যুৎপত্তি—বিদ্যা (অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বিদ্যা বা সর্ব্ববিদ্যা) যে জানে, সে বৈদ্য; বিদ্যা + অণ্ বা ষ্ণ্য। এ অর্থেও জাতির বিচার নাই।

(৩) জাতিবিশেষ অর্থাৎ বৈদ্য জাতি। যথা—

"চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥" (মহা, অনু, ৪৮।১)

শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন পুত্র চাণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্র ব্রাত্য, এবং বৈশ্যাতে উৎপন্ন পুত্র বৈদ্য। এই তিন জাতি অতি নিকৃষ্ট।

এই জাতিবাচক বৈদ্য শব্দ রূঢ়—অর্থাৎ গৃহাদিবাচক মণ্ডপাদি শব্দের ন্যায় ইহার কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি করা গেলেও, বস্তুতঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়গত কোনও অর্থ নাই। সেই হেতু যাঁহারা বৈদ্যবংশসম্ভূত হইয়াও পুরুষানু-

ক্রমে চিকিৎসাব্যবসায় না করিয়া জমীদারি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা জাতিতে বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত; এবং যে সকল ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতেছেন, তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণই আছেন (বৈদ্য বলিয়া পরিগণিত হন নাই)। সমাজে যাঁহারা বৈদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা যে জাতিতে বৈদ্য, ইহা সর্ব্বজনবিদিত, এবং তাঁহাদেরও স্বীকৃত। নচেৎ তাঁহারা এত কালের পর আপনাদের ব্রাহ্মণত্বপ্রতিপাদনে তৎপর হইবেন কেন?

প্রবোধনী-লেখক "কাচং মণিং কাঞ্চনমেকসূত্রে"র ন্যায় সর্ব্বত্রই এই ত্রিবিধ অর্থের ত্র্যহস্পর্শ ঘটাইয়া বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহা বড়ই বিচিত্র।

২। বৈঃ প্রঃ—উৎকৃষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন সর্ব্ববেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে "বৈদ্য" বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত প্রমাণ যথা—

(ক) "বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্ রক্ষোহামীবচাতনঃ।" (ঋগ্বেদ ১০ মং ৯৭ সূক্ত)। তত্র সায়নভাষ্যম্——বিপ্রঃ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ। অমীবা ব্যাধিঃ তস্য চাতনঃ চাতয়িতা চিকিৎসকঃ।—অর্থাৎ যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ ব্যাধির চিকিৎসা করেন, তিনি ভিষক্।

(খ) "ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা। যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি।" (ঋক্ ঐ) অত্র সায়নঃ—যস্মৈ রুগ্নায় ব্রাহ্মণঃ ওষধিসামর্থ্যজ্ঞো ব্রাহ্মণো বৈদ্যঃ কৃণোতি করোতি চিকিৎসাম্। অর্থাৎ ওষধিসামর্থ্যজ্ঞ যে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য রুগ্নের চিকিৎসা করেন।

বক্তব্য—এতদ্দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইল, বুঝিতে পারিলাম না। আবহমান কাল ধরিয়া ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যেতা, অধ্যাপয়িতা ও গ্রন্থ-প্রণেতা। চরক প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে আছে, ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আসিলে,

অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার নিকট উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের ন্যায় সৃষ্টির প্রারম্ভেই অম্বষ্ঠ, বৈদ্য প্রভৃতি সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয় নাই ; বহুকালের পর ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, এখনও কত-শত হইতেছে। সুতরাং প্রাচীনতম কালে রোগপ্রতীকার দ্বারা জগতের উপকারার্থ কেবল ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসাকার্য্য করিতেন। তজ্জন্যই ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে—(ক) "বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্" ইত্যাদি। উহার সায়ণভাষ্য—"...তত্র বিপ্রঃ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ ভিষক্ উচ্যতে।" অর্থাৎ যে স্থানে নানাবিধ ঔষধি থাকে, সেই স্থানে ঔষধিশক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক্ (চিকিৎসক) বলে। প্রবোধনী-লেখক ভাষায় "ভিষক্ উচ্যতে" এই দুইটি পদ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

(খ) "ওষধয়ঃ সংবদন্তে" ইত্যাদি ঋকের অর্থ—যে রুগ্নকে ঔষধি-শক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বৈদ্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চিকিৎসক) চিকিৎসা করেন ইত্যাদি।

ইহাতে ঐ মন্ত্রদ্বয়ে ও তদীয় ভাষ্যে ঔষধিশক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক্ বা বৈদ্য (অর্থাৎ চিকিৎসক) বলা হইয়াছে, বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। প্রবোধনীলেখক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির অভাবে উল্টা বুঝিয়াছেন, অথবা স্বার্থসাধনের জন্য অপর সাধারণকে উল্টা বুঝাইয়াছেন। এইজন্যই ভগবান্ বশিষ্ঠ ও বেদব্যাস বলিয়াছেন—"বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি" অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বেদের আলোচনা করিতে দেখিলে বেদ এই ভাবিয়া ভয় পান যে, এইবার আমার রফা রফা করিবে।

৩। বৈঃ প্রঃ—পূর্ব্বকালে যাঁহারা সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন এবং সর্ব্ববর্ণের রক্ষক বা পিতৃস্বরূপ হইতেন, তাঁহাদিগকেই বৈদ্য, তাত-বৈদ্য প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। যথা—

"কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৄন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাতবৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে॥"(রামা, অযো,১০০ সর্গ

অর্থাৎ (শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন) তুমি দেবগণকে পিতৃলোককে, ভৃত্যদিগকে, পিতৃস্থানীয় গুরুজনদিগকে, বৃদ্ধগণকে, তাতবৈদ্যদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিতেছ ত?

বক্তব্য—শ্লোকটার অনুবাদ ঠিক হয় নাই, এবং উহাতে বানান-ভুলও আছে। সে যাহা হউক, সর্ব্ববর্ণের পিতৃস্বরূপকে যে তাতবৈদ্য বলে, তাহার প্রমাণ উহা কিরূপে হইল? আমরা ত "তাতবৈদ্য" নাম কখনও শুনি নাই, কোথাও দেখিও নাই। ঐ শ্লোকে "তাতবৈদ্য" বলাতেই যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তাতবৈদ্যই যদি ব্রাহ্মণ, তবে আবার "ব্রাহ্মণান্" কেন? বস্তুতঃ ঐ স্থানে "তাত" শব্দ (বৎস অর্থে) ভরতের সম্বোধন—পৃথক্ পদ। যেহেতু, রামায়ণের তিনজন প্রাচীন টীকাকারই "তাত" শব্দ ছাড়িয়া "বৈদ্যান্ ব্রাহ্মণান্" ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বৈদ্যাঃ বিদ্যাসু নিপুণাঃ, তান্ ব্রাহ্মণান্ অভিমন্যসে বহু মন্যসে। যদ্বা বৈদ্যান্ চিকিৎসাপ্রবীণান্ ব্রাহ্মণান্। ব্রাহ্মণসামান্যবিষয়ঃ প্রশ্নোঽয়ং ভবিষ্যতি।"—বিদ্যানিপুণ ব্রাহ্মণদিগকে অথবা চিকিৎসানিপুণ ব্রাহ্মণদিগকে, কিম্বা বিদ্বান্ বা চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকে এবং তদিতর সাধারণ ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান কর ত?

মনুর সংহিতাপ্রণয়নের সময়ে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হয় নাই। হইলে, তিনি অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়া বৈদ্যেরও উল্লেখ করিতেন। রামচন্দ্রের সময়েও বৈদ্যজাতি ছিল না জানিয়া, অথবা বৈদ্য শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভ-জাত (পূর্ব্বোক্ত বৈদ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য) সুতরাং বিলোমজ শূদ্র বলিয়া এবং অম্বষ্ঠও বর্ণসঙ্কর বলিয়া ভরতের সম্মানার্হ হইতে পারে না ভাবিয়া, কোনও টীকাকারই সে অর্থ করেন নাই।

৪। বৈঃ প্রঃ—"বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে। অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা। বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা

সত্ত্বমার্ষমথাপি বা। ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানং তস্মাদ্ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ।"
(চরক, চিকিৎসা ১ অঃ)

অর্থাৎ বিদ্যাসমাপ্তির পর চিকিৎসকের তৃতীয় জন্ম হয়, তখনই তিনি বৈদ্য উপাধি লাভ করেন, জন্মাবধি কাহারও বৈদ্য নাম হইতে পারে না। বিদ্যাসমাপ্তি হইলে বৈদ্যের হৃদয়ে ব্রাহ্মসত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান অথবা আর্ষজ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে, এইজন্য বৈদ্যকে ত্রিজ বলা হয়।

বক্তব্য—অনুবাদটি সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ হয় নাই; মূলের পাঠও "জ্ঞানাৎ" ("জ্ঞানং" নহে)। যাহা হউক, সে বিচার করিতে চাহি না; ইহা দ্বারা যে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহাই দেখাইব। অগ্রে দ্বিজ না হইলে ত্রিজ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত মহাভারতীয় বচন অনুসারে বৈদ্য বিলোমজাত শূদ্র বলিয়া তাহার বৈদিক উপনয়নসংস্কার নিষিদ্ধ; সুতরাং সে যখন দ্বিজই নহে, তখন ত্রিজ কিরূপে হইবে? চরক-সংহিতার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকেই চিকিৎসক বলা হইয়াছে। বৈদিক উপনয়নসংস্কারে ব্রাহ্মণ দ্বিজ হইয়া, পরে আয়ুর্ব্বেদ সমাপনে ত্রিজ হইয়া থাকেন। "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্।" এই বচনে যাহাকে বিপ্র বলা হইয়াছে, চরক তাহাকেই ত্রিজ বলিয়াছেন।

সুশ্রুতে সূত্রস্থানের ২য় অধ্যায়ে চতুর্ব্বর্ণেরই আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন ও আয়ুর্ব্বেদিক উপনয়ন, এবং ত্রৈবর্ণিকের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপন বিহিত হইয়াছে। যথা—

"ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি, রাজন্যো দ্বয়স্য, বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি। শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জ্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে।"
পরন্তু এই উপনয়নে মেখলা-যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের বিধি নাই।

সর্ব্ববর্ণই আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ বলিয়া, আয়ুর্ব্বিদ্যাসমাপ্তিতে তাঁহারাই ত্রিজ হন, ইহাই

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। আয়ুর্ব্বেদোপনয়নে দ্বিজ হইয়া তদ্বিদ্যাসমাপনে ত্রিজ হয় বলিলে, দ্বিজাতিকে আয়ুর্ব্বেদোপনয়নে ত্রিজ এবং বিদ্যাসমাপ্তিতে চতুর্জ্জ বলিতে হয়; এবং শূদ্রই কেবল আয়ুর্ব্বেদোপনয়নে দ্বিজ এবং বিদ্যাসমাপ্তিতে ত্রিজ হইয়া থাকে।

বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইলে এবং চরকস্থ বৈদ্য শব্দ বৈদ্যজাতিবাচক হইলে ঐ চরকেই—ঐ চিকিৎসাস্থানের ঐ প্রথম অধ্যায়েই—কুটীপ্রাবেশিক-রসায়নসেবনার্থ যে কুটীনির্ম্মাণের বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকিত না। যথা—

"নৃপবৈদ্যদ্বিজাতীনাং সাধূনাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
নিবাসে নির্ভয়ে শস্তে প্রাপ্যোপকরণে পুরে।
দিশি পূর্ব্বোত্তরস্যাঞ্চ সুভূমৌ কারয়েৎ কুটীম্।"

সাধু ও পুণ্যকর্ম্মা নৃপ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদিগের যেখানে নিবাস, সেই নগরে ঈশানকোণে সুন্দর ভূমিতে কুটী নির্ম্মাণ করাইবে।

প্রবোধনীলেখকের "মহর্ষিকল্প গঙ্গাধরও" উহার টীকায় লিখিয়াছেন —"নৃপাদীনাং তস্মিন্ পুরে নৃপাদিবাসনগরে।" তাঁহার "নৃপাদীনাং" ও "নৃপাদি" লেখাতেই নৃপ, বৈদ্য ও দ্বিজাতির পার্থক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। উহার পরে পুনর্ব্বার বলা হইয়াছে—

"ইষ্টোপকরণোপেতাং সজ্জবৈদ্যৌষধদ্বিজাম্।"
ঐ কুটীতে আবশ্যক সামগ্রী, বৈদ্য, ঔষধ ও ব্রাহ্মণকে রাখিবে।

ইহাতেও বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্য বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ এখানে বৈদ্য বলিতে চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, এবং দ্বিজ বলিতে শান্তিস্বস্ত্যয়নকারী ব্রাহ্মণ।

৩। বৈঃ প্রঃ—(ক) "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" (মহা, উদ্, ২ অঃ) অর্থাৎ দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ।

(খ) "অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ" (ঐ ২৭ অঃ) অর্থাৎ বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী।

(গ) "সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যস্ত্বভিধীয়তে। বিপ্রাস্তে বৈদ্যাস্তাঃ যান্তি রোগজঃখপ্রণাশকাঃ॥" (উশনঃসংহিতা) অর্থাৎ সর্ব্ববেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ চিকিৎসায় নিপুণ হইলে বৈদ্য নামে অভিহিত হন। যে বিপ্র রোগজনিত দুঃখ নাশ করেন, তিনিই বৈদ্য নাম পাইয়া থাকেন।

(ঘ) "স্বয়মর্জ্জিতমবৈদ্যেভ্যো বৈদ্যঃ কামং ন দদ্যাৎ" (গৌতমসংহিতা) অর্থাৎ বৈদ্য অবৈদ্যকে স্বোপার্জ্জিত ধন দান করিবেন না।

(ঙ) "নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কচিৎ" (কাত্যায়নসংহিতা) অর্থাৎ বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান করিবেন না।

বক্তব্য—প্রবোধনীলেখক বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রথমেই শ্রৌত প্রমাণ দেখাইয়া এইগুলি স্মার্ত্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন।

(ক) তিনি অজ্ঞ লোকদিগকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে অন্তঃবিজ্ঞাসে মহাভারতীয় দুইটি শ্লোকের একাংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহাদের অপরূপ অনুবাদ দিয়া নিজের অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

উদ্যোগপর্ব্বের প্রারম্ভেই আছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট একজন সুদক্ষ দূত পাঠান স্থির হইলে, দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—আমার পুরোহিতকে পাঠাইয়া দিন। এই বলিয়া তিনি আপন পুরোহিতকে বলিয়াছিলেন—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ॥
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥
স ভবান্ কৃতবুদ্ধীনাং প্রধান ইতি মে মতিঃ।
কুলেন চ বিশিষ্টোঽসি বয়সা চ শ্রুতেন চ॥
প্রজ্ঞয়া সদৃশশ্চাসি শুক্রেণাঙ্গিরসেন চ।
বিদিতঞ্চাপি তে সর্ব্বং যথাবৃত্তঃ স কৌরবঃ॥"—(উদ্‌ ৬।১–৪)

নীলকণ্ঠের টীকা—"বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ। কৃতবুদ্ধয়ঃ সিদ্ধান্তজ্ঞাঃ।"

অর্থ—সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিমানেরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যাবানেরা শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাবান্‌দিগের মধ্যে সিদ্ধান্তজ্ঞেরা শ্রেষ্ঠ, সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের মধ্যে শাস্ত্রবিহিত-কর্ম্মকারীরা শ্রেষ্ঠ, উক্ত কর্ম্মকারীদিগের মধ্যে ব্রহ্মবাদীরা শ্রেষ্ঠ। আপনি সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের মধ্যে প্রধান, ইহা আমার জানা আছে। তদুপরি আপনি কুলে, বয়সে ও বিদ্যাতেও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিতে আপনি শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায়। দুর্য্যোধন যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাও আপনার জানা আছে।

পৌরোহিত্য অর্থাৎ যাজন কেবল ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি (মনু ১০।৭৫—৭৮); সুতরাং দ্রুপদ রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণই ছিলেন। এ বিষয়ে মহাভারতও পুনঃপুনঃ সাক্ষ্য দিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রণা-সভাতেই দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

"অয়ঞ্চ ব্রাহ্মণঃ শীঘ্রং মম রাজন্ পুরোহিতঃ।
প্রেষ্যতাং ধৃতরাষ্ট্রায় বাক্যমস্মৈ সমর্প্যতাম্॥" (উদ্‌, ৪।২৬)

ঐ পুরোহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়া তীব্র ভাষায় সমস্ত কথা বলিলে, ভীষ্ম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"ভবতা সত্যমুক্তঞ্চ সর্ব্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
অতিতীক্ষ্ণঞ্চ তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ॥" (২০।৪)

দ্রৌপদী-স্বয়ংবরসভায় অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্যবেধের পর ছদ্মবেশী পাণ্ডবেরা স্বীয় আবাসে চলিয়া গেলে, তাঁহাদের পরিচয় জানিবার জন্য দ্রুপদ রাজা তাঁহার ঐ পুরোহিতকেই পাঠাইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার উপদেশ প্রদান করিলে,

"ভীমস্তথৈতৎ কৃতবান্ নরেন্দ্র, তাঞ্চৈব পূজাং প্রতিগৃহ্য হর্ষাৎ।
সুখোপবিষ্টং পুরোহিতং তদা, যুধিষ্ঠিরো ব্রাহ্মণমিত্যুবাচ॥"
(আদি, ১৮৩।২৩)

অতএব "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" ইহা দ্বারা "দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ" কিরূপে বুঝাইল?

(খ) যুদ্ধের আয়োজন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

"নাধর্ম্মে তে ধীয়তে পার্থ বুদ্ধির্ন সংরম্ভাৎ কর্ম্ম চকর্থ পাপম্।
অথ কিং তৎ কারণং যস্য হেতোঃ, প্রজ্ঞাবিরুদ্ধং কর্ম্ম চিকীর্ষসীদম্॥"
(উদ, ২৭।২২)

আপনি কখনও অধর্ম্মে মতি করেন নাই, কখনও পাপ কর্ম্মও করেন নাই। তবে, এক্ষণে কিজন্য স্বজন ও গুরুজনদিগের বিনাশক যুদ্ধরূপ অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন?

তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

আমি ধর্ম্ম করিতেছি, কি অধর্ম্ম করিতেছি, তাহা বিচারপূর্ব্বক বুঝিয়া তার পর আমাকে তিরস্কার করিবেন। আপৎকালে অধর্ম্মাচরণও ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"মনীষিণাং সত্ত্ববিচ্ছেদনায়, বিধীয়তে সৎস্থ বৃত্তিঃ সদৈব।
অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ সর্ব্বোৎসঙ্গং সাধু মন্যেত তেভ্যঃ।"
(উদ্, ২৮।৬)

নীলকণ্ঠের টীকা—"মনীষিণাং মনসো নিগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছতাং...সত্ত্ববিচ্ছেদনায় সত্ত্বস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য চিদাত্মনা সহ একীভূতস্য বিচ্ছেদনায় মুঞ্জেষিকান্যায়েন পৃথক্করণায় সৎস্থ সতাং গৃহেষু বৃত্তিঃ জীবিকা শাস্ত্রে বিধীয়তে......আত্মান্বেষণায় সর্ব্বসন্ন্যাসপূর্ব্বকং ভিক্ষাচর্য্যবিধানাৎ ব্রাহ্মী বৃত্তিঃ কস্যাপি ন নিন্দ্যা। যে তু অব্রাহ্মণা অপি বৈদ্যাঃবিদ্যানিষ্ঠাঃ ন ভবন্তি, তেষাং ভিক্ষাচর্য্যায়া অবিধানাৎ, তেভ্যঃ তেষামর্থে সর্ব্বোৎসঙ্গং... স্বধর্ম্মসংযোগং আপদনাপদোরুচিতং সাধু মন্যেত।"

সরলার্থ—যাঁহারা সর্ব্বসন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মবিদ্যানিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণাত্যয়ের আশঙ্কায় সৎ জাতির গৃহে ভিক্ষাচর্য্যা বিহিত হইয়াছে; সুতরাং আপৎকালে সর্ব্বসন্ন্যাসীরও এই ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় নহে। পরন্তু যাহারা অব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণেতর অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি) হইয়াও বৈদ্য (বিদ্যানিষ্ঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) নহে, তাহাদের ভিক্ষাচর্য্যার বিধান না থাকায়, কি আপৎকালে কি অনাপৎকালে স্বধর্ম্মপালনই উচিত মনে করিবে। (ভাবার্থ—আমি ব্রাহ্মণ নহি, তদুপরি ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠও নহি; সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মপালন সর্ব্বকালেই আমার কর্ত্তব্য হওয়ায় অধর্ম্মাচরণ করিতেছি না।)

এতাবতা "অব্রাহ্মণাঃ" সন্তি তু তে যে ন বৈদ্যাঃ" ইহার অর্থ—"বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণনামের অনধিকারী" কিরূপে দাঁড়াইল? ঐরূপ অর্থ হইলে শ্লোকটার পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতি কিরূপে ঘটে? সঞ্জয় বলিলেন—"আপনি পরম ধার্ম্মিক হইয়া কিজন্য এরূপ অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন?" যুধিষ্ঠির তাহার উত্তর

দিলেন—"বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী।" কি শ্রুতি-সংবাদিনী ব্যাখ্যা! প্রবোধনীলেখকের প্রোজ্জ্বল পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় কি প্রখরতার পরিস্ফূর্ত্তি!!

বৈদ্যগণই যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, তবে 'ব্রাহ্মণ' বলিলে লোকে 'বৈদ্য' বুঝে না কেন? বৈদ্যেরা নিজেই বা বুঝেন না কেন?—তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে কেবল 'ব্রাহ্মণ' না বলিয়া তৎপূর্ব্বে 'বৈদ্য' বিশেষণ যোগ করেন কেন? তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-সমিতি"ই ত ইহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

(গ) "সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ" এই উশনোবচনে ব্রাহ্মণ চিকিৎসকেরই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে; বৈদ্যজাতির লক্ষণ নহে। প্রবোধনীলেখকের স্বকৃত অনুবাদেই ত তাহা প্রকাশ পাইতেছে। প্রাচীনতম কালে কেবল ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসক ছিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(ঘ) অবৈদ্যকে ও সুহৃৎকে স্বোপার্জ্জিত ধন ও বিদ্যাধন দান করা বৈদ্যদিগের নিষিদ্ধ হওয়াতেই বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ, এ কথাটা—মুচিরা যখন জুতা তৈয়ার করে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা জল-আচরণীয়—এই কথারই অনুরূপ।

বৈদ্যেরা কি এতই দাতা যে, আপামর সকলকে স্বোপার্জ্জিত ধন দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবেন ভাবিয়া, বৈদ্যেতর দেবদ্বিজকেও এবং দীন-দরিদ্রকেও এক পয়সা দিও না বলিয়া গৌতম তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন?

আর্য্যমাত্রেই জানেন, গৌতমবচনের অর্থ হইতেছে—বৈদ্য (অর্থাৎ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি) অবৈদ্যকে (অর্থাৎ বিদ্যাহীন দায়াদকে) স্বোপার্জ্জিত ধনের অংশ দিবে না।

(ঙ) "বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান করিবেন না"—কাত্যায়ন-বচনের এই অর্থ হইলে বুঝিতে হয় যে, বৈদ্য ভিন্ন আর

সকলেই বিদ্যাহীনকে বিদ্যাধনের অংশ দিবে।—তাই কি? মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ত সাধারণের জন্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন—স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ নাই। যথা—

"বিদ্যাধনন্তু যদ্ যস্য তৎ তস্যৈব ধনং ভবেৎ।" (মনু ৯।২০৬।)

"অনাশ্রিত্য পিতৃদ্রব্যং স্বশক্ত্যাপ্নোতি যদ্ধনম্।
দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাৎ বিদ্যালব্ধঞ্চ যদ্ভবেৎ।" (ব্যাস)

"উপন্যস্তে তু যল্লব্ধং বিদ্যয়া পণপূর্ব্বকম্।
বিদ্যাধনন্তু তদ্ বিদ্যাৎ বিভাগে ন নিয়োজয়েৎ॥"

ইত্যাদিরূপ বিদ্যাধনের লক্ষণ করিয়া কাত্যায়ন তৎপরেই উক্ত বচনটি বলিয়াছেন—

"নাবিদ্যানান্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ।
সমবিদ্যাধিকানান্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনম্।"

প্রাচীন স্মার্ত্তগণের ব্যাখ্যানুসারে রঘুনন্দন উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"তত্রোচ্চারিতবিদ্যাপদম্ উভাভ্যাং সম্বধ্যতে। তেন সমবিদ্যাধিকবিদ্যানাং ভাগঃ, ন তু ন্যূনবিদ্যাঽবিদ্যয়োঃ। বৈদ্যেন বিদুষা।... এবমেব দায়ভাগমদনপারিজাতাদয়ঃ।"

অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি সমবিদ্য ও অধিকবিদ্য দায়াদকে বিদ্যাধনের ভাগ দিতে পারে; কিন্তু অবিদ্য ও ন্যূনবিদ্য দায়াদকে দিবে না।

৬। বৈদ্যঃ প্রঃ—বশিষ্ঠ, ধন্বন্তরি, চন্দ্র প্রভৃতি বৈদ্য ছিলেন। ইঁহারা যে ইদানীন্তন বৈদ্যগণের কুল ও গোত্রপ্রবর্ত্তক—তাহা বৈদ্যগণের সুবিদিত। যথা—

(ক) "ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।
বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ॥"
(রাম', অযো, ৭৭ অঃ)

(খ) "ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো দেবো ধন্বন্তরিস্ত্বভূৎ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণ মমৃতেন সমুত্থিতঃ॥" (গরুড় পুঃ)

(গ) "চন্দ্রোঽমৃতময়ঃ শ্বেতো বিধুর্বিমলরূপবান্।
যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ॥"

(বৃঃ ধর্ম পুঃ)

বক্তব্য—যে-যেখানে যত বৈদ্য শব্দ আছে, সকলের **অর্থই** "জাতি-বৈদ্য" ধরিতে হইবে, এত ত বড় আপদ্! তাহা হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত—সকলকেই বৈদ্য বলিতে হয়। যেহেতু মহাদেবের "বৈদ্যনাথ" নাম ত প্রসিদ্ধ; তদুপরি তাঁহার সহস্র-নামের মধ্যে আছে—

(ঘ) "উন্মত্ত্ব ত্রিবিক্রমো বৈদ্যো বিরজো নীরজোঽমরঃ।"

(মহা, অনু, ১৭।১৪৮)

(ঙ) বিষ্ণুসহস্রনামে আছে—

"বেদ্যো বৈদ্যঃ সদাযোগী বীরহা মাধবো মধুঃ।" (ঐ ১৪৯।৩১)

(চ) বটুকভৈরবস্তবে তাঁহার অষ্টোত্তরশত নামের মধ্যে আছে—

"সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্।"

(ছ) কুন্তী স্বীয় পুত্রদিগের দুর্দ্দশায় দুঃখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

"তে তু বৈদ্যাঃ কুলে জাতাঃ অবৃত্ত্যা তাত পীড়িতাঃ।"

(মহা, উদ্, ১৩২।২৭)

(জ) মহর্ষি বাল্মীকি আদি-কবি, সুতরাং কবিরাজ। অতএব তিনিও বৈদ্য।

(ঝ) প্রবোধনী-লেখকের মতে বশিষ্ঠ যখন বৈদ্য, তখন তাঁর পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, সেই পরাশরের পুত্র বেদব্যাসকে ত বীজ-ভাবে খাঁটি বৈদ্যই বলিতে হয়।

(ক) ব্রহ্মার মানস পুত্র, সূর্য্যবংশের পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, এ কথা শুনিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। যেহেতু যাজনকার্য্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নাই।

(মনু ১০।৭৫—৭৮)।

বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য কেন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সে ঘটনা আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই জানে। প্রবোধনী-লেখকের নিশ্চিতই তাহা জানা নাই। তাঁহাকে মহাভারত আদিপর্ব্বের ১৭৫ অধ্যায় দেখিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে জানিতে পারিবেন—বশিষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন, কি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বহুসৈন্যসমন্বিত বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে পাইবার ইচ্ছায়, এক অর্ব্বুদ ধেনু লইয়া উহাকে দিবার জন্য বশিষ্ঠকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বিশ্বামিত্র বলিয়াছিলেন—

"ক্ষত্রিয়োঽহং ভবান্ বিপ্রস্তপঃস্বাধ্যায়সাধনঃ।
ব্রাহ্মণেষু কুতো বীর্য্যং প্রশান্তেষু ধৃতাত্মসু॥"

আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের প্রতি বলপ্রয়োগ কাহারও উচিত নহে। কিন্তু আপনি এক অর্ব্বুদ গাভী লইয়াও যখন একটী গাভী দিতে চাহিতেছেন না, তখন অগত্যা আমি স্বধর্ম্মানুসারে বলপূর্ব্বক উহাকে লইয়া যাইব।

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নন্দিনী কাতর হইয়া বশিষ্ঠের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন বশিষ্ঠ তাহাকে বলিলেন—

"হ্রিয়সে ত্বং বলাদ্ ভদ্রে বিশ্বামিত্রেণ নন্দিনি।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া তত্র ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণোঽস্ম্যহম্॥"

বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন, আমি কি করিব; আমি যে ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ।

"ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্।

ক্ষমা মাং ভজতে যস্মাদ্ গম্যতাং যদি রোচতে ॥"

ক্ষত্রিয়ের তেজই বল, ব্রাহ্মণের ক্ষমাই বল। সেই ক্ষমা আমাকে ভজনা করিতেছে। ইচ্ছা হয় তুমি গমন কর।

নন্দিনী তখন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে বহু সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা বিশ্বামিত্রের অমিত সৈন্যকে পরাস্ত করাইল। ব্রহ্মতেজের এই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া বিশ্বামিত্র নিতান্ত নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া,

"ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্। (ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্ : ব্রহ্মতেজোরূপ বলই পরম বল) এই বলিয়া রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর তপস্যার প্রভাবে—

"তত্তাপ সর্ব্বান্ দীপ্তৌজা ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্।"

সর্ব্বলোককে তাপিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত রামায়ণশ্লোকে বশিষ্ঠের বিশেষণ যে 'বৈদ্য' আছে, রামানুজ তাহার অর্থ করিয়াছেন—"বৈদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ। সর্ব্বজ্ঞবিদ্বজ্জৌ বৈদ্যৌ ইতি কোষঃ।" অর্থাৎ এখানে বৈদ্য শব্দের অর্থ—সর্ব্ববিদ্যাভিজ্ঞঃ (৯ পৃঃ)।

(খ) ধন্বন্তরি নামে অনেক ব্যক্তি ছিলেন—সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন এক ধন্বন্তরি; কাশিরাজের পুত্র দীর্ঘতমা, তৎপুত্র এক ধন্বন্তরি (বিষ্ণুপুঃ); বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার এক ধন্বন্তরি; ইত্যাদি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ জাতিতে বৈদ্য থাকিলেই বা তাহাতে ইষ্টোপপত্তি কি? পরন্তু গরুড়পুরাণে যে সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত ধন্বন্তরির উল্লেখ আছে, তিনি নারায়ণাংশ; যথা—

"অথোদধের্ম্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ।

উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ॥

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।

ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্॥" (ভাগবত ৮।৮।৩১—৩৫)

তিনি ঐরাবতাদির ন্যায় অযোনিসম্ভব; সুতরাং জাতিতে বৈদ্য ছিলেন না। সমুদ্রগর্ভে ত আর বৈদ্যজাতির বাস ছিল না যে, তিনি তদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিলেন। রোগহারী বলিয়াই গরুড়পুরাণে তাঁহাকে বৈদ্য বলা হইয়াছে (৮পৃঃ ২৩ পং)

(গ) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে চন্দ্রস্তবে চন্দ্রকে যে বৈদ্য বলা হইয়াছে, তাহা ওষধীর অধিপতি চন্দ্র ওষধী দ্বারা রোগপ্রতীকারক বলিয়া (১০পৃঃ ১৪ পং "ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা" ইত্যাদি ঋক্ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) মহাদেবসহস্রনামে যে বৈদ্য আছে, নীলকণ্ঠ তাহার অর্থ করিয়াছেন—"বৈদ্যঃ বিদ্যাবান্।"

(ঙ) বিষ্ণুসহস্রনামে বৈদ্য শব্দের শাঙ্কর ভাষ্য—"সর্ব্ববিদ্যানাং বেদিতৃত্বাৎ বৈদ্যঃ।"

(চ) বটুকস্তবেও ঐরূপ অর্থ।

(ছ) মহাভারতে কুন্তী পাণ্ডবদিগকে যে বৈদ্য বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ নীলকণ্ঠের টীকায়—"বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ।"

বৈদ্যদিগের শক্তি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গোত্র আছে বলিয়াই যদি তাঁহারা তত্তদ্গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে কায়স্থদিগের গর্গ, গৌতম, ভরদ্বাজ ইত্যাদি এবং তিলী, তামলী, কামার, কুমার, নাপিত প্রভৃতিরও কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ইত্যাদি গোত্র থাকায় তাঁহারা ও তাহারাও কি তবে ব্রাহ্মণ?

বৈদ্যদিগের চন্দ্র গোত্র থাকায় তাঁহাদিকে দেবতাও ত বলা যাইতে পারে! এজইনাই বোধ হয় (চন্দ্র গগনচারী বলিয়া) "অম্বষ্ঠঃ খচরো বৈদ্যঃ" এই প্রবাদটা প্রচলিত আছে—যাহা লক্ষ্য করিয়া প্রবোধনী-লেখক লিখিয়াছেন—"কেহ বা বৈদ্যগণকে 'জারজ' অথবা 'বর্ণসঙ্কর' কিংবা 'অজাত' বলিয়া গালি দেয়।" মহাভারতের প্রামাণ্যে (৯পৃঃ ১৪পং)

বৈদ্য বলিয়া যখন একটা জাতি আছে, তখন বৈদ্য যে 'অজাত' নহে, ইহা আমরাও স্বীকার করি।

গোত্র সম্বন্ধে স্মৃতিনিবন্ধকারদিগের অভিমত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধমাদিপুরুষব্রাহ্মণরূপং গোত্রম্। রাজন্যবিশাং প্রাতিস্বিকগোত্রাভাবাৎ পুরোহিতগোত্রপ্রবরৌ বেদিতব্যৌ। শূদ্রস্য তু, বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চেতি মনুবচনে চকারসমুচ্চিতগোত্রেঽপি বৈশ্যধর্মাতিদেশাৎ, পূর্ব্বপুরুষ-পুরোহিতগোত্রভাগিত্বং প্রতীয়তে।" অর্থাৎ প্রত্যেক বংশের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও বর্ণেরই গোত্র সম্ভবে না। অথচ বিবাহাদি-ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে সকলজাতিরই (হিন্দুমাত্রেরই) গোত্রোল্লেখ শাস্ত্রে আদিষ্ট হওয়ায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্ব স্ব গোত্রের অভাব হেতু পূর্ব্বপুরুষীয় পুরোহিতদিগের গোত্রই তাহাদের গোত্র বুঝিতে হইবে।

৭। বৈঃ প্রঃ—আয়ুর্ব্বেদকে যখন পুণ্যতম বেদ বলা হইয়াছে (যথা—"তস্মাদায়ুর্ব্বেদঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ" (চরক, সূত্র, ১ অঃ), তখন এই বেদের ও অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে হইতে পারে?

বক্তব্য—প্রবোধনীলেখকের অভিপ্রায় এই যে, আয়ুর্ব্বেদ যখন বেদ, বেদের অধ্যাপক যখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না, এবং বৈদ্যই যখন সেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক, তখন বৈদ্য সুতরাং ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বেই (৮পৃঃ) দেখাইয়াছি—আয়ুর্ব্বেদ 'বেদ' নহে, এবং সুশ্রুত ত্রৈবর্ণিককেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক বলিয়াছেন। প্রবোধনীলেখক নিশ্চিতই স্বয়ং বৈদ্য, এবং বৈদ্যক শাস্ত্রের অধ্যেতা ও অধ্যাপক; কিন্তু ঐ শাস্ত্রে যে, তাঁহার সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, তাহার পরিচয় পাওয়া

যাইতেছে। ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, তিনি "তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদঃ" ইহার অর্থ "আয়ুর্ব্বেদ পুণ্যতম বেদ" কখনই লিখিতেন না। চরকে

"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্।
মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে॥"

এইরূপ আয়ু ও আয়ুর্ব্বেদের লক্ষণ করিয়া তৎপরেই বলা হইয়াছে—

তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ।
বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ॥"

'তস্য আয়ুষঃ বেদঃ বক্ষ্যতে'—সেই আয়ুর বেদ অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ ("অর্থেদশমূলীয়"-নামক এই সূত্রস্থানের ত্রিংশ অধ্যায়ে) বলা হইবে।

সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—"আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে, অনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীতি আয়ুর্ব্বেদঃ।" প্রবোধনীলেখকের "মহর্ষিকল্প গঙ্গাধর"ও ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"বিদ বিচারণে, বিদ লাভে, বিদ জ্ঞানে ইত্যেতেষু অর্থেষু বেদয়তি বিন্দতি বেত্তি বা অনেন অস্মিন্ বেত্তি বেদ ইতি সুশ্রুতানুসারিণঃ।"

অতএব দেখা যাইতেছে, আয়ুর্ব্বেদকে 'বেদ' কেহই বলেন নাই; উক্ত শ্লোকে বেদ শব্দের অর্থ—সত্তা, জ্ঞান, লাভ বা বিচার ('বেদ' নহে)। যে শাস্ত্রে আয়ুর বিষয় আছে, যাহা দ্বারা আয়ুর জ্ঞান হয়, যাহাতে দীর্ঘায়ুর্লাভের উপায় কথিত হইয়াছে অথবা আয়ুসম্বন্ধে বিচার আছে, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে।

৮। বৈঃ প্রঃ—জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তিকৃত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ "চৈতন্যমঙ্গলে"ও লিখিত আছে—"বৈদ্যব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বৈসে। মহোৎসব করে সবে মনের হরিষে॥" এখানে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ এইরূপ অর্থ করিলেও পূর্ব্বে বৈদ্যের উল্লেখ থাকায় বৈদ্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। অদ্যাপি বহু স্থানেই বহু বৈদ্যসন্তান "বৈদ্যব্রাহ্মণ" বলিয়া

আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন এবং অন্যান্য জাতিরা অনেক স্থলেই বৈদ্য-গণকে "বদ্যিবামুন" বলেন।

বক্তব্য—প্রবোধনী-লেখক "অভ্যর্হিতক" (দ্বন্দ্বসমাসে শ্রেষ্ঠ-পদার্থ-বোধক পদের প্রাগ্‌ভাব হয়) এই পাণিনীয় বার্ত্তিকসূত্র দেখিয়াই, চৈতন্যমঙ্গলে বৈদ্যব্রাহ্মণ থাকায় বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন (এরূপ বলায় বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্যই সূচিত হইতেছে)। পরন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম খাটে না। এইজন্যই কায়েত-বামুন, ধোপা-নাপিত, কাক-কোকিল, মুড়ি-মিছরি ইত্যাদি পদ বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত। সংস্কৃতেও উক্ত নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়; যথা—"গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূ" (বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টক), "ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং" (চণ্ডী), "বাগেবার্থৈ-রিবার্ণবঃ" ও "চিত্রাচন্দ্রমসোরিব" (রঘুবংশ) ইত্যাদি। তজ্জন্য "বাসু-দেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" এই পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যায় তত্ত্ববোধিনীকার লিখিয়াছেন—"...তদপ্যনিত্যং শ্বযুবমঘোনামিত্যাদিলিঙ্গাৎ ইত্যাহু-র্বেষম্।" অর্থাৎ যদিও ভাষ্যকার প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছেন—অর্জ্জুন অপেক্ষা অভ্যর্হিত বলিয়া বাসুদেবের প্রাগ্‌ভাব হইয়াছে, তথাপি ঐ সূত্রের কার্য অনিত্য বুঝিতে হইবে; যেহেতু সূত্রকার স্বয়ং "শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে" সূত্রে প্রথমেই শ্বন্ (কুকুর), তার পর যুবন্ (যুবা) এবং তার পর মঘবন্ (ইন্দ্র) বলিয়াছেন। অতএব 'শ্বন্-মঘবন্'এর ন্যায় 'বৈদ্য ব্রাহ্মণ' বলায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদ্যের উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে না।

কবিকঙ্কণ কালকেতুর নগরে প্রথমে মুসলমান, তাহার পর দ্বিজ গ্রহবিপ্র, বর্ণদ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে বসাইয়া পরে বৈদ্যগণকে বসাইয়াছেন। (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, বঙ্গবাসীর সংস্করণ, পৃঃ ৮০।৮১)। ধর্ম্ম-মঙ্গলেও ইছাইয়ের নগরে—

"ব্রাহ্মণপণ্ডিত বৈদ্য" স্থলে ব্রাহ্মণের পর বৈদ্যের নাম লিখিত আছে

(শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, বঙ্গবাসীর সংস্করণ, পৃঃ ১২)। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই।

"বহুস্থানেই বহু বৈদ্যসন্তান বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন"—সর্ব্বত্র সর্ব্ববৈদ্য সেরূপ পরিচয় দেন না কেন? পরন্তু আত্মপরিচয়-দান একটা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; যেহেতু অনেক শূদ্রও সদ্ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া অনেকের বাটীতে রন্ধন-কার্য্য করিয়া থাকে; কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া পাচিকা বেশ্যারা কত লোকের বাটীতে শেষে ধরা পড়িয়াছে, এবং কত হাড়ি-বাগ্দির সন্তান পইতার গোছা গলায় দিয়া ব্রাহ্মণ-পরিচয়ে হোটেল খুলিয়াছে।

"অন্যান্য জাতিরা অনেক স্থলেই বৈদ্যগণকে বদ্দিবামুন বলেন"—সকল স্থলে সকলে বলে না; তাহার কারণ—ইতর লোকে যাহার গলায় পইতা দেখে, তাহাকেই বামুন মনে করে। এইজন্যই তারা ভাটবামুন, আচাজ্জিবামুন, ছেত্তিরবামুন, বদ্দিবামুন ইত্যাদি বলিয়া থাকে।

৯। বৈঃ প্রঃ—মন্বাদিস্মৃতির মতে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই উপনয়নে কার্পাস-সূত্রময় উপবীত, মৌঞ্জী মেখলা, বিল্ব বা পলাশ দণ্ড ও কৃষ্ণসার চর্ম্ম ধারণের বিধি আছে (মনু ২।৪৪—৪৬)। বৈদ্যগণকে চিরদিন ব্রাহ্মণোচিত বিধি অনুসারেই উপনীত করা হয়। বৈশ্যোচিত মেষলোমের উপবীত বা শণতন্তুময়ী মেখলা প্রভৃতি দেওয়া হয় না। বৈদ্য ব্রহ্মচারী ভিক্ষা গ্রহণকালে অন্য ব্রাহ্মণবালকের মতই "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া থাকেন। বৈশ্যোচিত উপনয়ন হইলে "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" বলিবার ব্যবস্থা হইত (মনু ২।৪৯)। অতএব ব্রাহ্মণোচিত উপনয়নসংস্কার দ্বারাও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বই সুপ্রতিপন্ন হইতেছে।

মন্তব্য—("বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠজাতীয় নহেন" পরে ১৪ সংখ্যায় তাঁহাদের উক্তি দ্রষ্টব্য) অনুলোমজ বলিয়া অম্বষ্ঠের বৈশ্যোচিত উপনয়ন—

সংস্কার আছে বটে; কিন্তু বৈদ্য বিলোমজ বলিয়া তাহার উপনয়ন-সংস্কারই নাই, ব্রাহ্মণোচিত কার্পাসোপবীতাদির কথা ত "শিরো নাস্তি শিরোব্যথা"র ন্যায় হইতেছে। বৈদ্যগণকে যে "চিরদিন ব্রাহ্মণোচিত বিধি অনুসারে উপনীত করা হয়," সে চিরদিনটা কত কাল হইতে? আর্ষযুগ হইতে, না রঘুনন্দনের সময় হইতে, কিম্বা "ঋষিকল্প গঙ্গাধর, উমেশচন্দ্র, প্যারীমোহন প্রভৃতি বৈদ্যকুলে আবির্ভূত" হইবার পর হইতে? "বৈদ্য ব্রহ্মচারী ভিক্ষা গ্রহণকালে অন্য ব্রাহ্মণ-বালকের মতই" লেখায় বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্যই সূচিত হইতেছে। বৈদ্য ব্রহ্মচারীকে ব্রাহ্মণোচিত "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা করিবার ব্যবস্থা কে দিয়াছেন? কোনও প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকার, না কোনও পঞ্জিকাকার, না উক্ত ঋষিকল্প গঙ্গাধর প্রভৃতি, না উক্ত স্মার্ত্তপ্রবরদিগের মধ্যে কেহ?

মনু ব্রাহ্মণাদির উপবীতাদি সম্বন্ধে সামান্যতঃ কার্পাসসূত্রাদির বিধান করিলেও সর্ব্বদেশের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা পুরুষানুক্রমে কার্পাসোপবীতই ধারণ করেন, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ; দণ্ডমেখলাদিও ব্রাহ্মণবৎ। যেহেতু ত্রৈবর্ণিকের কার্পাসোপবীতাদি শাস্ত্রবিহিত; যথা গোভিল—"অলাভে বা সর্ব্বাণি সর্ব্বেষাম্" অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মচারীর বসনাদি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া যাহা যাহা বলা হইল, তাহাদের অপ্রাপ্তিতে সকলেই সকলপ্রকার বসনাদি ব্যবহার করিতে পারে। অতএব ইহা দ্বারা "বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সুপ্রতিপন্ন" না হইয়া বরং দুর্ব্যাপন্নই হইতেছে।

১০। বৈদ্যঃ প্রঃ—বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার। রামায়ণে দেখা যায়, ভগবান্ রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কচ্চিদ্ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যমুখ্যাংশ্চ রাঘব।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বুভূষসে॥" (অযো, ১০০ সর্গ)

(অর্থাৎ হে রাঘব ! তুমি বৃদ্ধ, বালক ও শ্রেষ্ঠ বৈদ্যদিগকে অর্থদান, মঙ্গল জিজ্ঞাসা ও প্রিয়বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেছ ত ?)

ভূমিদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই ভূমি প্রতিগ্রহ করিতে অধিকারী নহেন। পূর্ব্বকালের বৈদ্য পণ্ডিতগণকে প্রদত্ত বহু ব্রহ্মোত্তর জমী এখনও বহু স্থানেই বর্ত্তমান আছে।

বক্তব্য—মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতিগ্রহ নিষেধ করিলেও (মনু ১০।৭৫—৭৮) রামায়ণের ঐ শ্লোকে বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার যদিই প্রতিপন্ন হয় এবং প্রতিগ্রহাধিকার থাকাতেই যদি বৈদ্য ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্লোকে সামান্যতঃ বৃদ্ধ ও বাল শব্দের উল্লেখ থাকায় যে-কোনও জাতির বৃদ্ধ ও বালককেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয়।

প্রাচীনকালে অনেক রাজা রাজড়া নিজেদের বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে প্রতিমা গড়িবার জন্য কুমারকে, ফুল যোগাইবার জন্য মালীকে, পরিচর্য্যা করিবার জন্য নাপিতকে, ঢাক ঢোল বাজাইবার জন্য মুচিকে, যাত্রা করিবার জন্য অধিকারীকে জমী দিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের বংশাবলী অদ্যাপি তাহা ভোগ করিতেছে। তাই বলিয়া তাহারাও কি ব্রাহ্মণ? ফলের তারতম্য থাকিলেও, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ—আচণ্ডাল—সকল জাতিকেই সর্ব্বপ্রকার দান করিবার বিধি আছে। যথা—

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্র-মনন্তং বেদপারগে।" (মনু ৭।৮২); সম—শাস্ত্রোক্ত ফল, দ্বিগুণ—তৎফলের দ্বিগুণ)

"সর্ব্বত্র গুণবদ্দানং শ্বপাকাদিষ্বপি স্মৃতম্।"
(বৃহস্পতি ; গুণবৎ—ফলবৎ, শ্বপাক—চণ্ডাল)

পরন্তু উক্ত রামায়ণ-শ্লোকে যে 'বৈদ্য' আছে, তাহার অর্থ টীকাকারগণের মতে পূর্ব্ববৎ (১২পৃঃ) বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বা চিকিৎসক ব্রাহ্মণ (বৈদ্য নহে)।

পাণ্ডবেরা বনবাসকালে রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও এইরূপ একটি শ্লোক আছে—

"কচ্চিত্তে গুরবঃ সর্ব্বে বৃদ্ধা বৈদ্যাশ্চ পূজিতাঃ।"

(মহা, বন, ১৫৯।৭)

নীলকণ্ঠের টীকা—"বৈদ্যাঃ বিদ্যয়া বিদিতাঃ।"

১১। বৈঃ প্রঃ—রাঢ়ীয় সমাজের অনেক বৈদ্যই শালগ্রামশিলা পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ দুর্গাপূজা ও কালীপূজা এবং চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অদ্যাপি অনেক বৈদ্য স্বয়ং করিয়া থাকেন। সেই সকল স্থলে বৈদ্যমহিলাদের পাক করা অন্নভোগও দেওয়া হয়।

বক্তব্য—ইদানীং যথেচ্ছাচারের যুগে সকলেই সকল কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির স্পর্শপূর্ব্বক শালগ্রামশিলা ও প্রতিমা পূজা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে "প্রাণতোষণী"কার বিশদ বিচার করিয়াছেন। যথা—

"নন্থ, ব্রাহ্মণঃ পূজয়েন্নিত্যং ক্ষত্রিয়াদির্ন পূজয়েৎ ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনাৎ ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামশিলামূর্ত্তিপূজননিষেধাৎ ক্ষত্রিয়াদিভিঃ শালগ্রামশিলামূর্ত্তিপূজনং কর্ত্তব্যং কথমিতি চেৎ? ন, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ত্রয়াণাং মুনিসত্তম। অধিকারঃ স্মৃতঃ সম্যক্ শালগ্রামশিলার্চ্চনে। ইত্যাদিপদ্মপুরাণাদিবচনৈঃ ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামপূজাশ্রবণাৎ। এবঞ্চ সতি, ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতাধিকো মম। ইতি লিঙ্গপুরাণবচনে ব্রাহ্মণস্যৈবেত্যত্র অন্যযোগব্যবচ্ছেদপরেণ এবকারেণ ব্রাহ্মণমাত্রস্যৈব স্পর্শবৎপূজায়ামধিকারো গম্যতে। ক্ষত্রিয়াদীনাং স্পর্শমাত্রং নিষিদ্ধমিতি। এবঞ্চ সতি, ক্ষত্রিয়াদিপূজানিষেধকবচনানাং স্পর্শমাত্রনিষেধপরত্বাৎ

ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামপূজাবিধায়কানি বচনানি স্পর্শহীনপূজাবিষয়ত্বেন যোজ্যানি।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই শালগ্রামশিলা পূজা করিতে পারেন। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্পর্শ ব্যতিরেকে পূজা করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের শালগ্রামশিলার স্পর্শে ও পূজায় অধিকার নাই। "একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথা" (এক বিষয়ে শাস্ত্রের যে বিধান আছে, বাধক বচন না থাকিলে অন্য বিষয়েও সেই বিধান) এই ন্যায়ে প্রতিমাপূজা বিষয়েও ঐ নিয়ম।

কলিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠাদি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। যথা—

"ইদানীন্তনক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ—শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ অতএব বিষ্ণুপুরাণম্—মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্ বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি।" (শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন)। বাচস্পতিমিশ্রও ঐরূপ লিখিয়াছেন।

এই কারণে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের শালগ্রামাদিপূজার ব্যবহার নাই। তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরাই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

এই জাতিতত্ত্বের আলোচনা আমি বিদ্বেষবশে করিতেছি না, অপক্ষপাতেই করিতেছি; তবে তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবার কিছু পাই নাই বলিয়াই সর্ব্বত্র বিপক্ষে বলিতে হইতেছে। কিন্তু এখানে তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবার একটা কথা আছে।—

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্রাদির ঐরূপ মীমাংসা প্রমাণরূপে গণ্য হইলেও আমাদের কিন্তু মনোরম হইতেছে না। যেহেতু শূদ্র রাজা

(অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কর্মকারী) হইবে বলিয়া ক্ষত্রিয়দিগকেও যে শূদ্র হইতে হইবে, এ কিরূপ যুক্তি ! তাহা হইলে ম্লেচ্ছের যাজনে সকল ক্ষত্রিয়কে আবার ম্লেচ্ছও হইতে হয়, এবং তাহা হইলে মহাভারতে (বন, ১৯০।[illegible]) কলিযুগে "শূদ্রা ধর্মং প্রবক্ষ্যন্তি" থাকায় সকল ব্রাহ্মণকেও শূদ্র হইতে হয়।

মনু উক্ত বচনে "ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" (এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি) বলিয়া পর-বচনেই তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" (১০।৪৪)

"ইমাঃ" বলিয়া ঐ সকল ক্ষত্রিয়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ এবং "বৃষলত্বং গতাঃ" এই অতীতকালে প্রয়োগ করায়, তাঁহার সংহিতা-প্রণয়নের পূর্ব্বে ঐ সকল ক্ষত্রিয়ই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সমস্ত ক্ষত্রিয় হয় নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তাহা না হইলে, পরশুরাম ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হইয়া একুশ বার পৃথিবীকে যে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া-ছিলেন, তখন তিনি ক্ষত্রিয় পাইলেন কোথায় ? তাহাতেও প্রত্যেক বারেই নিঃশেষে ক্ষত্রিয় নাশ করিলে 'একুশ বার' কিরূপে ঘটিল ? তাঁহার সমকালে ও ত্রেতার শেষভাগেও সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়-গণের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইল ? দ্বাপরে যদুবংশীয়, ভরতবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কিরূপে রহিল ? এবং কলিতে মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ই বা কোথা হইতে আসিল ? মহাপদ্মনামা নন্দের অখিলক্ষত্রিয়ান্তকারিত্বও সেইরূপ। এতাবতা পরশুরাম ও মহাপদ্ম নিঃশেষে ক্ষত্রিয় নাশ করেন নাই, এবং ক্রিয়ালোপে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়াদি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও সকল ক্ষত্রিয়, সকল বৈশ্য ও সকল অম্বষ্ঠ শূদ্র হইয়া যান নাই। কতক কতক প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য ও প্রকৃত অম্বষ্ঠ আছেন; বহু প্রদেশে তাঁহারা

অস্তিত্ব দেখাও যাইতেছে। এই কারণেই বঙ্গীয় অম্বষ্ঠগণের মধ্যে কতক উপবীতধারী ও কতক উপবীতবর্জ্জিত ছিলেন এবং এখনও অনেক আছেন (শেষোক্ত অম্বষ্ঠেরা শূদ্রধর্ম্মানুসারে ১ মাস অশৌচ পালন করিয়া থাকেন)। ইহাতে তাঁহাদের অম্বষ্ঠত্ব ও শূদ্রত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই একাকার হওয়ায় তাঁহাদের পার্থক্য বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং সংশয়স্থলে সকল অম্বষ্ঠকেই শূদ্র বলিয়া মনে করিতে হয়। বিলোমজাত বৈদ্যের শূদ্রত্বে ত সংশয়ের লেশমাত্র নাই।

অতএব কোনও বৈদ্যের এবং ইদানীন্তন কোনও অম্বষ্ঠেরও শালগ্রামশিলা ও প্রতিমা পূজায় অধিকার নাই। তবে যে-সকল অম্বষ্ঠ পুরুষানুক্রমে উপবীত-ধারণাদি বৈশ্যধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা (যাজনে অধিকার না থাকায়) নিজের জন্য স্পর্শ ব্যতিরেকে ঐ সকল পূজা করিতে পারেন বটে; কিন্তু শালগ্রামের স্নপনান্তে গাত্র-মার্জ্জনাদি এবং প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি স্পর্শ বিনা করা যায় না বলিয়া তাঁহারাও স্বয়ং না করিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণ দ্বারাই করাইয়া থাকেন।

পরন্তু রঘুনন্দনের ঐ পঙ্‌ক্তি দেখিয়া আমাদের ইহাও মনে হয়, তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠগণ উপবীতবর্জ্জিতই ছিলেন। তদ্দর্শনেই তিনি তাঁহাদের শূদ্রত্বের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহাদের উপবীত থাকিলে তিনি কখনই ঐরূপ লিখিতেন না, এবং নবদ্বীপে বৈদ্যমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া ঐরূপ লেখায় তাঁহাদের হস্তে তিনি নিস্তার পাইতেন না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তৎকালে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যেরা নিশ্চয়ই শূদ্রধর্ম্মা ছিলেন। তাঁহার ঐরূপ লেখায় চক্ষুরুন্মীলন হওয়ায় তাঁহার পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের অধিকাংশই উপবীত গ্রহণ করিয়া বৈশ্যধর্ম্মানুসারে ১৫ দিন অশৌচ পালনাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উপবীতগ্রহণ

বিধিপূর্ব্বক হয় নাই; যেহেতু চারি পুরুষ উপনয়নসংস্কারবর্জ্জিত হইলে, তাহাদের সন্তানের উপনয়ন হইতে পারে না (এম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। এইজন্যই অবৈধ উপনয়ন বলিয়া তাঁহারা কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখিতেন (কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং তাদৃশরূপে যুক্ত সূত্র উপবীতপদবাচ্যও নহে—মৎপ্রণীত "আহ্নিককৃত্যে"র ৩য় খণ্ডে "যজ্ঞোপবীতধারণ" দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, বৈদ্যগণের প্রতি সৌহার্দ্দবশতঃ, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, এ সকল কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি—"গতস্য শোচনা নাস্তি কৃতস্য করণং যথা" (যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য এখন আর আপত্তি করা নিষ্প্রয়োজন)। যম বলিয়াছেন—"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ" অন্তিম যুগে অর্থাৎ কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই জাতিই থাকিবে। এই জন্যই বোধ হয় অনেকে ব্রাহ্মণ হইতেছেন।

স্নান, শ্রাদ্ধ, পঞ্চযজ্ঞ ভিন্ন কার্য্যে পুরাণপাঠে অধিকার থাকায় শূদ্রে যখন নিজের জন্য মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী পাঠ করিতে পারেন, তখন অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের তাহাতে বাধা নাই; কিন্তু অন্যের জন্য চণ্ডীপাঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। যথা—

"ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যান্নান্যবর্ণজমাদরাৎ।
শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্রাজন্ বাচকান্নরকং ব্রজেৎ॥" (ভবিষ্যপুঃ)

ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণ দ্বারা পুরাণাদি পাঠ করাইলে ও তাহাদের মুখে শুনিলে নরকে যাইতে হয়।

রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বে লিখিয়াছেন—"শূদ্রকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকচরুবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা পক্বান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি।" (শূদ্রকর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গাদিতে ব্রাহ্মণপক্ব চরু যেমন দেবতাকে দেওয়া হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণপক্ব অন্ন দ্বারা শূদ্রও দেবতার ভোগ দিতে পারে; পরন্তু স্বপক্ব অন্ন দেবতাকে নিবেদন করিতে পারে না)। কিন্তু—

"মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥
... ...
পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্॥"
(মনু ৪।২০৭—২২০)

"চিকিৎসকস্ত অম্বষ্ঠস্ত" (কুল্লূকভট্ট)।

অর্থাৎ অম্বষ্ঠের অন্ন খাইবে না। অম্বষ্ঠের অন্ন খাইলে পূয খাওয়া হয়।

"অমৃতং ব্রাহ্মণান্নেন দারিদ্র্যং ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রান্নং শূদ্রান্নান্নরকং ব্রজেৎ॥" (ব্যাস ৪।৩৬)

ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দারিদ্র্যজনক, বৈশ্যের অন্ন শূদ্রান্নস্বরূপ এবং শূদ্রের অন্ন ভোজনে নরকে গমন হয়।

ইত্যাদি বচন দ্বারা অম্বষ্ঠের পক্কান্ন যখন সর্ব্ববর্ণের অভোজ্য এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্কান্ন যখন ব্রাহ্মণের অভোজ্য সুতরাং অস্পৃশ্য, তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও দ্বিজাতিরই পক্কান্নে দেবতার ভোগ হইতে পারে না। শূদ্রজাতীয়া "বৈদ্যমহিলাদের পাক করা অন্নভোগ" ত সুদূর-পরাহত।

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আরও তিনটি বক্তব্য এই যে—(১) প্রোক্ত কারণে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোনও দ্বিজাতিই পক্কান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতে পারেন না (আমান্ন দ্বারা করিবেন); যেহেতু (ক) শ্রাদ্ধীয় অন্ন ব্রাহ্মণেরই ভোজ্য, (খ) অগ্নৌকরণে ব্রাহ্মণের পাণিতে অন্ন প্রদান করিবার বিধি, এবং (গ) পিণ্ডও ব্রাহ্মণকে দাতব্য। যথা—

(ক) "গোভিলঃ...ব্রাহ্মণানামন্ন্য ···। ব্রাহ্মণানামন্ন্যেতি ব্রাহ্মণান্ নিমন্ত্র্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। ...ব্রাহ্মণাসম্পত্তৌ কুশময়ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধমুক্তং

শ্রাদ্ধবিবেকে—নিধায়াথ দর্ভচয়মাসনেষু...ইতি তদ্ধৃতবচনাৎ, ব্রাহ্মণানা-মসম্পত্তৌ কৃত্বা দর্ভবটূন্ দ্বিজান্। শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পশ্চাদ্ বিপ্রেষু দাপয়েৎ। ইতি শ্রাদ্ধসূত্রভাষ্যকার-সমুদ্রকরধৃতবচনাচ্চ।"

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

"শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্॥" (মনু ৩।১২৮)

(খ) "অথাভাবে তু বিপ্রস্য পাপাদেব জলেঽপি বা।"

(শ্রাদ্ধকল্পধৃত মৎস্যপুঃ)

(গ) "পিত্রাংস্তু গোবৃষবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা।"

(মৎস্যপুঃ ১৬।৫২)

শ্রাদ্ধধর্মের আদেশ হেতু পূর্বকালেও ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতির আমান্ন দ্বারাই কর্তব্য।

(২) অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য ব্রাহ্মণাদির নমস্য নহেন। তাঁহাদিগকে নমস্কার বা অভিবাদন করিলে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। যথা—

"ব্রাহ্মণ ইত্যনুবৃত্তৌ মিতাক্ষরাধৃত হারীতঃ—ক্ষত্রিয়স্যাভিবাদনেঽহো-রাত্রমুপবসেদেবং বৈশ্যস্যাপি। শূদ্রস্যাভিবাদনে ত্রিরাত্রমুপবসেদিতি। অত্র অহোরাত্রাদ্যুপবাসশ্রবণাৎ মনুবচনোক্তবিপ্রনমস্কারাপনয়ং-প্রায়শ্চিত্তং প্রমাদবিষয়ং জ্ঞানকৃতনমস্কৃতিবিষয়ং বা। যথা মনুঃ—যদি বিপ্রঃ প্রমাদেন শূদ্রং সমভিবাদয়েৎ। অভিবাদ্য দশ বিপ্রাংস্ততঃ পাদৈঃ প্রমুচ্যতে।" (মলমাসতত্ত্ব)

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে অভিবাদন করিলে ব্রাহ্মণ অহোরাত্র উপবাস করিবে, এবং শূদ্রকে অভিবাদন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে।— এই হারীতবচনে অহোরাত্র ও ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান থাকায়, অন্য মুনির মতে দশজন ব্রাহ্মণকে নমস্কাররূপ যে লঘু প্রায়শ্চিত্ত

বিহিত হইয়াছে, তাহা প্রমাদকৃত বা ভ্রমকৃত নমস্কারের পক্ষে। যেহেতু মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ যদি প্রমাদ (অনবধানতা) বশতঃ শূদ্রকে অভিবাদন করে, তাহা হইলে দশজন ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

(এই জন্যই, ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নমস্কার করিয়া পাছে ব্রাহ্মণেরা প্রায়শ্চিত্তার্হ হন, তাহা হইলে আপনাদিগকেও পাপভাগী হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় পূর্ব্বে অম্বষ্ঠজাতীয় ধর্ম্মভীরু বৈদ্যেরা কটিদেশে যজ্ঞোপবীত রাখিতেন।)

অতএব যে সকল ব্রাহ্মণ ছাত্র জ্ঞানপূর্ব্বক বৈদ্য অধ্যাপকদিগকে অভিবাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আর কখনও ঐরূপ গর্হিত কর্ম্ম যেন না করেন (অশক্তপক্ষে প্রত্যেক উপবাসের অনুকল্প ৮ পণ কড়ি উৎসর্গ করিবারও বিধি আছে)।

(৩) বৈদ্যের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র উপবাস, স্নান ও পঞ্চগব্যপানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত হইবে।

১২। বৈঃ প্রঃ—ইতিহাসে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিপতি বৈদ্য নৃপতি মহারাজ বল্লালসেন চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজের কৌলীন্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর কোনও রাজারই ব্রাহ্মণসমাজের উপর নেতৃত্ব করা বা বড়কে ছোট করা কখনই সম্ভবপর নহে। বল্লালসেন তাঁহার "দানসাগর"-নামক স্মৃতিগ্রন্থে সেনবংশকে "শ্রুতিনিয়মগুরু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি শব্দের অর্থ বেদ, শ্রুতিনিয়ম অর্থাৎ বেদবিহিত নিয়ম, তাহার গুরু ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে হইতে পারে?

বক্তব্য—বল্লালসেন চাতুর্ব্বর্ণ্যের কৌলীন্য সংস্থাপন করেন নাই; কেবল আদিশূরানীত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণেরই করিয়া-

ছিলেন। কুলজী গ্রন্থে বৈদ্যগণেরও কৌলীন্যসংস্থাপন লিখিত হইয়াছে; তাহাতে সেন, দাস ও গুপ্তকে যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম কুলীন বলা হইয়াছে। বল্লালের মৃত্যুর বহুকাল পরে ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; সুতরাং বৈদ্যদিগের কৌলীন্য সংস্থাপন বল্লালের স্বকৃত, কি অনুরোধপরতন্ত্র ঘটক মহাশয়গণের কৃত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় (৪র্থ পরিচ্ছেদে ১২ নং দ্রষ্টব্য)। যাহাই হউক, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের পৃথক্ কৌলীন্য সংস্থাপনেও তাঁহাদের "প্রকৃত ব্রাহ্মণপদ-বাচ্যত্ব" নিরাকৃত হইয়াছে।

হিন্দু নৃপতিমাত্রেরই শ্রুতিনিয়মগুরুত্ব এবং ব্রাহ্মণসমাজের উপরও নেতৃত্ব শাস্ত্রবিহিত ও ব্যবহারপ্রসিদ্ধ। যথা—

"সম্যগ্ বেদান্ প্রাপ্য শাস্ত্রাণ্যধীত্য,
সম্যগ্ রাজ্যং পালয়িত্বা চ রাজা।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্ম্মে,
পূতাত্মা বৈ মোদতে দেবলোকে॥" (মহা, শান্তি, ২৪।৩৬)

রাজা সম্যগ্রূপে বেদজ্ঞান লাভ ও শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়নপূর্ব্বক সম্যগ্রূপে প্রজাপালন এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিয়া পবিত্র হইয়া দেবলোকে সুখে বাস করেন।

এইজন্যই ক্ষত্রিয় রাজা পরীক্ষিৎ পরম সাত্ত্বিক ও ব্রাহ্মণভক্তিনিষ্ঠ হইয়াও, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় না দিবার অপরাধে, স্বধর্ম্মানুরোধে, শমীক মুনির স্কন্ধে মৃতসর্প সংযোজনরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকারমাত্রেই গ্রন্থের নমস্ক্রিয়ারূপ মঙ্গলে দেবতাকেই প্রণাম করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মধ্যে কেবল পিতা, মাতা ও গুরুর প্রণাম কোনও কোনও গ্রন্থে দেখা যায়; পরন্তু কোনও জাতির প্রণাম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বল্লালসেন "দানসাগর" গ্রন্থের প্রারম্ভে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদিগকেই প্রণাম করিয়াছেন। যথা—

"যে সাক্ষাদবনীতলামৃতভুজো বর্ণাশ্রমজ্যায়সাং
যেষাং পাণিষু নিক্ষিপন্তি কৃতিনঃ পাথেয়মামুষ্মিকম্।
যদ্বক্ত্রোপনতাঃ পুনন্তি জগতীং পুণ্যাস্ত্রিবেদীগির-
স্তেভ্যো নির্ভরভক্তিসম্ভ্রমনমন্মৌলি দ্বিজেভ্যো নমঃ।"

যাঁহারা ভূতলে প্রত্যক্ষ দেবতা, যাঁহারা সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, পুণ্যবান্ লোকেরা যাঁহাদের হস্তে পরলোকের পাথেয় গচ্ছিত রাখেন (অর্থাৎ পরকালে স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে যাইবার জন্য যাঁহাদিগের হস্তে ধন দান করেন) এবং যাঁহাদের মুখনিঃসৃত পবিত্র বেদধ্বনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, সেই ব্রাহ্মণদিগকে সাতিশয় ভক্তি ও সম্মানের সহিত মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি।

তৎপরে স্বীয় বংশ ও গুরুর পরিচয় দিয়া, পুনর্ব্বার বলিয়াছেন—
"দুরধিগমধর্ম্মনির্ণয়-বিষমাধ্যবসায়সংশয়স্তিমিতঃ।
নরপতিরয়মারেভে ব্রাহ্মণচরণারবিন্দপরিচর্য্যাম্।"

এই রাজা দুর্ব্বোধ-ধর্ম্মনির্ণয়রূপ বিষম অধ্যবসায়ে (অশক্য কর্ম্মে উৎসাহে) সংশয়ে জড়ীভূত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের চরণারবিন্দ সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

"শুশ্রূষাপরিতোষিতৈরবিরতং সম্ভূয় ভূদেবতৈ-
র্দত্তামোঘবরপ্রসাদবিশদস্বান্তস্খলৎসংশয়ঃ।
শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিরচয়ত্যেতং গুরোঃ শিক্ষয়া
স্বপ্রজ্ঞাবধি দানসাগরমহং শ্রদ্ধাবতাং শ্রেয়সে।"

নিরন্তর সেই সেবায় পরিতোষ লাভপূর্ব্বক, ভূদেবগণ মিলিত হইয়া, দয়া করিয়া যে অব্যর্থ আশীর্ব্বাদরূপ বর দিয়াছেন, তদ্দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও সকল সংশয় দূরীভূত হওয়ায়, গুরুর (অনিরুদ্ধভট্টের)

শিক্ষায়, এই নরপতি শ্রীবল্লালসেন শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের শ্রেয়োলাভের জন্য যথামতি এই দানসাগর রচনা করিতেছেন।

বল্লালসেন ব্রাহ্মণ হইলে, অত বড় রাজা হইয়া, ব্রাহ্মণের প্রতি এত ভক্তি, ব্রাহ্মণের নিকট এত হীনতা-স্বীকার এবং এত বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেন না।

বল্লালের মৃত্যুর বহুকাল পরে ঘটককারিকাবলী রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সেন উপাধি দেখিয়া ঐ সকল কারিকাবলীতে যদিও তাঁহাকে বৈদ্যবংশসম্ভূত বলা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের বৈদ্যজাতীয়ত্বে সংশয় জন্মে। যেহেতু মহাভারতে দেখা যায় (আদি, ১১১ অঃ), কুন্তী-গর্ভজাত কর্ণের প্রকৃত নাম বসুষেণ এবং তাঁহার পুত্রের নাম বৃষসেন। "বল্লালচরিতে" লিখিত হইয়াছে—ঐ বৃষসেনের পুত্র পৃথুসেন, তদ্বংশে বীরসেনের জন্ম, তদ্বংশীয় সামন্ত সেন, তৎপুত্র হেমন্তসেন, তৎপুত্র বিজয়সেন, তৎপুত্র বল্লালসেন। "দানসাগরে"ও লিখিত হইয়াছে—হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন, তৎপুত্র বল্লালসেন। এতাবতা ভীমসেনাদির ন্যায় "সেন" তাঁহাদের নামেরই অংশ বুঝা যাইতেছে (উপাধি নহে)। তাঁহারাও শাসনপত্রাদিতে কেবল চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়াই আত্মপরিচয় দিয়াছেন, কুত্রাপি বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন নাই (কলিকাতা সাহিত্যসভা হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত দানসাগর গ্রন্থের ভূমিকায় সংগৃহীত কতিপয় শাসনপত্র দ্রষ্টব্য)।

দানসাগরের ২য় শ্লোকে ঐ "শ্রুতিনিবহগুরু"র পূর্ব্বে ও পরে "ইন্দোর্বিশ্বৈকবন্দ্যাঃ শ্রুতিনিবহগুরুঃ সচ্চারিত্রচর্য্যামর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ ......নিরবগ্রহবলেন্দুর্বভৌ সেনবংশঃ" লিখিয়া, বল্লাল স্বয়ং তাঁহাদের সেনবংশকে (অর্থাৎ পালবংশের ন্যায় সেনান্তনামধারী ব্যক্তিবর্গের বংশকে) চন্দ্র হইতে উৎপন্ন ও ক্ষত্রিয়াচারী বলিয়াছেন; বৈদ্য বা ব্রাহ্মণ

বলেন নাই। কর্ণ, চন্দ্রবংশীয়া ও ভবিষ্যতে তদ্বংশীয় পাণ্ডুর পত্নীভূত কুন্তীর গর্ভজাত হইয়াও, সূতজাতীয়া কন্যা বিবাহ করায় তাঁহার বংশ বর্ণসঙ্করত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত সেনবংশের কেহই স্পষ্ট করিয়া আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়ও বলিতে পারেন নাই।

এই সমস্ত দেখিয়াই বোধ হয় 'প্রবোধনী'-লেখক বৈদ্যের 'চন্দ্র' গোত্র স্থির করিয়াছেন (৬ নং); কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতাদি আর কেহই যে 'গোত্র' হইতে পারেন না, তাহা (ঐ সংখ্যাতেই) বলিয়াছি।

আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফলেও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গালার সেনবংশীয় নৃপতিগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"সেনবংশীয় রাজগণের খোদিত লিপিমালায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় কর্ণাটদেশবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃ: ৩১৪)। উক্ত যুক্তির সমর্থনে রাখাল বাবু যে খোদিত লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—

"পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য বংশে
কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
কৃত্বা নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলমধিকতরাস্তপ্যাতা নাকনদ্যাঃ
নির্ম্মিক্তো যেন যুধ্যাত্রিপুরুধিরকণাকীর্ণধারঃ কৃপাণঃ॥"

১৩। বৈঃ প্রঃ—"ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" (মনু ১০ অঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণপরিণীতা বৈশ্যকন্যার গর্ভে জাত বৈধ সন্তান 'অম্বষ্ঠ' নামে অভিহিত।

পঞ্চম বেদ মহাভারতে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন—"ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ" (অনু, ৪৭।১৭) অর্থাৎ তিন বর্ণের পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণই উৎপন্ন হয়।

পরে আবার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণা-জ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ। ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি।" (৪৭:২৫) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয়কন্যাতে ও বৈশ্যকন্যাতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণই হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনুসংহিতাতেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে—"সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষত-যোনিষু। আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে।" (১০ অঃ) অর্থাৎ সকল বর্ণের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অক্ষতযোনি ও জাতিসামান্যে তুল্য পত্নীতে অনুলোমজ সন্তান জাতিতে পিতৃবর্ণই হইয়া থাকে।

মহামহোপাধ্যায় গদাধর এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করেন—সর্ব্ববর্ণের মধ্যে জাতিসামান্যে তুল্য নারীতে, সমানাসমানবর্ণজা পত্নীতে এবং অনুলোমজা অক্ষতযোনি কন্যা অর্থাৎ কুমারীতে জাত সন্তান পিতৃবর্ণই হইয়া থাকে।

বক্তব্য—উক্ত মনুবচনের ঐ অর্থই প্রকৃত হইলে, উহার পরবর্ত্তী শ্লোক—

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্।"

অনন্তরবর্ণা স্ত্রীতে দ্বিজাতিদিগের উৎপাদিত পুত্রগণ মাতৃদোষে বিগর্হিত (অর্থাৎ মাতার হীনবর্ণত্ব হেতু হীন) হওয়ায় পিতৃসদৃশ হয় (পিতৃজাতীয় হয় না)।

তাহার পরেই আবার—

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষডেতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ।"

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে, এবং বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্ন—এই ছয় পুত্র অপসদ (নিকৃষ্ট)।

"পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে।"

দ্বিজাতিদিগের অনন্তরবর্ণস্ত্রীজাত পুত্রেরা মাতৃদোষে (অর্থাৎ মাতার হীনবর্ণত্ব হেতু) পিতৃজাতীয় না হইয়া মাতৃজাতীয় হইয়া থাকে।

—এই সকল বচনের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হয়?

সমানাসমানবর্ণজা পত্নীতে জাত সন্তান পিতৃবর্ণই হইলে, ব্রাহ্মণের শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান নিষাদকেও ব্রাহ্মণ, এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান মাহিষ্যকেও ক্ষত্রিয় বলিতে হয়।

ব্রাহ্মণের অনন্তরজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্তই যখন মাতৃবর্ণ হইয়া থাকে, তখন একান্তরজ অর্থাৎ বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ কিরূপে পিতৃবর্ণ হইতে পারে?

অম্বষ্ঠ যদি পিতৃবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণই হয়, তবে তাহার 'অম্বষ্ঠ' এই পৃথক্ সংজ্ঞা কেন? অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে, অম্বষ্ঠকন্যা সুতরাং ব্রাহ্মণ-কন্যা; তাহার গর্ভে ব্রাহ্মণোৎপন্ন আভীরও তাহা হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে। যেহেতু মনুই বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়া-মায়োগব্যান্তু ধিগ্বণঃ।" (১০।১৫)

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" ইত্যাদি মনুবচনের টীকা—"ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু চতুর্ষ্বপি, তুল্যাসু সমানজাতীয়াসু, পত্নীষু যথাশাস্ত্রং পরিণীতাসু, অক্ষতযোনিষু, আনুলোম্যেন—ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং, ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং, বৈশ্যেন বৈশ্যায়াং, শূদ্রেণ শূদ্রায়াম্ ইত্যনেন অনুক্রমেণ যে জাতাঃ, তে মাতাপিত্রোর্জ্জাত্যা যুক্তাঃ তজ্জাতীয়াঃ এব জ্ঞাতব্যাঃ।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের যথাশাস্ত্র পরিণীতা অক্ষতযোনি সবর্ণা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্রগণ মাতাপিতৃজাতীয়ই হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের

ব্রাহ্মণীপত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াপত্নীর পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্যাপত্নীর পুত্র বৈশ্য, এবং শূদ্রের শূদ্রাপত্নীর পুত্র শূদ্র হইয়া থাকে।

এই অর্থই প্রকৃত; যেহেতু এই অর্থেই উক্ত সমস্ত বচনের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে। বিষ্ণুসংহিতাতেও এই কথা সুস্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ।
প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।" (১৬।১—৩)

মনু উক্ত বচনে "পত্নীষু" বলিয়া প্রত্যেক বর্ণের পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীকেই বুঝাইয়াছেন। যেহেতু "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" এই পাণিনি-সূত্র দ্বারা সহধর্ম্মচারিণী অর্থেই পতি শব্দের উত্তর ঙীপ্ প্রত্যয়ে 'পত্নী' হয়। অসবর্ণা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এইজন্যই তিনি এবং অন্যান্য সংহিতাকারগণও অসবর্ণা স্ত্রীর স্থলে সর্ব্বত্রই স্ত্রী বা ভার্য্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কুত্রাপি 'পত্নী' বলেন নাই, এবং দ্বিজাতিদিগের অসবর্ণা অনুলোমজাতা কন্যাকে বিবাহ করা বিষয়ে 'ধর্ম্মতঃ' না বলিয়া "কামতঃ" (মনু ৩।১২) বলিয়াছেন, মহাভারতেও (অনু ৪৭।৪) "রতিমিচ্ছতঃ" আছে। অসবর্ণা বিবাহে পাণিগ্রহণেরও বিধান নাই; আছে কেবল—

"শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া;
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে।" (মনু ৩।৪৪)

বর একটা বাণ ধারণ করিলে ক্ষত্রিয়া তাহার এক প্রান্ত গ্রহণ করিবে, বর প্রতোদ (পাঁচনী বাড়ি) ধরিলে বৈশ্যা তাহার এক প্রান্ত ধরিবে, এবং শূদ্রা বরের উত্তরীয় বস্ত্রের দশা (দশী) ধারণ করিবে।

এই জন্যই অমর পত্নীপর্য্যায়ে বলিয়াছেন—

"পত্নী পাণিগৃহীতী চ দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী।"

পাণিগৃহীতী—যথাবিধি যাহার পাণিগ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়া—যে ধর্ম্মাচরণের সহায়ভূতা। সহধর্ম্মিণী—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই ব্যবস্থানুসারে যাহার সহিত ধর্ম্মাচরণ করা যায়।

অতএব "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" বচনের ব্যাখ্যায় প্রবোধনীলেখকের "দ্বিজত্বসামান্যে তুল্যা পত্নীতে" লেখা এবং তাঁহার মহর্ষিকল্প গঙ্গাধরের "সমানাসমানবর্ণজা পত্নীতে" লেখাটাও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক হয় নাই।

এই ত মনুবচনের সম্বন্ধে বলা হইল। এখন মহাভারতীয় দুইটি শ্লোকের সম্বন্ধে বলি—

শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার প্রকরণ, উপক্রম, উপসংহার ও বচনান্তরের সহিত সামঞ্জস্য দেখিতে হয়। প্রবোধনীলেখক সে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাতেই ঐ দুইটি শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন।

অনুশাসনপর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ে উক্ত শ্লোকদ্বয়ের উপক্রমে ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন—

"চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ॥
তত্র জাতেষু পুত্রেষু সর্ব্বাসাং কুরুসত্তম।
আনুপূর্ব্ব্যেণ কস্তেষাং পিত্র্যং দায়াদ্যমর্হতি॥" (৪—৫)

ব্রাহ্মণের (ধর্ম্মার্থ) ব্রাহ্মণী, এবং রতীচ্ছায় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বিধ ভার্য্যা বিহিত হইয়াছে (যথা মনু—"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। কামতস্তু * প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ। শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে। তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ

* কামতঃ—কামবশাৎ (কুল্লুক)। ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়্বা পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ (পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য)।

তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ।"—৩।১২—১৩) । তাহাদের পুত্রগণের মধ্যে যথাক্রমে পিতার ধনে কে কিরূপ অধিকারী হইবে ?

ভীষ্মের উত্তর—

"লক্ষণং গোবৃষো যানং যৎ প্রধানতমং ভবেৎ ।
ব্রাহ্মণ্যাস্তদ্ধরেৎ পুত্র একাংশং বৈ পিতুর্ধনাৎ ॥
শেষন্তু দশধা কার্য্যং ব্রাহ্মণস্বং যুধিষ্ঠির ।
তত্র তেনৈব হর্ত্তব্যাশ্চত্বারোঽংশাঃ পিতুর্ধনাৎ ॥
ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ ।
স তু মাতৃবিশেষেণ ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি ॥
বর্ণে তৃতীয়ে জাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি ।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্ যুধিষ্ঠির ॥
শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো নিত্যাদেয়ধনঃ স্মৃতঃ ।
অল্পং চাপি প্রদাতব্যং শূদ্রাপুত্রায় ভারত ॥" (১১—১৫)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পিতার সম্পত্তির মধ্যে যাহা যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তৎসমস্ত বিভাগ না করিয়া ব্রাহ্মণীর পুত্র একাই লইবে। অন্য সম্পত্তি ১০ ভাগ করিয়া তাহার মধ্যেও ঐ ব্রাহ্মণীর পুত্র ৪ অংশ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র ৩ অংশ, এবং বৈশ্যার পুত্র ২ অংশ লইবে। শূদ্রার পুত্র ('নিত্য-অদেয়-ধন') ধনাধিকারী নহে, তথাপি তাহাকে ১ অংশ দিবে। (যথাবিধি স্মৃতিতেও এইরূপই আছে)।

ইহার পরেই বৈদ্যপ্রবোধনীতে উদ্ধৃত দুইটি শ্লোক—

"ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।" (১৭)

'ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈব হি ।" (২৫)

ইহাও ভীষ্মের উক্তি। ইহার পর উপসংহারে যুধিষ্ঠিরের পুনঃ প্রশ্ন—

"কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপসত্তম।
যদা সর্ব্বে ত্রয়ো বর্ণাস্ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি॥" (২৯)

আপনি যখন তিন বর্ণকেই (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীজাত, ক্ষত্রিয়াজাত ও বৈশ্যাজাত পুত্রকে) ব্রাহ্মণ বলিলেন, তখন তাহারা কি জন্য এরূপ অসমান অংশ প্রাপ্ত হইবে?

ভীষ্ম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া শেষে বলিয়াছেন—
"এষ দায়বিধিঃ পার্থ পূর্ব্বমুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা॥" (৫৮)
পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগের বিধি বলিয়াছিলেন।
ঐ অধ্যায়টার নাম "রিকৃথবিভাগকথন" (রিকৃথ—ধন)।

তার পরেই "বর্ণসঙ্করকথন"-নামক ৪৮ অধ্যায়ের প্রথমেই যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন—

"অর্থাল্লোভাদ্বা কামাদ্বা বর্ণানাঞ্চাপ্যনিশ্চয়াৎ।
অজ্ঞানাদ্বাপি বর্ণানাং জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
তেষামেতেন বিধিনা জাতানাং বর্ণসঙ্করে।
কো ধর্ম্মঃ কানি কর্ম্মাণি তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥" (১—২)

অর্থগ্রহণ, কন্যাপিতার সম্পত্তি পাইবার লোভ, রতীচ্ছা, বর্ণের অনিশ্চয়, অথবা বর্ণসম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু বর্ণসঙ্কর জন্মে। সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি, তাহা আমাকে বলুন।

[এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য এই যে,—যুধিষ্ঠিরের ঐরূপ প্রশ্নে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কেবল অসবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তানকেই বর্ণসঙ্কর বলে না; ঐসকল কারণে সবর্ণস্ত্রীগর্ভজাত সন্তানও বর্ণসঙ্কর বলিয়া গণ্য হয়। অতএব যাঁহারা বরপণরূপ অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দেন, তাঁহারাও বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ (১।৪১)

যাহারা বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করে, তাহারা ও তাহাদের বংশ নরক-গামী হয়, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জলপিণ্ডের বিলোপে পতিত হইয়া থাকেন।

পাছে বর্ণসঙ্করের কারণ হইতে হয়, এই ভয়ে স্বয়ং ভগবান্‌ও ভীত হইয়া বলিয়াছেন—

"সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥" (গীতা ৩।২৪)]

এখন প্রকৃত কথা বলি। যুধিষ্ঠিরের ঐ প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন—"ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্যাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ॥" (৪)

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বিধ ভার্য্যার মধ্যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণীগর্ভজাতপুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্তও ব্রাহ্মণ (পূর্ব্বোক্ত মনুবচনের সহিত একবাক্যতায় 'ব্রাহ্মণসদৃশ'—নীলকণ্ঠও এইরূপ বলিয়াছেন), এবং বৈশ্যাগর্ভজাত অম্বষ্ঠ ও শূদ্রাগর্ভজাত নিষাদ নিকৃষ্ট ও মাতৃজাতীয়।

এতাবতা, মুখাদি সম্বন্ধে সাদৃশ্য হেতু যেমন মনুষ্যকেও হস্তী বলা যায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণধনে অধিকারিত্ব সম্বন্ধে সাদৃশ্য হেতু ৪৭ অধ্যায়ের ১৭ ও ২৫ শ্লোকে দায়ভাগপ্রকরণেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে (তজ্জাতীয়ত্ব হেতু নহে); শূদ্রার পুত্র ধনাধিকারী নহে বলিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। এইরূপ ব্যাখ্যায় সর্ব্বসামঞ্জস্যই সুরক্ষিত হইতেছে। অন্যথা ৪৭ অধ্যায়ে অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ৪৮ অধ্যায়ে তাহাকে মাতৃজাতীয় (অর্থাৎ বৈশ্য) বলা উন্মত্তপ্রলাপ হয়।

ইহা আমাদের মনগড়া ব্যাখ্যা নহে। পূর্ব্বোক্ত "ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণা-

জাতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ যাহা সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, তাহাই আমরা বিস্তর করিয়া লিখিলাম। তিনি লিখিয়াছেন— "এতচ্চ দায়ার্থম্ অবধ্যত্বার্থঞ্চ উক্তং, বিপ্রাৎ বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াঞ্চ জাতস্য মাতৃজাতীয়ত্বস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ।" অর্থাৎ এখানে অম্বষ্ঠকে যে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, তাহা দায়াধিকারের জন্য এবং রাজদণ্ডে অবধ্য হইবার জন্য; যেহেতু পরে অম্বষ্ঠকে ও নিষাদকে মাতৃজাতীয় বলা হইবে।

১৪। বৈঃ প্রঃ—বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠজাতীয় নহেন। বৈদ্যগণ বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, অম্বষ্ঠ বলিয়া নহে।

বক্তব্য—যাঁহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ও প্রসিদ্ধ এবং উপবীত-ধারী, তাঁহারা এতকাল আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়াই জানিতেন। তজ্জন্য এখনও, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও, অনেকেই ১০দিন অশৌচ গ্রহণ ও পক্ষান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে সাহস করিতেছেন না। "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" এই মনুবচনে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি বিহিত হওয়ায় এবং "ভিষগ্ বৈদ্যৌ চিকিৎসকে" এই অমরোক্তিতে বৈদ্য শব্দের অন্যতম অর্থ 'চিকিৎসক' থাকায় অম্বষ্ঠেরাই বৈদ্য নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সুচতুর জাতি-বৈদ্যগণ তাঁহাদের বৃত্তি অবলম্বন ও তদ্বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়া অন্যের অগোচরে কোমরে পইতা রাখিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের দলে মিশিয়া গিয়াছেন; সেইজন্য সকল অম্বষ্ঠই চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, কিন্তু সকল বৈদ্য চিকিৎসা ব্যবসায় করেন না, এবং সেইজন্যই অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য জাতির উপাধিও এক হইয়াছে। একণে "প্রবোধনী"র প্রবোধনে ধর্ম্মের দিকে না চাহিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ ও ইহকাল পরকাল না ভাবিয়া সকল অম্বষ্ঠই বৈদ্য নামে পৃথক্ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তবে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের পার্থক্য কোথায়? অম্বষ্ঠেরাও বৈদ্যজাতীয় হইলে তাঁহাদের উপনয়নসংস্কার কোন্ প্রমাণে হয়? কোন্ প্রমাণে তাঁহারা—ব্রাহ্মণ হওয়া দূরে থাকুক—দ্বিজাতিই

বা হন? প্রবোধনীলেখক যে-সকল প্রমাণে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তৎসমস্তই যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা সকলকেই এখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বৈদ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিতে (৯পৃঃ) দেখাইয়াছি—মহাভারতে বৈদ্যকে বৈশ্যাগর্ভে শূদ্রোৎপন্ন বলা হইয়াছে। বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যার সহিত হীনবর্ণ পুরুষের বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ; সুতরাং বৈদ্যকে অবৈধ সন্তানই বলিতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণপরিণীতা বৈশ্যকন্যার গর্ভোৎপন্ন অম্বষ্ঠ বৈধ সন্তান—এ কথা প্রবোধনীলেখকও বলিয়াছেন (১৩ নং), এবং আমরাও স্বীকার করি। কেবল মহাভারতে নহে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও আছে—

"বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।" (ব্রহ্ম, ১০ অঃ)

অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদ্যের জন্ম।

মহাভারতে অশ্বিনীকুমারকে শূদ্র বলা হইয়াছে। যথা—

আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বিশশ্চ মরুতস্তথা।

অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাহিতৌ।

স্মৃতাশ্চাঙ্গিরসো দেবা ব্রাহ্মণা ইতি নিশ্চয়ঃ।

ইত্যেতৎ সর্ব্বদেবানাং চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।"

(শান্তি, ২০৮।২৩—২৪)

দেবতাদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় শূদ্র, এবং অঙ্গিরোগণ ব্রাহ্মণ। দেবতাদিগের এইরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য উক্ত হইয়াছে।

এতাবতা বৈদ্য—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে চণ্ডালস্থানীয়, এবং মহাভারতের মতে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আয়োগবস্থানীয়। পরন্তু ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত অপেক্ষা মহাভারতের প্রামাণ্যই অধিক।

ব্যাসসংহিতায় (১।৮) উক্ত হইয়াছে—"অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ

শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।" নিকৃষ্টবর্ণ পুরুষ হইতে উৎকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র অধম শূদ্র।

এতদবস্থায় বৈদ্য-ব্রাহ্মণ হওয়া ভাল, কি অম্বষ্ঠ-বৈশ্য থাকাই ভাল—ইহা ধীর ও স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে ধর্ম্মভীরু কৃতবিদ্য বৈদ্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করি।

১৫। বৈঃ প্রঃ—বৈদ্যরাজত্বাবসানে বৈদ্যগণ শক্তিহীন হইলে, এই সময় হইতেই বৈদ্যবিদ্বেষী অসদ্ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা, পুরাণাদিতে বৈদ্যকুৎসার উদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত মূর্খতাপূর্ণ শ্লোকসন্নিবেশ প্রভৃতি বহু কুকার্য্যই করিয়া রাখিয়াছেন। সেগুলি এখন ধরা পড়িতেছে।

বক্তব্য—বল্লালসেনকে বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার রাজত্বকালে বৈদ্যগণের অধিকতর শক্তিশালিতার এবং বৈদ্যেতর জাতির শক্তিহীনতার কোনও পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, তিনি নিজেই তৎকালেও ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ শক্তিশালিতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং কায়স্থগণকেও কৌলীন্যমর্য্যাদা দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যগণকে কোনও উচ্চ পদও দেন নাই এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থের অপেক্ষা তাঁহাদের সম্মানও বাড়ান নাই। বৈদ্যগণ এখনও যেমন আছেন, তাঁহার রাজত্বকালেও এইরূপই ছিলেন। তবে "বৈদ্য-রাজত্বাবসানে বৈদ্যগণ শক্তিহীন হইলে" এ কথাটা কিরূপে সঙ্গত হয়?

যে বৈদ্যগণের হস্তে সর্ব্বসাধারণের জীবনরক্ষার ভার ন্যস্ত, তাঁহাদের প্রতি কাহারও বিদ্বেষের কোনও হেতুই ত অনুমিত হয় না।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা তাৎকালিক অসৎ ব্রাহ্মণেরাই করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন সৎ বৈদ্য মহোদয়েরা কি সদ্ব্যাখ্যাই করিয়াছেন?

অসৎ ব্রাহ্মণদিগের কুৎসা রটনাতেই বৈদ্যেরা এতকাল ব্রাহ্মণবর্ণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা কি নিতান্ত ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, ও

নিকৃষ্টতার পরিচায়ক নহে? বৈশ্যপ্রভৃতি নানা জাতির দুরবস্থা হইয়াছেও ইদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ ত ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করেন নাই।

অসৎ ব্রাহ্মণগণের মূর্খতাপূর্ণ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি এখন যেরূপ বৈদ্যদিগের নিকট ধরা পড়িতেছে, সেইরূপ বৈদ্যগণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ—মহামহোপাধ্যায়ত্বপরিচায়ক—ধর্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা এখন সাধারণের চক্ষে—তাঁহাদের নিজের চক্ষেও—ধরা পড়িতেছে না কি?

যে সকল শাস্ত্রীয় বচন স্বমতের প্রতিকূল, সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলা আজকালকার অনেক প্রবন্ধলেখকের একটা রোগ দাঁড়াইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, কোনও কোনও মহামনীষী লেখক শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব বা অবতারত্ব খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার কোনও লীলাতেই যে ঐশ্বর্য্যভাবের বিকাশ নাই—ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য, পূর্ণমাত্রায় ঐশ্বর্য্যভাবে পরিপূর্ণ বাল্যলীলাগুলি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য লীলায় পুরাণাদির যে যে শ্লোকে ঐশ্বর্য্যভাব বর্ণিত আছে, সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। পরন্তু সেই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত, কি লেখকেরাই প্রক্ষিপ্ত, তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। প্রবোধনীলেখক যে সকল বচন তুলিয়া বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, সেগুলির তল্লিখিত অর্থই যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে বিরুদ্ধবাদীরা সে গুলিকেও ত প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারিতেন।

১৬। বৈঃ প্রঃ—এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ব্রাহ্মণের "দাশ" উপাধি অতি প্রাচীন—অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেইজন্যই আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাণিনি মুনি "দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে" এই সূত্র করিয়া—"দাশন্তি তস্মৈ ইতি দাশঃ" এই ব্যুৎপত্তিতে, যে ব্রাহ্মণ দান করিবার উপযুক্ত পাত্র তাঁহাকেই 'দাশ' এই উচ্চ পদবীর অধিকারী বলিয়াছেন। ক্রমদীশ্বরও তাঁহার সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে ঐরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া "দাশো বিপ্রঃ" বলিয়াছেন।

বক্তব্য—ব্রাহ্মণের 'দাশ' উপাধি আমরা জানি না, কাহারও মুখে কখনও শুনিও নাই।

তিন হাজার বৎসরমাত্র যদি কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে ব্রাহ্মণের দাশ উপাধি চলিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণেরই দাশ উপাধি ছিল না বলিতে হইবে। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে দাশেরা অবশ্যই অন্যজাতীয় (অর্থাৎ পশ্চাদ্বক্তব্য শাস্ত্রোক্তজাতীয়) ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এখন পাণিনিমতে কেবল দাশোপাধিক বৈদ্যেরই ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ করিলে সেন, গুপ্ত, কর, ধর, রায় ইত্যাদি-উপাধিধারী বৈদ্যদিগের গতি কি? ঐ সকল শব্দের 'বিপ্র' অর্থ ত কোনও ব্যাকরণে ও অভিধানে নাই।

প্রাচীনকাল হইতে সকল বৈদ্যই 'দাস' উপাধিতে দন্ত্য স লিখিতেন, বৈদ্যকুলজীগ্রন্থসমূহেও দন্ত্য স আছে। পাণিনি ও ক্রমদীশ্বরের ব্যাকরণ দেখিয়া আজ-কালই সেই দন্ত্য সকার তালব্য শকারে পরিণত হইয়াছে—অমুক অমুক দাসের সন্তান এখন অমুক অমুক দাশ হইয়া কুল উজ্জ্বল করিতেছেন।

বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ, এমন কথা কোনও শাস্ত্রেই নাই, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। বৈদ্য যে দানের উপযুক্ত পাত্র, ইহাও কোনও শাস্ত্রকার বলেন নাই; বরং তাঁহাদের প্রতিগ্রহাধিকার নিষেধই করিয়াছেন (মনু, ১০।৭৫-৭৮)। পাণিনি মুনিও দানের উপযুক্ত পাত্র ব্রাহ্মণকে 'দাশ' এই উচ্চ পদবীর অধিকারী বলেন নাই।

বৈয়াকরণমাত্রেই জানেন—পাণিনি কেবলই সূত্রকার; বামন ও জয়াদিত্য তাঁহার সূত্রের বৃত্তিকার। "দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে" এই সূত্রের মধ্যেও 'বিপ্র' অর্থ নাই, এবং বৃত্তিকারও দাশ বলিতে 'বিপ্র' বলেন নাই; তিনি লিখিয়াছেন—"দাশন্তি তস্মৈ দাশঃ, গাং হন্তি তস্মৈ

গোঘ্নঃ অতিথিঃ।" তবে "পাণিনি মুনি ব্রাহ্মণকে 'দাশ' এই উচ্চ পদবীর অধিকারী বলিয়াছেন" এ কথা প্রবোধনীলেখকের মস্তিষ্কে কিরূপে প্রবেশ করিল? সংক্ষিপ্তসারে "পুংসি দশ্‌ কারকে চ" সূত্রের বৃত্তিতে আছে বটে "তালব্যান্ত দাশৃ দানে, দাশন্তাস্মৈ দাশো বিপ্রঃ।" কিন্তু ইহাতে দাশ ও গোঘ্ন শব্দ যথাক্রমে বিপ্র ও অতিথির সংজ্ঞা মনে করা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। তাহা হইলে অভিধানে তত্তৎপর্য্যায়ে ঐ দুইটি শব্দ ধৃত হইত।

উক্ত পাণিনিসূত্রের অর্থ—সম্প্রদান বাচ্যে দাশ ও গোঘ্ন শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। "ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্" (যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কোনও কার্য্য করা যায়, তাহারও সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়)। কর্তৃবাচ্যে নিপন্ন গোঘ্ন শব্দের অর্থ 'গোহত্যাকারী।' এই অর্থেই গোঘ্ন শব্দ অতি প্রসিদ্ধ। তজ্জন্যই এখানে পাণিনিসূত্রের বৃত্তিকার সম্প্রদানবাচ্যতা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য গোঘ্ন পদের বিশেষ্যরূপে অতিথি পদ বসাইয়াছেন; দাশ পদে সেরূপ সংশয়ের সম্ভাবনা না থাকায় উহার কোনও বিশেষ্যপদ বসান নাই। শাস্ত্রে আছে "ষডর্ঘ্যা ভবন্তি" ইত্যাদি—অর্থাৎ গুরু, পুরোহিত, রাজা, বর, স্নাতক ও শ্রোত্রিয় অতিথি গৃহে আসিলে তাঁহাদিগকে মধুপর্কাদি দ্বারা অর্চনা করিতে হয়। "নামাংসো মধুপর্কঃ" মাংস ব্যতিরেকে মধুপর্ক হয় না অর্থাৎ মধুপর্ক দিলেই তাহার সঙ্গে মাংসও দিতে হয়। এইজন্যই ভবদেবভট্ট কন্যাসম্প্রদানে লিখিয়াছেন—"সম্প্রদানশালায়া উত্তরতঃ স্ত্রীগবীং বন্ধা।" এইজন্যই বর যখন মধুপর্ক ভক্ষণ করে, তখন নাপিত বলে—"গৌগৌর্গৌঃ" (আলভ্যতামিতি শেষঃ) গাভীটাকে এখন বধ করি? এবং এইজন্যই "উত্তর-চরিত" নাটকে বর্ণিত হইয়াছে—বশিষ্ঠ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে অতিথি হইলে, বাল্মীকি তাঁহাকে মধুপর্ক দিয়া তৎসঙ্গে কল্যাণী নামে একটা বৎসতরীও

দিয়াছিলেন। বাল্মীকির শিষ্যগণের মধ্যে এক বালক উহার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া অপরকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল—"নামাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহু মন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায় অভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্ব্বপন্তি গৃহমেধিনঃ।" (মাংস ব্যতিরেকে মধুপর্ক হয় না—এই শ্রুতিবাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গৃহস্থেরা বেদজ্ঞ অতিথিকে বৎসতরী, কিম্বা বৃষ অথবা ছাগ দিয়া থাকেন)।

অতএব গোঘ্ন বলিতে (যাহাকে উদ্দেশ করিয়া গোবধ করা যায়—এই অর্থে) গুরু পুরোহিত প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ছয় জনকেই বুঝায়; তন্মধ্যে অতিথি অর্থটাই ধৃত হইয়াছে। সেইরূপ দাশ বলিতে (যাহাকে দান করা যায়—এই অর্থে) বিপ্র, ভিক্ষুক,দরিদ্র প্রভৃতি সমস্ত দানপাত্রকে বুঝাইলেও তন্মধ্যে 'বিপ্র' এই একটা অর্থই সংক্ষিপ্তসারে ধৃত হইয়াছে। পাণিনির বৃত্তিতে কোনওটাই ধৃত হয় নাই; যে যেটা হউক একটা বুঝিয়া লইতে পারেন—দাশো বিপ্রঃ, দাশো রাজা, দাশো বরঃ ইত্যাদি।

পাণিনির "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" সূত্রের উদাহরণ—"স্নাতি অনেন স্নানীয়ং চূর্ণম্, দীয়তে অস্মৈ দানীয়ো বিপ্রঃ।" তাই বলিয়া কি স্নানীয় শব্দ চূর্ণের সংজ্ঞা, এবং দানীয় শব্দ বিপ্রের সংজ্ঞা? তাহা নহে; তাহা হইলে অভিধানে থাকিত। স্না ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে অনীয় প্রত্যয় করিলে চূর্ণ, তৈল, জল প্রভৃতি স্নানসাধন যাহা কিছু আছে, সকলকেই 'স্নানীয়' বলা যায়; এবং দা ধাতুর উত্তর সম্প্রদান বাচ্যে অনীয় করিলে বিপ্র, ভিক্ষুক প্রভৃতি দানের পাত্রমাত্রকেই 'দানীয়' বলে; তাহাদের এক-একটামাত্র দেখান হইয়াছে। সংক্ষিপ্তসারে "স্নানীয়ং তৈলম্" আছে, এবং সকলেই পূজাকালে "ইদং স্নানীয়জলং" বলিয়া থাকেন।

অতএব উক্ত সূত্র দ্বারা দাশধাতু-নিষ্পন্ন 'দাশ' শব্দ বিশেষণ। সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য 'দাশ' শব্দ দন্‌শধাতু-নিষ্পন্ন; ব্যাকরণ, অভিধান ও স্মৃতিশাস্ত্র-সম্মত তাহার একমাত্র অর্থ—কৈবর্ত্ত বা ধীবর। যথা—

"দংশেশ্চ।—দাশো ধীবরঃ।" (পাণিনি, উণাদি)

"মদ্গুশো নপুংক চ কৈবর্ত্তে পুং।—দাশঃ।" (সংক্ষিপ্তসার)

"কৈবর্ত্তে দাশধীবরৌ।" (অমর)

"দাশো বধে, ধীবর এব দাশঃ।" (উজ্জ্বলদত্ত)

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।

কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥" (মনু ১০।৩৪)

(শূদ্রাতে ব্রাহ্মণোৎপন্ন) নিষাদ হইতে (বৈশ্যাতে শূদ্রোৎপন্না আয়োগবীর গর্ভে) মার্গব জাতির উৎপত্তি। তাহার অপর নাম দাশ, নৌকা তাহার জীবিকা, আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা তাহাকে কৈবর্ত্ত বলে।

"নিষাদো মদ্গুরং সূতে দাশং নাবোপজীবিনম্।"(মহা,অনু, ৪৮।২১)

নিষাদ মদ্গুর জাতির জন্মদাতা, তাহার অপর নাম দাশ, নৌকা তাহার উপজীবিকা।

এতাবতা সংজ্ঞাবাচক তালব্য-শকারযুক্ত দাশ শব্দের 'কৈবর্ত্ত' ভিন্ন আর কোনও অর্থই নাই; কিন্তু দন্ত্যসকারযুক্ত দাস শব্দের 'জ্ঞাতাত্মা' (উপনিষদুক্ত বা আয়ুর্ব্বেদোক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান যাহার জন্মিয়াছে) এই একটা অর্থও আছে; যথা—"দাসো ভৃত্যে চ শূদ্রে চ জ্ঞাতাত্মনি চ ধীবরে" (মেদিনী)। অতএব বৈদ্যগণের দাসত্ব অপেক্ষা দাশত্ব স্বীকারে কি গৌরব বাড়িয়াছে, তাহা বুঝা গেল না।

১৭। বৈদ্যঃ প্রঃ—বহু তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতিতে সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা প্রভৃতির উল্লেখ বর্ত্তমান। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন— "শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ" ইত্যাদি।

বক্তব্য—বৈদ্য যখন ব্রাহ্মণই নহেন, তখন ব্রাহ্মণোচিত 'শর্ম্মা' উপপদ ব্যবহারে তাঁহাদের অধিকার কোথায়? তদ্ভিন্ন, শাস্ত্রে ও ব্যবহারেও দেখা যায়, শর্ম্মা বা দেবশর্ম্মা বলিলে কৌলিক উপাধি আর বলিতে

হয় না—বন্দ্যোপাধ্যায়শর্ম্মা, মুখোপাধ্যায় দেবশর্ম্মা ইত্যাদি কেহই বলেন না। বৈদ্যেরা তবে কোন্ প্রমাণে সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা ইত্যাদি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন? অনেক আধুনিক তাম্রশাসন ও শিলালিপি সুকৌশলে প্রাচীন বলিয়া পরিচিত হইবার কথাও আমরা শুনিয়াছি। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতে যদি ঐরূপই লিখিত হইত, তবে এতকাল বৈদ্যেরা শর্ম্মান্ত উপাধি ব্যবহার করেন নাই কেন? ঐরূপ অশাস্ত্রীয় সেনশর্ম্মা ইত্যাদি নামে যাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের সে সকল কর্ম্ম অশাস্ত্রীয়—সুতরাং পণ্ড বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে স্ব স্ব নামের পর বৈশ্যধর্ম্মা অম্বষ্ঠের কৌলিক উপাধির পরিবর্ত্তে "গুপ্তভূতি" বা "দত্তভূতি" ও তাঁহাদের স্ত্রীলোকের "দেবী" বলা, এবং শূদ্রধর্ম্মা বৈদ্যের দাসান্ত পদ্ধতি (সেনদাস, গুপ্তদাস ইত্যাদি) ও তাঁহাদের স্ত্রীলোকের "দাসী" বলাই উচিত।

"বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইলে, ব্রাহ্মণের ন্যায় কৌলিক উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল শর্ম্মা বা দেবশর্ম্মা বলিতে পারিতেছেন না কেন? উহার সহিত কৌলিক উপাধি যোগ করিয়াই ত তাঁহারা আপনাদিগকে কল্পিত ব্রাহ্মণ—সুতরাং অব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত করিতেছেন।

১৮। বৈঃ প্রঃ—বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় গণনাথ, তাঁহার পিতৃদেব কর্ত্তৃক গর্ভাষ্টমে উপনীত ও উপদিষ্ট হইয়া সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে দ্বাদশ দিনে একলক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কিশোর বয়সেই অসামান্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

বক্তব্য—যিনি যতই তাড়াতাড়ি করুন, ১৫ মিনিটের কমে একশত গায়ত্রী জপ কেহই করিতে পারেন না। সুতরাং প্রত্যহ ২৯ ঘণ্টা জপ করিলে তবে ১২ দিনে এক লক্ষ গায়ত্রী জপ হয়। তদুপরি

মলমূত্রত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান, ত্রিসন্ধ্যা, এবং উপনয়নান্তে সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ংকালে সমিদাধান ও মধ্যাহ্নে ভিক্ষাচরণ শাস্ত্র-বিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ সকলেও ন্যূনপক্ষে ৩ ঘণ্টা লাগে। তাহাহইলে দিনরাত্রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টানাটানি করিয়াও ২৪ ঘণ্টাই কাটিয়া যায়। পরন্তু ভোজন করিয়া (এমন কি, একটু জলপান করিয়াও) জপাদি কার্য্য করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এতদবস্থায় গর্ভাষ্টমে অর্থাৎ ৭ বৎসর বয়সে—মুখে দাঁত না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেই—গণনাথ বাবু যে, অনাহারে, নিরম্বু উপবাসে, অনিদ্রায় অবিশ্রামে ১২ দিন ধরিয়া একলক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়াছিলেন, তাহাতে "শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যং"এর ন্যায় "গণেশং গণনাথসেনং" বলিলেও অনুরূপ রূপক হয় না। পরন্তু এ অপ্রাসঙ্গিক কথাটা লিখিবার অভিপ্রায় সুবুদ্ধি ভিন্ন অন্যের দুর্ব্বোধ। ঐরূপ লেখায় নিঃসংশয়ে ইহাও বুঝা যাইতেছে, প্রবোধনী-লেখক কখনও গায়ত্রীজপ করেন নাই এবং গায়ত্রী কাহাকে বলে তাহাও জানেন না। তাহা করিলে বা জানিলে এরূপ অসম্ভব কথা লিখিয়া সাধারণের হাস্যাস্পদ হইতেন না। এইজন্যই শাস্ত্রের উপদেশ—"অসম্ভব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।" এ বিষয়ে আমরা মহামহোপাধ্যায় গণনাথ বাবুকেই সাক্ষী মানিতেছি, তিনি বাস্তবিকই ঐরূপ করিয়াছিলেন কি না, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ করুন।

১৯। বৈঃ প্রঃ—আমরা ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—বাস্তবিক সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, কর, ধর, চন্দ্র, নন্দী প্রভৃতি প্রাচীন বা আধুনিক বৈদ্যসমাজে প্রচলিত উপাধিগুলিই ব্রাহ্মণ সাধারণের প্রকৃত জাতীয় প্রাচীন উপাধি। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং অন্যান্য অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণের উপাধি 'ধর'।

বক্তব্য—সেন, দাস, গুপ্ত, প্রভৃতি উপাধি যে, ব্রাহ্মণ সাধারণের অথবা কোনও ব্রাহ্মণের আছে, তাহা আমরা জানি না; বোধ হয় কেহই জানেন না। কোথাও কোনও ব্রাহ্মণের উহাদের কোনওটা থাকিলেই বা ইষ্টোপপত্তি কি? বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, বসু, মিত্র, গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ উপাধি ভিন্ন, অন্যান্য উপাধি দ্বারা জাতিনির্ণয় করা যায় না। যেহেতু "রায়" উপাধি ব্রাহ্মণ হইতে বাগ্দি পর্য্যন্ত নানা জাতিরই আছে; সেন—কায়স্থেরও আছে; দাস—নাপিত, কৈবর্ত্ত হইতে চর্ম্মকার পর্য্যন্ত অনেকেরই আছে (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থেরও আছে); দত্ত—কায়স্থ, কাঁসারি, গন্ধবণিক্ ও সুবর্ণবনিকেরও আছে; কর—কায়স্থেরও আছে; ধর—সুবর্ণবণিকেরও আছে; নন্দী—কায়স্থ, তিলী ও তাঁতীরও আছে। এ অবস্থায় ঐ সকল উপাধি দ্বারা বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে, ইতরজাতি বলিয়া বুঝা হইবে না, ইহার প্রমাণ কি?

২০। **বৈঃ প্রঃ**—একদিন বঙ্গে বৈদ্যের আসন ব্রাহ্মণের উচ্চে, পরে নানা কারণে ব্রাহ্মণের মধ্যেই কিঞ্চিন্মাত্র নিম্নে, এবং অপর সকল জাতিরই উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, বৈদ্যগণ তাঁহাদের সামাজিক অবনতি তত্টা বুঝিতে পারেন নাই।

ইহাও সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, বৈদ্যগণের "সেনশর্ম্মা" "দাশ-শর্ম্মা" প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাধিই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে—গুপ্তান্ত উপাধি ভবিষ্যতে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবে না।

বক্তব্য—প্রবোধনীলেখক বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব—ব্রাহ্মণাভিন্নত্ব—প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াও চিরন্তন-সংস্কারবশে পুনঃপুনঃ ব্রাহ্মণ-ভিন্নত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখানেও "বৈদ্যের আসন ব্রাহ্মণের উচ্চে, ব্রাহ্মণের মধ্যেই" এইরূপ লেখায় তাঁহার মতেও বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্য পরিস্ফুট হইতেছে না কি?

বৈদ্যের আসন কোন্ দিন ব্রাহ্মণের উচ্চে ছিল, এবং কোন্ দিনই বা ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র নিম্নে ছিল, তাহা ত কেহই জানে না, কোনও ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। তবে যদি কোনও দিন কোনও "মেলা"য় গিয়া বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত "নাগর-দোলা"য় দুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কথাটা সত্য হইতে পারে।

অল্পদিন হইল, বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড়—এই লইয়া যখন আন্দোলন চলিয়াছিল, তখনও বৈদ্যেরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্টই জানিতেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে কখনই স্পর্দ্ধা করেন নাই। এখন যে হঠাৎ ব্রাহ্মণ হইতেছেন, ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, "অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী" বলিতে সাহসী হইয়াছেন, এ আস্পর্দ্ধার, এ অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতার সর্ব্বপ্রধান কারণ—অধ্যাপক মহাশয়গণের মূকতা, সামাজিক মহোদয়গণের উদাসীনতা, ব্রাহ্মণগণের উপেক্ষা, হিন্দু সংবাদপত্রসম্পাদক মহাশয়দিগের নীরবতা এবং কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানরহিত অধ্যাপকের প্রশ্রয়প্রদান।

সেনগুপ্ত ইত্যাদিরূপ উপাধি বলিবার কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই, এবং ব্যবহারও নাই—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ঐ সকল "বিশিষ্ট উপাধিই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে" এ কথাটা সত্যই বলা হইয়াছে; যেহেতু ঐরূপ কিম্ভূত-কিমাকার উপাধি দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, বৈদ্যেরা "কুঁইফোড়" ব্রাহ্মণ।

২১। বৈদ্যঃ প্রঃ—পল্লীগ্রামে ধর্ম্মসঙ্গত সদাচার পালনে যদি কাহারও কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির নিকট সত্বরে সংবাদ জানাইলে তাহার যথোচিত প্রতিকার (পুরোহিত প্রেরণাদি) করা যাইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—অর্থাৎ "করিলে কল্যাণ কার্য্য না হবে

দুর্গতি।" এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। ভগবদ্বাক্য কখনই বিফল হইবে না।

বক্তব্য—কাহারও পুরোহিতের অপ্রাপ্তি ঘটিলে, বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি অবশ্য বৈদ্য পুরোহিতই পাঠাইয়া তাহার কল্যাণ সাধন ও দুর্গতি নিবারণ করিবেন (এইজন্যই এখন অনেক বৈদ্য কোমর বাঁধিয়া দশকর্ম্ম শিখিতে লাগিয়াছেন)। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর কোনও দ্বিজাতিরই যাজন-কার্য্যে অধিকার নাই। যথা—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥
ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥
বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥"
(মনু ১০।৭৫—৭৮)

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তন্মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। বৈশ্যের পক্ষেও সেইরূপ।

অতএব বৈশ্য হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত সাক্ষাৎ বৈশ্যেরই যাজনকার্য্য যখন নিষিদ্ধ, তখন ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত বৈশ্যধর্ম্মা (অর্থাৎ ভাক্ত বৈশ্য) অম্বষ্ঠের এবং শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত শূদ্রধর্ম্মা (অর্থাৎ প্রতিলোমজ অধম শূদ্র) বৈদ্যের ত কথাই নাই। অতীতকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কোনও অম্বষ্ঠ ও কোনও বৈদ্যকে যাজনকার্য্য করিতে কেহ কখনও দেখেও না এবং শোনেও না। অতএব তাঁহাদের দ্বারা কোনও জাতিরই—এমন কি, বৈদ্যদিগেরও পৌরোহিত্য করান শাস্ত্রসম্মত নহে (মুচি ও চাঁড়ালেরও ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছেন, কেবল তাঁর ও

যূগীর ব্রাহ্মণপুরোহিত যেলে না বলিয়া তাহাদের স্বজাতীয়েরাই পৌরো-হিত্য করে। বৈদ্য ত সে শ্রেণীর নহেন যে, নিজেরাই নিজেদের পৌরো-হিত্য করিবেন)। বৈদ্যদিগের ১০ দিন অশৌচ পালন, সেনশর্ম্মা ইত্যাদিরূপ নামোচ্চারণ, পকার দ্বারা শ্রাদ্ধকরণ ইত্যাদি অভিনব প্রব-র্ত্তিত আচরণও শাস্ত্রবিধির বহির্ভূত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ যেমন "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" বলিয়াছেন, তেমনই আবার ইহাও বলিয়াছেন—"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।"—

শাস্ত্রবিধি ছাড়িয়া যে করে স্বেচ্ছাচার। কোনো কার্য্য কভু নাহি সিদ্ধ হয় তার। ইহকালে সুখ নাহি পায় কদাচন। পরকালে সদ্গতি না লভে সেইজন।

অতএব প্রবোধনীলেখকের কথাতেই আমরাও বলি—

"এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। ভগবদ্বাক্য কখনই বিফল হইবে না।"

পরিশেষে বক্তব্য—বৈদ্যপ্রবোধনীলেখক কোন্ বচনের কিরূপ অর্থ করিয়া বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পাঠক মহোদয়-গণ এবং বৈদ্য মহোদয়গণও তাহা দেখিলেন ও বুঝিলেন ত?

"বৈদ্যপ্রবোধনী" নামের অর্থ আমরা প্রথমে বুঝিয়াছিলাম—এই পুস্তিকা বৈদ্যগণকে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব প্রবোধন করিতেছে। এখন বুঝিতেছি—কেবল তাহাই নহে; এই পুস্তিকা-লেখক বৈদ্যকে শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, ব্যাকরণ, অভিধান, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়াও সাধারণকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বোক্ত সার্ব্বপ্রবরেরা ভূমিবিত শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী ও যুক্তি সমূহ অখণ্ডনীয় বলিয়া কিসে হৃদ্বোধ করিয়াছেন, বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে কি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, কিসে তাঁহাদিগকে "আমাদেরই একজন" বলি

নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছেন এবং কোন্ প্রমাণে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের "ভগিনীদের বিবাহ কার্য্যাদি করিয়াছি" লিখিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব। প্রবোধনী-লেখক শাস্ত্রীয় প্রমাণেই "বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী" লিখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী অখণ্ডনীয় বলিয়া হৃদ্বোধ করিলে নিজেকেই যে অব্রাহ্মণ হইতে হয়, পত্র লিখিবার সময় "বঙ্গদেশের অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তশিরোমণি" স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এ কথাটা হৃদ্বোধ করেন নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। বৈদ্যদিগের পুরোহিত না মিলিলে, যে "পণ্ডিতবর" আনন্দের সহিত তাঁহাদের পৌরোহিত্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তিনি এই একটা মহালাভজনক "একচেটিয়া" ব্যবসায়ের সুযোগ বুঝিয়া—

"হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।
অজা সিংহপ্রসাদেন বনে চরতি নির্ভয়ম্॥"

—এই নীতিটাকেই অবশ্য ইহামুত্র শ্রেয়স্করী স্থির করিয়াছেন।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উদারতায় বিদ্যামন্দিরসমূহ আপামর সাধারণের পক্ষেই অবারিতদ্বার হওয়ায়, পাশ্চাত্য শিক্ষার মহিমায় কেহ আর নিকৃষ্ট হইয়া থাকিতে চাহে না। অনেকেই ত বৈদ্যদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন; যাঁহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইয়াছেন (সম্প্রতি বাগ্দিরাও ব্যগ্রক্ষত্রিয় হইয়া উঠিয়াছে), আরও চক্ষু ফুটিলে তাঁহারাও যে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইয়া দাঁড়াইবেন, এমন আশাও করা যাইতেছে। সুতরাং অতঃপর প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ কাণে কড়ি না ঝুলাইলে উঁহাদের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য বুঝা যাইবে না।

(৫ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার দ্রষ্টব্য)

ইতি জাতিতত্ত্বে বৈদ্যজাতিতত্ত্বনির্ণয় নামে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যোগী (যুগী)

যাঁহারা যোগচর্য্যা করেন, তাঁহারা যোগী—এ কথা শাস্ত্রেও আছে, জানেনও সকলে। "যোগী" বলিয়া যে কোনও জাতি আছে, তাহা আমরা কস্মিন্ কালেও জানিতাম না, কোনও প্রাচীন লোকের মুখেও শুনি নাই, কোনও শাস্ত্রেও দেখি নাই। "যুগী" জাতি শুনিয়াছি এবং চক্ষেও দেখিয়াছি।

লোকে "যুগী জোলা" বলিয়া থাকে। উভয়েরই বৃত্তি—সুত-বস্ত্র-বয়ন এবং উভয়েই অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া হিন্দুসমাজে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। প্রভেদ কেবল—যুগী হিন্দু এবং জোলা মুসলমান। উচ্চশ্রেণীর মুসলমান-দিগের সহিত জোলাদিগের আহার-ব্যবহার নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে যুগীরাও সেইরূপ। তাহারা স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জনে অসমর্থ হইয়া, "যোগ-পাটা" ধারণ করিয়া সময়ে সময়ে ভিক্ষাও করিত বলিয়া "গেঁয়ো যুগী ভিখ্ পায় না" বলিয়া একটা প্রবাদও আছে।

যুগীদিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা এতকাল স্বতঃ পরতঃ যুগী বলিয়া পরিচিত হইয়াও, এক্ষণে একটা দল বাঁধিয়া যুগীকে "যোগী" করিয়া, আপনাদিগের ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন এবং উপবীতধারণও করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা তৎসম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমার অভিমত জানিবার জন্য যে কয়েকখানি পুস্তক পাঠাইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার কর্ত্তৃক সংগৃহীত "ব্রাহ্মণ্য যোগিবংশে" অনেক প্রমাণ এবং বহু মনীষীর মন্তব্য সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তাহাতে আছে—

১। কলিকাতা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল হইতে ১২৯৬ সালের ৭ই পৌষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"যোগী জাতি রুদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ ও পূর্ব্বে ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ ও যাজনাদি কার্য্য করিতেন। বল্লেশ্বর বল্লালের ক্রোধে পতিত হইয়া ঐ সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" ইতি

বক্তব্য—যাহার এই মন্তব্য, আমিই সেই ব্যক্তি। আমি কিছুকাল উক্ত স্কুলে অধ্যাপনা করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু ১২৯৬ সালের পৌষ মাসে ঐ স্কুলে ছিলাম কি না, তাহা স্মরণ নাই। তবে ইহা অভ্রান্ত-রূপে স্মরণ আছে যে, ঐরূপ পত্র আমি কাহাকেও কখনও লিখি নাই। যেহেতু রুদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ আমি ত আমি—আমার চৌদ্দপুরুষেও—কখনও শোনেন নাই। তদ্ভিন্ন, ঐরূপ ভাবাও আমার হাত দিয়া কখনও বাহির হয় নাই।

আরও কয়েকজন পণ্ডিতের ঐরূপ মন্তব্য আছে, সেগুলিও ঐরূপ কি না, জানি না।

২। কলিকাতা সিটী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক এবং রংপুর জেলার তাজহাটার মহারাজের ব্রহ্মোত্তরভোগী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাম-গোপাল দেবশর্ম্মা স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—...গীতায় লিখিত "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।" (অর্থাৎ যোগভ্রষ্টেরা পবিত্র ধনীর কুলে অথবা জ্ঞানী যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কারণ ইহলোকে এরূপ বংশে জন্মলাভ করাও সুদুর্লভ। এই শ্লোকের দ্বারাও ইহাদের প্রাচীনত্ব ঘোষণা প্রয়োজন করিতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যদি যোগিদিগের বংশ প্রয়োজনবহির্ভূত হইত, তাহা হইলে উল্লিখিত শ্লোকের কোন সার্থকতা থাকিত না।)

বক্তব্য—গীতার ঐ শ্লোকটি যে যোগী অর্থাৎ যুগী জাতির প্রাচী-

নব ঘোষণা করিতেছে, যুগীবংশে জন্মগ্রহণ করা যে মূল উত্তম, যোগ-জ্ঞদিগের জন্মগ্রহণের জন্যই যে যুগী জাতির সৃষ্টি প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, এবং ঐ শ্লোকে যোগীর অর্থ যুগী না বলিলে যে উহার সার্থকতাই থাকে না—ইহা পত্রলেখক স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এবং যাঁহারা সাধারণের সমক্ষে শ্রাঘার সহিত ঐ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসংশয়ে বুঝিলেও, অন্য কেহ বুঝেন নাই ও বুঝিবেনও না; বরং লেখক ও প্রকাশককে সকলেই উপহাস করিতেছেন ও করিবেন। আজকাল আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্রায় গীতার চর্চা করিয়া থাকেন; সুতরাং উহার প্রকৃত অর্থ কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন মনে করি না।

৩। (ক) আগমসংহিতায় লিখিত আছে যে, ঈশ্বর হইতে যে যোগীর উৎপত্তি হয়, তিনিই একাদশ রুদ্র বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পুত্র বিন্দুনাথ, এই বিন্দুনাথ মহাযোগী ছিলেন। বিন্দুনাথের ঔরসে রুদ্রকুলপ্রকাশক আদিনাথের প্রকাশ হয়। ক্রমে এই বংশে সিদ্ধ গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ ও সত্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) মহাবিরাটতন্ত্রে—মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে বরাননে! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, অবধৌত সাক্ষাৎ আমার সদৃশ। সেই অবধৌতের ঔরসে যোগীবংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য যোগীবংশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।'

(গ) তোমপ্রবন্ধে—অবধূত হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাথবংশের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণের ন্যায় দশরাত্রি ইহার অশৌচ ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

(ঘ) বল্লালচরিতে—মহান্ রুদ্রের ঔরসে সূর্য্যবতীর গর্ভে বিন্দু-নাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের (মহান্ ও সূর্য্যবতীর) এবং সেই যোগনাথ (বিন্দুনাথ) হইতে নাথবংশ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে।

(ঙ) শাতাতপসংহিতায়—অবধৌত সাক্ষাৎ শিবের সদৃশ। সেই

অবধৌতের ঔরসে সমুৎপন্ন বলিয়াই যোগী নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহারা শিবগোত্র হইয়াছে। তাহাদিগের নামের শেষে নাথ শব্দ প্রযুক্ত হয়। ইহারা বিপ্রাণীর গর্ভে সঞ্জাত, এই হেতু জন্মমরণাদিতে দশরাত্র অশৌচ গ্রহণ করে।

(চ) পরাশরসংহিতায়—ব্রাহ্মণ্যামবধূতাচ্চ নাথঃ সম্ভূত এব হি।

বক্তব্য—শাতাতপ ও পরাশরের সংহিতায় ঐরূপ কথা নাই, এবং থাকিতেও পারে না। পূর্ব্বোক্ত গীতাশ্লোকের অর্থের ন্যায় কোনও স্মৃতিতীর্থ ঐ কথা বলিয়া তাঁহাদিগের ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। আগমসংহিতা ও মহাবিরাটতন্ত্রের নামও ত আমরা শুনি নাই। ভোজ-প্রবন্ধ ও বল্লালচরিত অতি আধুনিক গ্রন্থ। তাহাদের উক্তি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তদুপরি ঐ সকল উক্তির পরস্পর সামঞ্জস্যও নাই। পরন্তু ঐ সকল প্রমাণে নাথবংশেরই যোগিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে; বিশ্বাস, মজুমদার, রায়, সরকার প্রভৃতি বংশ কিরূপে যোগী হইল? দণ্ডী, সন্ন্যাসী, যোগী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি এক-এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগের নামে আশ্রম, আনন্দ, নাথ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন—শিবাশ্রম, জ্ঞানানন্দ ইত্যাদি। মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতিও সেইরূপ। নাথ তাঁহাদের নামেরই অংশ; উপাধি নহে। গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যে, জাতিতে যোগী বা যুগী ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

৪। পুরাণের মতে যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ঈশ্বরের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, যোগী জাতিও সেইরূপ তাঁহার ললাট হইতে উৎপন্ন; সুতরাং তাঁহারা প্রথম বর্ণের অন্তর্গত যোগধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ।

বক্তব্য—শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১২।৪—১২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য হইতে নীললোহিত উৎপন্ন হইলেন। জাতমাত্র রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রুদ্র হইয়াছিল। ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টিকরণার্থ একাদশ স্থানে অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহার একাদশ

সৃষ্টি ও একাদশ নামও হইয়াছিল ; যথা—মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতাঃ, ভব, কাল, বামদেব, ধৃতব্রত। ব্রহ্মারই মানসোৎপন্ন তৎপত্নীগণের নাম—ধী, বৃত্তি, উশনা, উমা, নিযুৎ, সর্পিঃ, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা। তদুৎপন্ন পুত্রগণ জগৎ গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা ভীত হইয়া রুদ্রগণকে ঐরূপ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিয়া তপস্যা করিতে আদেশ করায় তাঁহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। ঐ একাদশ রুদ্রের মধ্যে মহান্ রুদ্রের পত্নীর নাম যে সূর্য্যবতী ছিল, তাঁহাদের পুত্রের নাম যে যোগনাথ বা বিম্বনাথ, এবং সেই বিম্বনাথ হইতেই যে "যোগী" বংশের উৎপত্তি—এমন কথা অর্ব্বাচীন "বল্লালচরিত" ভিন্ন আর কোনও গ্রন্থে (অর্থাৎ পুরাণাদি কোনও শাস্ত্রে) নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধ, ১২ অধ্যায়ে আছে—ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, নাভি হইতে পুলহ, কর্ণ হইতে পুলস্ত্য ইত্যাদিরূপে বহু অঙ্গ হইতে বহু ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তদ্বৎ নামে কোনও বর্ণ বা জাতির উল্লেখ নাই। তবে ললাটোৎপন্ন রুদ্রবিশেষের বংশ একটা জাতি কিরূপে হইল? এবং ললাটোৎপন্ন যোগী মুখোৎপন্ন ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গতই বা কিরূপে হইতে পারে

৩। যোগী জাতি সঙ্করবর্ণ নহে। ইহা অতি প্রাচীন জাতি। "ব্রাহ্মণীষু চ জাতানামশৌচং ব্রহ্মবদ্ভবেৎ। যোগিনাঞ্চ গৃহস্থানামশৌচং দশরাত্রকম্" বল্লালচরিতের এই বচনে 'যোগিনাং চ' এই 'চ' শব্দ দ্বারা সঙ্করবর্ণ হইতে যোগীদের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বক্তব্য—শাস্ত্রে যোগী বা যুগী বলিয়া কোনও জাতির উল্লেখ নাই। তাঁহাদেরই উদ্ধৃত বিরাটগুর্ব্বাদির মতে অবধূতের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন হওয়ায় যোগী জাতির বর্ণসঙ্করত্বই সিদ্ধ হইতেছে। কোন প্রবন্ধ ও বল্লালচরিত ঋষিপ্রণীত নহে যে, তাহার ব্যবস্থানুসারে অশৌচা

অশৌচগ্রহণ করা যাইতে পারে। যোগী জাতি অতিপ্রাচীন ও মূলবর্ণ হইলে মন্বাদিশাস্ত্রে নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ থাকিত। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হয় নাই। বহুকাল পরে ক্রমশঃ হইয়াছে এখনও কত নূতন নূতন হইতেছে। মনুর বা বেদব্যাসের সময় যুগী জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। মনু কতক গুলি সঙ্কর জাতির উল্লেখ করিয়া শেষে বলিয়াছেন—

"যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে॥
প্রতিকূলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ।
হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু॥"

(১০।৩০—৩১)

শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণীতে চণ্ডালরূপ বাহ্য (অর্থাৎ গ্রামের বহির্ভাগে বাস করিবার যোগ্য) জাতি উৎপাদন করে, সেইরূপ ঐ বাহ্য জাতি চাতুর্ব্বর্ণ্য-স্ত্রীতে আত্মাপেক্ষা বাহ্যতর জাতি উৎপাদন করিয়া থাকে। বাহ্য জাতিরা আবার প্রতিলোমজ পঞ্চদশপ্রকার এবং হীন জাতিরাও প্রতি-লোমজ পঞ্চদশপ্রকার জাতি উৎপাদন করে।

বেদব্যাসের সময়ে সঙ্করজাতি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি মহাভারতে ১৪৪ প্রকার সঙ্কর জাতির উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন—

"চতুর্ণামেব বর্ণানাং ধর্ম্মো নান্যস্য বিদ্যতে।
বর্ণানাং ধর্ম্মহীনেষু সংখ্যা নাস্তীহ কস্যচিৎ॥"

(অনু, ৪৮।৩০)

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণেরই ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। সঙ্কর জাতির ধর্ম্মনিয়মও নাই এবং তাহাদের সংখ্যারও ইয়ত্তা নাই।

এইজন্যই চণ্ডালাদি বাহ্য ও বাহ্যেতর জাতির মধ্যে পুরুষপরম্পরায় ১০ দিন অশৌচপালন, বিধবা ও সধবার পত্যন্তর গ্রহণ ইত্যাদি অশা-

ন্যায় আচরণ দেখা যায়। যুগীরও সেইরূপ। কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে কুর্মি, কাহার, চামার প্রভৃতি জাতিরা দশম দিনেই অশৌচান্ত ও শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।
সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ।" (১।৩১, ৮৭)

অর্থাৎ ব্রহ্মা স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিয়া, সমগ্র সৃষ্টির রক্ষার্থ তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন।

ইহা দ্বারাও জানা যাইতেছে, ঈশ্বরের ললাট হইতে যাহার উৎপত্তি, সে কোনও বর্ণ বা জাতি নহে, এবং তাহার ধর্ম্মকর্ম্মও শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই (সুতরাং তাহারা স্বেচ্ছাচারেই ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারে)।

৬। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব-সঙ্কলিত "বিশ্বকোষ" হইতে উদ্ধৃত—

"যোগী—বঙ্গবাসী হিন্দু জাতির শ্রেণীবিশেষ।...প্রাচীনতম পুরাণ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে এই জাতির উৎপত্তিবিষয়ক কোন উল্লেখ না থাকিলেও বর্ত্তমান শিক্ষিত যোগী সম্প্রদায়...যোগপরায়ণ একাদশ রুদ্র হইতে মহাযোগী ও বিশ্বনাথাদির জন্ম স্বীকার করিয়া নাথবংশীয় যোগীগণ হইতেই বাঙ্গালায় যোগীদিগের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।"

ব্যাখ্যা—নগেন্দ্র বাবু বহুশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বিশ্বকোষে যখন ঐরূপ লিখিয়াছেন, এবং "যোগিকুল"-সমর্থিত যখন উহাই

প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন যোগী অতি প্রাচীন জাতি কিরূপে প্রতিপন্ন হইল ?

৭। সুপ্রসিদ্ধ "সঞ্জীবনী" পত্রিকা (১৩০৩ সাল) হইতে উদ্ধৃত—

যোগী মাত্রেরই "শিব" বা অনাদি গোত্র এবং যোগিনী অর্থাৎ যোগীদিগের স্ত্রীমাত্রেরই "কাশ্যপ" গোত্র। শিবগোত্রের প্রবর ৫টী, যথা—শিব, শম্ভু, সরজ, ভূধর এবং আপ্লুবৎ ; আর কাশ্যপ গোত্রের প্রবর ৩টী, যথা—কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।

বক্তব্য—সঞ্জীবনী কোন্ শাস্ত্রে শিব গোত্র ও তাহার ঐরূপ প্রবর পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বৌধায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণের সূত্রগ্রন্থে এবং ধর্মপ্রদীপাদি প্রাচীন নিবন্ধ-গ্রন্থে গোত্র-প্রবরনির্ণয়ে শিব গোত্রের, সুতরাং তাহার প্রবরেরও কোনও উল্লেখ নাই। প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, যে-কোনও বংশের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে ; সুতরাং শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা কাহারও গোত্র নহেন। বাৎস্য ও সাবর্ণ গোত্রের পঞ্চ প্রবরের মধ্যে "আপ্লবান" ঋষির নাম আছে (মৎপ্রণীত আহ্নিককৃত্যে যজ্ঞোপবীত-ধারণের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। তাহাকে বিকৃত করিয়া ইদানীং অনেকে "আপ্লুবৎ" বলিয়া থাকেন ; সঞ্জীবনী আবার তাহাকেও বিকৃত করিয়া "আপ্লুবৎ" লিখিয়াছেন। কাশ্যপগোত্রের প্রবর অপ্সার নহে ; আবৎসার।

কবিবর ভারতচন্দ্র গৌরীসম্প্রদানকালে ব্রহ্মার মুখ দিয়া মহাদেবের পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, গোত্র ও প্রবর বলাইয়াছেন—

> "স্মরহর বর, বরপিতা পুরহর।
> পিতামহ সংহর, প্রপিতামহ হর॥
> শিব গোত্র, শম্ভু শর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
> শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর॥"

সঞ্জীবনীর উক্তিও সেইরূপ হইতেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও জাতির গোত্র থাকা সম্ভব না হইলেও শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণের গোত্রই গোত্র জানিতে হইবে। অন্যান্য সকল জাতির সেইরূপ গোত্রই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু হাড়ি (ডোম) ও যুগী জাতি হিন্দু হইলেও, পাতিত্যের ভয়ে কোনও ব্রাহ্মণ কস্মিন্ কালেও তাহাদের পৌরোহিত্য করেন না। অগত্যা তাহাদের স্বজাতীয়েরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে (তাঁহারাও লিখিয়াছেন—"বিবাহকালে তাঁহাদের স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তি পৌরোহিত্যে ব্রতী হয়"), এইজন্যই একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—

"হাড়ি যুগী বামন। তিন জাতি আপন আপন।" অর্থাৎ হাড়ির পুরোহিত হাড়ি, যুগীর পুরোহিত যুগী, এবং ব্রাহ্মণের পুরোহিত ব্রাহ্মণ।

কোনও ব্রাহ্মণ কস্মিন্ কালেও যখন যুগীর পুরোহিত ছিলেন না, তখন যুগীদিগের গোত্রই নাই। সেই যুগীরা এখন যোগী ও ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মসম্পাদিত "সঞ্জীবনী" পত্রিকার ব্যবস্থানুসারে ঐরূপ গোত্র-প্রবর বলিয়া বিবাহাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন!

শাস্ত্রমতে শূদ্র ভিন্ন আর কোনও বর্ণেরই সগোত্রে ও সমানপ্রবরে বিবাহ হইতে পারে না, এবং পাণিগ্রহণে সপ্তপদী গমনের (মতান্তরে চতুর্থীহোমের) পর কন্যা পতিগোত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যোগী ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত হইলে এবং তাহাদের পুরুষমাত্রেরই শিব গোত্র ও শিব শম্ভু প্রভৃতি একই প্রবর হইলে সগোত্রে ও সমানপ্রবরে কিরূপে বিবাহ হয়? এবং পতির শিবগোত্র ও পত্নীর কাশ্যপ গোত্রই বা কিরূপে হইতে পারে?

৮। "ইতিহাস ও আলোচনা" (শ্রাবণ ১৩২৮) হইতে উদ্ধৃত—

নাথধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। এই নাথধর্ম্ম "নাথ উপাধি" বিশিষ্ট যোগী * জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া একদা সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।......

* লেখক অনেক স্থলে "যোগী" শব্দের পরিবর্ত্তে যুগী লিখিয়াছিলেন। "যুগী" শব্দ যে অশুদ্ধ, বোধ হয় লেখক মহাশয়ের তাহা জানা নাই।

বক্তব্য—লেখক মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির প্রচারিত ধর্ম্মকেই "নাথধর্ম্ম" এবং তাঁহাদিগকেই যোগী বলিতে গিয়াও যুগীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া, যুগীকেই সেই যোগী বলিয়াছেন। তথাপি চিরন্তন অভ্যাসের বশে সর্ব্বত্রই "যুগী" লিখিয়াছিলেন, সংগ্রাহক তাহা সংশোধন করিয়া "যোগী" লিখিয়াছেন এবং যুগী শব্দ অশুদ্ধ বলিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যুগী বা যোগী বলিয়া কোনও জাতি কোনও শাস্ত্রেই উল্লিখিত নাই। সকল সংজ্ঞা শব্দের ব্যুৎপত্তিও হয় না। ভর্ত্তৃ, ভট্টোজি, কৈয়ট. সায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণের যে সকল নাম ছিল, তাহাদের কোনও ব্যুৎপত্তি নাই। শাস্ত্রোক্ত বেণ, মার্গব, আহিণ্ডিক প্রভৃতি এবং শাস্ত্রানুক্ত বাগ্দি, ডোম, কাওরা, কুর্ম্মি প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দেরও কোনও ব্যুৎপত্তি করা যায় না। তাই বলিয়া কি উহাদিগকে অশুদ্ধ শব্দ বলিতে হইবে এবং উহাদের সংশোধন করিয়া অন্য শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে? সেরূপ করিলে উহারা কি তত্তৎ ব্যক্তির ও তত্তৎ জাতির বোধক হইতে পারে? বিশেষতঃ যুগী শব্দের যখন ব্যুৎপত্তি আছে, তখন উহা অশুদ্ধই বা কিসে? নিকৃষ্ট-জাত্যুৎপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একণে স্বজাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিলেও যুগী জাতির চিরন্তন বৃত্তি বস্ত্রবয়ন। এখনও পল্লীগ্রামের অনেক অশিক্ষিত যুগী ঐ বৃত্তি করিয়াও থাকে।

"যানাদ্যঙ্গে যুগঃ পুংসি" (অমর), "যুগো রথহলাদ্যঙ্গে" (মেদিনী)

অর্থাৎ শকটের দণ্ড (যোয়াল), লাঙ্গলের দণ্ড (ঈষ), 'আদি' শব্দে তাঁতেরও ঐরূপ দণ্ডাকৃতি দণ্ড (ডণ্ডী ও পাটি) ইত্যাদিকে যুগ বলে। যার তন্ত্র (তাঁত) আছে, সে যেমন তন্ত্রী (তাঁতী), সেইরূপ যার যুগ (ডণ্ডী ও পাটী) আছে, সে যুগী।

শিক্ষিত যুগীদিগের অনুকরণে অশিক্ষিত যুগীরাও এখন "যোগী" হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ বেদেরা "বেদী" এবং তেওরেরা "তেওয়ারী" হইয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিবে না কেন?

৯। (ক) রাজা বল্লালসেনের পিতৃশ্রাদ্ধে যোগীরা দান গ্রহণ না করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিয়াছিলেন—"অদ্য হইতে যাহারা ইহাদের সহিত এক আসনে উপবেশন, ইহাদের দান গ্রহণ, পূজা, পৌরোহিত্য প্রভৃতি করিবে, তাহারাও পতিত হইবে।" এই আদেশ অবিলম্বে সর্বত্র প্রচারিত হইল। অনন্তর যোগীরা রাজা কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া অনেকেই তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিল; কেহ কেহ বা গুপ্তভাবে অতিকষ্টে তথায় বাস করিতে লাগিল। আর কতকগুলি যোগা যোগপট্ট প্রভৃতি জাতিচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় ব্যবসা পরিহার পূর্বক নানাবিধ জীবিকার উপায় অবলম্বন করিল; এবং অন্য-ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নীচ জাতির মত হইয়া গেল।

(খ) বাঙ্গালা দেশে তৎকালে যোগী ভিন্ন আর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিল না বলিয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া, বৃদ্ধাবস্থায় বল্লাল সেন একটি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সৎপাত্রে দান করিলে অনন্ত ফল হয়, এই হেতু যোগীদিগকে উহার দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। যোগীরা সে দানও গ্রহণ করেন নাই। পূর্বে পিতৃশ্রাদ্ধের দান গ্রহণ না করায় রাজা যোগীদিগের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন, এক্ষণে যজ্ঞের দান গ্রহণ করিতেও অস্বীকার করায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তদুপরি ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা যোগীদিগের সম্মান অধিক থাকায়, তাঁহারা যোগীদিগের

প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইবার জন্য তাঁহাকে উত্তেজিত করায়, রাজা যোগীদিগের যাবতীয় বৃত্তি কাড়িয়া লইলেন এবং যোগীদিগের উপর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন যোগীরা ক্রোধভরে স্বস্ব যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করিয়া রাজাকে এই অভিশাপ দিলেন যে, যত দিন তোমার বংশ নির্ব্বংশ না হয়, তাবৎ কাল আমরা এবং আমাদের বংশীয়েরা কেহই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে না।

বক্তব্য—ইহাই হইল তাঁহাদের এতকাল পইতা না থাকার ইতিহাস। উল্লিখিত উক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে, যোগী ও ব্রাহ্মণ পৃথক জাতি। তবে যোগীরা ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত কিরূপে হইল?

বল্লাল ইতঃপূর্ব্বে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যোগীদিগকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন, সৎপাত্রে দান করিয়া অনন্ত ফল লাভের কামনায় আবার সেই যোগীদিগকেই যজ্ঞের দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহা বড় বিচিত্র কথা!

রাজার পিতৃশ্রাদ্ধের পরেই ত যোগীরা তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়াছিল (দুই পাঁচ জন যাহারা ছিল তাহারা ত গুপ্তভাবে অর্থাৎ ছদ্মবেশে ছিল এবং অনেকে নীচ জাতির মত অর্থাৎ যুগী হইয়া বাস করিতে ছিল), তবে রাজা যজ্ঞের দান দিবার জন্য তাহাদিগকে কোথা হইতে পাকড়াইলেন?

রাজার উপর রাগ করিয়া নিজেদের পইতা ছেঁড়াটা "চোরের উপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া"র মত হইয়াছে।

কালাগ্নিরুদ্রবংশসম্ভূত যোগী মহোদয়গণ বল্লালকে নির্ব্বংশ হইবার অভিশাপ দিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অবমাননার নিমিত্ত-কারণ জানিয়া বঙ্গের ব্রাহ্মণগণকেও যে নির্ব্বংশ করেন নাই, ইহাই ব্রাহ্মণগণের পরম সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে।

বল্লাল ত প্রায় সহস্র বৎসর নির্ব্বংশ হইয়াছেন, এতাবৎ কালের মধ্যে যোগীদিগের কেহই ত উপবীত ধারণ করেন নাই; এখনই বা উহার জন্য এত হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে কেন?

শাস্ত্রে উপবীত ছেদনের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। তাঁহারা গীতায় ভগবদুক্ত "শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ। কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ" ইত্যাদি লক্ষণসঙ্গিত "যোগী" হইয়া ক্রোধের বশে কিরূপে এরূপ প্রায়শ্চিত্তার্হ গর্হিত কার্য্য করিলেন?

যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কদাপি ক্রোধবশে পইতা ছিঁড়িলে, অথবা জীর্ণ পইতা কদাপি আপনা হইতে ছিঁড়িয়া গেলে, যতক্ষণ তাহা যথাবিধি পুনর্দ্ধারণ না করেন, ততক্ষণ জলগ্রহণ করেন না। যেহেতু শাস্ত্রে যজ্ঞোপবীতরহিত ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। যোগীরা কিরূপে উপবীতবর্জ্জিত হইয়া অন্নজল গ্রহণ করিলেন?

যাঁহারা অধুনা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইয়া উপবীত ধারণের প্রয়াসী, তাঁহারাই দেখিতেছি যত দোষ ব্রাহ্মণদিগের ও বল্লালসেনের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকেন।

১০। বর্ত্তমানে যোগিদিগের মধ্যে নাথ, দেবনাথ, অধিকারী, বিশ্বাস, দালাল, গোস্বামী, মাচনদার, মহন্ত, মজুমদার, নাথজী, পণ্ডিত, রায়, সরকার, চৌধুরী, ভৌমিক, শর্ম্মা, দেবশর্ম্মা, ভট্টাচার্য্য, মহাত্মা, মণ্ডল, মল্লিক, বক্সি, চক্রবর্ত্তী, স্থানপতি প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত দেখা যায়।

বক্তব্য—"বর্ত্তমানে" যুগীদিগের ঐ সকল উপাধি প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং অতীতে ছিল না। আশা করি, ভবিষ্যতে যাহাতে

পাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষাল, সান্ন্যাল, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ইত্যাদিও প্রচলিত হইবে।

(অতঃপর পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার দ্রষ্টব্য)।

ইতি জাতিতত্ত্বে যোগিজাতিতত্ত্বনির্ণয় নামে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মাহিষ্য (কৈবর্ত্ত)

যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চিরকাল কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত এবং শূদ্র-ধর্ম্মানুসারে মাসাশৌচ পালন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই এখন কোনও কোনও স্থানে মাহিষ্য হইয়া বৈশ্যধর্ম্মানুসারে উপবীত ধারণ, ১৫ দিন অশৌচ পালন প্রভৃতি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা বেদাদি বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বহু প্রমাণ সংগ্রহপূর্ব্বক যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীআশুতোষ জানা-প্রণীত বহুগবেষণাপূর্ণ "মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি" পুস্তকেরই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তিনি লিখিয়াছেন—

১। (ক) প্রত্যেক হিন্দুরই ধারণা আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ইহার একটি বর্ণও সত্য নহে। নিরাকার পরমেশ্বর অথবা কল্পিত নিরাকার ব্রহ্মার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই ও ছিল না, তাহা হইতে কাহারও উৎপত্তি হয় নাই। বর্ণচতুষ্টয় যে পুরুষ বা ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ইহা কাল্পনিক ভিন্ন কোন কারণে প্রকৃত বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। বর্ণ বা জাতিবন্ধন যে মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হয় নাই, পরন্তু বহু পরেই হইয়াছে, তাহা

বিষ্ণুকে অবশ্যই মানিতে হইবে। ঈশ্বর নিরাকার জ্ঞানময়—তাঁহার মুখ নাসিকাদি কিছুই নাই, থাকিতেও পারে না। তাঁহা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও জন্মোৎপত্যাদি ঘটে নাই। (খ) মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে কোন জাতি ছিল না, সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বক্তব্য—(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়" পড়িয়া যদিও জানা মহাশয়ের জানা আছে "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।" কিন্তু শাস্ত্রে ঈশ্বরকে নিরাকার ও সাকার দ্বিবিধই বলা হইয়াছে। তাঁহার সাকারত্ব স্বীকার না করিলে উপাসনাই অসম্ভব হয়। জানা মহাশয় উইল্‌সন্ সাহেবের ডিক্‌শনারি ও বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে কৈবর্ত্তদিগকে অর্থাৎ আপনাদিগকে যে বৈষ্ণব বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, সে বৈষ্ণবত্ব কিসে?—ব্রাহ্মদিগের ন্যায় নিরাকার বিষ্ণুর উপাসনায়, না বিষ্ণুনামক কোনও মনুষ্যের উপাসনায়? বৈষ্ণবের বিষ্ণুকে ত শাস্ত্রে—বিশেষতঃ বৈষ্ণব গ্রন্থে—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই বলা হইয়াছে এবং তাঁহার চতুর্ভুজ, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতাম্বর, মকরকুণ্ডলবান্ ইত্যাদিরূপ রূপের বর্ণনাও আছে।

বুদ্ধিমান্ অদ্বৈতবাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় সাকার শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন; যথা—

"স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে। স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়-মর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ।" অপিচ—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।

স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ,
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ।"
(ভাগবত ১।২।২৩)

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥"
(শ্বেতাশ্ব, ৪ অঃ)

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" (গীতা ৪ ৭—৮)

উক্ত বচনগুলির ফলিতার্থ—পরমেশ্বর নির্গুণ থাকিয়া নিরাকার, এবং সগুণ হইয়া সাকার। হিন্দুমাত্রেই ইহা জানেন বলিয়া উহাদের অনুবাদ দিলাম না।

ব্রহ্মা নিরাকার নহেন। ব্রহ্মা যে সাকার, তাহা নিরক্ষর আবালবৃদ্ধবনিতারাও চিত্র ও প্রতিমা দেখিয়া জানে; শাস্ত্রজ্ঞদিগের ত কথাই নাই।

পরমেশ্বর হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধেই যে জগতের জন্মাদি হইয়া থাকে, চাতুর্ব্বর্ণ্য যে ঈশ্বরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে "কল্পিত" নহে—বস্তুতঃই তাঁহার তত্তৎ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, এবং সৃষ্টির প্রারম্ভেই যে বর্ণচতুষ্টয় ও তাহাদের গুণকর্ম্মবিভাগ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।"
(তৈঃ উপনিষদ্ ৩।১)

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। জন্মাদ্যস্য যতঃ।" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১—২)

"যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥
লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥" (মনু ১।১—৩১)
"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ।" (গীতা ৪।১৩)

শাঙ্করভাষ্য—"চত্বার এব বর্ণাঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া ঈশ্বরেণ সৃষ্টম্ উৎপাদিতম্ 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী'দিত্যাদিশ্রুতেঃ । গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ ।"

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের পুরুষসূক্তে যে ঈশ্বরের মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি বর্ণিত আছে, তাহা কল্পনা নহে; উহার উপক্রমে ও উপসংহারে "জজ্ঞিরে" ইত্যাদি জন ধাতুর প্রয়োগ থাকায় বাস্তব উৎপত্তিই বুঝাইতেছে । যথা ঋগ্বেদে—

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥"

ভাষ্য—"অস্য প্রজাপতেঃ, ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ, মুখমাসীৎ মুখাৎ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ । যোঽয়ং রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ত্বজাতিমান্ পুরুষঃ, স বাহূ কৃতঃ বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ বাহুভ্যামুৎপাদিত ইত্যর্থঃ । তৎ তদানীম্ অস্য প্রজাপতেঃ যৎ ঊরূ, তদ্রূপো বৈশ্যঃ সম্পন্নঃ ঊরুভ্যা-মুৎপন্ন ইত্যর্থঃ । তথা অস্য পদ্ভ্যাং পাদাভ্যাং শূদ্রঃ শূদ্রত্বজাতিমান্ পুরুষঃ অজায়ত ।"

(খ) মহাভারতে উক্ত হইয়াছে "[illegible]" (যা নাই

ভারতে, তা নাই ভারতে); এইজন্য সকলেই তাহাতে মনের মত বচন পাইয়া থাকেন! শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ে ভৃগুর উক্তিতে আছে বটে—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥"

বর্ণসমূহের কোনও বিশেষ নাই। ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া সমস্ত জগৎ একমাত্র ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টই ছিল, পরে কর্ম্ম দ্বারা ক্ষত্রিয়াদিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু উপক্রম ও উপসংহার দেখিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। উহার উপক্রমে আছে—

"প্রজাবিসর্গং বিবিধং মানসো মনসাসৃজৎ।
সংরক্ষণার্থং ভূতানাং সৃষ্টং প্রথমতো জলম্॥" (১৮৩।২)

এবং উপসংহারে আছে—

"আদিদেবসমুদ্ভূতা ব্রহ্মমূলাক্ষরাব্যয়া।
সা সৃষ্টির্মানসী নাম ধর্ম্মতন্ত্রপরায়ণা॥" (১৮৮।১০)

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে কারণাবস্থায় পরব্রহ্মের মন হইতে উৎপন্ন মানস ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টির বিষয় উক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে; কার্য্যাবস্থার কথা নহে। তাহা হইলে ঐ শান্তিপর্ব্বেই ২৯৬ অধ্যায়ে যে আছে—

"বক্ত্রাদ্ভুজাভ্যামূরুভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চৈবাথ জজ্ঞিরে।
সৃজতঃ প্রজাপতের্লোকানিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥"

"সৃজতঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

—ইহার সহিত সামঞ্জস্য থাকে না; এবং পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবচন-সমূহের সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না।

২। মাহিষ্য ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত। মাহিষ্য বর্ণসঙ্কর নহে। যেহেতু মনু বলিয়াছেন "ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ। স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।" অর্থাৎ ব্যভিচার, অবেদ্যাবেদন (অবিবাহ্যা-বিবাহ) ও স্বকর্ম্মত্যাগ এই তিনটি কারণে বর্ণসঙ্কর ঘটিয়া থাকে। বৈশ্যকন্যা ক্ষত্রিয়ের যখন বিবাহ্যা, তখন তদ্গর্ভজাত মাহিষ্য বর্ণসঙ্কর হইতে পারে না।

বক্তব্য—জানা মহাশয় প্রথমেই সপ্রমাণ করিয়াছেন, বর্ণ বা জাতিবন্ধন মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হয় নাই, বহু পরেই হইয়াছে; এখন সপ্রমাণ করিতেছেন—মাহিষ্য ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত। সুতরাং সৃষ্টির প্রারম্ভে ও ঈশ্বরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি অস্বীকার করিলেও চাতুর্ব্বর্ণ্য যে আছে, চাতুর্ব্বর্ণ্যই যে অন্যান্য জাতির উৎপাদক ও সর্ব্বজাতি অপেক্ষা প্রাচীনতম, ইহা ত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাঁহাদেরও ত স্বীকার করিতে হইয়াছে; তবে ঐরূপ (১ সংখ্যায় প্রকাশিত) লেখায় ইষ্টোৎপত্তি কি?

'সঙ্কর' শব্দের অর্থ—বিভিন্নজাতীয় বস্তুর মিশ্রণ। উহা বিশেষ্যপদ, উহা হইতে বিশেষণপদ হইয়াছে 'সঙ্কীর্ণ'। অতএব ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন "মাহিষ্য" নিশ্চয়ই বর্ণসঙ্কর। ভগবান্ মনু—

"সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ।" (১০।২৫)
"সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।" (১০।৪০)

বলিয়া (সজাতিজ ভিন্ন) অনন্তরজ, একান্তরজ, দ্ব্যন্তরজ, অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সকলকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন। "ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্" ইত্যাদি বচনে বর্ণসঙ্করের অন্যান্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উহার অর্থ—সবর্ণদিগের মধ্যেও পরস্পর-স্ত্রীগমনে, অবিবাহ্যাবিবাহে এবং উপনয়নাদি সংস্কারকর্ম্মের পরিত্যাগে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভিন্ন মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য প্রভৃতি সকলেই যে সঙ্করবর্ণ, তাহা মহাভারতে স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে যথা—

"মুখজা ব্রাহ্মণাস্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
উরুজা ধনিনো রাজন্ পাদজাঃ পরিচারকাঃ॥
চতুর্ণামেব বর্ণানামাগমঃ পুরুষর্ষভ।
অতোঽন্যে ত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ॥"
(শান্তি, ২২৬৬—৭)

পরমেশ্বরের মুখজাত ব্রাহ্মণ, বাহুজাত ক্ষত্রিয়, উরুজাত বৈশ্য ও পদজাত শূদ্র। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা হইতে এই চতুর্ব্বর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছে। এতদতিরিক্ত সমস্ত জাতিই সঙ্করজাত।

গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

"বক্ষ্যে সঙ্করজাত্যাদি গৃহস্থাদিবিধিং পরম্।
বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
জাতোঽম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পার্শবোঽপি বা।
মাহিষ্যোগ্রৌ প্রজায়েতে বিট্‌শূদ্রাঙ্গনয়োর্নৃপাৎ॥" (৯৬ অঃ)

অতঃপর সঙ্করজাতির কথা বলিব। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈশ্যাগর্ভজাত অম্বষ্ঠ, শূদ্রাগর্ভজাত নিষাদ বা পার্শব (পারশব); এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত মাহিষ্য ও শূদ্রাগর্ভজাত উগ্র।—ইত্যাদি।

অমরও বলিয়াছেন—

"আ চণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ।
মাহিষ্যোঽর্য্যাক্ষত্রিয়য়োঃ"

(এতদ্বর্গোক্ত) অম্বষ্ঠ ও করণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই সঙ্কীর্ণ (সঙ্করজাত)। শূদ্রা ও বৈশ্য হইতে করণ, বৈশ্যা ও ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠ, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয় হইতে মাহিষ্য (উৎপন্ন হইয়াছে)।

জানা মহাশয় নিজেই মাহিষ্য সম্বন্ধে শব্দশাস্ত্রের যে সকল প্রমাণ তুলিয়াছেন, তন্মধ্যে শব্দস্তোমমহানিধিতে আছে—

"মাহিষ্যঃ—ক্ষত্রেণ বৈশ্যায়ামুৎপন্নে সঙ্করজাতিভেদে।"

তদুদ্ধৃত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানগুলিতেও আছে—

"মাহিষ্য – A man of mixed class."

৩। দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন অনন্তরজ জাতিকে মনু "দ্বিজধর্ম্মী" বলিয়াছেন, "দ্বিজ" বলেন নাই; এবং দ্বিজাতিদিগেরই ব্রাত্যদোষ ধরিয়াছেন, দ্বিজধর্ম্মীদিগের ধরেন নাই। অতএব ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা-গর্ভজাত—সুতরাং দ্বিজধর্ম্মী মাহিষ্যের ব্রাত্যদোষ ঘটিতে পারে না (অর্থাৎ বহুপুরুষ যাবৎ উপনয়নসংস্কারবর্জ্জিত হইলেও মাহিষ্যসন্তান ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই উপবীত গ্রহণ করিতে পারে)।

ন্যায়রত্ন—সাক্ষাৎ দ্বিজ না হইয়া দ্বিজধর্ম্মী হওয়ায় মাহিষ্য যদি পতিতসাবিত্রীক হেতু ব্রাত্য না হয়, তাহা হইলে উপনয়নাদি কার্য্যে মাহিষ্যের অধিকারই জন্মে না। যেহেতু ঐ সকল কার্য্যবিধায়ক বচনে শাস্ত্রকারেরা 'দ্বিজ' বা 'দ্বিজাতি' শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, 'দ্বিজধর্ম্মী' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। যথা—

"এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ।" (মনু ২।৬৮)

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥" (মনু ৩।৫)

"অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।" (মনু ১০।৬)

অতএব দ্বিজধর্ম্মী মাহিষ্যের দ্বিজাতিবিহিত উপনয়নে ও বেদাধ্যায়নে অধিকার না থাকায় এবং সগোত্রা-বিবাহও বিহিত হওয়ায় শূদ্রত্বই সিদ্ধ হইতেছে।

পরন্তু দ্বিজধর্ম্মীরা যদি দ্বিজাতিবিহিত বিধিনিষেধের বহিভূর্ত হয়, তবে তাহাদিগকে দ্বিজধর্ম্মী বলিবার তাৎপর্য্য কি? উক্ত কারণে মাহিষ্যদিগের ত উপনয়ন-সংস্কার হইতেই পারে না; তথাপি তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন কোন্ প্রমাণে এবং কি জন্য? পশ্চিমাঞ্চলে ও উড়িষ্যা প্রদেশে একপ্রকার শূদ্র আছে, তাহারা বিবাহকালে বিনা মন্ত্রে গলায় পইতা পরিয়া থাকে; অথচ তাহারা চাষ করে, মোট বহে ও গরুর গাড়ী হাঁকায়। মাহিষ্যেরা কি কেবল চাষ করিবার জন্যই পইতা লইয়া থাকেন?

মনু "সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" (১০।৪১)

দ্বিজাতিদিগের সজাতিজ তিন ও অনন্তরজাতিজ তিন, এই ষড়্বিধ পুত্রকেই দ্বিজধর্ম্মী বলিয়াছেন। তাহা হইলে ত দ্বিজদিগের সবর্ণপত্নীগর্ভজাত পুত্রও দ্বিজ হইতে পারে না, তাহাদিগের উপনয়নাদি সংস্কারেও অধিকার জন্মে না এবং তাহাদের ব্রাত্যত্বও ঘটে না।

৪। মাহিষ্য ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা গর্ভজাত বলিয়া, বৈশ্যধর্ম্মা।

বক্তব্য।—এ কথায় কোনও প্রতিবাদ নাই; যেহেতু ইহা শাস্ত্রসম্মত। বৈশ্যধর্ম্মা বলিয়া মাহিষ্যের উপনয়ন সংস্কারে, সুতরাং বেদাধ্যয়নেও অধিকার আছে। পরন্তু কৈবর্ত্তেরা যে মাহিষ্য, তাহার প্রমাণ কি?

তাঁহারা যদি মাহিষ্যই হন, তাঁহাদের "কৈবর্ত্ত" এই পৃথক্ সংজ্ঞা কেন? এবং পুরুষানুক্রমে স্বতঃ পরতঃ কেবল কৈবর্ত্ত আখ্যাতেই অভিহিত হইতেছেন কেন?—এত কাল ত তাঁহারা নিজে ও অন্যে কেহই তাঁহাদিগকে মাহিষ্য বলিয়া জানিতই না। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মাসাশৌচ গ্রহণ করিতেন কেন? তাঁহাদের উপবীতই বা ছিল না কেন? বৈদ্য ও যুগীরা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপবীত ত্যাগের কারণ দেখাইয়াছেন—ব্রাহ্মণদিগের ঈর্ষ্যা ও মহারাজ বল্লালসেনের ক্রোধ। ইঁহারা ত সেরূপ কোনও কারণ দেখাইতে পারেন নাই, তবে ইঁহারা পইতা ফেলিয়াছিলেন কেন?

৫। কোনও জাতির সম্বন্ধে জানিতে হইলে বৃত্তি দ্বারা জাতি নির্ণয় করিবে অর্থাৎ সে জাতি কি কি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবে। যেহেতু মনু বলিয়াছেন "প্রজ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্মভিঃ" (১০।৪০)। মাহিষ্য জাতি কেবলমাত্র বৈশ্যবৃত্তি (কৃষি) দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

বক্তব্য—মাহিষ্যজাতি কেবলমাত্র কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে বলিয়া কৈবর্ত্তও যে মাহিষ্য হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। ভারতবর্ষে যত কৃষিজীবী আছে, সকলেই কি মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত, এবং সকল কৈবর্ত্তই কি কৃষিজীবী? সদেগাপ প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জাতিও ত পুরুষানুক্রমে কৃষিকর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, এবং অনেক কৈবর্ত্তও ত পুরুষানুক্রমে গুটিপোকার কারবার, জমিদারী প্রভৃতি করিতেছে। সদেগাপেরাই চাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ—"ন চাষা সদ্গোপাৎ পরঃ" বলিতে সদেগাপকেই বুঝায়, কৈবর্ত্তকে বুঝায় না।

মনু যে "বেদিতব্যাঃ স্বকর্মভিঃ" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—"স্বজাত্যুচিতকর্মানুষ্ঠানেন" (টীকা) অর্থাৎ শাস্ত্রে তত্তজ্জাতির যে যে কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তত্তৎকর্মানুসারে জাতিনির্ণয় করিতে হয়। এই বলিয়া

তিনি পরবর্ত্তী বচনসমূহে "সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" ইত্যাদি জাতিবিশেষের কর্ম্মবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। মাহিষ্য ও কৈবর্ত্তদিগের যে কৃষিবৃত্তি, তাহা কোনও শাস্ত্রেই উক্ত হয় নাই; উক্ত জ্ঞানী মহাশয় তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছুই না দেখাইয়া, দেখাইয়াছেন গদাধরভট্টের কুলজী প্রভৃতি কতিপয় অর্ব্বাচীন গ্রন্থের বচন।

৬। মাহিষ্য অন্ত্যজ নহে। অনেকে ব্যাসসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া কৈবর্ত্ত জাতির অন্ত্যজত্ব সপ্রমাণ করিয়া থাকেন—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"

কিন্তু উক্ত শ্লোকটি মূল ব্যাসসংহিতায় নাই। কেবল লোক সকলকে বঞ্চনা করিবার জন্য উহা প্রচারিত ও স্বকপোলকল্পিত। প্রকৃত শ্লোকটী এই—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
চণ্ডালমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"

অত্রি, অঙ্গিরা, যম, ব্যাস, মনু প্রভৃতি সংহিতা এবং বেদাদি কোনও শাস্ত্রেই কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য জাতি অন্ত্যজ বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। মাহিষ্য অন্ত্যজ—এরূপ অভিমত কেবল বিকৃতমস্তিষ্ক পাগলের অথবা বিবেকহীন নিরক্ষর লোকের মুখেই শোভা পায়।

বেদে, বেদান্তে, বেদাঙ্গে ও উপনিষদে অন্ত্যজ শব্দ বা অন্ত্যজ জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক কালে অন্ত্যজ জাতির অস্তিত্বের সম্ভাবনা ছিল না। শুক্লযজুর্ব্বেদ বাজসনেয় সংহিতা ত্রিংশ মণ্ডল ১৬ স্তবকে "অবরায় কৈবর্ত্তং" থাকায় কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ নহে।

ব্যাখ্যা—মাহিষ্যকে কেহই অন্ত্যজ বলেন নাই; কিন্তু কৈবর্ত্তকে সকলেই অন্ত্যজ বলিয়াছেন। "রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকটি যদি

কোনও সংহিতাতেই নাই, তবে উহার উক্তরূপ প্রকৃত পাঠ অর্থাৎ 'কৈবর্ত্ত' স্থলে 'চণ্ডাল' পাঠ কোথায় পাইলেন?

সাক্ষর, বিবেকবান্, প্রকৃতমস্তিষ্ক, বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জানা মহাশয় অত্রি, অঙ্গিরা ও যম-সংহিতায় কৈবর্ত্তের অন্ত্যজত্ব বর্ণনা নাই বলিয়াছেন। তাঁহাকে আর একবার ঐ সংহিতাগুলি দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। অত্রিসংহিতার ১৯৫, অঙ্গিরঃসংহিতার ১অঃ ৩, এবং যমসংহিতার ৫৪ শ্লোক—অবিকল ঐ "রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ" ইত্যাদি, এবং সর্ব্বত্রই "কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ" পাঠ রহিয়াছে। রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে এবং মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি প্রায়শ্চিত্তবিবেকে "যত্তু যমবচনং" বলিয়া ঐ বচনটিই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহাতে কৈবর্ত্ত পাঠই ধরিয়াছেন। তাঁহারাও নিরক্ষর, বিবেকহীন, বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল ও লোকবঞ্চক ছিলেন কি না, তাহা জানা মহাশয়ই জানেন।

উক্ত বচনে চণ্ডালের উল্লেখ থাকিতেই পারে না। যেহেতু মন্বাদির মতে চণ্ডাল অন্ত্যজ অপেক্ষাও অধম। যথা—

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" (মনু ১০।১২)

শূদ্র হইতে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ক্ষত্তা, এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি; সেই চণ্ডাল মনুষ্যদিগের মধ্যে অধম। ইহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর।

বেদ সর্ব্বজ্ঞ, বেদে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল বিষয়ই আছে,—ইহাই বেদের বেদত্ব। সুতরাং বেদে, বেদান্তে ও উপনিষদে অন্ত্যজ ও তদপেক্ষাও অধম জাতির উল্লেখ দেখা যায়। যথা উপনিষদে—

"অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।" (ছান্দোগ্য ৫।১০।৭)

বেদাঙ্গ ব্যাকরণে যথা—

"শূদ্রাণামনিরবসিতানাম্॥ (পাণিনি ২।৪।১০) অবহিষ্কৃতানাং শূদ্রাণাং প্রাগ্বৎ। তক্ষায়স্কারম্। পাত্রাদ্ বহিষ্কৃতানান্তু—চণ্ডালমৃতপাঃ।" সংক্ষিপ্তসারে—"অনিরবসিতশূদ্রঃ॥ যেন ভুক্তে বিনা পাত্রং সংস্কারেণ ন শুধ্যতি, স নিরবসিতশূদ্রঃ (যে কোনও তৈজস পাত্রে ভোজন করিলে পুনর্গঠন ব্যতিরেকে তাহা শুদ্ধ হয় না, তাহাকে নিরবসিত শূদ্র বলে) রজক-তন্তুবায়ম্, ভিল্লধীবরম্ (ইহারা অনিরবসিত শূদ্র)। নিরবসিতশূদ্রস্তু—চাণ্ডাল-হড্ডিপৌ।"

যজুর্ব্বেদে "মণ্ডল" নাই; অধ্যায় আছে। "অবরায় কৈবর্ত্তং" যাহাতে আছে, তাহা "ঋক্" নহে; যজুঃ। জানা মহাশয় ঐ দুইটিমাত্র পদ উদ্ধৃত না করিয়া যদি ঐ ১৬শ কাণ্ডকাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেন এবং পূর্ব্বাপর কণ্ডিকাগুলিও তুলিতেন, তাহা হইলে সকলকেই জানান হইত যে, বেদে বহু অন্ত্যজ ও অধম জাতির উল্লেখ আছে এবং ঐ ১৬শ কণ্ডিকাতেই "চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামাণিকে"র ন্যায় আশে-পাছে আশে-পাশে অন্ত্যজ ও অধম জাতির মধ্যেই "কৈবর্ত্ত" বিরাজ করিতেছে। জানা মহাশয় অপরকে লোকবঞ্চক বলিয়া, এখানে সম্পূর্ণ কণ্ডিকাটি না তুলিয়া নিজেরই লোকবঞ্চকত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকটি কণ্ডিকা নিয়ে উদ্ধৃত হইল।—

"নৃত্তায় সূতং, গীতায় শৈলূষং" (ভাষ্য—শৈলূষ = নট)।

"নদীভ্যঃ পৌঞ্জিষ্ঠং, ঋক্ষীকাভ্যো নৈষাদং" (ভাষ্য—পুঞ্জিষ্ঠ = পুক্কস অন্ত্যজ, তদপত্য; নৈষাদ = নিষাদের অপত্য।

"মেধায় বাসঃপল্পূলীং" (ভাষ্য—বাসঃ-পল্পূলী = বস্ত্রপ্রক্ষালক অর্থাৎ রজক)।

"সরোভ্যো ধৈবরম্-ঋূপস্থাবরাভ্যো দাশং, বৈশন্তাভ্যো বৈন্দং, নড়লাভ্যঃ শৌষ্কলং, পারায় মার্গার-মবারায় কৈবর্ত্তং, তীর্থেভ্যো আন্দং, বিষ-

মেভ্যো মৈনালং, স্বনেভ্যঃ পর্ণকং, গুহাভ্যঃ কিরাতং, সানুভ্যো জম্ভকং, পর্ব্বতেভ্যঃ কিম্পূরুষম্।"—১৬শ কণ্ডিকা (ভাষ্য—ধৈবর—কৈবর্ত্তাপত্য, দাশ—ধীবর, বৈন্দ—নিষাদাপত্য, শৌষ্কল—মৎস্যজীবী, মার্গার—ব্যাধের অপত্য, আন্দ—বন্ধনকর্ত্তা, মৈনাল—জালিকের অপত্য, পর্ণক—ভিল্ল, জম্ভক—হিংসক, কিম্পূরুষ—কুৎসিত নর)।

"বর্ণায় হিরণ্যকারং" (ভাষ্য—হিরণ্যকার—স্বর্ণকার)।

"বায়বে চাণ্ডালম্।" ইত্যাদি।

৭। বঙ্গদেশে দ্বিবিধ কৈবর্ত্ত আছে, হালিক ও জালিক। হালিকেরাই সৎ কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য, এবং জালিকেরা অন্ত্যজ।

বক্তব্য—"ধনকম্পকারং" ইত্যাদি বচনে 'কৈবর্ত্ত' পাঠ যদি প্রবন্ধকের মত হয়, তাহা হইলে জালিক-কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ হইল কোন্ প্রমাণে? "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" এই স্মৃতি-বচন অনুসারে মনুর বিরুদ্ধবাদি অন্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইতে পারে না। মনু কৈবর্ত্তের একবিধত্ব ও তাহার এইরূপ উৎপত্তিবিবরণ বলিয়াছেন—

> "নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্মজীবিনম্।
> কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ।" (১০।৩৪)

(শূদ্রাগর্ভে ব্রাহ্মণোৎপাদিত) নিষাদ হইতে (বৈশ্যাগর্ভে শূদ্রোৎপাদিতা আয়োগবীতে) মার্গব জাতির উৎপত্তি। তাহার নামান্তর—দাস; জীবিকা—নৌকাবাহন। আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা তাহাকে কৈবর্ত্ত বলে।

আমাদের মনে হয়, পরাশরসংহিতায় সামান্যতঃ

> "গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক-বারুজী।
> কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।"

থাকিলেও, সামাজিক সাধু পুরুষগণ আপনাদের কার্য্যের সুবিধা

জন্ত যেমন গোপ বলিতে সদ্গোপ (গয়লা নহে), তৈলী বলিতে তেলী (কলু নহে), এবং তন্ত্রী বলিতে আশ্‌নাই ও বসাক তাঁতী (কাপড়-বোনা তাঁতী নহে) করিয়া লইয়াছেন, সেইরূপ বাগ্দিকে তেঁতুলে ও মাছধরা এই দুইভাগে এবং কৈবর্ত্তকে চাষী, তুঁতে ও জেলে এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তেঁতুলে বাগ্দিকে ও চাষী কৈবর্ত্তকে সৎ বলিয়াছেন। "সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ" (সাধুদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়ম বেদবৎ প্রমাণ) এই আদিত্যপুরাণীয় বচন অনুসারে ঐরূপ জাতি-বিভাগও সমাজে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

হালিক কৈবর্ত্তেরা যদি বৈশ্যধর্ম্মা মাহিষ্যই হয়, তবে এখনও বহু স্থানের কৈবর্ত্তেরা শূদ্র হইয়াই রহিয়াছে কেন? তাহাদের মধ্যে সকলেই যে মূর্খ ও দরিদ্র, তাহাও ত নহে; বিদ্বান্ ধনবান নিষ্ঠাবান্ এবং মান্যমানও অনেক আছেন—(চব্বিশপরগণা) বাওয়ালির মণ্ডলেরা, (কলিকাতা) জানবাজারের রাণী রাসমণির জ্ঞাতি ও জামাতৃগণ প্রভৃতি ত সুবিখ্যাত। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও এখন অনেক কৈবর্ত্ত হাকিম, ব্যারিষ্টার, উকীল, মাষ্টার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা শূদ্রই আছেন, মাহিষ্য হইবার চেষ্টা করেন না।

উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই কায়স্থ, নবশাক, আগুরি, মাহিষ্য এবং (পঞ্চবণিকের মধ্যে সুবর্ণবণিক্ ভিন্ন) চতুর্ব্বণিকের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন; তাহাতে তাঁহারা স্বশ্রেণীচ্যুত হন নাই। গয়লা, সোণার বেণে, কলু কপালী, পোদ, বাগ্দি, চাণ্ডাল প্রভৃতি অসৎ শূদ্রের পৌরোহিত্যও উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই করিয়া থাকেন; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বশ্রেণীচ্যুত হইয়া "বর্ণের ব্রাহ্মণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কৈবর্ত্তের পুরোহিত স্বতন্ত্র; তাঁহারা "ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত। কোনও কোনও স্থানে বরং কৈবর্ত্তের জল ব্রাহ্মণেরাও ব্যব

হার করেন ; কিন্তু "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণের" অন্নজল অধম শূদ্রেরাও কুত্রাপি গ্রহণ করে না। এক্ষণে যে সকল কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ঐ পুরোহিতদিগকে "গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ" করিয়া তুলিয়াছেন ; অথচ তাঁহাদিগের জ্ঞাতিকুটুম্বগণ—যাঁহারা শূদ্র-কৈবর্ত্তের পৌরোহিত্য করিতেছেন তাঁহারা—সেই "ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ" বলিয়াই আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, মেদিনীপুর অঞ্চলে বহু উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মাহিষ্যীভূত কৈবর্ত্তদিগের বাটীতে তাঁহাদের পুরোহিত-গণের সহিত একযোগে অবিকল ও একপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিয়া থাকেন এবং অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও তাঁহাদের দান গ্রহণ করেন। শাস্ত্রে আছে—অযাজ্য-যাজন ও অসৎ-প্রতিগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ ; অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজের জলপানে এবং একপঙ্‌ক্তিতে ভোজনে অহোরাত্র উপবাস, স্নান ও পঞ্চগব্য পান,—জ্ঞানতঃ উহার দ্বিগুণ।

৮। মাহিষ্য, মাহিষিক ও কৈবর্ত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি—(ক) মহীকে অর্থাৎ ভূমি বা পৃথিবীকে যে ব্যক্তি লাঙ্গল দ্বারা বিদারণ করে, সেই ব্যক্তি মাহিষ্য (স্বার্থে ষ্যঞ্)। সুবন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিলে অনুপসর্গক আকারান্ত ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। মহী+সো+ক=মহিষ ; বৈদেশীয়কবৎ ঈকারের হ্রস্ব, ওকারের লোপ (পূর্ব্বা) স (মূর্দ্ধন্য) ষ হইল। মহিষ (স্বার্থে ষ্যঞ্ বা ষ্ণ) মাহিষ্য। মাহিষ্য অর্থে কৃষিজীবী জাতি বুঝায়।

(খ) মহিষ আছে যার সে মাহিষ্য, "শেষে" এই সূত্রানুসারে যথাবিধ সম্বন্ধে ষ্যঞ্ প্রত্যয় ; মহিষ কৃষিকর্ম্মের প্রধান উপকরণ। অতএব কুল্লুক বলিয়াছেন "মাহিষিক" অর্থ মহিষজীবন অর্থাৎ মহিষ যাহার জীবনাবলম্বন।

(গ) ক বা কা শব্দে পৃথিবী, জল, হল, সুখ, ধন, বিষ্ণু প্রভৃতি বুঝায়; তাহা হইলে ব্যুৎপত্তি দ্বারা কৈবর্ত্ত জাতিকে ভূমিকর্ষক, হলধারী, জলোপজীবী (জলরক্ষায় বৃত—নিযুক্ত অথবা জল সহায়তার কৃষি-উপজীবী), সুখী, ধনী, বিষ্ণুভক্ত প্রভৃতি বুঝা যায়।

বক্তব্য—প্রথম পরিচ্ছেদে বৈদ্যশব্দের ব্যুৎপত্তিতে দেখাইয়াছি, জাতিবাচক শব্দসমূহ রূঢ়; উহাদের শাস্ত্রসম্মত বা কল্পিত অর্থ সর্ব্বত্র খাটে না। ক্ষত্তৃ শব্দ সাধনের সূত্র—"তৃন্‌তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং চানিটৌ। শংস্তা স্তোতা। ক্ষদিঃ সৌত্রো ধাতুঃ শকলীকরণে ভক্ষণে চ, ক্ষত্তা স্যাৎ সারথৌ দ্বাঃস্থে ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ শূদ্রজে।" (পাণিনি, উণাদি)। অতএব ক্ষত্তৃ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ 'খণ্ডকারক ও ভক্ষক; কিন্তু উহা সারথি, দৌবারিক ও ক্ষত্রিয়াতে শূদ্রোৎপন্ন জাতির সংজ্ঞা। পরন্তু ঐরূপ ব্যুৎপত্তিতে কুম্ভকারকেও মাহিষ্য এবং বাগ্‌দি, তিওর ও জেলেকেও ত কৈবর্ত্ত বলা যাইতে পারে; যেহেতু কুম্ভকারেরাও মৃত্তিকা সংগ্রহের জন্য ভূমি বিদারণ করে; এবং বাগ্‌দি, তিওর ও জেলেরাও জলোপজীবী অর্থাৎ জলে মাছ ধরে, ভূমিতে মাছ ঝাড়ে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে ধনী ও সুখী আছে, এবং তাহারা বিষ্ণুভক্তও বটে।

জানা মহাশয় মাহিষ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিতে যে পণ্ডিতের "পাঁতি"র নকল করিয়াছেন, তাঁহার হস্তাক্ষর বুঝিতে না পারিয়া অথবা প্রণিধান পূর্ব্বক না দেখিয়া যাঞ্‌ স্থলে ঘঞ্‌, ষ্য স্থলে ক্ষ, এবং বৈদেহিবন্ধু স্থলে বৈদেহীবন্ধু লিখিয়াছেন। সে যাহা হউক, ঐ ব্যুৎপত্তি সর্ব্বাংশে ব্যাকরণসিদ্ধ, অভিধানসম্মত ও ব্যবহারসম্মত হয় নাই। যেহেতু সো (ষো ধাতুর অর্থ—অন্তকর্ম্ম (বিনাশ); বিদারণ নহে। সাহেবেরা আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তিতে যেমন ঋ ধাতুর অর্থ 'চাষ করা' লিখিয়াছেন, ইহাও সেইরূপ। উপসর্গের ইবর্ণের পরই ষোপদেশ ধাতুর দন্ত্য স স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়; মহী শব্দের উত্তর হইতে পারে না। "ষেষে" সূত্র দ্বারা অণ

প্রত্যয়ই হইয়া থাকে; ষ্যঞ্ প্রত্যয় হয় না। এবং স্বার্থে ষ্যঞ্ বা ষ্য প্রত্যয় হইবার সূত্রও নাই।

(খ) "প্রধান উপকরণ" ত দূরের কথা, মহিষ যে কৃষিকর্ম্মের কোনও কাজে লাগে, তাহা কোনও দেশের লোকই অবগত নহে। যে সকল কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইয়াছেন, পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানে তাঁহাদের কাহারও মহিষ থাকিতে ত কেহ কখনও দেখেও নাই, শুনেও নাই।

(গ) ক ও কা শব্দের পৃথিবী ও জল অর্থ কোনও অভিধানেই নাই। চাষী হইলেই যে ধনী ও সুখী হওয়া যায়, এমন কোনও নিয়মও নাই। অধিকাংশ চাষীই দরিদ্র ও দুঃখী।

মাহিষ্য, মাহিষিক ও কৈবর্ত্ত শব্দের প্রামাণিক ব্যুৎপত্তি যথা—

(১) "মহিষ্যাঃ সাধুঃ" (অমরটীকা) মহিষী+যৎ = মহিষ্য, পূর্ব্বপদবৎ "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" (পাণিনি ৬।৩।১৩৭) দীর্ঘ = মাহিষ্য—যে মহিষী পালন করে। যাহারা গাভী পালন করে, তাহারা গোপ এবং যাহারা মহিষী পালন করে, তাহারা মাহিষ্য। নন্দ গোপ বৈশ্য ছিলেন, তজ্জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন সংস্কার করিবার জন্য গর্গমুনিকে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্॥" (ভাগ, ১০।৮।১০)

মাহিষ্য বৈশ্যধর্ম্মা। ইহাদেরও দ্বিজাতিসংস্কার আছে।

(২) "মহিষীত্যুচ্যতে নারী যা চ স্যাদ্ ব্যভিচারিণী।
তাং দুষ্টাং কাময়তি যঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥" (কাশীখণ্ড)

(৩) "মহিষীত্যুচ্যতে নার্য্যা ভগেনোপার্জ্জিতং ধনম্।
উপজীবতি যস্তস্যাঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥"
(বিষ্ণুপুঃ ২ অংশ, ৬ অঃ, ১৫ শ্লোঃ, স্বামিটীকা)

(৪) "মহিষীত্যুচ্যতে ভার্য্যা যা চৈব ব্যভিচারিণী।

তান্ দোষান্ ক্ষমতে যস্তু স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ॥" (যমসং, ৬৬

(৫) "কে জলে বর্ত্তন-মাস্যেহস্য, শেষে অণ্" (অমরটীকা), বৃত+ভাবে ঘঞ্-বর্ত্ত, কে-বর্ত্ত+অণ্-কৈবর্ত্ত (অলুক্‌সমাস, আদিস্বরে বৃদ্ধি)—মাছ ধরিবার জন্য যাহারা জলে থাকে।

[অতঃপর ৫ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার দ্রষ্টব্য।)

ইতি জাতিতত্ত্বে মাহিষ্যজাতিতত্ত্বনির্ণয় নামে তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কায়স্থ

১। কতিপয় কায়স্থ নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বহু অধ্যাপক মহাশয় তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদান করিলেও ধর্ম্মভীরু সুবিচক্ষণ কায়স্থ মহোদয়গণ ঐ সকল প্রমাণে ও ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। এক্ষণে তাঁহাদের সে আন্দোলন বহুপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে; তাঁহারা নিজেরা বুঝিয়াছেন, ঐ আন্দোলন অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং তদ্বিষয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ এখনও বলেন (কায়স্থসংহিতা-নাম্নী মাসিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল) "রঘো বল্লা নিতে। তিন জনেছিল জাত খেতে।" অর্থাৎ রঘুনন্দন, বল্লালসেন ও মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কায়স্থ প্রভৃতিকে শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়—

(ক) প্রাচীন স্মৃতি অনুসারে শূদ্রদিগের অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় অমন্ত্রক বিবাহও চিরপ্রচলিত আছে। রঘুনন্দন সেই সকল বচনই উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদিগের অমন্ত্রক বিবাহ সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন

কলিকাতা কুমারটুলীনিবাসী ৺বংশীচরণ মিত্র (পেশন্ বঙ্) মহোদয় আমার নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া তাঁহার পুত্রের বিবাহে ব্রাহ্মণ বরণ-পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা কুশণ্ডিকা করাইয়াছিলেন। ঐ বিবাহের ৩।৪ দিন পূর্ব্বে তিনি আমারই সমক্ষে তাঁহার নবতিপর বৃদ্ধ পিতা ৺ বেণীমাধব মিত্র মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"এক কায়স্থ পরিবারের মোকদ্দমায়, বাদিনীর হাতে সম্পত্তি পড়িলে শীঘ্রই অপব্যয়ে নষ্ট হইবে বুঝিতে পারিয়া প্রতিবাদীকেই সম্পত্তি দিবার জন্ত আমি রায়ে লিখিয়াছিলাম—সপ্তপদী-গমন না হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না; শূদ্রের বিবাহ যখন কন্যাসম্প্রদান-মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, উহাতে পাণিগ্রহণ না থাকায় যখন সপ্তপদী-গমন হয় না, তখন ঐ বিবাহ অসিদ্ধ। অতএব বাদিনী এই সম্পত্তির অধিকারিণী নহে।" আপীলেও আমার রায়ই বহাল ছিল। এই জন্ত আমার ইচ্ছা, এই বিবাহে কুশণ্ডিকা করাইব। ইনিও তাঁহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এক্ষণে আপনার কি মত?" তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন—"আমার অমত নাই; রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার পুত্রের বিবাহে বহুজনের মতে কুশণ্ডিকা করাইয়াছেন, আমি দেখিয়াছি।"

(খ) বল্লালসেন আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে তৎকাল পর্য্যন্ত সদাচারী থাকিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্মানপূর্ব্বক এমন বংশগত কৌলীন্ত মর্য্যাদার মৌরসী পাট্টা দিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের সন্তানেরা এখন সম্পূর্ণরূপে কু-লীন হইয়াও সেই কুলীনত্বের দাবি করিতেছেন এবং সামাজিকগণও তাঁহাদের সে দাবি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছেন না। এইজন্যই কবিবর দাশুরায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"পরিচয় দেন আমি কুলে, গন্ধ দেন নাই বকু ফুলে; আর কিছু দেখি না কুলে; কেবল দেমাকটি আছে কুলে।"

(গ) ব্যভিচারোৎপন্ন যে সকল ইতর লোক জাতিভ্রষ্ট হইয়া সমাজের

বর্জ্জনীয় ছিল, নিত্যানন্দ তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া জাতি দিয়া গিয়াছেন।

অতএব তাঁহাদের উপর এরূপ বৃথা দোষারোপ মহাপাতক বলিয়াই মনে হয়।

২। সেদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম, কলিকাতা বাগবাজারের কোন ধনাঢ্য কায়স্থের পুত্র, পাকা দেখা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আশীর্ব্বাদ করিলে, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়াছিল বলিয়া, তাহার পিতা সভাস্থলেই তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন। উক্ত কায়স্থপুঙ্গবের নামটি কেহই প্রকাশ করেন নাই।

দেখা যায়, এখনও বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, অতুলবিভবশালী, উচ্চপদস্থ বহু বৃদ্ধ ও যুবক কায়স্থ ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া এবং ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করেন। ব্রাহ্মণ মূর্খ, দরিদ্র বা কদাচারী—এ সকল বিচার না করিয়া "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" এইমাত্র জ্ঞানে তিনি সর্ব্বজনের প্রণম্য। গঙ্গাজল বিষ্ঠা, আবর্জ্জনা ও গলিত মৃতদেহ বহন করে, বর্ষাকালে কলুষিত হয়—সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল "ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্" বলিয়াই তাহাতে স্নান করিতে হয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ॥
শ্মশানেষ্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি।
হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্তন্তে সর্ব্বকর্ম্মসু।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ পরমং দৈবতং হি তৎ॥"

(৯।৩১৭—৩১৯)

যথাবিধি স্থাপিত হউক বা নাই হউক, অগ্নি যেমন পরম দেবতা, সেইরূপ বিদ্বানই হউন আর মূর্খই হউন, ব্রাহ্মণ পরম দেবতা। মহাতেজা অগ্নি মৃতদেহ দহন করিয়াও যেমন অপবিত্র হয় না,—তাহাই আবার যজ্ঞে আহুতি প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার কুৎসিত কার্য্য করিলেও ব্রাহ্মণ পরম দেবতা জানে সর্ব্বথা পূজনীয়।

স্বয়ং সদাচারী ও মহাপণ্ডিত হইলেও বিবেকাদি প্রণালাত্ত যাবতীয় কার্য্যে হিন্দুমাত্রকেই যে ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইতে হয়, যে ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা না লইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান—এমন কি, যথেচ্ছাচারের সমর্থনও—কেহ করিতে পারেন না, সেই ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ কদাচ শুভ লক্ষণ নহে।

পরাশর বলিয়াছেন—

"যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে দ্বিজাঃ॥"

যুগে যুগে যেরূপ ধর্ম্ম এবং যেরূপ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, তাহাকে তাহাদের নিন্দা করিবে না।

বৈদ্য প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণেরা যথেচ্ছাচারে ও শাস্ত্রবচনের অপব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে—সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে—যাইতেছেন না। শাস্ত্র ও সমাজই তাঁহাদিগকে আবহমানকাল সে গৌরব দিয়া রাখিয়াছেন। এখন সে সম্মান নষ্ট করিলে সমাজেরই কলঙ্ক।

৩। উপবীতধারী কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়, এবং অপর কায়স্থেরা শূদ্রই আছেন; অথচ উভয়ের মধ্যে বিবাহও দেখা যায়। ইহাই বা কোন্ রীতি? কলিতে অসবর্ণা-বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্তার্হ; এ সকলও কেহ বিচার করেন না।

৪। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্বয়ং কায়স্থ হইয়াও, নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যে বিশ্ববিখ্যাত "শব্দকল্পদ্রুম" অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি কায়স্থের শূদ্রত্বই স্বীকার করিয়াছেন।

শাস্ত্রপ্রামাণ্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলে তিনি স্বয়ং এ তাঁহার জ্ঞাতি ও বংশধরগণ নিশ্চিতই উপবীতধারণ, অশৌচপাল প্রভৃতি অবশ্য ক্ষত্রিয়োচিত বিধানেই করিতেন।

৫। অমরকোষে শূদ্রবর্গের মধ্যে বর্ণসঙ্করের পরিগণনে যে "শূদ্রা-বিশোস্তু করণঃ" (শূদ্রা ও বৈশ্যের সন্তান করণ) আছে, বৈদ্যজাতীয় ভরতমল্লিক তাহার টীকায় লিখিয়াছেন—"অয়ং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ।" কিন্তু এ অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কায়স্থ ঐরূপ নিকৃষ্ট বর্ণ-সঙ্কর হইলে প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের এত ঘনিষ্ঠতা ঘটিত না। অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য করণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর; তথাপি ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের এত মিশামিশি নাই, কায়স্থদিগের সঙ্গে যত। করণ ও কায়স্থ অভিন্ন হইলে, মেদিনী-কোষে করণ শব্দের অর্থে "কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রা-বিশোঃ সুতে" এরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকিত না।

৬। মনুসংহিতা, মহাভারত, অমরকোষ প্রভৃতি অধিকতর প্রামাণিক গ্রন্থে 'কায়স্থ' বলিয়া কোনও জাতির উল্লেখ নাই।

৭। এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরের মুখাদি অবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি যে চতুর্ব্বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে পাদজ শূদ্রই পরবর্ত্তী কালে কায়স্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই-জন্যই অর্ব্বাচীন মেদিনীকোষে "কায়স্থঃ পরমাত্মনি। নরজাতিবিশেষে না" উক্ত হইয়াছে। অথবা দেশান্তরে কায়স্থ বলিয়া যে জাতিবিশেষ আছে, তদুদ্দেশেই মেদিনী ঐরূপ বলিয়াছেন, এবং ভরতমল্লিক তাহা-দিগকেই বোধ হয় 'করণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণ তজ্জাতীয় নহেন; তাঁহারা প্রকৃত (অর্থাৎ অসঙ্কীর্ণ) শূদ্র। অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য প্রভৃতি দ্বিজবংশ্য হইলেও, বর্ণসঙ্করত্ব-দোষ বশতঃ কায়স্থ অপেক্ষা

নিকৃষ্ট। শাস্ত্রেও তাঁহারা অপসদ (অর্থাৎ নিকৃষ্ট) বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (মনু ১০।১০)।

৮। বঙ্গীয় কায়স্থদিগের পাঁচজন আদিপুরুষ আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ঘটক-কারিকায় আছে, আদিশূর তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

"কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।"

আমরা পাঁচজনও কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছি; আমরা শূদ্র এবং এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের দাস।

তার পর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন—

"স্বকৃতালিকুলাধর এষ কৃতী
ক্ষিতিদেবসদাযুজভাকসহিতঃ।
মকরন্দ ইতি প্রথিতাতি যতি-
র্বিধবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টপতিঃ।
স চ ঘোষকুলাম্বুজচারুরবিঃ
প্রথিতেন্দু[illegible]লোকবশঃ।"

এই মহামহিম মহাপুরুষের নাম মকরন্দ ঘোষ; ইনি বন্দ্যকুলোদ্ভব ভট্টনারায়ণের দাস—ইত্যাদি।

ইহাতে জানা যাইতেছে, বঙ্গদেশে প্রথম-আগমন-সময়ে কায়স্থগণ শূদ্রই ছিলেন। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি উপাধি কুত্রাপি নাই।

আদিশূরের বহুকাল পরে বল্লালসেন যখন তাঁহাদের বংশধরগণকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা শূদ্রই ছিলেন। যথা—

"বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
সপ্তবিংশতিঃ শূদ্রাণাং বল্লালেন প্রশংসিতা।"

(কায়স্থেরা যদি বাস্তবিকই ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পইতা ছাড়িয়াছিলেন কেন? এবং প্রবলপ্রতাপশালী বল্লাল যখন আদর করিয়া তাঁহাদিগকে কৌলীন্যসম্মান দিয়াছিলেন, তখনই বা তাঁহার নিকট আবদার করিয়া পইতা পাইবার দাবি করেন নাই কেন?)

বল্লালের ৪।৫ বৎসর পরে রঘুনন্দনের সময়েও তাঁহারা শূদ্র ছিলেন। রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—

"শূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিপদ্ধতিযুক্তনামত্বঞ্চ বোধ্যম্।"

রঘুনন্দনের পরেও প্রায় ৪৫০ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা শূদ্রই রহিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটককারিকাবলী বহুকাল যাবৎ বিবাহসভায় ঘটকেরা সুললিত সমস্বরে পাঠ করিতেন। ঘটকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উহা পাঠ না করাইলে, বিবাহের যেন অঙ্গহানি হইত (সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পদিন হইল সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে; ঘটকেরাও অগত্যা পুঁথিপত্র ফেলিয়া দিয়া চাষে বা কেরাণীগিরিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন)। তাহাতে শূদ্রত্বপরিচয়ে কোনও কায়স্থ কখনও আপত্তি করেন নাই। পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেদের জাতি জানিতেন না, আমরাই জানি—এ কথাটা কেমন-কেমন ঠেকে না কি?

৯। মনুসংহিতায় (৪।১৮৫) ও মহাভারতেও (শান্তি, ২৪২।২০) আছে—

"ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা, ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ।
ছায়া স্বো দাসবর্গশ্চ, দুহিতা কৃপণং পরম্।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য, পত্নী ও পুত্র নিজেরই শরীর, আপন দাসগণ ছায়াস্বরূপ এবং কন্যা পরম কৃপার পাত্র।

অতএব বোধ হয় প্রকৃত শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের দাস হইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহাদের কায়সংলগ্ন থাকিতেন বলিয়া ক্রমশঃ কায়স্থ নামে অভিহিত

নি[illegible]াছেন। অথবা কায় শব্দের অর্থ লক্ষ্য ও স্বভাব; যথা—"কায়ঃ [illegible]বতে মূর্ত্তৌ সংঘে লক্ষ্যস্বভাবয়োঃ" (মেদিনী)। যে কায়ে (লক্ষ্যে বা স্বভাবে) স্থির থাকে, সে কায়স্থ। বিপ্রসেবাই শূদ্রদিগের স্বভাব বা স্বধর্ম। মনু সামান্যতঃ দ্বিজসেবাই শূদ্রের ধর্ম বলিয়া (১।৯১), পরে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—

"বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাম্।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্মো নৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ॥
শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্মৃদুবাগনহংকৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে॥ (৯,৩৩৪,৩৩৫)

ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ঃ—"প্রাধান্যেন ব্রাহ্মণাশ্রয়ঃ, তদভাবে ক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্রয়োঽপি।" (টীকা)

"স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ।
জাতব্রাহ্মণশব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম কীর্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥"

(১০।১২২-১২৩)

বিপ্রসেবাই শূদ্রের পরম ধর্ম। ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করিবে। স্বর্গার্থ অথবা স্বর্গ ও জীবিকা এতদুভয়ার্থ ব্রাহ্মণেরই সেবা করিবে। ইহাই তাহার জন্মসাফল্যের কারণ; যেহেতু "ব্রাহ্মণের দাস" বলিয়া সেই ত প্রসিদ্ধ।

কায়স্থ ভিন্ন কোনও শূদ্রকেই যখন এতল্লক্ষণাক্রান্ত দেখা যায় না, অন্য কোনও শূদ্রই যখন ব্রাহ্মণের নিকট নাম বলিতে "দাস" শব্দ ব্যবহার করে না, অপর সমস্ত শূদ্রই যখন শাস্ত্রানুসারে বর্ণসঙ্করের অন্তর্গত,

কোনও প্রদেশেই শূদ্র নামে একটা পৃথক্‌ জাতির যখন অস্তিত্ব নাই, তখন কায়স্থই যে সেই ভগবৎপাদজ প্রকৃত শূদ্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেই পারে না।

বিষ্ণুসংহিতায় (৭ অঃ) ত্রিবিধ লেখ্যের (দলিলের) লক্ষণে আছে—

"রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।"

আদালতে রাজার নিযুক্ত কায়স্থের লিখিত ও তদধ্যক্ষের (রেজিষ্টারের) করচিহ্নিত লেখ্যকে রাজসাক্ষিক বলে।—সে স্থলে কায়স্থ বলিতে (লক্ষ্যে স্থির) মুহুরি বা সেরেস্তাদার।

ব্যাসসংহিতায় যে আছে—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্‌কিরাতকায়স্থ-মালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডাল-দাশশ্বপচকোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥"

সেখানে কায়স্থ বলিতে ঐ করণ জাতি (উহা রূঢ় শব্দ)।

মনুর মতে করণ জাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে তজ্জাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন। তাহার নামান্তর—ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, খস ও দ্রবিড় (১০।২২)। যাঁহারা কায়স্থকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলেন, তাঁহারা মনুর ঐ বচন এবং ভরতমল্লিকের উক্ত অমরটীকা অনুসারে বলেন কি না, জানি না। তাহা হইলে ঐরূপ অন্ত্যজ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হওয়া ভাল, কি খাঁটি শূদ্র হওয়া ভাল, তাহাও বিবেচ্য।

১০। মনু বলিয়াছেন—

"মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্‌কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ॥" (১।৮৭)

ব্রহ্মা স্বীয় মুখজ ব্রাহ্মণের, বাহুজ ক্ষত্রিয়ের, উরুজ বৈশ্যের এবং পাদজ শূদ্রের পৃথক্‌ পৃথক্‌ কর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

আদিপুরাণে আছে—

"শৌচাশৌচং প্রকুর্বীরন্ শূদ্রবদ্ বর্ণসঙ্করাঃ।"

প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্করেরা শূদ্রের ন্যায় শৌচাশৌচাদি কার্য্য করিবে। সে শূদ্র কে? আমরা বলি—সেই শূদ্রই কায়স্থ; ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদেরই শৌচাশৌচ কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্করেরা তাঁহাদের আচরণকেই আদর্শ করিয়া চলিতেছেন।

১১। পাইকপাড়ার রাজা ৺ইন্দ্রচন্দ্রের পত্নী রাণী মৃণালিনীর পোষ্যপুত্র গ্রহণের মোকদ্দমায় কলিকাতার হাইকোর্ট কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদবধিই তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন নরম পড়িয়াছে; এখন আর পইতা লইবার জন্য তাঁহাদের তত আগ্রহ দেখা যায় না, বরং অনেকে পইতা ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াছি।

১২। কায়স্থেরা খাঁটি শূদ্র না হইয়া বর্ণসঙ্কর হইলে, "শ্রুতিনিয়মগুরু" ও "নিঃশঙ্কশঙ্কর" মহারাজ বল্লালসেন শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কখনই তাঁহাদিগকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দিতেন না। কুলীন শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ—কুলস্থ (সদ্বংশস্থ) অপত্যম্ "কুলাৎ খঃ" (পাণিনি) কুল+খ (ঈন)=কুলীন; "মহাকুলকুলীনার্য্যসভ্যসজ্জন-সাধবঃ" (অমর) অর্থাৎ সদ্বংশজাতকেই কুলীন বলে। বর্ণসঙ্কর সদ্বংশ নহে। যদিও বল্লালের স্বকৃত নবধা কুললক্ষণ ছিল, তথাপি তিনি শাস্ত্রোক্ত কুলীন ভিন্ন অকুলীনের প্রতি উহার অপপ্রয়োগ করেন নাই। তৎকালে (এবং এখনও বটে) বঙ্গদেশে খাঁটি ক্ষত্রিয় ও খাঁটি বৈশ্য না থাকায় তিনি কেবল খাঁটি ব্রাহ্মণ ও খাঁটি শূদ্র কায়স্থগণকেই কুলীন করিয়া গিয়াছেন; বহু সদাচারী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বর্ণসঙ্কর থাকিলেও তাঁহাদের কাহাকেও কুলীন করেন নাই। তবে যে কুলজী গ্রন্থে বৈদ্যদিগের মধ্যে সেন, দাস গুপ্ত যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম কুলীন বলিয়া উক্ত

হইয়াছে, তাহাতে ঘটকগণের কৌশলই অনুমিত হয় (১ম পরিচ্ছেদে ১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। পরন্তু যদি বল্লালই ঐরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি জাতিতে বাস্তবিক বৈদ্য হইলে স্বজাতীয়তার অনুরোধে, নচেৎ বৈদ্যদিগের চিকিৎসা-ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন বলিতে হয়।

১৩। পাবনের পাবন, পরাৎ পর, পরমারাধ্য পরমেশ্বরের কোনও অঙ্গই অপবিত্র, অপকৃষ্ট ও অবজ্ঞেয় নহে। তাঁহার যে পদ হইতে উদ্ভূত হইয়া ভগবতী ভাগীরথী ত্রিপুরারিশিরশ্চারিণী ও ত্রিভুবনপাবনী হইয়াছেন, সেই পদ হইতেই উৎপন্ন শূদ্র নিকৃষ্ট নহে।

১৪। নিকৃষ্ট শূদ্রগণ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয় বলিয়া অনেক কায়স্থ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা ও স্বাবমাননা বোধ করেন; কিন্তু সেটা তাঁহাদের বুঝিবার ভ্রম। মনু বলিয়াছেন—

> "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
> চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" (১০।৪)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।

সুতরাং হিন্দু হইতে হইলে বর্ণধর্ম্ম পালন করিতেই হইবে। বর্ণধর্ম্ম পালন করিতে গেলে উক্ত মূল চতুর্ব্বর্ণের যে-কোনও এক বর্ণের অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য প্রাচীনকালে বর্ণসঙ্করজাত আদিম পুরুষগণের মধ্যে কেহ পিতৃধর্ম্ম, কেহ বা মাতৃধর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন; তাহাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, ও প্রকৃত বৈশ্যেরা স্বাবমাননা বোধ করেন না। সেইরূপ নিকৃষ্টজাতীয়েরা অগত্যা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত শূদ্র কায়স্থের তাহাতে স্বাবমাননা বোধ করা এবং সেই অভিমানে স্বকীয় জাতি ত্যাগ করিয়া

জাত্যন্তর গ্রহণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। টক আমকেও 'আম' বলে বলিয়া নেংড়া, বোম্বাই প্রভৃতির গৌরবহানি ও মূল্যহ্রাস হয় না এবং তাহারা আম্রত্বজাতিচ্যুতও হইতে পারে না।

[অতঃপর ৫ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার দ্রষ্টব্য]।

ইতি জাতিতত্ত্বে কায়স্থ-জাতিতত্ত্বনির্ণয় নামে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

যে সময়ে একদিকে কতকগুলি মহাত্মা "স্বার্থপর সমাজকণ্টক" ইত্যাদি বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া প্রশান্ত-মহাসাগরে নিমগ্ন করিবার ব্যবস্থা দিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই অন্যদিকে অনেকেই ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাকেই বলে "কালস্য কুটিলা গতিঃ।"

পরন্তু তাঁহারা এত কালের পর ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, আর বৈশ্যই হউন, "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ"—যতকাল সমাজবন্ধন থাকিবে, তাবৎকাল তত্তৎ শ্রেণীর সহিত কিছুতেই মিশিতে পারিবেন না; লাভের মধ্যে "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতির ন্যায় পৃথক্ দল বাঁধিয়া থাকিতে হইবে। অতএব তজ্জন্য অনর্থক অর্থনাশ, বুদ্ধিব্যয় ও সময়ব্যয় না করিয়া স্বদেশের বা স্বজাতির হিতকর কোনও কার্য্যে ঐ সকল ব্যয় করিলে সার্থক হইত।

কর্ণ বলিয়াছিলেন—"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্" উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ দৈবের অধীন, তাহাতে আমাদের

কোনও হাত নাই ; কিন্তু পুরুষকার নিজের অধীন অর্থাৎ যথোচিত চেষ্টা করিলে শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যা ধন মান যশ ইত্যাদি সকলেই অর্জ্জন করিতে পারে। এইজন্যই তিনি আপনাকে কুন্তীগর্ভজাত জানিয়া ও শুনিয়াও, এবং কুন্তী ও শ্রীকৃষ্ণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির প্রলোভন সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ত্বলাভের প্রয়াসী হন নাই ; সূত জাতিতে থাকিয়াই স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। "তে হি নো দিবসা গতাঃ" সে সব দিন গিয়াছে।

বাল্যকালে আমাকে যে চাণ্ডাল একদিন বলিয়াছিল—"দাদা ঠাকুর! দাঁড়াও, তোমার হাতে ফুল রয়েছে, আমার ছাই মাড়াবে।" সেই-ই এখন গা ঘেঁসিয়া চলে, বলে—"আপনারাও ব্রাহ্মণ, আমরাও ব্রাহ্মণ, এর মীমাংসা হয়ে গেছে।"

যাহাদের জাতিতত্ত্ব আলোচিত হইল, তাঁহারা যে সকল প্রমাণে আপনাদের জাত্যুৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন, সে সকল প্রমাণ তাহাদের কোনও অংশেই সমর্থক নহে, দেখাইয়াছি। এতদবস্থায় হিন্দুসমাজের এই অধঃপতনের—এই বিষম সঙ্কটের—সময়ে মানবজাতির আদিপুরুষ ভগবান্ মনুর—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥"

এই সারগর্ভ উপদেশ অনুসারে পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মমার্গে চলিয়া কর্ম্ম করাই সামাজিকগণের উভয়লোকে শ্রেয়স্কর মনে করি। নচেৎ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দাভাজন ও পতিত হইতে হইবে। এতদ্বিষয়ে কয়েকটিমাত্র প্রমাণ ও যুক্তি ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন করিতেছি।—

(১) "যোঽন্যথা সন্তমাত্মান-মন্যথা প্রতিভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ॥" (মনু ৪।২৫৫)

"যোঽন্যথা সন্তমাত্মান-মন্যথা প্রতিভাষতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥"
(মহা, আদি, ৭৪।২৭)

যে জাতিতে একরূপ হইয়া আপনার অন্যরূপ পরিচয় দেয়, সেই আত্মাপহারী চোর কোন্ পাপ না করে? অর্থাৎ তাহার মত পাপিষ্ঠ আর নাই।

(২) "অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামি চ পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীকনির্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া॥" (মনু ১১।৫৬)

"অনৃতবচনমুৎকর্ষে।.........ইত্যুপপাতকানি।
উপপাতকিনস্ত্বেতে কুর্য্যুশ্চান্দ্রায়ণং নরাঃ।
পরাকঞ্চ তথা কুর্য্যুর্যজেয়ুর্গোমখেন বা॥" (বিষ্ণু ৩৭ অঃ)

আত্মোৎকর্ষখ্যাপনের জন্য মিথ্যাকথন ব্রহ্মহত্যার সমান। উহার প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ এবং (দ্বাদশাহ উপবাসরূপ) পরাক ব্রত।

(৩) "তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥"
(মনু ৯।২২৪)

রাজা যজ্ঞসূত্রাদি-দ্বিজচিহ্নধারী শূদ্রদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন।

(৪) "যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥" (মনু ১০।৯৬)

যে জাতিতে অধম হইয়া উত্তম জাতির কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, রাজা তখনই তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া নির্ব্বাসন করিবেন।

(৫) "বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥" (মনু ১০।৯৭)

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" (গীতা ৩।৩৫)

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই (শাস্ত্রবিহিত স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মই) শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম জাতিচ্যুতিকর ও নরকজনক বলিয়া ভয়ঙ্কর।

(৬) "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥" (গীতা ১৬।২৩)

যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করে, সে সিদ্ধি, সুখ ও সদ্গতি প্রাপ্ত হয় না।

(৭) "ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাণামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ। তেষাং সংস্কারেপ্সবো ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি বচনাৎ॥" (পারস্করসূত্র)

ইহার ভাষ্যানুযায়ী সরলার্থ—

যে-কোনও কারণেই হউক, তিন পুরুষমাত্র উপনয়নসংস্কারবর্জ্জিত হইলে, তাহাদের সন্তানের উপনয়ন হইতে পারে; কিন্তু তাহার বেদাধ্যয়নে অধিকার হয় না। উক্ত তিন পুরুষের মধ্যে কেহ উপনয়নসংস্কারেচ্ছু হইলে ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ (কিম্বা তদনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত) করিয়া উপনীত ও বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইবে। পরন্তু চতুর্থাদি বহুপুরুষ উপনয়নসংস্কার বর্জ্জিত হইলে, তাহাদের সন্তানগণের (প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও) উপনয়ন হইতে পারে না।

(৮) প্রায়ই দেখা যায়, যাঁহারা দ্বিজত্ব লাভে প্রয়াসী, তাঁহারা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে—বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনের পর উপনীত হইয়া থাকেন। ইহা অশাস্ত্রীয়। যেহেতু কালাতীত হইলেও সংস্কারগুলি অনুক্রমে (যার পর যাহা, তদনুসারে) করাই শাস্ত্রের বিধান।

বিজত্বসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রের বচন দেখাইব, ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে শাস্ত্র মানিব না—ইহাই বা কোন্ যুক্তি ?

(৯) যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শূদ্র বা বৈশ্যধর্ম্মানুসারে ১মাস বা ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া পিত্রাদির আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যধর্ম্মানুসারে ১০, ১২ বা ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া তৎপরদিনে আদ্যশ্রাদ্ধ করিলে অকালে শ্রাদ্ধ করা হেতু, হয় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রেতত্বপরিহার ও সদ্গতি হয় নাই, নয় ত তাঁহাদেরই পিত্রাদির উহা হয় নাই, এতদুভয়ের একতর পক্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পুত্রকন্যাদির বিবাহাদি সংস্কারে তাঁহাদের নামোল্লেখে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে না।

(১০) হিন্দুর যথাবিধি নামকরণসংস্কার করিয়া যে নাম রক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদনুসারে যাঁহার পিতৃপিতামহাদির নাম অমুক ঘোষদাস বা অমুক গুপ্তভূতি ছিল, তিনি যদি এখন অমুক রায়বর্ম্মা বা অমুক সেনশর্ম্মা বলিয়া তাঁহাদিগকে জলপিণ্ড দান করেন, তাহা হইলে সেই জলপিণ্ড তাঁহাদের গ্রাহ্য ও ভোগ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অমুক ঘোষদাসের পুত্র অমুক দেবশর্ম্মা, বা অমুক দাসগুপ্তের পুত্র অমুক দাশশর্ম্মা, কিম্বা অমুক মাইতিদাসের পুত্র অমুক গুপ্তভূতি, অথবা অমুক যুগীর পুত্র অমুক যোগী বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে ধর্ম্মতঃ পিতার ভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, এবং লোকতঃ "রামু ঘোষের বেটা শিবু পাঁড়ে"র ন্যায় হাস্যাস্পদও হইতে হয়।

(১১) হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়, স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুসারে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইলেও, কোনও জাতি কাহারও ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র নহে। সমাজরক্ষার জন্য সকলেরই উপকারিতা, উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকায় প্রত্যেকেরই পরস্পরের প্রতি যথাসম্ভব স্নেহ, ভক্তি ও সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া উচিত ও স্বাভাবিক। হিন্দুসমাজে

এতাবৎকাল সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। এখন ইহার বিপর্য্যয় ঘটাইলে অর্থাৎ সকলেই স্বস্বপ্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া নিকৃষ্টবোধে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া উৎকৃষ্টবোধে পরধর্ম্ম গ্রহণের বৃথা চেষ্টা করিলে, এবং পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কেহ কাহাকেও না মানিলে, সমাজ ক্রমশ: বিকলাঙ্গ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া শেষে আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইবে।

(১২) শাস্ত্রের কদর্থ করিলে এবং স্বেচ্ছানুসারে পূর্ব্বপুরুষাচরিত চিরন্তন আচার পরিত্যাগ করিলেই জাত্যুৎকর্ষ লাভ করা যায় না। ইহজন্মে জাত্যুৎকর্ষ লাভের দুইটি মাত্র উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তপঃপ্রভাব ও বীজপ্রভাব। যথা মনু—

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ।" (১০।৪২)

তপঃপ্রভাবে বিশ্বামিত্রাদি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং বীজপ্রভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ বেদব্যাসাদি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এত কালের পর বৈদ্য প্রভৃতির কি তপঃপ্রভাব বা বীজপ্রভাব ঘটিল যে, তাঁহারা জাত্যুৎকর্ষ লাভের অধিকারী হইলেন?

(১৩) জাত্যুৎকর্ষ খ্যাপন করিলেই যে সম্মান বৃদ্ধি পাইবে এবং নিকৃষ্ট জাতিতে থাকিলে যে সম্মানের হানি হইবে, এরূপ মনে করা বাতুলতার পরিচায়ক। দেখা যায়, যে সকল কায়স্থ, বৈদ্য, কৈবর্ত্ত, শৌণ্ডিক, সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি সমাজে গণ্য মান্য ও যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় বিদ্যাবত্তা দানশৌণ্ডতাদি সদ্গুণেই সেইরূপ হইতে পারিয়াছেন; জাত্যুৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া হন নাই। ৺ সারদাচরণ মিত্র মহোদয় অসাধারণ প্রতিভাবলে যোগ্যতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ববিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং ওকালতি ও জজিয়তি করিয়া যে সম্মান লাভ

করিয়াছিলেন, পইতা লইয়া তদতিরিক্ত কোনও সম্মানই লাভ করিতে পারেন নাই, বরং নিন্দাভাজনই হইয়াছিলেন। সম্মান অসম্মান সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরাই বলিয়াছেন—

"জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পূজয়েৎ।
অপি শূদ্রঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং সদ্বৃত্তমভিপূজয়েৎ।"
(মহা, অনু, ৪৮।৪৮)

চরিত্রহীন ব্রাহ্মণকেও সম্মান করিবে না; পরন্তু সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক শূদ্রকেও সম্মান করিবে।

"অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণ-মার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি।" (মনু ১০।১৩)

শূদ্র ব্রাহ্মণের কার্য্য করিলে এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রের কার্য্য করিলে উভয়ে সমান নহে (অর্থাৎ তাদৃশ শূদ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণ জাতিতে শূদ্র হয় না), অথচ অসমানও নহে (অর্থাৎ তাদৃশ শূদ্র ব্রাহ্মণবৎ মান্য এবং তাদৃশব্রাহ্মণ শূদ্রবৎ অমান্য)। বিধাতা বিশেষ বিচার করিয়া এই কথা বলিয়াছেন।—ইত্যাদি।

যাঁহাদের জাতিতত্ত্ব আলোচিত হইল, তাঁহারা আত্মস্থানীয় বলিয়া, তাঁহাদের মতের সমর্থনপূর্ব্বক প্রীতিসাধনের উদ্দেশে, অথচ "প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ" (মিথ্যা করিয়া প্রিয় কথা বলিবে না) এই শাস্ত্রশাসনের অনুসরণে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের প্রিয় কথা বলিবার কোনও সূত্র না পাইয়া তদ্বিষয়ে হতাশ হইলাম। অতএব তাঁহাদের নিকট সানুনয় অনুরোধ, এই প্রবন্ধ দর্শন বা শ্রবণ মাত্রেই আমার উপর খড়্গহস্ত না হইয়া ক্ষণকালের জন্য স্বজাতিগত পক্ষপাত ভুলিয়া গিয়া, উদাসীন ভাবে ধীর ও স্থির চিত্তে ইহার সমালোচনা করিবেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—

"সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥"

প্রিয় বাক্য বলিবার লোক অনেকই পাওয়া যায়; কিন্তু হিতকর অপ্রিয় বাক্যের বক্তাও বিরল এবং শ্রোতাও বিরল।

অত্রৈব শিবম্। এতেনৈব সর্ব্বা জাতয়ো ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ (ইহা দ্বারাই সকল জাতির তত্ত্ব বলা হইল)।

এই জাতিতত্ত্বের আলোচনায় যে মহাশক্তির তত্ত্বানুশীলনে প্রয়াস পাইলাম—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা,—নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

ইতি জাতিতত্ত্বে উপসংহার নামে পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

জাতিতত্ত্ব সম্পূর্ণ

পইতা-মাহাত্ম্য

[কবিবর মহাশয়ের রচিত (রঙ্গপুরদর্পণে প্রকাশিত) এই উপাদের কবিতাটি এবং তাঁহার বাল্যকালে রচিত (অপ্রকাশিত) ২য় কবিতাটি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কায় এই পুস্তকের সহিত সংযোজিত করা হইল।—প্রকাশক]

হে পৈতে! তোমারে নমস্কার।
তুমি নবগুণ সূত, ত্রিদণ্ডীতে গ্রন্থিযুত,
অসংখ্যাত গুণের আধার।
অতি লঘু তৃণগুলো, তারে' চেয়ে লঘু তুলো,
তাহা হ'তে তোমার জনম।
কিন্তু থাক যার গলে, তারে এ জগতীতলে
কর তুমি গুরু—গুরুতর।

তোমা ধরি কেহ করে জপ।

কেহ খায় ভিক্ষা মেগে, কেহ শাপ দেয় রেগে,

কেহ খোলে মিঠায়ের "শপ্"।

কেহ বা গঙ্গার ঘাটে ছাপ দিয়ে কাল কাটে,

বাবুদের বাড়ী কেহ রাঁধে।

কেহ সিঁধ কাটে মেপে প্রবেশের দ্বার ব্যেপে,

সর্পাঘাত হ'লে তাগা বাঁধে। *

কেহ বেচে পাঁউরুটী, কেহ কালীঘাটে জুটি

যাত্রী ধরে সেজে মা'র পাণ্ডা।

কেহ বা হোটেল খুলে রাঁধে গঙ্গাজল তুলে

হিন্দুমতে মোরগীর আণ্ডা।

কেহ বেচে "চা গরম," কেহ বা আলুর দম,

ডিম চিংড়ি কাঁকড়ার চাট।

লোক যত তত সুর, তব গুণে বহুদূর!

লোকনেত্রে ভাসে বিরাট।

নিষ্ঠাবান্ যারা কলিকালে,

তোমারে ধরিয়া গলে তারা কত সুকৌশলে

সনাতন জাতি ধর্ম পালে।—

---

* "শর্বিলকঃ—যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যং, বিশেষতোঽস্মদ্বিধস্য: কুতঃ—

এতেন মাপয়তি ভিত্তিষু কর্মমার্গম্,

এতেন মোচয়তি ভূষণসম্প্রয়োগান্।

উদ্ঘাটকো ভবতি যন্ত্রদৃঢ়ে কপাটে,

দষ্টস্য কীটভুজগৈঃ পরিবেষ্টনঞ্চ॥" (মৃচ্ছকটিক নাটক)

কেহ খায় গুড় ছানা, চিনি দিতে করে মানা,
আতপ্ত ক্ষীরেতে কিন্তু রুচি।
শাস্ত্রের বচন তায়— গোকুলে কন্দুশালায়
অমীমাংস্য শুচি বা অশুচি॥ *
উইল্‌সনের বাড়ী কারো বা চড়ানো হাঁড়ী,
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেয় খানা।
একে ত সমাজপতি, তায় ধর্ম্মে আঁট অতি,
তাই তাঁর খুঁটিনাটি নানা॥
যে গেলাসে খেয়ে তাড়ি রেখে দেয় নিধে হাড়ি,
তাই নিয়ে স্মৃতিরত্ন-নাতি।
বলে—বেটা কোন্ ধারে মুখ দিয়েছিলি হাঁরে?
ফিরাইয়া খেয়ে রাখি জাতি॥
কেহ বলে—বৃথা ভার বহিতে না পারি আর,
ফেলে দেয় তোমা' দূরে টেনে।
কোনো পুরুষেতে যার ধারে না তোমার ধার,
গলে পরে সে কুড়ায়ে এনে॥—
যেমন বয়াটে ছেলে মা-বাপের ধন পেলে,
মুটো-মুটো দেয় ছড়াইয়া।
মোসাহেব সেজে ছলে বাস্তুঘুঘুদের দলে
দুই হাতে লয় কুড়াইয়া॥
দেবদ্বিজে এক পাই দান যার দেখি নাই,
সেও তোমা পাইবার তরে।

---

* "গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি বালবৃদ্ধাতুরেষু চ॥" (স্মৃতি)

সই নিতে ব্যবস্থায়　　অধ্যাপকদের পায়
　　অর্থরাশি ঢালে অকাতরে।
না করুক সন্ধ্যাহ্নিক,　　চটুক পামরাধিক,
　　তব গুণে লভে নমস্কার।
বেদে অধিকার পায়,　　অশৌচ কমিয়া যায়,
　　তাই এত আদর তোমায়।
সিকি পয়সার সূত !　　ধর গুণ কি অদ্ভুত !!
　　কার শক্তি তোমার সমান ?
আছে তারে-তারে তব　　প্রণব প্রভৃতি নব
　　দেবতা সতত বিদ্যমান। *
কারো ব্রাহ্মণের প্রতি　　যদি হয় ক্রোধ অতি
　　কভু কোনো কুকার্য্য দেখিয়া।
সেও দেখি কয় রুখে—　　পইতা খুলিয়া মুখে
　　জুড়াইব সাধ মিটাইয়া।
　ইথে এই বুঝিতেছি সার।—
বিপ্রকুলে জন্ম জন্য　　ব্রাহ্মণত্ব নহে গণ্য,
　　তুমি পৈতে ! তার মূলাধার।
আগে ব্রাহ্মণীর হাতে　　আপনার মুখ হ'তে
　　বাহিরিতে কতই যতনে।
এখন অনা'সে "মিলে"　　বাহির করিছে "নীলে"
　　হাড়ি মুচি ডোমের নন্দনে।
বেদাদিতে করি দৃষ্টি—　　তোমার প্রথম সৃষ্টি
　　ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হৈতে †।

---

* "ওঙ্কারঃ প্রণবস্তত্র তদন্তর্গা বিবেবহঃ।" ইত্যাদি (পুরাণসংগ্রহ)।

† "ব্রহ্মণোহংশাধিকং সূত্রং বিষ্ণুনা ত্রিগুণীকৃতম্।
রুদ্রেণ চ কৃতো গ্রন্থিঃ সাবিত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।" (গৃহ্যসংগ্রহ)

এবে তাঁরা হতমান, তোমারো বাড়িছে স্থান;
ধন্য তুমি ধরাধামে পৈতে !!

ঘুঁড়ি ! *

এই যে উঠিতেছিলে ধীরে ধীরে।
মৃদুল মধুর মলয়-সমীরে।
কারেও না গণি, কারেও না মানি।
আপন গৌরবে হয়ে অভিমানী।
বিমল আকাশে, মনের উল্লাসে।
ভেবেছিলে—যাব ত্রিদশের বাসে।
এ কি পরমাদ, কে সাধিল বাদ।
অকস্মাৎ শুনি অশনি-নিনাদ।
উঠিল পশ্চিমে কাল নব ঘন।
নিমেষের মাঝে ছাইল গগন।
সবেগে বহিল প্রবল বাতাস।
লুটাইয়া পড়ি হইলে হতাশ।

"অতি বা'ড় হ'লে পড়িতেই হয়"—
সত্য এ প্রবাদ, জানিনু নিশ্চয়।

---

* কবিবর মহাশয় বাল্যকালে (৭ হইতে ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) মাতুলালয়ে থাকিয়া তাঁহার মাতুলের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। সেই অবস্থাতেই তিনি মুখে-মুখে সদ্ভাবপূর্ণ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তৎকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত "পদ্যমুক্তাবলী" পণ্ডিতগণের আগ্রহে তাঁহার মাতুল ছাপাইয়াছিলেন। সেখানে চড়কের সময় বড়-বড় ঘুঁড়ি উড়াইবার প্রতিযোগিতা হইত (এখনও বোধ হয় হইয়া থাকে), তন্মধ্যে একখানি ঘুঁড়ির তৎকালিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাতামহসম্পর্কীয় একজনের আদেশে ইহা তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়াছিলেন।

প্রতিবাদ ও উত্তর।

মাসিক বসুমতীর (১৩৩২) মাঘ-সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ভবতারণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন কৃত "জাতিতত্ত্বের প্রতিবাদ" বাহির হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি হইতে প্রচারিত বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকার অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোরত্ন কৃত "জাতিব্রাহ্মণের বৈদ্যবিদ্বেষ" নামে একটি প্রতিবাদও আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আরও কয়েকখানি পত্রিকায় প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে—অন্যের নিকট হইতে দেখিয়াছি। সকলগুলিই কার্ত্তিক-সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম অংশের প্রতিবাদ। সকল গুলিতেই প্রায় আমাকে অব্রাহ্মণ, গণ্ডমূর্খ, দুর্ব্বুদ্ধি, কূপমণ্ডূক ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে, এবং অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপও আছে। কেহ কেহ আমার চরিত্র সমালোচনেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐরূপ নিন্দাবাদে বা অযথাকথনে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নহি; যেহেতু ভগবানের উপদেশ—তাঁহার প্রীতি সাধন করিতে হইলে "হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী" ইত্যাদিরূপ হইতে হয়। ঐরূপ আচরণে প্রতিবাদকারীদিগের অসভ্যতা, বিদ্বেষ ও আত্মপ্রসাদ প্রকটিত হইতেছে বটে; কিন্তু আমি অব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইলেও বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব কিছুতেই সিদ্ধ হইতেছে না ও হইবেও না, ইহাই দুঃখের বিষয়। কেহ কেহ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করার দোষে আমাকেই অপরাধী করিয়াছেন; অপব্যাখ্যা করায় কে অপরাধী, তাহা ত পাঠকগণ বুঝিতেছেন। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া বৈদ্যেরাও যে এখন না বুঝিতেছেন তাহা নহে; তথাপি তাঁহাদের ঐরূপ প্রতিবাদ করা—"ঢাকরে ভেঙ্গেছে হাঁড়ী," তাই "মুণ্ডমালার ঝাড়-ঝাটী।"

একজন বৈদ্য লিখিয়াছেন—"জাতিতত্ত্বের লেখক যখন ভীমরুলের চাকে আঘাত করিয়াছে, তখন তাহাকে প্রত্যেক ভীমরুলের দংশনজ্বালা ভোগ করিতেই হইবে।" পরন্তু উহার প্রতিষেধক বহু প্রক্রিয়া থাকায় তজ্জন্য আমি চিন্তান্বিত নহি। আমার চিন্তা এই যে, ভীমরুলদিগের এত কাল ধরিয়া এত যত্নে নির্ম্মিত এত সাধের প্রকাণ্ড চক্র এ গণ্ডমূর্খের দণ্ডাঘাতে অকাণ্ডে বিখণ্ডিত হওয়ায়, তাহারা কত কালে ও কিরূপে উহার পুনর্নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে।

যদিও আমি প্রবন্ধের প্রারম্ভে লিখিয়াছি—আমার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ না হইলে কেহ প্রতিবাদ করিবেন না, এবং অসার প্রতিবাদের উত্তর আমি দিব না, তথাপি তাঁহারা ততটা সময় অপেক্ষা করিতে না পারিয়া যখন প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন অগত্যা আমাকে তাঁহাদের সম্মান রক্ষার্থ সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল। তৎপূর্ব্বে একটা কথা বলা উচিত, তাঁহারা যদি "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্" এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া এতটা অধীর না হইতেন, তাহা হইলে ঐরূপ অসার প্রতিবাদ করিয়া সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন না, এবং আমাকেও এ বৃথা পরিশ্রম করিতে হইত না।

বিদ্যারত্নের প্রতিবাদ।

১। বৈদ্যেরা কোনও স্থলেই ব্রাহ্মণ জাতির বা প্রকৃত ব্রাহ্মণের অপমান বা কুৎসা রটনা করেন না...।

উত্তর—বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণদিগের কুৎসা রটনা করেন না শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু বৈদ্যপ্রবোধনীতে (৩ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে—"দ্বিজাতিদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ" এবং "বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী" ইত্যাদি,—এ সকল কথা কি ব্রাহ্মণজাতির বা প্রকৃত ব্রাহ্মণের অপমানসূচক নহে? মহা-

ভারতের যে দুইটি শ্লোকাংশ তুলিয়া ঐরূপ অপব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা মূল প্রবন্ধের ৫ নম্বরে দেখুন।

ভট্টাচার্য্য উপাধি দেখিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়কে প্রথমে ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু বৈদ্যপ্রবোধনীর ঐরূপ উক্তিতে তিনি স্বাবমাননা বোধ না করিয়া তৎপক্ষাবলম্বনে আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করায়, এখন মনে হইতেছে—তিনি বৈদ্য (বৈদ্যপ্রবোধনীতে বৈদ্যদিগের ভট্টাচার্য্য উপাধিও উল্লিখিত হইয়াছে—৭ পৃঃ); অথবা তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও অযত্নলব্ধ স্বীয় কৃতিত্ব খ্যাপন করিবার জন্য কোনও বৈদ্যের লিখিত ঐ প্রতিবাদে অবিচারে নিজ নাম সাক্ষর করিয়া ধন্যাস্মন্য হইয়াছেন; কিম্বা কোনও বৈদ্যই ঐরূপ প্রতিবাদ লিখিয়া প্রবোধনী-লেখকের ন্যায় নিজ নাম প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া ঐ কল্পিত নামটি বসাইয়া দিয়াছেন।

বৈদ্যপ্রবোধনীতে বৈদ্যগণকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য বলা হইলেও বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রবোধনী-লেখকের প্রতিনিধি হইয়া এখন ব্রাহ্মণ-জাতিকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া সে সুর বদলাইয়াছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না।

২। বিদ্যাবারিধি মহাশয় প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন "অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য"......। অথচ বৈদ্যকে "অতি নিকৃষ্ট জাতি" বলিয়াছেন।

উঃ—"অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য" নাম দিয়াছি, ইহা বিদ্যারত্ন মহাশয় কিরূপ চক্ষে দেখিয়াছেন? আমি ত "অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য" এইরূপ নাম দিয়াছি। বৈদ্যপ্রবোধনীতে (২২ পৃঃ) "বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠজাতীয় নহেন" ইত্যাদি লিখিত হওয়ায় বৈদ্য জাতির শাস্ত্রোক্ত লক্ষণই দেখাইয়াছি।

৩। লেখক কটিদেশে উপবীতধারী বৈদ্য কোথায় দেখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই...।

উঃ—৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যগণকে কোমরে পইতা রাখিতে, কেবল আমি নহি—সকলেই সর্ব্বত্র দেখিয়াছেন বলিয়া অনাবশ্যক বোধে কোথায় দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করি নাই। অবিহিত হইলেও, তাঁহারা কটিদেশে কেন উপবীত রাখিতেন, তাহা ১১ নম্বরে বলিয়াছি।

৪। বৈদ্য জাতির আভ্যন্তরীণ সমাজসংস্কার ও উন্নতিতে ব্রাহ্মণ জাতির কোনও ক্ষতি আছে কি?

উঃ—কোনও ক্ষতিই থাকিত না, যদি তাঁহারা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে "ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী" না বলিয়া, অন্য উপায়ে আপনাদিগের সমাজসংস্কারে ও উন্নতিসাধনে সযত্ন হইতেন। তাহার উপর ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈদ্যদিগের পুরোহিত-যজমান ও গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ চিরপ্রচলিত; এক্ষণে বৈদ্যগণ একাদশাহে শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধে পক্বান্ন ব্যবহার, শর্ম্মান্ত নামের প্রয়োগ ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে থাকায় অগত্যা ঐ সকল শিষ্য-যজমানকে পরিত্যাগ করিতে হইতেছে বলিয়া ব্রাহ্মণ জাতির ক্ষতি হইতেছে বৈ কি। তাঁহারা যে সকল প্রমাণের বলে আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাদের একটাও তদ্বিষয়ে অনুকূল নহে। কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া যদি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করিবেন না, বরং পরম আনন্দিতই হইবেন।

৫। মনু কোথাও বলেন নাই যে, অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর। অনুলোম-বিবাহজাত সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলা যায় না। মনুবচনে স্পষ্ট আছে—"ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্……।" মোট কথা, অবৈধ সন্তানই বর্ণসঙ্কর বা বর্ণনিকৃষ্ট (সঙ্কর = নিকৃষ্ট, মিশ্রণ নহে)।

উঃ—তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২ নম্বরে ইহার উত্তর এবং "ব্যভিচারেণ বর্ণানাং" ইহার প্রকৃত অর্থ দেখুন।

"মনু অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর কোথাও বলেন নাই" ইহা কি বিভারত্ন মহাশয়ের উপযুক্ত কথা হইয়াছে? অসবর্ণ-স্ত্রীপুংসজাত সন্তান যে বর্ণসঙ্কর, এ কথা বলিবার প্রয়োজন না থাকিলেও মনু স্পষ্ট করিয়া "ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" হইতে "নিষাদস্ত্রী তু চণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্" পর্য্যন্ত বলিয়া, তৎপরে বলিয়াছেন—"সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ" বর্ণসঙ্কর বিষয়ে মাতাপিতার নির্দ্দেশপূর্ব্বক এই সকল জাতি বলা হইল (১০।৮—৪০)।

এ স্থলে আর একটা কথাও বক্তব্য—বৈদ্যহিতৈষিণী প্রভৃতির সংবাদে দেখা যায়, এক্ষণে অনেক বৈদ্যসন্তান প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তাঁহাদের পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ উপনয়নসংস্কারবর্জ্জিত ছিলেন; সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে "ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্" ইত্যাদি মনুবচনটিকে বর্ণসঙ্করের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও বহু অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব সুপ্রতিপন্নই হইতেছে—"স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।"

সঙ্কর শব্দের অর্থ যে নিকৃষ্ট, তাহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? সঙ্কর শব্দ বিশেষ্য, নিকৃষ্ট শব্দ বিশেষণ; সুতরাং সঙ্করের অর্থ 'নিকৃষ্ট' হইতেই পারে না, ইহা বালকেরাও জানে। অবৈধ সন্তানই যদি বর্ণনিকৃষ্ট, তবে মনু অনুলোমজাত অম্বষ্ঠাদি বৈধ সন্তানদিগকে অপসদ (নিকৃষ্ট), এবং বিলোমজাত সূতাদি অবৈধ সন্তানদিগকে অপধ্বংসজ (অধম) বলিয়াছেন কেন? (১০।১০ ও ৪৬)।

৬। (বিশ+ষ্ণ = বৈশ্য ও বেদ+ষ্য = বৈদ্য) এ স্থলে দুইটি মত উল্লিখিত হইয়াছে; একটি পাণিনির মত, অপরটি অন্য ব্যাকরণের মত। ষ্ণ ও ষ্য প্রত্যয় পাণিনির ব্যাকরণে নাই, তাহাও কি সমালোচকের জানা নাই?

উঃ—জানা না থাকার কি পরিচয় পাইলেন? প্রবোধনী-লেখক "মতান্তরে বেদ+ষ্য=বৈদ্য" লিখিয়াছেন বলিয়া আমি লিখিয়াছি—"উক্ত অর্থে ষ্য প্রত্যয়ের সূত্র নাই।" কোন্ অন্য ব্যাকরণের মতে বেদ+ষ্য=বৈদ্য হয় বলুন ত?

৭। বিদ্যাবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন—"বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যায়ীকে বৈদ্য বলে, এমন কথা কোনও শাস্ত্রে নাই।" যে বাক্যটি দেখিয়া বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের পিত্ত চটিয়াছে, সেই মহাভারতের বাক্য—"দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।" কালীসিংহের মহাভারতে বিশজন পণ্ডিত উহার অনুবাদ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ।" যে কোন সংস্কৃত অভিধান খুঁজিয়া দেখুন, বৈদ্য শব্দের বেদজ্ঞ বা পণ্ডিত অর্থের সহিত চিকিৎসক অর্থ পাশাপাশি রহিয়াছে।......শব্দকল্পদ্রুম কি বলিতেছেন দেখুন, "বৈদ্যঃ পণ্ডিতঃ। যথা কাত্যায়নঃ—নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কচিৎ।" যাহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি (পণ্ডা+ইতচ্) আছে, সেই ত পণ্ডিত?

উঃ—নীলকণ্ঠের টীকায় আছে "বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ (৫নং দেখুন)। মহাভারতের অনুবাদক বিশজন কেন—শতাধিক পণ্ডিত অপেক্ষাও নীলকণ্ঠের প্রামাণ্য যে অধিক, তাহাও কি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে? কালীসিংহের অনুবাদ এবং শব্দকল্পদ্রুমের অর্থই যদি অধিকতর প্রমাণ হয়, তাহা হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয় একচক্ষু হইয়া, বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের জন্য প্রবোধনীলেখকের কৃত উক্ত মহাভারতীয় বাক্যের "দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ" এই অনুবাদ এবং উক্ত কাত্যায়নবচনের "বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান করিবেন না" এইরূপ ব্যাখ্যায় (৫নং দেখুন) দোষদর্শী না হইয়া আমার লেখাতেই খড়্গহস্ত হইয়াছেন কেন?

অমরকোষাদি কোন্ সংস্কৃত অভিধানে বৈদ্য শব্দের বেদজ্ঞ বা পণ্ডিত

ও চিকিৎসক অর্থ পাশাপাশি রহিয়াছে? বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত অভিধান "শব্দকল্পদ্রুমে"ও ত বৈদ্য শব্দের অর্থ 'পণ্ডিত'ই আছে, বেদজ্ঞ নাই। তদুদ্ধৃত কাত্যায়নবচনটি মাত্র তুলিয়াই বিদ্যারত্ন মহাশয় হাত গুটাইয়াছেন কেন? উহার পরেই আছে—"বৈদ্যেন বিদুষা ইতি দায়তত্ত্বম্।" অর্থাৎ কাত্যায়নবচনস্থ বৈদ্য শব্দের অর্থ বিদ্বান্ (কাত্যায়নবচনের বিশদ ব্যাখ্যা ৫ নম্বরে দেখুন)। ৬ নম্বরে আমি বৈদ্যশব্দের বহু প্রয়োগ ও টীকা উদ্ধৃত করিয়াছি। কোনও টীকাকারই কুত্রাপি বৈদ্যশব্দের 'বেদজ্ঞ' অর্থ করেন নাই।

পণ্ডা শব্দের অর্থ 'বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি' এবং পণ্ডিত শব্দের অর্থ 'বেদজ্ঞ' কোনও অভিধানে এবং অন্য কোনও শাস্ত্রে কেহ দেখাইতে পারেন কি? পণ্ডিত ও বেদজ্ঞ একার্থক হইলে অমর বিদ্বৎপর্য্যায়ে পণ্ডিত ধরিয়া বেদজ্ঞ পর্য্যায়ে—"শ্রোত্রিয়শ্ছান্দসৌ সমৌ" পৃথক্ উল্লেখ করিতেন না। শব্দ-সংগ্রহকারক শব্দকল্পদ্রুমেও দেখা যায়—

পণ্ডা বুদ্ধিঃ ইতি মেদিনী। তত্ত্বানুগা বুদ্ধিঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ। **পণ্ডিতঃ** পণ্ডা বুদ্ধিঃ সা জাতা অস্য। শাস্ত্রজ্ঞঃ। ...যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ ইতি মহাভারতে বনপর্ব্ব।... শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্। তৎপর্য্যায়ঃ—বিদ্বান্ বিপশ্চিৎ... ইত্যমরঃ। বিধিজ্ঞঃ দূরদৃক্ বেদী...ইতি শব্দরত্নাবলী। বিজ্ঞঃ মেধাবী ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।" এতাবতা শব্দকল্পদ্রুম 'বিদ্বান্' অর্থেই বৈদ্য শব্দের অর্থ 'পণ্ডিত' লিখিয়াছেন; 'বেদজ্ঞ' অর্থে লিখেন নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

বিদ্যারত্ন মহাশয় বেদীর অর্থটি যেন বেদজ্ঞ মনে না করেন; যেহেতু শব্দকল্পদ্রুমেই আছে—"**বেদী** পণ্ডিতঃ। ব্রহ্ম ইতি কেচিৎ। জানাতি। সকলেই জানেন, বেদ ভিন্ন বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহাকে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত বলা যায়।

উদ্ধৃত প্রমাণাবলী দ্বারা দেখা যাইতেছে, পণ্ডা শব্দের অর্থ কেবলই বুদ্ধি (জ্ঞান)। পাণিনীয় উণাদিবৃত্তিতেও আছে—"পণ্ডা বুদ্ধিঃ।" যাহার বেদ, স্মৃতি, তর্ক, কাব্য প্রভৃতি কোনও একটা শাস্ত্রে জ্ঞান থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে হইলেই পণ্ডিত শব্দের ব্যুৎপত্তিতে পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ, স্মৃত্যুজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ, তর্কোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ বা কাব্যোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ ইত্যাদিরূপ বলিতে হয়।

৮। মহাভারতে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" এই ঋষিবাক্য শুনিয়াও বিদ্যাবারিধি মহাশয় বিচলিত হইয়াছেন।

উঃ—বিচলিত হইয়াছি বটে, কিন্তু ঐ ঋষিবাক্য শুনিয়া ও দেখিয়া হই নাই; যেহেতু উহার প্রকৃত অর্থ ৫ নম্বরে দেখাইয়াছি। প্রবোধনী-লেখক উহার অপব্যাখ্যা করিয়া অসঙ্কোচে তাহা প্রচার ও তদ্দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করায়, এবং বিদ্যারত্ন মহাশয় কালীসিংহের অনুবাদকেই প্রমাণ বলায়, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যদর্শনে বিচলিত হইয়াছি।

শিরোরত্নের প্রতিবাদ

[পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদের উত্তরে যে সকল কথা বলিয়াছি, ইহাতে সেগুলির পুনরুক্তি করিব না]

১। রত্নগর্ভ বারিধি মহাশয়ের এই আলোচনারত্ন দেখিয়াও অনেকে অবজ্ঞাভরে বলিতেছেন—"বড় মোগল-পাঠান হদ্দ হ'ল ফার্সি পড়ায় তাঁতি!" কত কত মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তপণ্ডিত যে সকল প্রমাণ অশাস্ত্রীয় বা অযুক্তিযুক্ত বলিতে পারেন নাই, তাহাই আজ বিদ্বেষান্ধ বারিধি অপ্রামাণ্য বলিতেছেন। বারিধির বিদ্যাবারি ঈর্ষাবিদ্বেষের পঙ্কর্দ্দম দ্বারা পঙ্কিল কিংবা 'অন্ত কোন কিছু' গুরুদ্রব্য ক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত না হইলে তাঁহার অন্তরেও ঐরূপ ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি কখনও হইত না।

উঃ—যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য বিশ্বামিত্র, মতঙ্গ প্রভৃতিকে কত কাল ধরিয়া কত কঠোর তপস্যা করিয়াও কৃতকার্য্য ও অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে, গোটা কতক অযথার্থ বচন তুলিয়া যাঁহারা অনায়াসে সেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তাঁতিকে কাসি পরাইতে দেখিয়া তাঁহাদের উপহাস করা শোভা পায় না। (স্বার্থপণ্ডিত ভিন্ন) কোন্ কোন্ মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তপণ্ডিত ঐ সকল বচনকে অশাস্ত্রীয় ও অযুক্তিযুক্ত বলিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নাম প্রকাশ করুন দেখি। আমি বিদ্বেষান্ধ হইয়া এ প্রবন্ধ লিখি নাই (৩২ পৃঃ ২০ পং); বৈদ্য প্রভৃতির ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্যই লিখিয়াছি। শিরোরত্ন মহাশয় আমাকে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে যে রূপক খাটাইয়াছেন, তাহাতে অবশ্য বর্ণনায় তিনি নিজেই সাধারণের উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। যেহেতু বারিধিতে পঙ্কর্দ্দমের সম্ভাবনা নাই, বারিধির বারি কিছুতেই পঙ্কিল হয় না, গুরুদ্রব্যাক্ষেপেও উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে না, এবং তজ্জন্য তাহাতে ঘূর্ণাবর্ত্তও ঘটে না।

আমাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"কালসর্পের বিষদন্ত ভগ্ন হইলে, আবার কালান্তরে যেমন তাহা পুনরুদ্গত হয়, তাঁহার কখনও সে আশা পূর্ণ হইবে কি?"

যে ভগ্নবিষদন্ত কালসর্পের নির্বিষ দন্তের সামান্য আঁচড়েই সমস্ত বৈদ্যের মস্তিষ্কে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত ও গাত্রদাহ উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহারা প্রলাপ বকিতেছেন, তাহার বিষদন্তের পুনরুদ্গমনে এখনও অবিশ্বাস করা চৈতন্য-লোপেরই লক্ষণ।

২। শুনিয়াছি, ঐ বারিধি তাঁহার অবিকৃত চিত্তের অবস্থায় 'আহ্নিকতত্ত্ব' লিখিয়া, সেই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে বৈদ্যের জন্য বৈশ্যাশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নিজের ব্যবস্থা নহে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া

আসিতেছেন। তাহার অনুসরণে নিজের বাহাদুরি নাই ভাবিয়াই বোধ হয় তিনি ধন্য পুরুষ হইবার অভিপ্রায়ে 'একটা নূতন কিছু' করায় দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। কিন্তু দুইটি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া, নিজের মর্য্যাদা কতটা ক্ষুন্ন করিয়াছেন তাহাও যাঁহার বুঝিবার শক্তি নাই, তাঁহার এরূপ দুঃসাহস কেন ?

উঃ—'আহ্নিকতত্ত্ব' নহে, "আহ্নিককৃত্য" এবং প্রথম সংস্করণেও নহে, পঞ্চম সংস্করণ হইতে উপর্য্যুপরি কয়েকটি সংস্করণের উপক্রমণিকায় বৈদ্যকে চিরপ্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠ জানিয়াই তাহাদের বৈশ্যাচার লিখিয়াছিলাম। —কিন্তু মূল গ্রন্থের আকার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকায় উপক্রমণিকার অনেক অংশ পরিত্যক্ত হওয়ায় তৎসঙ্গে উহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। "জাতিতত্ত্বে"ও সে কথার অপলাপ করি নাই (পৃঃ ১৪ নং)। বৈদ্যপ্রবোধনীতে (২২ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে—"বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠজাতীয় নহেন" ইত্যাদি। এইজন্যই তাহার লেখা প্রমাণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে বৈদ্যকে শূদ্রধর্ম্মা বলিতে (দুঃসাহসী নহি) সৎসাহসীই হইয়াছি।

৩। বৈদ্যকে 'বেদে' বলিয়া তিনি যেরূপ মিথ্যা গালাগালি করিয়াছেন, বৈদ্যগণের পক্ষেও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের 'কুলের কথা' প্রচারই বোধ হয় তাহার প্রকৃত উত্তর।

উঃ—আমি বৈদ্যকে 'বেদে' বলি নাই এবং মিথ্যা গালাগালিও করি নাই। শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাই লিখিয়াছি (৯পৃঃ ১৬নং)। এত কালের পর "কুলের কথা" বলিয়া দিবার ভয়ে "প্যারী! ব'লে দিব তোর কুলের কথা এই শ্যাম রায়ের কাছে" বলিয়া গান ধরায় প্যারীমোহন বিদ্যালঙ্কার কীর্ত্তনীয়াদিগকে যেরূপ পুরস্কার দিয়াছিলেন, কোনও রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৈদ্যদিগকে সেরূপ বা অন্য কোনরূপ পুরস্কার দিবেন কি না, জানি না।

জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিমত

প্রদান করিবার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট

প্রার্থনা—

সুধীবরাঃ প্রেষিতমেতদস্ত, যত্ "জাতিতত্ত্বং" কৃপয়া সমীক্ষ্য ।
বিচারিতে জাতিচতুষ্টয়েঽস্মিন্ শাস্ত্রপ্রমাণং স্বমতং প্রদেয়ম্ ।
প্রবৃত্ত-সামাজিকবিপ্লবানাং নিবারণে ধর্মসুরক্ষণে চ ।
জানে প্রমাণং ভগবতীহ সাক্ষাদ্-ব্রহ্মণ্যদেবাংশভবা ভবন্তঃ । ইতি

৮০নং মিশির পোখরা
বেনারস সিটি
২০শে বৈশাখ, ১৩৩৩

বিনয়াবনতস্য
শ্রীসারদাপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ
(প্রকাশকস্য)

কাশী-পণ্ডিতসমাজের অভিমতপত্র হইতে ।)

(१)

श्रीश्रीविश्वनाथो विजयते ।

(सौरवैशाखस्य २५ । शकाब्दाः १८४८)

श्रीमाधवचेन कृतं कविरत्नोपाधिना समीक्ष्येदम् ।
कृतमपि "जातितत्त्व" परमं सन्तोषमापाम: वयं ।
शिष्टकुलपरम्परया चिरतरकालं प्रवृत्त आचार: ।
अनुसरति शास्त्रजातं—मतमिदमुपपादितं तत्र ।

कलिकालकलुष[illegible]मग्नाः [illegible]येण कल्पनाकुशलाः ।
अनृतोत्कर्षमयुक्तं कुर्व्वन्तो ये प्रगल्भन्ते ॥
तेषां हिताय विहितो न च मात्सर्य्यान्न चान्यदुर्भावात् ।
धर्म्म्यं सत्सिद्धान्तं बोधयति बुधान् निबन्धोऽयम् ॥
पूर्व्वाचारान् हित्वा पातयतां स्वान् पितॄनधःश्वभ्रे ।
जातिं स्वामपलपतां नृणामयं ज्ञानदो गुरुवत् ॥
जीयादसौ निबन्धा स्थितिमान् पूर्णः समासीमा ।
विद्यावारिधिपदभाग् रत्नख्यातिर्मन्मथस्त्वः ॥
हित्वास्तु गौणयुक्तिषु मतभेदेऽपि सकलेषु तस्य वयम् ।
सिद्धान्तेष्व कमता नेह हि जातिविंपर्य्ययति ॥*

---

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, স্মার্ত্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি কতিপয় অধ্যাপক এই শ্লোকটি লেখায় আপত্তি করিয়াছিলেন (অর্থাৎ জাতিতত্ত্বে লিখিত কোনও অংশেই তাঁহাদের মতভেদ নাই জানাইয়াছিলেন)। তাহাতে সর্ব্ব-সম্মানিত অভিমত-লেখক মহাশয় কেবল দুইটিমাত্র স্থলে তাঁহার মতভেদের হেতু নির্দ্দেশ করেন—(১) ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠে রঘুনন্দনের পঙ্‌ক্তিতে দোষারোপ, (২) ৪র্থ পরিচ্ছেদে কায়স্থমাত্রকেই মূল শূদ্র বলা (তাঁহার মতে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থই মূল শূদ্র ; অন্যান্য কায়স্থেরা বর্ণসঙ্কর) এই হেতুবাদে কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া অপর সকলে ইহাতে নাম স্বাক্ষর করেন ; কিন্তু শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় উহাতে সন্তোষ লাভ করিতে না পারিয়া পৃথক্ অভিমত (২) লিখিয়াছেন। কাশীপণ্ডিতসমাজের অন্তর্ভুক্ত অন্য কতিপয় অধ্যাপকও অন্যান্য কারণে পৃথক্ অভিমত দিয়াছেন, এবং একজন পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর কার্ত্তিকসংখ্যায় এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ বাহির হইবার পরে বৈদ্যগণকে উত্তেজিত দেখিয়া স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন (৩নং) বলিয়া এ অভিমতে আর নাম স্বাক্ষর করেন নাই।

परिच्छेदविभागेन तस्य यत् सारसंग्रहः ।
तत्तं संख्यानुसारेण तत्रास्मन्मतमुच्यते ॥

(१म-परिच्छेदे)

१। जात्याम्बष्ठेषु वैश्यत्वं चिकित्सावृत्तिहेतुकम् ।
वैश्यधर्म्मत्वमेवैषां जात्या वैश्या न चाल्पशो ॥
अम्बष्ठत्वमपाकृत्य जातिवैश्यत्वकाम्यताम् ।
जन्मनः प्रातिलोम्येन दुर्वाराऽधमशूद्रता ॥

२। द्विजधर्म्मापि नाम्बष्ठो नमस्या ब्राह्मणैर्भवेत् ।
नतरामधमः शूद्रो जात्या वैश्यस्तु यः स्मृतः ॥

३। विप्रेतरेषां नास्त्येव पञ्चाग्न्याद्यधिकारिता ।
कलिकाले कृताहोमानामाचारः शास्त्रवादिनः ॥
शालग्रामादिसंस्पर्शं नाविप्रः कर्त्तुमर्हति ।

४। नापि याजयितुं योग्यो धर्म्मशास्त्रानुशासनात् ॥

५। नाम्बष्ठानां न वैद्यानां शर्म्मान्तं नाम सम्भवेत् ।
तेषां विप्रेतरत्वेन धर्म्मशास्त्रानुसारतः ॥

(२य—५म-परिच्छेदेषु)

७—१०। कायस्था वा तदन्या वा जातयः सन्ति याः ।
प्राचीनव्यवहारेण कार्य्यस्तत्तत्त्वनिर्णयः ॥
नामूलकल्पसंवादाच्च काल्पनिकभावत्वात् ।
न शास्त्राणामपव्याख्या-कौशलाच्च स युज्यते ॥

ये मोहादथवा लोभाद् ब्राह्मणाः पूर्व्वसञ्चितम् ।
त्यजन्ति होमसंसर्गात् ते प्रायश्चित्तिनो मताः ॥

১১। যথা ব্রাত্যেষু সংস্কারো বিহিতঃ শাস্ত্রকর্তৃভিঃ।
তথা তদধিকারো ন সাম্প্রতং ব্রাত্যমানিনাম্ ॥ ইতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন দেবশর্ম্মাণঃ
(মহা:) শ্রীবামাচরণ ন্যায়াচার্য্য ”

শ্রীউমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থদেবশর্ম্মাণঃ
” শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন ”

(মহা:) শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রিণঃ দ্রাবিড়াঃ

শাস্ত্রাচার্য্য শ্রীজয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর দেবশর্ম্মাণঃ
(মহা:) শ্রীঅন্নদাচরণ(তর্কচূড়ামণি) ”
(মহা:) শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ ”
(মহা:) শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ”
শ্রীতারিণীচরণ শিরোমণি ”
” রামগোপাল স্মৃতিভূষণদেবশর্ম্মাণঃ
” বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যানিধি ”
” অবিনাশচন্দ্র তর্কাচার্য্য ”
” হরিনারায়ণ বিদ্যারত্ন ”
” দীনবন্ধু বিদ্যারত্ন ”
” হারাণচন্দ্র শাস্ত্রি ”
” হরিহর শাস্ত্রি ”
” তারাচরণ সাহিত্যাচার্য্য ”
” শরচ্চন্দ্র তন্ত্ররত্ন ”
সীতানাথ বেদতীর্থ ”
চিন্তামণি বিদ্যাভূষণ ”
শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থস্মৃতিরত্ন ”
মধুসূদন বিদ্যারত্ন ”
হরিনারায়ণ বিদ্যাভূষণ ”

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ”
” শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন ”
” শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ ”
” বামাচরণ তর্কতীর্থ ন্যায়াচার্য্য ”
” গোপীচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ ”
” বিজয়কৃষ্ণ বেদান্তবাগীশ ”
” তারাপদ (কাব্যবিশারদ) ”
” মন্মথনাথ বেদান্তবাগীশ ”
” সদানন্দ স্মৃতিরত্ন ”
” বীরেন্দ্রকুমার কাব্যব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ-বিদ্যারত্ন-সাহিত্য-শাস্ত্রিস্মৃতিরত্ন ”
” দক্ষিণামোহন স্মৃতিতীর্থ ”
” নীলকমল তর্কভূষণ ”
” নিশিমোহন তর্কতীর্থ ”
” হরিকৃষ্ণ তন্ত্রভূষণ ”
” রামরঞ্জন তত্ত্বনিধি ”
” নিশিকান্ত শর্ম্মাণঃ
” ঠাকুরদাস দেবশর্ম্মাণঃ
” গোবিন্দচন্দ্র তর্করত্ন বেদাধ্যায়ি ”

সাহিত্য-সাঙ্খ্যতীর্থ-ষড়্দর্শনাচার্য্যোপাধিক-কবিরাজ-শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য শর্ম্মণঃ ।

(২)

পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি

মহাশয় সুরগুরুকল্পে—

মহাশয়, আপনার লিখিত "জাতিতত্ত্ব" পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য জাতির, যোগী বা যুগী জাতির, মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত জাতির যে সমাধান করিয়াছেন, এবং কায়স্থ যে সৎক্ষত্রিয় নয়—শূদ্র জাতি—বলিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমি কেন, যাঁহারা নিরপেক্ষ ধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিত— তাঁহারা সকলেই যে, এই "জাতিতত্ত্ব" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই। যদিও এই স্বেচ্ছাচারের যুগে আচণ্ডাল সকল জাতিরই ব্রাহ্মণ হইবার ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিতেছে এবং আমাদের পণ্ডিতকুলকলঙ্কস্বরূপ কোনও কোনও পণ্ডিত-নামমাত্রধারী গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবের তাড়নায় এই স্বেচ্ছাচারের অনুকূল চেষ্টা করিতেছেন ও অনেকে আপনাকে যা' তা' বলিয়া গালাগালি দিতেছেন, তথাপি আমরা আপনার নির্ভীকতার সহিত শাস্ত্রীয় সমালোচনা দেখিয়া অতর্কিতভাবে আপনার প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। বৈদ্যপ্রবোধনী, মাহিষ্যতত্ত্ব-বারিধি, কায়স্থসংহিতা, ব্রাহ্মণযোগি-বংশ প্রভৃতির লেখকগণ আপাততঃ জেদের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার প্রদর্শিত অখণ্ডনীয় যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি কিছুতেই স্বীকার করিবেন না বটে; কিন্তু সত্যের অক্ষয়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আপনার এই সমাধান অল্পকালমধ্যেই এই বিরাট্ বিশ্বসমাজের হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বর বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপ সাধুকার্য্যে দিন দিন উন্নতি লাভ করুন। নিবেদন ইতি—

৺কাশীধাম
তিং
২৭শে বৈশাখ, ১৩৩০

ভূতপূর্ব্ব নাটোররাজ-রাজপণ্ডিত—
বিদ্যারত্নোপনামক
শ্রীরুক্মিণীমোহনশর্ম্মণঃ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের লিখিত "জাতিতত্ত্ব" পুস্তক আমরা আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। তবে এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রধান পাঁচটী কারণে একমত হইতে পারিলাম না।

প্রথম কারণ—বৈদ্যলিখিত "বৈদ্যপ্রবোধনী" পুস্তকের প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পক্ষে অনুচিত (১)।

দ্বিতীয় কারণ—অম্বষ্ঠ জাতির বর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদিত হয় না। কেননা, অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর বলিলে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অবজ্ঞা করা হয় (২)।

তৃতীয় কারণ—মন্বাদিস্মৃতিসম্মত জাতিনির্ণয় ঠিক যেরূপ হওয়া উচিত, এই "জাতিতত্ত্ব" পুস্তকে সেইরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ (৩)। পরন্তু তিনি ঋষিবাক্যের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া শাস্ত্রের একবাক্যতা করিতে গিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয় (৪)।

---

(১) তাহা হইলে "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" হয় না কি?—প্রকাশক

(২) মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রের অবজ্ঞা করিয়া নহে, অনুজ্ঞাক্রমেই অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াছে; উক্ত "জাতিতত্ত্বে"র ৪৮ পৃঃ ১০ পং হইতে ৪৯ পৃঃ ১৬ পং পর্য্যন্ত (বর্ণসঙ্কর-প্রকরণে অম্বষ্ঠের গ্রহণ), ৮৩ পৃঃ ৩ পং হইতে ৮৫ পৃঃ ৭ পং পর্য্যন্ত, এবং ১২২ পৃঃ ১৯ পং হইতে ১২৩ পৃঃ ৭ পং পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার পাঠ করিতে পণ্ডিত মহাশয়গণকে অনুরোধ করি।—প্রঃ

(৩) সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যই আপনাদের অভিমত প্রার্থনা করা হইয়াছিল। আপনারাও যদি "সন্দেহ"ই রাখিলেন, তবে ভঞ্জন করিবে কে?—প্রঃ

(৪) কোথায় বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিলে ভাল হইত।—প্রঃ

চতুর্থ কারণ—"বৈদ্যপ্রবোধনী" পুস্তক ও তাহার প্রতিবাদস্বরূপ লিখিত এই "জাতিতত্ত্ব" পুস্তক, এই উভয় পুস্তকের লেখকই বৈদ্যজাতির তত্ত্বনির্ণয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন (৫)।

পঞ্চম কারণ—কায়স্থ প্রভৃতি জাতির তত্ত্বনির্ণয় এই পুস্তকে যাহা করা হইয়াছে, তাহা যে কত দূর ঋষিবাক্যসম্মত, ইহাই বিশেষ বিবেচ্য (৬)। বিদ্বদ্বেণ্যসমিতি—২৯ শে বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল।

শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্ম্ম বিদ্যারত্ন শ্রীঅনন্তদেব শর্ম্ম তর্করত্ন

শ্রীভোলানাথ শর্ম্ম বিদ্যাশ্রমী।

(৪)

বৈদ্যনাম্না প্রসিদ্ধা যে বঙ্গদেশনিবাসিনঃ।
অম্বষ্ঠত্বেন তে খ্যাতা মাধবস্থ পুরাতনৈঃ॥
আয়ুর্বেদে সুনিপুণা ধর্ম্মজ্ঞানসমন্বিতম্।
মাসাশৌচং চরন্ত্যেকে মাসার্দ্ধমপি কেচন॥
বল্লালসেনভূপস্য কর্ত্তৃত্বে নিশ্চয়া চ।
দ্বাদশাহমথাশৌচমিচ্ছন্তি কেচিদাধুনাম॥
গয়াতীর্থবিপ্রাণাং গোপ্যাজ্ঞাপনং স্মৃতং।
কথং দশাহং নাশৌচ-মিতি কাঙ্ক্ষদ্ বিবক্ষিতম্॥
এবং সংশয়মাপন্নানাং বৈদ্যানাং জাতিনির্ণয়ে।
প্রাপ্তাজ্ঞানবশাৎস্বার্থবক্তৃ "বৈদ্যপ্রবোধনী"॥

---

(৫) আপনাদের শাস্ত্রমতে অন্যায় ধারণাটা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল।—প্রঃ

(৬) আপনাদের উপরেই ত বিবেচনার ভার দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং আপনাদেরই তাহা বিবেচনা করিয়া বলা উচিত ছিল।—প্রঃ

কদর্থৈঃ শাস্ত্রবাক্যানাং ব্রাহ্মণত্ববিধিৎসয়া ।
যাঽম্বষ্ঠকুলজাতানাং খ্যাতজাতিনিরোধিনী ॥
যন্নামেন্তে তাতবৈষ্ঠাদিনবজাতিপ্রলোভনম্ ।
তত্র সংশয়মাপন্না যে বৈষ্ঠা ধর্ম্মভীরবঃ ।—
"যদি বা ব্রাহ্মণাঃ স্যাম তদা প্রবোধনীকৃতা ।
প্রোক্তা মহর্ষিকল্পান্তে কথং গঙ্গাধরাদয়ঃ ।
পক্ষাশৌচিত্বমস্মাকমম্বষ্ঠত্বং তথা পুনঃ ।
অঙ্গীকুর্ব্বস্যহো বিজ্ঞা ব্রাহ্মণত্বং কথং ন নঃ ॥"
এবং সন্দেহসন্দোহে বৈষ্ঠা বৈষ্ঠপ্রবোধনীম্ ।
নব্যাং নাবং সমালম্ব্য বিষ্ঠাবারিধিমাগতাঃ ॥
সেয়ং শাস্ত্রার্থকল্লোলৈঃ ক্ষণাঙ্গী শ্লথবন্ধনা ।
বিধাগুতা নিমগ্না চ হন্ত বৈষ্ঠপ্রবোধনী ॥
শ্রীশ্যামাচরণাপার-বিষ্ঠাবারিধিমজ্জিতাম্ ।
স্বজাতিতত্ত্বরত্নং স্যাদ্ বৈষ্ঠানাং দৃক্পথাগতম্ ॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ ।
ন স বাচ্যো হি শাস্ত্রজ্ঞৈঃ স্বভাবোঽস্য কলেরসৌ ॥
পারম্পর্য্যেণ লোকানাং তথা শাস্ত্রনিদেশতঃ ।
অম্বষ্ঠানাং সদাশৌচকল্পনা বৈশ্যবৎ স্মৃতা ॥
উৎকৃষ্টতা বৈশ্যতোঽপি হীনত্বং ব্রাহ্মণাৎ সদা ।
বৈশ্যামাতৃকতাহেতোর্ব্রাহ্মণত্বং কদাপি ন ।
স্ত্রীণাং দেব্যন্ততা নাম্নি পুংসাং বেদাধিকারিতা ॥
নামান্তে সেনগুপ্তাদি পক্ষাশৌচং স্মরন্তি যে ।
অম্বষ্ঠত্বেন তে বৈষ্ঠা ব্যবহার্য্যা হি সজ্জনৈঃ ।
তথাস্মদ্গুরুভিঃ প্রোক্তমিত্থমেব চ মে মতম্ ॥

শ্রীশ্যামাচরণ প্রাজ্ঞ কাশ্যাপীয়ে বিধীয়তাম্ ।
বিদ্যাবারিধিনাস্মৈব জায়া যেনাপ্যলঙ্কৃতঃ ।
যো জাতিতত্ত্বে শাস্ত্রার্থবিচারো দর্শিতস্ত্বয়া ।
ন তত্র পক্ষপাতোঽস্তি সর্ব্বথেতি সতাং মতম্ ।

বারাণসীনিবাসিনাং
শ্রীকমলাপ্রসাদদেবশর্ম্মস্মৃতিভূষণানাম্

সপ্তচত্বারিংশদধিকাষ্টাদশশতশকাব্দীয়-
সৌরাগ্রহায়ণস্য নবমদিবসীয়া লিপিরেষা ।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন
মহোদয় সমীপেষু

সাদর-সমাবেদনমেতৎ—

আপনার প্রণীত "জাতিতত্ত্ব" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। "বৈশ্যপ্রবোধনী" প্রভৃতির সম্বন্ধে যে সকল প্রতিবাদ লিখিয়াছেন, ঐ সকল প্রতিবাদ শাস্ত্রানুমোদিত হইয়াছে। জিগীষাশূন্য হইয়া যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই মনে করিবেন—ঐ প্রতিবাদ সকল অখণ্ডনীয়। যাহাদের জিগীষা আছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। ঐ সকল প্রতিবাদ সত্ত্বেও যদি বৈশ্যপ্রবোধনীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কালধর্ম্মে দেশে যে ধর্ম্মবিপ্লব ও জাতিবিপ্লব হইতেছে, তাহা আমাদের সহস্র প্রতিবাদেও নিবৃত্ত হইবে না; তবে পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রের সুমীমাংসা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়—ইহা বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রীয় মীমাংসাতে যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উহা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইত্যলমধিকেন। ২।৩।৩৩ বাং।

ভবদীয়—
শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ
(মহামহোপাধ্যায়)

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন
মহাশয়েষু

সবিনয়নমস্কারা নিবেদনঞ্চ—

হিন্দুসমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে আমার ঘোর নৈরাশ্য আসিয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্যেরই যথেচ্ছাচারিতা, স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস এবং শাস্ত্রে শ্রদ্ধার অভাব যখনই ভাবি, তখনই কলিযুগের প্রভাব মনে হয়; তজ্জন্য এ বৃদ্ধাবস্থায় সমাজসংস্করণের চেষ্টা হইতে একবারে বিরত হইয়াছি। ৺কাশীবাস করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণসভার উন্নতিকল্পে যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে নিষ্ফল হওয়ায় উক্ত সভার সহিতও নিঃসম্পর্ক হইয়াছি অবগত আছেন। ... এ অবস্থাতেও আপনার "জাতিতত্ত্ব" পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া সুখী হইয়াছি। সুখের কারণ এই যে, যুগধর্ম্মানুসারে যে সকল বৈশ্য, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, যুগী প্রভৃতি ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজেদের একপ্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাঁহারা আপনার "জাতিতত্ত্ব" পাঠে সম্ভবতঃ তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। আপনার মত কর্ম্মিগণ সমাজ-সংস্করণের চেষ্টা করিতে থাকুন। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনার "জাতিতত্ত্ব" যাঁরা ঋষিবাক্যই প্রকাশিত হইয়াছে। কিমধিকমিতি—

৺কাশীধাম
১৮ই বৈশাখ, ১৩৩৩

শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মা
(রায় বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ)

অন্যান্য অভিমত পরে প্রকাশিত হইবে।

"বঙ্গদেশের অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তশিরোমণি, গভর্ণমেন্টের উপাধি-পরীক্ষার সম্পাদক" শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পোষ্টকার্ডে লিখিত পত্রের অবিকল নকল—

Babu Satischandra Mukherjee

(Doctor)

153, Missirpokhra, Benares City.

ওঁ হংসঃ

১৩৩৩।২৫ বৈশাখ

৫নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার।

মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়াছি ও সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি। বৈষ্ণবপ্রবোধিনীর "পত্রিকা" সম্বন্ধে আপনারা যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা একরূপ সত্যই। জাতিতত্ত্ব-লেখক মহাশয় বৈষ্ণবজাতির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার আমাদের কিছুই নাই। প্রকৃত বিষয় এই যে, এক সময় আমার অত্যন্ত অসুখ অবস্থায় আমি শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াছিলাম। ঐ সময় আমার কোন বিষয় পর্য্যালোচনা বা প্রণিধান করিবার শক্তি একেবারেই ছিল না। সেই অবসরে উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের কয়েকটী ছাত্র আমার অবস্থা পরিদর্শন করিতে আসিত এবং প্রত্যেক দিনই আমাকে (১খানি পত্র লিখিয়া আনিয়া) সহি করিবার জন্য জিদ করিত। এইরূপ করায় আমি তাহাদের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া সহি করিয়াছিলাম। তাহাতে যে কি লেখা ছিল, তাহা আমি দেখি নাই। কারণ আমার সাধারণতঃ দৃষ্টিশক্তির অভাবে দেখিবার শক্তিও আমার ছিল না।

ইতি—

শ্রীদক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।

দুঃখের কথা।

"বৈষ্ণবপ্রবোধিনী"তে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া (অপব্যাখ্যাপূর্ব্বক) সপ্রমাণ করা হইয়াছে—"বৈষ্ণবগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী।" তথাপি আত্মসম্মানের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগণের একাদশাহে আদ্যাধিকপ

অশাস্ত্রীয় ক্রিয়া করাইতে এবং অধ্যাপক মহাশয়গণ উক্তরূপ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে তাঁহাদের বাটীতে বিদায় গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। হে রজতখণ্ড! ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি !! তুমি সকলকেই সকল-প্রকার অকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করিয়া থাক।

বৈদ্যগণের অন্যায় জেদ।

শুনিলাম—৺কাশীধামের কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত "জাতিতত্ত্বে"র আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণাচারে বৈদ্যগণের ক্রিয়া করাইতে অসম্মত হইয়া, দুই-এক ঘর যজমান পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, বৈদ্যগণ বৈদ্যমহিলাদিগকে লইয়া গত বৈশাখমাসে সভা করিয়া প্রস্তাব করেন যে, আমরা পুরোহিত চাহি না, নিজেরাই পৌরোহিত্য করিব। তাহাতে বিধবা বৈদ্যমহিলারা আপত্তি করায়, তাহারা মরিলে মড়া ফেলিবেন না বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। গত বৈশাখী পূর্ণিমায় একজন বৈদ্যমহিলা পুরোহিত দ্বারা শিবপ্রতিষ্ঠা করাইবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈদ্যগণের বাধাপ্রদানে তিনি তাহা করিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত ত্যাগ করিয়া নিজে পৌরোহিত্য করা ক্ষত্রিয়াদির নিষিদ্ধ (জাতিতত্ত্ব ৩২ পৃঃ)। নির্ণয়সিন্ধুকারও লিখিয়াছেন—

"প্রয়োগরত্নে—পিতৈবোপনয়েৎ পুত্রং তদভাবে পিতুঃ পিতা।
তদভাবে পিতুর্ভ্রাতা তদভাবে তু সোদরঃ॥ পিতেতি বিপ্রপরম্, ন ক্ষত্রিয়াদেঃ। তেষাং পুরোহিত এব। তেষাঞ্চ অধ্যাপনেঽনধিকারাৎ।"

অর্থাৎ বচনে যে আছে পিতাই আচার্য্য হইয়া পুত্রের উপনয়ন সংস্কার করিবে, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে। ক্ষত্রিয়াদির পুরোহিতই আচার্য্যকর্ম্ম করিবেন, যেহেতু তাহাদের সাবিত্রী অধ্যাপনে অধিকার নাই।

"বৈদ্যপ্রবোধনী"তে উদ্ধৃত কোনও একটা বচনেও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব

সিদ্ধ হইতেছে না, ইহা এখন বুঝিয়াও তাঁহারা জেদের বশে ব্রাহ্মণাচার পালন করিয়া ক্রিয়া লোপ করিতেছেন, তদুপরি পুরোহিত ত্যাগ করিয়া স্বয়ং ক্রিয়া করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, অম্বষ্ঠগণ পূর্ব্বে বৈশ্যধর্ম্মা হইয়াও মনুক্ত যে ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণাদর্শনরূপ কারণদ্বয়ে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (জাতিতত্ত্ব ৩২ পৃঃ ১০ পং), এখন 'যেন তেন প্রকারেণ' ব্রাহ্মণ হইয়াও আবার সেই দুইটি কারণ ও সেই ফল টানিয়া আনিতেছেন।

যা'ক ধর্ম্ম রসাতল, হ'ক সকল কর্ম্মকাণ্ড পণ্ড, না হউক পিতৃলোকের শ্রেতত্ব পরিহার; তথাপি তাঁহারা ব্রাহ্মণাচার পালন করিবেনই—এই প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইয়াছেন। এমন না হইলে কি জেদ !! দুর্লভ মনুষ্যজন্মে ইহাই ত পরম পুরুষার্থ !!

একজন বৈদ্য লিখিয়াছেন—"থাকিত যদি হিন্দু রাজা, তাহা হইলে এই জাতিতত্ত্বলেখক রীতিমত দণ্ড পাইত।" হিন্দু রাজার আমলে এই সব ব্যাপার ঘটিলে, তিনি অবশ্যই মনুর আইন অনুসারে বিচার করিতেন। তাহা হইলে কাহারা রীতিমত দণ্ড পাইত, তাহা প্রতিবাদকারী বুঝিয়া দেখুন। মনু বলিয়াছেন—

"অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামি চ পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া।" (১১।৫৫)
"তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্ রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ।" (৯।২২৪)
"ক্ষত্রিয়ং যত্তাকেদ্ যাজ্যো যাজ্যং চর্ত্বিগ্ ত্যজেদ্ যদি।
শক্তং কর্ম্মণ্যদুষ্টঞ্চ তয়োর্দ্দণ্ডঃ শতং শতম্।" (৮।৩৮৮)
"যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব বিবাসয়েৎ।" (১০।৯৬)

৭।১ বাজার লেন, উত্তরপাড়া, হুগলী ১৫ই আষাঢ়, ১৩৩৩। } শ্রীসারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক।

দোষ কার ?

(কবিরত্ন মহাশয়ের লিখিত)

(১)

বৈদ্যেরা বহুকাল যাবৎ অম্বষ্ঠ-পরিচয়ে বৈশ্যাচার পালন করত আপনারাও শান্তিতে ছিলেন, সমাজকেও নীরব রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে হঠাৎ ব্রাহ্মণ হইবার ইচ্ছায় বলিতেছেন—"আমরা অম্বষ্ঠ নহি, আমরা বৈদ্য।" সেই বৈদ্যের শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটাও যে তৎপক্ষে অনুকূল নহে, তাহা মূল প্রবন্ধে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, এবং 'বৈদ্য' পৃথক্ জাতি হইলে, শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত অধম শূদ্র হয়, ইহা মহাভারতের শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছি (৯ পৃঃ)। তাঁহারা জেদের বশে সে দিকে প্রণিধান না করিয়া আরক্ত নয়নে ক্রোধকম্পিত কলেবরে বলিতেছেন—জাতিতত্ত্বলেখক আমাদিগকে চণ্ডাল বলিয়াছে; কেহ বলিতেছেন—আমাদিগকে 'বেদে' বলিয়া অপমানিত করিয়াছে।

যাঁহাদের বিদ্যার দৌড় বেশী, তাঁহারা মহাভারতীয় শ্লোকের প্রথমেই চাণ্ডাল শব্দ আছে দেখিয়া তাঁহাদিগকে চাণ্ডাল বলা হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ শ্লোকে যে তিনটি জাতির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত সন্তানকেই চাণ্ডাল বলা হইয়াছে। শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত যে পুত্রকে মনু আয়োগব বলিয়াছেন, মহাভারতকার তাহাকেই বৈদ্য বলিয়াছেন। পরন্তু বৈদ্যেরা নিজেই অতিবুদ্ধির বলে সেই বৈদ্যের অর্থ 'বেদে' করিয়া আপনাদের উপর তজ্জাতীয়ত্বের আরোপ করিতেছেন এবং সাধারণের সেই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিতেছেন।

পরন্ত ঐ শ্লোকে বৈদ্য শব্দের 'বেদে' অর্থ হইতেই পারে না। যেহেতু "একান্তরে ত্বানুলোম্যাৎ" ইত্যাদি (১০।১৩) মনুবচনের টীকার শেষে কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—

"একান্তরোৎপন্নয়োঃ স্পর্শাভ্যনুজ্ঞানাৎ অনন্তরোৎপন্নানাং সূত-মাগধায়োগবানাং স্পর্শাদিযোগ্যত্বং সিদ্ধং ভবতি ; অতশ্চাণ্ডাল এবৈকঃ প্রতিলোমজঃ স্পর্শাদৌ নিরস্যতে।"

অর্থ—প্রতিলোমজ হইলেও, একান্তরোৎপন্ন (একবর্ণব্যবধানে জাত) অর্থাৎ শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত ক্ষত্তা এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত বৈদেহককে স্পর্শাদিযোগ্য বলায়, অনন্তরজ (অব্যবহিতবর্ণজাত) অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত সূত, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত মাগধ এবং শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত আয়োগবের (অথবা বৈদ্যের) সুতরাং স্পর্শাদিযোগ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রতিলোমজাতের মধ্যে [illegible]াল (শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত) চাণ্ডালই অস্পৃশ্য দাঁড়াইতেছে। [illegible]তাবতা বৈদ্য বা আয়োগব—স্পৃশ্য, জলচল ও সদ্ব্রাহ্মণের যাজ্য। [illegible] বেদে লোকালয় হইতে বিতাড়িত, অনিকেতন, অস্পৃশ্য জাতি। তবে বৈদ্য ও বেদে একার্থক কিরূপে হইল?

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের "জাতিনির্ণয়" যাহারা প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন, তাহারাও বৈদ্যকে বেদে বলিতে পারেন না। যেহেতু তাহাতে আছে—

"বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ।
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ।" (ব্রহ্মখণ্ড ১০ অঃ)

বৈদ্য হইতে শূদ্রার গর্ভে বেদে জাতির উৎপত্তি।

অতএব বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ না বলিয়া "বৈদ্য" এই পৃথক্ জাতি বলার জন্য এবং বৈদ্যের অর্থ 'বেদে' করার জন্য দোষ কার?

(২)

অম্বষ্ঠদিগের সম্মানরক্ষার্থ আমি একটা কথা প্রকাশ করি নাই (গোপনেই রাখিয়াছিলাম) এবং কীটাণুকীট—অণুকীট হইয়াও

সর্ব্বজনগুরুস্থানীয় দেশমান্য ঋষিকল্প রঘুনন্দনের পঙ্‌ক্তিতেও দোষারোপ-রূপ অতিমাত্র ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেও সাহসী হইয়াছি (৩২পৃঃ ২৪ পং); তথাপি অম্বষ্ঠেরা আমার পূর্ব বিদ্বেষভাবই দেখিতেছেন। কথায় বলে "যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।" এইজন্যই এখন অগত্যা সেই গুপ্ত কথাটা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান, যাঁহার বিপরীতবাদিনী স্মৃতি নগণ্য, সেই মনুর মতে অম্বষ্ঠের মাতৃজাতীয়ত্ব বা দ্বিজধর্ম্মিত্ব সিদ্ধ হয় না। এইজন্যই অমরকোষে শূদ্রবর্গে 'অম্বষ্ঠ' ধৃত হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন—

"স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥" (১০।৬)
"পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমশোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥" (১০।১৪)

দ্বিজাতিদিগের অনন্তর (অব্যবহিতবর্ণ)-স্ত্রীজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াজাত, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাজাত এবং বৈশ্যের শূদ্রাজাত সন্তানই পিতৃসদৃশ ও মাতৃজাতীয়।—অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাজাত হওয়ায় অনন্তরজ নহে, একান্তরজ হইতেছে; সুতরাং মনুর মতে তাঁহার পিতৃসদৃশত্ব ও মাতৃজাতীয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥" (১০।১০)

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই তিনে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই দুয়ে এবং বৈশ্যের শূদ্রা এই একে উৎপন্ন—এই ছয় সন্তান অপসদ অর্থাৎ নিকৃষ্ট।—ইহাতে অম্বষ্ঠের অপসদত্বই সিদ্ধ হইতেছে।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাঞ্চ সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥" (১০।৪১)

দ্বিজাতিদিগের সজাতিজ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্যের বৈশ্যাতে উৎপাদিত) তিন, এবং অনন্তরজ (অব্যবধানে জাত—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাতে ও বৈশ্যের শূদ্রাতে উৎপাদিত) তিন—এই ছয় পুত্র দ্বিজধর্মী অর্থাৎ উপনয়নসংস্কারযোগ্য। যাহারা অপধ্বংসজ অর্থাৎ দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন হইলেও প্রতিলোমজাত, তাহারা শূদ্রধর্ম্মা অর্থাৎ উপনয়নার্হ নহে।—অতএব ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত অম্বষ্ঠ অনুলোমজ হইলেও অনন্তরজ না হওয়ায় (একান্তরজ হওয়ায়) মনুর মতে তাহারা উপনয়ন-সংস্কারার্হ নহে। পরন্তু

"একান্তরে ত্বানুলোম্যা-দম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।

ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি॥" (১০।১৩)

("যথা—স্পর্শাদ্যৌ"—কুল্লূক।)

একবর্ণব্যবধানে অনুলোমজাত (ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত) অম্বষ্ঠ এবং (ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাগর্ভজাত) উগ্র যেমন স্পর্শাদিযোগ্য, সেইরূপ একবর্ণব্যবধানে প্রতিলোমজাত (শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত) ক্ষত্তা এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত বৈদেহকও স্পর্শাদিযোগ্য।—অতএব মনুর মতে অম্বষ্ঠ কেবল স্পৃশ্য, জল-চল ও সদ্ব্রাহ্মণের যাজ্য, ইহাই বুঝাইতেছে।

এখন জিজ্ঞাসা করি—কেঁচো খুঁড়িতে এই যে সাপ বাহির হইল, ইহার জন্য দোষ কার?

(৩)

আমি (১৬ পৃঃ) "বেদেষু বৈশ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" এবং (১৮ পৃঃ) "অব্রাহ্মণাঃ সন্তু তু যে ন বৈশ্যাঃ" এই দুইটি মহাভারতীয় শ্লোকাংশের প্রকৃত অর্থ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেও অনেক বৈদ্য এখনও বলিতেছেন যে, জাতিতত্ত্ব-লেখক উহাদের অপব্যাখ্যা করিয়াছে। আমি প্রথম

শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় যে-সকল প্রমাণ দেখাইয়াছি, সেগুলি যদি পর্য্যাপ্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর একটি সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। যাঁহারা মনু ও মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—মনুর অনেক শ্লোক অবিকৃতভাবে এবং অনেক শ্লোক কিঞ্চিৎ বিকৃতভাবে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। মনুতে আছে—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥" (১।৯৬—৯৭)

জাতিতত্ত্বের ১৬পৃঃ উদ্ধৃত মহাভারতের দুইটি শ্লোক ইহার সহিত মিলাইয়া দেখুন, মহাভারতের দ্বিজাতি ও দ্বিজ শব্দ এবং বৈদ্য শব্দ যথাক্রমে মনুক্ত ব্রাহ্মণ এবং বিদ্বস্ শব্দের সহিত একার্থক কি না। তাহা হইলে কে উহার অপব্যাখ্যা করিয়াছে ?

"অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ" ইহার—"বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী"—এইরূপ অর্থ করা এবং প্রাতঃসূর্য্যকে সুপক্ক ফল বলিয়া ধারণা করা, দুইই সমান নহে কি ?

একজন ভুল বুঝাইয়া দিয়া বৈদ্যদিগের জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, আর একজন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া সেই ভুলগুলি দেখাইয়া দিয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে দোষ কার ?

হ'ল কি!

(কবিরত্ন মহাশয়ের লিখিত)

এমন কাল পড়িয়াছে যে, এখন মুচিকে মুচি ও হাড়িকে হাড়ি বলিলে মানহানির দাবিতে পড়িতে হয়। "জাতিতত্ত্ব" পুস্তকে শাস্ত্রের বচন ও সমাজের চিরন্তন ব্যবহার অনুসারেই সকল বিষয় লিখিত হইলেও, বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সেবানন্দ ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"জাতিতত্ত্বে যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই ভ্রমপূর্ণ; এরূপ অসার আলোচনার ফলে কেবল বিরক্তি বৃদ্ধি পাইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি অবিলম্বে ইহার প্রতীকার পন্থা অবলম্বনে আগ্রহ করিবেন।"

এদিকে হাবড়া-আন্দুলমৌড়ি-দুর্লেনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ (কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ) বাবাজী কাশীতে আসিয়া সহর তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছেন; জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায় আমার নামে নালিশ করিবেন—অনেকের কাছে বলিতেছেন; এবং (শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সরস্বতী মহাশয় একদিন একটা বিষয়ে তর্কবিতর্কে যে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺উমাচরণ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয়কে "ভাবার্থেই বুঝা যায় কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" বলায় তিনি তাঁহার প্রতি আরক্তচক্ষু হইয়াছিলেন, সেই কবিরাজ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ষড়্‌দর্শনাচার্য্যকে মুরুব্বি ধরিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

(১) তাঁহারা অতিবিশুদ্ধ, রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বৈদিক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট "গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ" বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ।

(২) চাষী কৈবর্ত্তেরা প্রাচীনকাল হইতেই মাহিষ্য নামে পরিচিত—উৎকৃষ্ট জাতি।

(৩) এ বিষয়ে ৫।৬ হাজার অধ্যাপকের ব্যবস্থাপত্র মুদ্রিত আছে।

(৪) "ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বচনে চাষী কৈবর্ত্তকে স্পষ্টরূপে মাহিষ্য বলা হইলেও জাতিতত্ত্ব-লেখক তাহা গোপন করিয়া বিদ্বেষভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

(৫) অনেক রাঢ়ী বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণ চাষী কৈবর্ত্তের দান গ্রহণ করেন; তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে পূজারির কার্য্য করিতেছেন; এবং তাঁহাদিগকে মন্ত্রশিষ্যও করিয়াছেন।

(৬) ইং ১৯১১ সাল হইতে আদম সুমারির রিপোর্টে চাষী কৈবর্ত্তকে মাহিষ্য বলিয়া লেখা হইতেছে।

তিনি উক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা একটি সুদীর্ঘ প্রতিবাদ ও একখানি পত্র আমাকে দেওয়াইয়াছেন। পত্রের প্রারম্ভে তিনি আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া পরিশেষে "কূপমণ্ডূক" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা আমার যথেষ্ট সম্মান এবং নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দিবার জন্য কড়া হুকুম দিয়াছেন, এবং আমি তাঁহাকে "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" বলিয়া গুরুতর অপমান করিয়াছি জানাইয়াছেন।

আমি সময়াভাবে তাঁহার প্রতিবাদটা সম্পূর্ণ পড়িতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে এক-আধটু পড়িয়া ৩ দিনের মধ্যেই ফেরত দিয়া তাঁহার হুকুম তামিল করিয়াছি। যাহা পড়িয়াছি, তাহাতে তাঁহার উক্ত ছয়-প্রকার কথাই আছে বলিয়া মনে হইল। অধিকন্তু তিনি তাঁহার "ভ্রান্তি-বিজয়" গ্রন্থে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে বিজন্মা এবং বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণ-

দিগকে অধম বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারও আভাস দিয়াছেন। আমি জাতিসম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে কিছু বলি নাই, সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষকে উত্তর দিতে বাধ্য নহি। তিনি ও তাঁহাদের যজমানেরা আমার নামে নালিশ করিবার জন্য এখনই যখন জেলা হইতে থানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, তখন ভবিষ্যতে গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, গলিতে গলিতে, ঘাটে মাঠে নালিশ করিতেও ছাড়িবেন না,—সহজেই অনুমান হইতেছে। যাহা হউক, সাধারণের অবগতির জন্য, গগন-বুধদিগের ন্যায় উপকরণ সংগ্রহ করা অসাধ্য হওয়ায়, কূপমণ্ডূকোচিত কয়েকটী কথা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি—

(১) কৈবর্ত্ত যদি বৈশ্যাদপি মাহিষ্য-নামক জাতি, তবে "কৈব-র্ত্তের ব্রাহ্মণ" বলায় বাবাজীর অপমান বোধ হইল কেন? এখানে আসিবার পর প্রথম আলাপে তিনি নিজেই "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" বলিয়া আমার নিকট আত্মপরিচয় দিতে অপমান বোধ করেন নাই; আমি বলাতেই এত অপমান হইল? যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এক জাতির পুরোহিত, (যাজন করুন বা নাই করুন) তাঁহারা সকলেই সমাজে সেইজাতির ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ; যথা—গয়লার বামুন, কলুর বামুন, পোদের বামুন, কৈবর্ত্তের বামুন ইত্যাদি। তন্মধ্যে কৈবর্ত্তের বামুন ভিন্ন একজাতির ব্রাহ্মণদিগকে সাধারণতঃ বর্ণব্রাহ্মণও বলে। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখের পৌরোহিত্য করিলেও তাঁহাদিগকে কেহই বৈদ্যের বামুন, কায়স্থের বামুন, তেলীর বামুন ইত্যাদি বলে না; অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণের বৈদ্য যজমান থাকিলেও তাঁহাদিগকেও কেহ বৈদ্যের বামুন বলে না; কেবল "ব্রাহ্মণ"ই সকলে বলিয়া থাকে। এ কথা বাবাজীরও অজ্ঞাত নহে। যাহারা তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি পড়েন নাই, তাঁহারা "গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ" জানেনই না। বাবাজী জেলায় জেলায় গিয়া

ঐ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া দেখুন, "কৈবর্ত্তের বামুন" বলিয়া উহার অর্থ ভাঙ্গিয়া না দিলে কয়টা লোকে বুঝিতে পারে।

তিনি তাঁহার "ভ্রান্তিবিজয়" পুস্তকে ইং ১৯১১ সালের আদম সুমারির যে রিপোর্ট ছাপাইয়াছেন, তাহাতে তদ্বর্ণিত বিজন্মা ও অমুত্তম ব্রাহ্মণদের যাজ্য বলিয়া বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশায়ককে ১ম শ্রেণীতে, এবং অবিজন্মা উত্তম গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ—তাঁহাদের যাজ্য বলিয়া চাষী কৈবর্ত্তকে ২য় শ্রেণীতে ধরা হইয়াছে। ইহাতে কোন্ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ হইতেছে? রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের তদ্বর্ণিত কুলদোষ থাকিলেও, সমাজের ব্রাহ্মণগণ সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের কুলে কন্যাদান করিতে পারিলে ধন্যম্মন্য হইয়া থাকেন। বাবাজী কি ইহা জানেন না? তিনি তারস্বরে ঐরূপ কুলজী আবৃত্তি করিয়া যতই গলা ভাঙ্গুন, তাঁহার বাক্য "অশিবং শিবাক্রতং" ভাবিয়া সকলেই কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিবেন। সুতরাং ঐরূপ বলিয়া গাত্রদাহ নিবারণের চেষ্টা, গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টার ন্যায়, নিতান্তই নিষ্ফল।

(২.) সর্ব্বশাস্ত্রে কৈবর্ত্তমাত্রকেই অন্ত্যজ বলা হইয়াছে। মনূক্ত কৈবর্ত্ত যে জালিক কৈবর্ত্ত (হালিক কৈবর্ত্ত নহে), তাহার প্রমাণ কি? কৈবর্ত্তদিগের হালিক ও জালিক এই প্রভেদ কোন্ শাস্ত্রে আছে? "কৈবর্ত্তা দ্বিবিধা প্রোক্তা হালিকা জালিকা মুনে"—বৃহদ্ ব্যাসসংহিতার এই অলীক বচনই যদি উক্ত দ্বিবিধ ভেদের প্রমাণ হয়, তবে "তুঁতে কৈবর্ত্তেরা" দাঁড়ায় কোথায়? তাহারা ত হালিকও নহে, জালিকও নহে (গুটীপোকার কারবার করে)।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবু বিশ্বকোষে (কৈবর্ত্ত শব্দের বিবরণে) লিখিয়াছেন—

"মেদিনীপুরের বৃহৎ ব্যাসসংহিতার (৩য় খণ্ড ২০ অধ্যায়) পুথিতে আছে—কৈবর্ত্তা দ্বিবিধাঃ প্রোক্তা হালিকা জালিকা মুনে। হলবাহা

হালিকাশ্চ জালিকা মৎস্যজীবিনঃ।.........কাশীস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয় ও বঙ্গদেশের নানা স্থানে যে বৃহৎ ব্যাসসংহিতার পুথি আছে, তাহার সহিত মেদিনীপুরের পুথির কিছুই মিল নাই। মেদিনীপুরের পুথি পাঠ করিলেই বোধ হয়, যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অপ্রাচীন কালে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত দৃষ্টে রচিত হইয়াছে।"

(৩) শ্রীআশুতোষ জানা প্রণীত "মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি"তে এবং শ্রীসেবানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ব্যবস্থা-সংগ্রহে" ব্যবস্থাদাতা যে ৫।৬ হাজার অধ্যাপকের নাম আছে, বর্ত্তমানে তাঁহারা সকলেই মৃত; ৫।৬ জন মাত্র জীবিত। ৮৴ (পনর) জানা অধ্যাপক অবজ্ঞীয় (যাঁহাদের দেশে কৈবর্ত্ত জাতিই নাই), অপ্রসিদ্ধনামা ও শাস্ত্রাব্যবসায়ী। অধিকাংশ ব্যবস্থাপত্রের ভাষা ব্যাকরণাদি-দোষ-দুষ্ট। অনেকের নাম সাক্ষরেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মহামহোপাধ্যায়ত্ব পরিস্ফুট। যথা—

(ক) নবদ্বীপ, কলিকাতা, কাশী, চিত্রকূট বাস্তব্য প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ প্রদত্ত ব্যবস্থা—.......মাহিষ্যেণ নাম্না মাহিষ্যজাতিঃ পরিচিতা। পরন্তু স্বযাং কৈবর্ত্ত এব পরিচিতঃ। অপিচ পঞ্চদশাহাশৌচাচরণেন, চতুর্ব্বেদীয়সদ্ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকক্রিয়াকলাপনিষ্পাদনেন চ মাহিষ্যজাতিত্বং নির্ণীতং।...: নবদ্বীপনিবাসী শ্রীমধুসূদন স্মৃতিরত্নস্য। শ্রীকৃষ্ণনাথ স্মৃতিকণ্ঠ শর্ম্মণঃ, কলিকাতা বাগবাজার। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন শর্ম্মণঃ, সাং নবদ্বীপ। ইত্যত্র সম্মতি বারাণসীনিবাসী মিশ্রোপনামক হরি শ (?) পণ্ডিতস্য। রামপ্রসাদ শর্ম্মা কাশীনিবাসী। চিত্রকূটনিবাসী পণ্ডিত তুলসীদাস শর্ম্মণঃ।

(খ)........ইতি সুধীভিঃ পরামর্শঃ। শ্রীঅম্বিকাচরণ দেবশর্ম্মণাম্।

(গ) ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যাজাতানাং মাহিষ্যেবং হালিককৈবর্ত্তস্য নামান্তরম্। এতেষাং ক্ষত্রবৈশ্যধর্ম্মীত্বং ক্ষত্রবৈশ্যবৎ বিবুধিষ ইতি। পিতৃমাতৃবৃত্তীনাং ঐক্যে সন্দেহাভাবাৎ একজাতীয়ত্বেনাবক্ষমেব গণ্যো ভবতীতি

ছেন ; কিন্তু প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সে বচন নাই। তিনি জন্মাষ্টমীপ্রকরণেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অনেক বচন ধরিয়াছেন ; তন্মধ্যে "কৃষ্ণাষ্টমী স্কন্দষষ্ঠী" ইত্যাদি পারণের বচনটি প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নাই। প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ঐ প্রকরণেই "বালং নীলাম্বুদাভং অতিশয়রুচিরং" ইত্যাদি ("সামবেদোক্তং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা" !) ধ্যান থাকিতেও তিনি তাহা না ধরিয়া কোথাকার "মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং" ইত্যাদি ধ্যান ধরিয়াছেন। প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মনসার (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫১ অঃ) ও মঙ্গলচণ্ডীর (প্রকৃতিখণ্ড ২১ অঃ) পূজা থাকিতেও তিনি কৃত্যতত্ত্বে দেবীপুরাণ হইতে মনসাপূজার ও কালিকাপুরাণ হইতে মঙ্গলচণ্ডীপূজার প্রমাণ ধরিয়াছেন। ঐ দুইটি পূজা তাঁহার সময়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে থাকিলে তিনি মহাপুরাণ ত্যাগ করিয়া কেবল উপপুরাণের আশ্রয় লইতেন না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার পরবর্ত্তী কালে ঐ ধ্যান ও ঐ দুইটি পূজা উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (৩য়) ব্রহ্মবৈবর্ত্তের যে অধ্যায়ে ঐ শ্লোকার্দ্ধটি আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

... ...

বভূবুর্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
তাঃ স্থিতা দেশভেদেষু গোত্রশূন্যাশ্চ শৌনক ॥ ১৪
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
ঊরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ।
তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্বর্ণসঙ্করাঃ ॥ ১৬
গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ।
তাম্বূলিপর্ণকারৌ চ তথা বণিকজাতয়ঃ ॥ ১৭
ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ ॥ ১৮

... ...

সদ্যঃ ক্ষত্রিয়বীর্য্যেণ রাজপুত্রস্য যোষিতি।
বভূব তীবরশ্চৈব পতিতো জারদোষতঃ ॥ ৯৯
তীবরস্য তু বীর্য্যেণ তৈলকারস্য যোষিতি।
বভূব পতিতো দস্যুলেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০০

… … …

ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ।
সদ্যো বভূব চাণ্ডালঃ সর্ব্বস্মাদধমোঽশুচিঃ ॥ ১০২
তীবরেণৈব চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকারো বভূব হ।
চর্ম্মকার্য্যাঞ্চ চাণ্ডালাৎ মাংসচ্ছেদী বভূব হ ॥ ১০৩

… … …

সদ্যশ্চাণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক।
বভূবতুস্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডি-ডমৌ তথা ॥ ১০৪

… … …

বৈশ্যাৎ তীবরকন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূব হ।
শুণ্ডীযোষিতি বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৯
ক্ষত্রাৎ করণকন্যায়াং রাজপুত্রো বভূব হ।
রাজপুত্র্যান্তু করণাদাগরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১০
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

কলৌ তীবরসংসর্গাদ্ ধীবরঃ পতিতো ভুবি ॥ ১১১
তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ।
রজক্যাং তীবরাচ্চাপি কোয়ালী চ বভূব হ ॥ ১১২

… … …

ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলাজাতির্বভূব হ।
জোলাৎ কুবিন্দকন্যায়াং শরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২১

বর্ণসঙ্করদোষেণ বহ্বাশ্চ শঠজাতয়ঃ।
তাসাং নামানি সংখ্যাশ্চ কো বা বক্তুং দ্বিজ ক্ষমঃ॥ ১২২
বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ॥ ১২৩
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥ ১২৪

... ...

সম্বন্ধো যেষু যেষাং যঃ সর্ব্বজাতিষু সর্ব্বতঃ।
তত্ত্বং ব্রবীমি বেদোক্তং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা॥১৩৮

... ...

পিতৃষ্বসা পিতুর্ভগ্নী মাতৃভগ্নী চ মাতুলী।
স্বসুশ্চ তনয়ঃ পুত্রো দায়াদশ্চাত্মজস্তথা॥ ১৪৫

... ...

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে জাতিসম্বন্ধনির্ণয়ো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

এইরূপ শ্লোক যে বেদব্যাসের লেখনীপ্রসূত, ইহা স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ মহাপুরুষেরা বিশ্বাস করিলেও, অপর কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন না। বিশ্বাস করিলেও, "স্বধর্মবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" ইত্যাদি প্রমাণে মনু যে কৈবর্ত্তকে নিষাদ হইতে আয়োগবীর গর্ভোৎপন্ন বলিয়াছেন, তাহাকে ক্ষত্রিয়বীর্য্যে বৈশ্যাগর্ভজাত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। কথমপি স্বীকার করিলেও উহার উত্তরার্দ্ধে ঐ কৈবর্ত্তকে পতিতই বলা হইয়াছে ("কৈবর্ত্তে দাশধীবরৌ" এই অমরোক্তি হেতু কৈবর্ত্ত, দাশ ও ধীবর শব্দ একার্থক)। পূর্ব্বার্দ্ধে কৈবর্ত্তকে হালিক কৈবর্ত্ত, এবং উত্তরার্দ্ধে ধীবরকে জালিক কৈবর্ত্ত বলাও সঙ্গত নহে; যেহেতু উক্ত পুরাণে কুত্রাপি হালিক ও জালিকের উল্লেখ নাই; এবং উক্ত অধ্যায়ে

সমস্ত জাতির উৎপত্তি বিবৃত করিয়া, ধীবরের উৎপত্তিকথা না বলিয়াই তাহাকে একেবারে পতিত বলা অসঙ্গত হয়। অথবা উত্তরার্দ্ধে যখন ধীবর রহিয়াছে, তখন পূর্ব্বার্দ্ধের 'কৈবর্ত্ত' জালিক কৈবর্ত্তই বুঝিতে হয়। বিতর্কের বশে পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত উত্তরার্দ্ধের অন্বয় স্বীকার না করিলেও, সমস্ত অধম ও পতিত জাতির মধ্যে (চাড়, মুচি, ডোম ইত্যাদির পরে এবং ধোবা, জোলা, বেদে ইত্যাদির পূর্ব্বে) কৈবর্ত্তের উল্লেখ থাকায় পূর্ব্বাপর-সাহচর্য্যে কৈবর্ত্তের অধমত্ব ও পতিত্বই সপ্রমাণ হইতেছে। সুতরাং সে জালিক কৈবর্ত্ত হইলেও কিছুতেই মাহিষ্য হইতে পারে না। শুক্লযজুর্ব্বেদেও সমস্ত অধম জাতির মধ্যে কৈবর্ত্তের উল্লেখ পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি (১০ পৃঃ)।

বিশ্বকোষেও (কৈবর্ত্ত শব্দের বিবরণে) উক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে—

"কেহ কেহ পদ্মপুরাণীয় জাতিমালা নাম দিয়া ঐরূপ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু মূল পদ্মপুরাণের ৫।৬ খানি পুথির কোন খণ্ডে ঐরূপ জাতিমালার অনুসন্ধান পাইলাম না। ভার্গবরাম, পরশুরাম প্রভৃতির নামে একখানা জাতিমালা পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে—স্বর্ণকারাচ্চ কৈবর্ত্তো যোষিত্যাং জায়তে ততঃ।... ব্রহ্মবৈবর্ত্তে অতি নীচ জাতির বর্ণনাস্থলেই কৈবর্ত্ত জাতির কথা, তৎপরে জোলা প্রভৃতি নীচ মুসলমান জাতির উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের যে অধ্যায়ে জাতিনির্ণয় বর্ণিত আছে, তাহা প্রাচীন পুরাণের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং অপ্রাচীন বোধে উহা দ্বারা কৈবর্ত্ত জাতির প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না।... নানা স্থানে কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে নানা প্রবাদ আছে। কেহ বলেন পূর্ব্বে কেওট নামে এক প্রবল জাতি ছিল। তাহারা বল্লালসেনের অনুগ্রহে জলাচরণীয় শূদ্র ও কৈবর্ত্ত নামে পরিগৃহীত হয়। কৈবর্ত্ত হইয়া তাহারা মৎস্যজীবিকা

পরিত্যাগ করে। গোপালভট্ট-বিরচিত বল্লালচরিত পুথিতেও এই কথা আছে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সম্বন্ধে বিশ্বকোষে (পুরাণ শব্দে) লিখিত হইয়াছে—"প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এত বেশী ভেজাল মিশিয়াছে যে, আদি অকৃত্রিম জিনিস বাছিয়া লওয়া অসম্ভব। এ দেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইলে ও হিন্দুমুসলমানের যৌন সম্বন্ধে নানা নীচ জাতি উদ্ভূত হইতে থাকিলে এই পুরাণের সৃষ্টি। তাহা এই পুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডের বচন হইতেই জানা যায়; যথা—ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলাজাতির্ব্বভূব হ।"

এই সকল আলোচনা দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন কালে সকল কৈবর্ত্তই মনুক্ত নৌকর্ম্মজীবী ছিল। পরে, যুগী প্রভৃতি জাতির মধ্যে অনেকেই যেমন প্রাচীন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল যাবৎ অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, সেইরূপ কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে কতক চাষ আর কতক গুটিপোকার কারবার করিতে আরম্ভ করায় উঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

(৫) বিশাল ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে ২।৫।১০ জন কারণবিশেষে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কৈবর্ত্তের দান গ্রহণ, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা বা তাঁহাদিগকে মন্ত্রশিষ্য করিলেও, তাহা তাঁহাদের মাহিষ্যত্বের এবং তাঁহাদের পুরোহিতগণের বৈদিকব্রাহ্মণত্বের নজির হইতে পারে না। ইদানীং অনেক সদ্ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে মুসলমান পাচক রাখিয়াছেন ও তাহাদের পক্ক মাংসাদি ভক্ষণ করিতেছেন বলিয়া কি মুসলমানদের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইবে?

(৬) আদম সুমারির রিপোর্ট সম্বন্ধে বিশ্বকোষে (কৈবর্ত্ত শব্দে) লিখিত হইয়াছে—

"১৮৯১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনা কালে হালিক কৈবর্ত্ত সমিতি হইতে আদম সুমারির তত্ত্বাবধায়কের নিকট যে মুদ্রিত ইংরাজি আবেদন যায়,

তাহার ১২ পৃষ্ঠায় যে ভাবে লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয় (অশ্বমেধ-পর্ব্বের ৮৩ অধ্যায়ে) অর্জ্জুন দক্ষিণ সমুদ্র তীরবাসী যে মাহিষক জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারাই যেন হালিক কৈবর্ত্তের আদি-পুরুষ। কিন্তু মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে (৪৪ অঃ) মাহিষক ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।"

বিশ্বকোষের শেষোক্ত সিদ্ধান্তে আমরা একমত হইতে পারিলাম না। যেহেতু কর্ণপর্ব্বের ৪৪ অধ্যায়ে বাহীকদেশবাসীদিগকেই ম্লেচ্ছা-চারী বলা হইয়াছে। কারস্কর, মাহিষক প্রভৃতিও ঐরূপ দেশবিশেষ; তত্তৎ দেশে গমনের নিষেধমাত্র আছে। অনুশাসনপর্ব্বের ৩৩ অধ্যায়ে মাহিষক নামে ক্ষত্রিয় জাতির উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু তাহারাই যে বর্ত্তমান কৈবর্ত্তদিগের আদিপুরুষ, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কোনও প্রমাণে উহা প্রতিপন্ন করিলেও হালিক কৈবর্ত্তদিগের মাহিষ্যত্ব সুদূর-পরাহত হইয়া শূদ্রত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা—

"শকা যবন-কাম্বোজাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥
দ্রাবিড়াশ্চ কলিঙ্গাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।
কোলিসর্পা মাহিষকাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥"

এক্ষণে শ্রীমান্ হরিশ্চন্দ্র বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করি—

ইং ১৯১১ সালের পূর্ব্বে আদম সুমারির রিপোর্টে চাষী কৈবর্ত্ত-দিগকে কি বলিয়া লেখা হইত? তখন কেহ কোনও আপত্তি করেন নাই কেন? ৫।৬ হাজার অধ্যাপকের ব্যবস্থাপত্র ও ১৯১১ সালের রিপোর্ট ২৫।২৬ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলেও বাঙ্গালার প্রত্যেক মহকুমায় হিন্দুসমাজে কৈবর্ত্তেরা ও কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণেরা এখনও কি ভাবে ব্যবহৃত ও পরিচিত হইতেছেন? যে সকল কৈবর্ত্ত ১৫ দিন ও ১ মাস

অশৌচ পালন করে, তাহাদের কোন্ পক্ষের সংখ্যা কত? মৌড়ির কুণ্ডু বাবুদের ও আন্দুলের রাজার বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণে ব্রাহ্মণ-ভোজন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া বাবাজী নিজে ও তাঁহার সজাতীয়গণ কিরূপ পঙ্‌ক্তিসম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? আন্দুলের বাবু যোগেন্দ্র-নাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণদিগকে সমভাবে "সামাজিক" দিতে ইচ্ছুক হইলে কেন গণ্ডগোল বাধিয়াছিল? আজ পর্য্যন্ত ধনী বা মধ্যবিত্ত কোনও চাষা কৈবর্ত্তের বাটীতে ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে রাঢ়ীয়াদি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা "জলপান" ও অধ্যাপকেরা "বিদায়" গ্রহণ করেন কি না, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণই বা হয় কি না? চাষী কৈবর্ত্তেরা যদি চিরন্তন মাহিষ্য এবং তাঁহাদের পুরোহিতেরা যদি চিরকাল "গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ" বলিয়াই পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আদম সুমারির রিপোর্টে ঐরূপ লেখাইবার জন্য ইং ১৯০২ সাল হইতে হাওড়ার রেজিষ্ট্রার প্রভৃতির নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন কেন? (তাঁহারই "ভ্রান্তিবিজয়ে" দ্রষ্টব্য)।

বাবাজীকে অনুরোধ করিতেছি, জেলায় জেলায় আমার নামে নালিশ করিবার পূর্ব্বে, জেলায় জেলায় ঘুরিয়া তথ্যানুসন্ধান করিয়া ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান করুন। আর এক কথা—৫০৬ হাজার অধ্যাপক, সর্ব্বোপরি বঙ্গীয় আদম সুমারির তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত ও'মালি (L. S. S. O' Malley, Esqr. I. C. S.) সাহেব বাহাদুর যখন চাষী কৈবর্ত্তদিগকে মাহিষ্য বলিয়া মত দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, তখন আমার ন্যায় একজনমাত্র নগণ্য ব্যক্তি শাস্ত্রমতানুসারে বিপরীত বাক্য বলাতেই তাঁহাদের এত চাঞ্চল্য ঘটিল কেন? একটা কূপমণ্ডূকের ক্ষীণ নিস্বনে "প্রাক্তনাস্তে তিরোহিতাঃ" হইবে, এই আশঙ্কায় বীরহৃদয় বিকম্পিত হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য!

যদিই কোনও জাতি ব্রাহ্মণদিগের কুচক্রে ও কোনও কোনও রাজার

ক্রোধে বহুকাল এবং উৎকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে, তার জন্য এখন আর দুঃখ, অভিমান ও আক্রোশ করিলে কি হইবে ? হিন্দুসমাজের এখনও এত সভ্যতা ও উদারতা জন্মে নাই যে, পূর্ব্বপরিচয় পাইলেই তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট জাতিতে তুলিয়া লইবে। মুসলমান-রাজত্বে যে কত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান হইয়া, পুরুষ-পরম্পরায় তজ্জাতীয় হইয়াই রহিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা এখন কি করিতেছেন ? "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম"র ন্যায় আত্মগৌরব-সংঘটনও দৈবায়ত্ত ভাবিয়া এ জন্মের মত নীরব থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে কি ?

হীনজাতীয় হইলেও কেহ কাহারও হেয় ও অবজ্ঞেয় নহে, এ কথাও আমি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি (১১১ পৃঃ ২১ পং—১১২ পৃঃ ৫ পং)।

বর্ত্তমান ১৩০৩ বৈশাখের স্থিশূল পত্রে প্রকাশিত হাওড়ার ব্রাহ্মণ-সভার বিবরণে দেখা যায়, সভাপতি মহাশয় কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বল্লাল সেনের আমল হইতে ৭০০ বৎসর ধরিয়া এই নিরপরাধ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করত তাহাদিগকে একপ্রকার কোণঠেসা করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা বৈদিক ব্রাহ্মণগণমধ্যে গণনীয় হইতে বাধা নাই।"

. অধমতারণ অদ্বৈত মহাপ্রভু স্বয়ং ২৫০ বৎসরমাত্র পরে যাঁহাদিগকে কোণঠাসা হইতে বাহির করিয়া উদ্ধার করিতে পারেন নাই, তাঁহার বংশধর গোস্বামী প্রভুর সম্পাদিত পণ্ডিতোত্তারিণী সভার সভাপতি মহাশয়ের বাক্যে ৭০০ বৎসরের পর তাঁহারা এখন যদি বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে গণনীয় হন, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে ? পরন্তু সভাপতি মহাশয়ের কথাতেও সপ্রমাণ হইতেছে, ৭০০ বৎসর তাঁহারা সমাজের কোণঠাসা (অর্থাৎ হেয়) হইয়া আছেন, এবং (গৌরাঙ্গ যুগে পাইয়া) এখনও বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন নাই। বাবাজী সেই সুযোগেতে উপস্থিত থাকিয়াও সে কথার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া

নীরবে চলিয়া আসিয়া, ব্যাঘ্রবম্পনে আমার স্কন্ধে চাপিয়াছেন। ইহা নীরবের পরা কাষ্ঠা বটে! সভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, আমিও ত সেই কথাই লিখিয়াছি। তবে তাঁহার বাক্য প্রাণোন্মাদন ও মানবর্দ্ধন-বোধে সগৌরবে পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, আর আমার বাক্যই "অরুন্তুদমিবালানং" হইয়া মানহানিকর বিবেচিত হইল, ইহার কারণ কি? তিনি আদর্শ জমিদার এবং আমি দুর্দ্দর্শ দরিদ্র বলিয়া বুঝি। অথবা বাবাজী, মহারাজ দিলীপের ন্যায়, আকারসদৃশপ্রজ্ঞ হওয়ায় কথাটার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন নাই।

বাবাজী তাঁহার পুস্তকে পরিচয় দিয়াছেন—সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার গোয়ীচন্দ্র তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ। এইজন্য তিনি স্বকৃত পুস্তকাদিতে স্বীয় নামের পর 'উত্থাসনি' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।

তাঁহাদের কুলজী গ্রন্থে বাস্তবিকই যদি ঐরূপ থাকে, তাহা হইলে এইমাত্র বুঝা যাইতেছে যে, গোয়ীচন্দ্র কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার বা সংস্কৃতজ্ঞ হইলেই যে সদ্‌ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে অমরকোষের ও ভট্টিকাব্যের টীকাকার ভরত মল্লিককে, ঋগ্বেদসম্পাদক ভট্ট মোক্ষমূলরকে এবং বাল্মীকিরামায়ণের অনুবাদক গ্রিফিথ সাহেব প্রভৃতিকেও সদ্‌ব্রাহ্মণ বলিতে হয়।

গোয়ীচন্দ্র ঔত্থাসনিক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। উত্থাসনি ও ঔত্থাসনিক কি একার্থক? আশা করি, বাবাজী অতঃপর খাস গোয়ীচন্দ্রের বংশধর হইবার জন্য উত্থাসনির পরিবর্ত্তে ঔত্থাসনিক ব্যবহার করিয়া পরিচয়টা বিশুদ্ধ ও বিস্পষ্ট করিবেন। সকল জেলার লোকেই বলে "বরং কৈবর্ত্তের জল চলে, কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণের জল চলে না।" বাবাজী কয়টা লোকের মুখ বন্ধ করিবেন?

যাহারা আপনাদের আত্মোৎকর্ষ খ্যাপনের জন্য শাস্ত্রের বচন, তাম্রশাসন, শিলালিপি ও অধ্যাপকদিগের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ সকল প্রয়াসই যে নিকৃষ্টজাতীয়ত্বের সূচক [illegible]

অর্থাৎ সমাজে তাঁহারা হীন হইয়া আছেন বলিয়াই যে উচ্চ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন), ইহা তাঁহারা নিজেও বুঝিতেছেন না এবং তাঁহাদের মুরুব্বিরাও সে বিষয়ে প্রণিধান করিতেছেন না, ইহাই দুঃখ।

তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন—"প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্ব এব দ্বিজোত্তমাঃ।" হিন্দুসমাজ যে এখন ভৈরবীচক্রে পরিণত হইয়াছে, তাহা না জানিয়াই এই জাতিতত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তথাপি ইহার সূচনায় লিখিয়াছি—এই যথেচ্ছাচারের যুগে যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই হইতেছে ও তাহাই করিতেছে; তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। তবে সেই যথেচ্ছাচারের সমর্থনের জন্য মিথ্যা করিয়া শাস্ত্রের বচন তোলাতেই আমাদের আপত্তি ও প্রতিবাদে প্রবৃত্তি। আমার আলোচনায় কেহ কোনও অংশে যথাশাস্ত্র ভ্রম প্রদর্শন করিলে, সংশোধন করিব—এ কথাও স্পষ্টরূপে লিখিয়াছি। তথাপি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অনেকেই আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন।

ভাবিয়াছিলাম, এই জাতিতত্ত্ব পড়িয়া তাঁহারা "বালাদপি গ্রহীতব্যং" ইত্যাদি নীতিরই অনুসরণ করিবেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা না করিয়া, সকলেই "পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং" ইত্যাদি নীতিই অবলম্বন করিতেছেন। বৈদ্যেরা ত "হা-যা-কা" হইয়াছেন (তাঁহারা আমার জন্য "ভূতো" প্রণয়ন করিতেছেন শুনিতেছি); কৈবর্ত্তেরা ও কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণেরা আমার নামে নালিশ করিতে উদ্যত; যোগীরাও আমার দণ্ডবিধানের জন্য [illegible] সভা"র আয়োজন করিতেছেন শুনিয়াছি; কেবল কায়স্থদিগের কোনও উচ্চবাচ্য এখনও শুনিতে পাই নাই। যোগী মহোদয়েরা আপনাদের ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির জন্য বহুকাল যাবৎ বহু পুস্তকাদি প্রচার করিলেও আদম সুমারির রিপোর্টে ব্রাহ্মণেতর জাতির যে অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে যথাক্রমে "ডোম, কাওরা, হাড়ি, যোগী বা যুগী" এই চারি জাতির উল্লেখ আছে, অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়াছেন কি?

আমি বিদ্বেষবশে "জাতিতত্ত্ব" লিখিয়াছি বলিয়া তত্তজ্জাতীয়েরা সকলেই আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন। বস্তুতঃ যাঁহাদের জাতিতত্ত্ব লিখিয়াছি, তাঁহাদের প্রতি আমার বিদ্বেষের লেশমাত্রও নাই; তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্যই উহা লিখিয়াছি।

জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত কাহারও সহিত আমার কোনরূপ মনোমালিন্য নাই। বৈষয়িক ব্যাপারে কখনও কাহারও সহিত বিবাদ ঘটিলে, জ্ঞাতিদিগের আপত্তি সত্ত্বেও ন্যায্য সম্পত্তির নিজ অংশ ছাড়িয়া দিয়া সকলের সহিত সদ্ভাব রক্ষাই করিয়া আসিয়াছি। এইরূপ নানা কারণে অনেকে আমায় "অজাতশত্রু" আখ্যা দিয়াছেন। বিধির বিড়ম্বনায় অন্তিমকালে জাতিতত্ত্ব লিখিয়া—অপ্রিয় হইলেও শাস্ত্রসম্মত সত্য কথা বলিয়া, এই যে কতকগুলি লোকের সহিত মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিলাম, ইহার জন্য তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

জাতিতত্ত্বে লিখিত অংশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করিয়া সদ্ভাব রক্ষা করিবার জন্য অনেকে আমাকে উপদেশ দিতেছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও অংশ প্রত্যাহার করিবার (ভীতিপ্রদর্শন ও গালিবর্ষণ ভিন্ন) কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণই পাই নাই। পাইলে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে অবশ্যই প্রত্যাহার করিতাম এবং ভবিষ্যতে করিতেও প্রস্তুত আছি।

এইখানেই আমার সকল বক্তব্য শেষ করিলাম। (ব্রহ্মার মুখাদি হইতে যে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের সংখ্যা কত ও নাম কি? আফ্রিকা, ইয়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশের মনুষ্যগণ ব্রহ্মার সৃষ্ট না হয় ত কাহার সৃষ্ট? গীতার ৬ অঃ ৪২ শ্লোকের পূর্ব্বাপর সমস্ত বিশ্লেষণ করিলেই যোগী জাতির প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়; ইত্যাদি) নূতন নূতন নানাবিধ অভিসারগর্ভ প্রশ্নের ও প্রতিবাদের উত্তর দিতে আমার শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। যাঁহারা জন্মের বশে আত্মোৎকর্ষ লাভের মোহে ধর্মকর্ম পণ্ড করিতেছেন, তাঁহাদের মোহ

ইহার মত দুর্ব্বলবোধে জাতিতত্ত্বে সেই বচনগুলি শাস্ত্রপ্রমাণের সহরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। এ বর্ণকাহিনী যাঁহাদের কর্ণপীড়িনী বা কর্ণস্পর্শিনী হইবে, তাঁহারা ভ্রম সংশোধন করিবেন; নচেৎ যাহা [illegible]ন তাহাই করিবেন, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি [illegible]শাস্ত্রই যখন বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ন শিষ্যন্তি জনাধিপ।
একবর্ণস্তদা লোকো ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে॥
ন কশ্চিৎ কস্যচিচ্ছ্রোতা ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ গুরুঃ।
তমোগ্রস্তস্তদা লোকো ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে॥
জ্ঞানানি চাপ্যবিজ্ঞায় করিষ্যন্তি ক্রিয়াস্তথা।
আত্মচ্ছন্দেন বর্ত্তন্তে যুগান্তে সমুপস্থিতে॥"

(মহা, বন, ১৯০ অঃ),

তখন তাহা অন্যথা হইবার নহে। তবে এখনও যুগক্ষয় উপস্থিত হয় নাই, কলিযুগের এই সন্ধ্যাংশমাত্র চলিতেছে; ইহা জানিয়াই জাতিতত্ত্ব লিখিয়াছি। ইতি— শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় সমীপেষু

নবদ্বীপস্থবিবুধানাং প্রণতিপত্রমিদম্—

মহাশয়, আপনার প্রেরিত 'জাতিতত্ত্ব' নামক পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত নিপুণভাবে পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। আপনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ঐ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, ঐ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুমোদিত, সুতরাং পণ্ডিতাদিরও সর্ব্বতোভাবে অনুমোদিত; উহাতে কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি নাই। বৈদ্য প্রভৃতি জাতি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত

হইয়া পূর্ব্বানুশীলিত পথকে অতিক্রম করিতেছেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য আপনি যে সকল শাস্ত্র যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, উহাতে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ নাই, ইহা পণ্ডিতমাত্রেরই অনুমোদিত। ৺ভগবৎসমীপে আমাদের প্রার্থনা—আপনি দীর্ঘজীবী হউন। ইত্যলমতিবিস্তরেণ। ৩০।৩।৩৩

শ্রীশিতিকণ্ঠ বাচস্পতি *

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ
" চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ
" শশাঙ্কভূষণ ন্যায়পঞ্চাননতর্কতীর্থ
" অমরচন্দ্র তর্কতীর্থ
" যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ
" অহিভূষণ স্মৃতিরত্ন
" রামকণ্ঠ তর্কতীর্থ
" যোগেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন

শ্রীশ্যামসুন্দর কাব্যব্যাকরণতীর্থ
" ললিতমোহন কাব্যরত্ন বিদ্যারত্ন
" শিবনাথ তর্কতীর্থ
" প্রাণগোপাল তর্কতীর্থ
" ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ
" নিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ
" মনোরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ
" রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

ভাটপাড়া, রঙ্গপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত অভিমত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

যে সকল অধ্যাপক "জাতিতত্ত্ব" পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব অভিমত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কেবল পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় কোনও অভিমত দেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মব্যবস্থাপকরূপে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিয়াও এই ধর্ম্মসমস্যায় অভিমত প্রকাশে নীরব থাকায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। হিতবাদী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি ইহার সমালোচনা যে কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য করেন নাই, তজ্জন্যও দুঃখিত।

* ইনি ঐরূপ অভিমতই পৃথক্ পত্রে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

বৈদ্যহিতৈষিণীর ১৩৩২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বৃজগোপাল পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি আমাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা (বিশেষ করিয়া স্থানাভাবে ও সময়াভাবে এবার সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে না পারায়) সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি —

"...বৈদ্য জাতির মধ্যে বৈদ্যসম্প্রদায়ের কতিপয় শিক্ষিত ও গণনীয় মহোদয় আমার বিশেষ পরিচিত ও হিতৈষী।...তাঁহারা প্রস্তাবক্রমে... আমার নিকট বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব বিধায়িনী যুক্তিপূর্ণ "বৈদ্যহিতৈষিণী" পত্রিকা প্রদান করিয়া আমার মন্তব্য জিজ্ঞাসা করেন।...তৎকালে তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ যে সঙ্গতিপূর্ণ ও বিশেষ বিচারসাপেক্ষ, ইহা বোধ করিয়াই আমি সেইভাবেই প্রত্যুত্তরপত্র দিয়াছি, তাহাতে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার বা ব্রাহ্মণত্বে অধিকার একেবারেই প্রতিপন্ন করি নাই। পরন্তু তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তির বিরোধী প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারি নাই বা অনুরোধমূলক ইচ্ছা করি নাই।...বৈদ্য জাতির ব্রাহ্মণত্বপ্রতিষেধ বিষয়ে মাননীয় ৺কাশীবাসী পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীল শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন, ধার্ম্মিক পাঠকমাত্রই মাসিক বসুমতীতে তাহা অবগত আছেন। বৈদ্য উপাধিধারিগণ ব্রাহ্মণের বৈদ্যসংজ্ঞা দেখাইয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে পারেন না। অন্যদিকে তাঁহাদিগের চিরাগত আচার, ব্যবহার, উপাধি কি ব্রাহ্মণত্বের সূচক হইতে পারে?... শ্রীবৃজগোপাল পঞ্চতীর্থদেবশর্ম্মণঃ (১০ই মে, ১৯২৬)।"

বিশেষ কথা।

যদিই কোনও কোনও মহাত্মাবর্গে বাক্যচেষ্টা বা বাক্যব্যয়ো [illegible]ব্যবর্গী পাঠ থাকে এবং ছেদ, বেদ বা বর্ণ পদে কোনও

[illegible] পাঠ দেখাইয়াছেন, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন ?

১৩৩৩ আষাঢ়ের "মাহিষ্য সমাজে" দেখিলাম, গৌরীচন্দ্রের [illegible] চাণক্য ও হলায়ুধও কৈবর্ত্তব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ।—তাই বুঝি [illegible] রাজা চাণক্যকে পাত্রিয় ব্রাহ্মণের আসন হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন ? পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ী হইতে প্রকাশিত "কবিরহস্যে"র ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, হলায়ুধ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহারা ত বন্দোপাধ্যায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। জেতে উঠ্‌বার জন্য পরপুরুষকে ধরিয়া টানাটানি করা "নবীন তপস্বিনী"র ঘটনার ন্যায় কৌতুকজনক বটে !

উক্ত পত্রেই লিখিত হইয়াছে, কনোজিয়া ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আসিবার পূর্ব্বে কৈবর্ত্তব্রাহ্মণেরাই "বঙ্গের আদি পুরোহিত" ও "একজাতিযাজী" ছিলেন।—তখন কি বঙ্গদেশে মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত ভিন্ন আর কোনও জাতি ছিল না ? এখনকার ন্যায় আচণ্ডাল নানা জাতি থাকিলে, তাহাদেরও ত পুরোহিত ছিল ; তবে তাঁহারাই "বঙ্গের আদি পুরোহিত" কিরূপে হইলেন ?

আরও লেখা হইয়াছে—"আমাদের মাহিষ্য সমাজটা কত যুগযুগান্তর হইতে আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।...কৃষক ভাইদের সঙ্গে আমাদের এই সমাজকে গড়ে তুলতে হবে।"—তবে চাষী কৈবর্ত্তেরা চিরন্তন মাহিষ্য, এবং মাহিষ্য ও চাষা কৈবর্ত্ত অভিন্ন জাতি কিরূপে হইল ? তাঁহাদের সকল কথাই যেন উন্মত্তের ন্যায় অসম্বদ্ধ প্রলাপ !!

কবিরত্ন মহাশয় কৈবর্ত্তব্রাহ্মণদিগের বা কোনও জাতিরই নিন্দা করেন নাই ; সকলের স্বরূপকীর্ত্তনই করিয়াছেন। সুতরাং বিপ্রনির্ণয় জন্য তাঁহার কোনও পাপ ও অপরাধ হয় নাই। যাঁহারা বিনা অপরাধে তাঁহাকে গালি দিতেছেন এবং যাঁহারা বিনা প্রতিবাদে তাহা শুনিতেছেন, তাঁহারাই পাপভাগী ; যেহেতু "ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে, শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।" ইতি—প্রকাশক

৭৩ পৃঃ	১২ পং	ব্রাহ্মণ	স্থলে ব্রাহ্ম
১০[illegible]	৭	ব্রাহ্মণাদী	ব্রাহ্মণাদি